# ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

বঙ্গানুবাদ—ডঃ শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

**প্রকাশক :**
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা ৭০০ ০০৩

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
স্বামী বিবেকানন্দের ১৪০-তম শুভ জন্মতিথি
২২ মাঘ, ১৪০৮ / ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

প্রথম পুনর্মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯
May, 2002
1M1C

**অক্ষর বিন্যাস**
উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

**মুদ্রক :**
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০, দমদম রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩০

# প্রকাশকের নিবেদন

"নাম, নাম, নাম, কেবল নাম। তীব্র কর্ম কর আর নাম কর।" কথাগুলি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-সন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর শ্রীমুখে প্রায়ই বলতেন। কিন্তু অধ্যাত্ম-সাধনায় এই যে নাম-জপ, ধ্যান, যা এর অপরিহার্য অঙ্গ, তা আমরা কি করে করি? পথে তো অনেক বাধা, বহুবিধ অন্তরায়। মন মানে কই? গীতায় অর্জুন পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অনুযোগ করছেন, "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ, প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্...।" ইত্যাদি বলে। মন স্বভাব-চঞ্চল, ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপকারী আর তার এই চাঞ্চল্যের মাত্রা এতই বেশি যে সহজে তাকে বাগ মানানো যায় না। আর এই চঞ্চল মন ছাড়াও আছে আমাদের ষড় রিপু। তাই আমরা ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভে আগ্রহী হয়েও সাধন-জীবনে তেমন অগ্রসর হতে পারি না। কত বিভিন্ন রকমের সমস্যা, কত রকম জটিলতা, সঙ্কট ইত্যাদি এসে আমাদের দিশেহারা করে দেয়। এ ধরনের সমস্যাদির কথা বিচার করে ব্যবহারিক দিক থেকে কার্যকরী উপদেশ ও সঠিক পথ নির্দেশ আমরা কোথায় পাই?

একদিকে সাধারণ মানুষ, যারা সংসারের মধ্যে থেকেও সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন করে অধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর হতে চায় আর অপর দিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত সংসার ত্যাগী অধ্যাত্ম সাধক যাঁরা এই সাধনাকেই জীবনের অবলম্বন করতে চায়—এই উভয়বিধ মানুষের জীবনে উদ্ভূত এই সব সমস্যাবলীর কথা গভীরভাবে চিন্তা করতেন 'ব্রজের রাখাল' স্বামী ব্রহ্মানন্দেরই এক সুযোগ্য শিষ্য পরম পূজ্যপাদ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ। তাঁর শুচি-শুদ্ধ সার্থক সাধন জীবন ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাই তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ছিল সুগভীর এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল বহুমুখী। তিনি ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল-সতের বছর ইয়োরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় আলোচনা-চক্র, পাঠচক্র ইত্যাদির মাধ্যমে অগণিত অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসুদের কাছে অধ্যাত্ম-সাধনার বিভিন্ন দিক ও তাদের সাধন জীবনের এবম্বিধ সমস্যাদির কথা আলোচনা করে তাদের অধ্যাত্ম জীবন-গঠনে ব্যবহারিক ও কার্যকরী সব অমূল্য পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি পাশ্চাত্য দুনিয়ার ভোগবাদী মানুষদের মনেও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলে তাদের শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শুধু বহির্ভারতেই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তেও তাঁর কর্মময় জীবনে তিনি অসংখ্য মানুষকে দিয়ে গেছেন এই আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধান ও অভ্রান্ত দিঙ্‌নির্দেশ। স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ তাঁর কর্মবহুল জীবনে একাধিক গ্রন্থও রচনা করেছেন, যা অপরিসীম ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত এই সব গ্রন্থরাজির বাইরেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ও অপ্রকাশিত ভাষণ-লিপি, নথিপত্র ও চিঠিপত্রাদির

মধ্যে বহু অমূল্য রত্নসম্ভার লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢেকে গিয়েছিল। মহারাজ একসময় তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর কাছে ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতার ওপর একখানি বিশদ গ্রন্থরচনার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে অকস্মাৎ তাঁর মহাসমাধি ঘটে যাওয়ায় সে কাজ তিনি নিজ হাতে করে যেতে পারেন নি। তাঁর শেষ জীবনে তিনি বেলুড় মঠের অন্যতম সহাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও, বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষপদের দায়িত্বও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করে গিয়েছেন। সেখানে তাঁর অগণিত শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর শুভ প্রচেষ্টায় তাঁর রেখে যাওয়া ঐ সব মহামূল্য সম্পদরাশির সুচিন্তিত গ্রন্থন ও সংকলনের ফলে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালোর আশ্রমের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় *Meditation and Spiritual Life* নামে এক সুবৃহৎ কালজয়ী গ্রন্থ। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তার আপন বৈশিষ্ট্যে সমগ্র বিশ্বের অধ্যাত্ম অনুপ্রেরণায় প্রেরিত বিদগ্ধ মানুষদের মধ্যে সাড়া জাগে এবং অধ্যাত্ম সাধনায় আগ্রহী শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারাপুষ্ট নরনারীর কাছে গ্রন্থটি জীবন-বেদের মর্যাদা লাভ করে।

আমরা ইতঃপূর্বে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করে *'ধ্যান ও আনন্দময় জীবন'* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করি। ঐ পুস্তিকাটির অনুবাদ করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ঐ বইটি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই সকল শ্রেণীর পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করে। সে সময়েই এই অতুলনীয় ইংরাজি গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ঐ অনুবাদের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বার্ধক্যজনিত বহুবিধ শারীরিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও একক ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় পূর্বের ঐ আংশিক অনূদিত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সংশোধন করে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের এই দুরূহ কাজটি সুসম্পন্ন করেন। বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি *'ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন'* নামকরণ করা হয়েছে। উদ্বোধন কার্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের কতিপয় উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকমণ্ডলীর সক্রিয় সহযোগিতায় গ্রন্থটি মুদ্রণের বহুবিধ কাজ সুসম্পন্ন হয়। গ্রন্থশেষে নির্দেশিকা ও নির্ঘণ্ট প্রণয়নে সাহায্য করে শ্রীতারকনাথ দে। আমরা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সকলের প্রতি গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদটির প্রকাশনা সম্ভব করার জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

আশাকরি, এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি সাধনজীবন উত্তরণের ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশ দিয়ে মানবজীবন সার্থক ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করবে।

**স্বামী সত্যব্রতানন্দ**

## মূল ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকা

রামকৃষ্ণ মঠ<br>
পোঃ অঃ - বেলুড় মঠ<br>
জেলা-হাওড়া<br>
২০ এপ্রিল, ১৯৭৯

স্বামী যতীশ্বরানন্দের বক্তৃতা ও রচনা হইতে সঙ্কলিত 'Meditation and Spiritual Life' গ্রন্থখানি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া আমি আনন্দিত।

স্বামী যতীশ্বরানন্দ রামকৃষ্ণ মঠের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি ভারতে ও বিদেশে তাঁহার বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও উপদেশাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অনেক অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক আদর্শ ও তার অনুশীলনের খুঁটিনাটির বিস্তারিত বিবরণ ও সেগুলি অধ্যাত্মজীবনে কিভাবে কাজে পরিণত করা যায় তাহার নানা সূত্রও দেওয়া হইয়াছে।

আমি আশা করি এই গ্রন্থখানি আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনে উৎসুক ব্যক্তিদের প্রেরণা যোগাইবে ও সত্যানুভূতির সংগ্রামে তাহাদের সহায়তা করিবে।

**স্বামী বীরেশ্বরানন্দ**<br>
অধ্যক্ষ<br>
রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন

# ইংরাজী গ্রন্থে প্রকাশকের মন্তব্য

স্বামীজী বলেছিলেন 'সাহসী হও, সত্যের সম্মুখীন হও।' এই বইখানি তা-ই করতে শেখায়। যারা ঈশ্বরের ডাক শুনে ঈশ্বরোপলব্ধিকে—তথা আত্মোপলব্ধিকেই—জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে, যারা সে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কোন ত্যাগকেই অতি মহৎ বা কোন মূল্যকেই অতি উচ্চ বলে মনে করে না সেই সব যথার্থ অধ্যাত্মজ্ঞান-পিপাসুরা এই বইখানি থেকে পথ নির্দেশ পেতে পারে।

বর্তমান কালে সারা পৃথিবীতে যোগ এবং অন্যান্য ভারতীয় অধ্যাত্মসাধন পথের দিকে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলির প্রতিশ্রুতির এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার চমকের মোহ থেকে মুক্ত ও বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতির দোষ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে অসংখ্য পাশ্চাত্য দেশবাসী জীবনের নতুন দিকের—তার সত্যরূপের—অন্বেষণে বেরিয়েছে। সংস্কৃতির এই প্রয়োজন মেটাতে ভারতে ও বিদেশে বহু বই ও পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছে। সব বইয়েরেই যাথার্থ্য বা মূল্য সমান নয়। এও ঠিক যে, যারা প্রাচ্য চিন্তাধারার দিকে ফিরেছে তারা সবাই যে চরম সত্যের যথার্থ অনুসন্ধানী তাও নয়। অনেকেই নিজ চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গে খাপ খায় এমন একটি বৌদ্ধিক পরিকাঠামো খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবার অনেকেই ধর্মের অলৌকিক, উদ্ভট, ভূতুড়ে অঙ্গগুলির দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সব সময়েই কিছু সংখ্যক খাঁটি তত্ত্বলোভেচ্ছু থাকে, যারা কখনো যথার্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও সফলতা লাভ না করে থামে না। অপেক্ষাকৃত কম ধৃষ্টতাসম্পন্ন কিন্তু অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই লোকসমষ্টির আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা।

গ্রন্থকার স্বামী যতীশ্বরানন্দ তাঁর জীবৎকালেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ, অধ্যাত্মজীবন-পথের বিশেষ সুদক্ষ নির্দেশক, অতিশয় অমায়িক ও শান্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ, মানবসমস্যা সম্বন্ধে গভীর বোধসম্পন্ন, সর্বস্তরের মানবের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ বলে সুবিদিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিষ্য স্বামী যতীশ্বরানন্দ রামকৃষ্ণ মঠের একজন পরম-শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ সন্ন্যাসী ছিলেন; পরে ইহার সহাধ্যক্ষ হন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত ও গুরু সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিচারণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে উলফ্র্যাম. এইচ. কক (Wolfram H. Koch) প্রমুখ কতিপয় জার্মান বেদান্ত-শিক্ষার্থীর সনির্বন্ধ অনুরোধে মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দকে জার্মানীর ভাইসব্যাডেন (Wiesbaden) শহরে পাঠান। তিন বছর পরে স্বামী তাঁর কার্যক্ষেত্র সুইজারল্যাণ্ডের—জেনেভা, লুসানে, জুরিখ, ক্যামফ্যার এবং সেণ্ট মরিজ প্রভৃতি শহরে স্থানান্তরিত করেন। মধ্যে তিনি ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডেও গিয়েছিলেন। গতানুগতিক অর্থে তিনি প্রচারক ছিলেন না, কারণ তিনি তত্ত্বের থেকে আচরণের ওপর বেশি জোর দিতেন। ছয় বৎসর ইউরোপে থাকার সময় তিনি আত্মানুভূতি লাভে আগ্রহী ও আধ্যাত্মিক জীবনের কঠোরতা পালনে প্রস্তুত এমন আন্তরিক অধ্যাত্ম-পিপাসুদের নিয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশাবলী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ভগবদ্‌গীতা, উদ্ধবগীতা, নারদীয় ভক্তিসূত্র ও উপনিষদ্ সঙ্কলনের ওপর এদের নিয়ে ক্লাস করতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশাবলী-(Spiritual Teachings of Swami Brahmananda) নামক বইখানি ক্লাসের ধারা-নির্দেশক বলে ধরা যেতে পারে; বলা যেতে পারে যে, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর ক্লাসের আলোচনাগুলি স্বীয় গুরুর উপদেশাবলীরই বিস্তার।

এই স্বামীর প্রভাবে বহু জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল এবং কয়েকজন নর-নারী আধ্যাত্মিক সাফল্যও লাভ করেছিল বলে মনে হয়। যদিও গোড়ার দিকের ছাত্রেরা কেউই রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেনি, কিন্তু স্বামীজী আশা করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই কালে পৃথিবীর ঐ অংশে বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ আন্দোলনের ভাবধারা ছড়িয়ে দেবার মাধ্যম হয়ে উঠবে। এই কথা মনে রেখে তিনি তাদের একনিষ্ঠভাবে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাদের কঠোর সংযম অভ্যাস, অনাসক্তি, ত্যাগ, পারস্পরিক সম্পর্কের পবিত্রতা, মনোবল, ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মনিবেদন, প্রার্থনা, ধ্যান ও সর্বোপরি সকল নরনারীর মধ্যে ঈশ্বরদর্শন বিষয়ে বিশদভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল থেকে সদ্য আগত ও নিজ উচ্চ জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি দৈবক্রমে তাঁর শিক্ষাধীনে আগত আগ্রহী জ্ঞানপিপাসু ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ভাগবতী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ স্বামী ঐ ছাত্রদের প্রগাঢ় ধ্যানাভ্যাস করতে ও চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঐকান্তিক সাধনায় অনুপ্রাণিত করতেন। ছাত্ররা এই ভাব কতটা উদ্যম ও আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল তা বোঝা যায় কয়েকটি ছাত্রের তাঁর ক্লাসের কথাগুলির আনুপূর্বিক নথি রক্ষা করা দেখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ইউরোপে স্বামী যতীশ্বরানন্দের এই অভূতপূর্ব

কার্যক্রম আরম্ভ হতে হতেই থেমে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাঁর ত্যাগপ্রসূত এই সব মূল্যবান গচ্ছিত সম্পদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে এই অনুলিপিগুলির রূপ ধরে। পরে ১৯৩৮-৪০ খ্রীঃ বেদান্তকেশরীতে এর কিছু নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হয়; আর কিছু অংশ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন জিন হারবার্ট, সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঃ ডিসিপ্লিন মন্যাস্টিক কমেন্টারিজ দ্য স্বামী যতীশ্বরানন্দ (Swami Brahmananda ঃ Discipline monastique, Commentaries de Swami Yatiswarananda) নামে। বর্তমান গ্রন্থটির আকর হলো স্বামীজী ইউরোপে যেসব প্রবচন দিয়েছিলেন তার মূল অনুলিপিগুলি, যা নথি আকারে ব্যাঙ্গালোরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। লেখকের তিরোধানের বার বছরেরও বেশি কাল পরে গ্রন্থটি এখন প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪০ খ্রীঃ স্বামী যতীশ্বরানন্দ ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে এসে ফিলাডেলফিয়ায় নতুন বেদান্ত সেণ্টার খোলেন। ইউরোপের কাজের অভিজ্ঞতা ও আমেরিকান সভ্যতার সঙ্গে মেলামেশার ফলে তিনি বুঝেছিলেন অনেকে মনন-বহুল জীবনাদর্শের দিকে আকৃষ্ট হলেও অতি অল্প লোকই ঐ আদর্শকে রূপায়িত করার মতো আন্তরিক গুণাবলীর অধিকারী। ২৫০টিরও বেশি বিষয়বস্তুর ওপর তিনি ফিলাডেলফিয়ায় যা আলোচনা করেছিলেন, এবং যার নথি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের মহাফেজখানায় রাখা আছে—তা থেকে তাঁর শিক্ষণ ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তিনি সাধন পদ্ধতি কিছুটা সহজসাধ্য করে আচার-আচরণের কঠোরতা কমিয়ে এনেছিলেন। যুক্তি, তদানীন্তন জনপ্রিয় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বভিত্তিক আত্মবিশ্লেষণ, জীবনে সুসমঞ্জস দৃষ্টিভঙ্গির ভাব গ্রহণের মনোভাব, জাগতিক কাজকে আধ্যাত্মিক ভাবে মণ্ডিত করা, মানবে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের সেবাই—স্বামীর আমেরিকান ছাত্রদের আধ্যাত্মিক শিক্ষণের তালিকার শীর্ষে থাকত। উদাহরণচ্ছলে বা একটানা শোনার কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি কৌতুকপূর্ণ গল্প ও কাহিনীও তাঁর আলোচনায় সংযোজন করতেন। ফিলাডেলফিয়া ও ব্যাঙ্গালোরে দেওয়া আলোচনাগুলির কিছু কিছু সঙ্কলিত করে দি অ্যাডভেঞ্চার্স ইন রিলিজিয়াস লাইফ (The Adventures in Religious Life) গ্রন্থটি, স্বামী ভারতে ফেরার কয়েক বছর পরেই প্রকাশিত হয়।

বর্তমান গ্রন্থে ফিলাডেলফিয়ায় প্রদত্ত ভাষণগুলির কিছু কিছু নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ডের ক্লাসে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্তসার থেকে গৃহীত। যেমন আগেই বলা হয়েছে, এইসব প্রবচনে যে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা আছে, তার উদ্দেশ্যই ছিল অল্প-বয়সী ছেলেমেয়েদের একটি ছোট গোষ্ঠীকে আধ্যাত্মিক

জীবনে গভীরভাবে শিক্ষিত করে তোলা। অনেক নির্দেশই এমন দৃঢ়ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, কিছু পাঠকের কাছে তা অতি কঠোর ও দুরূহ সাধন বলে মনে হতে পারে। আমরা কিন্তু সেগুলিও প্রকাশ করছি, এই আশায় যে, আধ্যাত্মিক জীবনপথে যাঁরা কঠোর সাধনা করছেন তাঁরা এ থেকে প্রভূত উপকার পাবেন। এটি কোন দর্শনশাস্ত্র নয়, একজন প্রতিভাধর অধ্যাত্মজ্ঞানীর সারা জীবনের সাধনার অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র। পাঠক তার সাধারণ বুদ্ধি অবলম্বনে এর থেকে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই গ্রহণ করে অভ্যাস করতে পারে। স্বামী যতীশ্বরানন্দ একবার বলেছিলেন, 'কালের এক বিশেষ প্রভাব আছে. সাধককে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না ঈশ্বরের কৃপায় পথটি তার কাছে পরিষ্কার হয়।' যদি এই বইখানি কিছু আগ্রহীর অন্তরে অনুপ্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে অধ্যাত্মজীবনে সত্য পথটি অনুসরণে সহায়তা করে—তাহলেই বুঝব যে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে।

'অ্যাডভেঞ্চার্স ইন রিলিজিয়াস লাইফ' ('Adventures in Religious Life') বইখানির প্রকাশনার পর স্বামী যতীশ্বরানন্দ তাঁর কোন কোন শিষ্যের কাছে আধ্যাত্মিক সাধনার ওপর আর একখানি বই প্রকাশনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—যাতে ধ্যানপরায়ণ জীবন সম্বন্ধে খুঁটিনাটি ব্যক্তিমুখী নির্দেশ থাকবে। মনে হয় তিনি এ ধারণাও পোষণ করতেন যে. বইটির মধ্যে ভাইসব্যাডেন (Wiesbaden) ও সেন্ট মরিজ (St. Moritz)-এ ক্লাসের প্রবচনগুলি ও ইউরোপীয় ছাত্রগণকে লেখা কিছু চিঠির উদ্ধৃতিও থাকতে পারে। এখন এই সঙ্কলনে আমরা তাঁর বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক নির্দেশগুলি প্রায় সবই প্রকাশ করছি; আশা করি এতে তাঁর ইচ্ছা বহুলাংশে কার্যে রূপায়িত করা হবে। প্রায় এর অর্ধেকই নিয়মমাফিক প্রথম মুদ্রিত হচ্ছে। অন্য অর্ধেক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত হয়েছে।

মরণোত্তর প্রকাশন বলে এর বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ লেখক পছন্দ করতেন কি না বলা শক্ত। তবে তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুকে যেভাবে বিন্যাস করা পছন্দ করতেন আমরা সেই অনুযায়ীই—'আদর্শ', 'অনুশীলন' ও 'অভিজ্ঞতা'—এই তিন খণ্ডে বইখানিকে ভাগ করেছি। প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুকে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিজ জীবনকে কি করে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা শিখতেই হবে। যে উদ্দেশ্যসাধনে সে চেষ্টা করছে তার সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা তাকে প্রথমে করতেই হবে। আধ্যাত্মিক জীবন পথে অগ্রসর হবার আগেই তাকে তাত্ত্বিক দিক থেকে জেনে নিতে হবে জীবাত্মা, বিশ্বজগৎ ও ঈশ্বর কি এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধই বা কি। বইটির 'আদর্শ' নামক প্রথম পর্ব অনুসন্ধিৎসুকে একাজে সহায়তা করবে।

'অনুশীলন' নামক দ্বিতীয় পর্ব দুটি অংশে বিভক্ত। এর প্রথম অংশে—গভীর প্রার্থনা ও ধ্যানপ্রবণ জীবনের জন্য উপযুক্ত গুণাবলী ও প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা আছে। এই বিষয়টির উপর গ্রন্থকার বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তাই আমরা এ বিষয়টির জন্য যথেষ্ট বেশি স্থান দিয়েছি; আশা এই যে, ধ্যানপরায়ণ জীবনে কঠোর সংযম ও মানসিক পবিত্রতার প্রয়োজনকে খাটো করা বা বাতিল করার আধুনিক প্রবণতা এর দ্বারা সংশোধিত হবে। দ্বিতীয় অংশে—একজন উন্নতিকামী সাধককে তার প্রবণতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর অনুযায়ী যে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম কার্যত অভ্যাস করতে হবে—তাই বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় পর্বে—একজন অধ্যবসায়ী অন্বেষু যেসব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভে কৃতার্থ হতে পারে এবং তার ফলে যেসব সম্ভাব্য মানসিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি আলোচিত হয়েছে। উপসংহারে জগতের বিভিন্ন ধর্মের কিছু মহান সন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পর্বে—লেখকের কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত চিন্তাধারা সংযোজিত হয়েছে, যার বেশির ভাগ সুইজারল্যাণ্ডের সেন্ট মরিজ (St. Moritz)-এ নথিভুক্ত হয়েছিল।

গ্রন্থের সর্বত্রই লেখকের চিন্তাধারাকে আমরা মূল আকারে অপরিবর্তিত রাখতে চেষ্টা করেছি। ক্লাসের সহজ কথোপকথনের ভাবটিও বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু অধিক স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতার কথা ভেবে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত মূল প্রবন্ধগুলির ছত্র ও অনুচ্ছেদগুলির কিছু পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে—যাতে ভাবগুলির পারম্পর্য ও সুসংগতি আরও সুস্পষ্ট হয় ও সমগ্র গ্রন্থটির ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। এখন এই গ্রন্থে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত, এমনকি একই পরিচ্ছেদের ভেতরও, ধাপে ধাপে বিকাশের পথে ভাবের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। এই পুনর্বিন্যাসের ফলে একই ভাবের পুনরুল্লেখ বহুলাংশে কমেছে, অবশ্য এরকম গ্রন্থে কিছু পুনরুল্লেখ অনিবার্য এবং অপরিহার্যও বটে। মূল প্রবন্ধের ও অনুচ্ছেদগুলির শিরনামা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বজায় রাখা হয়েছে; তবে প্রয়োজনবোধে কিছু নতুন শিরনামাও সংযোজন করা হয়েছে। তৃতীয় পর্বে সন্তদের জীবনী-সম্বলিত দুটি পরিচ্ছেদ লেখকের ১৯৫৬-৫৮ খ্রীঃ ব্যাঙ্গালোরে প্রদত্ত ঐ বিষয়ে বক্তৃতাবলীর সংক্ষিপ্তসার।

বইখানি হিন্দুসাধনার দর্শনের ওপর একটি পদ্ধতিগত বর্ণনা নয়। এর নিজস্ব একটি সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো আছে। উপদেশ, নিষেধ ও নানা কার্যকরী সূত্রের পেছনে গাঁথা আছে কতকগুলি মূল তত্ত্ব, যা এই লেখক তাঁর বছরের পর বছর সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলে শাশ্বত সত্য বলে বুঝেছিলেন। এইরূপ পূর্বধারণার কয়েকটিকে সমগ্র গ্রন্থটির ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে তিনি সেগুলিকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ

করেছিলেন এবং প্রায়ই সেগুলিকে 'আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম' বলে অভিহিত করতেন। তাই নিচে সেগুলি দেওয়া হলো ঃ

১। আপাতদৃষ্টিতে যা আমরা সত্য বলে ধরে নিই, তা-ই আমাদের সমগ্র দৃষ্টি, চিন্তা, আবেগ ও কর্মকে প্রভাবিত করে। আমাদের পূর্ণসত্তাটিতেও এই সত্যের অনুবর্তন হয়।

২। সত্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা আমাদের আপন সত্তার ধারণার ওপর নির্ভর করে; অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের ধারণার ক্রমবিকাশ হয় তার আত্মচেতনার ক্রমোন্মেষের তালে তালে।

৩। আধ্যাত্মিক জাগরণ মানবের আত্মচেতনার রূপান্তর, অর্থাৎ চেতনার নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে অধিরোহণ।

৪। যদিও নৈতিক কর্তব্যবোধ থেকে স্পষ্টত স্বতন্ত্র, তবু আধ্যাত্মিক প্রেরণালাভে এর সহায়তা অবশ্যই প্রয়োজন। একাগ্রতা (ধ্যান) অভ্যাসের আগে ও পরে যদি মনের পবিত্রতা রক্ষা ও সহজাত প্রবৃত্তির উদ্গতি বিহিত না হয় তবে এই অভ্যাস সাধককে বিপথে নিয়ে যেতে পারে।

৫। প্রত্যেক সাধককে বুঝতে হবে তার অবস্থান কোথায়। সেখান থেকেই তাকে আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু জীবনের গোড়ায় তাকে যেসব রক্ষাকবচ ও সহায়তা দেওয়া হয়েছিল সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার পর তাকে তাদের ওপরে উঠতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে—মানবের বা কোন সঙ্ঘের চেয়ে ঈশ্বরের সহায়তার ওপরেই তাকে বেশি নির্ভরশীল হতে হবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির এই নিয়ম। এর অর্থ সাধক আধ্যাত্মিক পথে তখনই উত্তরোত্তর এগুতে পারে যদি সে প্রাথমিক স্তরে যেসব অবলম্বনের সহায়তা পেয়েছে সেগুলি পরিহার করতে প্রস্তুত থাকে।

৬। অপরোক্ষ শুদ্ধসত্ত্বের—গুণাতীত সত্যের—উপলব্ধি, অন্তর্নিহিত ঈশ্বরীয় তত্ত্বের উপলব্ধির মাধ্যমেই হয়। ইষ্ট-দেবতা ঈশ্বরীয় তত্ত্বেরই অভিব্যক্তি।

৭। আমাদের চেতনা যত বেশি বিস্তৃতি লাভ করবে, ততই আমরা সর্বজনের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করব আর ততই আমরা আধ্যাত্মিক হব।

'ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন' (Meditation and Spiritual Life) বইখানিই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজী গ্রন্থ। স্বামী যতীশ্বরানন্দ পনের বছর (১৯৫১-৬৬) এই আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। এর প্রকাশন সম্ভব হয়েছিল, প্রধানত তাঁর কয়েকটি অনুগত ছাত্র তাঁর প্রবচন ও ব্যক্তিগত

উপদেশাবলীর হুবহু অনুলিপি রেখেছিল বলে। পাঠকবৃন্দ স্বভাবতই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। দেশের ও বিদেশের বহু ভক্তের স্বতঃপ্রণোদিত আর্থিক সাহায্যেই বেশির ভাগ মুদ্রণ-ব্যয় নির্বাহ হয়েছে—তাঁদের প্রতিও আমরা ধন্যবাদ জানাই। অন্য অনেকে নানা সময়ে নানা রকমে পুস্তকটির প্রকাশনে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমাদের ধন্যবাদ।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি যে, বইখানির প্রকাশনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অগণিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসুর কাছে প্রেরণার, নির্দেশনার ও শান্তির অব্যর্থ আকরগ্রন্থ বলে প্রমাণিত হবে—অসৎ থেকে সতের দিকে, আঁধার থেকে আলোকের দিকে, মরণ থেকে অমৃতত্বের দিকে তাদের যাত্রাপথে।

দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৮৩ খ্রীঃ) 'গুরু ও অধ্যাত্ম পথপ্রদর্শক' (The Guru and Spiritual Guidance) নামে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে; এটি 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর মার্চ ১৯৮২ খ্রীঃ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল; শিষ্যদের কাছে লিখিত চিঠিপত্র থেকে সংগৃহীত আরও কিছু উপদেশও এতে স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় সংস্করণ (১৯৮৯ খ্রীঃ), দ্বিতীয় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। কেবল অক্ষরগুলি স্পষ্ট এবং আকারে বড়। দশ বছরেই তিনটি সংস্করণের প্রকাশনাই প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি যে কোন স্তরের অধ্যাত্মপিপাসুর পক্ষে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ-গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। স্বামী যতীশ্বরানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর বছরে এটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করছি।

# স্বামী যতীশ্বরানন্দ

স্বামী যতীশ্বরানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁর জন্ম হয়, অধুনা বাংলাদেশে পাবনা জেলায় নন্দনপুর গ্রামে মাতুলালয়ে, বুধবার ১৬ জানুয়ারি, ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর পিতা, ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। মাতার নাম বিধুমুখী দেবী। তাঁর সৌভাগ্য যে, তিনি এরূপ ভক্ত ব্রাহ্মণ পিতা ও সাধ্বী মাতার ধর্মপরায়ণ পরিবারে জন্মলাভ করেছিলেন।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল জলপাইগুড়ি ও বগুড়ায় এবং প্রবেশিকা (এণ্ট্রান্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন রংপুরের স্কুল থেকে। পরে রাজসাহী ও কোচবিহার কলেজে এবং কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়েন। শেষে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম হয়ে ও স্বর্ণপদক লাভ করে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে রসায়নশাস্ত্রে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত পাঠ করলেও তিনি কৃতকার্য হননি; পড়াশুনার প্রতি ঔদাসীন্য তার কারণ। এই সময়ে তিনি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গের সংস্পর্শে এসে বৈরাগ্যের প্রেরণায় পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর পিতামাতা চেয়েছিলেন—তিনি যেন গৃহস্থের জীবন যাপন করেন, কিন্তু তিনি ১৯১১ খ্রীঃ শেষের দিকে, তাঁর মাকে সহজভাবেই বলে দিলেন যে, তিনি ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিতে চলেছেন—এ উদ্দেশ্য বিফল হলে তিনি নিশ্চয়ই ফিরে এসে তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।

তাঁর পিতামাতা তাঁকে যে সামান্য অর্থ দিলেন তাতেই তিনি সোজা বেলুড় মঠে এসে সঙ্ঘে যোগ দিলেন, ১৯১১ খ্রীঃ ২২ বছর বয়সে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কৃপালাভ করেন এবং ১৯১৭ খ্রীঃ মাদ্রাজে তাঁরই কাছে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন।

১৯২১ খ্রীঃ ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে দু-বছর কাজ করেছিলেন। এর পর, তিনি এক বছরের জন্য বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৬ খ্রীঃ তিনি মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ পদে বৃত হয়ে ১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। ১৯২৮ খ্রীঃ তিনি বেলুড় মঠের অছি ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর সভ্য নির্বাচিত হন। একটি অনুরাগী ভক্তগোষ্ঠীর

আমন্ত্রণে তাঁকে রাইনল্যাণ্ডের (জার্মানীর) ভাইসব্যাডেন (Weisbaden) শহরে পাঠানো হয়; সেখানে তিনি ১৯৩৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে পৌছান। ১৯৩৫ খ্রীঃ শীত ঋতু থেকে ১৯৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁর কাজের পরিধি সুইজারল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। সেন্ট মরিজ (St. Moritz), জেনেভা (Geneva) ও অন্যান্য স্থানে তিনি আলোচনা চক্রের প্রবর্তন করেন। কয়েকমাস হল্যাণ্ডের হেগ (Hague) শহরে, প্যারিসে ও লণ্ডনেও তিনি কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় ১৯৪০ খ্রীঃ তিনি জার্মানি ছেড়ে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে যান। সেখানে ১৯৪২ খ্রীঃ ডিসেম্বরে ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) শহরে তিনি বেদান্তকেন্দ্র প্রবর্তন করেন ও সেখানকার অধ্যক্ষরূপে ১৯৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত থাকেন। ১৯৫০ খ্রীঃ তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপ হয়ে ভারতে ফেরেন। ১৯৫১ খ্রীঃ তিনি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ হন ও তাঁর মধ্যে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ দেখে বেলুড় মঠের অছিপরিষদ ১৯৫২ খ্রীঃ থেকে তাঁর ওপর আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিদের দীক্ষা দেবার অনুমতি দেন। ১৯৬২ খ্রীঃ তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

স্বামী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত, হৃদয়গ্রাহী বক্তা ও সুলেখক ছিলেন; 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স ইন রিলিজিয়াস লাইফ' (The Adventures in Religious Life), 'ইউনিভার্সাল প্রেয়ার্স' (Universal Prayers), 'ডিভাইন লাইফ' (Divine Life), 'ওয়ে টু দ্য ডিভাইন' (Way to the Divine) ও 'লেটার্স এণ্ড প্রেয়ার্স' (Letters and Prayers) বইগুলি তাঁরই রচনা। তাঁর মনোজয়ী ব্যবহার, মর্মগ্রাহী হৃদয়, উদার মনোভাব ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য তিনি দেশে বিদেশে বহু সুহৃদ, অনুরাগী ও শিষ্যের প্রশংসা ও ভক্তির পাত্র হয়েছিলেন; এঁদের জীবনকে তিনি বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিলেন। ১৯৬৫ খ্রীঃ মাঝামাঝি থেকে তিনি নানা শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। বায়ু পরিবর্তন ও চিকিৎসার জন্য তাঁকে বেলুড় মঠে আনা হয়। ১৯৬৬ খ্রীঃ ২৭ জানুয়ারিতে তিনি মহাসমাধিতে লীন হন।

দেহাবসানের কিছুদিন আগে থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর অন্তিম সময় আসন্ন। প্রায়ই শোনা যেত যে, তিনি বলছেন, "স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর কাছ থেকে সব শক্তি ফিরিয়ে নিয়েছেন। এ শরীরের আর কোন প্রয়োজন নেই, একে বর্জন করাই শ্রেয়।"

## স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে স্বামী যতীশ্বরানন্দের স্মৃতিচারণ

১৯০৬ খ্রীঃ কলকাতায় এফ. এ. পড়ার সময় আমি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারার সংস্পর্শে আসি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও স্বামীজীর রাজযোগ প্রায় এক সঙ্গেই আমার হাতে এসেছিল। এই বইগুলি ও এ ধরনের আরও অন্যান্য বই অনুধাবনে রত হয়ে আমি এক নতুন চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করলাম। এই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয়ে সাত্ত্বিক জীবনযাপন করতে লাগলাম, তবে সে সঙ্কল্প কাজে পরিণত হতে কিছু সময় লেগেছিল।

১৯০৭ খ্রীঃ এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে রাজসাহী গিয়ে সেখানে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হই। দু-বছর পরে ১৯০৯ খ্রীঃ গ্রীষ্মে কলকাতায় ফিরেছিলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন মাদ্রাজ থেকে ফিরে উড়িষ্যায় রয়েছেন। ১৯১০ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উৎসবে আমি তাঁকে প্রথম দর্শন করি। উৎসবের পর তিনি পুরী চলে যান। এই সময়ে আমি আমার বন্ধু সীতাপতির (পরে স্বামী রাঘবানন্দ) সঙ্গে বেলুড় মঠে গিয়ে সাধুদের দর্শন করি। তখন থেকে আমি শনি রবিবারে বেলুড় মঠে থাকতে শুরু করি। স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আমাকে তাঁদের প্রিয় করে নিয়েছিলেন। ১৯১০ খ্রীঃ শেষে, যখন শ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসবের পূর্বে এলেন, স্বামী শিবানন্দ তাঁর কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার মনে হলো শ্রীমহারাজের সঙ্গে আমার যেন একটা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হলো এবং তাঁর প্রতি আমি ভক্তি ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে গেলাম। অন্য সন্ন্যাসীদের প্রতি আমি তত হইনি। কলকাতায় ও বেলুড় মঠে আমি ঘন ঘন শ্রীমহারাজের দর্শনে যেতাম ও তাঁর সেবা করার সুযোগ একটু একটু পেতাম। একদিন বিনোদবাবুর বাড়িতে কোন উৎসবে অনেক সাধু ও ভক্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি মহারাজকে একখানি বড় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, "দেখ, দেহ-মন জাগতিক উদ্দেশ্যে নিয়োগ করলে, জগৎ সবই ধ্বংস করে ফেলে; কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলে দেহ-মন সুস্থ থাকে।" সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, শ্রীমহারাজ এই আদর্শকে আমার সামনে আরও উজ্জ্বল করে তুলে ধরলেন। একদিন আমি ও আমার এক বন্ধু শ্রীমহারাজের দর্শনের আশায় বেলুড় মঠে গিয়ে শুনলাম যে,

তিনি স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে বলরাম মন্দিরে (কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে) গেছেন। আমরাও তাই বলরাম মন্দিরে গেলাম। শ্রীমহারাজ আমার বন্ধুকে তার হাতটি দেখাতে বললেন। তা দেখে তিনি বললেন, "ভোগ-বাসনা তার কিছু বাধা সৃষ্টি করবে তবে শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় তা দূর হবে।" স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে ভালবাসতেন। তিনি শ্রীমহারাজকে আমার হাতটিও দেখবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। এতে আমি অন্তরে ব্যথিত হলাম ও ভাবলাম যে, আমার বন্ধুর হয়তো সন্ন্যাস-জীবনের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমার তাও নেই।

এর কয়েকদিন পরে, আমি যেই বেলুড় মঠে ঢুকছি—শ্রীমহারাজের সেবক আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "ভালকথা শ্রীমহারাজ আমাদের বলছিলেন যে, তুমি সাধু হবে।" এতে আমি মনে যথেষ্ট বল পেলাম এবং ক্রমে সাধু হলাম। আমার বন্ধুটিকে কিন্তু সংসার-জীবনে প্রবেশ করতে হয়েছিল। সে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েছিল কিন্তু অন্যদিকে সে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক মহান ভক্ত ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যও হয়েছিল।

একদিন শ্রীমহারাজ একটি বড় দল নিয়ে দুটি নৌকা করে দক্ষিণেশ্বর গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। তিনি আশ্চর্যভাবে মগ্ন ছিলেন। তিনি বললেন, "একটা কুকুর হয়েও দক্ষিণেশ্বরে থাকাটা সৌভাগ্যের জানবে।"

যখন আমরা শ্রীমহারাজের কাছে বসতাম, আমাদের বোধ হতো যেন তাঁকে কেন্দ্র করে একটি ভাবচক্র রয়েছে আর আমরা তার মধ্যে এসেছি। একদিন তিনি এক নতুন ভাবে নিজেকে আমার কাছে প্রকাশ করলেন। তিনি যখন মঠের মাটিতে পায়চারি করছিলেন, আমার বোধ হলো তিনি যেন একজন অতিমানব বা দেবমানব।

শ্রীমহারাজ আমাকে ১৯১১ খ্রীঃ দীক্ষাদানে কৃপা করেছিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি পুরীধামে গেলে আমার সাধু হবার বাসনা জানিয়ে তাঁকে লিখলাম। তিনি স্বামী শঙ্করানন্দকে লিখে দিতে বললেন, আমার যদি যথেষ্ট মনোবল থাকে তবে আমি কেন সেখানে চলে যাচ্ছি না। তাই আমি সেই বছরেই অক্টোবর মাসে পুরীতে শ্রীমহারাজের কাছে চলে গেলাম ও ঐ পবিত্র সম্প্রদায়ে যোগ দিলাম। এই সময়ে শ্রীমহারাজ আমাকে দিয়ে অটলবাবুর বাড়িতে দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা করিয়েছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ তন্ত্রধারক ও স্বামী অম্বিকানন্দ সহায়ক ছিলেন। কুমারী-পূজাও (কুমারী মেয়েকে ঈশ্বরীজ্ঞানে পূজা) করা হয়েছিল। এইভাবে সন্ন্যাসের পরেই তিনি আমার জীবনে এক গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চারে সাহায্য করেছিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীমহারাজ আমাকে স্বামী শর্বানন্দের সঙ্গে মাদ্রাজে যেতে বললেন। যাবার

আগে তাঁর কাছে কিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ চাইলাম। খুব শান্তভাবে ও গভীর অনুকম্পার সঙ্গে তিনি বললেন, 'সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম।' এইটিই আমার জীবনের মূলমন্ত্র হয়েছিল—এই কথাগুলি যেন এখনো আমার কানে বাজছে বোধ হয়।

পুরীতে থাকাকালীন কয়েকটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদিন অটলবাবু স্বামী শর্বানন্দকে বললেন, "তোমরা কি রকম সন্ন্যাসী! তোমাদের কোন সিদ্ধাই নেই।" একথা শুনে শ্রীমহারাজ বললেন, "সিদ্ধাই লাভ তো সহজ, মনের পবিত্রতা অর্জন করা কঠিন। মনের পবিত্রতাই আসল জিনিস।" অন্য একদিন শ্রীমহারাজ অসুস্থ—তাঁর কোমরে ব্যথা। সেদিন পুরীর মন্দিরে বিশেষ উৎসব ছিল। শ্রীমহারাজের সেবক একাই তাঁর সেবা করতে পারবে—একথা ভেবে আমরা প্রায় সবাই মন্দিরে গেলাম। সেখানে অনেকক্ষণ কাটিয়ে আমরা সন্ধ্যার পর ফিরলাম। শ্রীমহারাজ আমাদের স্বার্থপরতার জন্য বেশ তীক্ষ্ণভাবে তিরস্কার করে শেষে বললেন, "আমি তোমাদের কাছে কিছুই আশা করি না। আমি কেবল তোমাদের মঙ্গল কামনা করি, আর তোমাদের যা বলি তা তোমাদের কল্যাণের জন্যই বলে থাকি।" এরপর শ্রীমহারাজের রাত্রিকালীন সেবার ভার আমি নিজেই নিলাম। এক রাত্রে তিনি খুব গরম বোধ করছিলেন, আমাকে জানালাগুলি খুলে দিতে বললেন। তাঁর ব্যক্তিগত সেবায় আমি তখন নতুন, বোধশক্তিও তেমন হয়নি। তাই ভাবতে পারিনি যে, জানালাগুলি একটু পরে বন্ধ করা দরকার ছিল। পরদিন শ্রীমহারাজের জ্বরভাব হলো। আমি অন্তরে খুবই দুঃখ বোধ করলাম। কিন্তু শ্রীমহারাজ নিজে তো আমাকে কোন তিরস্কার করলেনই না বরং অন্যদের বললেন যে, আমি বালক মাত্র সব জিনিস ভালভাবে জানি না। তাই অন্য কেউ এবিষয়ে আমাকে কিছু বলেননি, কিন্তু আমি উচিত শিক্ষা পেলাম।

১৯১১ খ্রীঃ শেষে আমি মাদ্রাজ গেলাম ও সেখানে ৫ বৎসর রইলাম। সেখানে শ্রীমহারাজকে আমি আবার ১৯১৬ খ্রীঃ দেখি। মাদ্রাজ মঠের ম্যানেজার পদে আমাকে খুবই খাটতে হয়েছিল। ম্যানেজারের আসনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাজ করতে দেখে তিনি একদিন বললেন, "আমি কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছি কেরানির কাজ করবার জন্য?" তিনি আমাকে খুবই তিরস্কার করলেন, স্বামী শর্বানন্দকেও বকাবকি করে বললেন, "ছেলেটিকে একটুও পড়াশুনা প্রভৃতি কাজের জন্য ফুরসৎ না দিয়ে শুধুই কেরানির কাজ করাচ্ছ।"

স্বামী হরিহরানন্দ ছিলেন শ্রীমহারাজের ব্যক্তিগত সেবক। তিনি আমাকে শ্রীমহারাজের জন্য ভাল জিঞ্জিলি তেল বাজার থেকে আনতে বলতেন, আর আমি

খোঁজ খবর নিয়ে সব থেকে ভাল তেল যা পাওয়া যায় তাই আনতাম। এই কাজের ইঙ্গিত করে শ্রীমহারাজ একদিন বললেন, "আমি কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছিলাম, ভাল জিঞ্জিলি তেল কোথায় পাওয়া যায় তা খোঁজ খবর করে বার করবার জন্য?" সব তিরস্কারগুলিকে তাঁর ভালবাসা ও কৃপার অভিব্যক্তি বলে ধরে নিয়ে, আর তিনি আমার আর আমি তাঁর এই ভাব অন্তরের অন্তস্তলে পোষণ করে, আমি এ সবেতে বড়ই আনন্দ বোধ করতাম।

এই সময়েই শ্রীমহারাজ আমাকে অধ্যয়ন ও ধ্যানের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিতে আদেশ দিলেন, আর প্রত্যহ 'বিষ্ণু সহস্রনাম' আবৃত্তি করতে বললেন। তাঁর কৃপায় মন খুব ভাল অবস্থায় থাকত। আর অন্তর তাঁর সঙ্গে একরকম একাত্ম বোধের অনুভূতিতে মহা উল্লাসে ভরে থাকত।

শ্রীমহারাজ অশেষ কৃপা করে তাঁর দলের অনুগামীদের সঙ্গে আমাকেও কন্যাকুমারী নিয়ে গেছলেন। আমি পূর্বে কখনো সঙ্কল্প করে 'চণ্ডী' (দুর্গা-সপ্তশতী) পাঠ করিনি। আমি চণ্ডীতে বর্ণিত যুদ্ধ ও সংহারলীলা পছন্দ করতাম না। আমি কেবল স্তুতিগুলির আবৃত্তি করতাম। এসব কথা জানতে পেরে শ্রীমহারাজ তিরস্কার করে আমাকে পক্ষকাল অন্তর একবার সঙ্কল্প করে সমস্ত 'চণ্ডী' আবৃত্তি করতে বললেন। তিনি আমাকে তিন বছর 'বিষ্ণু সহস্রনাম' ও 'চণ্ডী' আবৃত্তি করতে বললেন। আমি আরও বেশিদিন তাঁর আদেশ পালন করেছিলাম।

পাছে গর্বিত হয়ে পড়ি, তাই আমি প্রবন্ধ লিখতাম না বা বক্তৃতা দিতাম না এবং ধর্মালোচনাদি থেকেও সরে থাকতাম। একদিন ত্রিবাঙ্কুরের হরিপাদ আশ্রমে শ্রীমহারাজ আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, "আমাদের কাছে তুমি যা শুনছ ও শিখছ তা অন্যদের বল।" আবার, মাদ্রাজে একদিন তিনি বললেন, "অধ্যয়নের অভ্যাস এমন করতে হবে যে, একদিন তা বাদ গেলে তুমি অসুস্থ বোধ করবে। যদি মন উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে না থাকে তবে তা অন্তত অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকবে—নিচুতে নামবে না।" অন্য সময়ে তিনি বললেন, "সপ্তাহে একটি করে প্রবন্ধ লেখ না কেন?" আমি বললাম, "আমি কি লিখব? কোন ভাবই আসে না।" তিনি বললেন, "গভীরভাবে চিন্তা করতে শেখ, দেখবে ভাবের স্রোতকে বশে রাখাই শক্ত হয়ে পড়ছে।" পরবর্তী কালে গুরুর কৃপায় আমার কখনো ভাবের অভাব হয়নি। যখন ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে আমরা ছিলাম, তখন একদিন সকালে তিনি আমাকে শারীরিক ব্যায়াম দেখিয়ে সেগুলি প্রত্যহ অভ্যাস করতে বললেন। আমি ঘরের মধ্যে কতকগুলি ব্যায়াম করতাম, তার সঙ্গে এগুলিও করতে লাগলাম। তিনি অনেকবার বলেছেন, "শারীরিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকে সঙ্গে সঙ্গে চলতে

হবে।" মাদ্রাজে ফিরে শ্রীমহারাজ নিজেই কয়েকবার আমার সন্ন্যাসের কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অপরাপর সন্ন্যাসীরা বরং আগেই তাঁর কাছে গিয়ে 'সন্ন্যাস' প্রার্থনা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি মূর্খের মতো তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "মহারাজ আমাকে যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবে কৃপা করে আমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করুন।" তাতে তিনি সস্নেহে বললেন, "কাউকেই সন্ন্যাসের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা যায় না, কিন্তু আমি তোমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করব।"

আমার সন্ন্যাস-দীক্ষার দিন, আমি অনুভব করলাম শ্রীমহারাজ যেন অলৌকিক আধ্যাত্মিক ভাবাবেগে শিহরিত হচ্ছেন। 'হোমা'নুপানাদির পর যখন আমি তাঁকে প্রণাম করছি, তিনি তাঁর হাতখানি আমার মাথায় রাখলেন আর আমি তখনই এক বিরাট সত্তার অনুভূতি লাভ করলাম—যেন তিনি, এই জগৎ আর আমি নিজে এক অসীম অনন্ত সত্তার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছি। তিনি কৃপাপরবশ হয়ে 'গুরুর' প্রকৃত রূপ কি তার ধারণা করিয়ে দিলেন। তখন আমি—"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" স্তোত্রটির মধ্যে নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার পর আমরা অনেকে শ্রীমহারাজকে ঘিরে বসেছিলাম। স্বামী শর্বানন্দও সেখানে ছিলেন। শ্রীমহারাজের মন খুব উঁচু আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা ছিল। আমি ভেবেছিলাম তিনি হয়তো আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও ধ্যানাদির বিষয় কিছু বলবেন, কিন্তু তা না করে, আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কি আধ্যাত্মিক অনুশীলন তুমি করবে। দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভগবানের পুণ্য নাম শোনাও। সেইটাই এক মহতী-সাধনা।" স্বামী শর্বানন্দকে ডেকে বললেন, "শর্বানন্দ, আজকাল আমি শ্রীরামানুজাচার্যের—প্রত্যেককে ঈশ্বরের নাম শ্রবণে সাহায্য করার ভাবটির—মর্ম খুব বেশি করে উপলব্ধি করছি।" সেদিন শ্রীমহারাজ আমার মধ্যে এক নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে দিলেন ও আমার চিন্তাধারাকে এক নতুন প্রণালীতে চালিত করলেন। সেই প্রণালী এখনো রয়েছে। মাদ্রাজে পাওয়া এই নতুন অনুপ্রেরণার দরুন আমি অধ্যয়ন ও ধ্যানাদির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে থাকলাম এবং অধ্যাপনা করতে ও সভায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলাম। পরে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবন্ধ লেখাও শুরু করলাম।

মাদ্রাজ মঠের নতুন বাড়ি তৈরির মধ্যেও শ্রীমহারাজের ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ পাওয়া যায়। পুরাতন মঠবাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আশ্রম একটি ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। স্বামী শর্বানন্দ ও আমরা স্থির করে উঠতে পারছিলাম না যে, কি করে মঠের জন্য নতুন বাড়ি তৈরি হবে। অবশ্য জমি আগেই কেনা ছিল। মাদ্রাজে এসে শ্রীমহারাজ বললেন যে, তিনি নতুন বাড়ির ভিত্তি স্থাপন করবেন, আর স্বামী

শর্বানন্দকে ধার করে হলেও অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হতে বললেন। যা হোক অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য এসে পড়ল এবং আট মাসের মধ্যে সামনের সভাগৃহটি বাদে পুরো বাড়িটি ব্যবহারোপযোগী করে গড়ে তোলা হলো। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে, আমাদের সন্ন্যাস-দীক্ষার কিছু পরেই শ্রীমহারাজ আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন বাড়ির দ্বারোদ্ঘাটন করলেন।

সেইদিন—নতুন মঠের উৎসর্গ-পর্বে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্ধ্য আরতি করছিলাম, আর শ্রীমহারাজ আমার একটু পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। আরতি করার সময় আমার অনুভূতি হলো যেন সব কিছুই এক বিরাট সত্তায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আরতি করতে করতে দেখলাম সব ছবিতে, শ্রীমহারাজের মধ্যে, উপস্থিত সকলের ভিতরেও সেই বিরাট সত্তার উপস্থিতি ! এখনো যখন আরতি করি সেই ভাব আমার মধ্যে আসে। এটি শ্রীমহারাজের বিশেষ আশীর্বাদ। সেইদিন সন্ধ্যায় ভাড়াবাড়ির ছাদে আমরা শ্রীমহারাজের সামনে বসেছিলাম। শ্রীমহারাজ বললেন, "আমি কাতরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলাম ঃ 'এরা বালকমাত্র। এরা কি করে নতুন বাড়ি করবে? আপনি দয়া করে সবকিছু সম্ভব করে দিন।' তাই দেখছ, তাঁর কৃপায় নতুন বাড়িটি গড়ে উঠল।"

মাদ্রাজে আমি নানা কাজে ব্যস্ত থাকতাম, পড়াশুনা বা ধ্যানাভ্যাসের জন্য অতি অল্প সময়ই পেতাম। শ্রীমহারাজ মাদ্রাজে আসার কিছু পরেই বুঝলেন যে, আমার স্থানান্তর প্রয়োজন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—আমি যেন মাদ্রাজ ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর যাই। কিন্তু আমার ব্যাঙ্গালোরে যাবার কোন ইচ্ছা ছিল না; তবে তিনি বুঝেছিলেন এতেই আমার ভাল হবে। তাই একদিন বললেন, "বোকা! তোমার ভাল তুমি বোঝ না! আর তোমার মাদ্রাজে থাকার কোন প্রয়োজন নেই—ব্যাঙ্গালোরে চলে যাও।"

ইতঃপূর্বে স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীমহারাজকে অনুরোধ করেছিলেন—আমাকে ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দিতে। আমি শুনেছিলাম শ্রীমহারাজও এতে মোটামুটি রাজি ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীঃ গরমের গোড়ায় শ্রীমহারাজ পুরী চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে আমিও শ্রীমহারাজের ইচ্ছানুসারে ব্যাঙ্গালোরে রওনা হলাম। সেখানে আমি আধ্যাত্মিক অভ্যাস ও শাস্ত্রানুশীলনে অনেক সময় দিতে পারতাম। ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে আমি রবিবারের ক্লাসও পরিচালনা করতাম। সেই বছর গ্রীষ্মের শেষে আমি আন্ত্রিক জ্বরে ভুগি ও সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা অনুভব করতে থাকি। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীও চলছিল। একদিন সকালে একটি বৃদ্ধকে ভর্তি করে আমার পাশের খাটে শোয়ানো হয়। সে ডবল

নিউমোনিয়ায় ভুগছিল এবং তার অবস্থাও ছিল সঙ্কটাপন্ন। সন্ধ্যার মধ্যেই তার সব শেষ হয়ে গেল।

আমি খুবই যন্ত্রণাবোধ করছিলাম। কিন্তু তখন আমার মন অত্যন্ত পরিষ্কার। কোন মৃত্যুভয় ছিল না। কিন্তু এটা আমার বোধ হচ্ছিল যে, রোগযন্ত্রণা আরও বেশি হলে সহ্য করা কঠিন হবে। তার থেকে মৃত্যুই কাম্য। যখন মনে এই ভাব এল, আমি শ্রীমহারাজের ভাবমূর্তির দর্শন পেলাম। তিনি বললেন, "তুমি কি করে মরবে? তোমাকে এখনও শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কাজ করতে হবে!" এই কথা বলে তিনি অন্তর্ধান হলেন। আমার মন নতুন প্রেরণায় ভরে উঠল। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। আমার মৃত্যুভয়ের কোন প্রশ্নই ছিল না, বরং আশ্চর্য শান্তি ও আত্মসমর্পণের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল! আমার রোগও ভালর দিকে মোড় ফিরল।

এক বছরের ওপর ব্যাঙ্গালোরে থেকে ও আর এক বছর মাদ্রাজ প্রদেশের নানা স্থানে তপস্যায় কাটিয়ে আমি ১৯১৯ খ্রীঃ ডিসেম্বরের শেষে শ্রীমহারাজের দর্শন লাভের জন্য ভুবনেশ্বরে গেলাম। সেখানে তাঁর পুণ্য সান্নিধ্যে কয়েকদিন কাটাবার দুর্লভ সুযোগ পেলাম। সে সময়ে ভুবনেশ্বর মঠ তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবারেই একদিন সন্ধ্যার সময় পুরীর শ্রীঅটল মৈত্র সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধ মানুষটি শোকাভিভূত হয়ে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়েছিলেন। শ্রীমহারাজ স্বামী বরদানন্দকে সেই গানটি গাইতে বললেন, যার শুরুতে ছিল ঃ

*রে মন, শরণ নে না ঈশ্বরী মায়ের সেই অভয় পদে*

গান শুনে, তার থেকে বেশি শ্রীমহারাজের দর্শনলাভে ও তাঁর কথা শুনে, বৃদ্ধ মানুষটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ও সে আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। এই পরিবর্তনে আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছিলাম।

ভুবনেশ্বরে কয়েকদিন থাকার পর শ্রীমহারাজ অসুস্থ স্বামী গোকুলানন্দের সঙ্গে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতা থেকে আমি বেলুড় মঠে গেলাম, সেখানে কয়েকমাস ছিলাম। এই সময়ে ১৯২০ খ্রীঃ স্বামীজীর জন্মজয়ন্তীর পূর্বে শ্রীমহারাজ বেলুড়ে এলেন। তখন আমরা সবাই তাঁর ঘরে যেতাম ও বসে ধ্যান করতাম এবং নানা স্তোত্র আবৃত্তি করতাম।

আমি শ্রীমহারাজকে শেষ 'দর্শন' করি ১৯২১ খ্রীঃ বারাণসীতে, স্বামীজীর জন্মোৎসবের কয়েকদিন পূর্বে। তখন আমি স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে থাকতাম। শ্রীমহারাজ বারাণসী সেবাশ্রমে এবং অদ্বৈত আশ্রমে এক নতুন আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহ নিয়ে এলেন। সে সময়ে আমাকেও তিনি প্রভূত আধ্যাত্মিক প্রেরণা

দিয়েছিলেন। একদিন তিনি আমার আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদির বিষয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, "আমার মনে হয় যেন আমার কোন অন্তর্জাগরণ হয়নি। সেজন্য মনে শান্তি পাই না। আমরা কিছু সংস্কার নিয়ে জন্মেছি সেইগুলিই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।" উত্তরে মহারাজ বললেন, "ওভাবে চিন্তা করো না। গভীর রাত্রে জপ অভ্যাস কর। পুরশ্চরণ (নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ) কর। অন্তর্জাগরণ আপনা হতেই ঘটবে।"

আর একদিন, মনের অস্থিরতার জন্য আমি তাঁর কাছে গেছি। আমাকে আসতে দেখেই, তিনি উঠে পড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন ও অল্প সময়ে বহু উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, "তোমাকে যা করতে বলি তা তুমি করতে চাও না বলেই তোমার মন অস্থির হয়।" তাঁর হাত আমার মাথায় রেখে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে আমার হৃদয় শান্তিতে ভরিয়ে দিলেন।

শ্রীমহারাজের ইচ্ছা ছিল যে, আমি মায়াবতী গিয়ে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ভার নিই। কিন্তু তিনি নিজে কিছু বলেননি। স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী মাধবানন্দই বার বার আমায় মায়াবতী যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আমি এতে রাজি ছিলাম না।

একদিন সকালে, আমি যখন স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত, আমার মনে হলো আমার মধ্যে কি যেন ভেঙে পড়ছে, আর মনের অতল গভীরতা থেকে যেন বিলাপ উথলে উঠছে। চোখ দিয়ে জলও পড়তে লাগল। যতই মুছে ফেলি, ততই চোখের জল পড়তে থাকে। এর সঙ্গে আমি লক্ষ্য করলাম, একটা আত্মসমর্পণের ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আমি বুঝলাম এটি শ্রীমহারাজেরই খেলা। তিনি কৃপা করে আমার একগুঁয়েমি ও মনের বাধা দূর করে দিলেন। সন্ধ্যায় আমার মনে স্থিরতা এল।

এরপর একদিন সকালে আমি যখন তাঁকে প্রণাম করতে গেছি, তিনি বললেন, "দেখ, ওরা সবাই চায় যে, তুমি মায়াবতী গিয়ে 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর ভার নাও।" তিনি আমার অনমনীয় ভাব আগেই ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাই আমি বিনা দ্বিধায় বললাম, "মহারাজ, আপনি আদেশ করলে আমি নিশ্চয়ই যাব।" শ্রীমহারাজ আমার জবাবে অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। এরপর ঠিক হলো যে, আমি মায়াবতী যাব। একদিন সকালে, তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, আমি, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ ও অন্য সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁর কাছে বসলাম। শ্রীমহারাজ আগেই আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদি কেমন চলছে?" উত্তরে আমি বললাম, "অনেক কাজ করতে হয়, যথেষ্ট সময় পাই না।" এতে তিনি

বললেন, "সময় নেই মনে করা ভুল। মনের অস্থিরতার জন্যই এরকম মনে হয়।" এতেই তাঁর কথার বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেল। খুব ভাবের সঙ্গে তিনি বলে চললেন, "কাজ আর উপাসনা পাশাপাশি চালিয়েই মনকে তৈরি করতে হয়।" এই উপদেশগুলি 'দি ইটার্নাল কম্প্যানিয়ন' (The Eternal Companion) গ্রন্থের 'ওয়ার্ক এণ্ড ওয়ার্শিপ' (Work and Worship) পরিচ্ছেদে আছে। এগুলি বিশেষ ভাবে আমাকে উদ্দেশ করেই বলা হয়েছিল। সেদিন তিনি আমার, স্বামী মাধবানন্দের ও অন্যান্য সন্ন্যাসী ভাইদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে দিলেন। তিনি বললেন, "মাধবানন্দ আমার যেমন প্রিয়, তেমনি তুমি ও অন্যেরাও।" যখন আমি মনে করি সকলে মহারাজের প্রিয়, তখন এও ভাবি যে, সকলে আমারও প্রিয়। শ্রীমহারাজের কাছে নিজ শিষ্যরা আর শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্যরা সমভাবে প্রিয় ছিল। তিনি বলতেন সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কাজ করতে এসেছে। একদিন আমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বললেন, "তাঁদের কাজ এইভাবে করলে, বন্ধন কখনই আসতে পারে না এবং এর মাধ্যমে—আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও শারীরিক সবরকমের উন্নতি হয়। তাঁদের চরণে নিজেকে সমর্পণ কর, তোমার শরীর মন তাঁদের কাছে নিবেদন কর; তাঁদের দাস হয়ে থাক।" এইটি এবং শ্রীমহারাজের অন্যান্য উপদেশগুলি আমার জীবনের অবলম্বন হয়ে আছে।

আমার ইচ্ছা ছিল একদিন শ্রীমহারাজের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলি। তাঁর বিরুদ্ধে একটু ক্ষুণ্ণ মনোভাব পোষণ করছিলাম। যখন তিনি মাদ্রাজে যান, তখন তিনি ফেরার সময় আমাকে বাংলায় নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু তার পরিবর্তে আমাকে ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে দিলেন। আবার ১৯১৯ খ্রীঃ শেষে যখন ভুবনেশ্বরে গেলাম তিনি আমাকে বেশিদিন তাঁর কাছে থাকতে না দিয়ে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। এইসব কারণে হৃদয় অভিযোগে পূর্ণ ছিল, আর অন্তরে অশান্তি ভোগ করছিলাম। মনের কথা প্রকাশ করবার সুযোগ খুঁজছিলাম, তা একদিন পাওয়া গেল। ১৯২১ খ্রীঃ শ্রীমহারাজের পুণ্য জন্মতিথির দিন ৺কালীপূজা হয়। আমি মনে মনে ঠিক করলাম—পরের দিন সন্ধ্যায় যখন অন্যেরা প্রতিমা বিসর্জন দিতে গঙ্গার ধারে যাবে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আমি তাঁকে এ বিষয়ে অবশ্য আগে থেকে কিছু বলিনি। সেদিন সন্ধ্যায় আমি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাঁর কাছে বসে আছেন। পেতাপুরীও সেখানে ছিলেন। শ্রীমহারাজ আমাকে দেখতে পেয়েই, শিশুর মতো চেঁচিয়ে পেতাপুরীকে বললেন, "দেখ আমি কেমন 'যোগী'!" আমি পরে জেনেছিলাম—একটু আগেই তিনি পেতাপুরীকে—আমি আসছি কিনা দেখতে বলেছিলেন; তিনি জানতেন যে, আমি আসব।

সেদিন আমাদের অনেক কথা হলো। শ্রীমহারাজ বললেন যে, যখন আমি ভুবনেশ্বর গেছিলাম তখন আমার নানা স্থান ঘুরে দেখবার বাসনা ছিল তা তিনি জানতেন, তাই তখন বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি এও জানতেন যে শীঘ্রই আমার মনের এই প্রবণতা চলে যাবে। এটি যাতে আরও শীঘ্র যায় তাই তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যখন জানলাম যে, আমার জন্য তিনি যা করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁর ভাবনা কত গভীর তখন আমি লজ্জিত হলাম। তিনি আমার সব মন-মরা ভাব দূর করে মনটিকে পরিচ্ছন্ন করে দিলেন। ফলে তাঁর ও আমার মধ্যে এক নতুন আন্তরিক বন্ধন সৃষ্ট হলো। আমার মনে তাঁর ঈশ্বরীয় মূর্তি দৃঢ়ভাবে এঁকে রেখে শ্রীমহারাজ শীঘ্রই বেলুড় চলে গেলেন। মাদ্রাজ ও বারাণসীতে যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ধীরে ধীরে আমার মনে সঞ্চার করেছিলেন এবং পবিত্রতা ও সেবার যে পথ তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন, তা এখনো আমার মধ্যে প্রেরণা যোগাচ্ছে। তাঁর কৃপায় এখনো তিনি সূক্ষ্মভাবে আমাকে নতুন আলো দেখাচ্ছেন ও আমায় নতুন প্রেরণা দিয়ে চলেছেন। যত দিন যাচ্ছে, ঈশ্বরই গুরুরূপে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করছি।

# সূচীপত্র

## প্রথম পর্ব
## আধ্যাত্মিক আদর্শ


**প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আধ্যাত্মিক অন্বেষা** ৩—১৭

আধ্যাত্মিক রূপান্তর—অধ্যাত্ম-পিপাসা ঈশ্বরের দুর্লভ আশীর্বাদ—জগতে চিরস্থায়ী সুখ হয় না—শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সাধনা—সত্যের পরীক্ষা—সত্যের শক্তি—ঈশ্বরের অদর্শনে অতৃপ্তি—সাধু-সন্তদের আদর্শ—অল্প বয়সে শুরু করা উচিত

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জ্ঞানাতীত ভাবোপলব্ধির আদর্শ** ১৮—৩৪

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কেন আমাদের প্রয়োজন?—অনুভূতি—অপরোক্ষ ও পরোক্ষ—পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট নয়—জ্ঞানাতীত অনুভূতির স্তর—অবিদ্যা ও তার পরাজয়—মরমিয়া সাধকদের পথ—কর্ম-যোগ—রাজ-যোগ—ভক্তি-যোগ—জ্ঞান-যোগ—যোগের লক্ষ্য

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ জীবাত্মা ও তার নিয়তি** ৩৫—৫২

সকল সমস্যার অন্তর্নিহিত মূল সমস্যা—জীববিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা—অমরত্ব সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা—ভারতীয় চিন্তায় কর্মবাদ—পাশ্চাত্য ভাবনায় জীবাত্মার পূর্ব-অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম—মহান আচার্যগণ পূর্বজন্মের কথা জানতেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন থেকে নজির—আমরা অমর কিন্তু আমরা তা জানি না

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা** ৫৩—৬৭

পরব্রহ্মের অন্বেষণ—আধ্যাত্মিক জীবনে ব্যক্তি বা সাকার ঈশ্বরের স্থান—প্রাচীন ভারতে ঈশ্বরীয় ধারণার পরিবর্তন—ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার ভাব—বিভিন্ন দেবতা থেকে ঈশ্বরে—মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা—হিন্দুদের অবতারবাদ—ধর্মীয় সহনশীলতা ও সমন্বয়ের আবেদন

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ সাংসারিক কর্তব্য ও অধ্যাত্ম-জীবন** ৬৮—৮৪

কর্তব্য কি?—কর্তব্য ও স্বার্থবোধ—অহংত্বের নানা রূপ—হিন্দুধর্মে কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা—বর্ণাশ্রম ধর্ম—গৃহস্থের কর্তব্য—নিজের প্রতি মানবের কর্তব্য—কর্তব্য ও আসক্তি—কর্তব্যের দ্বন্দ্ব—কর্মের মহৎ উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন—অধ্যাত্মজীবনে অন্যের সহায়ক হওয়া

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক আদর্শের শর্ত** ৮৫—১০০

আদর্শে বিশ্বাস—ধর্মের মূল বিষয়গুলিকে আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে পৃথক করা—আত্মপ্রচেষ্টা—সংসারকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা—ঈশ্বর ও তাঁর কৃপা সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি—নিজেদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

## দ্বিতীয় পর্ব
## আধ্যাত্মিক অনুশীলন
### (ক) প্রস্তুতি

**সপ্তম পরিচ্ছেদ : ক্ষুরধারের ওপর চলা** ১০১—১১৮

উপনিষদের শিক্ষা—ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা—ভেতরের 'স্ফিঙ্কস্'—বিশ্বকেন্দ্রিক হতে চেষ্টা কর—নৈতিক যোগ্যতার একটি ন্যূনতম মান প্রয়োজন—বহিঃসৌন্দর্য নয়, অন্তঃসৌন্দর্য প্রয়োজন—আমাদের ত্রুটি—আধুনিক মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান ও নৈতিকতা—মধ্য পন্থা—শুদ্ধতা ব্যতিরিক্ত একাগ্রতার শক্তি বিপজ্জনক হতে পারে—পরম সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ কর

**অষ্টম পরিচ্ছেদ : গুরু ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা** ১১৯—১৩২

আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে শিক্ষার প্রয়োজন—গুরুর করণীয়—গুরুর প্রয়োজনীয়তা—আধ্যাত্মিক দীক্ষার শক্তি—মন্ত্রের শক্তি—শুদ্ধ মনই গুরুর কাজ করে—অবতারই সর্বোত্তম আচার্য—সর্বকালের আচার্য

**নবম পরিচ্ছেদ : জ্ঞানিজনের সংসর্গ** ১৩৩—১৪৬

সাধুসঙ্গ প্রয়োজন—মূর্খের সংসর্গ পরিহার কর—প্রথমে নিজে উদ্ধার হও—অপরকে নিন্দা করার প্রয়োজন নেই—আত্মম্ভরিতারূপ বাধা—নিজ গুরুকে কিভাবে দেখবে?—ভারতে গুরুবাদ—প্রবুদ্ধ আশীর্বাদ—নিজ ইষ্টের সঙ্গ

**দশম পরিচ্ছেদ : ত্যাগ ও অনাসক্তি** ১৪৭—১৬৫

ত্যাগ প্রয়োজন—ভালবাসা ও আসক্তি—প্রকৃত আত্মীয়—ঘৃণা আসক্তির মতোই নিন্দনীয়—প্রথমে সাবধানতা চাই—প্রকৃত ত্যাগই ঈশ্বরানুরাগ—বৃথা আশা—পিঙ্গলার উপাখ্যান—বিরক্তি বোধ—সাধু-সন্তদিগের দৃষ্টান্ত—ত্যাগের রকমফের—অন্তরের অনাসক্তি—সংসার বৃক্ষ—জ্ঞান-খড়্গ

**একাদশ পরিচ্ছেদ : মনের পবিত্রতা—অধ্যাত্ম জীবনের মৌলিক প্রয়োজন** ১৬৬—১৮৩

সম্পূর্ণ জাগরিত হও—অধ্যাত্ম জীবনের সকল পথেই পবিত্রতার ওপরে জোর

দেওয়া হয়েছে—পবিত্রতা ঃ পতঞ্জলি মতে—পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা কর—অতীত নিয়ে বেশি চিন্তান্বিত হবে না—কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন—আত্ম-চিন্তা কর—সূক্ষ্ম বাসনা—আধ্যাত্মিক মানুষের অধিকতর দায়িত্ব—প্রলোভন এড়িয়ে চল—নৈতিক জীবনই আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রদর্শক হবে—প্রকৃত উদ্দেশ্য

**দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ আধ্যাত্মিক জীবনে কাম নিয়ে সমস্যা** ১৮৪—১৯৮

জীবনের ওপর কামের প্রভাব—চির কৌমার্য ও বিবাহ—গৃহস্থের কর্তব্য—অবিবাহিতদের প্রতি সাবধানবাণী—স্ত্রী-পুরুষ-তত্ত্বের পারে—কেবল বীরপুরুষই সত্যকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখে—তোমার মনের প্রতারণা থেকে সাবধান—অবিবাহিতদের প্রতি উপদেশ (ক্রমশ)—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী—আধ্যাত্মিক স্তরে সমাধান

**ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ ব্রহ্মচর্যব্রত বা ইন্দ্রিয় সংযম (চিরকুমারদের প্রতি বিশেষ উপদেশ)** ১৯৯—২১২

ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা—পাশ্চাত্যে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা—মহান সন্তদের দৃষ্টান্ত—ব্রহ্মচর্য পালন—বাস্তব সহায়তা—মনের স্তরে কাম সংযমন—কাম দমনের আরো কিছু কার্যকরী প্রস্তাব—চেতনার পরিবর্তন—চরম সমাধান

**চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ শক্তি** ২১৩—২২৩

শারীরিক শক্তি—মানসিক শক্তির পরীক্ষা—বিশ্বাস ও অধ্যবসায়—সিদ্ধান্তে আসার পারদর্শিতা—সৎচিন্তাকেও সংযত রাখার সামর্থ্য—নির্ভীকতা—অহিংসা—সত্যের ক্ষতিকর দিক—আত্মার চিন্তা কর

**পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ ব্যক্তিত্ব ও আন্তরিক সমতার একীকরণ** ২২৪—২৩৭

আমাদের ভর-কেন্দ্র—মনের জটিলতা (চিত্তাচ্ছন্নতা)—দ্বন্দ্বের কারণ—'ব্যক্তিত্ব' কথাটির অর্থ—ব্যষ্টি ও বিশ্ব—ব্যক্তিত্বের সংহতি কাকে বলে?—সংহতির পথে পদক্ষেপ—অসংহতি থেকে সংহতি—বিশ্ব-চৈতন্যে ব্যক্তিত্বের সংহতি

**ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ ঈশ্বরপ্রেম** ২৩৮—২৫৫

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম—ভক্তের রকমফের—ঈশ্বরপ্রেমের শক্তি—ঈশ্বরের দিকে মোড় ফেরাও—সব ভ্রান্ত ইষ্টগুলিকে সত্য ইষ্ট দেবতায় মিশিয়ে দাও—ধর্ম সম্বন্ধে অতি গোঁড়া হয়ো না—ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক প্রেম

**সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ আত্ম-সমর্পণ** ২৫৬—২৭৩

ঈশ্বরীয় দিব্যশক্তি—অনিশ্চয়তার আশীর্বাদ—অহমিকাই দুঃখের প্রধান কারণ—দুঃখ ভোগকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর—কর্ম ও ভগবৎ কৃপা—জগন্মাতার লীলা—ঈশ্বরের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হও—কিছু প্রায়োগিক প্রস্তাবনা

## দ্বিতীয় পর্ব
## আধ্যাত্মিক অনুশীলন
## (খ) প্রণালী

**অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ যোগ-বেদান্ত সংশ্লেষণের পথ** ২৭৭—২৯৫

প্রাথমিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন—ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হও—ক্রম-বিন্যস্ত পথ—গুরুকরণ কি অত্যাবশ্যক—মনকে কি করে শুদ্ধ করা যায়—যোগের আটটি ধাপ—ঈশ্বরোপাসনা—জপ ও ধ্যান—আধ্যাত্মিক জীবন সেবার জীবন

**ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ধ্যানশীল জীবনে যা অবশ্য করণীয়** ২৯৬—৩১১

আমাদের সামনে যে পথ রয়েছে—তোমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা হোক—স্বামী ব্রহ্মানন্দ কি শিখিয়েছিলেন—প্রাথমিক পর্যায়গুলি—পরিবেশের নিন্দা করো না—প্রথমে শরীরের প্রশিক্ষণ—নৈতিক শৃঙ্খলা—মানসিক সমন্বয়সাধনে ব্রতী হও—দেহের অঙ্গবিন্যাস (আসন)—সকলের জন্য প্রার্থনা করবে—শ্বাসগ্রহণের তাৎপর্য—বাসনাগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাব আরোপ কর—ঈশ্বরের মন্দির—কিভাবে ধ্যান করতে হবে—গুরু অন্তরে বিরাজ করেন—ঈশ্বরের কাছে আত্ম-সমর্পণ—একটি নির্দিষ্ট ভাব গড়ে তোল—একই আত্মা সকলের অন্তরে—নিজ মুক্তি ও জগৎ কল্যাণের জন্য

**বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ একাগ্রতা ও ধ্যান** ৩১২—৩২৫

সব রকম একাগ্রতাই ধ্যান নয়—নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন—মনের শুদ্ধি প্রয়োজন—আসন—ছন্দোবদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস—ধ্যানের বিষয়বস্তু—চেতনার কেন্দ্র—চেতনাকেন্দ্র-স্বরূপ হৃদয়—হৃদয়কেন্দ্রের গুরুত্ব—হৃদয়কেন্দ্রটি কোথায়?—হৃদয়েই জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ হয়

**একবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ধ্যানশীল জীবনের জন্য কিছু কার্যকর পরামর্শ** ৩২৬—৩৪৭

ধ্যানেই বিশ্রামের অনুসন্ধান—নিজের মধ্যেই নির্জনতা খোঁজ —নির্দিষ্ট কার্যসূচী পালন কর—ধ্যানের উৎকর্ষ বাড়াও—শুভ দিনগুলি—ধ্যানের সময়—ঘুম সম্বন্ধে নির্দেশ—একটি নির্দিষ্ট চেতনা-কেন্দ্রকে ধরে থাক—আহার সংযম—আসন—ছন্দোবদ্ধ শ্বাসক্রিয়া (প্রাণায়াম)—সদা সতর্কতা প্রয়োজন—তোমার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা—ঈশ্বরের প্রতি একটা নির্দিষ্ট ভাব গড়ে তুলতে চেষ্টা কর—নিজ মনকে নিপুণভাবে চালাতে শেখ—সর্বদা একমাত্র ঈশ্বরমুখী হও—সরলতার প্রয়োজন—প্রথমে যথার্থ ভদ্রলোক হও—ধৈর্যশীল হতে শেখ—নালিশ করা বন্ধ কর—অন্তরে ও বাইরে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা কর

**দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ অধ্যাত্ম জীবনে প্রার্থনার স্থান** ৩৪৮—৩৬৩

প্রার্থনা—সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক—হিন্দুধর্মে আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ধারা—ঈশ্বরই শোধনকর্তা ও পরিত্রাতা—ভক্তের ঈশ্বর প্রেমের গভীরতা—হিন্দু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সর্বগ্রাহী প্রসার

**ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ মরমী সাধনা** ৩৬৪—৩৮২

সব ঈশ্বরকে নিবেদন কর—উপাসনা বা মানস পূজা—প্রতীকের মাধ্যমে সাধনা—হিন্দুদের কয়েকটি ধর্মীয় প্রতীক—পূজার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি—এই শরীর দেব-মন্দির স্বরূপ—জপ—মরমী সাধনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি—শুদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন—উপসংহার

**চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ঈশ্বরের নামের শক্তি** ৩৮৩—৪০৩

কথার শক্তি—পবীত্র শব্দ ওঁ—ঈশ্বরীয় বাণী এবং নাদ ব্রহ্ম—মন্ত্র কি?—জপের শক্তি—পৃথিবীর নানা ধর্মে জপ-প্রণালী—হিন্দুধর্মে জপ পদ্ধতি—কয়েকটি কার্যকরী ইঙ্গিত—ঈশ্বরীয় নামের শক্তি

**পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ নিরাকারের ধ্যান** ৪০৪—৪১৮

অদ্বৈতবাদ হলো সুদূর লক্ষ্য—বহুর পেছনে এক—নানা রকমের নিরাকার ধ্যান—প্রথমে নিজেকে নিয়ে আরম্ভ কর—চেতনাস্তর সমূহ—নৈর্ব্যক্তিক বা নিরাকার ধ্যান—আত্মায় মগ্ন থাক—আত্মার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা আত্মাই হয়ে পড়ি—উপাসনা ও বিশ্লেষণ—দ্বিমুখী প্রণালী

**ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ ঈশ্বর সান্নিধ্যের সাধনা** ৪১৯—৪৩৭

মনকে উচ্চতর স্তরে রক্ষা করা—সাধনায় নিরবচ্ছিন্নতা—ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরের যোগ—অতিরিক্ত কাজ বাধাস্বরূপ—কর্ম ও উপাসনা—তীব্রতা প্রয়োজন—অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া—জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন—মহাজাগতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ—উচ্চতর কেন্দ্রের উন্মোচন—আন্তর নিয়ন্ত্রণ—আহত হলেই সে আঘাত ঈশ্বরে সমর্পণ কর

## তৃতীয় পর্ব
## আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা

**সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ অসৎ থেকে সৎ** ৪৪১—৪৫৮

মানব ও সৎস্বরূপ—অহং-ভাবের প্রাথমিক সচেতনতা—অধ্যাত্ম জীবনের মৌলিক নিয়মাবলী—যুক্তির ভিত্তি—দ্রষ্টার প্রকৃতি—অন্তরের দীপ্তি—ঐ স্বজ্ঞাকে কিভাবে জাগিয়ে তোলা যায়?—তিন রকম শরীর—ব্যষ্টি ও বিশ্ব—ভৌত

জগতের স্বরূপ—যথার্থ স্বরূপ ও আপাত প্রতীয়মান বস্তু—সৎ (সত্য) ও চিৎ (চৈতন্য)

**অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক রূপান্তর** ৪৫৯—৪৭৪

আকস্মিক পরিবর্তন—অন্তঃপরিবর্তনের কারণ—অজ্ঞান, পরিবর্তনের প্রধান বাধা—প্রত্যেক মানুষেই পরিবর্তন আসতে পারে—মানবিক অভ্যাস ও প্রবণতা—আমাদের অন্তরস্থ দেবতা ও অসুর—জীবাত্মার মুখোশ—চারিত্রিক রূপান্তর—আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা

**উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সাধনার প্রতিক্রিয়া** ৪৭৫—৪৯৫

অধ্যাত্মজীবন যেন এক বেড়া-ডিঙ্গানো দৌড়—প্রতিক্রিয়াগুলির প্রকৃতি—প্রতিক্রিয়ার কারণ—তোমার চেতনাকে দিব্য-চেতনার সঙ্গে যুক্ত কর—তোমার চেষ্টা ছাড়বে না—সাধক সহানুভূতিশীল ব্যবহার চায়—তোমার উচ্চতর চেতনা-কেন্দ্রটিকে ধরে থাক—তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি—আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়া যায় কিভাবে?—সংগ্রামে নানা হাতিয়ার

**ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতা** ৪৯৬—৫১৬

এ কালের সংশয়—মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?—পরোক্ষ জ্ঞান যথেষ্ট নয়—ধর্মের পরশপাথর—স্বপ্ন ও বাস্তবতা—মনোজগতের রহস্য—প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় তোমার কি লাভ হয়—আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য

**একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক উন্মেষ** ৫১৭—৫৩৭

দেহ, মন ও আত্মা—সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলা—চক্র বা চেতনা কেন্দ্র—ঐ সর্প-শক্তির সঙ্গে ছেলেখেলা করো না—আধ্যাত্মিক বিকাশ কদাচিৎ সমভাবে হয়ে থাকে—কুণ্ডলিনী জাগ্রত করবার শ্রেষ্ঠ উপায়—কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি—সম্পাদকের মন্তব্য—আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রাথমিক স্তর—অদ্বৈত ভাবের অনুভূতি—বিজ্ঞান—অখণ্ড অনুভূতি

**দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : এই জীবনেই প্রকৃত মুক্তি লাভ** ৫৩৮—৫৫৪

আধ্যাত্মিক মুক্তির আদর্শ—যথার্থ মুক্তি—গুণগত বন্ধন—নৈতিক মুক্তি—আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকে এক ধাপ—স্বর্গসুখ লাভই জীবনের উদ্দেশ্য নয়—বেদান্তের আদর্শই হলো পরম মুক্তি—বিশুদ্ধ জ্ঞান—চরম মুক্তির পথ—অহং—কারাগারের স্থপতি—নিজে মুক্ত হও, পরে অপরকে (মুক্ত হতে) সাহায্য কর

**ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : মুক্ত জীবন** ৫৫৫—৫৭৬

জীবন্মুক্তি—মুক্ত পুরুষের লক্ষণ—জগতের আচার্যগণের দৃষ্টান্ত —সাধু-সন্তদের দৃষ্টান্ত—খ্রীস্টীয় মরমী সাধকগণ—সুফি মরমী সাধকগণ—শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ

**চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ কালের বালুকারাশিতে পদচিহ্ন** **৫৭৭—৬১৭**

ভারত ও হিন্দুধর্ম—দক্ষিণ ভারতের আলোয়ারগণ—দক্ষিণ ভারতের শৈব (নায়নমার) সন্তগণ—মহারাষ্ট্রের সন্তগণ—উত্তর ভারতের সন্তগণ—বাংলার সন্তগণ

## চতুর্থ পর্ব

## আধ্যাত্মিক টুকিটাকি

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ আধ্যাত্মিক টুকিটাকি ৬২১—৬৫৫

গ্রন্থে উদ্ধৃত গল্প, আখ্যান ও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাবিবরণের তালিকা ৬৫৭—৬৬০

গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোক-সূচী ৬৬১—৬৬২

নির্দেশিকা ৬৬৩—৬৮৫

## প্রথম পর্ব

# আধ্যাত্মিক আদর্শ

# প্রথম পরিচ্ছেদ

# আধ্যাত্মিক অন্বেষা

## আধ্যাত্মিক রূপান্তর

তরুণ রাজকুমার সিদ্ধার্থ প্রাসাদ-কাননের এক বৃক্ষতলে একাকী বসে আছেন। তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। মধ্য রাত। সারা পৃথিবী অন্ধকারে ও নীরবতায় আচ্ছন্ন।

নৃত্যরতা বালিকাদের কোলাহল ও উল্লাসে বিরক্ত হয়ে কুমার সবে ভোজনকক্ষ ত্যাগ করেছেন।

তীব্র অসন্তোষ ও গভীর শূন্যতা তাঁর মনের মধ্যে বেড়ে চলছিল। সহসা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেদিকে তিনি কর্ণপাত করলেন এবং শুনলেন দিব্যধামবাসিগণ সমবেত কণ্ঠে গাইছেন ঃ

**জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,**
**কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।**
**ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,**
**কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই!**
**কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন?**

*         *         *

**কর হে চেতন, কে আছ চেতন,**
**কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?**
**কে আছ চেতন, ঘুমায়োনা আর**[১]

*         *         *

সিদ্ধার্থ আসন থেকে উঠলেন। তাঁর নিদ্রামগ্ন স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে শেষ বারের মতো দেখে নিয়ে ঐতিহাসিক যাত্রায় বের হলেন। এই মহাযাত্রাই পরিশেষে তাঁকে বুদ্ধে বা জ্ঞানদীপ্ত পুরুষে পরিণত করল। কেবলমাত্র বুদ্ধ একাই এই আধ্যাত্মিক পথ গ্রহণ করেননি। কঠ-উপনিষদ্ বলছে, 'ওঠ, জাগো, মহান গুরুদের অনুসরণ করে সত্য উপলব্ধি কর।'[২] স্মরণাতীত কাল থেকে ঈশ্বর শাস্ত্রগ্রন্থাদির মাধ্যমে

---

১ Edwin Arnold -এর *The light of Asia*-র অনুকরণে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ রচিত; দ্রঃ *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত*, উদ্বোধন অখণ্ড সং, ৯ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯, ১৯৯৭, পৃঃ ৯৪২

২ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।'—*কঠ. উ.* ১/৩/১৪

মানুষকে বলেছেন ধর্মের পথ অবলম্বন করে তাঁকে অনুসরণ করে চলার জন্য। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সহস্র সহস্র মানুষ সমস্ত কিছু ত্যাগ করে জ্ঞানাতীত বা তুরীয় রাজ্যে যাত্রা করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে এই জগৎ ও এর ভোগসুখ বেশ মূল্যবান হতে পারে কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সেই শাশ্বত ও অনন্তকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল ও উদগ্রীব হয়ে থাকেন। চিন্তা কর, স্বামী বিবেকানন্দের সংগ্রাম ও সত্য অন্বেষণের নিরন্তর প্রয়াসের কথা। তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ পবিত্র, শক্তিমান, সুন্দর, বুদ্ধিদৃপ্ত ও মেধাবী। তিনি ইচ্ছা করলেই পার্থিব জীবনে যে কোন উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন। তাঁকে বৈষয়িক জীবনে টেনে নিয়ে আসার ব্যাপারে অন্য একটি প্রবল চাপও ছিল—সংসারের দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থা। কিন্তু এ সকল প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও তিনি ত্যাগ ও সেবার পথই বেছে নিলেন।

কোন এক সময় প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন সে আধ্যাত্মিক আদর্শের আহ্বান অনুভব করে। যখন সে ডাক আসে তখন সে তা অগ্রাহ্য করতে পারে না। তখন বিশ্বের কোন জিনিসই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। উচ্চতর আদর্শের আহ্বানে অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত সে কখনো শান্তি পায় না। এই আন্তর সচেতনতা ও উচ্চতর আদর্শ অনুসরণ করার প্রবল প্রেরণা আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনার ইঙ্গিত। তখন আধ্যাত্মিক আদর্শ তাকে মুগ্ধ করে এবং সারা জীবন তার সঙ্গী হয়ে চলতে থাকে. পার্থিব আদর্শ থেকে আধ্যাত্মিক আদর্শে এই পরিবর্তনকে বলা হয় 'ধর্মান্তরসাধন'। এই সঙ্গেই শুরু হয় আধ্যাত্মিক জীবন। কিছু কিছু মানুষের কাছে এই ধর্মান্তরসাধন হঠাৎই ঘটে। অন্যান্য কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই উন্নতি আসে ধাপে ধাপে।

যথার্থ রূপান্তর যাঁদের মধ্যে ঘটে তাঁদের সংখ্যা যে কোন দেশে যে কোন সময়েই বেশ অল্প। কথাটা ভাল লাগুক বা না লাগুক, যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবন মাত্র কয়েকজন মনোনীত ব্যক্তির জন্য।

গণ-আধ্যাত্মিকতা বলে কিছু হতে পারে না, এই আদর্শটি তোমাদের কাছে যতই মনোরম বলে মনে হোক না কেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েকজন আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করে এবং শেষোক্তদের মধ্যে আরো অল্প সংখ্যক ব্যক্তি চরম তুরীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে।[৫]

কিন্তু আমাদের ভেবে নিতে হবে যে আমরাই সেই মনোনীত কয়েকজন, আর

৫ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ গীতা-৭/৩

তাই চরম আধ্যাত্মিক আদর্শ উপলব্ধির জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলতে আমাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হবে।

## অধ্যাত্ম-পিপাসা ঈশ্বরের দুর্লভ আশীর্বাদ

ধর্মক্ষেত্রেও এক ধরনের আভিজাত্য আছে। সকল ধর্মেই উন্নত সাধু, সন্ত ও জ্ঞানী সাধকদের নিয়ে একটি শ্রেণী সৃষ্ট হয়। তবে আধ্যাত্মিক অভিজাতগণ সাধারণ সংসারী অভিজাতবর্গের মতো না হয়ে সর্বদা তাঁদের উপলব্ধ সম্পদ অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আগ্রহী। এঁরা যা কিছু উপভোগ করেন তা অন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েই বেশ আনন্দ পান। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সম্পদ লাভ করতে প্রয়াসী হয়ে থাকেন। অধিকাংশ মানুষ আধ্যাত্মিক মসনদের মধ্যে নিহিত নিবিড় আনন্দ লাভ করা অপেক্ষা এ জগতের পঙ্কিল আবর্তের খোঁয়াড়ে গড়াগড়ি দিতেই বেশি ইচ্ছুক। তুমি একটি ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পার; কিন্তু ও যদি জল পান করতে না চায়, তবে তুমি ওকে পান করাতে পারবে না। আধ্যাত্মিক মার্গে কতজন অগ্রসর হচ্ছেন তা দেখতে তোমাকে এদিক ওদিক তাকাতে হবে না। তুমি যদি উচ্চতর আদর্শের ডাক শুনে থাক তবে তোমার তাতে সাড়া দেওয়া এবং তার জন্য সকল শর্ত পালন করাই উচিত। অন্যেরা যদি সেই ডাকে সাড়া না দেয় তবে তাতে তোমার কিছু করার থাকতে পারে না। দুই পথের এই বিভাজন আধ্যাত্মিক জীবনে অবশ্যম্ভাবী।

শঙ্করাচার্য বলেছেন, মনুষ্য-জন্ম, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষদিগের সংশ্রব—জগতে এই তিনটি দুর্লভ, একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাতেই তা লাভ হতে পারে।[৪] অবশ্য এই তিনটি সুযোগই যে যথেষ্ট তা নয়, এগুলির সাহায্যে লাভবান হওয়ার আগ্রহ থাকা চাই এবং আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে আমাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তিও চাই। জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য যে কোন কৃচ্ছ্রসাধনার ও যে কোন মূল্য দেবার মতো মানসিক প্রস্তুতি থাকা চাই।

এটাকে পরম সৌভাগ্য বলে ধরে নিতে হবে যে, যে কারণেই হোক উচ্চতর ও শাশ্বত বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আমাদের মনের মধ্যেই রয়েছে। লক্ষ্য রাখতে হবে ঐ উচ্চতর আদর্শের পথে অবসন্ন না হয়ে আমরা যেন ক্রমশ দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যে উপনীত হই। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসাহ বজায়

---

৪ *'দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।*
*মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥' —বিবেকচূড়ামণি-৩*

রাখতে হবে, কিন্তু প্রায়ই আমাদের শৈথিল্য এসে থাকে। তাই দেখা যায় কিছুদিন আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করার পর অধিকাংশ মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের অগ্রগতির প্রয়াস থেমে যায়। তাদের মন এত চঞ্চল ও বহির্মুখী যে তারা দীর্ঘকাল আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসাহ ও তীব্রতা ধরে রাখতে পারে না এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন, পাঠ ও স্বাধ্যায় অবিচলিত ও দৃঢ়ভাবে চালাতে সক্ষম হয় না। কাজেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজন এক অদম্য মানসিকতা। অতিশয় স্থৈর্য ও দৃঢ়তার মাধ্যমেই সকল প্রকার উন্নতি সম্ভব। কিছুতেই নিস্তেজ বা নমনীয় মনোভাবাপন্ন হলে আমাদের চলবে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন, 'আমাদের জন্ম—নিদ্রা ও বিস্মরণ বৈ তো নয়'।[৫] অন্য একটি গীতি কবিতায় তিনি লিখেছেন, "এ জগৎ আমাদের কাছে অতি বিশাল; পরে বা আগে যত পাই তত করি ব্যয়, শেষে সব শক্তি করি অপচয়"।[৬] আমাদের সব সময় এ ভাবে নষ্ট করা উচিত নয়।

## জগতে চিরস্থায়ী সুখ হয় না

প্রায়ই এমন হয়, আমরা যখন কোন জিনিস পাই তখন মনে হয় যে, আসলে আমরা ঐ জিনিসটি কখনোই চাইনি। জিনিসটি হয়ত খুঁজে থাকতে পারি, কিন্তু বস্তুতপক্ষে আমরা দেখি যখন ওটা পেয়ে যাই তখন মনের ঐ বাসনাটা চলে গেছে এবং তার জায়গায় অন্য আর একটি বাসনা মনে বাসা বেঁধেছে। অনেক মানুষ নিজেদের বাসনার আসল প্রকৃতি বুঝতে ভুল করে বসে এবং সেগুলিকে জাগতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে থাকে, অথচ বাস্তবে যা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল নয় এমন কোন কিছুতেই মানুষের বাসনা পরিতৃপ্ত হতে পারে না, এবিষয়ে তারা যতই নিজেদের প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা করুক না কেন। পুরাতন শূন্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগের থেকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর ও তীব্র আকারে বারংবার তাদের মনে হানা দিতে থাকে। মানুষ সুখ খুঁজে বেড়ায় বাইরের জিনিসে এবং নর-নারীর দেহ-সৌষ্ঠবের মধ্যে। বস্তুত প্রকৃত সুখ আমাদের অন্তরেই নিহিত। এ আমাদের অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। বাইরের জিনিস আমাদের প্রকৃত সুখ এনে দিতে পারে না; যদিও বা যা অল্প কিছু পাই তাও অবিলম্বে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা সমগ্র জীবনকালের দিকে না তাকিয়ে কিছু স্বল্প পরিসরের সময়ের দিকে নজর দিয়ে ভুল করে থাকি। সন্দেহ নেই যে জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে এবং মানুষের স্নেহ ও ভালবাসায় সাময়িক সুখ থাকে। কিন্তু সাময়িক সুখ তো আর প্রকৃত সুখ নয়, বরং

---

৫ William Wordsworth : *Ode on the Intimations of Immortality*

৬ William Wordsworth : *The world is too much with us*

এটা ঐ সুখের বিপরীত অবস্থা। প্রকৃত সুখ অন্তরাত্মার স্বকীয় অবস্থা। আমাদের সত্তাকে জানার ও আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে জানার ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জাগাতে হবে। একমাত্র আত্ম-জ্ঞানেই যথার্থ দিব্য আনন্দ।

যদিও মানুষের উচ্চতর সত্তা ব্রহ্মের একটি অংশ এবং প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম থেকে অবিভাজ্য, তথাপি ভক্ত নিজ আত্মা অপেক্ষা ঈশ্বরের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর সকল শান্তি ও সৌভাগ্যের আধার। আমাদের উচিত অন্তর্লোকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের অন্বেষণ করা।

আমাদের এই দেহই ঈশ্বরের সদাজাগ্রত মন্দির। আমরা দেখি যে সকল ধর্মশাস্ত্রে এই ধারণাটিকে বারংবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রবর্তক ও তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ অবশ্যই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়। তাই তাঁরা সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। যাঁরা নিজের হৃদয়ে সত্যকে উপলব্ধি করেছেন একমাত্র তাঁরাই পারেন অন্যদের আত্মোপলব্ধির পথ দেখাতে। ঈশ্বর সর্বদা আমাদের মনের পশ্চাৎপটে ও ব্যক্তিত্বের অন্তরালে অবস্থান করেন। যদি ব্যাকুল হৃদয়ে আমরা প্রার্থনা করতে পারি একমাত্র তবেই তিনি সেই প্রার্থনা শোনেন; নচেৎ নয়। প্রার্থনা করার সময় পার্থিব সুখের বিষয়ে কখনোই আমাদের চিন্তা করা উচিত নয়। সুখ বলতে সাধারণত যা মনে করা হয় তা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত পরিচায়ক নয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বা উপলব্ধির কোন প্রকার প্রমাণও নয়। আধ্যাত্মিক সুখ ভিন্ন প্রকারের; এ হলো 'সকল বুদ্ধির অগোচর এক ঈশ্বরীয় শান্তি।'[৭]

ঈশ্বরের কাছে জাগতিক কোন কিছুর জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত নয়। ধরা গেল, তিনি তা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু জাগতিক বস্তু তো অশান্তিও নিয়ে আসতে পারে। আমরা যখন এই মহান বর-দাতার নিকট যাচ্ছি তখন কখনোই আমাদের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার সঙ্গে জড়িত পার্থিব বস্তু তাঁর কাছ থেকে চাওয়া উচিত হবে না। আমরা ঈশ্বরের কাছে শুধু চাইতে পারি তিনি যেন আমাদের সংসার সাগরে বা পার্থিব সম্পদের মোহে নিমজ্জমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করেন। সাধারণত আমরা যখন অসুখী বোধ করি, তখন আমাদের পথ পরিবর্তন না করে এবং সত্য ও শান্তির দিকে না গিয়ে বরং অসুখী অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলি আর আমাদের বাসনা ও কল্পনাকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখি। আমাদের দেহ-বন্ধন এত বেশি যে দৈহিক ভোগকে সব কিছুর ওপরে স্থান দিই। একে ত্যাগ করতে আমরা প্রস্তুত নই। বার বার ধাক্কা আর আঘাত ছাড়া অন্য কিছু না পেয়েও আমরা ভোগের বিভিন্ন উপকরণকেই বেপরোয়াভাবে জড়িয়ে ধরে থাকি। মায়া বা অজ্ঞানের এমনই ভীষণ শক্তি।

---

৭ Bible. Philippians. 4:7

পরম পিতা বা পরম মাতা দেখছেন যে তাঁর সন্তানেরা খেলায় রত। যখন কোন সন্তান নিজের খেলনায় ও শিশুসুলভ কাজে অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন ঈশ্বর সত্যই তার কাছে আসেন এবং মায়াময় খেলার জগৎ থেকে তাকে উদ্ধার করেন। শিশুরা সন্দেশ-মিষ্টি নিয়ে, পুতুল নিয়ে, খেলার সৈনিক নিয়ে, খেলার বাড়ি, খেলার গাড়ি নিয়ে খেলাধুলা করে। যতক্ষণ তারা এ-সকলে ক্লান্ত না হচ্ছে বা বিরক্তিতে ঐ সকল খেলা থেকে সরে না আসছে, ততক্ষণ ঈশ্বরের কিছু করার থাকে না। ঈশ্বর এটাকে বেশ একটা মজা বলে মনে করেন। তারপর একদিন শিশুটি একটু বড় হয়ে যখন বিলাপ করে বলে, "এ জীবনটা নিয়ে আমি কি করলাম?" তখন ঈশ্বর বলেন, "ঠিকই তো বাছা, কি করলে? কে তোমাকে এসব করতে বলেছিল? কে তোমাকে মূর্খের মতো অনির্দিষ্ট এতটা কাল ধরে এ খেলায় মত্ত থাকতে বলেছিল? কে বলেছিল তোমার খেলনাগুলি থেকে আঘাত পেতে আর তাতে জড়িয়ে পড়তে? কে এসব করল?" কিন্তু তারপর প্রায়শই দেখা যায় যে ইতোমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে আর শিশুটিও তার বিধ্বস্ত জীবনের ধ্বংসাবশেষের ওপর বসে বিলাপ করছে।

## শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সাধনা

আমাদের সকলের আরও সুবিবেচনাপ্রসূত ও শ্রেয়তর পথ ধরে চলার সুযোগ আছে। কিন্তু আমরা আমাদের বিশেষ বিশেষ খেলনা নিয়ে এমন মজে থাকি যে ওদের হাতছাড়া করতে চাই না। তাই আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয় এবং এ দুঃখ-ভোগ চলতে থাকবে ততদিন, যতদিন না আমাদের জীবন বারবার অসংখ্যভাবে যে মহান শিক্ষা দিয়ে চলেছে তা শিখব, আর প্রাজ্ঞের মতো কাজ করব। যেমন অধিকাংশ মানুষ জাগতিক আশা ও আদর্শ পূরণের জন্য চেষ্টা করে থাকে, আমাদেরও তেমনি আধ্যাত্মিক জীবন ও জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা করে না। এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আমাদের পছন্দের ওপর, আমরা পার্থিব জীবন বেছে নেব, না আধ্যাত্মিক জীবন অথবা আমরা দাসত্ব ও ভীতির জীবন যাপন করব, না স্বাধীন ও নির্ভয়ের জীবন।

আমাদের চেষ্টা করতে হবে এমন একটা কিছু পেতে যা শ্রেয়, যার বিকার এবং ক্ষয় নেই। কিন্তু প্রায়ই আমরা স্বেচ্ছায় ও সুচিন্তিতভাবে অবিদ্যার (অজ্ঞানের) পথই বেছে নিই। কারণ আমরা দেহজ ও আবেগজনিত ভোগের মায়ামূর্তিগুলিকেই জড়িয়ে থাকি, যদিও এগুলিকে আমাদের একদিন না একদিন ত্যাগ করতেই হবে। একদিন আমাদের এসব ছেড়ে দিতেই হবে, তা যদি স্বেচ্ছায় না ছাড়ি তবে ঐ খেলনাগুলি আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। সে হবে বড় দুঃখের এবং

বহু ক্ষেত্রে হৃদয়বিদারক ব্যাপার। অধিকাংশ মানুষকে শুধু এভাবেই শিক্ষা পেতে হয়, যদিও এটি খুবই কষ্টকর এবং সাধারণভাবে বহু জন্ম-সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের চেষ্টা করতেই হবে। জ্ঞাতসারে, সচেতনভাবে বিচার করে, জীবনোৎসর্গের মনোভাবে উদ্দেশ্যের প্রতি অনন্যমনা হয়ে। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের পছন্দমতো জীবনকে উচ্চতর মার্গেও নিয়ে যেতে পারে আবার হীনতর স্তরেও পরিচালিত করতে পারে।

যদি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমরা নিজের মধ্যে গভীর উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারি, তবেই কেবল লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করার মতো প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। আধ্যাত্মিক জগতে প্রায়ই অস্থির মস্তিষ্ক লোক দেখা যায়। তারা কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণে তৎপর না হয়ে, নিজেদের ভাবাবেগ ও উত্তেজনার অসীম সাগরে ভেসে চলতেই পছন্দ করে। কাজেই, তাদের কার্যত কিছুই অগ্রগতি হয় না, ঘোর বিষয়ীদের মতোই যা কিছু প্রাপ্তি হয় তা অতি নগণ্য। বিক্ষিপ্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এজগতে কোন সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়, আধ্যাত্মিক জগতে তো নয়ই। আগে ঠিক কর তুমি প্রকৃতপক্ষে কি চাও। প্রায় সময় আমরা শান্তি পেতে চাই কিন্তু তার জন্য এমন একটি পথ বেছে নি যা পরিণামে মানসিক অস্থিরতা ও ঝামেলার মধ্যে গিয়ে শেষ হয়। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে ঃ "কিছু লোক আছেন, যাঁরা পূর্ব দিকে যেতে চান কিন্তু চলেন পশ্চিম দিকে। তাঁদের যদি জিজ্ঞেস কর কেন তাঁরা এমন ভাবে চলছেন, তাঁরা তখন বলবেন, 'কারণ আমি উত্তর দিকে যেতে চাই'।"

## সত্যের পরীক্ষা

প্রেমিক যখন তার প্রেমাস্পদের চিন্তায় বিভোর থাকে তখন সে যা কিছু কল্পনা করে তার কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে না। উন্মাদ ব্যক্তিও যা কল্পনা করে তার কোন অস্তিত্ব থাকে না। আধ্যাত্মিক জীবনে এসব অলীক কল্পনা পরিহার করে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক সাধনার একটি সুসম্বদ্ধ ধারা অনুসরণ করে আমাদের সত্যের ক্ষণিক আভাস বা দর্শন লাভের জন্য চেষ্টা করতে হবে। ঐ ধরনের দর্শন যদি দৈবাৎ ঘটে যায়, আর এর জন্য আমরা নিজেরা যদি আগে থেকে দীর্ঘ ও নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা প্রস্তুত না হয়ে থাকি, তবে এর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হতে পারে, এমনকি সারা জীবনের মতো আমাদের বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। প্রথমেই আমাদের জানতে হবে কিভাবে এই দর্শনের জন্য উপযুক্ত হতে পারি, তবেই আমরা এসব দর্শনকে চিরদিনের মতো নিজের করে নিতে পারব। আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের শুরুতে সাধকের নিকট দুঃখ-কষ্টই আসে, সুখ আসে না। মাঝপথে তাঁর জীবনে

খুবই দুর্বহ হয়ে ওঠে। ঐ সময় জাগতিক ব্যাপারে তাঁর আর কোন ঔৎসুক্য থাকে না, আবার আত্মজ্ঞান লাভ করাও সম্ভব হয় না, কারণ তা তখনো পর্যন্ত তার নাগালের বাইরে। এ যেন ওপরে ওঠা বা নিচে নামার ক্ষমতাশূন্য অবস্থায় ঠিক শূন্যে ঝুলে থাকা।

সত্যের পরীক্ষা এই রকম—জাগতিক সম্পদ ও জাগতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তুমি কখনোই পরম সুখ পেতে পার না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় ও আধ্যাত্মিক জীবনে তুমি পেতে পার পূর্ণ তৃপ্তি যা বাহ্যিক কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তাই দেবর্ষি নারদ বলেছেন, 'ঐশ্বরিক প্রেম উপলব্ধি করলেই মানুষ পূর্ণতা, অমরত্ব ও চরম তৃপ্তিলাভ করে থাকে।'[৮]

প্রকৃত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পানীয় জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তৃষ্ণার্ত যারা নয় তারা জল ছাড়াই বহুক্ষণ থাকতে পারে। একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান সাধককে যেমনটি বলা হয় সে তেমনই পালন করে; কিন্তু সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা ও উৎসাহ এত অল্প যে, তারা সাধনের জন্য যে উপদেশ পায় তা পালন করতে মোটেই আগ্রহী নয়।

আবার, আমাদের দরকার অতি বিশুদ্ধ জল; দূষিত জল নয় অথবা ভীষণ নোংরা হয়ে গেছে এমন জলও নয়। আমাদের যথার্থ তৃষ্ণার্ত হওয়া প্রয়োজন, তবে এমন কোন কিছু গ্রহণ করা উচিত নয় যা বিশুদ্ধ ও পবিত্র নয়।

কঠোর পরিশ্রম ছাড়া সৎস্বরূপকে উপলব্ধি করা যায় না। সমগ্র জীবনই একটি সংগ্রাম। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পাবার জন্য সংগ্রাম করছে তবে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম হলো একটি মহত্তর সংগ্রাম। এ হলো চৈতন্যোদয়ের জন্য সংগ্রাম। সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম! এছাড়া কোন পথ নেই। সংগ্রাম করতে আমরা যেন ভীত না হই।

## সত্যের শক্তি

প্রায়ই দেখা যায় প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসা বেশ শক্ত, তার কারণ ঈশ্বরকে বাস্তব সত্য বলে আমাদের বোধ হয় না। অনেকের কাছে শরীরই আত্মা এবং আমরা ভীষণ ব্যগ্র হই বস্তুজগতে এই দেহের উপভোগের জন্য; তা সে ভোগ অবশ্য খুব স্থূল পর্যায়ের নাও হতে পারে। ধর্ম আমাদের অনেকের কাছে একটা বেশ শখের ব্যাপারের মতো; বহু ধরনের ফ্যাশনের মতো এও যেন একরকম ফ্যাশন। কিন্তু কোনদিন আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে যদি সত্য বলে ধারণা হয়, তখন এই বোধ হবে যে, আমাদের সমগ্র সত্তা সেই

---

৮ 'যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।' —*নারদীয় ভক্তিসূত্র*, ১.৪

অস্তিত্বেরই প্রতিস্পন্দন এবং কেবল এর জন্যই ব্যাকুল। এ জগৎ যদি আমাদের কাছে সত্য হয়, তবে তা আমাদের সমগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করে। যদি অন্য কিছু সত্য হয়, তবে তার ফলও একই হবে। বর্তমান সময়কালে আমরা যেটিকে সত্য বলে মনে করি সেটাই আমাদের প্রভাবিত করে, আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দেয় এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ঘটায়, আর আমাদের সমগ্র বোধশক্তিকে অধিকার করে ফেলে। বস্তুত আমাদের সমগ্র সত্তা তারই অস্তিত্ববোধে সাড়া দেয়।

আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে আমাদের জীবন ও সেই সঙ্গে সাধু-সন্তদের জীবন পর্যালোচনা করি তবে দেখব বিরাট এক পার্থক্য রয়েছে উভয়ের মধ্যে। 'সত্য'-বোধ উভয়ের মনকেই প্রভাবিত করে। তবে এই সত্য-বোধ সাধু-সন্তদের ক্ষেত্রে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সত্য-বোধ থেকে আলাদা। আমাদের কাছে এই জগৎ সত্য, সাধুদের নিকট একমাত্র আধ্যাত্মিক জগৎই সত্য। তাঁদের সমগ্র জীবনই—কি উপায়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, বুদ্ধিগত অস্পষ্ট ধারণার বদলে তাঁর অস্তিত্বকে কিভাবে সত্য রূপে উপলব্ধি করা যায়—এই এক চিন্তাতেই পূর্ণ। সাধু-সন্তগণ যাকে 'সত্য' বলেন তা যদি আমরা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তবে আমরা এটাও বুঝতে পারব—কেন তাঁরা ঈশ্বর-দর্শনের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত থাকেন।

অবশ্য সাধু-সন্তদের অন্ধের মতো অনুকরণ করা আমাদের উচিত নয়। কারণ তাঁদের আচরণ আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আগেই যা বলা হয়েছে, ঈশ্বরের জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা সত্যের সুস্পষ্ট ধারণা থেকেই আসে। আমাদের মধ্যে যারা ইন্দ্রিয়-বেদ্য এই জগৎটাকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করি, তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রয়াসে সর্তক হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমাদের পক্ষে সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়মানুবর্তিতা ও তীব্রতার ওপর। প্রায়শই আমরা এই ব্যাপারে খুবই অমনোযোগী হয়ে পড়ি। অবিচলিত সাধনা ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবনে কিছুই লাভ করা যায় না। আধ্যাত্মিক জীবনকে হতে হবে পরমেশ্বরে নিবেদিত, পবিত্রতা, ত্যাগ ও একাগ্রতায় বিধৃত। তাই নিজের ও পরের কল্যাণের জন্য আমাদের চিন্তার বিষয় সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন ও সতর্ক হতে হবে, কারণ অপরের প্রতি আমাদের কাম, ক্রোধ বা লোভের চিন্তাগুলি বিষ-বাষ্পের থেকেও ক্ষতিকর। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের অশুভ চিন্তার মাধ্যমে আমরা যে বিরাট ক্ষতিসাধন করি তা বিষ-বাষ্পের ক্ষতিসাধনের থেকেও অনেক বেশি হানিকর। আমাদের অপবিত্র চিন্তা, অপবিত্রতা যে কি তাই জানে না এমন লোকেদের ক্ষতি করে। কিন্তু আমাদের পবিত্র চিন্তা শুদ্ধতা অর্জনের সংগ্রামে তাদের সাহায্য করে।

## ঈশ্বরের অদর্শনে অতৃপ্তি

আমাদের মধ্যে ঈশ্বর-দর্শনাভাবে প্রগাঢ় অতৃপ্তি জাগিয়ে তুলতে হবে, যে অতৃপ্তির কথা সকল যুগের মরমিয়া সাধকগণ বলে থাকেন। আমরা যদি অন্তরে জাগিয়ে তুলতে না পারি ঈশ্বরের জন্য এমন অতৃপ্তি যা জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি ও বাসনাকে নাশ করে দেয়, তাহলে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা আমাদের আসবে না। এ জগতে প্রকৃত শান্তি কখনোই আসতে পারে না তবু এখানে আমাদের যে যার ভূমিকা তা যত ভাল করে সম্ভব পালন করে যেতে হবে। আমাদের চেষ্টায় যেন কোন রকম শৈথিল্য না আসে অথবা এই বদ্ধ দশাতে যেন কোন ভাবে আমাদের সন্তুষ্টির মনোভাব না এসে পড়ে। সকল আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে এ ধরনের সন্তুষ্টি বোধ খুবই বিপজ্জনক। মহত্তর জীবনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার আগুন আমাদের সজাগভাবে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। নিম্নতর কোন কিছুর জন্য আমরা কখনোই যেন আমাদের শক্তির অপচয় না করি। আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের জন্য মনের অস্থিরতা অপেক্ষা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার শান্তি যেন কখনো আমাদের না পেয়ে বসে।

চরম লক্ষ্যের দিকে বেশ কিছু দূর না অগ্রসর হতে পারলে কোন নিরাপত্তার আশা নেই। যে কোন ভক্তেরই আত্মজ্ঞান লাভের পূর্বে যে কোন সময়ে দুর্দশা অথবা জঘন্য রকম পতন আসতে পারে। যথেষ্ট অগ্রসর হবার পূর্বে আমাদের নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে খুব বেশি ঝুঁকি নেওয়া কখনোই উচিত হবে না।

আধ্যাত্মিক সাধনা ও প্রার্থনার মাত্রা অবশ্যই বাড়িয়ে তুলতে হবে। দিবারাত্র, নিরন্তর প্রার্থনা, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান ও সর্বদা উচ্চ চিন্তা আমাদের অশেষ কল্যাণ করে। প্রত্যেকের মনকে সর্বদা ঐশ্বরিক ভাবের সঙ্গে যুক্ত রাখা প্রয়োজন, তবেই এটা তার অভ্যাসে পরিণত হবে। সঠিক অভ্যাস রপ্ত হলে পথ চলা বেশ সহজ হয়ে যায়; তখন সাধকের জীবন অল্পই ক্লেশকর হয়।

ঈশ্বরে আমাদের মনের সবটাই সমর্পণ করতে হবে, মনের কিছুটামাত্র দিলে হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "আমি যদি এক টাকার একটা কাপড় কিনতে চাই, তবে আমাকে এক টাকাই দিতে হয়, এক পয়সা কম হলে হয় না। না দিলে ওটি আমি পাব না।" আধ্যাত্মিক জীবনেও তাই, পূর্ণ মনোযোগ না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না। কয়েক মাস বা কয়েক বছর যেমন তেমন ভাবে ধ্যান অভ্যাস করে যদি দেখ যে তোমার আধ্যাত্মিক লাভ কিছুই হয়নি, তার জন্য অন্য কাউকে দোষ দিতে পার না।

যেটা আমাদের দরকার তা হলো অধ্যবসায়। অবিচলিত ও নিয়মিত সাধন চাই। হাল ছেড়ে দেবার থেকে শরীর ও মন পবিত্র রাখার সংগ্রামে দেহপাত করা

বরং ভাল। যদি আমাদের মরণও হয় তাতে কি আসে যায়? আসল কথা হলো সত্যকে উপলব্ধি করা এবং আমাদের স্বরূপের পূর্ণতায় ও প্রকৃত সত্তায় উপনীত হওয়া। আমাদের সাধন সংগ্রামে যদি থাকে পরম প্রয়াস আমাদের কর্মে যদি থাকে সর্বৈব প্রচেষ্টা, তবেই আমাদের কর্তব্য করা হলো। বাকি সবই তারপর ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এইভাবেই হবে ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদন।

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাঁর সারথি এবং মন যাঁর ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সংযমনের রজ্জু, তিনি সংসার গতির পরিসমাপ্তিরূপ সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের সেই প্রসিদ্ধ পদ লাভ করেন।"[১] আমাদের কখনো আত্মতৃপ্ত বা আত্মতুষ্ট হওয়া উচিত নয়; এটা ভাবাও উচিত নয় যে, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। হয়তো বর্তমান কালের জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কিন্তু তবুও অধিকতর সাফল্য অর্জনের জন্য ঈশ্বরের কাছে আরো শক্তি প্রার্থনা করতে হবে। আজ হয়তো আমি পাঁচ কিলোগ্রাম তুলতে পারি কিন্তু আমি পঞ্চাশ কিলোগ্রাম তোলার জন্য শক্তি প্রার্থনা করতে পারি। আমি যদি মনে করি যে, আমি আমার সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি এবং এখনো করছি তাহলেও আমার ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব, কারণ এই 'সর্বোত্তমটি' কিছু একটি অপরিবর্তনীয় মাপ নয়।

## সাধু-সন্তদের আদর্শ

ঈশ্বরের জন্য আমাদের তীব্র ব্যাকুলতা সৃষ্টি করতে হবে—ঈশ্বরের জন্য এমন এক নিরন্তর, অদম্য অন্বীক্ষা, যা আমরা সাধু-সন্তদের জীবনে দেখি। তরুণ বয়সে শ্রীচৈতন্য ছিলেন বিরাট পণ্ডিত। কিন্তু পূর্ণ যৌবনে তাঁর মধ্যে হঠাৎ এক পরিবর্তন ঘটে যায় এবং তিনি হয়ে যান এক যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালবাসা এতই তীব্র ছিল যে, তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভুলে থাকতে পারতেন না। সারা জীবন তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর হয়ে থেকেছেন। তাঁর রচিত একটি ছোট কবিতায় দেখা যায় ঈশ্বরের প্রতি তাঁর মহাভাবোদ্দীপক ভক্তির প্রকাশ ঃ

> **অহো, কি আকুল আকাঙ্ক্ষা সেদিনের জন্য**
> **যেদিন তোমার নাম গানে নয়নে বহিবে ধারা**
> **মহাভাবে গদ গদ, রুদ্ধ কণ্ঠ করিবে না তোমার নাম উচ্চারণ।**
> **যখন প্রেমে রোমাঞ্চিত হবে এ শরীর আমার!**
> **হে গোবিন্দ, যেদিন নিমেষের বিচ্ছেদ**

---

১ *বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।*
*সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।। কঠ.উ.,-১/৩/৯*

মনে হবে যেন এক যুগ সময়,
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—এ জগৎ সব পুড়ে যাবে
যেদিন তোমার বিরহে হৃদয় শূন্য বোধ হবে।
অচলা ভক্তি লয়ে দাও হতে প্রণত তোমার চরণে,
চাহি না আলিঙ্গন তোমার, করি না দুঃখ বিরহে তোমার,
যদিও এতে হয় হৃদয় বিদারণ
হে প্রভু, ভক্ত-হৃদয় অপহারী যেমন ইচ্ছা তোমার
কর তাই আমারে,
তুমি প্রাণনাথ আমার, শুধু তুমিই, অন্য কেহ নয়।[১০]

পুরাণের বরেণ্য ভক্তগণের এক আদর্শ, প্রহ্লাদ। অতি শৈশবকাল থেকেই ভগবান বিষ্ণুর জন্য তাঁর ছিল তীব্র ভালবাসা। তাঁর অসুরতুল্য পিতা তাঁকে সংসারের পথে ফিরিয়ে আনতে সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নবীন বালক সকল নিষ্ঠুর পরীক্ষাই সাহসের সঙ্গে সহ্য করে ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে থাকত। ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে বালককে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার কি প্রার্থনা। বালকের উত্তর হলো :

'অজ্ঞানী সাংসারিক বিষয়ে যেমন গভীর ভালবাসা পোষণ করে, তেমন ভালবাসা নিয়ে যেন আমি তোমার চিন্তা করতে পারি, আর হৃদয়ে সে ভালবাসা যেন কখনো স্তিমিত না হয়।' [১১]

'হে প্রভু, শত সহস্রবার যদি আমাকে জন্ম নিতে হয়, তবুও তোমাতে আমার ভক্তি সর্বদা যেন অচল ও অটল থাকে।' [১২]

বর্তমান যুগে ঈশ্বরের জন্য তীব্র ব্যাকুলতার এক অপূর্ব উদাহরণ, শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের সর্বৈব রূপ দর্শনের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা এমনই তীব্র ছিল যে, ছয় মাস তাঁর নিদ্রা ছিল না। দিবারাত্র তিনি নানা আধ্যাত্মিক ভাবাবেশে থাকতেন, যা এত গভীর ছিল যে, মানুষ মনে করত তিনি বুঝি পাগল হয়ে গেছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন ঈশ্বর প্রেমে পাগল। তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী ও কথোপকথন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এতে দেখা যায়, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হবার ওপর কী বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা যথার্থই বলতে পারি যে, সকলকে এই আচরণবিধি পালন করতে বলাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিক্ষা। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিবরণ এখানে দেওয়া হলো :

---

১০ শ্রীচৈতন্য, '*শিক্ষাষ্টকম্*'।

১১ দ্রষ্টব্য : '*ইউনিভার্সাল প্রেয়ার্স*' (Universal Prayers), স্বামী যতীশ্বরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, চেন্নাই, ১৯৭১, কবিতা নং ২১২

১২ তদেব, কবিতা নং-২১১

"...বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, আর বলে, 'না, আমি মার কাছে যাব', সেইরকম ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই। আহা! কি অবস্থা! বালক যেমন মা মা করে পাগল হয়। কিছুতেই ভোলে না! যার সংসারে এ-সব সুখভোগ আলুনী লাগে, যার আর কিছু ভাল লাগে না—টাকা, মান, দেহের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ, যার কিছুই ভাল লাগে না, সেই আন্তরিক মা মা করে কাতর হয়। তারই জন্যে মার আবার সব কাজ ফেলে দৌড়ে আসতে হয়।

"এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুলপথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনি আবার ভাল পথে তুলে লন।

"আর, সব পথেই ভুল আছে—সব্বাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু কারও ঘড়ি ঠিক যায় না। তা বলে কারু কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা থাকলে সাধু সঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।"...

বঙ্কিম (ঠাকুরের প্রতি)—"মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ব্যাকুলতা! ছেলে যেমন মার জন্য! মাকে না দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে, সেইরকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ করা পর্যন্ত যায়।

"অরুণোদয় হলে পূর্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের আর দেরি নাই। সেইরূপ যদি কারও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তির ঈশ্বর লাভের আর বেশি দেরি নাই।"[১৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের সব অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য এই জ্বলন্ত ভালবাসা ছিল। এঁদের একজন ছিলেন বলরাম। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার খুবই অভিব্যক্তিপূর্ণ ঃ

কলকাতায় আগমনের পরের দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে রওনা হলেন। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর ব্রাহ্ম ভক্তদিগের আগমনের জন্য মন্দির-উদ্যানে খুব ভিড় ছিল । বলরাম ঠাকুরের ঘরের এক কোণে গিয়ে বসলেন। ঐ দলটি আহারের জন্য স্থান ত্যাগ করলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কিছু জানবার আছে কি না। বলরাম বললেন, "মহাশয়, ঈশ্বর কি সত্যই আছেন?" ঠাকুর বললেন, "নিশ্চয়"। "কেউ কি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে?" উত্তরে ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ,

---

১৩ *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন অখণ্ড সং. ৯ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃঃ ১১২৩-২৪

ঈশ্বর সেই ভক্তের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন, যে ভক্ত তাঁকে অত্যন্ত নিকটের, অত্যন্ত আপনার জন বলে মনে করে। একবার ডেকে তাঁর সাড়া পেলে না বলে তুমি ভেবো না যে তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই।" বলরাম পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু এত ডেকেও তাঁর দেখা পাই না কেন?" ঠাকুর একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সন্তানেরা তোমার কাছে যেমন প্রিয়, ঈশ্বরও কি তোমার কাছে তেমনি প্রিয়?" একটু ভেবে বলরাম বললেন, "না মহাশয়, আমি কখনই তাঁকে এত ভালবাসতে পারিনি।" বেশ আবেগের সঙ্গে ঠাকুর বললেন, "নিজের থেকে ঈশ্বরকে আরও আপনার মনে করে তাঁকে ডাক। সত্য বলছি, তিনি তাঁর ভক্তদের বড় ভালবাসেন। তিনি তাঁদের দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না। তাঁকে চাইবার আগেই তিনি মানুষের কাছে আসেন। ঈশ্বরের চাইতে আপন ও প্রিয় আর কেউ নেই।" বলরাম এই কথা শুনে নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেলেন। তিনি আপন মনে ভাবলেন, "তিনি যা যা বলেছেন তা সবই সত্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে এত জোর দিয়ে কেউ কখনো আমাকে বলেনি।"[১৪]

## অল্প বয়সে শুরু করা উচিত

বহুলোকে মনে করে যে, জীবনের সমস্ত ভোগ শেষ করে নিয়ে ধর্মকর্ম বৃদ্ধ বয়সে করলেই হবে। কিন্তু তাদের সেই সময় হয়তো নাও আসতে পারে, কারণ সংসারে ভোগসুখের জন্য অধিকাংশ শক্তি ক্ষয় করে ফেলে, কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য বেশি শক্তি আর অবশিষ্ট থাকে না। অনেকেই আধ্যাত্মিক জীবন এত দেরিতে শুরু করে যে, তারা বিশেষ কিছু লাভ করতে পারে না। বহু মানুষ বেশ দেরিতে বুঝতে পারে যে, তাদের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবে যারা বৃদ্ধ বয়সেও নিজেকে প্রেমিক যুবক বলে বৃথা কল্পনা-বিলাসে মত্ত হয়ে বিষয় ভোগের দিকে ছুটছে, সেই সব বৃদ্ধ অজ্ঞানীদের থেকে অবশ্য এদের অবস্থা ভাল। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এমন বহু দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দেখা পাওয়া যায়।

যতদূর সম্ভব অল্প বয়স থেকেই আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হওয়া উচিত। অল্প বয়সেই আধ্যাত্মিক জীবনের বীজ বপন না করলে পরবর্তী জীবনে আধ্যাত্মিক মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। বাংলার প্রখ্যাত নাট্যকার-অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য তরুণ নরেন্দ্রনাথকে মেলামেশা করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন :

শ্রীরামকৃষ্ণ : "তুই গিরিশ ঘোষের ওখানে বেশি যাস?... কিন্তু রসুনের বাটি

---

১৪ Life of Sri Ramakrishna : Advaita Ashrama, Kolkata, 1964, p-371

যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। ছোকরারা শুদ্ধ আধার! কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেকদিন ধরে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁটলে রসুনের গন্ধ হয়। যেমন কাকে ঠোকরানো আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ। নতুন হাঁড়ি আর দৈ পাতা হাঁড়ি। দৈ পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়। প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়।"[১৫]

গিরিশ ঘোষ পরে এই কথা শুনতে পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'রসুনের গন্ধ' চলে যাবে কি না। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন, জ্বলন্ত আগুনে রসুনের বাটি পোড়ালে ঐ গন্ধ চলে যায়। মানুষ একবার সহজ-প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেলে তার পক্ষে ঐ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভে চেষ্টিত হওয়ার মতো সময় আর থাকে না। জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করে দুঃখ ও বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করাই যদি তোমার জীবনের আদর্শ হয়, তবে এখনই সে কাজ শুরু করা ভাল।

আর ভাব, যদি কেউ ভগবান লাভের পূর্বেই দেহ ত্যাগ করে? গীতার সেই শ্লোকটি স্মরণ কর যাতে বলা হয়েছে ঃ "এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।"[১৬] যারা আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছে, যারা ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমস্ত কিছু সমর্পণ করেছে তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই। ইহজন্মে প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করলে, সাধক ঊর্ধ্বতন লোকে গতিলাভ করে সেখানে আধ্যাত্মিক সাধনার ধারা বজায় রাখার সুযোগ পায়। সে সাধনার পথে যতদূর এগিয়েছিল তারপর থেকে আবার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করে। মৃত্যুতে শুধু পরিবেশের পরিবর্তন হয়, কিন্তু আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ ঈশ্বর, সর্বদাই আমাদের মধ্যে থাকে। আমরা যেখানেই থাকি না কেন সেই অনন্ত সব সময় আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। এই ভাবটি আমাদের মধ্যে দৃঢ় হলে মৃত্যুর ভয় আমরা অতিক্রম করতে পারি। আমাদের জীবন বা মৃত্যু কোনটির প্রতি আমাদের আগ্রহ না থাকাই ভাল, অদৃষ্টকে তার পথে চলতে দাও, কিন্তু আমাদের হৃদয় যেন সর্বদা ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিবদ্ধ থাকে। লক্ষ্যের দিকে নির্ভয়ে ও দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।

যতক্ষণ নিদ্রা না আসে, যতক্ষণ মৃত্যু না আসে, ততক্ষণ বেদান্তের ভাবে নিজেকে আবিষ্ট রাখ।[১৭]

---

১৫ *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন, অখণ্ড সং, ৯ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃঃ ৭৫০

১৬ 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।' *গী*—২/৪০

১৭ 'আসুপ্তেঃ আমৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদান্তচিন্তয়া।।' —*সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ*, আপ্পাইয়া দীক্ষিত ১ম অং, পরিসংখ্যাবিধি-বিচার

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# জ্ঞানাতীত ভাবোপলব্ধির আদর্শ

### আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কেন আমাদের প্রয়োজন?

আমরা গভীর ভাবে নিজেদের দিকে তাকালে আশ্চর্যের সঙ্গে দেখব যে, আমাদের নিজেদের প্রতি, যে জগতে আমরা বাস করি সেই জগতের প্রতি এবং যাদের সঙ্গে মিশছি তাদের প্রতি আমরা একটা তীব্র অসন্তোষের ভাব পোষণ করি। এই অসন্তোষ আমাদের মধ্যে এক প্রকার মানসিক সংঘাত ও চাপ সৃষ্টি করে— এবং তা বর্তমান বিশ্বে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অস্বাভাবিক মানসিক সংঘাত ও চাপ আমাদের মন ও শরীরকে অসুস্থ করে তোলে। এর কারণ যাই হোক, আমাদের এই বাহ্যিক জীবনযাপন প্রণালী থেকে উদ্ভূত অসন্তোষের ফলেই এই মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা ঘটে থাকে। আমাদের জীবন তখন অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন বলেই মনে হয়। যখন আমরা নিজেদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ি, তখন অন্যদের মধ্যেও শান্তির পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করে বসি। শারীরিক রোগের মতো মানসিক রোগও সংক্রামক হতে পারে।

আমরা হয়তো সঠিক কর্মই পেয়েছি, কিন্তু ঐ কর্ম সম্পাদনে আমাদের ভুল মানসিকতা এনে ফেলি। সেক্ষেত্রে ঐ কর্মের প্রতি আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে আমরা যে কর্ম করছি তা আমাদের বিশেষ প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারল না। এর ফলে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং এই হতাশা থেকে উদ্ভূত হয় অদ্ভুত ও অনেক সময় ক্ষতিকর মনোভাব। হয়তো আমরা খুব বেশি অন্যের উপর নির্ভর করি। অথবা আমরা ভাবি যে, আমাদের চারপাশেই বুঝি শত্রুতা চলছে এবং ঐ কাল্পনিক শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের শক্তি ক্ষয় করি। হয়তো আমরা নিজেদের অন্যান্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি এবং নিজেদের সম্বন্ধে বিরাট এক ভাবমূর্তি গড়ে তুলে মূর্খের স্বর্গে বাস করি। মানসিক রোগের সব থেকে খারাপ লক্ষণ হলো নিজেদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করা। আর তখনই জীবন হয়ে পড়ে দ্বিগুণ পরিমাণ শোচনীয়।

এর প্রতিকার কি? এসব বিষয়ে আমরা কি করতে পারি? বিচক্ষণ

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, সার্থক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য কোন আদর্শ গ্রহণ করতে পারার পূর্বে আমাদের নিজেদের স্বভাব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করে নেওয়া দরকার। নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তন করতে পারলে আমরা নিজেদেরও পরিবর্তন করতে পারি। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই আসে আমাদের শক্তি প্রয়োগের সার্থক পথ খুঁজে পাবার পূর্বেই। আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা কি ভাবে বদলানো যায়? মনোবিজ্ঞানী বলেন যে, মনঃ সমীক্ষণের দ্বারা এই ধারণার পরিবর্তন সম্ভব। অবশ্য এর জন্য আমাদের মনোবিজ্ঞানীর কাছে পরীক্ষা দেবার জন্য সম্মত হতে হবে। বুদ্ধিগম্য প্রশ্নের মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানী আমাদের ব্যক্তিত্বের গভীরতা বুঝতে চেষ্টা করতে পারেন। আমাদের অজ্ঞাত মানসিক জটিলতা জানতে পেরে আমাদের বলে দিতে পারেন কার্যত আমাদের ভুল কোথায়। বিচারের দিক থেকে এই পদ্ধতি নির্ভুল মনে হয় এবং অনেকে মনঃসমীক্ষণের দ্বারা বাস্তবিক কিছু না কিছু উপকারও পেয়েছেন। কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা হলো—মনোবিজ্ঞানীর নিজের সম্বন্ধে সাধারণত খুব ভাসা ভাসা যে জ্ঞান থাকে তারই ওপর নির্ভর করে তার অপরের সম্বন্ধে জ্ঞান।

সমস্ত গবেষণালব্ধ জ্ঞান আয়ত্ত করেও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীরা মানব মনের গভীরতা নির্ণয় করতে পারেননি। অবশ্য নিঃসন্দেহে তাঁরা একথা জেনেছেন যে, মানুষের চেতন মন এক বিশাল অচেতন মনের অধীন এবং আচরণের ক্ষেত্রে চেতন ও অচেতন মন প্রায়ই পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। চেতন মনের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে কিন্তু অচেতন মন নিম্নতর লালসায় পূর্ণ হতে পারে। অচেতন মনের ক্রিয়াসকল চেতন মনের কর্ম ও চিন্তার বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন তা হলো মানুষের চেতন ও অচেতন মনের সংহতির সন্তোষজনক উপায় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী তাঁদের রোগীদের বলেন তাঁরা যেন নিজেদের অচেতন মনের চাহিদা পূরণ করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এতে মনের গভীরতর চাপ কমে যেতে পারে। কিন্তু এটা কোন স্থায়ী সমাধান নাও হতে পারে, বরং এর ফল পরে আরও মারাত্মক হতে পারে।

এখানেই হিন্দু যোগের কথা এসে পড়ে। যোগের শুরু হলো প্রথমেই অচেতন মনের শুদ্ধিকরণ ও পরে চেতন মনের সঙ্গে তার সংগতিসাধন। শুদ্ধিকরণ ব্যাপারটা কৃত্রিম কোন কিছু নয়। পবিত্রতাই হলো আমাদের প্রকৃত স্বভাব। মানবাত্মার এটাই সত্য স্বরূপ। হিন্দুধর্ম বহুকাল পূর্বেই মানুষের ব্যক্তিত্বের এক উচ্চতর সত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন যাকে বলা হয় জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা। এই তুরীয় অবস্থার

মাধ্যমেই আমাদের উচ্চতর আত্মার স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। এ থেকেই আত্মজ্যোতি প্রতিফলিত হয়। এ জ্ঞানালোকের দ্বারা অচেতন মনের গহন গভীর কন্দর আলোকিত করে তুলতে হবে। আর তখনই অচেতন মনের শুদ্ধি সম্ভব হবে। আর তখনই চেতন মন ও তার ঐকান্তিক এষণার সঙ্গে এর সহযোগিতা গড়ে উঠে, তখন মনের এই বিভাজন, দ্বন্দ্ব ও মানসিক চাপ লুপ্ত হয়ে যায়। অন্তরের শান্তি ও সমন্বয় অর্জনের জন্য মনের তুরীয় অবস্থার সন্ধান অত্যন্ত জরুরী। জ্ঞানাতীত তুরীয় অবস্থার সন্ধান লাভই হলো প্রথম আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই অবস্থা লাভের ফলে অচেতন মনের সঙ্গে চেতন মনের সংহতি সম্ভব হয়। আর আমরা ফিরে পাই আমাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও অখণ্ড সত্তা।

আধ্যাত্মিক অনুভূতি শুধু যে আমাদের জ্ঞানাতীত অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করে তা নয়, অচেতন মনের সমস্যাগুলিরও সমাধান করে। আমাদের কতকগুলি মানসিক জটিলতা অচেতন মনের বিকৃতি থেকেই হয়। অনেকের মধ্যে বিশেষত প্রথম যৌবনে কামই দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে। কিন্তু তা বলে মানুষের জীবনে এর স্থানকে খুব বড় করে দেখাটা ভুল হবে, যেমন ফ্রয়েড (Freud) দেখতেন। কিছু মানুষের মধ্যে দেখা যায় অন্যদের উপর আধিপত্য করার জন্য আগ্রাসী মনোভাব, যা দ্বন্দ্বের আরেকটি কারণ বলে স্বীকৃত। কিন্তু এর ক্রিয়াকে অতিরঞ্জিত করে দেখলে এবং মানুষের সকল দুঃখের জন্য একে দায়ী করলে ভুল করা হবে। ডঃ অ্যাডলার (Dr. Adler)-এর মনোবিদ্যা সংক্রান্ত চিন্তাধারায় তাই হয়েছে। দীর্ঘকাল তথাকথিত জড়বাদী পাশ্চাত্য দেশে থাকায় আমি ওদেশে অনেক মানুষ দেখেছি যারা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক। তাদের সমস্যাগুলি ছিল মূলত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। সাধারণ জীবনের ভোগসুখে তারা ক্লান্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গতানুগতিক নিয়ম কানুনেও বিরক্ত। তারা জীবনে পেতে চাইছেন উচ্চতর অনুভূতি ও উচ্চতর সত্তা।

জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন আছে বলে বহু পূর্বেই যাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডঃ কার্ল জঙ্ (Dr. Carl Jung)-এর মতো মনোবিজ্ঞানী। তিনি উল্লেখ করলেন যে, আধুনিক মানুষ নিজের আত্মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তবে তাঁর লেখা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ডঃ জঙ্ (Dr. Jung) নিজের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। সুইজারল্যাণ্ডে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার কয়েকটি বই তাঁকে উপহারস্বরূপ দিয়ে আসি। অচেতন মনের বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। তাঁর মতে হিন্দুধর্মের জ্ঞানাতীত অবস্থা অচেতন মনেরই অন্তর্গত। এ একটি অদ্ভুত মতবাদ। আসলে ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। সাধারণত আমরা মনে করি যে দেহ হলো

স্থূল বাহ্যতম আবরণ। দেহের অভ্যন্তরে মন আর মনের মধ্যে আত্মার স্তরটি বিরাজ করে। এই ক্রম আমাদের উল্টো করে দেখতে হবে। আত্মা হলো অনন্ত ও সর্বব্যাপী চৈতন্য সত্তা। মন তার ভিতরে। তারও ভিতরে স্থূল জড় দেহ, যা সীমিত আধারবিশিষ্ট এবং যাতে চৈতন্যের প্রকাশও যৎসামান্য।

জ্ঞানাতীত অবস্থা সম্বন্ধে আপাতত আমরা কিছু জানি না, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এই অবস্থা মনোবিজ্ঞানীদের অচেতন মনের মতো। আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারাই এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, যা আত্যন্তিক শান্তি ও চরম আনন্দের উৎস। সর্বোপরি এই অবস্থায় মানব পূর্ণতা ও পরম চরিতার্থতা বোধ করে।

ডঃ জঙ্ (Dr. Jung) মানুষকে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দেখার জন্য খ্যাত। অন্তর্মুখী মানুষ কেবল চিন্তা করতে ও আত্মসমালোচনা নিয়ে থাকতে ভালবাসে। তিনি নিজের মনের মধ্যে এক ভাব-জগতে বাস করেন। বহির্মুখী মানুষের বৈশিষ্ট্য তাঁর বহিঃপ্রকাশে। তিনি বাহ্য জগতের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কাছে কর্মময় বৈষয়িক জগৎই সত্য। এই দুই শ্রেণীর মানসিকতা পরস্পর স্বতন্ত্র নয়। উভয় শ্রেণীকেই আমাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। বেদান্ত শাস্ত্রে *কর্মযোগী, ভক্ত* ও *জ্ঞানীর* কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এঁরা পরস্পর একেবারে স্বতন্ত্র তা নন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অল্প বিস্তর এই তিন শ্রেণীর গুণ বিদ্যমান। আমাদের মনে এই বিভিন্ন ভাবের সার্থক সমন্বয় সাধন করতে হবে। অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের স্বভাবের নানাভাবের সমন্বয় সাধন ও সংহতি করা যায়। পরিশেষে গুণগত উৎকর্ষে এদের অতিক্রমও করা সম্ভব হয়। এইভাবে আমরা উদ্দীপনার সঙ্গে কর্ম করতে পারি, উচ্চতর আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান এবং চিন্তায় ও কাজে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারি। কিন্তু এই কার্যসাধনের শক্তিরূপে চাই আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ঐকান্তিক এষণা।

রিলিজ ফ্রম নার্ভাস টেনশন্ (Release from Nervous Tension) গ্রন্থে লেখক ডঃ ফাঙ্ক (Dr. Fink) শরীর মনের ক্লান্তি হ্রাস করবার জন্য একটি ইতিবাচক উপদেশ দিয়েছেন।[১] তিনি বলেছেন, প্রথমে মাথা ও ঘাড় শিথিল করতে শেখ, পরে হাঁটু ও পা, তারপর বুক, হাত, চোখের পাতা, এইভাবে সমস্ত শরীরকে শিথিল করার অভ্যাস আয়ত্ত কর। ঠিকমত অনুশীলন করতে পারলে এইভাবে একটি একটি করে অঙ্গকে শিথিল করলে কিছু সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের আচার্যগণ বলেন যে, আত্ম-বিশ্লেষণ ও ধ্যানের সাহায্যে আমরা আমাদের

---

১ ডেভিড হ্যারল্ড ফাঙ্ক (David Harold Fink), *Release from Nervous Tension* (New York : Simon & Schuster, 1943, pp.67-72)

সমগ্র ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করতে পারি। শরীর মনের ক্লান্তি দূর করার জন্য শরীরের এক একটি অঙ্গকে শিথিল করা অপেক্ষা এই উপায়ে অনেক বেশি কার্যকর ও স্থায়ী ফল লাভ করা যায়।

কেন আমরা শরীরের একটি একটি অঙ্গ ধরে কষ্টকর পদ্ধতিতে আমাদের কষ্টের লাঘব করব, যখন উপযুক্ত শিক্ষা পেলে আমরা মনকে বশে এনে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করতে পারি, যা আমাদের সকল কষ্ট থেকে একেবারেই রেহাই দেয়। এক কৃপণের গল্প আমার মনে পড়ছে। সে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। একজন পুরোহিত তাকে বাঁচাতে এলেন। পুরোহিত ছিলেন লোভী; তিনি কৃপণের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে এক একটি করে বাঁচাতে মনস্থ করলেন এবং অমঙ্গল থেকে উদ্ধার করা প্রত্যেক অঙ্গের জন্য কিছু কিছু পারিশ্রমিক চাইলেন। সব শেষে তার ডান পায়ের কাছে এসে পুরোহিত ভাবলেন, "এবার আমাকে অনেক বেশি টাকা চাইতে হবে কেন না এখন তো সে আমাদের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।" তিনি তাই কৃপণকে জোর গলায় বললেন, "এবার তোমার ডান পায়ের জন্য আমাকে অনেক বেশি দক্ষিণা দিতে হবে।" এই মুমূর্ষু মানুষটির মনটি ছিল বেশ হিসেবি, সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে জানাল, "কিন্তু গুরুদেব, ওটা তো কাঠের পা।" একটু একটু করে মানুষকে ত্রাণ করার ব্যাপারে ধর্মতত্ত্ববিদগণ যাই বলুন না কেন, প্রকৃত আধ্যাত্মিক গুরুর কিন্তু মুক্তির জন্য অনেক বেশি ফলপ্রদ উপায় জানা আছে। জীবাত্মার মুক্তির এই হলো আদর্শ, যা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে লাভ হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের রূপান্তর সাধন করে। পরম শান্তি ও আনন্দে জীবাত্মা পূর্ণ হয়ে যায় এবং দেহ-মনের সকল ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়।

## অনুভূতি—অপরোক্ষ ও পরোক্ষ

ধর্মের যথার্থ সংস্কৃত প্রতিশব্দ হলো *'দর্শন'*। এই *'দর্শন'* শব্দটির দুটি অর্থ। এক অর্থ দর্শন বা অনুভূতি। যে পথে বা সাধনায় এই অনুভূতি লাভ করা যায়, তাও এর অপর একটি অর্থ। ধর্ম বলতে এদের উভয়কেই বুঝতে হবে। 'দর্শনের' অর্থ আবার দর্শনশাস্ত্রও হতে পারে। হিন্দু ধর্মে যে ছয় প্রকার দর্শনশাস্ত্র আছে তাদেরও *'দর্শন'* বলা হয়।

হিন্দুধর্মে ধর্ম ও দর্শন অবিচ্ছেদ্য ও সমার্থক। সত্যের ভাবোপলব্ধি উভয়েরই লক্ষ্য, এরা একে অপরের পরিপূরক। অধ্যাপক মোক্ষমূলার (Prof. Max Muller) যথার্থই বলেছেন, একমাত্র ভারতেই ধর্ম ও দর্শন এক সমন্বয়ের রূপ নিয়েছে; ধর্ম

যেমন দর্শনশাস্ত্রের উদার প্রজ্ঞা লাভ করেছে, দর্শনশাস্ত্রও তেমনি ধর্মের কাছ থেকে পেয়েছে আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম হলো দর্শনশাস্ত্রের কার্যে পরিণত রূপ এবং দর্শনশাস্ত্র ধর্মের যুক্তিবাদী বিন্যাস। হিন্দু দার্শনিকেরা মুখ্যত আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তাই তাঁদের দর্শন পদ্ধতিগুলির ভিত্তি তুরীয় অবস্থার অভিজ্ঞতার উপর। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত যে কোন পদ্ধতি মেনে চললে ঐ এক লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

জীবনে ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের মধ্যে চলে নিরন্তর প্রভাব বিনিময়। ব্যক্তিত্বের যেমন বিভিন্ন স্তর আছে, পরিবেশেরও তেমনি বিভিন্ন স্তর আছে। জড় শরীরের সঙ্গে জড় জগতের সংস্পর্শ আছে। তেমনি মনোময় শরীরের সঙ্গে মনোজগতের এবং অধ্যাত্ম শরীর বা জীবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার বা ঈশ্বরের সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন স্তর থেকেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। আমরা যখন যে স্তরে বা যে জগতে বাস করি তখন সেই স্তরের অভিজ্ঞতাকেই সত্য বলে মনে করি। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা যা কিছু দেখি শুনি তা আমাদের মনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত করে রাখে। স্বপ্নাবস্থায় আমরা যা দেখি স্বপ্ন চলা কালে আমাদের কাছে তা সত্য বলে মনে হয়। এ সবই অনুভূতি বা *দর্শন*, সেই কারণেই সেগুলিকে যে সত্য হতে হবেই এমন নয়। তাই সমস্যা হচ্ছে ভ্রান্ত ও যথার্থ অনুভূতির পার্থক্য নির্ণয় করা। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বৈধ অনুভূতির বিচারের আদর্শ কি হবে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। জড় বিজ্ঞানী বস্তুজগতে নিহিত সত্যের সন্ধানে আগ্রহী। তিনিও যে সকল ঘটনা অনুভব করেন তা পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা যাচাই করেন। মনোবিজ্ঞানীরও নিজস্ব *দর্শন* আছে। তিনি অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে চিন্তাধারা যে নিয়মে চলে তা প্রকাশ করতে সমর্থ হন। অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু চান ঈশ্বর বা চরম সত্যকে সরাসরি অনুভব করতে, একেই বলে *অপরোক্ষানুভূতি*।

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির বিষয় আমরা অত্যধিক চিন্তা করি। আমরা মনে করি এই বাহ্য জগৎকে প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করছি। তা কখনই নয়। বাইরের বস্তু থেকে উদ্দীপনা আসে আমাদের চোখে। সেখান থেকে খবর বাহিত হয় মনে, শেষে আত্মায়, যিনি হলেন প্রকৃত জ্ঞাতা। কত দূর এক পরোক্ষ পদ্ধতি! অথচ একেই আমরা অপরোক্ষ অনুভূতি বলে ধরে নিতে অভ্যস্ত। প্রকৃত সরাসরি অনুভূতি বা *অপরোক্ষানুভূতিতে* সত্য সরাসরি প্রকাশ পায় আত্মজ্যোতিতে। এই অন্তর্জ্যোতি মন ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হন। ইনি স্বয়ং-প্রকাশও বটে। এটাই জ্ঞানাতীত অবস্থা। কখনো একে *তুরীয়* অবস্থা বলেও অভিহিত করা হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা সাধারণত *জাগ্রৎ, স্বপ্ন* ও *সুষুপ্তি*—এই তিন অবস্থার জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ হয়।

এই তিন অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, চতুর্থ অবস্থা একটি আছে, যাকে বলা হয় *তুরীয়*। অন্য তিন অবস্থার মতো এটি অবশ্য একটি অবস্থা নয়। এ হলো অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বা চৈতন্য স্বরূপ! এই চৈতন্যের আংশিক প্রকাশ ঘটে অন্য তিন অবস্থায়। ঐ অবস্থায় জীবাত্মার উপলব্ধি হয় যে, সে পরমাত্মারই অংশ।

## পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট নয়

বই পড়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রয়াসী হওয়া উচিত নয়। তথ্য জানবার জন্য আমাদের পড়ার প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানতে হবে যে, কোন্ ভাবাদর্শগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং কোন্‌গুলি বর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতির কথা নানা ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা পড়তে পারি কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি আমাদের পক্ষে কল্যাণকর তা পূর্বেই জেনে না নিয়ে ঐ সকল গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হওয়া উচিত নয়। আমরা নানা পথ ও উপায়ের কথা জানতে পারি, যা আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসার করে, কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের জানতে হবে যে, কোন্ পথটি আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার দিকটাকে সাধারণত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল বলা যায়। এই সময়ে আমাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে এবং আমাদের শরীর ও মনে কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা লক্ষ্য করে সেই মতো আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

অযোগ্য ব্যক্তি নির্ভুল সাধনপ্রণালী অনুসরণ করলেও তার ফল ভাল হয় না। সেইজন্য ধর্মপিপাসুকে ঠিকমতো যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে কেউ যে কোন বই সংগ্রহ করে তার থেকে কিছু সাধন প্রণালীর কথা পড়ে সেইমতো সাধনা শুরু করে দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে। সাধনায় এক একজন মানুষের এক এক রকম নির্দেশ প্রয়োজন। একজনের খাদ্য অপরজনের কাছে বিষবৎ হতে পারে। প্রত্যেকেরই প্রয়োজন নিজ নিজ মানসিকতা অনুযায়ী পথ বেছে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অনুসারে নিজেকে সাধনার অনুকূল অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা। মজবুত ভিতের ওপর অট্টালিকা তৈরি হলে তা বেশ খাড়া থাকে, অন্যথায় ভেঙে পড়ে।

সাধারণত আমাদের ভালবাসা সত্যের প্রতি নয়, কোন বস্তুর মাধ্যমে আমরা নিজেদেরই ভালবাসি। আমাদের কোন একটি ভাব ভাল লাগে, কারণ ঐটি আমাদের ভাব, ভাবটি সত্যকে প্রকাশ করছে বলে নয়। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

"যে মনে করে ব্রহ্মকে জানি না বস্তুত সেই তাঁকে জানে; আর যে মনে করে ব্রহ্মকে জানি সে তাঁকে জানে না।"[২]

ঈশ্বর নিজ মহিমা তাঁর প্রকৃত ও অনন্যমনা ভক্তের কাছে প্রকাশ করেন। ভক্তের কাজ হবে ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তের সঙ্গে, ঐকতান অনুভব করা, আর তখনই তিনি ভক্তের কাছে নিজের মহিমা প্রকাশ করেন। ভক্ত যেমন ঈশ্বরের কাছে যেতে চান ঈশ্বরও তেমনি সর্বদা ভক্তের কাছে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব।

প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বৌদ্ধিক অনুসন্ধান সত্যের স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে না। তুমি যদি বুদ্ধির সাহায্যে সকল বিষয়ের মূল কারণ জানতে চেষ্টা চালিয়ে যাও তবে দেখবে যে, এটা জানা সম্ভবপর নয়। এই জগৎপ্রপঞ্চ ভেদ করে সত্য উপলব্ধি করতে প্রয়োজন সূক্ষ্মতর ও গূঢ়তর সাধনপদ্ধতি। শরীর, মন ও সকল বস্তু সম্বলিত এই জগৎপ্রপঞ্চ বেশ এক মজার ব্যাপার—এসবের মধ্যে কোন অর্থ নেই, অন্তত আমাদের কাছে তো তাই প্রতীয়মান হয়। যিনি নিরাকার তাঁর আবার সাকার হওয়ার কি প্রয়োজন? এসব কোন ছন্দ বা কারণ ছাড়া বলেই মনে হয়, যেহেতু সত্য যুক্তিবাদের অতীত। মায়ার এই বহুমুখী বিচিত্র খেলার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এই পরিবর্তনশীল জগতে থেকে কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এই সৃষ্টিকে খ্রীস্টানদের মতো ঈশ্বরের ইচ্ছা বা হিন্দুদের মতো ঈশ্বরের লীলা বা খেয়াল বা খেলা যাই বলা হোক না কেন, এই অনিত্য জগতে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। এর ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, তবে একে অতিক্রম করা সম্ভব।

প্রত্যেক বস্তুরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো *অপরোক্ষানুভূতি*। যদি একান্তই ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে থাকে তবে তাঁকে অবশ্যই দর্শন এবং উপলব্ধি করা সম্ভব। শুধু তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেই হবে না। যাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন তাঁদের কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের অনুভূত সত্যকে আমাদের জীবনে পরীক্ষা করে নিতে হবে। শুধু বিশ্বাস থাকলেই চলবে না যদিও সাধনার প্রথম দিকে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। রাজযোগের ভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন ঃ

"যদি জগতে জ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয়ে কেউ কখন একটা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন, তা হলে আমরা এই সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পূর্বেও কোটি কোটি বার ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করার সম্ভাবনা ছিল, পরেও

---

২ *যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।*
*অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌ ।। কেন.উ.-২/৩*

অনন্তকাল ধরে বার বার ঐরূপ সম্ভাবনা থাকবে। ... যোগবিদ্যার আচার্যগণ তাই বলেন, 'ধর্ম কোন পূর্বকালীন অনুভূতির ওপর স্থাপিত নয়, পরন্তু স্বয়ং এই সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হলে কেউই ধার্মিক হতে পারে না'।"[৫]

ঈশ্বরানুভূতির এই হলো আদর্শ এবং এই আদর্শকেই আমাদের ধরে রাখতে হবে।

## জ্ঞানাতীত অনুভূতির স্তর

ইন্দ্রিয় সুখের মাধ্যমে যে উল্লাস আমাদের হয় তা পরিণামে দুঃখ নিয়ে আসে। প্রথমে এটা অমৃতের মতো মনে হয় কিন্তু পরিশেষে তা ব্যর্থতা ও নিরাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৬] বুদ্ধিজাত সুখ অবশ্য এর থেকে উঁচুস্তরের, কিন্তু এর দ্বারাও আমরা চরম সন্তুষ্টি বা পূর্ণতা লাভ করতে পারি না। আমরা যখন ধ্যান করি বা ঈশ্বরের নাম কীর্তন করি তখন অন্তরে এক আনন্দের আস্বাদ পাই। এই সুখ বেশ ভালই, তবে দীর্ঘস্থায়ী না হতেও পারে। কিন্তু জ্ঞানাতীত অবস্থায় সাধক যে দিব্যানন্দ লাভ করে তা চিরস্থায়ী। এই হলো প্রকৃত আনন্দ। আনন্দের অন্যান্য স্তরগুলি এর ছায়ামাত্র। সাধকের আধ্যাত্মিক অনুভূতি যদি পূর্ণ নাও হয়ে থাকে এবং সে যদি জ্ঞানাতীত অবস্থার দোরগোড়া পর্যন্তও যেতে পারে, তাহলে ঐ অবস্থায় একবার যে পরমানন্দের অনুভূতি তার হয় তার রেশ কিন্তু মিলিয়ে যায় না এবং ঐ আনন্দের রেশ তাকে আরো কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে উদ্বুদ্ধ করে যাতে সে জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করে পরমানন্দের অধিকারী হতে পারে।

জ্ঞানাতীত অনুভূতি সব ধর্মের মূল। জ্ঞানাতীত অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভেই ছুতোরের ছেলে যীশু আজ কোটি কোটি মানুষের কাছে প্রভু রূপে আরাধিত হচ্ছেন; এটাই এক দরিদ্র উট-চালক মহম্মদকে ইসলাম ধর্মের পয়গম্বরে রূপায়িত করেছিল। মহাপণ্ডিত নৈয়ায়িক নিমাই এরই জন্য রূপান্তরিত হলেন ভগবৎপ্রেমের বার্তাবাহক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে। বর্তমানকালে আমরা দেখি কলকাতার এক মন্দিরের দরিদ্র পূজারী গদাধর চট্টোপাধ্যায় এই জ্ঞানাতীত অনুভূতি লাভ করে রূপায়িত হলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে। অবশ্যই এঁরা সাধারণ লোক ছিলেন না।

আমাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরের কথা শুনেছি কিন্তু *ঈশ্বর* শব্দটির প্রকৃত অর্থ আমরা জানি না। আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা কোন কোন মানুষ সামান্য ঐশ্বরিক

---

৫ *বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন, ১ম সং, ১৯৬৩, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩

৬ *বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।*
*পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥* গীতা—১৮/৩৮

রূপ দর্শন লাভ করে থাকেন, কিন্তু আবার এমন অনেকেই আছেন যাঁরা এই ক্ষণিকের দর্শনে তৃপ্ত হন না। তাই তাঁরা অন্তরের গভীরে ডুব দেন এবং ঈশ্বরকে সকল আত্মার আত্মা পরমাত্মারূপে দর্শন করেন। জীবাত্মা যেমন দেহমন্দিরে বাস করেন, ঈশ্বর তেমনি সকল জীবের অন্তরে নির্লিপ্ত ভাবে কিন্তু সর্বনিয়ন্তা রূপে বাস করেন। ঈশ্বর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েও সর্বাতীত। ভক্ত ভগবানের সঙ্গে নানা ভাবের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাঁর সঙ্গে ঐভাবে যুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন। আমরা যখন বলি, ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে প্রভু, সখা, মাতা বা প্রেমাস্পদ ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেন, তখন তাকে স্থূল অর্থে বুঝবার চেষ্টা করলে ভুল হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ধর্ম হলো অনন্ত আত্মা ও অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত সম্বন্ধ।"[৫] মানবিক সম্পর্কের বিচারেই এই ভাব আরোপিত হয়।

তবে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা এই ভাবজগতের অতীত অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন। তাঁরা সকল সত্তার সঙ্গে ব্রহ্মে একীভবন অনুভব করেন। আত্মা তখন পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়, আর '*একমেবাদ্বিতীয়ম্*'ই শুধু অবস্থান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে এটা বুঝিয়েছেন, "একটা লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খপর কে দিবেক?"[৬] অপরোক্ষ জ্ঞানাতীত অনুভূতি যাঁর হয়েছে, তাঁকে বলা হয় *ঋষি* বা দ্রষ্টাপুরুষ। প্রত্যেকেই এক এক ধরনের দ্রষ্টা। যাঁর ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি হয়েছে তিনি একজন দ্রষ্টা। যাঁর দূরের গ্রহ ও নক্ষত্রের বোধ হয়েছে তিনি একজন দ্রষ্টা। যিনি অন্যের মনের গতি প্রকৃতি জানতে পারেন তিনিও একজন দ্রষ্টা। যিনি চিন্তা জগতের ও মানবের মনন ক্রিয়ার নিয়ম জেনেছেন তিনিও দ্রষ্টা। তবে এ সবের থেকে স্বতন্ত্রভাবে ঋষি শব্দের ব্যবহার হয় তাঁর সম্বন্ধে যিনি স্বতই জ্ঞানাতীত সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। এই সত্যজ্ঞান বা স্বজ্ঞাশক্তিকে ভগবদ্‌গীতায় 'দিব্য-চক্ষু' বলেছে; তা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।[৭]

## অবিদ্যা ও তার পরাজয়

অচিরে আমাদের এই 'দিব্য চক্ষু' উন্মেষের পথে বাধাটা কি? বেদান্তের আচার্যগণ বলেন অজ্ঞান বা অবিদ্যাই হলো এর বাধা। পতঞ্জলিও অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কথা বলেছেন, যা মেঘের মতো ঢেকে রেখেছে আমাদের দৃষ্টিকে, তাই পুরুষ বা আত্মার দর্শন সম্ভব হয় না। যোগসূত্রে (২.৫) আমরা পাই, অনিত্য,

৫ পূর্বোক্ত '*বাণী ও রচনা*', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০

৬ পূর্বোক্ত '*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*', পৃঃ ৯৯

৭ দ্রঃ—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ১১/৮

অপবিত্র, দুঃখকর ও আত্মা-ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মা বলে ভ্রম হয়, তাকে 'অবিদ্যা' বলে।[৮] অবিদ্যাজনিত প্রমত্ততায় সত্যকে কাল্পনিক মিথ্যার থেকে অপকৃষ্ট বলে বোধ হয়।

একটি গল্পে আছে, এক মাতালকে ক্রমাগত চিৎকার করতে করতে প্রচণ্ড বেগে এক 'ল্যাম্প-পোস্টের' উপরে উঠতে দেখা যায়। পুলিশ স্বভাবতই তাকে গ্রেপ্তার করে টানতে টানতে বিচারকের কাছে নিয়ে যায়। বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি ব্যাপার?' মাতাল বলল, ''মহাশয়, আমার আর কি করার ছিল? তিন তিনটি কুমির আমাকে তাড়া করেছিল, তাই ল্যাম্প-পোস্টে উঠে আমি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।'' শহরের রাস্তায় কুমির! অথচ নেশার ঘোরে সে ঠিক তাই দেখেছিল। অবিদ্যার ঘোরে আমরাও এমন বহু জিনিস দেখি যার আদপে কোন অস্তিত্ব নেই।

আমাদের পরের প্রশ্ন হলো, কিভাবে এই অবিদ্যাকে অতিক্রম করে জ্ঞানাতীত অনুভূতি লাভ করা যায়? অবিদ্যাকে অবিদ্যা রূপে জানা যায় না। অবিদ্যা নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। প্রথমেই আসে অহঙ্কার যা প্রকৃত আত্মাকে ঢেকে রাখে। এরপর আসে আসক্তি বা বাসনা। এরা বাধা পেলে ক্রোধ ও ভীতির সঞ্চার হয়। অবিদ্যা বা অজ্ঞান, অহংবোধ ও সহজাত প্রবৃত্তির কারণে মানুষ এই জগতে বদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিগণ বিবিধ মানসিক জটিলতার কথা বলে থাকেন। একটি শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে মনের তিন প্রকার জটিলতা দেখা যায় : কামজ, অহংকারজ ও গোষ্ঠীবোধজ। এই সকল মানসিক জটিলতার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার উপায় না জানলে আধ্যাত্মিক জীবন শুরুই হয় না। একেই বলে আধ্যাত্মিক জীবনের সংগ্রাম। একদিনেই প্রবৃত্তির প্রভাব মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আমরাই আমাদের বন্ধনের কারণ; আমরা নিজেদের মনের মধ্যে যে সকল বাধা সৃষ্টি করি তার তুলনায় বাইরের বাধা তো কিছুই নয়। তাই আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ঢেলে সাজাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? বিশ্বের নানা ধর্মের মরমিয়া সাধকগণ আমাদের জন্য কয়েকটি পথের সন্ধান দিয়েছেন।

## মরমিয়া সাধকদের পথ

ঈশ্বর বা পরমাত্মা যে নামেই তিনি অভিহিত হন, সেই চরম সত্যকে যিনি স্বজ্ঞায় অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনিই মরমিয়া সাধক। সংস্কৃত ভাষায় তাঁকে বলে ঋষি। বিশ্বের প্রত্যেক মহৎ ধর্মে বহু মরমিয়া সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে।

---

৮ 'অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।' পাতঞ্জল-যোগসূত্র, ২/৫—স্বামী বিবেকানন্দকৃত অনুবাদ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন, ১ম সং, ১৯৬৩, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০

তবে সব ধর্মই তাঁদের মাহাত্ম্য স্বীকার করে না। তার কারণ খ্রীস্ট, ইসলাম, ইহুদি, প্রভৃতি কয়েকটি ধর্মে মুক্তির উপায় রূপে বিশ্বাস ও নৈতিকতার উপর মৌলিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এ সব ধর্মের অনুগামীদের কাছে আশা করা হয় যে, তারা নিজ নিজ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পয়গম্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে চলবেন। প্রত্যেক ধর্মই দাবি করে যে, তার প্রতিষ্ঠাতা পয়গম্বরই শ্রেষ্ঠ এবং যারা এই মত গ্রহণ করবে না তাদের মুক্তি হবে না, অর্থাৎ তাদের নরকে যেতে হবে। এ রকম ভাব থাকলেও এই সব ধর্মে এমন সব অসাধারণ সন্তের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা ঈশ্বরকে অপরোক্ষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। খ্রীস্ট ও ইসলাম ধর্মে মরমিয়া সাধনা বৈধ ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত নয়। তাই বহু খ্রীস্টান মরমিয়া সাধক খ্রীস্টান পাদ্রীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। সপ্তদশ শতকে তথাকথিত শান্ত ভাবে ভগবৎ-ধ্যানের আন্দোলনকে (Quietist Movement) কঠোর হস্তে দমন করা হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে গীর্জার ভিতরে ও বাইরে মরমিয়া সাধনার বিরুদ্ধে এমন জোরালো আন্দোলন হয়েছিল যে, বর্তমান শতকের শুরুতে খ্রীস্ট ধর্মের মরমিয়া সাধনার মহান ধারাটিকে ভুলতেই কেবল বাকি আছে। ইসলাম ধর্মে মরমিয়া সাধনা 'সুফীবাদ' নামে খ্যাত। প্রাচীনপন্থীদের প্রতিরোধ ও ধর্মীয় গোঁড়াদের হিংস্র আচরণের ফলে বহু আগ্রহী ভগবৎ সাধককে অত্যাচার ও মৃত্যু বরণ করতে হলেও ইসলাম ধর্মে বিপুল সংখ্যক সুফীসাধকের আবির্ভাব ঘটে এবং এঁদের মধ্যে কয়েকজন আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

কেবল ভারতেই, বিশেষত হিন্দুধর্মে আমরা দেখতে পাই ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মরমিয়া সাধনার প্রাচুর্য। হিন্দু ধর্মমতে পরমাত্মার অপরোক্ষ দিব্যানুভূতি মুক্তি লাভের পক্ষে অপরিহার্য। দুঃখ ও অবিদ্যার আত্যন্তিক নাশই মুক্তি। যতদিন মানুষের *মুক্তি* বা বন্ধন মুক্তি না হচ্ছে ততদিন তাকে এই সংসারে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং স্বকৃত কর্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করে যেতে হবে। হিন্দুধর্মেই আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভের বিবিধ পথ নিয়ে গভীর মনন করা হয়েছে এবং এগুলিকে একটি বিজ্ঞান বলেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। হিন্দুধর্মে উচ্চতর অপরোক্ষানুভূতি লাভের চারটি পথ দেখানো হয়েছে, এগুলিকে *যোগ* বলা হয়। একে একে আমরা এগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

### কর্ম-যোগ

প্রথমেই কর্ম-যোগের কথা বলতে হয়। এই যোগে কর্মফলে অনাসক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একে বলে নিষ্কাম কর্ম। এরূপ কর্ম যত সহজ বলে মনে হয় আসলে তত সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছা-শক্তি। তবে

কর্মফলে অনাসক্ত হওয়ার সহজতর উপায়ও আছে। তা হলো ঈশ্বরের পাদপদ্মে সকল কর্মের ফল সমর্পণ করে দেওয়া। তোমরা জান, উপনিষদের 'ঈশাবাস্য' শ্লোকটি, "জগতে যা কিছু পরিবর্তনশীল পদার্থ আছে, তা সবই পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হবে।"[৯] এই জগৎ ঈশ্বরের—এই ভাব উপলব্ধি করে সকল প্রকার বাসনা ত্যাগ কর। ওল্ড টেস্টামেন্টের ইহুদি সন্ত জব কঠোর পরীক্ষা ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়েও বলেছিলেন, 'ঈশ্বর দিয়েছিলেন এবং তিনিই আবার নিয়ে নিয়েছেন। ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত হোক।'[১০] অনাসক্তি ও আত্মসমর্পণের ফলে মন যখন শুদ্ধ হয়ে ওঠে, আত্মা তখন ধীরে ধীরে অন্তরে প্রকাশিত হতে থাকেন।[১১]

## রাজ-যোগ

এরপর ধ্যানের পথ বা রাজ-যোগ। এতে মূল সংগ্রাম হলো মনে যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা ওঠে তাকে নিরোধ করা ও মনকে উচ্চতর চিন্তার খাতে প্রবাহিত করা। অধিকাংশ মানুষের কাছেই এটি অসম্ভব সাধনা। পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া এই সাধনা প্রচেষ্টায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই এই পথের প্রধান ব্যাখ্যাতা, পতঞ্জলি, একে পর পর কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথমে *যম* ও *নিয়ম* অর্থাৎ সাধারণ ও স্বতন্ত্রভাবে নৈতিক আচরণ। সাধক সর্বদা অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় (অচৌর্য) ও অপরিগ্রহ অভ্যাস করবেন; তিনি স্বাবলম্বী হতে শিখবেন; শুচিতা ও সন্তোষ অভ্যাস করবেন; তত্ত্বগুলি গভীর অধ্যয়ন, মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে আয়ত্ত করবেন; সর্বযোগেশ্বর পরমেশ্বরে সবকিছু সমর্পণ করবেন। ঐ সব আয়ত্ত করার পর সাধক নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে আসন করে বসে শ্বাস-ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ শিখবেন; এর অর্থ বিশ্বশক্তির যে প্রবাহ শরীর ও মনের অভ্যন্তরে চলেছে তার (প্রাণের) নিয়মন করবেন। একেই বলে *প্রাণায়াম*। বেশ কিছু ব্যক্তি এর ওপর অত্যধিক বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলে—এর ভিতর যে সব শক্তি ক্রিয়া করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। ফলে সাধকের সাময়িক অথবা এমনকি চিরস্থায়ী মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। পতঞ্জলি তাই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন-চর্যায় *প্রাণায়ামের* উপর সামান্যই গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজযোগের পরবর্তী সোপান দুটি হলো—বাহ্যবস্তু থেকে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করে কোন একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বে মনকে একাগ্র করে রাখা। এই একাগ্রতা যখন গভীর হয় তখন সাধক নিজেকে পুরুষ বা আত্মারূপে উপলব্ধি করে।

---

৯ 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'—*ঈশোপনিষদ*, ১

১০ *বাইবেল*, জব, ১:২১

১১ পূর্বোক্ত *বাণী ও রচনা*, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১-৬২ ও পৃঃ ১৮৪

## ভক্তি-যোগ

তৃতীয় পথ ভক্তি-যোগ। এখানেও সাধনার প্রয়োজন আছে। এতে ভক্তের সমস্ত উদ্দীপনাকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেবার উপর জোর দিতে বলা হয়েছে। জগতের প্রতি ভালবাসাকে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় পরিণত করতে হবে। ত্যাগের দ্বারা ঘৃণাকে এবং ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের মাধ্যমে ভয়কে জয় করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ মনন চাই। এর জন্য ভক্ত শব্দ-প্রতীক বা *মন্ত্র* জপের সহায়তা নিতে পারেন। মন্ত্র হলো সংক্ষিপ্ত গূঢ় সূত্র। এছাড়া আছে স্তব ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত যা মন্ত্রের থেকে দীর্ঘতর। এসবের সহায়তায় ভক্তকে সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ মনন করতে হবে। পরে ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে সকল বাধা অতিক্রম করে তাঁর দর্শন লাভ করেন।

## জ্ঞান-যোগ

জ্ঞান-যোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখি আত্মোপলব্ধি-সংজ্ঞক দুঃসাহসিক আধ্যাত্মিক অভিযানে অগ্রসর হতে গেলে সাধকের উচ্চস্তরের নৈতিকতার তথা এক উচ্চতর যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। তাঁর আত্ম-সংযম, অনন্ত সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস থাকা চাই; আর চাই মনের একাগ্রতা-সাধনের ক্ষমতা। আরও চাই নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা এবং ইহ ও পরকালের সকল সুখভোগের বাসনা ত্যাগের সামর্থ্য। সবশেষে তাঁর থাকা চাই *মুমুক্ষুত্ব*, সব বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের তীব্র ইচ্ছা। এসব গুণের অধিকারী হওয়া খুব সহজ কথা নয়।

*জ্ঞান* কোন পুঁথিগত বিদ্যা নয়। উপনিষদে দুই প্রকার *বিদ্যার* কথা বলা হয়েছে, অপরা অর্থাৎ নিম্নস্তরের এবং পরা অর্থাৎ উচ্চতর স্তরের বিদ্যা। *অপরাবিদ্যা* লাভ হয় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি ও অনুমানের মাধ্যমে। পুস্তকাদি পাঠ এই বিদ্যার অন্তর্গত। চরম সত্যের বা অক্ষর পুরুষের স্বজ্ঞা অপরোক্ষ অনুভূতিই হচ্ছে *পরাবিদ্যার* বিষয়। জ্ঞান যোগের লক্ষ্যই হলো এই জ্ঞানাতীত অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ—দার্শনিক বিষয়ের চুলচেরা তর্ক বিচারের প্রবণতা নয়, যেমন প্রায়ই দেখা যায়।

প্রথমে আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে গুরুর কাছ থেকে *শ্রবণ* করতে হয় অর্থাৎ পড়ে বা শুনে নিতে হয়। এই সত্যগুলি উপনিষদের চারটি *মহাবাক্যে* সূত্রাকারে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু কেবল শ্রবণ করলেই হবে না, যে সত্যের কথা শোনা হয়েছে সে বিষয়ে গভীর অনুধ্যান চাই, যতদিন না সত্যের স্বরূপ ও তা উপলব্ধি করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রগাঢ় প্রত্যয় জন্মায়। একে বলে *মনন*। প্রায়ই দেখা যায় মানুষ এমনকি সাধারণ বিষয় অধ্যয়ন করেও এ রকম কখনো করে না। একটি গল্প আমার

মনে হচ্ছে। একটি কিশোরী মেয়ে এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়েছিল এবং সে এক বিশিষ্ট জ্যোতির্বেত্তার পাশে গিয়ে বসেছিল। তাঁর সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখে মেয়েটি কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কোন্ পেশায় রত?" তিনি বিনীতভাবে বলেন, "আমি জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন করি।" শুনে মেয়েটি সন্তুষ্ট হলো না, সে ঐ সম্ভ্রান্ত মানুষটির কাছ থেকে আরও ভাল উত্তর আশা করেছিল। মেয়েটি আবার প্রশ্ন করে, "কি! আপনি এত বয়সেও জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ছেন? আমি গত বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ শেষ করেছি।" কয়েকটি বই পাঠ করেই তার জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞানের অর্জন শেষ হয়ে গেছে। *মননের* পর *নিদিধ্যাসন*। এ হলো ধ্যানের উচ্চতর অবস্থা যখন আত্ম-স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভের জন্য জাগে অনুসন্ধিৎসা। বস্তুত এই অবস্থায় *নেতি, নেতি* বা 'এ নয়', 'এ নয়' পদ্ধতিতে সত্যের জন্য গভীরতর অন্তরানুসন্ধান চলতে থাকে।

## যোগের লক্ষ্য

জীবাত্মা মাত্রেই পরমাত্মার সনাতন অংশ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

> *"সংসারে প্রসিদ্ধ জীবাত্মা, আমারই—পরমাত্মারই—সনাতন অংশ; সেটি শরীর গ্রহণ করে শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে।*
>
> *বায়ু যেমন পুষ্পাদি থেকে গন্ধ আহরণ করে তদ্রূপ জীব যখন এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য এক দেহে প্রবেশ করে তখন এইগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যায়।"* [১১]

যতদিন মানুষের অজ্ঞান ও কামনা বাসনা থাকবে ততদিন তাকে জন্মমরণরূপ চক্রের ভিতর দিয়ে বার বার যেতে হবে। এই সংসার-চক্রের অবসান হয় *পরমাত্মার সঙ্গে* জীবাত্মার মিলনে।

একত্ব-জ্ঞান হচ্ছে সকল যোগের লক্ষ্য। তবে মেধার দ্বারা নয় অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। তখনই পরম সত্যের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে কৃতকৃত্য হওয়া যায়। সকল মানুষের জীবনে যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা রয়েছে তাই জীবাত্মাকে অহং, মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্ম বোধ করায়। নিজ প্রকৃত স্বরূপকে শরীর ও মন থেকে পৃথকরূপে উপলব্ধি হলেও অহং-বোধ থেকে

---

১১ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥" গীতা—১৫/৭-৮

নিজেকে মুক্ত করা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ একে অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন অশ্বত্থ গাছ কেটে ফেললেও আবার তাতে ফেঁকড়ি বের হয়।[১৩]

মিথ্যা অহং-বোধকে শুদ্ধ ও আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ করতে হবে। সকল যোগ-মার্গে এটাই হলো প্রধান লক্ষ্য। কর্মযোগে বলা হয় আমাদের সমস্ত কর্মের ফল পরমাত্মায় সমর্পণ করতে এবং কর্মের মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছাকে স্রষ্টার ইচ্ছার সঙ্গে এক সুরে মিলিয়ে নিতে। একই ভাবে রাজযোগেও সমস্ত সাধনাতে দিব্যভাব ও আত্ম-নিবেদনমূলক মনোভাবের আশ্রয় নিতে বলা হয়, সেই সঙ্গে জপ ও ধ্যানের মাধ্যমে সতত অন্তরের শুদ্ধ চেতনাকে ভাস্বরতর করার উপর জোর দিয়ে থাকে। ভক্তিযোগে ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তাঁতে প্রেমাভক্তি ও সেবার ভাব আনতে বলা হয়েছে। এই ভাবে বা যে কোন উপায়ে 'কাঁচা আমি' 'পাকা আমি'তে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে পিতা বা সখা ভাবে ঈশ্বরকে চিন্তা করা দোষের নয়; তবে যখন পৃথক ব্যক্তিসত্তা বা অহং-ভাব ব্রহ্মানুভূতিতে লীন হয়ে যায়, কেবল তখনই সাধক সেই অদ্বয় আত্মার দিব্য আনন্দের অধিকারী হন। জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হলো আত্ম-বিশ্লেষণ ও উপনিষদের 'তৎ ত্বম্ অসি' এই মহাবাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ধ্যান করার মাধ্যমে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একত্ব অনুভূতি লাভ করা।

সকল যোগের মূলকথা হলো *তপস্যা* (অভ্যাস)। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তিনরকম *তপস্যার* কথা বলেছেন, শারীরিক, মানসিক ও বাচিক।[১৪] শৌচ, সাধুতা ও ব্রহ্মচর্য হলো শারীরিক *তপস্যা*। অনুদ্বেগকর, সত্য, হিতকর বাক্য বলা ও বেদাদি শাস্ত্র পাঠকে বাচিক *তপস্যা* বলে। এই নিয়ম মেনে চলতে হলে আমাদের বাক্য ব্যবহারের অভ্যাসকে বিচার করে দেখতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ও হানিকর বাক্য পরিহার করে চলতে হবে। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মৌনভাব, ইন্দ্রিয় সংযম ও হৃদয়ের পবিত্রতা, এই সকলকে মানসিক *তপস্যা* বলে। এই সকল নিয়ম অটল বিশ্বাস ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনে আচরণ করা উচিত। উপরন্তু দৃষ্টির উদারতাও থাকা বিশেষ প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদের দরকার শ্রীকৃষ্ণ কথিত কর্মফল ত্যাগের আদর্শ, শঙ্করের অপরোক্ষ আত্ম-বিশ্লেষণের পথ এবং চৈতন্যদেবের উচ্ছ্বসিত ভগবৎ-প্রেম। তাছাড়া বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যীশুখ্রীস্টের শৈলোপদেশ এবং মহম্মদের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বোধ আমাদের সহায়ক হতে পারে। সাধনার এই সকল ধাপগুলি সাধককে তার প্রকৃত দিব্য-স্বরূপ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, সকল ধর্মের মরমিয়াগণ এই সাধনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

---

১৩ পূর্বোক্ত '*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*', পৃঃ ৫২

১৪ দ্রঃ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*—১৭/১৪-১৬

জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ। এই সত্য প্রকাশিত হয় শুদ্ধ মনের স্বতঃলব্ধ অনুভূতিতে। সমস্ত যোগ-মার্গে আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু হয় অনুরাগ থেকে, পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব-বোধ থেকে সকল মানুষের সঙ্গে একত্ব-বোধ অবশ্যই জন্মায়। ঈশ্বরের নাম জপ ও সর্বদা সর্বভূত-হৃদি-স্থিত ঈশ্বরের স্মরণ মননের মাধ্যমে ভক্ত-সাধকের জীবন হয়ে উঠে মধুময় এবং তিনি তখন নিজের অহং বোধকে দিব্য চৈতন্যে লীন করে দিতে সমর্থ হন। সমুদ্রের ঢেউ যেমন সমুদ্রেই মিলিয়ে যায়, তেমনি ক্ষুদ্র ব্যক্তি-চৈতন্য বিশ্ব-চৈতন্যে লীন হয়ে যায়। তিনি তখন উপলব্ধি করেন, "স্বরূপত আমি ব্রহ্ম, আমি পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নই।" প্রতিটি প্রকৃত আত্মজ্ঞানীর অন্তরেই যে আনন্দের আভাস দেখা যায়—এই অনুভূতিই তার উৎস। মানুষ যখন শাশ্বত সৎ-স্বরূপের সঙ্গে তার একত্ব উপলব্ধি করে, জীবাত্মা যখন আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যায় তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একত্বভাব অনুভব করে। প্রত্যেকেই তখন সকল জীবের হৃদয়ের প্রতিফলিত ঈশ্বরের কৃপা ও প্রেমের আভাস অন্তত কিছুটা পেতে পারে। তখন জীবনে অসন্তোষের ভাব চলে গিয়ে শান্তির ভাব আসে, যা এই সংসারকে স্বর্গে পরিণত করতে সাহায্য করে। দুঃখের মধ্যেই আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হতে পারে, কিন্তু যেই পরমাত্মার সঙ্গে একত্বভাব প্রকৃত সত্য বলে অনুভূত হয়, অজ্ঞানের অন্ধকারে যারা বসে আছে তাদের কাছে তখন আমরা জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে পারি। তাই আধ্যাত্মিক অনুভূতি শুধু নিজের জন্য নয়, অপরের সুখ ও শান্তির জন্যও প্রয়োজন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# জীবাত্মা ও তার নিয়তি

## সকল সমস্যার অন্তর্নিহিত মূল সমস্যা

জন্মের পূর্বেও জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হিন্দুধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে ইহজন্মের পরে জীবাত্মার অস্তিত্বে বা অমরত্বে বিশ্বাস বিশ্বের প্রায় সব ধর্মেই করে থাকে। 'পুনর্জন্ম' সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

''সকল দেশে ও সকল কালে যে-সকল কূট সমস্যা মানুষের বুদ্ধিকে বিমূঢ় করেছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল মানুষ নিজে। যে অগণিত রহস্য ইতিহাসের আদি যুগ থেকে মানুষের শক্তিকে সমাধানের জন্য আহ্বান জানিয়ে ঐ কাজে ব্রতী করেছে তন্মধ্যে গভীরতম রহস্য হলো মানুষের নিজ স্বরূপ। এটি সমাধানের অসাধ্য একটি প্রহেলিকা মাত্র নয়, এটি সকল সমস্যার অন্তর্নিহিত মূল সমস্যাও বটে। মানুষের এই স্বরূপটিই আমাদের সর্বপ্রকার জ্ঞান, সর্বপ্রকার অনুভূতি ও সর্বপ্রকার কার্য-কলাপের মূল উৎস ও শেষ আধার। এমন কোন সময় ছিল না, এমন কোন সময় আসবেও না—যখন মানুষের নিজের স্বরূপ তার সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করবে না।''[১]

জীবপ্রকৃতি ও তার নিয়তি বা জীবন-মৃত্যুর গভীর রহস্যটি যুগ-পরম্পরায় বা বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সব সময় কিছু সাহসী ও নিষ্ঠাবান সাধক থাকেন যাঁরা এই রহস্য উন্মোচন করতে এবং আত্মজ্ঞানের সাহায্যে এর সমাধান করতে সচেষ্ট হন। এইসব মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য আমাদেরও সচেষ্ট হওয়া উচিত। আমরা যদি যথেষ্ট কঠোরতা ও অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করি তবে আমরা নিজেরাই এই সমস্যার সমাধান করে নিতে পারি।

হ্যারিয়েট বীচার স্টোয়ে (Harreit Beecher Stowe)-এর বিখ্যাত বই আঙ্কল টম্‌স কেবিন (Uncle Tom's Cabin)-এ ছোট্ট মেয়ে তপ্‌সীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'তুমি কি বলতে পার কে তোমাকে তৈরি করেছেন?' একটু হেসে মেয়েটি

---

১ পূর্বোক্ত *বাণী ও রচনা*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮

বলেছিল, 'কেউ না, আমি যতদূর জানি। আমার মনে হয় আমি এমনি হয়েছি। ভেবো না কেউ আমাকে তৈরি করেছে।' আমরা কখনো এরূপ মনে করি কি? আমাদের এই অদ্ভুত সংসারে এমন অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আছেন যাঁরা এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে মোটেই আগ্রহী নন। আবার এমন কিছু মানুষ আছে যাদের অন্তরের প্রশ্ন হলো : 'আমরা কোথা থেকে এসেছি? চতুর্দিকে আমরা যে সব জিনিস দেখছি তাদের মতো আমরাও কি সৃষ্ট পদার্থ? এই পৃথিবীতে জন্মের পূর্বে কি আমাদের অস্তিত্ব ছিল? মৃত্যুর পরেও কি আমাদের অস্তিত্ব থাকবে?' যুগযুগান্তর ধরে বার বার এই প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। ওয়াল্ট হুইটম্যান (Walt Whitman)-এর কথায় :

'পুরাতন দুটি সরল সমস্যা সতত পরস্পর জড়িত খুব কাছাকাছি, পলায়নপর, বর্তমান, বিমূঢ়, সমাধানে প্রয়াসী, যুগপরম্পরায় সমাধানের অসাধ্য, আমাদের কালেও তাই—ও-ভাবেই আমরা রেখে দিয়ে যাব।'[২]

## জীববিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা

পাশ্চাত্যের জীববিজ্ঞানীরা একটি বহু কোষবিশিষ্ট প্রাণীর—তা হতে পারে মাছি, পাখি, জন্তু বা মানুষের—জীবনকে পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে থাকেন : গর্ভাধানপদ্ধতিতে জীব-দেহের গঠন, বৃদ্ধির কাল, বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় স্থায়িত্ব-কাল, বার্ধক্য ও মৃত্যু যা এই জীবন-চক্রের শেষ পরিণাম। অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীর মতে, বংশগত ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবের আবির্ভাব ঘটে। বংশধর বা কুলের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করার কোন সম্ভাবনা ব্যষ্টি বা ব্যক্তির থাকে না। যেসকল প্রাণী নিজ প্রজাতির জন্মদান করে না তারা শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

## অমরত্ব সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা

এই মত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি মত আমরা পাই প্রাচীন হিন্দু ধর্মাচার্যদের কাছ থেকে। তাঁরা বলেন প্রত্যেক জীবের ভৌত জীবন ছয় প্রকার পরিবর্তন-চক্রের মাধ্যমে অতিবাহিত হয় : জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অবক্ষয় ও বিনাশ।[৩] স্থূলদেহের মৃত্যুই বিনাশ। মৃত্যুর অর্থ জীবাত্মার স্থূলদেহের অস্তিত্ব লোপ কিন্তু জীবাত্মার অস্তিত্ব তখন সূক্ষ্ম জগতে, সৃষ্টিকর্তার আরও নিকটে বর্তমান

---

২ Walt Whitman, Leaves of Grass (Adventine Press, New York, 1931) p. 530

৩ দ্রঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাঙ্কর ভাষ্য, মহাদেব শাস্ত্রী অনূদিত, পৃঃ ৪২

থাকে। সংক্ষিপ্ত বিরামকালের অন্তে জীবাত্মা নতুন দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করে। জীবাত্মার বিনাশ কখনো হয় না, শুধু এর স্থূল শরীর পরিবর্তন-চক্র অনুযায়ী পরিণাম প্রাপ্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

> *মানুষ তার স্বরূপ সম্বন্ধে যতগুলি মত আজ পর্যন্ত স্বীকার করেছে, তার মধ্যে এই মতটিই সর্বাধিক প্রসার লাভ করেছে যে, আত্মা-নামক একটি সত্য বস্তু আছে এবং উহা দেহ থেকে ভিন্ন ও অমর। যাঁরা এইরূপ আত্মার অস্তিত্বে আস্থাবান, তাঁদের মধ্যে আবার অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন যে, আত্মা বর্তমান জন্মের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান।*[৪]

বেদান্তের আচার্যগণ নিজেদের অপরোক্ষ অনুভূতি থেকে বলেন যে, জীবাত্মা বা জীবের আধ্যাত্মিক সত্তা বার বার দেহ ধারণ করলেও তিনি নিজে অমর। তিনি এই জন্মের পূর্বে ছিলেন এবং অনেকবার 'জন্ম' ও 'মৃত্যু'র ভেতর দিয়ে গিয়েও তিনি চিরকাল বিদ্যমান থাকবেন। একটি আধুনিক উপমা দেওয়া যাক—বর্ণালী যেমন শুধু দৃশ্যমান আলোর গুচ্ছ নয় কারণ বেগুনী ও লাল রশ্মির পরিসর ছাড়িয়েও এর অস্তিত্ব থাকে—তেমনি জীবাত্মার আছে অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ। জীবাত্মা অনন্ত সত্তার অংশ যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েও স্থান ও কালের অতীত। জীবাত্মার অতীত ও ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে অজ্ঞাত হলেও বস্তুত এর অস্তিত্ব নিরবধি। যদিও নিজ সত্তার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না, তথাপি এর প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে উচ্চতর সত্তার প্রয়োজন। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

> *কেউই স্থূল চক্ষুদ্বারা অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আত্মাকে দর্শন করতে পারে না। এর কোন সাকার রূপ নেই। পরন্তু শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা ইনি হৃদয়ে উপলব্ধ হন; যাঁরা তাঁকে জানেন, তাঁরা অমৃত বা বিমুক্ত হন।*[৫]

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ কেবল বদ্ধ জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা নিজেদের অহং, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহের সঙ্গে একাত্মবোধ করে। তাদের বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। তবে যাঁদের মধ্যে নতুন উচ্চতর চেতনা জাগ্রত হয়েছে তাঁরা এই মিথ্যা দেহাত্ম-বুদ্ধি থেকে মুক্ত হন এবং অনন্ত পরমাত্মাই যে তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ তা উপলব্ধি করে জন্ম-মৃত্যু-চক্রের আর্বত থেকে মুক্তি পেয়ে অমরত্ব লাভ করেন।

সূক্ষ্ম শরীর নতুন নতুন স্থূল শরীরে বার বার জন্মায় এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। প্রতিবার স্থূল দেহের মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর পুনর্জন্মের

---

৪ পূর্বোক্ত *বাণী ও রচনা*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৯

৫ *ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।*
*হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥* কঠ.উ. ২/৩/৯

পূর্ব পর্যন্ত সূক্ষ্ম জগতে বাস করতে পারে।[৬] আধ্যাত্মিক জগতের দুর্জ্ঞেয় নিয়ম অনুসারেই এইসব ব্যাপার ঘটে থাকে।

প্রত্যেক জীবাত্মা নিজের প্রকৃত স্বরূপকে পরম, অবিকারী, স্বয়ংজ্যোতি, চৈতন্যস্বরূপ আত্মারূপে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু-চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। সত্য আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ..." (আত্মা জন্ম-হীন, মৃত্যু-হীন, শাশ্বত, পুরাতন হয়েও চিরনতুন)।[৭] বেদান্তমতে অনাদি *অজ্ঞানই* মুক্ত-স্বভাব আত্মার বন্ধন-ভাব সৃষ্টি করে। অনাদিকাল থেকে অনাত্মায় আত্মবোধ রয়েছে। আর যতদিন এই বোধ থাকে আত্মা ততদিন সান্ত-স্বতন্ত্র জীবাত্মা বা অহংরূপেই বিদ্যমান থাকে এবং বার বার জন্মায়। অজ্ঞানের ঘোরে মানুষ নিজের ঈশ্বরীয় সত্তাকে ভুলে যায়। তবে প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা সময় আসে যখন সে প্রথম প্রথম ক্ষীণ বা অস্পষ্টভাবে তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিছু আভাস পায়। তখন মানুষের অন্তরাত্মা যেন অনন্ত নিদ্রা থেকে জেগে উঠে নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য সাধনায় ব্রতী হয়। উচ্চতর চেতনার সম্যক উদয় ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক জাগরণে জীব যখন নিজ আধ্যাত্মিক স্বরূপ ও পরমাত্মার সঙ্গে তার অভেদ সম্পর্কের বিষয় উপলব্ধি করে তখন তাঁর সব কর্ম-বন্ধন খসে যায় এবং জন্ম-মৃত্যু-আবর্তের নিবৃত্তি হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন তেমন আমরাও তখন বলতে পারি, "খেলা মোর হলো শেষ।"[৮]

## ভারতীয় চিন্তায় কর্মবাদ

জন্মান্তরবাদ কর্মবাদেরই সম্প্রসারণ মাত্র। *কর্ম* বলতে শুধু কায়িক ও মানসিক কর্মকেই বোঝায় না, *কর্ম* বলতে বাহ্য উদ্দীপনার উত্তরে মনের সাড়াকেও বোঝায়। শুভ বা অশুভ কর্মের শক্তিতে সৃষ্ট হয় শুভ বা অশুভ কর্মফল, তা ফলকামী অহং-কেন্দ্রিক কর্তাকে প্রভাবিত করে। তাই, বস্তুত কর্মবাদ মানেই হেতুবাদ। এই মহান নীতিবিধানই ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্ষেত্রে, ব্যক্তির ও সমাজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রত্যেক কর্মের দুরকম ফল হয়। একটি হলো সৃষ্টি-সংক্রান্ত ফল যা স্থির করে আমাদের ভবিষ্যৎ সুখ বা দুঃখ ভোগ। *কর্মের* অপর ফলটি ব্যক্তি-নির্ভরশীল। প্রতিটি কর্ম মনে একটি দাগ রেখে যায় যাকে বলা হয় *সংস্কার*। এরূপ সহস্র সহস্র

---

৬ দ্রঃ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*—২/২২ এবং ৮/১৮

৭ দ্রঃ তদেব ২/২০ এবং *কঠোপনিষদ্*—১/২/১৮

৮ পূর্বোক্ত *বাণী ও রচনা*, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪১২-১৫

*সংস্কার* আমাদের মনের গভীরে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে যা পরবর্তী কালে আবার প্রেরণা বা বাসনারূপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি আমাদের পরের জন্মের জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে। বিষয়টি আমরা যত দুর্বোধ্য বলে মনে করি ততটা নয়। আমরা নিজেদের মন বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, আমাদের বর্তমানের অনেক চিন্তার মূল নিহিত আছে আমাদের বাল্যকালে। বাল্যকালে অর্জিত কিছু ধারণা ও অভিজ্ঞতা আমাদের মনে গভীর দাগ রেখে দেয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের মনের চিত্রগুলি যতই পরিস্ফুট হতে থাকে, ততই আমরা মনের গভীরে কতরকম চিত্র ও ধারণা রয়েছে দেখে বিস্মিত হয়ে যাই। এ যেন টেপ-রেকর্ডে ধরে রাখা শব্দগুলি আবার বাজানো। প্রায়শ আমরা কিছু প্রবণতার উৎস কোথায় তা ভুলে যাই। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে ঐ উৎসের সন্ধান মেলে আমাদের অতি শৈশবকালে, এমনকি আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মেও। আমাদের কিছু কিছু স্বপ্ন বিশ্লেষণে অতীতের ভুরি ভুরি খুঁটিনাটি জানা যায়; এই জ্ঞান প্রায়শ অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার দিকে ইঙ্গিত করে।

কর্মবাদের দুটি দিক আছে। একটি বন্ধন সৃষ্টি করে, অপরটি মুক্তি বিধান করে। অহঙ্কার ও আসক্তি প্রণোদিত *কর্ম* জীবকে আরো বদ্ধ করে। অবিরত ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ পূর্ব সংস্কারকে অধিকতর প্রবল করে তোলে এবং তা মানুষকে জন্ম-মৃত্যু স্তরে টেনে নামিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু নিরাসক্ত হয়ে ঈশ্বর-সেবা বা কেবল জীবের কল্যাণের জন্য যদি কর্ম করা যায় তবে তা জীবের মুক্তির কারণ হতে পারে। নিরাসক্ত ভাবে জীবকে অভ্যস্ত হতে হলে সর্বদা আত্ম-সমীক্ষা ও সচেতনতার বা ঈশ্বরে অবিরত আত্ম-সমর্পণ করে থাকার প্রয়োজন। এটা করতে পারলে নতুন করে কোন সংস্কার আর গড়ে উঠতে পারে না এবং পুরান সংস্কারগুলি প্রবলতর হয়ে উঠতে পারে না। ক্রমে ক্রমে আমাদের উপর পুরাতন সংস্কারগুলির প্রভাবও শিথিল হয়ে পড়ে। একেই বলে চিত্ত-শুদ্ধি। কর্মের সহায়েই এই শুদ্ধি সম্ভব হয়। সুতরাং *কর্ম* নিজে হানিকর নয়। আমরা কি ভাবে কর্ম করি তার উপর নির্ভর করে—কর্ম আমাদের বন্ধনের কারণ হবে কি না।

ভারতে দর্শনশাস্ত্রের সকল শাখা, ঈশ্বর-বিশ্বাসী না হলেও, কর্মবাদ স্বীকার করে। তবে মূল প্রশ্নটি হলো পরমাত্মার বা ঈশ্বরের সঙ্গে এই কর্মবাদের কোন সম্পর্ক আছে কি? এর ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে একটি ঐশ্বরিক ইচ্ছা থাকে। 'মহাকাশীয় বর্তুলাকৃতিগত সমতা' (Spherical Harmonies) তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ 'লাপ্লাস' (Laplace) সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দ্য সেলেস্টিয়াল মেকানিজম্' (The Celestial Mechanism)

নেপোলিওনকে উপহার দিলে সম্রাট তাঁকে তাঁর মতবাদে ঈশ্বরের স্থান আছে কি না এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। জ্যোতির্বিদ শান্তভাবে বলেন, 'মহাশয়, আমি ঐরূপ অনুমান ছাড়াই কাজ করেছি।' এটা ঠিক যে বহু বিজ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর একটি অনুমানের বিষয় যা স্বীকার না করলেও চলে। আজকাল বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একশ্রেণীর অগভীর চিন্তাশীল মানুষের কাছে অজ্ঞেয়বাদ বা নিরীশ্বরবাদ যেন একটা ফ্যাশন (কেতা) হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের তত্ত্বকে আধুনিক বলে মনে করে ভারতে তরুণ সমাজের অনেকেই এই ভাব আরো বেশি বেশি গ্রহণ করেছে।

এখন, এই সকল ব্যক্তির মন জানতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, এদের মনে পরিপক্কতা বা গভীরতার অভাব রয়েছে। মনের গভীরে প্রবেশ করার বা এমনকি কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার আন্তরিক চেষ্টা বা ক্ষমতাও এদের নেই। বস্তুত কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিয়মে অভ্যস্ত মন। অধিকাংশ তথাকথিত আধুনিক জড়বাদীরা শুধু অন্যাদের মতামত আওড়াতে ও অন্ধের মতো অনুকরণ করতে চায়। একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে; একজন শিক্ষিকা ছোট ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখাচ্ছিলেন। তিনি তাদের একটি অঙ্ক কষতে দিলেন। তাঁর প্রশ্নটি ছিল, 'আমার বারটি মেষ আছে। তাদের মধ্যে ছ-টি বেড়া টপকে পালিয়ে গেল। তাহলে আর কটি পড়ে থাকবে?' অধিকাংশের উত্তর এল, 'ছয়'। কিন্তু এক কৃষকের ছেলে শান্ত ভাবে বলল, 'কেউই পড়ে থাকবে না।' শিক্ষিকা এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করলে, বালকটি বলে, 'মহাশয়া, আপনি অঙ্ক জানতে পারেন, আমি কিন্তু মেষপালের আচরণ জানি'। এর থেকে আমরা সকলেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। মেষের ন্যায় অন্ধভাবে কাউকে অনুকরণ করা অনুচিত। একজন বিজ্ঞানী যেমন বলেছেন, 'আমাদের অধিকাংশের পক্ষে মেরুদণ্ডই যথেষ্ট, মস্তিষ্কটি একটি অপ্রয়োজনীয় অংশ।' এর অর্থ এই যে, অধিকাংশ মানুষ সহজাত প্রবৃত্তিমুখী ও আবেগপ্রবণ জীবন যাপন করে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ সত্যসত্যই চিন্তা করে ও নিজ জীবন বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে।

জড়বাদে আধুনিক বলতে কিছুই নেই। প্রাচীন ভারতে চার্বাকপন্থী বলে খ্যাত এক দল চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা ঈশ্বর, আত্মা ও অমরত্বে বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, স্থূল বিষয়ভোগই জীবনের উদ্দেশ্য। তবে সাধারণের মনে এঁরা বিশেষ কোন প্রভাব ফেলতে পারেন নি বলেই মনে হয়। তাই বলে কি প্রাচীন চার্বাকপন্থীরা লোপ পেয়েছে? তাঁরা আমাদের অনেকের মধ্যেই গুপ্তভাবে থেকে মুখে ধর্মের কথা বলেন, কিন্তু বাস্তবজীবনে জড়বাদী ভাবধারা অনুসরণ করেন।

এইসব ভাসা ভাসা জড়বাদী চিন্তাশীল মানুষ ছাড়াও প্রাচীন ভারতে গভীর, ঐকান্তিক দার্শনিক মনও ছিল, তবু সে মনে ঈশ্বর, অন্তত সাধারণের ধারণামতো ঈশ্বর, স্বীকৃত হননি। কিন্তু তাঁরা সকলেই কর্মবাদ মানতেন এবং সম্ভবত বৌদ্ধরা ছাড়া, সকলেই আত্মার সত্যতায় ও অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। *'আস্তিক'* ও *'নাস্তিক'* বলতে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বোঝায় না, বরং যথাক্রমে 'প্রাচীনপন্থী' ও 'প্রাচীন পন্থায় অবিশ্বাসী'—লোকেরাই উল্লিখিত হয়। যারা বেদের সর্বোচ্চ প্রামাণ্যে বিশ্বাসী তারা 'আস্তিক', আর যাদের বিশ্বাস এর বিপরীত তারা 'নাস্তিক' বলে গণ্য। বৌদ্ধরা ও জৈনরা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। আস্তিকদের মধ্যে আবার সাংখ্যবাদী ও কিছু কিছু মীমাংসকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে জীব কর্মের অমোঘ নিয়মে বাঁধা।

বৌদ্ধরা আবার আত্মারই অস্তিত্ব স্বীকার করে না, অথচ কর্মবাদ স্বীকার করে, ফলে তাদের অনেকেই এক অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। তারা মানুষের ব্যক্তিত্বকে একটি রথের সঙ্গে তুলনা করে। চাকা প্রভৃতি অংশগুলির সংহত রূপ হলো একটি রথ, এবং এগুলি ছাড়া রথের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। মনুষ্য দেহও তেমনি বহু উপাদানের সংহত রূপ এবং তাহলেও কর্মফল অনুযায়ী জন্ম পরিগ্রহ করে। একটি গল্পে এক বৃদ্ধ কাঠুরিয়া তার ধারাল কুঠারটি নিয়ে গর্ব করত। কেউ কুঠারের প্রশংসা করলে বৃদ্ধ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলত : "দেখ বাছা, আমার যখন বিশ বছর বয়স তখন থেকে আমি এটি ব্যবহার করছি, এবং এখনো এটিকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে! কেবল এর ফলকটা ছ-বার আর হাতলটা আটবার পাল্টানো হয়েছে।" বৃদ্ধ লোকটির ধারণা ছিল যে, সে একই কুঠার তখনো ব্যবহার করছিল! বৌদ্ধরা বলে যে, বারবার পুনর্জন্মের মাধ্যমে একই জীবাত্মার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার ধারণা একই ধরনের বিভ্রান্তি।

কয়েক বছর পাশ্চাত্য দেশে থাকার ফলে ধর্মীয় পরিবেশ কি তা আমি বেশ ভালই বুঝতে পারি। ভারত বেদান্তের দেশ। বেদান্ত বিশ্বাস করে, সকল প্রাণীর ভাগ্য-নিয়ন্তা এক ঐশ্বরিক শক্তি আছে। বেদান্ত বিশ্বাস করে না যে, একটি অচেতন বিধি সব চেতন জীবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্যই এক চৈতন্য-সত্তা, বুদ্ধিমান শক্তি আছেন, যিনি পরম নিয়ন্তা ও পথ প্রদর্শক। 'ন্যায়-সূত্রে'র একটি সূত্রে পাওয়া যায় : "ঈশ্বরই পরমকারণ, যেহেতু মানুষ যে কর্ম করে তা সব সময় ফল প্রসব করে না।"[১] ভারতের বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র বেদান্তই ঈশ্বর সম্বন্ধে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, তাই বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন স্বীকৃত, এর প্রসারও তেমন

---

১ 'ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ-কর্মাফল্য-দর্শনাৎ।'— গৌতম, ন্যায়-সূত্র, ৪/১/১৯

ব্যাপক। কিন্তু যে-সকল দার্শনিক মতবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি তারা হয় নিজ দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বেদান্তের মূল ধারায় মিশে গেছে।

আমরা বিরাট আকারে যন্ত্র ও খুব জটিল ধরনের কমপিউটারের কথা শুনি এবং তাদের দক্ষ কার্যকারিতা দেখে প্রভাবিত হই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, এর পেছনে বুদ্ধিমান সত্তাসকল আছে যারা এগুলি সৃষ্টি করেছে বা চালাচ্ছে। ঠিক তেমনি, যদিও মনে হয় এই অনন্ত ও রহস্যময় বিশ্ব আপন স্বভাবে চলছে, কিন্তু একে চালাচ্ছেন এক বিশ্বসত্তা, যিনি স্বরূপত পরম বোধশক্তি হয়েও সর্বভূতে অনুস্যূত হয়ে বিরাজ করছেন। জমিতে বীজ বপন করে জল দাও। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বড় হবে। আমাদের কি এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, কোন সাকার দেবতা, নারায়ণ বা শিব, বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে বসে বীজের ঐ রূপান্তর সাধন করাচ্ছেন? সর্বভূতেই ঈশ্বর অনুস্যূত হয়ে বিরাজমান। সর্বানুস্যূত এই দৈব সত্তাই জীবনের সকল ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করেন। কিছু কিছু পাশ্চাত্য দার্শনিকও এক সর্বানুস্যূত মহাজাগতিক অভিপ্রায়ের কথা বলেন। কর্মবাদ এই ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে ঈশ্বর স্বয়ং এই নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে, তিনি এর অধীন নন। তিনি নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত ও পরম চিদানন্দস্বরূপ।

বেদান্ত একথাও বলে যে, মানুষের সব সময় কাজ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। জীবাত্মার অন্তর্নিহিত সত্তা বিকশিত না হওয়া পর্যন্তই কর্ম করা বিধেয়। যখন জীব নিজের স্বরূপকে ঈশ্বর-সত্তা থেকে অভিন্নরূপে অনুভব করে তখন সে সকল কর্মের গণ্ডির বাইরে চলে গিয়ে মুক্ত হয়। বেদান্তমতে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা দেখি এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে *মুণ্ডক উপনিষদ্* একটি সুন্দর রূপকের অবতারণা করেছেন : মনোরম পালকবিশিষ্ট দুটি পাখি একই বৃক্ষে বসে রয়েছে। একটি পাখি ঐ বৃক্ষের তিক্ত বা মিষ্ট ফল ভক্ষণ করছে; অন্যটি বৃক্ষের চূড়ায় বসে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে দেখছে। কিছু সময় পরে নিচের পাখিটি উপরের পাখিটির দিকে তাকিয়ে থেকে অনুভব করে উপরের পাখিটির সঙ্গে তার কোন ভেদ নেই। তখন সেও ফল খাওয়া ত্যাগ করে পরম শান্তির অধিকারী হয়। নিচের পাখিটি হচ্ছে জীব—একটি জীবাত্মা যা কর্মপাশে বদ্ধ থেকে বার বার সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যখন জীব পরমাত্মার—উপরের পাখি যার প্রতীক তার—সঙ্গে একত্ব অনুভব করে তখন সেও সকল আসক্তি ও বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে স্ব-মহিমায় বিরাজ করে।[১৩]

---

১৩ *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।*
*তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥*
*সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।*
*জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥* মুণ্ডকোপনিষদ্—৩/১/১-২

কর্ম-বন্ধনে জড়িয়ে চক্রে পিষ্ট হবার প্রয়োজন নেই। দুঃখময় চক্রের দাঁত হতে মুক্তি-লাভের উপায় আছে। ভগবদ্গীতায় কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার সহজ পথ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "সকল ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করব। অতএব শোক করো না।"[১১] সকল মানুষের প্রতি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভগবান। মহান অবতার পুরুষগণ সকলেই মানুষকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যাটা হলো এতে বিশ্বাস রেখে সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করা।

## পাশ্চাত্য ভাবনায় জীবাত্মার পূর্ব-অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম

বহু শতাব্দী পূর্বে প্লেটো (Plato) বলেছিলেন, "জীবাত্মা অনন্তকাল থেকেই আছে; কারাগার সদৃশ দেহে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বেও জীবাত্মার অস্তিত্ব ছিল। আত্মজ্ঞান হলেই জীবাত্মার মুক্তি হয়। এই জ্ঞান কোন নতুন ব্যাপার নয়। এ হলো আমাদের ভুলে যাওয়া স্বরূপ-জ্ঞানকে আবার স্মরণে নিয়ে আসা।" [১২]

জীবাত্মার পূর্ব-অস্তিত্ব ও অমরত্ব সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা শুধু প্লেটোর একার ছিল না; ঐ ধারণা প্রাচীনকালে অরফিক্স (Orphics) ও পিথাগোরাস-পন্থীদের (Phythagoreaus) ন্যায় বহু মহান চিন্তানায়কেরাও পোষণ করতেন।

প্লটিনাস (Plotinus, A. D. 205-270) নব্য-প্লেটোবাদের স্রষ্টা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানবাত্মা বিশ্বাত্মারই অংশ এবং তা জড় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাঁকে কঠোর সাধনা করতে হবে; নচেৎ মৃত্যুর পর তাঁকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হবে। যতক্ষণ বিষয়জনিত অপবিত্রতা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ তাকে জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়েই চলতে হবে। সাধনার মাধ্যমে অন্তর পবিত্র হলেই জীবাত্মা, বিশ্বাত্মা তথা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

মন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা (Kabbalists) ইহুদি ধর্মে এই ধরনের মতবাদ প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন। নিউ টেস্টামেন্টেও (New Testament) পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ স্পষ্টভাবেই করা হয়েছে। শৈল চূড়ায় যীশুর মহীয়ান রূপান্তর দর্শনের সময় তাঁর শিষ্যেরা যীশুর দুই পার্শ্বে মোজেস (Moses) ও ইলিয়াস (Elias)-কে দেখেছিলেন।

[১১] *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।*
*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥* গীতা—১৮/৬৬

[১২] S.F. Frost, *The Basic Teachings of the Great Philosophers*, New York : The New Home Library, 1942, pp. 174-75

Elias বা Elijah একজন প্রাচীন-ইহুদি ধর্মগুরু। তাঁকে লক্ষ্য করে যীশু বলেছিলেন, "ঐ যে ইলিয়াস ইতোমধ্যে এসে পড়েছেন।" তাঁর শিষ্যরা বুঝে নিয়েছিলেন যে, তিনি দীক্ষাদাতা জনের (John, the Baptist) কথা বলছেন। যীশু জনকে ইলিয়াসের অবতার বলে মনে করতেন।[১৩]

প্রাচীন খ্রীস্ট ধর্মের অন্তর্গত মনিকিয়ান (Manicheans) ও নস্টিক (Gnostic) সম্প্রদায় আত্মার জন্ম-পূর্ব অস্তিত্ব যেমন বিশ্বাস করত তেমনই করত মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব। অতীতের এক শ্রেষ্ঠ খ্রীস্টান পণ্ডিত, ওরিজেন (Origen: A.D. 185-251) বলেছেন : "মানুষের মন কখনো সৎ কখনো অসৎ ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আমার মনে হয় মনুষ্য দেহের জন্মের আগে থেকেই সৃষ্ট কারণসমূহ এর পশ্চাতে অধিক কাজ করে।" তবে এই মত অবশ্যই গোঁড়া খ্রীস্টান মতবাদের বিরুদ্ধে ছিল, তাই চার্চ কঠোরভাবে এই মতের প্রচার দমন করে। ৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের সভায় (Council of Constantinople) ঘোষণা করা হয়, "কেউ যদি লোকগাথায় বর্ণিত আত্মার পূর্ব-অস্তিত্বে ও এঁর পুনরায় দেহধারণরূপ ভয়ঙ্কর মতবাদে বিশ্বাসী হয়, তবে তাকে খ্রীস্টধর্ম থেকে অভিশপ্ত বলে বহিষ্কৃত করা হোক।"[১৪] কিন্তু সুসংগঠিত চার্চের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এই মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে রোধ করা যায়নি। বরং এর প্রসার লাভ হয়েছিল অন্যান্য দেশে এমনকি খ্রীস্টান দেশগুলির বহু মরমিয়া সাধকদের মধ্যে। ইউরোপীয় নবজাগরণের কালে ইটালীয় সন্ন্যাসী ও দার্শনিক, গ্যোরদানো ব্রুনো (Giordano Bruno, A.D. 1548-1600) এই মতবাদকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি সর্বেশ্বরবাদ ও মানবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সে কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ ও নির্যাতিত করে ও খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে দর্শনকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিলেন।

চার্চের ক্ষমতা এতটাই ছিল যে, পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসীরা বড় জোর অতি গোপনে তাদের প্রচারকার্য চালাতে পারত। বহু শতাব্দী ধরেই এই মত অনেক মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল, অবশ্য মানুষ খোলাখুলিভাবে এ বিষয়ে কিছু বলতে ভয় পেত। চার্চের ধর্মগত অপরাধ বিচারের দিন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাবিদ, কবি ও দার্শনিকেরা নিজেদের ভাব স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে এগিয়ে এলেন।

ডারউইনের বড় অনুগামী টমাস হাক্সলি (১৮২৫-১৮৯৫) পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নির্ভয়ে বলেছিলেন : "প্রত্যেকটি সচেতন জীব নিজকর্মের ফলভোগ

---

১৩ Bible, St. Mathew, 17.12

১৪ *Encyclopaedia of Religions and Ethics*, Edited by James Hastings, Vol. IV, 1967, p.193

করছে মাত্র; অবশ্য এই কর্ম এজন্মে না হলেও অসংখ্য পূর্ববর্তী জন্মধারার কোন একটি জন্মে কৃত হয়েছিল, বর্তমান জন্ম এই ধারারই শেষ পর্ব।" তাঁর মতো বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কারণ ব্যতীত কোন কার্য হতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন, "বিবর্তনবাদের মতোই জন্মান্তরবাদও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

এমারসন (১৮০৩-১৮৮২) ও তাঁর সমসাময়িক নিউ ইংল্যাণ্ডের কিছু মানুষ একইভাবে চিন্তা করেছেন। ভগবদ্গীতার বাণীতে প্রভাবিত এমারসন সাহসের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন, "আমাদের নিচে অনেক সিঁড়ি আছে যা বেয়ে আমরা উপরে উঠে এসেছি; আমাদের ওপরে অনেক সিঁড়ি রয়েছে, যা ওপরে উঠে চলেছে দৃষ্টির অন্তরালে।"

কবিরা আত্মার সান্নিধ্য অনুভব করেন। যে সত্যে তাঁরা বিশ্বাসী তা তাঁরা তাঁদের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করে থাকেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) যেমন বলেন ঃ

> *"জনম মোদের ঘটে এক মহানিদ্রার অবসানে জীবন-তারার উদয়ের সাথে আত্মার জাগরণে। অন্য কোথা ছিল তার গেহ সুদূরের পরপারে দূরে বহুদূরে বিস্মৃত এক কোন্ সীমানার ধারে।"*

টেনিসন (Tennyson) নিম্নতর জীবনের কথা বলেছেন, যেগুলি যাপন করে ও তা বিস্মৃত হয়ে জীবাত্মার বর্তমান আবির্ভাব ঃ

> *জীবনের প্রথম বছরটি যেমন যাই ভুলে ঠিক তেমনি ভুলি—আমাদের দুর্ভাগ্যের বেদনা-ভরা সেই অতীতকে যা ছিল নাকি মানুষের থেকেও নিচু কোন এক স্তরের জীবন।*

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানও সাহসভরে একই কথা ব্যক্ত করেছেন, যদিও আমরা জানি না যে, এই ভাব তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ঃ

> *হে মোর জীবন, জানি আমি, তুমি বহু মরণের সঞ্চয়, হাজার দশেক মৃত্যুর পরে এসেছ হেথায় নাহি তায় সংশয়।*

এ ভাবটি অজানা মনে হলেও অনেকেই এটিকে স্বীকার করেন। ক্রমে বেশি বেশি লোকে জন্মান্তরবাদকে খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করছেন। জার্মানীর নাট্যকার ও সমালোচক, লেসিং (Lessing 1729-1781) মনে করেন, "যতবার আমি নতুন জ্ঞান ও নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারব ততবার আমি এখানে ফিরে ফিরে আসব না কেন?" ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte) বলেছেন, "একটি সুবিদিত যুক্তি এই যে, কালবশে যার উৎপত্তি হয় কালবশেই তার বিনাশ হয়। তাই মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে মৃত্যুর পূর্বেও তার অস্তিত্ব

স্বীকার করতে হয়।" পাশ্চাত্যে সতের বছর বাস করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, সেখানে বহু মানুষ পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। আর অনেকে যাঁরা প্রকাশ্যে এ মত ব্যক্ত করেন না, তাঁরা চার্চের ভয়েই তা করেন না। আমেরিকার এক বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও লেখক ডঃ প্র্যাট (Dr. Pratt) এ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে এসেছিলেন। পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমি নিজে জীবাত্মার দেহান্তর মানি না, তবে এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি যদি কেউ করতে চান, তবে তার প্রতি আছে আমার খোলা মন।" তিনি আরও লিখেছেন "আমি পুনর্জন্মবাদের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করি। জীবাত্মা সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণার মধ্যে অনস্বীকার্য ভাবে যে এক উৎকর্ষ আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; এই জীবাত্মা পর পর বিভিন্ন নশ্বর দেহ ও ক্ষয়িষ্ণু সংসারের মধ্যে দিয়ে তীর্থ ভ্রমণ করে শেষে এর স্বধাম 'অনন্ত সাগরে' গিয়ে মিলিত হয়। হিন্দু বিশ্বাস করে না যে, সে শাশ্বত জীবনে প্রবেশ করতে চলেছে, তার বিশ্বাস সে শাশ্বত জীবনই যাপন করছে।"[১৫]

## মহান আচার্যগণ পূর্বজন্মের কথা জানতেন

পাশ্চাত্যে দীর্ঘকাল থাকাকালে একটি প্রশ্ন আমাকে বহুবার শুনতে হয়েছিল এবং সেটি হলো, "আমাদের যদি পূর্বজন্ম থাকে তবে আমরা তা স্মরণ করতে পারি না কেন?" এখন অতীত জীবনের কথা যে আমরা ভুলে গেছি তা কি এক আশীর্বাদ নয়? এক জীবনের, ধরা যাক এই জীবনের, সকল স্মৃতি যদি এক সঙ্গে হঠাৎ বা এক এক করে ক্রমান্বয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়, তবে আমাদের অবস্থা কেমন হবে? তখন আমরা অধিকাংশই পাগল হয়ে যাব এবং সাধারণ রোগী হিসেবে থাকার মতো কোথাও কোন আস্তানা পাব না। মনো-রোগের চিকিৎসার জন্য অসংখ্য হাসপাতাল তৈরি করতে হবে। এর সংখ্যা তো বেড়েই চলেছে, আরো বাড়ানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। আমি এক কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, আমি শুধু প্রকৃত ঘটনা বলছি। তা হলো জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা থেকে মহামায়া আমাদের অতীত ভুলিয়ে রাখেন যাতে আমরা নতুন ভাব, নতুন প্রেরণা ও নতুন আশা নিয়ে জীবনের নতুন এক পর্ব শুরু করতে পারি।

পূর্ব জীবনের স্মৃতি কি জাগিয়ে তোলা যায়? মানুষ নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই অনুসন্ধিৎসু। তাই ভারতে, আরো বিশেষ করে পাশ্চাত্যে এত জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ, স্ফটিক-দ্রষ্টা, মনের কথা বলে দেবার লোক প্রভৃতি দেখা যায়। ঈশ্বরের থেকে এসবের ওপরে মানুষের বিশ্বাস বেশি বলে মনে হয়। একটি

১৫ James Bisset Pratt, *India and Its Faiths*, New York, Houghton Miffin Co. 1915, pp. 114-15

গল্পের কথা মনে হচ্ছে। একটি মেয়ে মনের কথা বলতে পারে এমন লোকের কাছে গিয়ে তার অতীত মানসিক সংস্কারগুলি জানতে চায়। তাতে ঐ লোকটি মেয়েটিকে বলে, "মান্যগণ্যলোকের কাছ থেকে আমি ১০০ টাকা নিয়ে থাকি, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৫০ টাকা। তবে তোমার মনের জন্য মাত্র ৫ টাকা দিলেই চলবে।" মেয়েটির কি রকমের মন ছিল?

উন্নত, পরিণতমনা লোকেদের হাতুড়ে বৈদ্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁরা নিজেরাই সত্য উদ্ঘাটন করতে চান। যোগ সাধনার মাধ্যমে আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি জাগিয়ে তোলা সম্ভব। মহান যোগাচার্য পতঞ্জলি বলেছেন, "নির্লোভতায় প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব পূর্ব জন্মগুলি কেমন ও কোথায়, যোগীর সে জ্ঞান আয়ত্ত হয়।"[১৬] এবং 'মনের সংস্কারগুলির অনুভূতি থেকে যোগীর পূর্ব জন্মের জ্ঞান হয়।'[১৭] পূর্ব স্মৃতি লাভ করা সম্ভব তবে এই বিষয়ে কৌতূহলী না হওয়াই ভাল।

শুদ্ধ মনে আমাদের প্রবণতাগুলির ওপর ধ্যান করলে পূর্ব জীবনের অন্তত অস্ফুট স্মৃতি আমরা পেতে পারি, যা আমাদের বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করে ও ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত হতে শেখায়। জগতে কিছু শ্রেষ্ঠ আচার্য তাঁদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা জানতেন এবং সে বিষয়ে নিজেদের শিষ্যদের বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, "আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেইগুলি জানি; কিন্তু তুমি সেইসব জান না।"[১৮] যীশুখ্রীস্ট বলেছিলেন, "আব্রাহামের আবির্ভাবের পূর্ব থেকে আমি রয়েছি।"[১৯] ঈশ্বরের অবতারগণ এইভাবে কথা বলেন। তাঁরা অখণ্ড চৈতন্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই হেতু অতীতকেও স্মরণে আনতে পারেন, সেইজন্য জীবন-নাট্যে তাঁদের অভিনয় এত ভাল হয়।

বুদ্ধদেব কখনো নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলেননি। কিন্তু পরে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে অবতাররূপে শ্রদ্ধা করতে থাকেন। তিনি অবশ্য বলতেন যে, নির্বাণ বা জ্ঞানলাভের পূর্বপর্যন্ত তাঁকে চিত্তশুদ্ধির জন্য পর পর বহু জন্মের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে।

তিনি ছিলেন রাজপুত্র এবং সত্যের সন্ধানে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। বোধিলাভ করে নিকটস্থ সকলের কাছে নিজের অনুভূতির কথা জানিয়ে যেতে

---

১৬ অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ। পতঞ্জলি, যোগসূত্র, ২/৩৯

১৭ সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্। তদেব, ৩/১৮

১৮ *বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।*
*তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ গীঃ—৪/৫*

১৯ *Bible*, St. John. 8.58

চান। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তিনি দ্বারে দ্বারে যেতে লাগলেন। তাঁর পিতা মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পুত্রের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমাদের এই মহান রাজপরিবারের কারও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করা শোভন নয়।' কিন্তু বুদ্ধকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে আনা যায়নি। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'মহারাজ, আপনি রাজবংশের উত্তরপুরুষ বলে নিজেকে মনে করেন, কিন্তু আমার বংশ একেবারেই ভিন্ন। বুদ্ধগণের বংশে আমার জন্ম এবং তাই তাঁদের মতোই আমি বদান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করি—এর অন্যথা হতে পারে না।' তাঁর চেতনা ছিল সাধারণের থেকে অন্যস্তরের। আত্মা যে কোন বংশধারার থেকেও প্রাচীন সে কথা ভুলে গিয়ে কত সময়ই না আমরা বংশধারা নিয়ে বাড়াবাড়ি করি।

অন্যান্য সেমিটিক (Semitic) ধর্মের মতো ইসলামধর্মও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু পারস্য দেশে এই ধর্মের প্রসার হলে অন্যান্য মতবাদের সঙ্গে এর সংস্পর্শ ঘটে, ফলে সুফিবাদ নামে এক মরমিয়া সাধন-ধারা প্রবর্তিত হয়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক জালালুদ্দীন রুমী তাঁর একটি কবিতায় এই ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন :

> শিলারূপে মৃত্যু হলে আমি জন্মেছিলাম উদ্ভিদ হয়ে,
> উদ্ভিদরূপে মৃত্যু হলে জন্মেছিলাম পশুরূপে,
> পশুরূপে মৃত্যুর পর এসেছিলাম মানুষ হয়ে।
> কেন হবে ভয়? মৃত্যুতে কখনো হয়েছি কি ছোট?
> আরও একবার লভিব মৃত্যু মানুষরূপের ঊর্ধ্বে বিরাজিতে
> পুণ্যবান দেবতাদের সাথে; তবু দেবতার জীবনও
> আমাকে অতিক্রম করতে হবে; সবার বিনাশ আছে, ঈশ্বর ছাড়া।
> দেবতার কায়া ত্যাগ করি মনাতীত অবস্থা লাভ করিব আমি।
> চাই না এই অনিত্য জীবন। কারণ সকল অনিত্যের
> হলে অবসান, "ফিরিব সচ্চিদানন্দে"।[২০]

## শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন থেকে নজির[২১]

শ্রীরামকৃষ্ণ একদা বলেছিলেন, "সেদিন... দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বলল, আমি যুগে যুগে অবতার।"[২২] তাঁর দেহত্যাগের

২০ Quoted by R. A. Nicholson in '*The Mystics of Islam*,' (London : Routledge and Kegan Paul. 1963) p. 168

২১ Eastern and Western disciples. The Life of Swami Vivekananda, Kolkata : Advaita Ashrama, Vol. I 1979 and Vol. II. 1981

২২ পূর্বোক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৭৬২

কয়েকদিন পূর্বে তাঁর প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি প্রভুকে বলতে শুনেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর ভিতরে আবির্ভূত। কিন্তু কোন প্রমাণ ছাড়া বিবেকানন্দ কিছু স্বীকার করার পাত্র ছিলেন না। এক অদ্ভুত চিন্তা তাঁর মাথায় এসে পড়েঃ "এখন, তাঁর দেহত্যাগের প্রাক্কালে, যদি তাঁকে বলতে শুনি যে, ঈশ্বরই তাঁর শরীরে আবির্ভূত হয়েছেন, তবেই তাঁকে ঠিক ঠিক অবতার বলে বিশ্বাস করব।" এই ভাব তাঁর মনে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু তাঁর দিকে ফিরে স্পষ্টভাবে বললেন, "এখনো অবিশ্বাস? যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণরূপে জন্মেছে।" পূর্বে প্রভুর কথা বিশ্বাস না করার জন্য বিবেকানন্দ খুব লজ্জিত হলেন।

প্রভুর নিকট বিবেকানন্দ যখন প্রথমবার আসেন তখন তিনি মেধাবী, মার্জিতরুচি কলেজের ছাত্র নরেন্দ্র। প্রভু তাঁকে বলেছিলেন, "আমি জানি তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।" যুবক নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন, "আমার পিতা থাকেন কলকাতায়, আমি কেমন ধরনের মানুষ তা আমি জানি; অথচ তিনি বলছেন, 'আমি পুরাতন ঋষি'।" তিনি স্থির করলেন যে, প্রভু নিশ্চয় পাগল হয়েছেন।

যাই হোক, নরেন্দ্র আবার প্রভুর কাছে গেলে প্রভু তাঁকে ইন্দ্রিয়াতীত প্রত্যক্ষ অনুভূতির রাজ্যে আরূঢ় করান এবং সেই অবস্থায় শিষ্যটি সম্বন্ধে যা জ্ঞাতব্য ছিল জেনে নেন। পরবর্তী কালে এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, "আমি তাকে তার পরিচয়, গতিবিধি, জগতে তার উদ্দেশ্য ও আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সেও নিজ অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে যথাযথ উত্তর দিয়েছিল। তার সম্বন্ধে যা কিছু দেখেছিলাম ও ভেবেছিলাম ঐ উত্তরগুলিতে তার সমর্থন পাওয়া গেল। সে-সকল কথা গোপন রাখা প্রয়োজন, আমি জেনেছি যে, সে ধ্যানসিদ্ধ ঋষি ছিল—পূর্ণ অনুভূতি লাভ করেছিল, যেদিন সে তার সত্য স্বরূপ জানতে পারবে, সেদিন আর ইহলোকে থাকবে না, স্ব-ইচ্ছায় যোগমার্গে শরীর ত্যাগ করবে!"

মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য বিবেকানন্দ এক তীব্র কর্মময় জীবন কাটিয়েছেন; সে জীবনের তীব্রতা এত বেশি যে, তাঁর শরীর তা সহ্য করতে পারেনি। তাঁর মহাসমাধির কয়েকদিন অগে—যা ঘটেছিল তাঁর চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই—তাঁর কয়েকজন গুরুভাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ "তুমি কে তা কি জানতে পেরেছ?" গম্ভীরভাবে তিনি বলেছিলেনঃ "হ্যাঁ, আমি এখন জানি।"—এর পরেই এসে পড়ল এক গভীর নিস্তব্ধতা, যা তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইরা ভাঙতে সাহস করেনি।

এর অল্পকাল পরে মহাসমাধি লাভের ঠিক তিন দিন আগে স্বামীজী মঠ-বাড়ির নিকটে গঙ্গার তীরে একটি স্থান নির্দেশ করে বলেন : "আমি দেহত্যাগ করলে, ঐখানে দাহ করবে।" স্থানটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর যেখানে ভস্মীভূত করা হয়েছিল, তার অপর পারে ঠিক বিপরীত স্থানে।

স্বামীজী তাঁর কয়েকজন গুরুভাইকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।" তাঁর দেহত্যাগের দিনে তিনি ঠাকুরঘরে একলা তিন ঘণ্টা ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এরপর তিনি একটি সংস্কৃত ক্লাসে পড়ান, মাঝে মাঝে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং হাস্য রসাত্মক গল্প করে পাঠ বুঝিয়ে দেন। পরে, বেশ খানিকটা বেড়িয়ে এসে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করেন। সন্ধ্যা হতে স্বামীজী ক্রমে বেশি বেশি অন্তর্মুখী হয়ে নিজ ঘরে গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যানে বসলেন। তিনি বলে রেখেছিলেন, কেউ যেন তাঁকে না ডাকে। এক ঘণ্টা পরে তিনি মঠের এক সাধুকে ডেকে হাওয়া করতে বলেন। এরপর তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েন। তাঁর হাত দুটি একটু কেঁপে ওঠে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর হতে থাকে। তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়, মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে এবং সব শেষ হয়ে যায়। আত্মা দেহ ত্যাগ করে চলে গেল। এই কি মৃত্যু?

সংস্কৃত সাহিত্যে একে মৃত্যু বলে না; বলে *মহাসমাধি*। সাধারণ *সমাধিতে* আত্মা ইন্দ্রিয় জগতে পুনরায় ফিরে আসে, কিন্তু *মহাসমাধিতে* জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হলে, আত্মার কাছে শরীরের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে আত্মা দেহমুক্ত হয়ে জ্ঞানাতীত অবস্থায় অবস্থান করে।

স্বামীজীর *মহাসমাধির* সময় তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূর্বাশ্রমে যাঁর নাম ছিল শশী—মাদ্রাজে স্বামীজীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছুক্ষণ পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ধ্যানে বসার পরেই শুনতে পেলেন কেউ তাঁকে ডেকে বলছেন : "শশী, শশী, আমি শরীরটাকে থুতু ফেলার মতো ত্যাগ করেছি।"[২৩] এ কণ্ঠস্বর তাঁর পরিচিত। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলেন, ঐ কণ্ঠস্বর স্বামীজীরই।

শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে (পরবর্তী কালের স্বামী ব্রহ্মানন্দকে) বৃন্দাবনের রাখাল বালক বলে উল্লেখ করতেন। একদিন ভাবে তাঁর এক আশ্চর্য দর্শন হলো—তিনি দেখেন এক প্রস্ফুটিত শতদল পদ্ম, প্রতিটি দলে অপূর্ব সৌন্দর্যের দ্যুতি, সেই পদ্মের উপরে দুটি বালক নৃত্যরত, তাদের পায়ে নূপুর। একজন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অপরজন

---

২৩ *The story of a Dedicated life* : (Madras, Sri Ramakrishna Math, 1958.), p. 139

রাখাল।[২৪] স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে যেমন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের ক্ষেত্রেও ঠাকুরের ভাব-দর্শন পরবর্তী কালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। মৃত্যু-শয্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এক অপূর্ব ভাবদর্শনে দেখলেন—অনুপম সৌন্দর্যে মণ্ডিত বালক শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করতে বলছেন। গভীর ভাবাবস্থায় মহারাজ বলে উঠলেন ঃ "আমিই রাখাল বালক, আমার পায়ে নূপুর পরিয়ে দে—আমি কৃষ্ণের সঙ্গে নাচব। তোরা কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের কি চোখ নেই; আমার খেলা এবার সাঙ্গ হলো। দেখ দেখ গোপাল আমাকে আদর করছে। সে আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলছে। আমি আসছি।"[২৫]

## আমরা অমর কিন্তু আমরা তা জানি না

কেউ হয়তো বলতে পারেন, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এই রকম উচ্চ অবস্থার মহাপুরুষেরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবার পূর্বেও ছিলেন তাতে আমাদের মতো সাধারণ লোকের কি এসে যায়? এ বিষয়ে বেদান্তের উত্তর এই, আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে আত্মা রয়েছেন তিনি জন্ম ও মৃত্যুর অতীত, কিন্তু অজ্ঞানবশত আত্মা ভোগ বাসনায় দেহের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন। অজ্ঞানীর পক্ষে জীবন শেষ হয়ে গেলেই শরীরের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আত্মা বার বার নতুন নতুন দেহে ফিরে আসে যতদিন না তার নির্বাসনা বোধ হয়—এইটিই জ্ঞানোন্মেষের পূর্বাবস্থা। আর এই জ্ঞানই জীবকে জন্ম-মৃত্যু-চক্রের পারে নিয়ে যায়।

আমাদের আচার্যগণ বলেছেন যে, মনুষ্য-জন্ম অতি দুর্লভ। এই জীবনেই আমাদের পূর্ণতা ও সত্য উপলব্ধির সুযোগ আছে। কারণ শুধু অবতার ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ নন, আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষও সেই একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। প্রকাশে তারতম্য আছে, তাতে সন্দেহ নেই, তবে ঈশ্বর-সত্তা সর্বত্র একই। সমুদ্রের তুলনা দেওয়া হয়েছে, ঢেউ ও বুদ্‌বুদ্—বস্তু হিসাবে এক, কেবল প্রকাশে ভিন্ন। স্বামী বিবেকানন্দ বার বার বলেছেন ঃ "আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।... আত্মার এই ব্রহ্ম-ভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।"[২৬]

অন্তরের এই ঈশ্বরভাব সম্বন্ধে স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন ঃ "... আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা মুক্ত ও নিত্য। কিন্তু তা শরীর নয়, মনও নয়। শরীর প্রতিমুহূর্তে মরছে, মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। শরীর একটি যৌগিক পদার্থ, মনও তাই; অতএব তারা কখনো পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিন্তু এই

---

২৪ দ্রঃ Swami Prabhavananda, *The Eternal Companion*, (Madras : Sri Ramakrishna Math, 1971, p. 20)

২৫ তদেব, পৃঃ ১৩৭

২৬ পূর্বোক্ত *বাণী ও রচনা*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫

স্থূল জড়বস্তুর ক্ষণিক আবরণের ঊর্ধ্বে, এমনকি মনের সূক্ষ্মতর আবরণেরও ঊর্ধ্বে সেই আত্মা বিরাজমান, যা মানুষের প্রকৃত সত্তা, যা চিরস্থায়ী ও চিরমুক্ত। তারই মুক্ত-স্বভাব মানুষের চিন্তা ও বস্তুর স্তরের মধ্যে দিয়ে অনুস্যূত হচ্ছে এবং নানারূপের বর্ণপ্রলেপ সত্ত্বেও স্বীয় শৃঙ্খলহীন অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। অজ্ঞানের ঘনীভূত স্তরের আবরণ সত্ত্বেও, তাঁরই অমরত্ব, তাঁরই পরমানন্দ, তাঁরই শান্তি, তাঁরই ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হয়ে স্বীয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই ভয়শূন্য, মৃত্যুহীন, মুক্ত আত্মাই প্রকৃত মানুষ। ...মুক্ত, অবিকারী ও বন্ধনহীন এই যে জীবাত্মা, এই যে মানবাত্মা, এটিই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ; এর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। 'এই মানবাত্মা অজ, অমর, শাশ্বত ও সনাতন'।[২১]

বিশ্বাস, ভক্তি ও ধ্যানের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। একই আত্মা আমাদের জীবাত্মাকে যেমন উদ্ভাসিত করছে, তেমনি করছে অন্যান্য সকলের জীবাত্মাকে। একই জ্ঞানালোক আমরা সকলে প্রতিফলিত করছি। এক অনন্ত আত্মাই সকল জীবাত্মার মধ্যে প্রকাশিত হন। আত্মজ্ঞানে অপরোক্ষানুভূতি হয় যে, প্রত্যেক জীবাত্মাই সেই সর্বানুস্যূত পরমাত্মার আংশিক প্রকাশ মাত্র। আত্মজ্ঞান লাভ হলে সকল অজ্ঞান ও বাসনা, তা যত সূক্ষ্মই হোক, নাশ হয়ে যায়। তাই আসুন, আমরা আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্তর্যামী ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করে জন্ম মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করি। আবার এমনও হতে পারে যে, আত্মজ্ঞান লাভের পর, আমাদের পৃথিবীতে ফিরতে হলো অন্যকে দিব্যজ্ঞান, অধ্যাত্ম চেতনা ও মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন লাভে সহায়তা করতে।

---

২১ বাণী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮-৩৯

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা

## পরব্রহ্মের অন্বেষণ

মানব সভ্যতার একেবারে আদি থেকেই আমরা দেখতে পাই—বিশ্ব রহস্য জানবার জন্য মানবের চেষ্টা চলেছে। একদিকে, সে যেমন জটিল ক্ষেত্রসমূহ ও অসংখ্য জীবসমেত দৃশ্যমান প্রকৃতির বিশ্লেষণে প্রয়াসী, অন্যদিকে তেমন বিশ্বের আদি কারণ অনুসন্ধানেও সে সচেষ্ট। মানব মনের এই চির-পুরাতন প্রশ্ন নিয়েই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শুরু ঃ

"ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পর আলোচনা করছেন ঃ জগৎ কারণ কি? ব্রহ্মই কি কারণ? আমরা কোথা হতে উৎপন্ন হয়েছি? কেন, কার দ্বারা জীবিত আছি? আমাদের শেষ বিশ্রাম কোথায়? কার পরিচালনাধীনে আমাদের মতো ব্রহ্মবিদের সুখ-দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা হয়ে থাকে?"[১]

পরের শ্লোকে, পরস্পর জিজ্ঞাসারত ঐ ব্রহ্মবাদিগণ সম্ভাব্য জগৎ-কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূত, বস্তু, তেজ, মন বা অহংকার জগৎ-কারণ হতে পারে কি না, তা বিচার করেন ও সিদ্ধান্তে আসেন যে, এরা বা এদের সংহতি কারণ হতে পারে না। কেন না এরা অন্যের ওপর নির্ভরশীল।[২] 'শুধু যুক্তি বিচারের দ্বারা ঐ মূল প্রশ্নগুলির সমাধান পাওয়া সম্ভব নয় বুঝে ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যান অভ্যাস করতে থাকেন। তাঁরা গভীর ধ্যান-সহায়ে সর্ব জীবে স্ব-প্রকাশ-শক্তি, ব্রহ্মনামে খ্যাত কাল থেকে অহং পর্যন্ত সব কিছুর কার্যাবলীর নিয়ন্তা, অবিকারী পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।'[৩] এই পরমাত্মার স্বরূপ কি? আমরা দেখতে পাই যে, বৈদিক যুগের শুরু থেকেই হিন্দু ঋষিগণ এই বিষয় নিয়ে জল্পনা কল্পনা করেছেন। ঋগ্বেদের (১০.১২৯.১-৩) 'নাসদীয় সূক্তে' বলা হয়েছে ঃ

***তখন অসৎ ছিল না সৎ-ও ছিল না, পৃথিবীও না, তার পারে অন্তরীক্ষও না।***

---

১ *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্*, ১/১

২ তদেব, ১/২

৩ তদেব, ১/৩

*কে আবরণ করবে? কোথায়ই বা করবে? কে আশ্রয় দেবে? অগাধ জলরাশি ছিল কি? ॥ ১॥*

*তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃতত্বও না; দিন রাত্রির চিহ্নও সেখানে ছিল না। তিনি একাই শ্বাসহীন হয়ে নিজ স্বভাবে শ্বাস নিতেন—অন্য কিছুই ছিল না ॥ ২॥*

*তখন আঁধার ছিল, প্রথমে সবই আঁধারে ঢাকা অভিন্ন এক সত্ত্বা ছিল। তখন সব কিছুর অস্তিত্ব ছিল বস্তুহীন ও রূপহীন, তপস্যার প্রভাবেই ঐ একত্বের উৎপত্তি হলো ॥ ৩॥*[৪]

উপরোক্ত শ্লোকগুলি ব্রহ্মের সৃষ্টি-পূর্ব অদ্বৈত স্বরূপ বর্ণনা করেছে। শুদ্ধ জ্ঞানাতীত সত্তার ধারণাও যেন অদ্বৈত সত্যকে সীমিত করে ফেলে। তাই পরবর্তী কালে উপনিষদে দেখা যায় যে, পরম সত্যকে 'নেতি' 'নেতি' বলে বোঝানো হয়েছে।

সাংখ্যদর্শন নামে আর এক চিন্তাধারায় সত্য বস্তুর ধারণা অন্যরকম। সাংখ্য মত হিন্দু দর্শনের খুবই প্রাচীন, হয়তো প্রাচীনতম মত। এর প্রভাব অন্য সব দার্শনিক মতের উপর পড়েছিল। সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান হিন্দুধর্মের প্রায় সব মতেই স্বীকৃত হয়ে থাকে। সাংখ্যের দুটি মূল ভাগ হলো পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষকে আত্মা এবং প্রকৃতিকে মন ও ইন্দ্রিয়াদি-সহ সকল পদার্থের মূলাধার বলা হয়। চেতন প্রাণীর সংখ্যা যত পুরুষের সংখ্যাও তত। বেদান্তের দৃষ্টিতে যা জীব (জীবাত্মা) তাই সাংখ্যের দৃষ্টিতে পুরুষ। বেদান্ত ও সাংখ্য—উভয় মতে জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনন্ত শাশ্বত শুদ্ধ চৈতন্য। কিন্তু অজ্ঞানতাবশত জীবাত্মা দেহ ও মনের সঙ্গে নিজের একাত্মতা বোধ করে এবং বার বার জীব-দেহে জন্মগ্রহণ করে। সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ কতকটা অদ্বৈত বেদান্তের বিশ্ব-অজ্ঞান বা মায়াবাদের মতো। উভয় দর্শনেই আত্মা ও অনাত্ম পদার্থ সম্বন্ধে বিচারসম্ভূত জ্ঞানকেই জীবের বন্ধন-মুক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে করা হয়েছে। এইগুলিই সাংখ্য ও বেদান্তের মিলন সূত্র।

কিন্তু বেদান্তে এক চরম সত্য বা ব্রহ্মের ধারণা পাওয়া যায়, যিনি স্বভাবত সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, তিনিই নিজেকে জীবাত্মা ও ভূতবস্তুরূপে প্রকাশ করেন। আবার সাংখ্যে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের কোন স্থান নেই, যেমন বেদান্তে আছে। এখানে সকল জীবাত্মাই একই শ্রেণীভুক্ত এবং সাংখ্য ও যোগ দর্শনে যদি কোন ঈশ্বরের প্রসঙ্গ থাকে, তবে তিনি কেবল বিশেষ শ্রেণীর পুরুষ, যিনি সদামুক্ত ও সকল গুরুর গুরু। কিন্তু তিনি স্রষ্টা নন। পতঞ্জলি বলেন, এই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও আত্মসমর্পণ দ্বারা সাধক সরাসরি *সমাধি* লাভ করতে পারে। বিশ্বসৃষ্টি ও লয় অনন্তকাল চলে থাকে প্রকৃতির অন্তরে। বেদান্তে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভের

---

৪ নাসদীয় সূক্ত, ঋগ্বেদ, ১০.১২৯.১-৩

স্থান ঈশ্বরের নিচে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ঈশ্বর হলেন মানুষের কাছে পরব্রহ্মের সর্বোচ্চ ধারণা ।

বেদান্তের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বিষ্ণু, শিব বা দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীকে পরমেশ্বর বা ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলে গণ্য করা হয়েছে। অবতার পুরুষদেরও প্রায়ই ঈশ্বরের থেকে অভিন্ন বলে ধরা হয়েছে। *ভাগবত* শ্রীকৃষ্ণকে একজন ঈশ্বরাবতার বলে মানতে রাজি নয়; বলা হয়েছে তিনি স্বয়ং ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু নন, *কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং*।[৫] শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবতা ও ঋষিদিগের প্রার্থনায় আমরা এই ভাবটি লক্ষ্য করি ঃ

আপনার নিকট থেকে তেজ লাভ করেই মায়াশক্তিসহ অলঙ্ঘবীর্য পুরুষ 'মহৎ'কে নিজ অন্তরে ধারণ করেন, যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভাবস্থা। মায়ার সাহায্যেই এই মহৎ নিজ অন্তর থেকেই প্রকাশ করেছেন—বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট এই স্বর্ণময় ব্রহ্মাণ্ড গোলক।[৬]

পরমেশ্বরের সঙ্গে অবতার পুরুষের অভিন্ন ভাবের কথা গীতাতেও বলা হয়েছে ঃ

ইহলোকে দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ; ক্ষর ও অক্ষর। সব জীবই ক্ষর এবং যা কূটস্থ (যা শঙ্করের মতে মায়া বা আদি অজ্ঞানকেই নির্দেশ করে) তাই অক্ষর। কিন্তু আর একটি রয়েছে, তা হলো সর্বোত্তম আত্মা—অবিকারী পরমাত্মা, যিনি ত্রিলোকে অনুস্যূত থেকে তাদের পরিপালন করেন। আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষর থেকেও উত্তম, তাই জগতে ও শাস্ত্রে আমি পুরুষোত্তম নামে অভিহিত।[৭]

## আধ্যাত্মিক জীবনে ব্যক্তি বা সাকার ঈশ্বরের স্থান

শুদ্ধ ব্যক্তি ঈশ্বরের মধ্যে ভক্ত সান্ত ও অনন্তের এক যোগসূত্র দেখতে পান। প্রথমে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের অপূর্ব মাধুর্যে আকৃষ্ট হন এবং পরে তার মাধ্যমে তাঁর অনন্তের উপলব্ধি হয়।

আমাদের অনুভূতিগুলিকে কোন কিছুতে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন, আর আমরা যদি কোন পবিত্র প্রতিমা বা ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট না হই, তবে স্বাভাবিকভাবেই আমরা কোন মানবমূর্তিকে বেছে নিই এবং তাতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু যদিও প্রথমে এইসব মহাপুরুষের মানবিক গুণগুলিই আমাদের আকর্ষণ করে, পরে তাঁদের ঈশ্বরীয় সত্তা আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। এখানেই ঈশ্বরাবতারের পুজোর

---

৫ শ্রীমদ্ভাগবত, ১/৩/২৮

৬ তদেব, ১১/৬/১৬

৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৫/১৬-১৮

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি বাড়ি করতে গেলে আমাদের একটি নকশা (Model) লাগে। আমরা দেখতে পাই অবতার পুরুষদের দেহ ও মন যেন কাচের আধার আর তার ভেতর থেকে বিরাট চৈতন্য প্রকাশ পাচ্ছেন; আর আমাদের দেহ-মন বড় জোর লোহার খাঁচার মতো। এই লোহার খাঁচাকে কাচের আধারে রূপান্তরিত করাই আমাদের কাজ। অবতার পুরুষগণ নিজেদের অতিমানবিক আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে লোহার খাঁচাকে কাচের আধারে রূপায়িত করার উপায় আমাদের দেখিয়ে গেছেন। এইসব অবতার পুরুষদেরও নিয়মিত আধ্যাত্মিক সাধনা ও অভ্যাস সহায়ে নিজ নিজ শরীর ও মনের পূর্ণ উৎকর্ষতা অর্জন করতে হয়েছিল। তাঁদেরও শরীর-মনকে সম্পূর্ণ ঠিক রাখতে হতো। পুরাণে এইসব মহাপুরুষদের জীবন-বর্ণনায় দেখা যায় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আদর্শের এক আশ্চর্য সমন্বয়। তাঁদের ক্ষেত্রে অতিচেতন অবস্থার প্রকাশ হয় চেতন অবস্থার মাধ্যমে। আমরা যদি তাঁদের মানবীয় ভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হই, তবে কালে আমরাও তাঁদের ঈশ্বরীয় ভাবের সংস্পর্শে আসব।

এমনকি একনিষ্ঠ অদ্বৈতবাদীও আমাদের কাছে তাঁদের চিন্তারাশি এমন ভাবে তুলে ধরতে প্রস্তুত, যা আমরা বর্তমান স্তরে থেকেও বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারি। তিনি আমাদের হাত ধরে উচ্চ থেকে উচ্চতর সত্যে নিয়ে যেতে আগ্রহী। একটি অবস্থায় প্রতিমা-উপাসনার প্রয়োজন আছে; তবে এই অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে। মানুষ যদি তার সকল অনুভূতি ও আবেগের আশ্রয়স্থলরূপে কোন পবিত্র মূর্তিকে গ্রহণ না করে, তবে সে বীভৎস কোন এক মানব মূর্তিকে, পুতলনাচের ছেলে বা মেয়ে পুতুলকে গ্রহণ করে, তার পুজো করতে থাকবে ও তার দাসে পরিণত হবে।

কোন্ প্রতিমা ঠিকতর : রক্ত-মাংসের একটি সাধারণ মূর্তি, না সেই মূর্তি যা উচ্চতর কোন আদর্শের প্রতীক? সাধারণ মনুষ্য-মূর্তিতে কোন উচ্চতর আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। আবার তুমি যদি অমূর্তের (Abstract) কথা ভাব, তবে অমূর্ত অমূর্তই থেকে যাবে, এদিকে পুরুষ বা নারী-রূপী মানবীয় পুতুলগুলি তোমাদের সব মনকে টেনে নেবে, সেগুলিই প্রকৃত সত্য বলে মনে হবে, আর অন্য সব কিছুই তার পেছু পেছু চলবে—যেন তাই স্বাভাবিক।

আমাদের ব্যক্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র, আমাদের পুরুষ বা নারী-রূপ থেকে স্বতন্ত্র, আমাদের নিজ অন্তরের দিব্যসত্তাকে আমরা যত বেশি অনুধ্যান করতে পারব, অন্যদের স্থূল শরীর ও ব্যক্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র, তাদের অন্তরের দিব্যসত্তাকেও আমরা তত বেশি ধারণা করতে পারব। আর তখনই আমরা নিরাপদ হব। তাহলে আমরা আর কখনো কোন পুরুষ বা নারী-রূপ পুতুলের দাস হব না।

মানুষ যে ঈশ্বরকে জানতে চায়, তাঁর স্বরূপের ধারণা সকলের সমান নয়;

নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশের তারতম্যের উপর এটি নির্ভর করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে 'ওই ঈশ্বর', অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে যে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে তিনি এই সব হয়েছেন—যা কিছু দেখছি সবই তাঁর এক একটি রূপ।"[৮]

আবার ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার রূপের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি সুন্দরভাবে বলেছেন ঃ "কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নেই—ভক্তি-হিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে, কখনো কখনো সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না।"[৯]

## প্রাচীন ভারতে ঈশ্বরীয় ধারণার পরিবর্তন

হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার কথা বলা হয়েছে। কোন কোন সাধক ঈশ্বরকে সগুণ ও সাকার বলে বর্ণনা করেন। তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে নিতে চান। আবার অনেকে বলেন, ঈশ্বর অমিত তেজ, জ্ঞান ও অন্যান্য গুণবিশিষ্ট এবং মনে করেন নিরাকার হয়েও তিনি বহু রূপ ধারণ করেন। ঈশ্বরের ব্যক্তি বা সাকার ভাবের কথা জানলেও, তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দেন তাঁর নিরাকার ভাবের উপর, যার থেকে সাকার রূপের অভিব্যক্তি।

অধিকাংশ ভক্তই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম দিকে ঈশ্বরে মানুষের রূপ ও ভাব আরোপ না করে বা তাঁকে নিজের থেকে পৃথক না ভেবে পারে না। কখনো কখনো আমরা দেখি যে, একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা অর্জিত আত্মশুদ্ধির ফলে ভক্ত যাঁকে এতদিন বাহ্য বস্তুরূপে পূজা করে এসেছে অন্তরে তাঁরই দর্শন পান। তারপর তিনি তাঁকে "কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, প্রাণেরও প্রাণ"[১০] রূপে, অন্তরাত্মারূপে উপলব্ধি করেন। এরপর ভক্ত একমাত্র ঈশ্বররূপেই তাঁর দর্শন পায়, যিনি "অগ্নিতে অবস্থিত, যিনি জলে অধিষ্ঠিত, যিনি ওষধিসমূহে প্রতিষ্ঠিত, যিনি বনস্পতিসমূহে বিরাজিত, যিনি নিখিল জগতে অনুস্যূত, যিনি নারী ও নর, যিনি কুমার ও কুমারী; যিনি জরাগ্রস্ত হয়ে দণ্ডসহায়ে স্খলিত পদে চলেন এবং যিনি নানা রূপে জন্ম নেন।"[১১]

---

৮ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৩৯৪

৯ তদেব, পৃঃ ৯৯

১০ *কেনোপনিষদ্*, ১/২

১১ *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্*, ২/১৭; ৪/৩

তার কাছে ঈশ্বর এখন সর্বভূতে ও সর্ব বস্তুতে প্রকাশিত এক পরম তত্ত্ব। তিনি কেবল দেবতারই দেবতা নন, তিনি সকলেরই সদাত্মা, বিশ্বপ্রাণ। আরও এগিয়ে চলার পরে, সাধক তাঁকে উপলব্ধি করেন তুরীয় সত্তারূপে, যিনি 'বাক্য ও মনের অতীত।'[১২] 'যিনি অদৃশ্য, বৈশিষ্ট্যহীন, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, মূলত চৈতন্যস্বরূপ কেবল আত্মা, ...শান্ত, পরমানন্দ ও অদ্বিতীয়।'[১৩]

বৈদিক ঋষিদের উপাস্য ছিলেন বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, সূর্যের গতিপথের নিয়ন্তা মিত্র; উজ্জ্বল নীলাকাশে অবস্থিত ও অনুতপ্তের পাপ মোচনকারী দেবতা বরুণ; কখনো কখনো পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় বা বন্ধুরূপে কথিত আগুনের দেবতা অগ্নি,[১৪] জগতে প্রাণ ও কর্মকে যিনি সতেজ করে রাখেন সেই সূর্যমণ্ডলের দেবতা সবিতৃকে, আবাহন করা হতো ভক্তদের বিবেক বুদ্ধি সৎপথে চালিত করার জন্য।[১৫] লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আধ্যাত্মিক চেতনার ঊষালগ্নেই কয়েকজন বৈদিক ঋষি প্রতিটি প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির পিছনে অন্তরাত্মার উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। তাঁদের ধারণাকে বাহ্যত বহু-ঈশ্বরবাদ মনে হলেও তার মধ্যে একেশ্বরবাদের ধারণা নিহিত ছিল, কারণ একের পর এক প্রত্যেকটি দেবতাকে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও এমনকি সর্বব্যাপিরূপে আবাহন ও উপাসনা করা হতো। এই বিষয়টি একটি প্রসিদ্ধ স্তোত্রে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, "মুনিগণ একই সত্যের নানা নাম দিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলে সম্বোধন করেন।"[১৬]

ঋক্‌বেদের যুগের পর হিন্দুধর্মে, বিশেষ করে উপাসনা ও প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত প্রতীক ও নামের ক্ষেত্রে, এক বিপ্লব ঘটে যায়। এক সময়ে যে সকল নামের গুরুত্ব তেমন ছিল না পরে তারাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠে ও বহু দেবতার সঙ্গে নতুন নতুন দেবতার নামও যুক্ত হয়। পরবর্তী কালে শিব, বিষ্ণু ও দেবী এবং রাম ও কৃষ্ণের মতো অবতার পুরুষদের পূজা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে এসব লক্ষণীয় পরিবর্তনের মধ্যেও হিন্দু সাধকের পরম দেবতা সম্বন্ধে ধারণা, তার সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আশা, আকাঙ্ক্ষা, তার দৈব সহায়তা ও নির্দেশ অনুসন্ধানের ইচ্ছা এবং পরম দেবতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগের জন্য ব্যাকুলতা অপরিবর্তনীয় থেকে যায়। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এটা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যে, এক নৈর্ব্যক্তিক বা নিরাকার তত্ত্বই ঈশ্বরের সকল ব্যক্তিভাবের পটভূমি এবং বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে উপাসিত সমস্ত দেব দেবীর ধারণার উৎসস্বরূপ। বস্তুত অদ্বৈতবাদ অনুসারে যে কোন প্রতীক

---

১২ *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌*, ২/৪/১, ২/৯/১

১৩ *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌*, ৭

১৪ *ঋগ্বেদ*, ১/১/৯

১৫ তদেব ৩/৬২/১০

১৬ একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। —তদেব, ১/১৬৪/৪৬

অবলম্বন করে বা ব্যক্তিত্বের উপাসনা দিয়ে অধ্যাত্ম জীবন শুরু করলেও আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্য হলো নৈর্ব্যক্তিক বা একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতিতে সাধকের অনন্তে লীন বা একীভূত হয়ে যাওয়া। এ অবস্থায় মানব ও ঈশ্বর এবং ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে সকল ভেদ নাশ হয়ে যায় ঃ কেবল একমেবাদ্বিতীয়ম্ই থাকে।

উপরোক্ত অনুভূতি অবলম্বনে প্রচলিত হিন্দুধর্মে অনেক রকম অদ্বৈত ভাবের ধ্যান নিহিত আছে যাতে অনাত্ম বস্তুকে অস্বীকার করে একমাত্র আত্মাকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য তাঁর 'নির্বাণ-ষট্কম্' স্তবে বলেছেন ঃ

*আমি মন, বুদ্ধি, চিত্ত বা অহঙ্কার নই, কর্ণ বা জিহ্বা নই, নাসিকা বা চক্ষু নই। আকাশ বা ভূমি নই, অগ্নি নই, বায়ুও নই। আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। আমি সর্বব্যাপী আত্মাস্বরূপ, আমি সর্বব্যাপী আত্মাস্বরূপ।*[১৭]

*আমি নির্বিকল্প, অবিকারী, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বত্র বিদ্যমান। আমি ইন্দ্রিয়াসক্তির স্পর্শাতীত। আমি মুক্তিও নই, কারণ কখনো বদ্ধ হইনি; আমি সব আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত। আমি সর্বব্যাপী আত্মাস্বরূপ, আমি সর্বব্যাপী আত্মাস্বরূপ।*[১৮]

এই রকম ধ্যান উপনিষদের সাহসী ঋষিগণ কূটস্থ ব্রহ্মের ধ্যানে চরম সত্য উপলব্ধির জন্য যে পথ অনুসরণ করেছিলেন তারই অনুরূপ।

*ইনি (ব্রহ্ম) অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ ... অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক, অমনঃ, অনন্তর বা অবাহ্য।*[১৯] *... এই কূটস্থ (আত্মা) ... অদৃশ্য কিন্তু দ্রষ্টা, ... মননের অবিষয় হয়েও মন্তা : অবিজ্ঞাত হয়েও বিজ্ঞাতা।*[২০]

চরম জ্ঞানাতীত সত্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর অতি মহিমান্বিত ধারণা ছাড়া প্রাচীন ভারতে গড়ে উঠেছিল এক সর্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের ধারণা, যে তত্ত্ব নানা রূপে নিজেকে বিকশিত করেও সতত অনন্ত ও অরূপ। একেই পরে 'সগুণ-অদ্বৈতবাদ' বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করা হয়। বহু সাধক এই ঈশ্বরতত্ত্বের উপাসনাই পছন্দ করেন, কারণ ঈশ্বরের ব্যক্তিভাবে তাঁদের কোন আগ্রহ নেই। উপনিষদেও এই সর্বানুস্যূত ঈশ্বরতত্ত্বের ধ্যানপ্রসঙ্গের উল্লেখ আছে ঃ

*তিনি নিম্নে, তিনি ঊর্ধ্বে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনি অবশ্যই সর্বত্র সর্ববস্তুতে।*[২১]

---

১৭ *শঙ্করাচার্য,* নির্বাণষট্কম্, স্তোত্র ১

১৮ তদেব, স্তোত্র ৬

১৯ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্,* ৩/৮/৮

২০ তদেব, ৩/৭/২৩

২১ *ছান্দোগ্যোপনিষদ্,* ৭/২৫/১

> *তিনি সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর, বিশালতম থেকেও বিশালতর, এই আত্মা সকল জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত।*[২২]

> *তিনি পৃথিবী, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সকলের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান। তিনি অন্তরে থেকেই প্রত্যেকটি বস্তুকে ও প্রত্যেকটি জীবকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি অন্তর্যামী নিয়ন্তা; উপাসকের অমর আত্মা।*[২৩]

ভক্ত-সাধক ঈশ্বরের থেকে নিজের একটু পার্থক্য রেখে দেন। সে নিজেকে জীবাত্মা মনে করে আর ঈশ্বরকে সর্বভূতাত্মা বা পরমাত্মারূপে দেখে।

## ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার ভাব

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভগবদ্গীতায় বলেছেন : 'যাদের চিত্ত নিরাকারভাবে আসক্ত তাদের অধিকতর ক্লেশ পেতে হয়। কারণ সুউচ্চ জ্ঞানাতীত অবস্থায় (নিরাকার প্রাপ্তি) পৌঁছানো দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর।'[২৪] তাই হিন্দুধর্মের প্রায় সকল অধ্যাত্ম-সাধনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি (সাকার) ভাব বা প্রতীকের মাধ্যমে নিরাকারের উপাসনা ও ধ্যান সাধারণের কাছে সর্বাধিক প্রিয়। সাধক ঈশ্বরকে অনন্ত গুণের গুণবিশিষ্ট সাকার ব্যক্তি ঈশ্বররূপে, যিনি প্রার্থনায় সাড়া দেন ও পূজা গ্রহণ করেন, এবং সাধককে পূর্ণতা ও পরমানন্দ লাভে সহায়তা করেন। কোন কোন উপনিষদে পরম সত্যের এই ধারণার উল্লেখ আছে :

> *মুক্তি কামনায় আমি সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক জ্যোতির্ময় পুরুষের শরণ গ্রহণ করি; যিনি আদিতে বিরাট আত্মা বা ব্রহ্মাকে (হিরণ্যগর্ভকে) সৃষ্টি করে তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠজ্ঞান বেদসমূহ প্রকাশ করেছিলেন; যিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক; যিনি অমৃতত্ব লাভের পরম সেতু, এবং দগ্ধ-ইন্ধন জ্বলন্ত অগ্নির মতো স্বয়ংজ্যোতিঃ।*[২৫]

সাকার ঈশ্বরের ধারণাতেও, তিনি মানবাকৃতিবিশিষ্ট কি মানবাকৃতিবিশিষ্ট নন, এই নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। ইসলামধর্মে ঈশ্বর সাকার, তবে মানবাকৃতি-বিশিষ্ট নন। একজন প্রখ্যাত লেখক বলেছেন যে, ইসলাম ও ইহুদি ধর্মে ঈশ্বর মানব-মন-বিশিষ্ট অর্থাৎ মানবের ন্যায় অনুভূতি ও চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট কিন্তু মানবরূপী নন। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবাকৃতিবিশিষ্ট ও অমানবাকৃতিবিশিষ্ট দুই রকম ধারণাই প্রচলিত। সাধারণ হিন্দুরা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে থাকেন। এর অর্থ এই নয় যে, হিন্দুধর্ম বহু-ঈশ্বরবাদী। ঈশ্বরবিশ্বাস প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অন্যান্য ধর্মের মতো হিন্দুধর্মও একেশ্বরবাদী, তবে পার্থক্য এই, অন্যান্য ধর্মে যেমন নিজ নিজ

---

২২ কঠোপনিষদ্, ১/২/২০

২৩ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, ৩/৭/৭

২৪ ভগবদ্গীতা, ১২/৫

২৫ *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্*, ৬/১৮/১৯

একমাত্র ঈশ্বরকে পরমেশ্বরের (যেমন ইহুদিদের জিহোবা) পদে তুলে ধরা হয়েছে, হিন্দুধর্মে বিভিন্ন উপাসকগণ তাঁদের উপাস্য দেবদেবীকে পরমেশ্বর বলেই মনে করেন। বিষ্ণুর উপাসক মনে করেন যে বিষ্ণুই পরমেশ্বর এবং অন্যান্য দেবদেবী তাঁর অধীন। শিবের উপাসক মনে করেন শিবই পরমেশ্বর এবং অন্যসকল দেবদেবী নিম্ন স্তরের। ম্যাক্সমূলার এই মতবাদকেই পরমেশ্বরবাদ (Henotheism) আখ্যা দিয়েছেন। এ ধারণার মূল হলো প্রধান এক ঈশ্বরে বিশ্বাস। এর ফলে হিন্দুধর্মে বিবিধ আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের একীকরণ ঘটেছিল।

সকল দেবতার ঊর্ধ্বে এক পরম ঈশ্বরের ধারণা হিন্দুর ধর্মীয় চেতনায় স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে যেমন আগে বলা হয়েছে দেবতাদের নামের ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব ঘটেছে। বৈদিক যুগে বিষ্ণু ও শিবের মতো নামগুলি বিশেষ গুরুত্ব না পেলেও পরবর্তী কালে এরা প্রাধান্য লাভ করল, আর ইন্দ্র, বরুণ ও মিত্রের মতো নামগুলি বিস্মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। এছাড়া, রাম ও কৃষ্ণের ন্যায় অবতার-পুরুষের উপাসনা সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করল। ক্রমে এই ভাবই বেশি বেশি করে স্বীকৃত হতে লাগল যে, নিরাকার বা নৈর্ব্যক্তিকের পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সব ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব, যা সেই অব্যয় অব্যক্ত তত্ত্বের অভিব্যক্তি মাত্র। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কিছু লোক তাদের দেবতা, অবতার ও মহাপুরুষগণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে থাকেন, কিন্তু পূর্ণ প্রসারিত দৃষ্টির অধিকারী জ্ঞানীরা—দেবতাই হন বা অবতারই হন—সকল ব্যক্তিত্বকেই নিরাকার ঈশ্বরের বিবিধ প্রকাশ বলেই গণ্য করেন। অসংখ্য ঢেউ উঠলেও মহাসাগর যেমন চিরকাল অসীম ও অতলই থেকে যায়, তেমনি চরম সত্য থেকে বিভিন্ন দেবদেবী অভিব্যক্ত হলেও তিনি অবিকারীই থাকেন। বাস্তবিক উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপলব্ধি করেছেন যে, যে কোন পবিত্র সাকার রূপ অবলম্বন করেই সাধনার শুরু হোক না কেন, অধ্যাত্ম-জীবনের লক্ষ্য হলো সেই নিরাকার তত্ত্বের—একমেবাদ্বিতীয়মের অপরোক্ষানুভূতি, যে অবস্থায় সাধক ও সাধ্য বা ঈশ্বর, জীবাত্মাসকল ও বিশ্ব একীভূত হয়ে এক ও অখণ্ড সত্তায় পরিণত হয়ে যায়।

## বিভিন্ন দেবতা থেকে ঈশ্বরে

নিরাকারের উপাসনা ভক্তের নাগালের বাইরে, এদিকে সাকারে তার তত্ত্বান্বেষী মনের সন্তুষ্টি হয় না। তাই উন্নত ধরনের আধ্যাত্মিক উপাসনায় সাকার-নিরাকার উভয় ভাবের অবলম্বন বেশি জনপ্রিয়। কৃষ্ণ বা রাম, শিব বা বিষ্ণু, দুর্গা বা কালীর উপাসকগণের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা।

অধ্যাত্ম-জীবনে ঈশ্বরের সাকারভাবের বা ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারভাবের উপাসনার

স্থান অবশ্যই সংশয়াতীত; অধিকাংশ ভক্তের পক্ষে এটি অপরিহার্য। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া খুবই কষ্টকর। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন ধর্মে ভক্ত সাকাররূপ ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাঁকেই উদ্দেশ্য করে সব কর্ম করে, ভক্তি ও একাগ্রতার সঙ্গে তাঁরই ধ্যান করে এবং স্বীকার করে যে, তিনিই জীবনের মুখ্য গতি। কিন্তু খাঁটি ভক্ত মানবাকৃতিবিশিষ্ট ঈশ্বরের উপাসনা করেই থামতে পারে না। তাঁর ক্রমশ শিক্ষা হয় তাঁর উপাসিত মূর্তিটি সেই গুণরাশির একটি মূর্তরূপ, যা পরম ঈশ্বরতত্ত্বকে কোন না কোন ভাবে প্রকাশ করে। সাধনায় আরও অগ্রসর হলে সে দেখতে থাকে যে, তার ঐশ্বরিক মূর্তিটি একটি ঈশ্বর-প্রতীক বা ঐশ্বরিক ভাব এবং ঐ ভাবই আবার হয়ে দাঁড়ায় সত্যের প্রতীক—যে সত্যে সর্বভূতের অধিষ্ঠান।

শিব লোকায়ত হিন্দুধর্মের একটি জনপ্রিয় দেবতা। স্থূলবুদ্ধি-ভক্তের নিকট তিনি নির্জন পর্বতনিবাসী বা শ্মশাননিবাসী সংহারের দেবতা। কিন্তু উন্নত ভক্তদের দৃষ্টিতে তিনি ত্যাগের মূর্তি ও সর্ব অমঙ্গল বিনাশকারী। আবার তিনি মূর্তিমান ধ্যান ও ঈশ্বর-চেতনা। উত্তম ভক্ত তাঁর মহিমা কীর্তন করে গান গায় ঃ 'হে প্রভু, তুমিই ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমিই সমস্ত কিছু, তুমিই সেই এক সত্য, সত্যই তুমি ছাড়া কিছু নেই।'[২৬]

বিষয়াসক্ত বিষ্ণুভক্ত তাঁকে পালন ও স্থিতিকারী দেবতারূপে দেখে, যিনি তাঁর অশেষ করুণায় ভক্তগণের কল্যাণের জন্য অবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হন। কিন্তু শ্রেষ্ঠভক্ত তাঁকে দেখে থাকে ঈশ্বরতত্ত্বের এক মূর্ত প্রতীকরূপে, যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অনুস্যূত আছেন, যাঁর মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপ জগৎ-লীলা চলেছে। এবং সে স্তুতি করে ঃ "হে প্রভু, তুমি সর্বভূতে রয়েছ, তুমিই সব, তুমি সব রূপ ধারণ কর। তুমিই সকলের আদি তুমি সকলের অন্তরাত্মা। তোমায় প্রণাম করি।"[২৭]

## মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা

আমরা কি ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা করতে পারি? অবশ্য ভারতে আমরা এ ধরনের প্রশ্ন করি না। আমরা ধরে নিই যে, পরমেশ্বর সত্তাকে নানাভাবে উপাসনা করা যায়। ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মে যেমন কেবল প্রভুভাবে উপাসনাই অনুমোদিত হয়, সেই প্রভুভাবে উপাসনা ছাড়াও, আমরা মাতৃভাবে, বাল গোপালরূপে, দিব্য প্রেমিক ভাবে উপাসনা করতে পারি। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা কিছু অস্বাভাবিক

২৬ দ্রঃ Sw Yatiswarananda : *Universal Prayers*. (Madras. Sri Ramakrishna Math. 1977) p 120

২৭ *বিষ্ণুপুরাণ*, ১/১২/৭২

নয়। মা যেমন সন্তানকে লালনপালন করেন, তেমনি ঈশ্বরও সকল জীবকে সৃজন, ভরণ ও পোষণ করেন। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখা অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়। এই ভাবই মহত্তম ও স্থিতিশীল। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের মাতৃসম্পর্কে অধিকতর স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্তি দেখা যায়। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "মায়ের কাছে ছেলে যেমন জোর করে আবদার করে, তেমনি ভক্তও ঈশ্বরের কাছে জোর করে আবদার করতে পারে।" তিনি আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেন, "শিশু যতক্ষণ তার খেলা নিয়ে থাকে মা গৃহকর্মে রত থাকেন। কিন্তু শিশুটি যখন খেলা ফেলে দিয়ে মায়ের জন্য কাঁদতে থাকে মা তখন সব কাজ ফেলে শিশুর কাছে ছুটে যান।" এই সুন্দর উপমাটিতে মাতৃরূপী ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ভক্তের সম্বন্ধ যে কত গভীর তা ফুটে উঠেছে।

ঈশ্বরে মাতৃজ্ঞান হিন্দুদের সৃষ্টি নয়। অতীতে বহু দেশেই এই ভাব প্রচলিত ছিল। এই মাতৃ-উপাসনার রীতি পদ্ধতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অপসংস্কার ঢুকে পড়েছিল। তবে মাতৃ-পূজার আদর্শই হলো আমাদের মূল প্রসঙ্গ। মিশরে মাতৃদেবী আইসিস (Isis) নামে পরিচিত, ব্যাবিলনে ও আসিরিয়ায় ইস্টার (Ishter), গ্রীসে ডিমেটার (Demeter) এবং ফ্রিজিয়াতে সাইবেলি (Cybele) নামে। কার্থেজিয় সৈ-াধ্যক্ষ হ্যানিবলের পরাক্রমে কোণঠাসা হয়ে পড়লে রোমানগণ যুদ্ধজয়ের জন্য সাইবেলি দেবীর আরাধনা করেছিল। সরকারিভাবে এই দেবীকে তারা 'দেব-মাতা' বলেও ঘোষণা করেছিল। ইহুদি এবং পরে ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যে মাতৃ-উপাসনা বন্ধ করে দেয়। খ্রীস্টধর্মও মাতৃ-উপাসনার কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল কিন্তু পরে তা পরিবর্তিত আকারে পুনঃ প্রবর্তিত হয়েছিল।

ক্যাথলিকরা কুমারী মেরীকে ঈশ্বর-মাতা থিওটোকোস্ (Theotokos) রূপে পূজা করে। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের জন্য ঐ শুদ্ধা কুমারী গির্জায় অপেক্ষাকৃত নিচে স্থান পেয়ে থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এরকম ভেদ করে না। লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিক, বিশেষত গরিবরা, কুমারী মেরীকে মোটামুটি হিন্দুদের মতোই মাতৃদেবী-রূপে পূজা করে থাকে। আমি ওয়ারসতে (Warsaw) ম্যাডোনার (মেরীমাতা) নামে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির দেখেছি। সুইজারল্যাণ্ডে আমি একটি হাজার বছরের পুরান মঠ দেখতে গেছলাম। সেখানে তিনজন সন্ন্যাসীকে কৃষ্ণকায়া ম্যাডোনাকে উপাসনা করতে দেখেছি। তাঁর গায়ের রঙ ও আকৃতি দেখে হিন্দু দেবী কালীকে আমার মনে হয়েছিল। গ্রেগরীয় ভজন ও তীর্থযাত্রীর ভিড় ভারতের দেবী মন্দিরের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ঈশ্বর-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ইওরোপে ও ল্যাটিন আমেরিকায় দিন দিন বাড়ছে।

আমি যখন ইওরোপে ছিলাম তখন পশ্চিমের জনগণের ঈশ্বরকে মাতৃরূপে

শ্রদ্ধা নিবেদন করতে অসুবিধা দেখে হতাশ হয়েছিলাম। একটি মহিলা আমাকে বলেন : "আচ্ছা স্বামী, আমি নিজে একজন মাতা, আমার মাতাও এখন জীবিতা আমাদের যুক্তিতে দৃঢ়তাও আছে আবার ফাঁকও আছে। কিন্তু আমরা মাতৃত্বের মধ্যে কোন বিশেষ পবিত্রতা দেখি না। আমরা আমাদের মধ্যে দেবত্বের ভাব দেখি না।" সেটা নিশ্চয়ই তাঁর দুর্ভাগ্য। আমার একটি গল্প মনে পড়ে। একদিন কতকগুলি ছেলে চেঁচামেচি করে কথা বলছিল। তারা মিথ্যা কথা বলা নিয়ে একটা নতুন খেলা খেলছিল। যে সব থেকে বড় মিথ্যা বলবে সে প্রথম পুরস্কার পাবে। ঠিক সেই সময় একজন পুরোহিত সেই পথে যাচ্ছিলেন এবং ছেলেদের জিজ্ঞেস করেন তারা কি করছে। ছেলেরা যখন তাদের কথা পুরোহিতকে বলল, তিনি তাদের উপদেশ দিলেন, "বাছারা, তোমাদের মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। আমি যখন তোমাদের বয়সের বালক ছিলাম আমি কখনো মিথ্যা বলিনি।" সকলেই তখন একজোটে চিৎকার করে বলল, "পুরুতমশাই, আপনিই প্রথম পুরস্কারটি পেলেন" ছেলেরা ছেলেদের ব্যাপার বোঝে, মেয়েরা মেয়েদের। কিন্তু তারা কেবল ওপর ওপর দেখে, তাদের দৃষ্টি এই শরীর ও তার নড়াচড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এর বাইরে কোন দেবত্বের দিকে তারা অবলোকন করতে পারে না।

পাশ্চাত্যে নারীকে প্রেয়সী বা স্ত্রীরূপেই দেখা হয়। মাতা তেমন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী নন, যেমন হন হিন্দুমাতারা। ধর্ম-শিক্ষকরা যেহেতু শেখান আদমের পাঁজরা থেকেই ইভের সৃষ্টি, নারীকে তাই সব সময়ে নরের থেকে খাটো বলে মনে করা হয়। এই ধারণাই পাশ্চাত্য সমাজে নারীর ভূমিকা নির্ধারণ করেছে। যদি পাশ্চাত্যের মানুষ ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনা করত, তবে তারা অত কঠিন-হৃদয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হয়ে আরও ঈশ্বরপরায়ণ হতো। তাহলে সেখানে পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় হতো ও গৃহে অধিকতর শান্তি বিরাজ করত।

ভারতে ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনার ঐতিহ্য বৈদিক যুগ থেকে বরাবর চলে আসছে। বেদে দেবীর উদ্দেশ্যে অনেক মন্ত্র আছে। কেনোপনিষদে অধ্যাত্ম জ্ঞান মূর্ত হয়ে মাতৃরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরে শত শত বছর ধরে বহু গ্রন্থ (তন্ত্রশাস্ত্র) মাতৃ উপাসনার ও মাতৃদর্শনের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত হয়েছে। বঙ্গদেশে মাতৃ উপাসনা তখন অতি সূক্ষ্মরূপ নিয়ে ছিল আর তখন থেকেই সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে মাতৃ-উপাসনা নতুন জীবন পেয়েছে। উপাসনার অসার ভাগ দূর হয়ে গেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়কন্দরে নতুন আলোয় মা উদ্ভাসিত হচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালী বলতে কি বুঝতেন? তিনি তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী-

শক্তিরূপে দেখতেন। তিনি আরও বলতেন—এই মাতৃরূপিণী শক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। কূটস্থ অবিকারী সৎ বস্তুই ব্রহ্ম, যখন তিনি জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিতা হন তখন তিনি কালী। ঠিক যেমন আকাশের নীল রঙ তার অনন্ত বিস্তৃতি বোঝায়, কালো রঙ কালীর অসীমতা বোঝায়। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ কালী প্রতিমার পূজাকে অসীমের আরাধনার স্তরে তুলে ধরেছেন।

মাতৃশক্তি বা দৈবী-তেজের বহু রূপ এবং প্রতীক আছে। তিনি কখনো বিদ্যাদায়িনী দেবীর প্রতীক, কখনো ঐশ্বর্যদায়িনী দেবীর প্রতীক, কখনো বা মৃত্যু-রূপা হয়ে ধ্বংসের লীলায় নৃত্যরতা। কালী প্রতিমায় তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রতীক আবার সকল বস্তুর লয়ের পর তাদের অধিষ্ঠাত্রীর প্রতীক। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্থিরভাবে শায়িত-শবরূপ-শিবের ওপর, যিনি কূটস্থ ব্রহ্মের প্রতীক। এ যেন ইন্দ্রিয়াতীত সৎবস্তুরূপ ভিত্তির ওপর বিশ্বপ্রকৃতির ক্রিয়ার প্রতীক। সেই সৎবস্তু জীবন মৃত্যুর পারে, সেজন্য ভক্তেরা জীবনে আসক্ত হবে না, মৃত্যুকেও ভয় করবে না। ভক্ত সুখ-দুঃখের পারে ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় যাবার চেষ্টা করবে, যেখান থেকে বলতে পারবে ঃ 'মৃত্যু বা অমৃত, দুয়ে তব কৃপা ঝরে গো।'[১৮] মাকে আহ্বান করে ভক্ত বলে ঃ "তোমার নাম নেই বংশধারাও নেই, জন্ম নেই মৃত্যুও নেই ... বন্ধন নেই মুক্তিও নেই। তুমি অদ্বিতীয়, পরব্রহ্ম বলে খ্যাত।"[১৯] হিন্দুশাস্ত্রে মাতার সম্বন্ধে ধারণা এইরকমই অভ্রংলিহ।

## হিন্দুদের অবতারবাদ

অন্যান্য ধর্মমতের সঙ্গে না মিললেও হিন্দুরা ঈশ্বরের বহু অবতারত্বের কথা বিশ্বাস করে। ঈশ্বর-তত্ত্বের রহস্য বুঝবার জন্য সাধারণ লোক এদের প্রত্যেককেই এক একজন আদর্শপুরুষরূপে দেখে। সেই পরমপদের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টায় হিন্দুর যে কোন অবতারকে আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে। হিন্দু ভক্তদের লক্ষ্য অতিবিচারপ্রবণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সাগ্রহ ইঙ্গিত মতো অবতারগণের মানবিক সীমাবদ্ধতায় বদ্ধ নয়, পরন্তু তাঁদের দেবত্ব ও দৈবগুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট। অবতার-পুরুষের মানবত্ব ভক্তদের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই। অবতারের এই মানবিক রূপ দেবভাবের প্রতীক মাত্র।

বিষ্ণুর এক অবতার রাম সত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠার এক জীবন্ত প্রতীক। সাধারণ ভক্ত তাঁর কমনীয় কান্তি ও সৎগুণাবলীর ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়। কিন্তু প্রজ্ঞাবান ভক্ত তাঁকে সর্ব ভূতে বিরাজমান দেখে আর প্রার্থনা করে ঃ 'তুমি শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর

---

১৮ স্বামী বিবেকানন্দ—মৃত্যুরূপা মাতা, পূর্বোক্ত বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬০ ও ২৬২

১৯ পূর্বোক্ত Swami yatiswarananda. *Universal Prayers*. verse 205

আধার। তুমি অন্তর্যামী, পরমাত্মা। তুমি মানবের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ও ত্রাতা।"[৫০] "তুমি কালিমাহীন, বিকারহীন, বিনাশহীন, পবিত্র, এবং শাশ্বত জ্ঞান ও সত্য।"[৫১]

বিবিধ লীলা বৈচিত্র্যে কৃষ্ণ-আদর্শ বহুল প্রচলিত, কিন্তু অনেকেই তাঁকে পুরোপুরি ভুল বুঝে থাকে। স্থূলবুদ্ধি লোকেরা বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে তাঁর লীলাকে কুরুচিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ভক্তেরা তাঁর মধ্যে ভগবৎ প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখতেন, যা কেবল তারাই উপলব্ধি করতে পারে যাদের মন কাম-প্রবণতা ও কুরুচিপূর্ণ চিন্তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন প্রণতি জানিয়ে বললেন : "হে প্রভু, আপনাকে সবদিক থেকে প্রণাম জানাই, আপনি সর্বাত্মা, আপনি অনন্তবীর্য, অসীম শক্তিশালী, আপনি সর্বব্যাপ্ত, সর্বস্বরূপ।"[৫২]

এইরূপে ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক বা সাকার-নিরাকার ভাব ও বহুতে একত্ব বোধ সমগ্র হিন্দু ধর্মবোধে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে। যারা হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মস্থানে প্রবেশ করতে পারে তারাই এ তত্ত্ব পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

## ধর্মীয় সহনশীলতা ও সমন্বয়ের আবেদন

কিন্তু সকলেই সমন্বয়ের ও পরমত গ্রহিষ্ণুতার মহান আদর্শ উপলব্ধি করতে পারে না। অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাপ্রবণ গোঁড়া ভক্তেরা প্রায়ই ধরে নেয় যে, উদ্ধারের একমাত্র পথ হলো, তারা যে বিশেষ দেবতা বা অবতারের পূজা করে কেবল তাঁরই পূজা, [illegible] তাদের আরাধ্য নিরাকার বা সাকার দেবতা—যিনি বিশেষ কয়েকজন মাত্র পয়গম্বর বা ধর্মাচার্যের মাধ্যমে তাঁর বাণী প্রচার করেন—কেবল তাঁরই প্রতি ভক্তি। পাশাপাশি প্রসারিত দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেদের মধ্যে উদারচেতা ব্যক্তিও আছে—যারা নিজের মনোনীত আদর্শের প্রতি অবিচলিত থেকেও মনে করে, সব দেব-মানবই একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ : "আমি বিশ্বের পরমেশ্বর শিব ও তাঁর অন্তরতম আত্মা বিষ্ণুর মধ্যে বস্তুগত কোন ভেদ দেখি না, তথাপি আমার ভক্তি যেন শিবমুখী হয়।"[৫৩]

সাম্প্রতিককালের একটি শ্লোকে আরও পরিষ্কারভাবে এই অন্তর্নিহিত সমন্বয়ের ভাব ব্যক্ত হয়েছে : "সেই পরম পুরুষকে বিষ্ণু বা শিব, ব্রহ্মা বা ইন্দ্র, সূর্য বা চন্দ্র, বুদ্ধ বা পূর্ণ মহাবীর, যে নামেই ডাকি—আমি সব সময়েই কেবল তাঁকে প্রণাম জানাই, যিনি রাগ-দ্বেষহীন, বিষয়-বুদ্ধি ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত, পবিত্রতা ও করুণায় ভরা এবং সকল সদ্‌গুণের আধার।"[৫৪]

---

৫০ [illegible] ৬.১১৭.১৪, ১৭

৫১ *অধ্যাত্ম রামায়ণ*, ১/৫/৬

৫২ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১১/৪০

৫৩ ভর্তৃহরি, *বৈরাগ্যশতকম্*, ৮৪

৫৪ দ্রঃ পূর্বোক্ত, *Universal Prayers*, verse 305

এইরূপে দেখা যায় যে, বহুত্বের মধ্যে একত্ববোধ হিন্দুর ধর্ম চেতনার নিরবচ্ছিন্ন ধারার একটি মূল তত্ত্ব, এই ভাব মনু আরও নির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন : "সেই পরমাত্মাকে জান যিনি সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, স্বয়ংজ্যোতিঃ, কেবল ধ্যানগম্য। কেউ তাঁকে অগ্নি (পূজ্য) নামে ডাকে, কেউ নাম দেয় মনু (চিন্তাশীল), কেউ বলে প্রজাপতি (জীবের পতি), কেউ ডাকে ইন্দ্র (মহিমান্বিত), কেউ বা ডাকে প্রাণ (জীবনের উৎস), অন্য কেউ তাঁকে ডাকে শাশ্বত ব্রহ্ম (বৃহৎ) নামে।"[৩৫]

যারা বহুত্ব ও ভেদজ্ঞানের ওপরে উঠতে পারে না তারা অগ্নি প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকেই বোঝে। কিন্তু যারা উচ্চতর ধারণা গ্রহণ করতে সক্ষম তারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে এক দৈবসত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা গুণ বলেই মনে করে। সত্য কথা এই যে, একেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাতা এমন অনেক আছেন, যাঁরা মনে করেন বিভিন্ন নাম একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ বোঝায়। এই বিষয়ে বিষ্ণু-সহস্রনামের ভাষ্যকার ও আধুনিক আর্যসমাজী একেশ্বরবাদীদের মতপার্থক্য অতি সামান্যই।

বাস্তবিকই যদি সাকার ঈশ্বরকে—তাঁর নাম-রূপ যেমনই হোক, তিনি দেবতা বা অবতার যাই হোন নিরাকার ঈশ্বরের একটি অভিব্যক্তি বলে মনে করা যায়, তবে সাকার-নিরাকার বা নিরাকার-সাকারের একত্র উপাসনায় সকল ধর্মের ও বিশ্বাসের লোক হাতে হাত ও হৃদয়ে হৃদয় মেলাতে পারে। আর বর্তমানযুগে ঈশ্বরসত্তার এই সর্বাত্মভাবের স্বীকৃতির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন—যাতে এটি সকল দেশের সকল পরিবেশে আন্তরিক ধর্মভাবাপন্ন সব লোকের মধ্যে একটি যোগসূত্রস্বরূপ হয়ে, তাদের একযোগে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাহচর্যের মনোভাবে, সেবক ও সহায়করূপে সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে প্রেরণা যোগাতে পারে।

যিনি অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ, যিনি অজ্ঞাত প্রয়োজনে নানা শক্তিসহায়ে সৃষ্টির প্রাক্কালে অনেক পদার্থ বিধান করেন, লয় কালে যাঁতে বিশ্ব বিলীন হয় এবং স্থিতিকালে যাঁতে অবস্থান করে, তিনি যেন আমাদের শুভবুদ্ধি দেন।[৩৬]

---

৩৫ *মনুস্মৃতি*, ১২/১২২-২৩

৩৬ *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্*, ৪/১

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# সাংসারিক কর্তব্য ও অধ্যাত্ম-জীবন

## কর্তব্য কি?

আমরা সকলে নানা কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখি—সাধারণত এগুলিকে কর্তব্য নাম দিয়ে থাকি; প্রায়ই দেখা যায় এ কাজগুলি কেবল অস্থিরতা ও দুঃখকেই ডেকে নিয়ে আসে। এ কথা যদি সত্য হয় তবে নিশ্চয়ই কর্তব্য সম্বন্ধে লৌকিক ধারণায় কিছু ভুল আছে। আমরা কাজ বা *কর্ম* করি, কিন্তু সাধারণত আমরা জানি না কিরূপে এই কর্মকে যোগে—ঈশ্বরানুভূতির উপায়স্বরূপ আধ্যাত্মিক উপাসনায় পরিণত করা যায়। দেখা যাক স্বামী বিবেকানন্দ *কর্মযোগ* সম্বন্ধে কি শিক্ষা দিয়েছেন :

"প্রথমে এই স্বার্থপরতার জাল বিস্তার করার প্রবণতা বিনষ্ট কর, যখন তা দমন করার শক্তি লাভ করবে, তখন মনকে আর স্বার্থপরতার তরঙ্গে পরিণত হতে দিও না। তারপর সংসারে গিয়ে যত পার কর্ম কর, সর্বত্র গিয়ে মেলামেশা কর, যেখানে ইচ্ছে যাও, মন্দের স্পর্শ তোমাকে কখনই দূষিত করতে পারবে না। পদ্মপত্র জলে রয়েছে, তাতে জল যেমন কখনও লিপ্ত হয় না, তুমিও সেইভাবে সংসারে থাকবে; এটাই *বৈরাগ্য* বা অনাসক্তি। ...অনাসক্তি ব্যতীত কোন প্রকার যোগই হতে পারে না। অনাসক্তিই সকল যোগের ভিত্তি। যে-ব্যক্তি গৃহে বাস, উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং সুখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করে মরুভূমিতে গিয়ে থাকে, সে অতিশয় আসক্ত হতে পারে। তার একমাত্র সম্বল নিজের শরীর তার কাছে সর্বস্ব হতে পারে, ক্রমশ তাকে তার দেহের জন্যই প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হবে। অনাসক্তি বাইরের শরীরকে নিয়ে নয়, অনাসক্তি মনে। 'আমি' ও 'আমার'—এই বন্ধনের শৃঙ্খল মনেই রয়েছে। যদি শরীরের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদির সঙ্গে এই যোগ না থাকে, তবে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যাইই হই না কেন, আমরা অনাসক্ত। একজন সিংহাসনে বসেও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হতে পারে, আর একজন হয়তো ছিন্নবস্ত্র পরেই ভয়ানক আসক্ত। প্রথমে আমাদেরকে এই অনাসক্ত অবস্থা লাভ করতে হবে, তারপর নিরন্তর কাজ করতে হবে। যে কর্ম প্রণালী আমাদেরকে

সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করতে সাহায্য করে, কর্মযোগ আমাদের তাই দেখিয়ে দেয়...।''[১]

তবে কর্তব্য বলতে আমরা কি বুঝি? বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য, দুটি কথার মধ্যে প্রথমটি আসন্ন বন্ধন ও নির্দিষ্ট কর্মের ইঙ্গিত করে; যেমন, যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বিধবা মাতাকে ভরণ পোষণের বাধ্যবাধকতা থাকে। এদিকে কর্তব্যবোধে আসন্ন পরিস্থিতির জন্য বাধ্যবাধকতার ভাব কম, কিন্তু নীতিগত ও চরিত্রগত প্রেরণার ভাব বেশি। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কথায় কর্তব্য হলো 'ঈশ্বরের বাণীর এক নির্মম কন্যাসন্তান'। আমরা সকলেই জানি যে, 'কর্তব্যবোধ আর স্বার্থবোধে'র দ্বন্দ্বে সময়ে সময়ে আমাদের কী ভীষণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে হয়। আমরা যাই বলি না কেন, আমাদের মতো জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কাছে, কর্তব্য বলতে যেন কিছুটা বন্ধন বা বাধ্যবাধকতা বোঝায়।

প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে ব্যাপারটা অন্য রকম। ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন 'আমার কোন কর্তব্য নাই, সব লোকে এমন কিছু নাই যা আমি পাই নাই, আমার প্রাপ্তব্যও কিছু নাই, তথাপি আমি কাজ করে চলেছি।'[২] ঈশ্বরাবতার বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ বন্ধনহীন হয়েই কাজ করেন, তাও মানবের প্রতি প্রীতিবশত। অবতারের কোন বাসনা-দ্বন্দ্ব থাকে না, কাজেই তাঁর কর্তব্যের দ্বন্দ্বও নাই। তিনি একমুখী, তথা ঈশ্বরমুখী হয়েই কাজ করেন। অজ্ঞানের প্রভাবে আমরা কর্তব্যের প্রকৃতি ও সমাধানের উপায় সম্বন্ধে প্রায়ই দ্বিধাগ্রস্ত হই।

## কর্তব্য ও স্বার্থবোধ

স্বামী বিবেকানন্দ কেমন নির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, আমাদের তথাকথিত কর্তব্যবোধ প্রায়ই ব্যাধিতে পরিণত হয় ঃ

"কর্তব্য আমাদের পক্ষে রোগ-বিশেষ হয়ে পড়ে এবং তা আমাদেরকে সবসময় সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কর্তব্য আমাদেরকে ধরে রাখে এবং আমাদের সারা জীবনটাই দুঃখপূর্ণ করে তোলে। এটি মনুষ্যজীবনের ধ্বংসের কারণ। এই কর্তব্য—এই কর্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সূর্য; তা মানুষের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করে দেয়। এই সব কর্তব্যের হতভাগ্য ক্রীতদাসদের দিকে ঐ চেয়ে দেখ! কর্তব্য—বেচারাদের ভগবানকে ডাকবার অবসরটুকুও দেয় না, স্নানাহারের সময় পর্যন্ত দেয় না! কর্তব্য যেন সর্বদাই তাদের মাথার ওপর ঝুলছে। তারা বাড়ির বাইরে গিয়ে

---

১ পূর্বোক্ত *'বাণী ও রচনা'*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯

২ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৩/২২

কাজ করে, তাদের মাথার ওপরে কর্তব্য! তারা বাড়ি ফিরে এল আবার পরদিনের কর্তব্যের কথা চিন্তা করে; কর্তব্যের হাত থেকে মুক্তি নেই। এ তো ক্রীতদাসের জীবন—অবশেষে ঘোড়ার মতো গাড়িতে জোতা অবস্থায় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পথেই পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ! কর্তব্য বলতে লোকে এরকমই বুঝে থাকে। অনাসক্ত হওয়া, মুক্ত পুরুষের মতো কর্ম করা এবং সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাই আমাদের প্রকৃত কর্তব্য।”[৩]

আমরা কর্তব্যের ক্রীতদাস হয়ে পড়ি এবং সমস্ত জীবনকে দুঃখময় করে তুলি। আমাদের কর্তব্য কোথায় ও কিভাবে তা পালন করতে হবে সে বিষয়ে আমাদের সম্যক বোধ অর্জন করতে হবে। নিজ সমস্যার সমাধান করতে শেখার আগেই আমরা অপরকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই—ভালবাসার তাগিদে নয়, আত্মতুষ্টির স্বার্থে। নিশ্চয়ই অনেক নিঃস্বার্থ লোক আছে যারা অপরকে সেবা করতে আগ্রহী, কিন্তু এই বিচিত্র জগতে—যাকে আমাদের এক প্রবীণ সাধু ঈশ্বরের উন্মাদ আশ্রম বলে অভিহিত করেছেন—অনেক ব্যস্তবাগীশ লোক আছে যারা জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অথবা নিজেদের হাতের কাছে ন্যস্ত কাজের পরোয়া না করে আত্মগরিমা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অন্য লোকেদের ব্যাপারে নাক গলায়। আত্মকেন্দ্রিক লোকেরা বলে থাকে ‘ওরা আমার প্রীতিপূর্ণ সেবা চায়’। মানুষ আত্ম-প্রীতিতে এতই মশগুল হয়ে যায় যে, সে ধারণা করতে পারে না, সে যে পরিমাণে অন্যকে অপছন্দ করে তেমনই অন্যেরাও তাকে অপছন্দ করতে পারে। এই কথা এক মনস্তাত্ত্বিক একদা মেয়েদের একটি দলকে বলেছিল, তাতে তারা খুব আশ্চর্য হয়েছিল—কারণ আত্ম-প্রীতি ভাবতে দেয় না যে, সে কখনো অপরের অপছন্দের পাত্র হতে পারে।

আর এক রকমের আত্মকেন্দ্রিক লোক আছে যারা অপরকে সুখী করতেই খুব বেশি রকমের আগ্রহী বলে মনে হয়—ফলে প্রার্থনা বা ধ্যান করবার সময় পর্যন্ত তারা পায় না। তারা জগদুদ্ধারের কাজে লেগে পড়তে অত্যন্ত আগ্রহী—এর জন্য ক্লাবে, ব্রীজ খেলার দলে, সমিতিতে, ভোজ সভায় বা রাজনৈতিক সংস্থায় যোগ দিয়ে কিছুদিনের মতো নিজের আত্মগরিমা প্রকাশের সুযোগ নেয়, কিন্তু নূতনত্ব ঝরে পড়লে বা হৈ চৈ আর কাজে ভাঁটা পড়লে বিমর্ষ বোধ করে ও অসন্তুষ্ট হয়। অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

> *“দাসত্বকে কর্তব্য বলে, দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক আসক্তিকে কর্তব্য বলে ব্যাখ্যা করা কত সহজ! সংসারে মানুষ টাকা বা অন্যকিছুর জন্য সংগ্রাম করে, চেষ্টা করে এবং আসক্ত হয়। জিজ্ঞাসা কর, কেন তারা তা করছে,*

---

৩ পূর্বোক্ত কর্ম ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০১

*তারা বলবে, 'এটা আমাদের কর্তব্য।' বাস্তবিক তা হলো কাঞ্চনের জন্য অস্বাভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তারা কতকগুলো ফুল দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে।"*[৪]

স্বার্থপরতাকে ফুল দিয়ে ঢেকে রেখে আমরা অনাসক্তভাবে কোন প্রকৃত কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে এবং তাকে সংহত অধ্যাত্ম জীবনের অঙ্গরূপে পরিণত করতে পারি না। স্বার্থসঞ্জাত 'কর্তব্য' অনেক সমস্যা নিয়ে আসে ও বন্ধন সৃজন করে।

## অহংত্বের নানা রূপ

মানবজাতি বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। উইলিয়াম জেমসের মতে অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সে যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মতামতকে গুরত্ব দেয়, সে ততগুলি বিভিন্ন সামাজিক সত্তাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। আমাদের দুই বা ততোধিক ব্যক্তিসত্তা আছে। ব্যবসায়ে আমাদের একটি সত্তা, গির্জায় একটি, বাড়িতে আবার আর একটি। নিজ গোপন জীবনে যে কাজটি আনন্দের সঙ্গে করে থাকি, লোকসমাজে তা করতে ইতস্তত করি। আমাদের বিভিন্ন সত্তাগুলি আবার কখনো কখনো পরস্পর মিলনের বিরোধী হয়ে আমাদের মনে অশেষ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। গল্পে আছে, একদা এক দোকানী বরাবর রবিবারে বেচাকেনা করত। একদিন এক শুদ্ধিসভায় গিয়ে সপরিবারে নতুন ধর্ম গ্রহণ করল। পরবর্তী রবিবার এক প্রতিবেশীর ছেলে যখন দুধ কিনতে এল, দোকানীর ছোট মেয়ে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে ওপরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলল, 'তুমি জান না গত সপ্তাহে আমরা সকলে নতুন ধর্ম নিয়েছি? এরপর তোমরা যদি রবিবারে দুধ কিনতে চাও তো তোমাদের ঘুরে পেছনের দরজায় যেতে হবে।'

শুধু সরল লোকেরাই যে এভাবে নিজেদের প্রতারণা করে তা নয়, উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও প্রায়ই দুটি সত্তা নিয়ে জীবন যাপন করে। গল্পে আছে জার্মানীর কোলন শহরের এক ভোটদাতা, তিনি আবার একজন ধর্মযাজক, এক চাষীর সামনে কিছু অসাধু কথা বলে ফেলেছিলেন। চাষীটি তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারেনি। সেই পাদ্রীটি নিজেকে সমর্থন করে বলল, 'ওহে আমার সজ্জন বন্ধু, আমি দিব্যি দিয়েছিলাম ধর্মযাজক হিসাবে নয়, রাজপুরুষ হিসাবে।' সেই বুদ্ধিমান চাষীটি উত্তরে বললে, "প্রভু, রাজপুরুষ যখন নরকে যাবেন তখন ধর্মযাজকের কি হবে?"

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যদি আমরা ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনকে পৃথক করি এবং দুটি ক্ষেত্রে বিপরীত আচরণবিধি পালন করি, তবে আমরা অস্থিরতা ও দ্বিগুণ বন্ধনের মতো কড়া শাস্তি থেকে রেহাই পাব না।

৪ তদেব, পৃঃ ১৩২

সতাই আমরা নিজের জীবনটাকে নরকে পরিণত করি আর তারই অশুভ পরিণামের জের টেনে চলি।

যেমন ঠিক কর্তব্য আছে তেমন মেকি কর্তব্যও আছে। জীবনে কোন্ কাজ উচিত আর কোন্ কাজ অন্যায় তা নির্ণয় করা সব সময় সহজ নয়। আইন অনুযায়ী শান্তির সময়ে কাউকে বধ করা অন্যায়, কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রত্যেক মানুষের, বিশেষত যদি সে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে থাকে, তার কর্তব্য হলো যতগুলি সম্ভব শত্রুকে বধ করা। হিন্দুধর্মের মতে গাভীকে বধ করা অন্যায়, কারণ গাভীকে তারা মাতৃত্বের প্রতীক মনে করে, আবার একজন মুসলিমের ক্ষেত্রে কোন কোন ধর্মোৎসবে গোরু জবাই করা একটি পুণ্যকর্ম। আবার হিন্দুরা যখন অহিংসাব্রত পালন করে বা পরপীড়ন না করাকে কর্তব্য মনে করে, আদিকালে মুসলিমরা 'কাফের'দের বধ করার জন্য প্রশংসিত হতো; মধ্যযুগে খ্রীস্টান তদন্তকারী বিচারকগণ স্বীয় গির্জাকে বাঁচাতে বিরুদ্ধমতবাদীদের খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারাকে কর্তব্য মনে করত। এইভাবে কর্তব্য নানা রকমের হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন—

> *"...ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কর্তব্যের একটা সংজ্ঞা দেওয়া একেবারে অসম্ভব; ...তবে ব্যক্তি বা অধ্যাত্মের দিক থেকে কর্তব্যের লক্ষণ নির্ণয় করা যেতে পারে। যে-কোন কাজ যা ভগবানের দিকে নিয়ে যায়, তাই সৎ কার্য এবং সেটাই আমাদের কর্তব্য; এবং যে-কোন কার্য যা আমাদেরকে নিচু দিকে নিয়ে যায়, তা অসৎ কার্য এবং তা আমাদের অকর্তব্য।"*[৫]

মহান হিন্দু দার্শনিক রামানুজের মতে যাতে জীবের আত্মপ্রসার ঘটে তাই ভাল আর যাতে আত্মসঙ্কোচন ঘটে তাই মন্দ।

## হিন্দুধর্মে কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা—বর্ণাশ্রম ধর্ম

হিন্দুধর্ম সমাজে চারটি শ্রেণী প্রবর্তন করে তাদের প্রত্যেকটিতে নির্দিষ্ট কর্তব্যধারার ব্যবস্থা করেছে ঃ আধ্যাত্মিক মানব (ব্রাহ্মণ), যোদ্ধৃ মানব (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী মানব (বৈশ্য), শ্রমিক মানব (শূদ্র); এদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জীবনের পর্যায় অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব আছে। যেমন ছাত্রের, গৃহস্থের, অবসরপ্রাপ্তের ও সন্ন্যাসীর। প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতিতে এইসব জীবনধারাগুলি সুস্পষ্টভাবে ও নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্যের সামাজিক ও রাজনীতিক ভাবধারা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা এসবকিছুর (বর্ণাশ্রম) পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এখন অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে সংশয় জেগেছে এবং অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে জানে

৫ তদেব, পৃঃ ৮৬

না এমন লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়ছে। হিন্দুশাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক মানবের *ধর্ম* বা ন্যায়পরায়ণতা তাকে ঈশ্বরাভিমুখী পথটি ধরিয়ে দেয়। ধর্ম হলো মানবসত্তা-বিষয়ক সর্বার্থসাধক নিয়ম যা সমগ্র মানবজীবনকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত সমাজজীবনের মাধ্যমে স্ফুরিত গভীর বিশ্বস্পন্দনের সঙ্গে সমন্বিত হতে সুযোগ করে দেয়। সেখানে জীবন-চেতনার একত্বের সঙ্গে আছে সহস্রমুখী অভিব্যক্তি।

ভগবদ্‌গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মহৎ উপদেশ—সমষ্টিজীবনের অঙ্গ হিসাবে ব্যষ্টিজীবন বিরাট বিশ্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বিরাট বিশ্বসত্তার প্রতীকের কথা আছে, তাঁর মুখ থেকে জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, পবিত্র সংযতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ বের হলেন; তাঁর বাহু থেকে ক্ষত্রিয়; তাঁর কটিদেশ থেকে বৈশ্য ও কৃষক যাদের কর্তব্য হলো মানবের জীবনধারণোপযোগী খাদ্য ও ব্যবহার্য সামগ্রী যোগাড় করা; তাঁর পদযুগল থেকে শ্রমজীবী, যারা সংসারের জন্য কঠোর শ্রমদান করে।[৮] সমাজের সকল স্তরই পূর্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেমন অবয়বগুলি মনুষ্যদেহের। ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের কাজ সাঙ্গ হলে, বানপ্রস্থ জীবন যাপন করতে হয়; এবং জীবন আরও দীর্ঘ হলে আসে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে নির্জনে ধ্যানপরায়ণ সন্ন্যাস-জীবনের সময়।

যদি প্রতিটি আশ্রমজীবনের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বানুস্যূত বিশ্বস্পন্দনের সঙ্গে একীভূত করা হয়, তবে সে কেবল নিজের কল্যাণ নয় পারিপার্শ্বিক সকলের কল্যাণসাধনেও সহায়ক হবে। এইটিই হলো আমাদের প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। প্রায়শই বিশ্বসত্তার প্রতীকরূপে বহুহস্তপদবিশিষ্ট মূর্তিই গৃহীত হয়ে থাকে যা পরম একত্বের বহু অভিব্যক্তির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিটি মানব যেন জগতের রঙ্গমঞ্চে এক একটি নট, যাতে সে তার সাধ্যমতো নিজের অংশটুকু ভাল ভাবে অভিনয় করতে পারে, সে শিক্ষা তাকে অবশ্যই নিতে হবে। আমাদের মধ্যে কোন দুজনের অভিনয়ের অংশ কখনো এক হয় না।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'সকল মানব সমভাবে সৃষ্ট হয়েছে।' অথচ আমরা জানি যে, কোন দুজন ব্যক্তি কি বহির্জীবনে কি অন্তর্জীবনে সমান নয়। তবে কিভাবে তারা সমান হতে পারে? এর উত্তরে বেদান্তে বলা হয়েছে ঃ একই আত্মা সকলের মধ্যে বাস করছেন, কিন্তু মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্য এবং প্রবণতার দিক দিয়ে মানবগণ অসমান, এবং একে অপরের থেকে অনেকখানি তফাত। আত্মিক স্তরে একীভাব ও পরস্পর সমতা থাকলেও অন্যান্য সকল স্তরে অনন্ত বৈচিত্র্য বর্তমান।

---

৮ *পুরুষ-সূক্তম্*—ঋগ্বেদ, ১০.৯০.১২

পণ্ডিত ও লোকহিতৈষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদা শ্রীরামকৃষ্ণকে জিগ্যেস করেছিলেন ঃ

> *তিনি (ঈশ্বর) কি কাউকে বেশি, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন? প্রভু উত্তরে বললেন ঃ তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হলে একজন লোক দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়, আর তা না হলে, তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো?... তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে।* [৭]

হিন্দুমত প্রতিটি মানুষকে শেখায় জাগতিক বস্তু যেমন আছে তেমন ভাবেই তাকে গ্রহণ করতে, নিজ নিজ সামর্থ্য নিরূপণ করতে, আপন সত্তা সম্বন্ধে সত্যটিকে অনুসন্ধান করতে এবং পরে নিজ উন্নতির পথ বা *স্বধর্ম* অনুসরণ করতে। তখনই নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি আপন কর্তব্য সম্বন্ধে তার ধারণা স্বচ্ছ হবে। একটি গৃহস্থ যুবক শ্রীরামকৃষ্ণকে এসে বললে যে, সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবে। প্রভু তাকে পরিবারের কাছে ফিরে যেতে উপদেশ দেন। সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছু যুবকটি বললে, "আমার শ্বশুর মশায় তাদের ভরণ পোষণ করবেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ জিগ্যেস করেন, "তোমার কি কোন মানসম্ভ্রম বোধ নেই?" যুবকটিকে তিরস্কার করে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "যাও, একটা কাজ খুঁজে নিয়ে পরিবার প্রতিপালন করগে।"[৮] প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ জীবনের প্রতিটি স্তরেরই ধর্ম আছে, এমনকি অত্যন্ত গতানুগতিক জীবনও বিশ্বস্পন্দনের অঙ্গ। জীবনের কর্তব্যগুলি নিয়মমত পালন করে প্রতিটি মানব আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে। জীবনের কাজ অথবা কর্মস্থল বড় না ছোট তা নিয়ে প্রশ্ন আসে না। প্রত্যেক লোকের আধ্যাত্মিক জীবনের শীর্ষ স্তরে উঠবার চেষ্টা থাকা দরকার। এইটিই হলো ভগবদ্গীতার অন্তর্নিহিত বাণী যেমন একটি শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

> *যে সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর প্রাণিগণের সকল কর্ম চেষ্টার উৎস, যিনি সর্ব জীবে অনুস্যূত, তাঁকে মানুষ স্বীয় কর্ম দ্বারা অর্চনা করে অধ্যাত্ম জীবনের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ করতে পারে।* [৯]

আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে ঃ প্রথম, সংসারে নীতিগত কর্ম ও ভোগের পথ। সঠিক নিয়ন্ত্রণের ফলে এই পথই স্বাভাবিক ভাবে শেষ হবে দ্বিতীয় পর্বে বা ঈশ্বরানুভূতির ও সমস্ত বন্ধনমুক্তির পথে। সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষ যেকোন্ একটি পথ বেছে নিতে পারে। অধর্মের বা ন্যায়বর্জিত পথ, যা কাম, মোহ ও

৭ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৫১

৮ তদেব, পৃঃ ১৭

৯ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১৮/৪৬

লোভ সমাকীর্ণ, তা সর্বথা পরিত্যাজ্য। যদি জাগতিক কর্মের ফলে সম্পদলাভ হয়, সকলকে তার ভাগ দেওয়া উচিত এবং তা নিজ পর সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

## গৃহস্থের কর্তব্য

হিন্দু সমাজ-জীবনের পরিকল্পনায় গৃহস্থকে সমাজের প্রধান অবলম্বনরূপে দেখা হয়। শিশুদের এমন শিক্ষা দিতে হবে, যেন তারা সমাজের সাধারণ কল্যাণ ও নিরাপত্তার কাজে অংশ নিতে পারে। মনুস্মৃতিতে আছে ঃ যেমন সব সজীব প্রাণী বাঁচবার জন্য বায়ুর ওপর নির্ভর করে, তেমনই সমাজের অন্য স্তরের মানব তাদের জীবন ধারণের জন্য গৃহস্থদের ওপর নির্ভর করে।[১০]

কিন্তু বোঝা উচিত, গার্হস্থ্য জীবন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নয়। শিষ্য উদ্ধবকে কৃষ্ণ এই কথার ওপর জোর দিয়ে বার বার বলেছেন ঃ

> *গৃহস্থরা সর্বদা মনে রাখবেন আদর্শ কল্যাণ ভোগে নয় জ্ঞানলাভে, যা সম্ভব হয় যখন ব্যষ্টিজীবনকে সমষ্টিজীবনের বা বিশ্বজীবনের অংশ বলে বোধ হয়। ভক্ত গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্যের মাধ্যমে ভগবদুপাসনার পর বনে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে চিত্ত শুদ্ধ করবেন।* [১১]

হিন্দুশাস্ত্র মতে গৃহস্থকে পাঁচ রকম কর্তব্য পালন করতে হবে ঃ ১। দেবপূজা (দেব যজ্ঞ), ২। শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বেদপাঠ (ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ), ৩। সাথীদের বা অতিথিদের সেবা (নৃযজ্ঞ), ৪। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করা (পিতৃযজ্ঞ), ৫। ইতর প্রাণীদের রক্ষা করা (ভূতযজ্ঞ)। এই কর্তব্যগুলিকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলে।[১২] এইসব কর্তব্যগুলি একঘেঁয়ে খাটুনিভাবে নয় সেবাভাবে, পূজাভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এইভাবে কর্তব্য সম্পাদন জীবকে আবদ্ধ করে না, বরং অধ্যাত্ম-জীবনে উন্নতি লাভে সহায়তা করে। বেদান্ত কর্তব্য, সেবা ও পূজাকে এক সূত্রে গাঁথতে চেষ্টা করে। যদি কোন কর্মকে অধ্যাত্ম-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা না যায় তবে তাকে কর্তব্য বলা যায় না। যদি দেখ কোন কর্ম তোমাকে ঈশ্বরের থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তবে তা করবে না। সব কাজই যেন তোমাকে ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। কৃষ্ণ যেমন উদ্ধবকে বলেছিলেন ঃ

> *যে কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে, আমাকে পরমেশ্বর জ্ঞানে, সর্বদা একনিষ্ঠভাবে*

---

১০ *যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ।*
*তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ॥ মনুস্মৃতি,* ৩/৭৭

১১ দ্রঃ *ভাগবতম্,* ১১/১৭/৫২, ৫৫

১২ *বৃহঃ উঃ,* ১.৪.১৬, শতপথ ব্রাহ্মণ, ১/৭/২/৬

*পূজা করে, সে জ্ঞান ও অনুভূতি লাভ করে ও অচিরে আমাকে পায়। সব কর্তব্যই আমার প্রতি ভক্তিভাবে করলে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। পরম শান্তির এই হলো পথ।*[১৩]

## নিজের প্রতি মানবের কর্তব্য

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার কর্তব্যের ওপর আছে প্রত্যেক মানুষের নিজের প্রতি—স্বীয় উচ্চতর আত্মার প্রতি কর্তব্য। যেহেতু প্রতিটি আত্মা—পরমাত্মারই অংশ—যখন মানুষ তার উচ্চতর আত্মার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করে, তখন তার অন্যান্য সব দায়িত্বই পালন করা হয়। মানবের উচ্চতর আত্মা স্বীয় অভিব্যক্তির, বিকাশের অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু তিনি সদাই নিম্নতর আত্মা বা অহং-এর দ্বারা রাহুগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন। দৈনন্দিন জীবনের কোলাহলে, ইন্দ্রিয়ভোগের অতিরিক্ত তাড়নায় মানুষ অন্তরের 'শান্ত নম্র ডাক', আত্মার ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে। ফলে সে যা কিছু করে তা শেষ পর্যন্ত তার কাছে অশান্তি ও ব্যর্থতার কারণ হয়ে পড়ে। এমনকি তার সাথীদের প্রতি কর্তব্যও তাকে ক্লান্ত ও বিফল মনোরথ করে। আমাদের সব কর্তব্য-কর্মেরই এক অখণ্ড উদ্দেশ্য হওয়া উচিত উচ্চতর আত্মার অভিব্যক্তি। তবেই জীবন অর্থবহ বলে মনে হবে।

মূল সমস্যা হলো মানুষ নিয়ন্ত্রিত সাধন পদ্ধতির ভিতর দিয়ে না গিয়েই—ঈশ্বরের হাতের পবিত্র যন্ত্রস্বরূপ না হয়েই—শিক্ষক হতে চায়। তিনি মানবের দেহ-মন্দিরে বাস করেন। আমরা প্রথমে নিজেরা তাঁকে জানব, নিজেদের সমস্যার সমাধান করব, পরে অন্যকে সাহায্য করব। আমরা আমাদের সত্তার মাধ্যমে নীরবে সত্যের প্রভাব বিস্তার করে অপরকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু নিজেরা আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ না করে অন্যকে আধ্যাত্মিক পথে সহায়তার কথা চিন্তা করা বা বলা একেবারেই অবাস্তব। একবার শুদ্ধ পবিত্রতা ও অনাসক্তি অর্জন করলে মানব আর সংসারে বদ্ধ থাকে না, আর সংসারও মানব-মন ও স্নায়ুর ওপর কোন ক্রিয়া করতে পারে না। কেবল তখনই মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রস্বরূপ মাত্র এই অনুভূতি লাভ করে অপরকে সহায়তা করার কথা বলতে পারে।

আর একটি বিষয়কে আমাদের কর্তব্য বলে বোধ করা উচিত। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েও আরো কিছুদিন ছাত্রজীবন চালিয়ে যাওয়া দরকার। যদি আমাদের অধ্যয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ পড়াশুনায় কোন ছেদ পড়ে তবে তা আমাদের মন ও চিন্তাশক্তির উন্মেষের পক্ষে হানিকর। অনেকেই স্কুল ছাড়ার পরে বা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

---

১৩ দ্রঃ *ভাগবতম্*, ১১/১৮/৪৪, ৪৭

চিন্তা করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলে। এটা বাস্তবিক খুব খারাপ। অসংলগ্ন অস্পষ্ট চিন্তার মতো বিপজ্জনক আর কিছু নেই। চিন্তাশক্তি হারিয়ে তারা কেবল কাজের মানুষ হয়, তারা চিন্তাশীল লোক হতে পারে না। কর্ম ও চিন্তা, দুটিকে মেলাতে হবে—তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে, অন্যথায় ফল মন্দ হবে। অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে পড়াশুনা একবার ছেড়ে দিয়ে আবার আরম্ভ করা সম্ভব হয় না, যে অল্প লোকের পক্ষে তা সম্ভব হয়, তাদের ভয়াবহ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়, কারণ তারা চিন্তা করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলে। ওপর ওপর পাঠ, হালকা কথা, চিন্তাহীন বাহ্যক্রিয়া তাদের চিন্তাশক্তিকে বহুলাংশে নষ্ট করে দেয়। চোখ চেয়ে দেখলেই বর্তমান জগতে এর ফলাফল দেখতে পাওয়া যাবে ঃ উচ্চ আদর্শ অথবা সত্য ও উচ্চতর নিয়মাবলী সম্বন্ধে গভীরতর বোধশূন্য চিন্তাহীন দুর্বার কর্মচঞ্চলতা; এইরূপ কর্মতৎপর জীবনের জন্য সাধারণ লোকে যতই গর্ব করুক শুধু কাজের জন্যই কাজ, আলস্যের জন্য আলস্য অপেক্ষা একটুও বেশি ভাল নয়। একটা কিছু সৃজন করে গেলেই হলো না। আমি যা সৃজন করব নিশ্চয়ই তাকে ভাল ও গঠনমূলক হতে হবে এবং তাতে যেন ধ্বংস-প্রবণতা না থাকে আর তা যেন মানবকে অধোমুখী না করে।

অতএব যদিও আমরা বেশি পড়ার সময় না পাই, গভীর চিন্তাশীলতা যেন আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়। বাজে, এমনকি ক্ষতিকর, চিন্তায় আমাদের এত সময় ক্রমাগত নষ্ট হয় যে, আমাদের উচিত এই সময়কে উচ্চতর গঠনমূলক চিন্তায় নিয়োজিত করা। সারা দিনে একঘেয়ে অবসাদপূর্ণ সময় অনেক আসে, তাকে আমরা স্বচ্ছন্দে উচ্চ ধ্যান ধারণায় কাজে লাগাতে পারি। এই সময়টা আমরা বাজে চিন্তায় অপব্যয় না করে, একটা মহত্তর কোন কাজে তা ব্যয় করতে পারি। এক কোণে বসে বসে অবসাদগ্রস্ত হয়ে না থেকে, আমরা কোন উন্নততর, শুদ্ধতর বিষয়ের চিন্তা করতে পারি। যদি সত্যই আমরা এইরূপ করি, তবে আমরা অভ্যাস, অধ্যয়ন, বুদ্ধিযুক্ত চিন্তার জন্য অনেক সময় পাব। চিন্তাধারাকে এলোমেলো পথে বয়ে যেতে দিতে নেই।

প্রায়ই আমরা কোথাও গিয়ে আধঘণ্টার মতো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি, কিংবা হালকা ধরনের কিছু পড়ি বা হালকা ও বাজে কথা কিছু শুনি। এ সবই আমরা কম বেশি মূর্খের মতোই করে থাকি। এতে আমরা আনন্দও পাই। কিন্তু যখনই এই আধঘণ্টা সময় কোন ভক্তিগ্রন্থ পাঠে বা লাভজনক ও স্বাস্থ্যপ্রদ কোন বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নে কাটাবার প্রয়োজন হয় আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি তখন বিদ্রোহ করে ওঠে ও বাধা দেয়।

একজন বুদ্ধের সেই বিখ্যাত বাণীর কথা চিন্তা করে লাভবান হতে পারে—যাতে তিনি বলেছেন, "বন্ধুগণ এখন এস, আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, সব বিকারগ্রস্ত পদার্থই কালে বিনাশ পাবে, তোমরা সতর্কতার পথ অবলম্বন করবে।" এই উপদেশ দৃশ্যজগতের অস্থায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের বাজে কাজ ও এলোমেলো চিন্তা বর্জন করতে সহায়তা করে। জীবনের অবিনশ্বর তত্ত্বের ওপরই আমাদের জোর দেওয়া প্রয়োজন, যা সর্বদা ও সর্বথা পরিবর্তনশীল তার ওপর নয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য একটাই, তা হলো এই জীবনে সেই তত্ত্বটি উপলব্ধি করা ও অন্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

যে সময় আমরা অলস বাক্যব্যয়ে, ও বাজে কাজে ও চিন্তায় নষ্ট করি তা যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজে লাগাই তবে দেখব আমাদের প্রয়োজনের অধিক সময় আমাদের হাতে আছে। অভ্যাসের দ্বারা আমাদের চিন্তা এমন গভীর হতে পারে যে, আধঘণ্টায় আমরা এত চিন্তা করতে পারব যা সাধারণভাবে করা দুঘণ্টা চিন্তার সমান। পরিমাণ ও গুণ দুটি জিনিস আছে। যদি পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব না হয়, তবে গুণগত মান—ধ্যান, অধ্যয়ন প্রভৃতির গুণগত মান যাতে উন্নত হয় তাই কর।

আধ্যাত্মিক উপাসনার পর শুধুমাত্র প্রার্থনা, জপ ধ্যান নয় নিয়মিত পর্যালোচনা এবং উপনিষদ্ থেকে অন্তত ১০ মিনিটের জন্যও নির্বাচিত অংশ পাঠ প্রত্যেকের পক্ষেই যুক্তিযুক্ত। অধ্যাত্ম জীবনের প্রত্যেকটি ধাপেই কুঁড়েমি ও জড়তা হলো প্রধান শত্রু। ফলে বহু লোকের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক জড়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে; এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই জড়তাকে আমাদের মধ্যে প্রশ্রয় দিলে আমরা নিয়মিত অভ্যাস বা পঠন-পাঠন ও অনুশীলনের সময় করে নিতে পারব না। মনের এই রকম অবস্থায় আমরা 'সময়' খুঁজে পাই না, যদিও সময়ের অভাব নেই—আমরা এতই কুঁড়ে হয়ে যাই যে তা বুঝে উঠতেও পারি না।

ইন্দ্রিয়-সংযম আমাদের গভীর চিন্তা করতে এবং পূর্ণমাত্রায় ও সফলতার সঙ্গে বাঁচতে সাহায্য করে। কেন আমরা ইন্দ্রিয়-ভোগ-সর্বস্ব জগতে যেতে ও বাস করতে চাইব? ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করলে সহজে মননের জগতে থাকা যায়। আমরা কেন বহির্জগৎ থেকে লাথি ও ধাক্কা খাবার জন্য সেখানে যাব? যখন বিক্ষেপগুলিকে সরিয়ে দেওয়া যায় তখনই আমরা আরও পরিপূর্ণ ও সচেতন জীবন যাপন করতে পারব এবং সকল পরিস্থিতিতে যথাসম্ভব পূর্ণ জাগ্রত থাকতে পারব। কিন্তু প্রায়ই আমরা দেখি বহির্বিক্ষেপ ও ভোগ-বাসনার তাড়না চলে গেলেই আমরা ক্রমে গাছের গুড়ি ও পাথরের মতো আরো বেশি কুঁড়ে ও জড় হয়ে যাই, আর আমাদের অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সময় যায় আরও কমে।

## কর্তব্য ও আসক্তি

আমরা কাজ করি ঃ (১) মানবের বা উদ্দেশ্যের প্রতি আসক্তিতে, (২) কর্তব্যবোধে অথবা (৩) সকল জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার প্রতি ভক্তিতে। প্রায়শই প্রথম দুটি মিশে যায়। বেশির ভাগ লোকই প্রকৃত কর্তব্যবোধ আর আসক্তির মধ্যে পার্থক্যটুকু বুঝতে পারে না। কর্তব্যবোধ তখন আসক্তির সমর্থনে একটি যুক্তিতে পর্যবসিত হয়। তাই একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেছিলেন, "কর্তব্য হলো আমাদের আসক্তির জন্য দণ্ডস্বরূপ।" এক নজরে এই সংজ্ঞাকে অদ্ভুত ও অসন্তোষজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি অনুধাবন-যোগ্য। বুদ্ধ, যীশু, রামকৃষ্ণদেবের কোনই কর্তব্য ছিল না। তাঁদের ক্ষেত্রে ছিল কেবল প্রীতিপূর্বক সেবা, কর্তব্য নয়। তাঁদের কাজে কোন বাধা ছিল না, কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কর্মফলেরও ছিল না কোন প্রত্যাশা। খাঁটি লোকের কোন কর্তব্য বা আসক্তি থাকে না। কর্তব্য বলে তার কোন কাজ থাকে না।[১৪] তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রীতির সঙ্গে সেবা করেন—সে কাজে কোন 'আমি' ও 'আমার' বোধ এসে বাধার সৃষ্টি করে না।

কর্তব্য বলতে আসক্তি নয়, বা আমাদের অহং-এর ক্ষুদ্র রাজ্যে; দেহাত্মবোধ মন প্রভৃতির রাজ্যে, জড়িয়ে থাকা নয়, আসক্তিজনিত বা যে কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা-পূরণের কাজকে আমি কর্তব্য বা কর্তব্যপদবাচ্য বলতে পারি না। এ ধরনের কাজকে আসক্তি ও আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ববোধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বলা যেতে পারে—কিন্তু তা কখনই উচ্চতর কর্তব্যবোধের ও মুক্তির উচ্চ আদর্শবোধের ফল নয়।

প্রকৃত কর্তব্য রয়েছে ইন্দ্রিয়সংযমে, স্বার্থহীনতায়, প্রীতিপূর্ণ সেবায়, চিত্তশুদ্ধিতে, মনের সঠিক একাগ্রতা সাধনে এবং আমাদের সমস্ত মানসিক বৃত্তিসমূহকে উঁচু দিকে ফিরিয়ে—ঈশ্বরলাভের সঠিক যন্ত্রে পরিণত করায়। আমরা যত পবিত্র হব, তত ভাল করে সর্বভূতস্থ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-পূর্বক সেবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারব—কিন্তু দেখতে হবে এতে কোন আসক্তি যেন না থাকে। আসক্তিকে যে কোন নাম দেওয়া হোক, কিন্তু কখনই তাকে কর্তব্য আখ্যা দেওয়া উচিত নয়। অধিকাংশ লোক তথাকথিত কর্তব্য করে স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়ভোগের আসক্তি থেকে বা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আকর্ষণের জন্য, কিন্তু তা তো কর্তব্য নয়। এখানে আমাদের সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে শিখতে হবে, কোন্‌টা বাস্তবে কোনরূপ দৃঢ়বদ্ধ অহঙ্কার আর কোন্‌টা প্রকৃত কর্তব্য।

যতদিন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র আত্মার ও তার ক্ষুদ্র বাসনার প্রতি দৃঢ় আসক্তি

১৪ "...তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।" *গীতা* ঃ ৩/১৭

এবং ইন্দ্রিয়জ সুখ ও বিষয় সম্পত্তির প্রতি তীব্র লোলুপতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত না হই, ততদিন আমরা কখনই উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারব না, সুতরাং কর্তব্য হলো, 'আমাদের আসক্তির জন্য দণ্ডস্বরূপ' এই সংজ্ঞার অর্থও বুঝব না। সত্য বলতে কি, সেটাই কর্তব্য যা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়তা করে। এইটিকে সকলের জন্য সাধারণ নিয়ম বলে গ্রহণ করা উচিত। বিভিন্ন কর্তব্য পালন করা—শারীরিক প্রয়োজন মেটানো, অপরকে সাহায্য করা বা ঈশ্বরের সেবা করা—যেন আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে সহায়ক হয়। আমরা যদি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হতে পারি, তবে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কাজের প্রতি আমাদের মনোভাবে বা কর্তব্যবোধে কিছু ত্রুটি আছে।

কেউ কেউ উদাসীন মনোভাব অবলম্বন করে থাকে। তারা সব কিছুতেই উদাসীন, কেবল নিজের ব্যাপারটুকু ছাড়া। প্রায়ই দেখা যায় স্বার্থপরতা ও আলস্য থেকেই এই উদাসীনতা আসে। এটি একটি তামসিক অবস্থা, একে অধ্যাত্ম সাধকের অনাসক্তি বলে ভুল করা উচিত নয়। এইরূপ অলস ও নির্বোধ লোক যেন জীবিত থেকেও মৃতের থেকেও অধিক জড়। প্রকৃত অনাসক্তি, প্রকৃত সাক্ষীর মনোভাব, মানবকে সতর্ক করে দেবে এবং কর্ম বা ধ্যান যাতেই সে মনোনিবেশ করবে তাতেই প্রগাঢ়তা এনে দেবে।

## কর্তব্যের দ্বন্দ্ব

প্রায়ই আমরা মনে করি আমাদের কিছু করণীয় কর্তব্য আছে, কিন্তু দেখি তা আমাদের আওতার বাইরে। আমাদের পক্ষে তা খুব বেশি রকমের উঁচু। এ ক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য? যে কর্তব্যটি সম্পাদন করছ তাকেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটি সোপান হিসাবে গ্রহণ কর। কর্তব্যের একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ বলতে কিছু নেই। আমাদের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়। শিশুর কর্তব্য যুবার নয়, যুবার কর্তব্য বৃদ্ধের নয়। গৃহীর কর্তব্য সন্ন্যাসীর নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করতে হবে।

প্রায়ই আমাদের কর্তব্যবোধ আর প্রীতিবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় কিন্তু আমাদের কর্তব্যবোধ আর প্রীতিবোধকে মেলাতে হবে, আমাদের চিন্তাকে আমাদের কি করা কর্তব্য তার সঙ্গে মেলাতে হবে এবং এই ভাবেই আমরা অযথা দ্বন্দ্ব ও উদ্বেগ এবং তজ্জনিত শক্তির অপচয় এড়াতে পারি।

কখনো কখনো আমরা আপত্তি তুলি যে, সাংসারিক কর্তব্যকর্মে ব্যস্ত থাকায় আমরা অধ্যাত্ম-সাধনার জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছি না। সাধারণত এইসব আপত্তি

ভিত্তিহীন। যদি উচ্চতর জীবনের প্রতি সত্যই আন্তরিক দৃঢ়মূল আকাঙ্ক্ষা জাগে, তবে অধ্যাত্মসাধন ও অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীর সময় সর্বদাই পাওয়া যায়। প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেও যদি সাধন ও অধ্যয়ন না কর তবে তুমি একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। আত্মা যদি একটুও জাগরিত হয়, তবে যেকোন অবস্থায় তার পুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায়, নিজ ব্যক্তিত্বেই গভীর ফাটল দেখা দেবে, তীব্র বিক্ষোভ ও অস্থিরতা, প্রচণ্ড অসন্তোষ ও ভারসাম্যের অভাব ঘটবে। এক্ষেত্রে যতক্ষণ আত্মা অতৃপ্ত থাকবে ততক্ষণ কিছুতেই স্বস্তিবোধ হবে না।

আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন কোন দিন একটু তাড়াতাড়ি, কোন দিন বা ধীরে ধীরে একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে করতে পারি, কিন্তু যদি কোনদিন একেবারে না করি তবে সেই চিন্তা সারাক্ষণ আমাদের বিঁধতে থাকবে ও মনে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। তাড়াতাড়ি হোক আর ধীরে ধীরে হোক আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রতিদিন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রচিত্তে নিয়মিতভাবে করতে হবে।

আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ও অধ্যয়নের জন্য একটুও সময় পাই না বলার মধ্যে কোন সত্য নেই। যদি ৬ ঘণ্টা ঘুমাবার সময় পাই, তার থেকে ১০ মিনিট কম ঘুমাই, ৫ মিনিট যদি খাবার সময় থেকে পাই অন্য কিছুর সময় থেকে আরও ৫ মিনিট নিতে পারি। এইভাবে অন্তত আধ ঘণ্টা সময় আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও অধ্যয়নের জন্য পাওয়া যেতে পারে। সব ক্ষেত্রেই এইরূপ করতে হবে, মন বিক্ষিপ্ত থাকলেও, ভাল মনঃসংযোগ না হলেও, অনুশীলন গতানুগতিক হলেও, এমনকি অধ্যয়নের ও গভীর চিন্তার কথায় মস্তিষ্ক বিদ্রোহ করলেও। এটাও একটা কর্তব্য! কারণ পরের সেবার জন্য আগে নিজের সেবা করলে, পরের সেবা আরও দক্ষতার সঙ্গে, আরও বেশি উদ্যমের সঙ্গে করা যায়। যদি সঠিক উদ্যম নিয়ে ব্যক্তিগত লাভের দিকে না তাকিয়ে পরের সেবা করা যায়, তবে ধ্যান আরও ভাল হয় এবং তা আবার পবিত্র কাজে আত্মোৎসর্গ ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ বুদ্ধিতে পরহিত-ব্রতে আত্মনিযুক্তির সহায়ক হয়।

কেউ কেউ কোন কাজে ব্যাপৃত থাকার সময়ও জপ করতে থাকে। মনকে সংযত, শুদ্ধ ও সঠিক পথে বিকশিত করতে জানলে, মনের আশ্চর্য কর্মদক্ষতা প্রকাশ পায়। কর্তৃত্ববোধ একেবারে ত্যাগ করে, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ও নিঃশর্তভাবে আত্ম-সমর্পণ বুদ্ধিতে করতে পারলে নিজ কাজ বেশ ভাল ভাবেই করা যায়। এইভাবে কাজ করলে একসময়ে সব কাজই পূজা হয়ে দাঁড়ায়। আবার যখন আমরা ঐরকম স্তুতিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে থাকি তখনো কাজ পূজা হয়ে দাঁড়ায়। কর্মের সঙ্গে আত্মসমর্পণভাব যুক্ত হলে করণীয় সব কর্মই একেবারে স্বার্থলেশহীন ভাবে করা যায়।

## কর্মের মহৎ উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন

দেখা যায় অধিকাংশ লোকের জীবন উদ্দেশ্যবিহীন কাজে ভরা, যার কোন আদর্শ নেই, কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কোন কিছুর সম্পর্কেই পরিষ্কার ধারণা নেই। এ যেন অস্পষ্ট ও ঘোলাটে ধারণা ও কামনার সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো। লোকে সাধারণত যাকে কর্তব্য বলে তা বাস্তবে আসক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকাংশ লোকই আসক্তি ও ভোগলিপ্সায় নিজেদের ব্যস্ত ও কর্মচঞ্চল করে রাখে। আসক্তি ও ভুল মূল্যবোধের বশবর্তী হয়ে কাজে ব্যস্ত থাকা সহজ। আসক্তি ও কোন রকম লোভের বশবর্তী হয়ে কাজ করাকেই আমরা কর্তব্য আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু তা মোটেই কর্তব্য নয়। এ সব আসক্তি ও ভোগলিপ্সা—যদিও তাকেই আমরা বড়সড় সব নাম দিয়ে সন্তুষ্টি বোধ করি। কর্তব্যকর্মে একটুও আসক্তি বা অহংবোধ থাকবে না—তা ব্যক্তিগতভাবেই হোক আর সমষ্টিগতভাবেই হোক। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণবোধে কাজ করা বিধেয়, ঔচিত্যবোধে, কখনো কোন স্বার্থবুদ্ধিতে নয়।

সাধারণত মানুষ স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও বাসনার দাস হিসাবে কাজ করে। কিন্তু মহৎ ব্যক্তিরা স্বীয় অবাধ স্বাধীন মন দিয়ে কাজ করেন, কখনো আসক্তি বা সাধারণ কর্তব্যবোধ থেকে নয়। তাঁদের সব কাজ যেন নিজে প্রভুর হাতের যন্ত্রস্বরূপ এই বোধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতস্থ ঈশ্বরের প্রতি একরকম প্রীতিপূর্ণ সেবা।

আমাদের কর্মের একটি লক্ষ্য থাকা উচিত—যা ক্ষুদ্র ভোগজগতের বাহিরে এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে। আমাদের কাজ যেন উদ্দেশ্যবিহীন বা নিছক কাজের জন্যই কাজ না হয়। অনেকেই 'কাজপাগল' হয়ে গর্ববোধ করে, তাতে বোঝায় তারা অলসভাবে বসে থাকতে পারে না, কিছু না কিছু করবেই—পাছে তাদের নিজের মধ্যে, নিজ চিন্তার মধ্যে, একাকী থাকতে বাধ্য হতে হয়, এই ভয়ে। তাদের কাজ বানরের মতো—গভীর মনঃসংযোগ আছে কিন্তু কিসের জন্য তা কেউ জানে না। এতে গর্বের কিছু নেই। এরা স্থূলজগতে কিছু না কিছু কাজ করে, দেখে বা শোনে এবং এ কাজে বাধা পেলে দুঃখে কাতর হয়। তারা আর চিন্তাজগতে বাস করতে পারে না। বেশির ভাগ লোকই নিজ শরীরের প্রতি আসক্তি ও অনুরাগের জন্য কাজ করে। একেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'কাম-কাঞ্চনাসক্তি' বলতেন। যদি কারও প্রকৃত কর্তব্যবোধ জাগে তাহলে ভাল—কিন্তু তাও একরকমের বাধ্য-বাধকতা। এর চেয়ে আরও মহত্তর এবং উচ্চতর অবস্থা আছে, তা হলো সকলের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তাঁর প্রীতিপূর্ণ সেবা—সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মনোভাবে।

উচ্চ আদর্শের সঙ্গে অবশ্যই কিছু কিছু সীমাবোধও আসে। যখনই কোন উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য স্থাপন করা যায় তখন আর অবাধে ও নির্বিচারে তথাকথিত কর্তব্যের

প্রতি ধাবমান হতে পারা যায় না। চুরি করা বা মিথ্যা বলা বা কোন অনৈতিক কাজ বা অপবিত্র যৌনজীবনযাপন করতে পারা যায় না—কুরুচিসম্পন্ন বা অসভ্য আচরণও সম্ভব হয় না। অন্তত প্রকৃত বিবেকবান ও নিষ্ঠাপরায়ণ লোকেরা তা পারে না। অবিবেকী লোক ঐসব কাজ ও আরও অধিক অন্যায় কাজ করতে পারে। এখানেও বিবেকী ব্যক্তির পরিধি অবিবেকী অপেক্ষা সীমিত, কিন্তু বেশ উচ্চ পর্যায়ের ক্ষেত্রেই এই সীমাবদ্ধতার কথা আসে। যদি আমরা আন্তরিকভাবে উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য স্থাপন করি তবে দেখা যাবে যে, কোন কোন কাজ বা কোন কোন তথাকথিত কর্তব্য তার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। সে কাজগুলিকে সব জলাঞ্জলি দিতে হবে। অন্য কোন পথ নেই।

(বিবেকের) সঙ্গে বোঝাপড়ায় এলে আমরা বলব এবং জানব যে সেটা আমাদের দুর্বলতা। কিন্তু সেটাই আমাদের দুর্বলতার যৌক্তিকতার প্রমাণ মনে করা বা একে কর্তব্য বলা উচিত নয়। কোন সমঝোতা করতে হলে তা যেন ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার সমঝোতার ওপরে ওঠার জন্যই করা হয়। কোন যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা নয়, আদর্শকে কখনোই খর্ব করা নয়।

কর্তব্যের প্রশ্ন বড় জটিল। তাই ভগবদ্গীতায় বলেছে—জ্ঞানী লোকেরাও কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[১৫] আগে যেমন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ যা উন্নতির পথে নিয়ে যায় তাই কর্তব্য, আর যা তাতে বাধা দেয় বা অবনতির দিকে নিয়ে যায় তাই অকর্তব্য—যেমন আমরা বলি, যা ক্রমবিকাশের পথে যেতে সাহায্য করে তাই ভাল, আর যা তাতে বাধা দেয় তাই মন্দ। এগুলি কিন্তু অত্যন্ত মামুলি এবং অস্পষ্ট সংজ্ঞা। প্রত্যেকটি ব্যাপারকে তার গুণাগুণের ওপর বিচার করতে হবে এবং মহত্তরের জন্য নিকৃষ্টতরকে ত্যাগ করতে হবে, উচ্চতর আত্মার জন্য নিম্নতর আত্মাকে ত্যাগ করতে হবে। এরূপে আমরা ধাপে ধাপে উচ্চ থেকে উচ্চতর কর্তব্যের পথে অগ্রসর হতে পারব, শেষে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাব, যেখানে কোন কর্তব্য থাকে না—কেবল পূর্ণ আত্মসমর্পণ বুদ্ধিতে স্বার্থলেশহীন ভাবে প্রীতিযুক্ত হয়ে সর্বভূতে ঈশ্বর সেবাই পড়ে থাকে। এই হলো সকল মহৎ ব্যক্তির জীবনে প্রকটিত আদর্শ।

## অধ্যাত্মজীবনে অন্যের সহায়ক হওয়া

আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু উন্নত হওয়ার পর অন্যকে এই পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তুমি যতদূর শক্তি অর্জন করেছ কেবল ততদূর। অন্যথায় যাদের তুমি সাহায্য করতে চাও, ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা কর। যদি

---

১৫ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* ৪/১৬

তুমি গভীর ও ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা কর—তবে ঈশ্বরই তাদের মঙ্গলের জন্য সব করবেন। তুমি ততটুকুই অন্যদের সাহায্য করতে পার যতদূর পর্যন্ত তারা প্রভুর প্রতি, তোমার ইষ্ট দেবতার প্রতি অনুগত।

নিজে সাধন না করলে অপরকে ঠিক ঠিক সাহায্য করা যায় না। তুমি যে নৌকাতে চলেছ তা যদি ডুবে যায়, তুমি সাঁতার জানলে অন্তত একজন সাথীকে বাঁচাতে পারবে। তুমি সকলকে বাঁচাতে পারবে না, সে চেষ্টা করলে তুমি শুদ্ধ সকলে মিলে ডুববে। তাই প্রথমে খোলামনে বিচার করে দেখবে তোমার শক্তি কতটা। পরে সুযোগ যদি আসে অন্যকে সাহায্য করবে।

শিব বিশ্বজগৎকে ত্রাণ করার জন্য তীব্র বিষপান করেছিলেন। নিজে বিষগ্রস্ত না হয়ে বিষ পান করার ক্ষমতা শিবের ছিল। শিবের মতো প্রচণ্ড পবিত্রতা অর্জন করতে পারলেই জগতের বিষ দূর করা যায়। অল্প মাত্রা থেকে আরম্ভ করা ভাল। যত পবিত্রতর হবে, যত আধ্যাত্মিকভাবে উন্নততর হবে, তুমিও নিজেকে বিপন্ন না করে জগৎকল্যাণে অধিকতর বিষ আত্মস্থ করতে পারবে। তুমি যতই অন্যের জন্য বেশি বেশি অনুভব করবে, তাদের কল্যাণচিন্তা যত করবে, তত অধিকতর নিরাসক্ত হবে এবং ততই তুমি তোমার ইষ্টদেবতার, প্রভুর, নিকটতর হবে। তোমার নিজের ও পরের জন্য প্রার্থনা কর।

যাই ঘটুক না কেন, প্রভুর প্রকৃত সন্তান হতে চেষ্টা কর। প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর প্রতি ও তোমার নিজের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস প্রভু দেন। প্রভুকে তোমার সর্বস্ব করে নাও। তাহলে কিছুই তোমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। যদি তুমি অন্তর্নিহিত ঈশ্বরানুভূতির সংস্পর্শ সর্বদা রক্ষা করতে পার, তবে তুমি সব সময়ে সর্ব স্থানে নিরাপদ থাকবে। পবিত্র, একাগ্র, স্থির-সঙ্কল্প হও—নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সফল হবে।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# আধ্যাত্মিক আদর্শের শর্ত

## আদর্শে বিশ্বাস

উচ্চতম অনুভূতি উন্মেষের পূর্বেই, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরে স্পষ্ট ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে পারে। কারণ এই ধারণা আমাদের সত্তার অতি গভীরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অধ্যাত্মজীবনের প্রথম শর্ত হলো আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলা। আমাদের আত্মা সেই ঈশ্বরের প্রতিফলন; এবং এই প্রতিফলনই দিব্যদ্যুতির অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ, যদিও তখনো আমরা দ্যুতিকে সরাসরি দেখতে পাই না। আমরা চিরজীবী হতে চাই কারণ স্বরূপত আমাদের স্বভাব হলো শাশ্বত। শরীর মন ইন্দ্রিয়সমূহ কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না কারণ তারা সব সময়েই পরিবর্তনশীল। এদের থেকে পৃথক রূপে আমাদের মধ্যে আছে 'অহং'-বোধ যার পরিবর্তন নেই। যখন আমরা কোন না কোন ভাবে আমাদের চিন্তাধারা এবং দেহবোধের সঙ্গে মিশে থাকা জীবাত্মা বা অধ্যাত্ম-চেতনার কথা ভাবতে চেষ্টা করি, তখন আসলে আমরা অনুসন্ধান করি পরম সত্য বা পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে।

আমাদের পূর্ণজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত পরমাত্মা সম্বন্ধে আমাদের কোন একটি ধারণা বা কল্পনা নিয়েই চলতে হবে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই আমাদের বিশ্বাস বা মতকে যাচাই করতে হবে। মত যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা পুষ্টিলাভ করবে, তা না হলে কিছুদিন চলে তা বিনষ্ট হবে।

জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি—ভয় এবং দুঃখ-যন্ত্রণার হাত থেকে এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যুর এই ফাঁদ আর তার টানাপড়েন থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তি লাভ করা। এর উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। ভারতের সহস্র সহস্র ঋষি বহু কাল ধরে এই কথাই ঘোষণা করে গেছেন। অধ্যাত্ম-জীবনের প্রথম শর্ত হলো আধ্যাত্মিক আদর্শ অর্থাৎ আত্মানুভূতি লাভের আদর্শের প্রতি *শ্রদ্ধা* বা বিশ্বাস। এই আদর্শে স্থির হতে হবে—স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে—সাধনার পথে অগ্রসর হবার পূর্বেই। এই পথ সম্বন্ধে ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে—অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের নির্দিষ্ট ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। যত দিন আমরা আমাদের সকল অনুভূতি ও কাজের

মধ্যে ভাসাভাসা, স্বপ্নের মতো ধোঁয়াটে ভাব নিয়ে থাকব, ততদিন আমরা কেবলই এক নিরন্তর দ্বন্দ্বের শিকার হব যা আমাদের বেশির ভাগ লোককে উদ্দেশ্যের প্রতি এক পাও অগ্রসর হতে দেবে না। থাকবে কেবল ওপর ওপর চিন্তা, অগভীর অনুভূতি, অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত কর্মোদ্যোগ আর হারিয়ে যাবে আমাদের সাধনার সুতীব্র অভীপ্সা, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং সুগভীর বোধশক্তি।

জেন বৌদ্ধসাহিত্যে একটি উপদেশপূর্ণ গল্প প্রচলিত আছে—

> ***একজন সন্ন্যাসী জেন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'একটি সিংহ যখন শিকার ধরে, খরগোসই হোক আর হাতিই হোক, সে একটি কেন্দ্রীভূত উদ্যমে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। এই শক্তির প্রকৃতি কিরূপ?' প্রভু বললেন : 'পূর্ণ ঐকান্তিকতার ভাব। প্রতারণা না করার শক্তি।' (সংক্ষিপ্ত উত্তরটিকে ব্যাখ্যা করে বলেন) 'প্রতারণা না করার অর্থ সমস্ত সত্তাকে একযোগে কাজে নিয়োগ করা। একেই বলে সমস্ত সত্তাকে একযোগে কাজে লাগানো—কিছুই জমিয়ে না রেখে বা অন্য ভাবে অপ্রকাশিত না রেখে—অপচয় হতে না দিয়ে। যে এইভাবে জীবন যাপন করে তাকে বলা হয় স্বর্ণ-কেশরযুক্ত সিংহ—যা হলো তেজ, ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠতার প্রতীক।***

অন্যভাবে বলা যায়, অধ্যাত্মজীবনে যা বিশেষ প্রয়োজন তা হলো শ্রদ্ধা—সত্য আত্মাকে উপলব্ধি করার স্বীয় সামর্থ্যের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই আমাদের পুঞ্জীভূত শক্তিকে সঠিক দিকে চালিত করে।

অবিশ্বাস বা সন্দেহই হলো ভয়ানক বিপদ, যা অধ্যাত্মজীবনে উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম সকলের ক্ষেত্রেই এরকম হয়ে থাকে। সন্দেহ মানেই হলো নিজের উপর, ঈশ্বরীয় সত্তার উপর বিশ্বাসের অভাব—একে পুরোপুরি অপসারিত করা যায় না, যতদিন না ঈশ্বরানুভূতি হয়। যেমনই হোক সন্দেহকে প্রশ্রয় দিতে নেই, অথবা অধ্যাত্মজীবনের উন্নতির জন্য আমাদের যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, তা থেকে কিছুতেই বিচলিতও হতে নেই।

মনোজগতে আমাদের এমন এক আদর্শে স্থির থাকা উচিত যাতে মর্তে বা স্বর্গে কোন সুখভোগই আমাদের উদ্দেশ্য না হয়, একমাত্র লক্ষ্য হবে আত্মানুভূতি। স্বর্গের সুখ কোনভাবেই মর্তের সুখের থেকে ভাল নয় এবং যতক্ষণ স্বর্গসুখের আকাঙ্ক্ষা থাকবে আমরা উদ্দেশ্যলাভে সিদ্ধ হব না। আমাদের লক্ষ্যের কাছে স্বর্গলাভ অতি তুচ্ছ।

স্বর্গলাভ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। এক গল্‌ফ খেলার অনুরাগী মৃত্যুর পর স্বর্গে গেছিল। স্বর্গে পৌঁছে সে প্রথম প্রশ্ন করল—"এখানে কি কোন গল্‌ফ খেলার

মাঠ আছে?" উত্তর এল—"স্বর্গে গল্‌ফ খেলার মাঠ! না তা কখনো হয় না!" "তবে আমি স্বর্গ চাই না। আমি বরং অন্য কোথাও যাব!" তাই তাকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে পৌঁছে তাকে চমৎকার গল্‌ফ কেন্দ্রগুলি দেখানো হলো—সে তখন জিগ্যেস করল—"কিন্তু বন্ধু, গল্‌ফ ক্লাবগুলি কোথায়?" উত্তরে বলা হলো "আমাদের গল্‌ফ খেলার মাঠটাই আছে—কোন ক্লাব নেই, সেটি হলো এর নরক।"

আমরা পরিপূর্ণ সংসারজীবন আর উচ্চতর জীবন একই সঙ্গে যাপন করতে পারি না। আমরা জাগতিক স্নেহ ভালবাসার পেছনেও ছুটব আবার মহনীয় ঈশ্বরপ্রেমও লাভ করব, তা হয় না। ঈশ্বর ও সাংসারিক স্নেহপ্রীতি, ঈশ্বর ও সাংসারিক ইন্দ্রিয়-ভোগলিপ্সা ও সুখ একই সঙ্গে থাকতে পারে না। সন্ত তুলসীদাস যেমন বলেছেন—"যেখানে কাম সেখানে রাম থাকতে পারে না; যেখানে রাম সেখানে কাম থাকতে পারে না।" যেমন যীশুখ্রীস্ট বলেছিলেন, "ঈশ্বর ও ম্যামন অর্থাৎ ধন দেবতা, একসঙ্গে দুজনকে সেবা করা যায় না।"[১]

আমাদের গভীরভাবে আত্মানুসন্ধান করা উচিত এবং আমরা সত্যই ঈশ্বরলাভ করতে চাই কি না তা যাচাই করা উচিত। যদি আমরা অন্যের স্নেহ ভালবাসা বা সাংসারিক বস্তু পেতেই আগ্রহী হই, তবে ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও আমরা চলতে পারি। যদি এগুলি লাভ করে আমরা বেশ সুখী ও সন্তুষ্ট থাকি, তখন বুঝতে হবে যে, ঈশ্বরকে আমরা চাই না। এ ক্ষেত্রে তাঁকে না পাওয়াটাই আমাদের যোগ্য পুরস্কার। সুতরাং প্রত্যেক সাধকেরই উচিত সময় সময় নিজেকে প্রশ্ন করা—সত্যই কি ঈশ্বরই তার কাম্য না অন্য কোন বস্তু। যদি সত্যই ঈশ্বরই তার কাম্য হন, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাকে দেখা দেবেন—কারণ যে ভক্ত কেবল ঈশ্বরকেই অনুসন্ধান করে, ঈশ্বর তার কাছে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "ভক্ত যদি ঈশ্বরের দিকে এক-পা যায়, তবে তিনি তার দিকে দশ-পা এগিয়ে আসেন।"[২]

সব থেকে বড় গোলমাল হলো আমরা বহুলোক-পরিবৃত এই দৃশ্যমান জগৎকে কঠোর সত্য বলে বিশ্বাস করি, আর আমাদের মধ্যে দুটি সত্যের স্থান হতে পারে না। তাই আগে ভক্ত হৃদয়টিকে শূন্য করে ফেলতে হবে; একবার তা করলে সে স্থান ঈশ্বরকে দিয়ে ভরিয়ে নেওয়া যাবে।

যাকেই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি, যাকেই সত্য ও চিরস্থায়ী বলে চিন্তা

---

১ বাইবেল, সেন্ট ম্যাথু—৬.২৪

২ স্বামী অভেদানন্দ-কৃত *'Thoughts on Yoga, Upanishads and the Gita'* (Kolkata. Ramakrishna Vedanta Math, 1970) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭৪।

করি—তাই আমাদের সমস্ত সত্তাকে টেনে নেয়, সমস্ত মনকে শুষে নেয়, সমস্ত অনুভূতিকে আকর্ষণ করে। এটি আধ্যাত্মিকজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। বেদান্ত মতে যা সকল অবস্থাতে অপরিবর্তিত থাকে না তা চরম সত্য নয়। যা অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অপরিবর্তিত থাকে একমাত্র তা-ই সত্য। যা কিছুর বিকার বা ক্ষয় হয়, ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিজড়ন হয় তাকেই অসত্যের পর্যায়ে ফেলা হয়। এক ছেলেকে তার মা জিগ্যেস করে, "স্বপ্ন কাকে বলে?" উত্তরে ছেলেটি বলে, "চোখ বুজে সিনেমা দেখার মতো।" আমরা জাগ্রত অবস্থাতেও ঐ ভাবের অভিজ্ঞতা পেতে পারি যদি আমাদের মধ্যে শিশুর পবিত্রতা ও আন্তরিক সরলতা থাকে। যখন আমরা নিজেদের বিশ্লেষণ করি আমরা দেখতে পাই একমাত্র চেতনাই অপরিবর্তিত থাকে। শুদ্ধ চিত্ত যেন একটা পর্দা যার ওপরে জগৎরূপ চলচ্চিত্র নিয়ত প্রদর্শিত হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ "ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্যকে ধরে থাক।"[১] এই বিবৃতির যাথার্থ্যতার ওপর আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় থাকা উচিত।

এই উচ্চ আদর্শকে আমরা যেন কখনোই খাটো না করি, বরং এই আদর্শের তুল্য জীবন যাপনে সর্বদা যেন সচেষ্ট থাকতে উদ্যমী হই। উচ্চ আদর্শ যদি নাগালের বাইরে হয়, তবে সেই উচ্চ আদর্শে পৌঁছবার সোপান স্বরূপ আমাদের একটি কার্যকরী আদর্শ থাকা চাই তবে ঐ উচ্চ আদর্শকেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য বলে জেনে রাখতে হবে। যতদিন না আমরা ঐ উচ্চতম আদর্শে পৌঁছতে পারছি, যথা, অনন্তের উপলব্ধি করতে পারছি, ততদিন আমরা যেন, কোন আপস-রফা না করি। যদি আমরা ঐ উচ্চ আদর্শে পৌঁছনোর চেষ্টায় ব্যর্থ হই—জানতে হবে যে, সেটা আমাদের সাময়িক ব্যর্থতা মাত্র। আমরা আরও অধিক উদ্যমে ও দৃঢ়তর সঙ্কল্প নিয়ে আদর্শে পৌঁছতে চেষ্টা করব। আমরা নিম্নমানের আদর্শের পেছনে যেন না ছুটি।

## ধর্মের মূল বিষয়গুলিকে আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে পৃথক করা

আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসুর ক্ষেত্রে অপরিহার্য দ্বিতীয় গুণ হলো, ধর্মের মূল অংশগুলিকে আনুষঙ্গিক অংশ থেকে পৃথক করার ক্ষমতা। যারা ধর্মের এই আনুষঙ্গিক অংশগুলিকে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন বলে ভুল করে ও অসংলগ্ন আচার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে, তারা কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। তথাকথিত গোঁড়া লোকেদের এই দশা; তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের

---

১ পূর্বোক্ত, বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২

অনুশাসনগুলি কঠোরভাবে পালন করা সত্ত্বেও যে অবস্থায় ছিল সেইখানেই থেকে যায়। তারা মূল উদ্দেশ্যটিকে ঠিক ধরে উঠতে পারে না।

ধর্ম পুঁথিগত বিদ্যা থেকে আলাদা ও তার থেকে আরও বেশি কিছু একটা। আজকাল সর্বত্র বই পাওয়া যায়; সব ধর্মপুস্তকের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের বার্তা বিভিন্নরূপে সকলের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্যে, বুদ্ধিগত অনুশীলনে, সত্যবস্তুর উপলব্ধি কখনই হয় না। বৌদ্ধিক জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা ও খুব একটা উচ্চ ধারণা করলে—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"[৪] রূপ ধর্মের মূল সত্যের উপলব্ধি হয় না।

> *সাধক নিঃশেষে আত্মবিদ্যার বিষয় অনুশীলন ও আয়ত্ত করবে, কিন্তু পাণ্ডিত্য অর্জনের পর, সর্ববিধ এষণা (কামনা) ত্যাগ করে, আত্মজ্ঞানরূপ বল মাত্র অবলম্বন করে, জীবন যাপন করবেন।*[৫]

সরল না হলে অধ্যাত্মজীবন হয় না। আমাদের সব রকম ছলনা, অসত্যকথন, গোপনতাপ্রিয় মানসিকতা, অসাধুতা, মানসিক ভ্রষ্টাচারিতা বর্জন করতে হবে, তবেই আমাদের অধ্যাত্ম পথে কোন উন্নতি সম্ভব। অধ্যাত্ম-সাধককে ন্যায়পরায়ণ, সম্পূর্ণ ঐকান্তিক, উন্মুক্তমনা ও ধ্যানশীল হতে হবে। আত্মগর্ব, পাণ্ডিত্যের গর্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। অধ্যাত্মজীবনের মূল কথাগুলি জেনে, ঈশ্বর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে সাধক সাধনায় প্রবৃত্ত হবেন। বেশি ফাঁকা কথা পড়তে নেই। তাতে কেবল বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

> *ধর্মগ্রন্থের বাক্যস্তূপ ঘন-অরণ্যের মতো মনকে বিভ্রান্ত করে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত আত্মার স্বরূপ জানবার জন্য উদ্যম করা। (বিঃ চূঃ—৬০)*
>
> *ভাষায় ব্যুৎপত্তি, শব্দ প্রয়োগে নিপুণতা, শাস্ত্র ব্যাখ্যায় চাতুর্য, কাব্য অলঙ্কারাদিতে পাণ্ডিত্য—বিদ্বান ব্যক্তিদের ভোগ্যবস্তু প্রাপ্তির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু এগুলি মুক্তি-লাভের সহায়ক হয় না।*[৬]

তবে যেন মনে করা না হয় যে, অধ্যয়নাদি বর্জনীয়। শাস্ত্রাদি অনুশীলন নিশ্চয়ই করা উচিত—চরম সত্য উপলব্ধির জন্য। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন, এক ব্যক্তি বাড়ি থেকে একখানি চিঠি পেয়েছিল—তাতে কিছু জিনিস পাঠাবার কথা লেখা ছিল। চিঠির মর্মার্থ জেনে নিয়ে সেখানি সে ফেলে দিয়ে জিনিসগুলি কিনে নিয়ে এল।[৭] বেদান্তে অধ্যয়নাদি করতে সর্বদা উৎসাহ দেওয়া হয়, কিন্তু তার

---

৪ *ঋগ্বেদ*, ১/১৬৪/৪৬ (৪র্থ অধ্যায়ের ১৬ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

৫ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, ৩/৫/১ এবং এর ওপর শাঙ্করভাষ্য

৬ *বিবেকচূড়ামণি*, ৫৮

৭ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৭৩২

সঙ্গে কোনরূপ যথার্থ আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা নিশ্চয়ই কর্তব্য। ধীশক্তিকে নিয়মিত অধ্যয়নের এবং জীবন সমস্যা ও সত্যবস্তু সম্বন্ধে গভীর চিন্তনের শিক্ষায় সর্বদা নিয়োজিত রাখতে হয়। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বই পড়া এবং স্বচ্ছ ও গভীর চিন্তনের অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজন, এর ফলে কোনদিন কিছু গভীর অধ্যয়ন না করলে অশান্তি বোধ হবে। দৈনন্দিন অধ্যয়ন অধ্যাত্মসাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ হওয়া উচিত।

বুদ্ধজীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, জনগণকে আচার অনুষ্ঠানের বিষয় বেশি চিন্তা না করে, ধর্মকে নিজ নিজ জীবনে জীবন্ত করে তুলতে বলা—পবিত্র, ধ্যানপরায়ণ, অধ্যাত্ম অনুশীলনে অভ্যস্ত ও সংযতমনা জীবন যাপনের মাধ্যমে। জীবনে নীতিপরায়ণ ও পবিত্র না হয়ে আধ্যাত্মিক হতে বা সেই পথে অগ্রসর হতে কখনই পারা যায় না। তাহলে সবই মূর্খের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

বুদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে কি বলেছেন? তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে ঈশ্বরের কথা বেশি বলার থেকে তাঁর পথে চলা আরও বেশি প্রয়োজনীয়। লোকে প্রায় বলে, "হে ঈশ্বর, তুমি কত সুন্দর! তোমার আকাশ কত সুন্দর! তোমার নক্ষত্র, ও সমগ্র সৃষ্টি কত সুন্দর!" কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, সৃষ্টির চেয়ে সৃষ্টিকর্তা আরও বড় এবং তিনি এইসব ক্ষুদ্র জিনিসের জন্য গর্ব অনুভব করেন না। মানুষের দিক থেকে এটি বড় মনে হয়, কিন্তু ঈশ্বরের দিক থেকে এটি তো অতি ক্ষুদ্র। তাই বাহ্য ঐশ্বর্যের জন্য ঈশ্বরকে স্তুতি করার চেয়ে তাঁর পথে চলা বেশি প্রয়োজনীয়। এইরূপ স্তুতি প্রায়শ কেবল বাক্‌সর্বস্বই থেকে যায়।

একবার বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হয়—"ভগবন্, ঈশ্বর কি আছেন?" "আমি কি বলেছি যে, ঈশ্বর আছেন।" প্রশ্নকর্তা বুঝলেন, "অতএব ঈশ্বর নাই।" কিন্তু বুদ্ধ প্রতিপ্রশ্ন করে বললেন, "আমি কি বলেছি যে, ঈশ্বর নাই?"[৮] সব রকম ফাঁকা চুল-চেরা তর্ক বন্ধ করে যাতে মানুষ তার দুঃখ কষ্ট মোচনের দিকে সচেষ্ট হয় তাই চেয়েছিলেন শ্রীবুদ্ধ। তাই তিনি বললেন, "একটি বাড়িতে আগুন লাগলে তুমি কি আগেই কারণ অনুসন্ধান কর, না আগুন নেভাবার চেষ্টা কর?" কিন্তু প্রায়ই আমরা মূর্খের মতো প্রথমেই কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হই এবং সে কাজ শেষ হবার আগেই বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ধর্মের সারকে অসার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান থেকে পৃথক করতে শিখতে হবে।

---

৮ F. L. Woodward, *Some sayings of the Buddha* (London : Oxford University Press, 1951) p. 223 থেকে সংকলিত।

## আত্মপ্রচেষ্টা

এর অর্থ, বহু বছর ধরে আমরা যে চিন্তাজগৎ গড়ে তুলেছি তার পারে যাবার প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ। অধিকাংশ লোকই এটি ত্যাগ করতে চায় না। তারা নিজ মনের বিরুদ্ধে কাজ করতে অতি জড়িমাগ্রস্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মা ভবতারিণীর কাছে অনুযোগ করেছিলেন তিনি ভাত রেঁধে লোকের সামনে রেখেছেন, তবু তারা উঠে এসে খাবার চেষ্টাও করছে না।[১] আমরা সব সময়ে চাই অন্যে আমাদের জন্য সব করে দিক। নিজ প্রচেষ্টা ছাড়া বদলিস্বরূপ অপরের সাধনার মাধ্যমে নিজের মোক্ষলাভ কোন সাধকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিরা ধর্মজগতে ও আধ্যাত্মিকজীবনে পরগাছাস্বরূপ। তাদের পক্ষে অন্য কিছু নিয়ে থাকা উচিত।

প্রকৃত আগ্রহের সঙ্গে আধ্যাত্মিকজীবন শুরু করবার আগে আমাদের বিচার করে দেখা দরকার—আমরা সত্যই পুরোপুরিভাবে এর জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত কি না। আমাদের মধ্যে সাধারণত দুরকম প্রবণতা দেখা যায়—সাংসারিক আর আধ্যাত্মিক। যদি প্রথমে দুটিরই প্রভাব প্রায় সমান হয়, তবে আধ্যাত্মিক প্রবণতাকে বাড়িয়ে নিতে হবে; নচেৎ কোন অগ্রগতি হবে না আর আমাদের অন্তরের মধ্যে দড়ি টানাটানির যে যুদ্ধ চলছে, তাতে কখনই জয়ী হওয়া যাবে না। সেইজন্য আগে বরাবরের জন্য উদ্দেশ্য স্থির করে নিতে হয়, পরে সব রকম পরিস্থিতিতেই ঐ উদ্দেশ্যকে ধরে থাকতে হয়। এই দুরূহ পথ যদি সত্যই বেছে নিতে হয়, তবে পথের অসংখ্য গর্ত, বিপদ ও বাধা অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। সব অসত্যের পারে যেতে হলে আমাদের মধ্যে কিছু নির্ভীকতা ও ডানপিটে ভাব থাকা প্রয়োজন। মুমুক্ষুর পথ অতি বিপদসঙ্কুল; সর্বত্র আশে পাশে খানাখন্দ ও বিপদ যেন ওঁত পেতে রয়েছে; একবার আটকে গেলে অনেকের পক্ষে আর কোন উপায় থাকে না। সমস্ত সাংসারিক বাসনা ও ক্ষুদ্র আমিত্ব ত্যাগ না করলে উচ্চতর আদর্শের অনুভূতি হয় না।

আমরা লম্বা দড়ি সমেত খুঁটোয় বাঁধা গোরুর মতো। গোরু চরতে পারে ও চলাফেরায় কিছুটা স্বাধীনতা তাদের আছে। কিন্তু মূর্খ জন্তুটা কেবল পাক খাবে, শেষে সমস্ত দড়িটা খুঁটোয় জড়িয়ে ফেলায় তার পক্ষে পায়ের কাছের ঘাসে পর্যন্ত মুখ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঈশ্বর মানবকে বেশ লম্বা দড়িই দেন, কিন্তু সে কদাচিৎ তার সদ্ব্যবহার করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে হতাশভাবে জড়িয়ে মরে—শেষে আর এদিক ওদিক করার ক্ষমতাও থাকে না; যদিও তা ঈশ্বরের দোষ নয়। নিজের ওপর সমস্ত দায়িত্ব নিতে শেখ। তোমার যা হয় তার সব দায়িত্ব ঈশ্বরের

---

১ দ্রঃ *Sayings of Sri Ramakrishna*, Ramakrishna Math, Madras 1975, p. 206

ওপর চাপিয়ে দেওয়া অত্যন্ত ভুল। তুমি ক্ষণিক সুখের জন্য সব ভুলে যাও—ঈশ্বর যুগ যুগ ধরে মানবকে কি বলে আসছেন তা শুনতে পর্যন্ত চাও না।

আধ্যাত্মিক জীবনের অর্থ যদি হয় মহৎ লক্ষ্যের অনুভূতির উদ্‌গতি ও শুদ্ধায়ন, তাহলে একই সঙ্গে তার অর্থ হয় তোমার ইচ্ছাশক্তির উন্নতি সাধন ও মনকে উন্মার্গগামী হতে বাধা করা। এ সমস্তকেই পুরোপুরি উচ্চতর জীবনের অভিমুখী হতে হবে। এ জগতে প্রভূত ইচ্ছাশক্তি ও একাগ্রতা দেখা যায়, কিন্তু সে দুটিকেই ভুল পথে চালিত করা হয়, ফলে মানব গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকার ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়। যদি জগতের সব ইচ্ছাশক্তি সঠিক পথে চালিত হতো, তবে আমাদের এই জগৎ এখনই স্বর্গ হয়ে যেত।

একটি ছোট মেয়ের ধাত্রী তার মায়ের কাছে নালিশ করল—মেয়েটিকে শাসনে রাখা তার পক্ষে কঠিন হচ্ছে। মা ধাত্রীকে বললেন, "আর একটু বেশি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করুন।" ধাত্রী বলে, "আমি চেষ্টা করি কিন্তু মেয়েটির অনিচ্ছাশক্তি আমার ইচ্ছাশক্তির থেকে বেশি।" আধ্যাত্মিক শিশুর ক্ষেত্রেও এই একই সমস্যা। সে অনেক কিছু করতে চায়, সর্বদা ধ্যান করতে চায়, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকতে চায়, কিন্তু তার মন বিদ্রোহ করে। খ্রীস্টান মতে—মানুষের ইচ্ছা সর্বদাই বিপথগামী। হিন্দু মতে মনের বিপথগামিতার কারণ মানুষের *সংস্কার* বা সংগুপ্ত ভাবরাশি। এতে ইচ্ছাশক্তিকে সঠিক পথে চালিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু *সংস্কারের* পরিবর্তন এমনকি নাশও সম্ভব। ভাল কাজ করে, সৎসঙ্গে থেকে, আমরা *সৎ-সংস্কার* অর্জন করতে পারি। উপরন্তু, ইচ্ছাশক্তি প্রথমে যত সীমিতই হোক, নিরন্তর প্রয়োগের মাধ্যমে আমরাই সেই ইচ্ছাশক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে পারি। এতে আধ্যাত্মিক জীবন আরও সহজ হয়।

ঈশ্বরের কৃপা আত্মপ্রচেষ্টারূপে আসে। ঈশ্বরকৃপার নিদর্শন হলো, সঠিক পথে আমাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়োগ করতে আমরা তীব্র প্রেরণা অনুভব করব, পথের সব বাধাকে উড়িয়ে দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হতো। পাপকে ভয় হতো না। পাপের শাস্তি হতো না।

"যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁর ভাব কি জান? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী।..."[১০]

একদিন শ্রীসারদাদেবীকে তাঁর এক শিষ্য প্রশ্ন করে, "যদি ঈশ্বর সত্যই আমাদের

---

১০ পূর্বোক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১৭৫

আপনার জন, তবে কেন তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন না।" শ্রীশ্রীমা বলেন, "কারণ অতি অল্প লোকই সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, অধিকাংশই ধর্মকে একটা আচার-অনুষ্ঠান মাত্র বলে মনে করে।"[১১] আত্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন—আপন সত্তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় সত্তায় মিলন সম্বন্ধে অনুভূতির জন্য। যখন আমরা আমাদের মনকে শুদ্ধ করে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সমতানে বাঁধতে পারব, তখন দেখব যা কিছু ঘটে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তখনই আত্মপ্রচেষ্টা আর ঈশ্বর কৃপার মধ্যে বিরোধ দূর হয়ে যায়।

## সংসারকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা

স্বভাবতই এর অর্থ নিজেদের ও অন্যান্যদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তন। অন্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু পুনর্বিবেচনা করতে হবে। অধ্যাত্ম-জীবন অবশ্যই সংসার জগতের ওপর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনবে। যারা পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ তাদের বর্তমান সম্বন্ধগুলোকে উচ্চতর খাতে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্যে তোমার ভাব না বুঝলে বা পছন্দ না করলে, তুমি যে তাদের সঙ্গে সুর মেলাবে তা ঠিক নয়। আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে সমঝোতা না হলে, এ ব্যাপারে তোমাকে একাই সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তোমাকে শিখতে হবে, কি করে ঈশ্বরের মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। একবার আধ্যাত্মিক আদর্শ গ্রহণ করলে তোমার সব ভাবের ও সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ঐ আদর্শকে সমুজ্জ্বল করে রাখতে হবে।

আধ্যাত্মিক জীবনে দুটি বিপদ এড়িয়ে চলতে হবে। একটি হলো মানব শরীরকে মানবীয় প্রেমে ভালবেসে—তাকে ঈশ্বর প্রেম বলে মিথ্যা আখ্যা দেওয়া। অন্যটি হলো অতি উদাসীন হয়ে যাওয়া—এমনকি সঠিক অনুভূতি সম্বন্ধেও—এবং অত্যন্ত স্বার্থপর হওয়া। অধ্যাত্মজীবনের পক্ষে দুটিই ক্ষতিকারক। অন্যকে ঠিক ঠিক ভালবাসতে বা সেবা করতে হলে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের মহিমা প্রতিফলিত করতে শেখা উচিত। তখন নীরবতাই আবেগপূর্ণ অভিব্যক্তির থেকে আরও সরব হবে এবং কথা বলা প্রয়োজন হলে তাও সহায়ক ও কার্যকরী হবে। অন্যের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঈশ্বরীয় ভাবের মাধ্যমে স্থাপন কর। অন্যের প্রতি আসক্ত না হয়েও প্রীতিপূর্ণ, সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়া সম্ভব। সবই নির্ভর করে আমাদের নিজেদের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তনের ওপর।

আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

---

১১ *At Holy Mother's feet*, (Kolkata, Advaita Ashrama, 1963) p. 89

> শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহান আত্মা (হিরণ্যগর্ভ) আবার বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ, মহান আত্মা থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষের বা অসীম পরমাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। এই আত্মা, জীবাত্মা সর্বজীবে গুপ্ত আছেন। সকলের কাছে প্রকাশিত হন না, কিন্তু কেবল সূক্ষ্ম-বিচারসম্পন্ন ঋষিরাই একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে তাঁকে উপলব্ধি করে থাকেন। বিবেকী পুরুষ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে মনে লয় করবেন এবং মনকে (প্রকাশাত্মক) বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে মহান আত্মায় এবং মহান আত্মাকে শান্ত (ক্রিয়াশূন্য) বা তুরীয় আত্মায় লয় করবেন।[২]

এখানেই গুরু শিষ্যকে উৎসাহিত করেছেন ঃ

> জ্ঞানী আচার্যের সান্নিধ্যে এসে ওঠো, জাগো, আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কর, আত্মজ্ঞান লাভ কর। ... যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধবিহীন অক্ষর শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহত্তত্ত্বেরও পারে কূটস্থ নিত্য, তাঁকে জেনেই জীব মৃত্যু মুখ থেকে মুক্তি পেতে পারে।[৩]

এই মন্ত্রগুলি পড়লেই আমাদের ধারণা হবে, কেন আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যার আচার্যগণ আমাদের সামনে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শটিকে তুলে ধরেন ও উপযুক্ত গুণার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন, যা না থাকলে এমনকি অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনকও হতে পারে। কিন্তু ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে, শেষ পর্যন্ত চরম উদ্দেশ্যে বা পরমপদে পৌঁছানো যায়।

## ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

অনেকে অধ্যাত্ম পথে পা বাড়াতে ভয় পায়। কিন্তু আমাদের যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকে, ভয় পাবার কোন কারণ নেই। মোটর গাড়ি চালানো কি ছেলে খেলা? শিক্ষা না নিয়ে বিমান চালনা বা স্কেটিং বা স্কী করা কি সম্ভব? না। এগুলি সব খুবই বিপজ্জনক খেলা ও অবসর বিনোদনের উপায় কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সবই দক্ষতার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে করা যায়। যদি সংসারে আমরা ঠিকভাবে বাঁচতে ও আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে চাই, তবে আধ্যাত্মিক ভাবের অনুশীলন একান্তই প্রয়োজন।

১৮৮২ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে বর্তমান ভারতের মহান অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, রাখাল (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও অন্য শিষ্যদের সঙ্গে কলকাতায় সার্কাস দেখতে গেছিলেন। সার্কাসে নানা খেলা দেখানো হচ্ছিল। তার মধ্যে একটি খেলার স্মৃতি প্রভুর মনে বিশেষ ছাপ রেখেছিল। একটি ঘোড়া চক্রপথে দৌড়াচ্ছিল, পথের ওপর

---

২ তদেব, ১/৩/৩-১৩

৩ তদেব, ১/৩/১৪-১৫

থেকে বড় বড় লোহার বলয় ঝুলছিল। একটি মেম সাহেব ঘোড়ার ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল, আর ঘোড়াটি যখন বলয়ের নিচে দিয়ে যাচ্ছিল, সে এক একটি বলয়ের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আবার ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। ঘোড়াটি কয়েকবার ঐ চক্রপথটি পরিক্রমা করলে, কিন্তু মেম একবারও ঘোড়ার ওপর চড়তে বা ভারসাম্য বজায় রাখতে ভুল করেনি। এই খেলাটি ঠিকমত দেখাবার জন্য নিশ্চয়ই কয়েক বছরের অভ্যাস প্রয়োজন হয়েছিল। এই খেলাটি দেখতে ঠাকুরের খুব ভাল লেগেছিল। এটি তাঁকে, অধ্যাত্মজীবনে কি করা উচিত তাই মনে করিয়ে দিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত একটি ভক্তকে বলেছিলেন ঃ

> **দেখলে, বিবি কেমন একপায়ে ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বনবন করে দৌড়ুচ্ছে। কত কঠিন, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে তো হয়েছে। একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে। আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা ওইরূপ কঠিন। অনেক সাধন ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। অধিকাংশ লোক পারে না। সংসার করতে গিয়ে আরও বদ্ধ হয়ে যায়, আরও ডুবে যায়, মৃত্যু যন্ত্রণা হয়। কেউ কেউ, যেমন জনকাদি অনেক তপস্যার বলে সংসার করেছিলেন। তাই সাধন-ভজন খুব দরকার, তা না হলে সংসারে ঠিক থাকা যায় না।**[৪]

শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলনের মাধ্যমে সাম্য ও শান্তির অধিকারী না হলে সংসারজীবনে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

জীবনের অন্য সব পথে যেমন, অধ্যাত্ম পথেও তেমনি বিপদ এড়িয়ে ও বাধা পেরিয়ে চলতে হয়। অধ্যাত্ম জীবনে সব থেকে বড় বাধা কি জান? তা হলো সাইনবোর্ড লাগিয়ে ধর্মজীবন যাপনের প্রবণতা। এটা ততক্ষণ সম্ভব হয় যতক্ষণ কারও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা থাকে না। কিন্তু যখন জীবের এই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সে ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য আন্তরিকভাবে ব্যাকুল হয়। তখন সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা পায়, যা তাকে পরম লক্ষ্যের আরো আরো কাছে নিয়ে যায়। আমাদের আচার্যগণ বলেন, মানব-জন্ম লাভ অত্যন্ত দুর্লভ। মানব জন্ম লাভ করে কেউ যদি পশুর মতো জীবন যাপন করে, সেটা খুবই দুঃখের বিষয়।

একজন অগুনতি বই পড়তে পারে; সে অগুনতি বক্তৃতা শুনতে পারে। কিন্তু যদি তার মন আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে না ঝোঁকে, তবে তার সব কর্মই বৃথা। তাই ভারতে আধ্যাত্মিক আচার্যগণ বলেন ঃ 'তোমাকে তোমার মনের কৃপা লাভ করতে হবে।' ঈশ্বর কৃপা ও গুরু কৃপালাভ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের হয়তো

৪ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১০৬

বহু আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করারও সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি নিজ মনের কৃপা লাভ করতে না পারি, তবে সবই বৃথা। আমাদের মনকে সত্যলাভের জন্য খোলা রাখতেই হবে। আবার, যদি সত্যলাভের জন্য মন উন্মুক্তও থাকে, যদি আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরাগও থাকে, তবু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। বৈষয়িক উদ্দেশ্যসিদ্ধিতেও শিক্ষণের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভ্যাস বিনা আমরা কোন কাজই করতে পারি না। অধ্যাত্মজীবনের ক্ষেত্রেও সে কথা সত্য।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প আছে। এক যুবার কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল না কিন্তু সে কার্যনির্বাহীর পদ পাবার জন্য ছিল অতি-আগ্রহী। সে একটি ব্যাঙ্কে গিয়ে এক সহ-সভাপতির সঙ্গে দেখা করে একটি ভাল চাকরি—একটি কার্যনির্বাহীর পদ চায়। যে কর্ম-কর্তাটি তার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি যুবকটিকে বলেন, 'দুঃখিত, তোমাকে দেবার মতো কোন কাজ আমাদের নেই। বারটি সহ-সভাপতির পদ পূর্ণ হয়ে আছে।' যুবা বেশ সাহসের সঙ্গে উত্তর দেয় ঃ 'সংখ্যা সম্বন্ধে আমার কোন কুসংস্কার নেই—তের নম্বর সহ-সভাপতি হতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

দেখ, সহ-সভাপতি নিয়োগ ঐভাবে হয় না। তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। তেমনি, তুমি যদি পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে চাও , তুমি যদি 'ক্ষুরধারের' ওপর দিয়ে হাঁটতে চাও, তোমাকে বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। বিনা শিক্ষায় একাজ করতে গেলে তুমি টুকরো টুকরো হয়ে কাটা পড়ে যাবে। যদি তুমি নিয়ম মতো শিক্ষণ লাভ কর, তবে কোন ভয় নেই বরং ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলতে তুমি আনন্দ পাবে।

আমরা সকলেই জানি সরু বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে দিয়ে উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাতে গেলে কি হয়। তারটি পুড়ে যায়। সেই রকম, সঠিক প্রস্তুতি ছাড়া আমরা যদি বিশ্বাত্মার ভাবে ভাবিত হতে চাই, তবে সে ভাবের চাপ এত বেশি হবে যে আমাদের শরীর, স্নায়ু, মন তা সহ্য করতে পারবে না। এ রকম ঘটে থাকে। তাই আধ্যাত্মিক পথে চলতে গেলে, আমাদের দৃঢ় শরীর, স্থির মন-বুদ্ধি, সবল ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হতে হবে। অন্যথায় আমাদের সব প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে।

### ভেতরের 'স্ফিঙ্কস্'

জীব বিজ্ঞানের 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' এবং 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন' আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রেও ভালভাবে প্রযোজ্য। পশুজগতে পশুরা পরস্পর লড়াই করে,

নিম্নস্তরের মানুষের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে লড়াই করে, আর যারা বলবত্তর তারাই কেবল বেঁচে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতে, সংগ্রাম মানুষে মানুষে নয়, মানুষের নিম্নপ্রকৃতির সঙ্গে উচ্চপ্রকৃতির। আমরা সকলেই এই বিষয়ে অবহিত—কিভাবে আমাদের উচ্চপ্রকৃতি ও নিম্নপ্রকৃতি ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে আর আমাদের জন্য অনন্ত দুঃখকষ্ট নিয়ে আসছে।

গ্রীক পুরাণে স্ফিঙ্কস্ হলো সিংহ শরীর ও নারীমুণ্ডবিশিষ্ট এক দানব। লোকে বলে থিব্জের স্ফিঙ্কস্ সেখানকার অধিবাসীদের একটা ধাঁধার বিষয় ভাবতে বলত। তার সঙ্গে সে এক কঠিন শর্তও আরোপ করত ঃ যে সঠিক উত্তর দিতে না পারবে তাকে মরতে হবে, আর যদি কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে সে থিব্জের সিংহাসনে বসবে। তার প্রশ্ন ছিল ঃ 'কোন্ প্রাণী সকালে চার পায়ে হাঁটে, দুপুরে দুপায়ে, আর সন্ধ্যায় তিন পায়ে?' সঠিক উত্তর দিতে পারেনি এমন অনেককে সে গলা টিপে মেরেছিল। লোকে বলে, ইডিপাস্ ধাঁধার সঠিক উত্তরে বলল ঃ 'শিশু অবস্থায় মানুষ চার-পায়ে হামাগুড়ি দেয়, পূর্ণজীবনে দু-পায়ে সোজা হয়ে হাঁটে, আর বৃদ্ধ বয়সে একটি লাঠিও ব্যবহার করে।' এই উত্তর শুনে ঐ স্ফিঙ্কস্ সমুদ্রে ডুবে আত্মবিসর্জন দিল, আর ইডিপাস্ থিব্জের রাজা হলো।

মিশরীয় পুরাণে স্ফিঙ্কস্ সিংহশরীর আর নরমুণ্ডবিশিষ্ট। পরবর্তী কালের রোমক স্ফিঙ্কসের মুণ্ড কখনো নরের, কখনো বা নারীর। তাই বলা যেতে পারে—স্ফিঙ্কস্ নর ও নারী সকলেরই প্রতীক। সত্যই, নর ও নারী, আমরা সকলেই আশ্চর্য জীব। আমরা আমাদের চরিত্রে পশু ও মানব উভয়ের প্রকৃতিই মিশিয়ে ফেলি। এই প্রকৃতিগুলিই আত্মাকে ঢেকে রাখে। যখন স্ফিঙ্কস্ জিজ্ঞেস করে ঃ 'তুমি কে?' — আমরা কি তার উত্তর দিতে পারি? যদি আমরা 'আমি সেই আত্মা' বলে উত্তর দিতে পারি, তবে আমাদের মধ্যে যে স্ফিঙ্কস্ আছে তার মৃত্যু হবে। তখন আমাদের আত্মজ্ঞানোন্মেষের, প্রকৃত মানুষটির আত্মার অন্তরাত্মার আবির্ভাবের অনুভূতি হতে থাকবে, আর এই বিপরীত ভাবের মিলিত আশ্চর্য ব্যক্তিত্বটি যাবে লুপ্ত হয়ে।

## বিশ্বকেন্দ্রিক হতে চেষ্টা কর

একবার কঠোপনিষদের সেই উপমাটির দিকে ফিরে তাকানো যাক ঃ

> **আত্মা হলো রথস্বামী, শরীর হলো রথ, বুদ্ধি সারথি, মন লাগাম, ইন্দ্রিয়গণ হলো অশ্ব, ...**[৫]

—কিন্তু আমাদের রথের ভেতরে তাকিয়ে দলের সাথীদের কীর্তি দেখলে আমরা

৫ *কঠোপনিষদ্*, ১/৩/৩-৪

আসা উচিত। কিন্তু তা তখনই সম্ভব যখন আমাদের নিজেদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসবে। এই সূত্রটি ধরতে পারাই অধ্যাত্মজীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। নিজেকে আত্মারূপে, দেহমন থেকে পৃথক এক সত্তারূপে, দেখতে আরম্ভ না করলে মানবের অধ্যাত্মজীবন শুরু হয়েছে বলা চলে না। আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে পুরাতন ভাবনার স্থলে নূতন এক আত্ম-ভাব বসাতে হবে। নিজের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনই একজন প্রকৃত অধ্যাত্ম-পিপাসুকে সাধারণ তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তি থেকে তফাত করে। এই পরিবর্তনের প্রথম স্তরে একজন সাধকের কাছে আত্মা সত্যই কিরূপ সে বিষয়ে কোন পরিষ্কার ধারণা নাও থাকতে পারে। তার ধারণা যাই হোক, এটাই যথেষ্ট হবে, যদি সে আত্মাকে দেহমন থেকে পৃথক বলে মনে করতে পারে এবং সেই আত্মার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বলে ভাবতে পারে।

এক চৈনিক সম্পর্কে একটি সত্য কাহিনী আছে যে তাকে ষাট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। নূতন সম্রাটের অভিষেকের সময় তাকে ছেড়ে দেওয়া হলে সে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলল, "আমি এত আলো সহ্য করতে পারছি না, আমি এতটা স্বাধীনতা সহ্য করতে পারছি না।" তার অনুরোধেই তাকে আবার অন্ধকার কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমাদের ক্ষেত্রেও ঐ একই রকম ব্যাপার ঘটে। আমরা আমাদের অজ্ঞতা ও দুঃখভোগে এত বেশি অভ্যস্ত যে, আমরা নূতন জীবন চাই না। আমরা আমাদের অহঙ্কারের অন্ধকারময় চিত্রকল্পে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠি যে, আত্মার সত্যস্বরূপের উজ্জ্বল দীপ্তি আমরা সহ্য করতে পারি না।

আমাদের মধ্যে কারও কারও পাগলামি গারদে পাঠাবার মতো অত বেশি না হলেও, আমরা স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগি ও খণ্ডিত জীবনযাপন করি। বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার, কিভাবে নিজেদের ওপর যত্নবান হতে হয়, কি ভাবেই বা সৎজীবনের আদর্শ উপলব্ধি করা যায়। প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ডঃ জঙ্‌ একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন—"আমার রোগীদের এক তৃতীয়াংশ চিকিৎসাশাস্ত্রের সংজ্ঞামতো কোন স্নায়বিক রোগে ভোগে না, তারা কেবল তাদের জীবন সম্পর্কে অর্থহীনতা ও শূন্যতাবোধে ভুগছে।"[১২]

আধুনিক মানব যে 'তাৎপর্য' খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার পেছনেও রয়েছে উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করার জন্য এই প্রেরণা। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব, তেজস্ক্রিয় শক্তির ও বহু নীহারিকাপুঞ্জের আবিষ্কার, ডারউইনের

---

১২ Carl. G. Jung, *Modern Man in Search of a Soul*, (London : Routledge, Kegan Paul & Co., 1953) p. 70

বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডের অচেতন মানব বিষয়ে গবেষণা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের নানারূপ উন্নতি মানবের মূল্যায়নের নির্দিষ্ট ধারাগুলিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। যা আগে পরিষ্কার ও সঠিক বলে ভাবা হতো তা এখন ক্ষণিক ও অপরিজ্ঞাত বলে মনে হচ্ছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও অন্যান্য সামাজিক পরিবর্তন নৈতিকতা বোধকে আপেক্ষিকতার স্তরে পর্যবসিত করেছে। মূল্যায়নের অনিত্যতাবোধ ও মানব জীবনের মূল্যহীনতাবোধ আধুনিক শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনে প্রতিফলিত হচ্ছে।

## ঈশ্বর ও তাঁর কৃপা সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা কেন জন্মেছি? অস্তিত্ব বলতে কি বোঝায়? পশ্চিমে বহুলোকে বিশ্বাস করে আমরা সব জড়বস্তুসঞ্জাত প্রাণী, জড়ের কঠিন নিয়মে অসহায়ভাবে বাঁধা পড়েছি। কেউ বা মনে করে মানুষ ভুলক্রমে জন্মেছে। কোন কোন খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক মনকে জড়বস্তুর এক পরিশুদ্ধ রূপ বলতে চেষ্টা করেন, আবার তাতে আধ্যাত্মিক নিয়তির বীজও রোপন করতে চান। এই সমস্ত ধারণার বিভ্রান্তির মধ্যে, সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়গুলি তাদের সেই 'শূন্য থেকে সৃষ্টি' ও 'আদি পাপ'-এর প্রাচীন ধারণা নিয়ে চলেছে।

বৌদ্ধরা অধিকাংশই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে মানুষ হচ্ছে কতকগুলি পরিবর্তনশীল সত্তার সমষ্টি যা অজ্ঞানজাত বাসনা তাড়িত হয়ে জন্ম মৃত্যুর চক্রে পাক খাচ্ছে। তারা ব্যক্তিত্বকে স্রোতবতী নদী বা কম্পমান অগ্নিশিখার সঙ্গে তুলনা করে। তারা পরিবর্তনশীলতার ওপর এত গুরুত্ব দেয় যে, মানুষের মধ্যে যা বিকাররহিত তা তাদের নজর এড়িয়ে যায়।

অধিকাংশ আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকই—যকৃতের পিত্তক্ষরণের মতো, চিন্তাক্ষরণকারী সংহত মস্তিষ্কের উপজাত স্বরূপ এক আনুষঙ্গিক গৌণ-ব্যাপাররূপে মনকে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁদের অনেকের কাছে মন শরীরের মতোই প্রত্যক্ষবস্তু। তাঁদের মতে ব্যষ্টি মানব একটি শরীরযুক্ত মন বা মনযুক্ত শরীর নয়, দেহ-মনের সংহতি।[১৩] কোন কোন চিন্তাবিদ আরও এগিয়ে গিয়ে, মনকে কোন কিছু অবস্তু—যাকে দেখা, ছোঁয়া, মাপা বা ওজন করা যায় না—বলে মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন মন কোন 'আধ্যাত্মিক' ব্যাপার। পশ্চিমদেশে বলা হয়, যিনিই মন ও তার প্রয়োজনকে শরীর থেকে উচ্চে স্থান দেন তিনিই 'আধ্যাত্মিক'। ধার্মিক ব্যক্তি মনে করেন মন বা 'চেতনা' শরীরের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে। মনই প্রাণবন্ত ক্রিয়াশক্তি। মানবের ব্যক্তিসত্তা মনোব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত সবরকম আচার-

[১৩] R.A. Strecker and K.E. Appel, *Discovering Ourselves* (N.Y. : The Mc. Millan. Co. 1954), p. 19

আচরণের সমষ্টি; আর এই মনোব্যাপারের অভিব্যক্তির জন্যই শরীরের প্রয়োজন। অবশ্য প্রতীচ্য মনস্তত্ত্ব মানুষকে কেবল মন ও ভাবাবেগের এক মিশ্র মনস্তত্ত্বগত সত্তারূপে স্বীকৃতি দিয়ে মাঝ পথে থেমে যায়।

হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি আরও গভীরে যায়। মানবের ব্যক্তিসত্তা জটিল। মূলা প্রকৃতিতে মানুষ হলো এক আত্মসচেতন আধ্যাত্মিক সত্তা—যা সূক্ষ্ম মনোময় শরীর ও স্থূল ভৌত শরীর দিয়ে ঢাকা। আত্মা স্থূলশরীর এবং মন থেকে পৃথক। সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী, কিন্তু চূড়ান্ত মুক্তির সময় আত্মা সেটিকেও ত্যাগ করে। জন্ম সময় থেকেই সূক্ষ্মশরীরাভিমানী ব্যক্তিচেতনা স্থূল দেহের সঙ্গে জড়িত থাকে। মৃত্যু হলো সূক্ষ্মশরীরের স্থূলদেহ ত্যাগ। *মুক্তি* হলো আত্মার সূক্ষ্মশরীরও ত্যাগ করা।

হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় অরফিউসের গানের ছত্রে—"মানুষ পৃথিবী ও নক্ষত্রখচিত স্বর্গের সন্তান।" জুডীয়-খ্রীস্টান বাইবেলে বলা হয়েছে—মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবির মতো সৃষ্টি করে[১৪] কিছুদিন দেহমন্দিরে রাখা হয়েছে। ভগবদ্গীতায় (২.১৩, ২২) বলা হয়েছে ঃ

> ***দেহাভিমানী আত্মা যেমন এই দেহেই বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য অবস্থা অতিক্রম করে, সেই রকমই অন্য শরীরেও যায়।***
>
> ***মানব যেমন তার পুরাতন জামাকাপড় ত্যাগ করে নতুন বস্ত্রাদি পরে, তেমনই দেহাভিমানী আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে।***[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে সূক্ষ্মশরীরকে এই ভাবে বর্ণনা করেছিলেন, "যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে।"[১৬] শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো কখনো দেখতেন তাঁর নিজ আত্মা স্থূল শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ভক্তেরা তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে দেখতে পেত শরীরের বাইরে অন্য জায়গায়। তাঁর জীবনসঙ্গিনী শ্রীসারদা দেবীও একদা দেখেছিলেন তাঁর আত্মা শরীর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উঠছেন, ফিরে এসে প্রথমে ঐ শরীরে প্রবেশ করতে ইতস্তত করেছিলেন।[১৭]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আমরা পড়ি। পুলিস-সার্জেণ্ট রাত্রের অন্ধকারে পাহারা দেবার সময় যে আলো ব্যবহার করেন, তাতে তিনি অন্যের মুখ দেখতে পান কিন্তু তাঁর মুখ কেউ দেখতে পায় না। যদি তুমি তাঁর মুখ দেখতে চাও তবে তাঁকে

---

১৪ *Bible*, Genesis, 11.26, 27

১৫ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ২/১৩, ২২

১৬ স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১০ (উদ্বোধন, ২০০০)

১৭ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী*, পৃঃ ১২৯ (উদ্বোধন, ১৪০৬)

অনুরোধ করতে হবে আলোটি তাঁর মুখের দিকে ফেরাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, সেই ভাবেই তুমি যদি প্রভুর দর্শন চাও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে—"হে প্রভু, কৃপা করে জ্ঞানের বাতি আপনার দিকে ফেরান।" শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন—"ঘরে যদি আলো না জ্বলে সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। জ্ঞানের বাতি জ্বেলে রাখ, হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়।"[১৮]

আমাদের অধ্যাত্ম আচার্যগণ বলেন, ভগবৎকৃপা আসে আত্মপ্রচেষ্টা, আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও উদ্যমরূপে। এগুলিই আত্মানুসন্ধিৎসুকে সরাসরি ভগবৎকৃপা লাভে সাহায্য করে, যার ফলে আত্মার ঈশ্বরানুভূতি বা ব্রহ্মানুভূতি হয়। হিন্দুশাস্ত্রে আছে ঃ

> *মানব তার উন্নত আত্মার সাহায্যে নিজেকে উন্নীত করবে, সে যেন অবনত না হয়। উপযুক্ত অনুশীলনে নিম্নতর আত্মাই বন্ধুর কাজ করে, আর অনুশীলনের অভাবে সেই আত্মাই শত্রুর কাজ করবে।*[১৯]
>
> *মানুষের কাছে তার মনই বন্ধন বা মুক্তির কারণ হয়।*[২০]

তথাপি অনেক হিন্দু অদৃষ্টবাদী হয়ে নিজেদের ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেয়।

খ্রীস্টান জগতেও এইরূপ হয়, যদিও যীশু শিখিয়েছিলেন, "স্বর্গস্থ পিতার মতো তোমরাও সম্পূর্ণ শুদ্ধ হও।"[২১] তিনি আধ্যাত্মিক উদ্যমের কথাই বলেছিলেন। 'যারা প্রভু, প্রভু, ডাকে তারা সবাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না; স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী যারা কাজ করবে তারাই প্রবেশাধিকার পাবে।'[২২] যীশু সক্রিয় আধ্যাত্মিক জীবন, প্রচণ্ড সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার জীবন যাপন করতে শিখিয়েছিলেন। খ্রীস্টান মরমিয়া সাধকগণ এইরকম জীবনযাপন করেছিলেন; তথাপি পাপবাদ, অন্যের মারফত পাপ থেকে শুদ্ধি ও সহজ মুক্তির কথা খ্রীস্টধর্মে অনুপ্রবেশ করায়, বহু উদ্যমশীল সংসারজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ধর্মজীবনে কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এই রকম চিন্তায় নিজেদের সম্মোহিত করে রেখেছে। এই সম্মোহনের ফলে, মহান মরমিয়া সাধকগণ যে উদ্যম অধ্যাত্মজীবনে প্রয়োগের কথা বলেছিলেন তা লুপ্ত হয়ে এক প্রচণ্ড শক্তি কেবল জড় জগতের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে। জড় জীবনের সফলতার ওপর অতি মাত্রায় জোর পড়ছে। অধ্যাত্ম আদর্শ অবহেলিত হওয়ায় বর্তমান সভ্যতা প্রচণ্ডবেগে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। একে এখনো হয়ত ফেরানো যায় যদি সময় থাকতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এক মাতালকে আদালতে নিয়ে গেলে বিচারক পুলিস রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করল—

---

১৮ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১২৫

১৯ *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা*, ৬/৫ ও ৬

২০ "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।"—*অমৃতবিন্দু উপনিষদ্*, ২

২১ *Bible*, St. Mathews. 5:48

২২ তদেব, ৭ ঃ২১

"কয়েদীটি মদ খায় বলেই বেশি খারাপ হয়েছিল এ ধারণা কে দিল?" পুলিশ উত্তর দিলে—"সে একজন ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে তর্ক করছিল।" বিচারক বললেন, "এতে কিছু প্রমাণ হয় না।" অফিসারটি বলল, "কিন্তু মহাশয়, সেখানে কোন ট্যাক্সিচালক ছিলই না।" আমরা অনেকেই এই রকম করি। অনুরাগে মত্ত হয়ে আমরা সর্বত্র শত্রু দেখি ও তাদের সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে লড়তে থাকি, ভুলে যাই আমাদের নিজেদের মধ্যেই আরও প্রবল শত্রু আছে যারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আমাদের ধ্বংস করতে প্রস্তুত। আমাদের সংগ্রামী মনোভাব আরও ভাল কাজে লাগত যদি তা দিয়ে আমাদের নিজ নিজ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় ভোগ লালসা দমন করা হতো। যখন আমরা অজ্ঞতা ও ধ্বংস প্রবণতার সুরায় মত্ত থাকি, তখনি এইগুলিই আমাদের সব থেকে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে অহঙ্কারের ভ্রান্ত ধারণায় মানুষ নিজেই নিজেকে সম্মোহিত করে রেখেছে।[২৩]

## নিজেদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

গ্রীক পুরাণে নার্সিসাস নামে এক সুদর্শন যুবকের গল্প আছে; সে পুকুরের জলে নিজ প্রতিবিম্বের প্রেমে পড়েছিল। সে সেই প্রতিচ্ছবিটিকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষায় থাকতে থাকতে শুকিয়ে মারা গেল, কারণ এরকম আত্ম-প্রেম শেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই রকম আত্মপ্রেম, এক রকম রোগ, সে বিষয়ে ডঃ কার্ল জুঙ-এর নির্ণয় ঠিকই ছিল যখন তিনি বলেছেন—"অহংভাব রোগগ্রস্ত, কারণ সেটি পূর্ণ সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, আর মানব সমাজের এবং আপন প্রকৃত সত্তার চৈতন্যের সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছে।"[২৪] হিন্দু প্রবাদ বাক্যে পাওয়া যায়—"অজ্ঞতার মদে মত্ত হয়ে সারা সংসার হয়েছে মাতাল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, " 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল" এবং "যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; আবার মুক্তিও হয় না।"[২৫] তিনি আরও বলতেন, "পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।"[২৬]

মহান যোগাচার্য পতঞ্জলির বর্ণনায় পাওয়া যায়, কিভাবে জীবাত্মা চালিত হয় অজ্ঞানের দ্বারা যা নেতিবাচক কোন সত্তা নয়, কারণ এর দ্বারা অস্মিতা নামে এক বিপজ্জনক কল্পনা-রাজ্যের সৃষ্টি হয়। অস্মিতা থেকে আসক্তি জন্মায়, আবার আসক্তি

---

২৩ পূর্বোক্ত *বাণী ও রচনা*, ২ খণ্ড, পৃঃ ২১২ ও ২২৪

২৪ পূর্বোল্লিখিত, *Modern Man in Search Of a Soul*, p. 141

২৫ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৬৬৪, ৬৬৭

২৬ তদেব, পৃঃ ৩০০, ৭২৫

থেকে দ্বেষ। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরম্পরার ফলে জীবনের ও জীবন ধারণের ক্লেশের ওপর ভীষণ আসক্তি এসে পড়ে।[২৭] অস্মিতাপূর্ণ হওয়াই আধ্যাত্মিক ব্যাধি। সকল অধ্যাত্ম পথেই এই অস্মিতা ব্যাধি দূরীকরণের উপায় নির্ধারিত আছে। হিন্দুশাস্ত্রে এই পথগুলিকে যোগ নাম দেওয়া হয়। প্রথমে কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মপ্রচেষ্টা; এতে আত্মসমর্পণের ভাবে সমস্ত কর্মফল পরমাত্মায় নিবেদিত হয়। ক্রমে প্রতিটি কাজই আত্ম-সমর্পণ হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বার্থপরতাপূর্ণ অস্মিতা বা অহং ভাবটি বিজিত হয়ে যায়।

রাজযোগের পথও আছে। এ পথে মনকে একাগ্রভাবে ব্যক্তিত্বের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে নিয়োগ করতে করতে অগ্রসর হতে হয়। এই পরীক্ষা করতে করতে আত্মার বোধ হয়, সে অহং নয়, মনও নয়, তার একটা পৃথক সত্তা আছে। সাধক আত্মার সত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত থেকে তার অহংকে সরিয়ে দিতে চেষ্টিত হয়। এতে যে মোহ (বা বিভ্রান্তি) দেহ ও মনে আত্মাভিমান ঘটাচ্ছিল তার নাশ হয়।

জ্ঞানযোগে অধ্যাত্ম সাধক আরও অগ্রসর হয়। ব্যক্তিচেতনা থেকে সে বিশ্বচেতনায় উন্নীত হয়—তখন অহং ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। এই জ্ঞানযোগে অতি সূক্ষ্ম অহংবোধেরও নাশ হয়।

কিন্তু কলিযুগে—যে যুগে আমরা এখন বাস করছি—সহজতম পথ হলো ভক্তিযোগ বা ভক্তির পথ। এ পথে সাধক ঈশ্বরের আরাধনা করে পিতা, মাতা, বন্ধু বা সখারূপে—সব ক্ষেত্রেই একনিষ্ঠ ভালবাসা দিয়ে ও আত্ম-নিবেদন করে। আমাদের জীবনটাই ঈশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন সেবায় পরিণত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "দু-একটি লোকের সমাধি হয়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না।... একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, থাক শালা 'দাস আমি' হয়ে।"[২৮] এইরূপ প্রেমের সেবায় অহং ধীরে ধীরে তার মন্দ স্বভাব ছেড়ে উচ্চতর 'জীবে'—ঈশ্বরের হাতে যন্ত্ররূপে পরিবর্তিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'কাঁচা আমি' 'পাকা আমি' হয়ে যায়, তাতে আর কোন ক্ষতি হয় না।[২৯]

আত্মা যে, দেহ থেকে, এমনকি মন থেকেও পৃথক তা আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারি। যোগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনে অগ্রসর হলে পরিষ্কার বোধ হবে অখণ্ড পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে এই মনুষ্য শরীরে অবস্থান করছে। যেটা বিভক্ত বলে মনে হয় তা জীবাত্মা নয় ব্যক্তিমন। এই পৃথকভাব হয় মনের

---

২৭ পতঞ্জলি, যোগসূত্র ঃ ২.৩-৯

২৮ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১২১

২৯ তদেব, পৃঃ ২৪৪

বিভাজনের জন্য। নৈতিক সংস্কার ও আধ্যাত্মিক অভ্যাস এক নতুন বোধশক্তি, স্বতঃলব্ধজ্ঞান, জাগিয়ে তোলে যাতে আমাদের বোধ হয় যে, আমরা দেহও নই, মনও নই। আমরা আমাদের চিন্তা ও আবেগসমূহের সাক্ষী হতে পারি। যেমন উপনিষদে আছে ঃ "আত্মা ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হন, ইন্দ্রিয়গুলি আত্মার যন্ত্রস্বরূপ।"[৩০] আত্মাকে শরীর থেকে পৃথক করা যায়, আমরা সত্যই মনুষ্যজীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ নই—এই উপলব্ধিতেই আমরা গভীর আনন্দ অনুভব করি।

আমরা যখন আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গিয়ে অহঙ্কারের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি, তখন প্রকৃতির হাতে এক ক্রীড়নক হয়ে পড়ি। অহং-সর্বস্ব ব্যক্তি খেয়ালী ছেলের হাতে খেলার বলের মতো। তার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। সে প্রকৃতির শক্তির দয়ার ওপর নির্ভরশীল। যারা অত্যন্ত অহং-সর্বস্ব, তাদের পক্ষে অধ্যাত্ম জীবনযাপন অত্যন্ত দুরূহ। তারা ভুল করে তাদের নিম্নতর আবেগগুলিকেই একটা বিরাট কিছু মনে করে তারই অনুসরণ করে। তারা—তাদের চেতনার, 'আরও ক্ষীণ স্বরটুকু'র সাবধানবাণী শুনতে থামে না। যারা অধ্যাত্মজীবনের দুঃসাহসিক অভিযানে নামতে চায়, তাদের পক্ষে আগে অহঙ্কারের কিছুটা দমন একান্ত প্রয়োজন। লোক দেখানো বাহ্য বিনয় প্রদর্শনই যথেষ্ট নয়, চাই আমাদের অন্তঃস্থ সুপ্ত দেবত্বে আস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাপূর্ণ নম্রতা। ঈশ্বরে শরণাগতির মনোভাব, অনাসক্তি ও নৈতিক সংশোধনীগুলি গ্রহণের মানসিকতা ছাড়া অধ্যাত্মজীবন দুরূহ হয়ে পড়ে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের নিজেদের প্রতি, জগতের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হতে হবে।

---

৩০ কেনোপনিষদ্, ১/২

# দ্বিতীয় পর্ব

# আধ্যাত্মিক অনুশীলন

## (ক) প্রস্তুতি

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

# ক্ষুরধারের ওপর চলা

## উপনিষদের শিক্ষা

উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষি অধ্যাত্ম পথে জীবন যাপন করে পরমাত্মার অনুভূতি লাভ করে এইভাবে বলেছিলেন ঃ পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন 'পরমাত্মোপলব্ধির পথে চলা ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের ওপর দিয়ে চলার মতো।' [১] তবে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে খুব কঠিন পথেও চলা যেতে পারে ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য লাভে সফল হওয়া সম্ভব। প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যার আচার্যগণ এইটিই আবিষ্কার করেছিলেন। এই কঠিন অথচ অধ্যাত্মজগতের পথে সব থেকে প্রয়োজনীয় যাত্রা শুরু করার আগে আমাদের কি রকম শিক্ষা নিতে হবে? সে বিষয়ে আবার উপনিষদ্ থেকেই বলি ঃ

> জানবে আত্মাই হলো রথস্বামী, আর শরীর যেন রথ। বুদ্ধিকে সারথি মনে করবে, আর মন যেন লাগাম। তাঁরা বলেন ইন্দ্রিয়গুলিই অশ্ব আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন তার চলার পথ। জ্ঞানী বলেন আত্মা যখন শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে মিলিত থাকেন তখন তিনি ভোক্তা।
>
> যে সর্বক্ষণ অসংযতমনা, বিচার-বিবেকহীন, সে সারথির দুষ্ট অশ্বের মতো নিজ ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখতে পারে না। কিন্তু যে সর্বদা সংযতমনা, সদসৎ বিবেক যুক্ত তার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির সদশ্বের মতো বশে থাকে। যে সদসৎ বিবেকহীন, অসংযতমনা ও সর্বদা অশুচি, সে কখনো উদ্দেশ্যলাভে সফল হয় না এবং বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তন করে। কিন্তু যে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, সদা শুচি, সমাহিতমনা সে চরম উদ্দেশ্য লাভে সফল হয়, সেখান থেকে আর জন্মগ্রহণ করে না। যে সাধকের বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথি রয়েছে, সুসংযত মনরূপ লাগাম রয়েছে, সেই সাধক সার্থকভাবে পথ পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ করে—সর্বব্যাপী আত্মার পরম অনুভূতি লাভ করে।
>
> ইন্দ্রিয়ের (সূক্ষ্ম) বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ইন্দ্রিয়ের তুলনায়

---

১ "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"—*কঠোপনিষদ্,* ১/৩/১৪

শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহান আত্মা (হিরণ্যগর্ভ) আবার বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ, মহান আত্মা থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষের বা অসীম পরমাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। এই আত্মা, জীবাত্মা সর্বজীবে গুপ্ত আছেন। সকলের কাছে প্রকাশিত হন না, কিন্তু কেবল সূক্ষ্ম-বিচারসম্পন্ন ঋষিরাই একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে তাঁকে উপলব্ধি করে থাকেন। বিবেকী পুরুষ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে মনে লয় করবেন এবং মনকে (প্রকাশাত্মক) বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে মহান আত্মায় এবং মহান আত্মাকে শান্ত (ক্রিয়াশূন্য) বা তুরীয় আত্মায় লয় করবেন।[২]

এখানেই গুরু শিষ্যকে উৎসাহিত করেছেন ঃ

**জ্ঞানী আচার্যের সান্নিধ্যে এসে ওঠো, জাগো, আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কর, আত্মজ্ঞান লাভ কর। ... যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধবিহীন অক্ষর শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহত্তত্ত্বেরও পারে কূটস্থ নিত্য, তাঁকে জেনেই জীব মৃত্যু মুখ থেকে মুক্তি পেতে পারে।**[৩]

এই মন্ত্রগুলি পড়লেই আমাদের ধারণা হবে, কেন আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যার আচার্যগণ আমাদের সামনে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শটিকে তুলে ধরেন ও উপযুক্ত গুণার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন, যা না থাকলে এমনকি অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনকও হতে পারে। কিন্তু ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে, শেষ পর্যন্ত চরম উদ্দেশ্যে বা পরমপদে পৌঁছানো যায়।

## ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

অনেকে অধ্যাত্ম পথে পা বাড়াতে ভয় পায়। কিন্তু আমাদের যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকে, ভয় পাবার কোন কারণ নেই। মোটর গাড়ি চালানো কি ছেলে খেলা? শিক্ষা না নিয়ে বিমান চালনা বা স্কেটিং বা স্কী করা কি সম্ভব? না। এগুলি সব খুবই বিপজ্জনক খেলা ও অবসর বিনোদনের উপায় কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সবই দক্ষতার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে করা যায়। যদি সংসারে আমরা ঠিকভাবে বাঁচতে ও আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে চাই, তবে আধ্যাত্মিক ভাবের অনুশীলন একান্তই প্রয়োজন।

১৮৮২ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে বর্তমান ভারতের মহান অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, রাখাল (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও অন্য শিষ্যদের সঙ্গে কলকাতায় সার্কাস দেখতে গেছিলেন। সার্কাসে নানা খেলা দেখানো হচ্ছিল। তার মধ্যে একটি খেলার স্মৃতি প্রভুর মনে বিশেষ ছাপ রেখেছিল। একটি ঘোড়া চক্রপথে দৌড়াচ্ছিল, পথের ওপর

---

২ তদেব, ১/৩/৩-১৩

৩ তদেব, ১/৩/১৪-১৫

থেকে বড় বড় লোহার বলয় ঝুলছিল। একটি মেম সাহেব ঘোড়ার ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল, আর ঘোড়াটি যখন বলয়ের নিচে দিয়ে যাচ্ছিল, সে এক একটি বলয়ের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আবার ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। ঘোড়াটি কয়েকবার ঐ চক্রপথটি পরিক্রমা করলে, কিন্তু মেম একবারও ঘোড়ার ওপর চড়তে বা ভারসাম্য বজায় রাখতে ভুল করেনি। এই খেলাটি ঠিকমত দেখাবার জন্য নিশ্চয়ই কয়েক বছরের অভ্যাস প্রয়োজন হয়েছিল। এই খেলাটি দেখতে ঠাকুরের খুব ভাল লেগেছিল। এটি তাঁকে, অধ্যাত্মজীবনে কি করা উচিত তাই মনে করিয়ে দিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত একটি ভক্তকে বলেছিলেন ঃ

> **দেখলে, বিবি কেমন একপায়ে ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বনবন করে দৌড়ুচ্ছে। কত কঠিন, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে তো হয়েছে। একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে। আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা ওইরূপ কঠিন। অনেক সাধন ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। অধিকাংশ লোক পারে না। সংসার করতে গিয়ে আরও বদ্ধ হয়ে যায়, আরও ডুবে যায়, মৃত্যু যন্ত্রণা হয়। কেউ কেউ, যেমন জনকাদি অনেক তপস্যার বলে সংসার করেছিলেন। তাই সাধন-ভজন খুব দরকার, তা না হলে সংসারে ঠিক থাকা যায় না।**[৪]

শুধু তাই নয়, আধ্যাত্মিক জীবন অনুশীলনের মাধ্যমে সাম্য ও শান্তির অধিকারী না হলে সংসারজীবনে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

জীবনের অন্য সব পথে যেমন, অধ্যাত্ম পথেও তেমনি বিপদ এড়িয়ে ও বাধা পেরিয়ে চলতে হয়। অধ্যাত্ম জীবনে সব থেকে বড় বাধা কি জান? তা হলো সাইনবোর্ড লাগিয়ে ধর্মজীবন যাপনের প্রবণতা। এটা ততক্ষণ সম্ভব হয় যতক্ষণ কারও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা থাকে না। কিন্তু যখন জীবের এই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সে ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য আন্তরিকভাবে ব্যাকুল হয়। তখন সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা পায়, যা তাকে পরম লক্ষ্যের আরো আরো কাছে নিয়ে যায়। আমাদের আচার্যগণ বলেন, মানব-জন্ম লাভ অত্যন্ত দুর্লভ। মানব জন্ম লাভ করে কেউ যদি পশুর মতো জীবন যাপন করে, সেটা খুবই দুঃখের বিষয়।

একজন অগুনতি বই পড়তে পারে; সে অগুনতি বক্তৃতা শুনতে পারে। কিন্তু যদি তার মন আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে না ঝোঁকে, তবে তার সব কর্মই বৃথা। তাই ভারতে আধ্যাত্মিক আচার্যগণ বলেন ঃ 'তোমাকে তোমার মনের কৃপা লাভ করতে হবে।' ঈশ্বর কৃপা ও গুরু কৃপালাভ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের হয়তো

---

৪ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১০৬

বহু আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করারও সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি নিজ মনের কৃপা লাভ করতে না পারি, তবে সবই বৃথা। আমাদের মনকে সত্যলাভের জন্য খোলা রাখতেই হবে। আবার, যদি সত্যলাভের জন্য মন উন্মুক্তও থাকে, যদি আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি আমাদের প্রকৃত অনুরাগও থাকে, তবু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। বৈষয়িক উদ্দেশ্যসিদ্ধিতেও শিক্ষণের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভ্যাস বিনা আমরা কোন কাজই করতে পারি না। অধ্যাত্মজীবনের ক্ষেত্রেও সে কথা সত্য।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প আছে। এক যুবার কোন বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল না কিন্তু সে কার্যনির্বাহীর পদ পাবার জন্য ছিল অতি-আগ্রহী। সে একটি ব্যাঙ্কে গিয়ে এক সহ-সভাপতির সঙ্গে দেখা করে একটি ভাল চাকরি—একটি কার্যনির্বাহীর পদ চায়। যে কর্ম-কর্তাটি তার সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি যুবকটিকে বলেন, 'দুঃখিত, তোমাকে দেবার মতো কোন কাজ আমাদের নেই। বারটি সহ-সভাপতির পদ পূর্ণ হয়ে আছে।' যুবা বেশ সাহসের সঙ্গে উত্তর দেয় : 'সংখ্যা সম্বন্ধে আমার কোন কুসংস্কার নেই—তের নম্বর সহ-সভাপতি হতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

দেখ, সহ-সভাপতি নিয়োগ ঐভাবে হয় না। তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। তেমনি, তুমি যদি পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে চাও , তুমি যদি 'ক্ষুরধারের' ওপর দিয়ে হাঁটতে চাও, তোমাকে বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। বিনা শিক্ষায় একাজ করতে গেলে তুমি টুকরো টুকরো হয়ে কাটা পড়ে যাবে। যদি তুমি নিয়ম মতো শিক্ষণ লাভ কর, তবে কোন ভয় নেই বরং ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলতে তুমি আনন্দ পাবে।

আমরা সকলেই জানি সরু বৈদ্যুতিক তারের মধ্যে দিয়ে উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাতে গেলে কি হয়। তারটি পুড়ে যায়। সেই রকম, সঠিক প্রস্তুতি ছাড়া আমরা যদি বিশ্বাত্মার ভাবে ভাবিত হতে চাই, তবে সে ভাবের চাপ এত বেশি হবে যে আমাদের শরীর, স্নায়ু, মন তা সহ্য করতে পারবে না। এ রকম ঘটে থাকে। তাই আধ্যাত্মিক পথে চলতে গেলে, আমাদের দৃঢ় শরীর, স্থির মন-বুদ্ধি, সবল ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হতে হবে। অন্যথায় আমাদের সব প্রচেষ্টাই বিফলে যাবে।

## ভেতরের 'স্ফিংক্স্'

জীব বিজ্ঞানের 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' এবং 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রেও ভালভাবে প্রযোজ্য। পশুজগতে পশুরা পরস্পর লড়াই করে,

নিম্নস্তরের মানুষের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে লড়াই করে, আর যারা বলবত্তর তারাই কেবল বেঁচে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতে, সংগ্রাম মানুষে মানুষে নয়, মানুষের নিম্নপ্রকৃতির সঙ্গে উচ্চপ্রকৃতির। আমরা সকলেই এই বিষয়ে অবহিত—কিভাবে আমাদের উচ্চপ্রকৃতি ও নিম্নপ্রকৃতি ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে আর আমাদের জন্য অনন্ত দুঃখকষ্ট নিয়ে আসছে।

গ্রীক পুরাণে স্ফিঙ্কস্ হলো সিংহ শরীর ও নারীমুণ্ডবিশিষ্ট এক দানব। লোকে বলে থিব্‌জের স্ফিঙ্কস্ সেখানকার অধিবাসীদের একটা ধাঁধার বিষয় ভাবতে বলত। তার সঙ্গে সে এক কঠিন শর্তও আরোপ করত ঃ যে সঠিক উত্তর দিতে না পারবে তাকে মরতে হবে, আর যদি কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারে তবে সে থিব্‌জের সিংহাসনে বসবে। তার প্রশ্ন ছিল ঃ 'কোন্ প্রাণী সকালে চার পায়ে হাঁটে, দুপুরে দুপায়ে, আর সন্ধ্যায় তিন পায়ে?' সঠিক উত্তর দিতে পারেনি এমন অনেককে সে গলা টিপে মেরেছিল। লোকে বলে, ইডিপাস্ ধাঁধার সঠিক উত্তরে বলল ঃ 'শিশু অবস্থায় মানুষ চার-পায়ে হামাগুড়ি দেয়, পূর্ণজীবনে দু-পায়ে সোজা হয়ে হাঁটে, আর বৃদ্ধ বয়সে একটি লাঠিও ব্যবহার করে।' এই উত্তর শুনে ঐ স্ফিঙ্কস্ সমুদ্রে ডুবে আত্মবিসর্জন দিল, আর ইডিপাস্ থিব্‌জের রাজা হলো।

মিশরীয় পুরাণে স্ফিঙ্কস্ সিংহশরীর আর নরমুণ্ডবিশিষ্ট। পরবর্তী কালের রোমক স্ফিঙ্কসের মুণ্ড কখনো নরের, কখনো বা নারীর। তাই বলা যেতে পারে—স্ফিঙ্কস্ নর ও নারী সকলেরই প্রতীক। সত্যই, নর ও নারী, আমরা সকলেই আশ্চর্য জীব। আমরা আমাদের চরিত্রে পশু ও মানব উভয়ের প্রকৃতিই মিশিয়ে ফেলি। এই প্রকৃতিগুলিই আত্মাকে ঢেকে রাখে। যখন স্ফিঙ্কস্ জিজ্ঞেস করে ঃ 'তুমি কে?' — আমরা কি তার উত্তর দিতে পারি? যদি আমরা 'আমি সেই আত্মা' বলে উত্তর দিতে পারি, তবে আমাদের মধ্যে যে স্ফিঙ্কস্ আছে তার মৃত্যু হবে। তখন আমাদের আত্মজ্ঞানোন্মেষের, প্রকৃত মানুষটির আত্মার অন্তরাত্মার আবির্ভাবের অনুভূতি হতে থাকবে, আর এই বিপরীত ভাবের মিলিত আশ্চর্য ব্যক্তিত্বটি যাবে লুপ্ত হয়ে।

## বিশ্বকেন্দ্রিক হতে চেষ্টা কর

একবার কঠোপনিষদের সেই উপমাটির দিকে ফিরে তাকানো যাক ঃ

> **আত্মা হলো রথস্বামী, শরীর হলো রথ, বুদ্ধি সারথি, মন লাগাম, ইন্দ্রিয়গণ হলো অশ্ব, ...[৫]**

—কিন্তু আমাদের রথের ভেতরে তাকিয়ে দলের সাথীদের কীর্তি দেখলে আমরা

---

৫ *কঠোপনিষদ্*, ১/৩/৩-৪

স্তম্ভিত হয়ে যাব। আমরা দেখব জীবাত্মারূপ রথস্বামীটি মাতাল। বুদ্ধিরূপ সারথিটি অচৈতন্য হয়ে পড়েছে, মনরূপ লাগাম শ্লথ হয়ে গেছে, ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ এদিক ওদিক ছুটছে। আর রথ, অশ্ব ও তাদের প্রভু—সকলেরই ভয়ঙ্কর বিপদ আসন্ন, যদি না এই মুহূর্তেই নতুনভাবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে কিছু করা যায়। আমাদের আচার্য বলেন, অজ্ঞানের বশে রথস্বামী জীবাত্মা, নিজেকে অধিক মাত্রায় বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছে। সে নিজেকেই ভোক্তা বলে মনে করছে। সে নিজের প্রকৃত সত্তার কথা ভুলে গেছে।

প্রাচীন যোগাচার্য পতঞ্জলি বলেন, অজ্ঞানই জীবাত্মাকে তার প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বরূপটিকে ভুলিয়ে দেয়।[৮] তখন জীবাত্মা মিথ্যা স্বপ্নজাল বুনতে বুনতে যে সব উদ্ভট কল্পনা করতে থাকে তার শেষ নেই, আর সে ঘুমিয়ে ও অতীতের স্মৃতিচারণ করে সময় কাটায়। প্রতি মুহূর্তে জীবাত্মা নিজের থেকে দূরে পালাতে চায়। অজ্ঞানের কাজই ওই। অজ্ঞান থেকে অহঙ্কার, ভোগস্পৃহা, ঘৃণা আসে, ফলে মানব মনে জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তির সৃষ্টি করে। এই আসক্তির জন্যই সে অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে।

সামান্য স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপরের ক্ষতি করতেও আমাদের বাধে না। আমরা মিথ্যা বলে থাকি। আমরা কখনো কখনো অপরের জিনিস চুরিও করতে চাই। আমরা বন্য কামার্ত জীবন যাপন করি এবং প্রায়ই অপরের ওপর অতি নির্ভরশীল হয়ে তাদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভ করতে হলে, জীবন ধারার পরিবর্তনও শুরু করতে হবে। আমাদের শিখতে হবে কি করে নির্দোষ, সহানুভূতিপূর্ণ, সত্যবাদী, নির্লোভ, পবিত্র ও স্বাধীন হওয়া যায়—সে অভ্যাস করতে হবে। আমরা এত অলস যে শারীরিক ও মানসিক পরিচ্ছন্নতাই রক্ষা করতে পারি না। আমরা সর্বদাই অসন্তোষে ভুগছি, বিড়বিড় করছি, আর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নালিশ করছি এবং নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করতে চাইছি। আজকাল আমরা অনেক বই পড়ি কিন্তু সে পড়াও এলোমেলো। আমরা মস্তিষ্ককে অসংখ্য অন্য লোকের চিন্তায় ভরিয়ে ফেলি, আর সেই চিন্তাগুলি বিজাতীয়রূপেই থেকে গিয়ে মানসিক বদহজমের সৃষ্টি করে। তখনই আমাদের সমগ্র জীবনটা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।

আমাদের কি করা উচিত?

আমাদের আচার্যগণ বলেন : "শরীর ও মনকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা কর। হৃষ্টচিত্ত হতে যত্নবান হও। একটু বৈরাগ্য অবলম্বনের চেষ্টা কর। বেশি নরম হয়ো না। এলোমেলো ভাবে বই পড়ে তোমার মনকে এদিক ওদিক ছুটতে না দিয়ে, কিছু

৮ পতঞ্জলি, যোগসূত্র, ২।২৪

গভীর অনুধাবন ও অনুচিন্তন অভ্যাস কর। আত্মকেন্দ্রিক না থেকে, তোমার সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করতে চেষ্টা কর—যে ঈশ্বর সকলের চিরনিয়ন্তা ও প্রত্যেকের অন্তরে অধিষ্ঠিত আছেন।" কিন্তু আমরা এ উপদেশ শুনি না। আমরা সামঞ্জস্যহীন চিন্তা ও আবেগকেই পোষণ করি। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঁচা কাজ করে থাকি এবং অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভ করলেও মন্দ আবেগের বশীভূত হয়ে নানা ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ি। কখনো কখনো আমরা নিজেকে অসহায় মনে করি। আমাদের আর শক্তি থাকে না। আমরা ইতস্তত করি, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। আমাদের মন ও দেহ জড়বুদ্ধি বা তামসে আচ্ছন্ন। এখন এসব পরিবর্তন করতে হবে। জীবনকে নতুনভাবে শুরু করার চেষ্টা করতেই হবে। পতঞ্জলি বলেন ঃ 'যখনই বাধা আসবে আত্মার বিষয় চিন্তা করার চেষ্টা কর।'[৭] নিজের মধ্যে একটা উঁচু ভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা কর, তাহলে তুমি আলস্য, ইতস্তত ভাব প্রভৃতি তোমার বর্তমান জীবনের বিশেষ অবগুণগুলি ছাড়িয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু এখানেও আমরা স্থির নই, নির্ভরযোগ্যও নই, আর তাই হলো আমরা যেসব গুরুতর কষ্ট ভোগ করি তার একটি। নিজেদের ওপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস নেই, সেইটিই আমাদের সব থেকে বড় প্রতিবন্ধক।

এই বাধাগুলিকে একে একে অতিক্রম করার পরামর্শ দিয়ে পতঞ্জলি বলেছেন ঃ 'মন্দচিন্তাকে সৎচিন্তা দিয়ে রোধ কর, ঘৃণাকে ভালবাসা দিয়ে।'[৮] কিন্তু এখানেই থামলে চলবে না। মানসিক পবিত্রতার একটা স্তরে পৌঁছে, মনকে বিশ্বজগতের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নীত করতে চেষ্টা কর। তোমার হৃদয়স্থিত পরমাত্মার চিন্তা আরো বেশি করে করতে চেষ্টা কর। ঈশ্বরের নাম জপ কর, ধ্যান কর সেই গুরুর গুরু পরমাত্মার, দেখবে তুমি তোমার বর্তমান অস্থির অবস্থা ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পারছ।[৯] অনন্তের চিন্তা করে অনন্তের ভাব কিছুটা লাভ করা যায়। ঈশ্বরের নাম জপে ও ধ্যানে সিদ্ধ হলে, পরমাত্মার উপলব্ধি হয়। মানব তখনই জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন অনুভব করতে সমর্থ হয়।

## নৈতিক যোগ্যতার একটি ন্যূনতম মান প্রয়োজন

এ বিষয়ে উপনিষদের আচার্যগণ সকলেই এক ভাবে কথা বলে থাকেন। এই ঋষিরা সব দোষ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে, অন্তর্যামী জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছিলেন। যোগের আচার্যদের মতো বেদান্তের আচার্যগণ এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করে থাকেন। তাঁরা চান, আমরা যেন উত্তম দেহ, দৃঢ় ও সুস্থ ইন্দ্রিয় এবং পবিত্র ও একাগ্র মনের অধিকারী হই। এগুলি ছাড়া আধ্যাত্মিক

---

৭ তদেব, ১/৩২ ৮ তদেব, ২/৩৩ ৯ তদেব, ১/২৮, ২৯

পথ অনুসরণে কৃতকার্য হওয়া যায় না এবং আধ্যাত্মিক জগতে কোন কিছু ফললাভও সম্ভব নয়।

আচার্যেরা প্রায়ই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ত্রুটির কথা বলে থাকেন। শরীরের মধ্যে সুসঙ্গতির অভাব। শরীরের সব অঙ্গগুলি ঠিক মতো কাজ করে না। তারা এক যোগে পরস্পর সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে না। ইন্দ্রিয়গুলিরও দোষ যে তারা তাদের নিজ নিজ বিষয়ের দিকে বেগে ধাবমান হয় ও তাদের সংস্পর্শে আসে। আবার মনেরও রোগ আছে ঃ কামনা, সংশয় ও অনিশ্চয়তা, মূঢ়তা একাগ্রতার অভাব। এতে মন দূষিত হয়। মনের আরও দোষ আছে ঃ ভুল বোঝা, অতি অহংকার, ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিপরীত বুদ্ধি। এই সব ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই, এ ক্ষেত্রেও যোগাচার্যদের মতো বেদান্তাচার্যগণ ঘোষণা করেন ঃ "একটা ন্যূনতম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা বজায় রাখার চেষ্টা কর। বিচার করতে শেখ। স্বচ্ছভাবে চিন্তা করার অভ্যাস কর। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, কোন্‌টা পরিবর্তনশীল আর কোন্‌টা স্থিতিশীল, কোন্‌টা অল্প কিছুদিন থাকবে আর কোন্‌টা চিরস্থায়ী তা বুঝতে শেখ। ইন্দ্রিয়গুলিকে আর মনকে যতটা সম্ভব সংযত রাখার অভ্যাস কর। যে জিনিসের সংস্পর্শে আসতে চাও না তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে শেখ। খুব অধ্যবসায় ও গভীর বিশ্বাসে বলীয়ান হও। তোমার সদাত্মার ওপর, ঈশ্বরের ওপর—তোমার দ্বারা অনুসৃত উপদেশগুলির ওপর, তোমার সত্য উপলব্ধির সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হতে থাক। তার সঙ্গে সহজ মানসিক একাগ্রতা অভ্যাসের চেষ্টা কর।" যেমন আগেই বলা হয়েছে—সকল যুগের সকল ধর্মের আধ্যাত্মিক আচার্যগণ পবিত্রতা অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। খ্রীস্টীয় মরমিয়া সাধকগণ এর নাম দিয়েছে 'শুদ্ধিকরণ'। এটি প্রথম সোপান। অধ্যাত্ম জীবনের পথ সফলতার সঙ্গে অনুসরণ করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন ন্যূনতম মূল নৈতিক যোগ্যতা।

## বহিঃসৌন্দর্য নয়, অন্তঃসৌন্দর্য প্রয়োজন

আমাদের আচার্যগণ বলেছেন, অধ্যাত্মজীবনে সব থেকে বেশি দরকার—সুন্দর দেহ নয়, সুন্দর মন, মনের সাম্য। জীবনের গভীরতম রহস্য ভেদ করবার মানসিক সামর্থ্যের উন্নয়ন আমাদের করতেই হবে। আমাদের চাই অন্তরের সৌন্দর্য, নৈতিক সৌন্দর্য।

প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন সুদর্শন পুরুষ ছিলেন না, তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক সময়ে ফিলাডেলফিয়া থেকে একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়;

তারা তাদের একজনের পরিচয় দিয়ে বলে, "একজন দক্ষ চিত্রকর হিসেবে, ইনি আপনার একটি রঙিন চিত্র এঁকে আমাদের সভাগৃহে উপহার দিয়েছেন।" প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন একটু ভেবে চিত্রশিল্পীর দিকে ফিরে বললেন ঃ "মহাশয় আমি ধরে নিচ্ছি, আপনি চিত্রটি আঁকবার সময় আমার নীতিগুলি থেকে আমার সম্বন্ধে আপনার যে ধারণা হয়েছে তার ওপরেই নির্ভর করেছিলেন, আমার দেহাকৃতির ধারণার ওপর নয়।" এই রকমই দরকার। মন ও হৃদয়ের পবিত্রতাই শরীরের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আমি দেখেছি, অতি সাধারণ গৃহস্থের শরীরে যে বিশেষ কমনীয়তা লক্ষ্য করা যায় তা অধিকাংশ সুন্দর দেহে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া পবিত্র ও জ্ঞানী আত্মা থেকে পূত ও সাম্যভাবাপন্ন স্পন্দন বিকীর্ণ হয়, তাঁদের সংস্পর্শে যারা আসে তাদের ওপর এর প্রভাব শুধু সুখদায়ক নয়, উন্নতিসাধকও বটে।

যেমন আগেই উল্লেখ করেছি, আমাদের আধ্যাত্মিক আচার্যগণ আমাদের সকলকে উচ্চ অধ্যাত্মজীবনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে খুবই উদ্বিগ্ন থাকেন, কারণ এ ছাড়া আমরা 'ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলতে' পারব না।

## আমাদের ত্রুটি

শারীরিক ত্রুটিগুলি, শারীরিক সামঞ্জস্যবিহীন ক্রিয়াকর্মগুলি সংশোধন করতে হবে। একজন প্রাচীন উপনিষদাচার্য সশিষ্য প্রার্থনা করতেন ঃ

> **আমার অবয়বগুলি, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও সম ইন্দ্রিয়গুলি পুষ্টিলাভ করুক।** [১০]

যখন এই সুসঙ্গতি আসবে, তখন আমরা এই শরীরে জীবন ধারণের আনন্দ পাব। শরীরের অঙ্গগুলির মধ্যে এই সঙ্গতি কিভাবে আনা যায়? অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খাবে না, নিয়মিত ও সংযত জীবন যাপন করবে, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবে জীবনে নীতিপরায়ণ হবে। সুসমঞ্জস্য চিন্তা ও কাজেই শরীর সুসমঞ্জস থাকে।

ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে গেলে, সেগুলিকে অসৎ বস্তুর দিকে যেতে না দিয়ে সৎ বস্তুর দিকে নিয়ে যেতে হবে। এর অর্থ উৎপীড়ন বা দমন নয়। যা ভাল, পবিত্র, অধ্যাত্মবিষয়ক, সেই সব শুনবে ও দেখবে। তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে সেগুলি উত্তম মানসিক পুষ্টির যোগান দিয়ে তোমার ক্ষতির পরিবর্তে উন্নতি সাধন করে।

মানসিক ত্রুটিমুক্ত হওয়া যায়, যদি আবেগের পরিবর্তে উচ্চতর যুক্তি ও ভাবনার দ্বারা আমরা চালিত হই। অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে যা ক্ষতিকর তা বর্জন করে যা

---

[১০] আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি...।—ছান্দোগ্যোপনিষদ্, শান্তিপাঠ

কল্যাণকর তা অর্জন করা উচিত। যা কল্যাণকর তা হয়ত সুখকর নাও হতে পারে, তবু তা গ্রহণ করতেই হবে, কারণ সে পথ ধরেই আমরা মানসিক ত্রুটি থেকে বহুলাংশে মুক্ত হতে সক্ষম হব।

মন আমাদের নানাভাবে কষ্ট দেয় বিশেষত যখন আমরা তাকে বশে আনতে চাই। একে কখনো কখনো খুবই অনুভূতিশূন্য বলে বোধ হয়, নড়তে চায় না। কখনো কখনো মন উন্মাদের মতো এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে। ঘনীভূত নিস্তব্ধ মন মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য শান্ত থাকলেও, আবার পাগলামির পথে ছোটে। কিন্তু এই পাগল মনকে শিক্ষা দিয়ে একাগ্র করে আনা যায়। আমাদের আচার্যেরা বলেন ঃ আমাদের আহার শুদ্ধ হওয়া চাই। আমরা মুখ দিয়ে যে আহার গ্রহণ করি, তা শুদ্ধ হওয়া চাই। এই খাদ্য যেন দেহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। তেমনি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে আহার্য গ্রহণ করি, তাও শুদ্ধ হওয়া চাই। এর সাহায্যেই সূক্ষ্ম শরীর শুদ্ধ হয়। মন দিয়ে যে আহার আমরা গ্রহণ করি—মনে যে চিন্তা ও আবেগ আসে—তাও শুদ্ধ হওয়া চাই। তারই সাহায্যে আমাদের সূক্ষ্ম শরীর সুসমঞ্জস হয়ে গড়ে উঠবে। একটি সংস্কৃত প্রবাদে আছে ঃ 'সাপকে খাঁটি দুধ খাওয়ালেও সে দুঃসহ বিষ-ই বমন করে।'[১১] এই তার স্বভাব। তেমনি শুদ্ধ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের শুদ্ধ, সহৃদয় ও অমায়িক হতে হবে।

আমাদের নানা দোষ আছে, সেজন্য আমরা কষ্টভোগ করি। এখন কি আমরা সেগুলিকে একে একে সরাতে চাই? কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিতে বলেন, তারপর কর্ণকে, পর পর নাসিকাকে, হস্তকে, মূল দেহভাগকে, পদযুগলকে এমনিভাবে সমস্ত অঙ্গকেই একে একে বিশ্রাম দিতে বলেন। কেউ কেউ পরামর্শ দেন বাসনা দমন করো না, সহজভাবে সেগুলি প্রকাশ কর। কিন্তু বাস্তব জীবনে এরকম অনিয়মিত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা অতি অল্পলোকই আত্মোন্নতি লাভের সুফল পেয়েছে। বেদান্তে এ ব্যাপারের মূলে চলে গিয়ে জীবাত্মার সামগ্রিক উন্নতির চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণ সত্তা বা অহংভাবের পেছনে একটি আত্মা আছে, যাকে পরমাত্মা বলা হয়—তিনিই পবিত্রতা, বল ও শান্তির উৎস। যতই এঁকে লাভ করার চেষ্টা করবে—কর্মে ও চিন্তায় এঁর বিকাশের সুযোগ করে দেবে—ততই তুমি ত্রুটিমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ "তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর এবং সর্বসাধারণকে তা শিক্ষা দাও। ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ

১১ *ফণী পীত্বা ক্ষীরং, বমতি গরলং দুঃসহতরম্।*

হলে শক্তি আসবে, মহিমা আসবে, সাধুত্ব আসবে, পবিত্রতা আসবে—যা কিছু ভাল সবই আসবে।"[১২] একটা একটা অঙ্গকে পবিত্র করে সমগ্র সত্তাকে পবিত্র করার চেষ্টা নয়, অখণ্ড আত্মাকে আয়ত্তের মধ্যে আনার চেষ্টা কর—এই হলো বেদান্তের শিক্ষা।

## আধুনিক মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান ও নৈতিকতা

আজকাল নৈতিক শৃঙ্খলাপরায়ণতাকে—একালের মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞায়—দমন ও নিষ্পেষণের সঙ্গে খুব বেশি মাত্রায় জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা ইন্দ্রিয়গুলিকে ঊর্ধ্বমুখী করার চেষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই প্রার্থনা করছেন—'হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বারা কল্যাণবচন শ্রবণ করি; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষু দ্বারা যেন সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করি; দৃঢ় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত হয়ে আমরা যেন তোমাদের স্তব করে দেবকর্মে নিযুক্ত জীবন লাভ করি।'[১৩]

মানব মনে সাম্য ও শান্তি বোধ তখনই সত্য সত্য আসবে, যখন সে ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনকে বশে আনতে পারবে ও বিনা দ্বিধাদ্বন্দ্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে সক্ষম হবে। মনের এই বিশুদ্ধিকরণকে অতীন্দ্রিয়বাদের ভাষায় বলে 'সংশয় মোচন', আর মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় বলে 'উদ্‌গতি'। এই প্রক্রিয়ায় বাসনা বা 'মূলা প্রবৃত্তি'গুলিকে উচ্চতর অবস্থার দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্যা এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যা ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মবিদগণের আরও বিশদভাবে জানা ছিল। আধুনিক মনোবিশ্লেষণের পদ্ধতির মূল কাজ হলো রোগীর মানসিক কষ্টগুলির মৌলিক অন্তর্নিহিত কারণ আমাদের জ্ঞাতসারে বা চেতনার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা। কোন কোন অবিবেকী মনস্তত্ত্ববিদ রোগীকে তার রুগ্ন প্রবৃত্তিগুলিকে যথেচ্ছ চরিতার্থ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ হ্যাডফিল্ডের ভাষায়, "রোগ নিরাময়ের দিক থেকে 'প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার' উপদেশ দেওয়া খুবই নির্বুদ্ধিতা, কার্যত আমার অভিজ্ঞতায় কামবৃত্তি যথেচ্ছ চরিতার্থ করে কোন স্নায়ুরোগীকে সুস্থ হতে দেখিনি।"[১৪]

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে রোগীকে বলা হয়—(১) বিরক্তিকর কামনাটিকে নতুনভাবে দেখতে ও সেটিকে কোন ভয় বা বিরক্তি ছাড়াই

---

১২ পূর্বোক্ত *বাণী ও রচনা*, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮২

১৩ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥—ঋগ্বেদ ১/৮৯/৮

১৪ J.A. Hadfield, *Psychology and Morals* [London : Methuen And Co.] 1923 p. 100

সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করতে, বা (২) স্বেচ্ছায় কষ্টের কারণটির মুখোমুখি হয়ে, মনে বেশি গ্লানির স্থান না দিয়ে, সেটিকে বর্জন করতে, বা (৩) সেটিকে উচ্চতর লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে উচ্চতর পথে চালিত করতে।

ব্যষ্টি মনোবিজ্ঞান শাখার প্রবর্তক Dr. Adler, সব সময়ে সমাজে-কল্যাণমূলক সুস্থতর জীবনযাত্রা অনুবর্তনের পক্ষপাতী। হিন্দু আধ্যাত্মিক আচার্যগণও আমাদের সব লালসাকে উঁচু দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "ছয় রিপুকেই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। আত্মার সঙ্গে রমণ কর, এই কামনা। যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয়, তাদের ওপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার লোভ। 'আমার আমার' যদি করতে হয়, তবে তাঁকে নিয়ে। যেমন—আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। যদি অহঙ্কার করতে হয় তো বিভীষণের মতো। আমি রামকে প্রণাম করেছি—এ মাথা আর কারুর কাছে অবনত করব না।"[১৫]

ডঃ অ্যাডলার (Dr. Adler) কী সুষ্ঠু মন্তব্যই না করেছেন ঃ 'নিজের সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করে আমরা নিজেদের পরিবর্তনও করতে পারি।' স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন ঃ 'নিজেকে শিক্ষা দাও, প্রত্যেক মানবকে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। ...তাতে তেজ আসবে, সততা আসবে, পবিত্রতা আসবে, যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই আসবে...।' হিন্দু আচার্য এই আদর্শ সম্বন্ধে একেবারে যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে চলে যান—চলে যান সেই মূল তত্ত্বে যা সাধারণ মনস্তাত্ত্বিকদের আওতার বাইরে।

## মধ্য পন্থা

আমাদের চেতনার বর্তমান স্তরে দেহ ও মন পরস্পর খুবই ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ও একে অপরকে প্রভাবিত করে। তাই দুটিরই যত্ন নেওয়া উচিত। বুদ্ধের জীবন কাহিনীর কথা মনে কর। রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসে তিনি ক্লান্ত হয়ে গৃহত্যাগ করেন ও সন্ন্যাসের কঠোরতা পালন করেন। একদিন দাঁড়াতে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরলে তিনি শুনতে পেলেন একটি মধুর সঙ্গীত ঃ

> **অতিরিক্ত টান পড়লে বীণার তার ছিড়ে যায়, সুরও পালায়;**
> **তার ঢিলে হলে চ্যাপ চেপে আওয়াজে সুরের হয় মৃত্যু।**
> **আমাদের সেতারকে উঁচুও নয় নিচুও নয় এমন সুরে বাধতে হবে।**[১৬]

এই সময়েই সুজাতা নামে একটি গ্রাম্য মেয়ে সেই পথে এসে পড়ে ও বুদ্ধ

---

১৫ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১৮৪-৮৫

১৬ *The Light of Asia* by Sir Edwin Arnold [London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. 1943] p. 94

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার নিবেদিত পায়েসের বাটিটি গ্রহণ করেন। শক্তি ফিরে পেয়ে তিনি গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন এবং নির্বাণ লাভ করলেন। তিনি বুঝলেন—অতি ভোগ বা অতি কঠোরতা দুটিই বর্জনীয়। অতিরিক্ত ভোগ বা অতিমাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধন না করে সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ জীবন ও সম্যক্ ধ্যানের মধ্যপন্থাই তিনি খুঁজে পেলেন। বুদ্ধের কয়েক শত বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ একই বাণী প্রচার করেছিলেন ঃ 'যিনি পরিমিত আহার ও বিহার এবং কর্মপ্রচেষ্টা করেন, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, যোগ—আধ্যাত্মিক অনুশীলন—তাঁর কাছে দুঃখনাশক হয়।'[১৭] আরও প্রাচীন কালে বৈদিক ঋষিগণ বলেছিলেন ঃ 'যতটুকু খাদ্য একজনের প্রয়োজন, তাই তাকে রক্ষা করে—ক্ষতি করে না। পরিমাণ অতিরিক্ত হলে তা ক্ষতি করে, আর অতিঅল্প হলে তা রক্ষা করে না।''[১৮] আমরা মুখ দিয়ে যে খাদ্য খাই তা পরিমিত ও শুদ্ধ হওয়া চাই; সেরকম অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে আহার গ্রহণ করি তাও শুদ্ধ হওয়া দরকার; তদুপরি নীতিগত সংস্কৃতিও থাকা চাই; এই হলো মধ্য পন্থা।

## শুদ্ধতা ব্যতিরিক্ত একাগ্রতার শক্তি বিপজ্জনক হতে পারে

কামনা আমাদের হঠাৎ ছেড়ে চলে যায় না। আমরা কঠোর সংযম অভ্যাস করতে পারি। আমরা কামনার বস্তু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু কামনা সূক্ষ্মভাবে থেকেই যায়। এই কামনা লুপ্ত হয় একমাত্র অধ্যাত্ম চেতনার জাগরণে।[১৯] এই অধ্যাত্ম চেতনার কিছু কিছু আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকলে চলবে না।

এই উপদেশগুলি সব সময়ে মনে রাখবার চেষ্টা করতে হবে ঃ ন্যূনতম পবিত্রতা অর্জন না করেই একাগ্রতা অনুশীলন করা বিপজ্জনক। একাগ্রতা অনুশীলনের বা শক্তি সঞ্চয়ের আগে আমাদের জানতে হবে এই শক্তিকে কিভাবে উঁচু খাতে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়; অন্যথায় দুঃখে পড়তে হতে পারে।

ভারতে একটি রূপক কাহিনী প্রচলিত আছে ঃ একজন ভূত নামাতে শিখেছিল। সে কিছু মন্ত্র পড়তেই ভূত হাজির। হাজির হয়েই বলল, 'এখন আমাকে কাজ দাও।' সে ভূতকে কিছু কাজ দিল। অল্পক্ষণে সে কাজগুলি সেরে ভূত আবার এসে হাজির হয়ে জানাল ঃ 'আমাকে কাজ দাও, তা না হলে আমি তোমার ঘাড় মটকাব', লোকটি তাকে আর কি কাজ দেবে ভেবে পেল না। সে ভূতকে ডেকেছে, তাকে

১৭ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৬/১৭

১৮ শতপথ ব্রাহ্মণ, ৯/২/১/১, গীতার ৬/১৬ শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্যে উদ্ধৃত

১৯ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৫৯

কিছু কাজ দিতেই হবে। তখন তার এক মতলব মনে এল। একটা কুকুরকে দেখিয়ে সে ভূতকে বলল, 'আচ্ছা তুমি এই কুকুরটার বাঁকা লেজটি সোজা করে দাও তো।'

আমরা আমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলি কিন্তু তাকে কাজে লাগাতে জানি না। শক্তি বাজে কাজে নষ্ট হয়ে যায় এবং অধ্যাত্মজীবনে এটি খুবই দুঃখজনক। শক্তিকে ঊর্ধ্বাভিমুখী কি ভাবে করা যায় তা জানা প্রয়োজন। অন্যথায় এই পুঞ্জীভূত শক্তি আমাদের বাসনা, কামনাগুলিকে প্ররোচিত করবে ; অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও করবে উত্তেজিত; আর আমরা যদি এই বাসনাকে ঊর্ধ্বমুখী করতে না পারি—তারা বিস্ফোরকের মতো হয়ে উঠে আমাদের শরীর মনকে ভেঙ্গে দেবে। একাগ্রতা ও ধ্যান নিয়ে খেলা করতে গেলে বিপদের আশঙ্কা। কিন্তু যদি আমরা ঠিক মতো শিক্ষাগ্রহণ করি, যদি আমাদের উপযুক্ত গুণ থাকে, তখন একাগ্র ও ধ্যানপরায়ণ জীবন আনন্দের হয়।

শক্তি ঠিক মতো পরিচালিত না হলে, সিদ্ধাইরূপে তা প্রকাশ পেতে পারে। তাতে হয়তো আমরা পরের চিন্তাকে কিছুটা পড়তে শিখি। ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে তাও কিছুটা জানতে পারি, কিন্তু আমরা নিজ মন সম্বন্ধে, নিজ আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্বন্ধে, অজ্ঞই থেকে যাই। অধ্যাত্মজীবনের আদর্শ হলো নিজেকে জানা। যদি কেউ পূর্ব-বর্ণিত নিয়ম পালন করে প্রয়োজনীয় পবিত্রতা অর্জন করে থাকে, তবে সে এই সঞ্চিত তেজকে নিষ্কাম কর্মে 'জপে', একাগ্রতা ও ধ্যান অভ্যাসে নিয়োগ করতে পারে। আর এগুলি সবই তখন আমাদের সত্যলাভের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

## পরম সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ কর

সফলতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক পথে চলতে গেলে বুদ্ধি ও অহংকারের ত্রুটিগুলি দূর করে ফেলতে হবে। ক্রমান্বয়ে সৎপথে চললে ও মনকে সবল করতে পারলে, ইচ্ছাশক্তি প্রবল হবে, আর আধ্যাত্মিক জীবনে সফলতা পেতে হলে অবশ্যই আমাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি অপরিহার্য। যখন প্রলোভন আমাদের পরাভূত করে, যখন অবচেতন মনের সব সুপ্ত বাসনাগুলি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রলুব্ধ করে, তখন প্রবল ইচ্ছাশক্তি আমাদের প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের সামনে নানা ধরনের যে সব প্রলোভন নিশ্চয়ই এসে থাকে তাদের কাটিয়ে উঠে আমাদের অধ্যাত্ম পথে চলবার সামর্থ্য অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

অধ্যাত্ম জীবনে এই কথাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে, শুধু অহংকেন্দ্রিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। তাই যোগাচার্যগণ এবং সেইসঙ্গে বেদান্তাচার্যগণও

বলে থাকেন, 'সংযম অভ্যাসের সঙ্গে সাধককে অবশ্যই নিজ কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করতে চেষ্টিত হতে হবে।'[২০] 'যোগী'র কাছে ঈশ্বর আচার্যের আচার্য। এই আচার্যের আচার্য আমাদের থেকে দূরে থাকেন না। তিনি আমাদের হৃদয়ে আছেন। পাশ্চাত্যে ঈশ্বরের আচার্যের আচার্যত্ব ভাবটি তেমন বিশেষভাবে ধারণা করতে পারে না কিন্তু ভারতে আমরা এ ভাবটি উপলব্ধি করে থাকি। পিতা মাতা আমাদের সংসারে এনেছেন, কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম আচার্যগণ আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যে জন্ম নিতে সহায়তা করেন এবং জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ-শোকের পারে যেতেও সাহায্য করেন। বেদান্তে, ঈশ্বর বা পরমাত্মা কেবল আচার্যের আচার্যই নয়, সব আত্মার আত্মাও বটে।

আমরা প্রত্যেকেই অনন্ত আত্মারই অংশ। প্রথম দিকে বিশ্ব-আত্মায় বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, আমাদের মন ও অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হলেই আমরা অন্তঃস্থ জীবাত্মা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারব। আমরা যত এগুতে থাকব তত আমরা বুঝব যে সত্যই আমরা সকলেই এক বৃহত্তর পূর্ণের অংশ এবং এটাই হলো পরম সত্য, যা আমাদের জানা প্রয়োজন। জীবাত্মা হিসাবে, আমরা মহদাত্মা বা পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

উপনিষদ্ ঘোষণা করে ঃ 'আত্মা সকলের হৃদয় গুহায় লুকিয়ে আছেন। তবে তিনি কেবল ঋষিদের নিকট পরিদৃষ্ট হন তাঁদের শুদ্ধ সূক্ষ্ম স্বজ্ঞার মাধ্যমে।'[২১] আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক বিচিত্র মানসিক শক্তি লুকিয়ে আছে। এই শক্তির সহায়েই জীবাত্মা জানতে পারে নিজেকে, যার ফলে সে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে। নৈতিক আচরণ, প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে এই সুপ্ত শক্তিকে জাগাতে হবে; কেবল তখনই ঘটবে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত সূর্যোদয়। কেবল তখনই অধ্যাত্ম সাধক বলতে পারে, সে ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলেছে। তার মধ্যে সে অবস্থাতেই জেগে ওঠে সদসৎ বিচারের ক্ষমতা। বিচারের এই ক্ষুরধারের সাহায্যেই সে নিজের থেকে সমস্ত অনাত্ম বস্তুকে দূরে সরিয়ে ফেলে। সে দেহে, মনে ও বুদ্ধিতে আরোপিত আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে। সে উপলব্ধি করে যে সে নিজেই আত্মা, আর আত্মারূপে সে পরমাত্মার—সকল আত্মার যিনি আত্মা তাঁর—অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানেই পরম পবিত্রতা লাভ করে, ভৌতিক, মানসিক ও আবেগপ্রসূত সকল উপকরণের ওপর থেকে আসক্তি সরিয়ে নিয়ে, আত্মা ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলতে পারে এবং আত্মার যিনি আত্মা তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। প্রবুদ্ধ ঋষিদের এই রকম অনুভূতিই হয়।

---

[২০] *পতঞ্জলি*, যোগসূত্র ১.২৩; *শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা*, ৯.২৭; ১২.১০, ১১

[২১] কঠোপনিষদ্, ১/৩/১২

এখন, আমরা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারি ঃ 'আমাদের কি হবে?' কেবল ইচ্ছা করলেই আমরা দ্রষ্টা ঋষি হতে পারি না, পরন্তু পরমাত্মার অনুভূতি যাঁদের হয়েছে, যাঁরা ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে চলেছেন, যারা সমস্ত অনাত্ম বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে আত্মোপলব্ধি করেছেন—তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই পথে গিয়ে আমরা সামান্যভাবে অধ্যাত্মজীবন শুরু করতে পারি।

আমরা যে আত্মা এই বোধ জাগাতে আমরা যেন সচেষ্ট হই। আমরা সকলে যে এক পরমাত্মার অংশ এই অনুভূতি লাভে যেন প্রয়াস পাই। আমাদের অনুভূতি হোক, শরীর যেন আমাদের রথ, ইন্দ্রিয়গুলি যেন আমাদের অশ্ব, আমাদের মন যেন লাগাম, আর বুদ্ধি যেন সারথি। এই রথটিকে পুরোপুরি বশে রাখতে শিক্ষা প্রয়োজন। প্রবুদ্ধ আত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা যেন সৎ বুদ্ধিসম্পন্ন হই। আমরা যেন মনকে সংযত রাখি, ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখি, আর ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম অনুভূতির পথে অগ্রসর হই। আমাদের ঘুম যেন ভেঙে যায়। আমরা যেন সমুত্থিত হই। আমরা যেন অধ্যাত্ম পথ অনুসরণ করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলি। আমরা যেন প্রকৃত আত্মাকে, সর্বাত্মাকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হই। উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা যেন থেমে না যাই।

ক্ষুরধারের ওপর দিয়ে পথ চলে, কঠোর নিয়মে অধ্যাত্ম পথ অনুসরণ করে আমরা যেন জ্ঞানালোক ও আনন্দ লাভ করি এবং অন্যদেরও সেই ক্ষুরধার পথে চলতে, অধ্যাত্মপথ অনুসরণ করতে এবং সেই একই জ্ঞানালোক ও আনন্দ লাভ করতে সহায়তা করি।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

# গুরু ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা

## আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে শিক্ষার প্রয়োজন

মহান চৈনিক মরমিয়া দার্শনিক লাওৎসু-র এক শিষ্য এই গল্পটি বলেছিলেন ঃ এক যুবক চি-নামে এক দস্যু সর্দারের দলে যোগ দিয়েছিল। একদিন যুবক শিক্ষানবীসটি দল-নেতাকে প্রশ্ন করে, ''চুরি করতেও কি 'তাও' (ঠিক পথ) খুঁজে পেতে হয়?'' চি উত্তর দেয় ''আচ্ছা, এমন একটি জিনিসের নাম কর তো যাতে কোন 'তাও' বা ঠিক পথ নেই। চুরির কাজেও বামালটি কোথায় আছে, তার সঠিক *জ্ঞান* চাই; প্রথম এগিয়ে যাবার *সাহস* চাই; শেষে ফেরার *বীরত্ব* চাই; সফলতার সম্ভাবনা গণনা করবার *অন্তর্দৃষ্টি* চাই; অবশেষে চোরাই মাল দস্যুদের মধ্যে সমবণ্টনের *ন্যায়বিচার* চাই। এই পাঁচটি গুণ ছাড়া কেউই সফল (কৃতকর্মা) দস্যু হতে পারেনি।''

জীবনে প্রতিটি কাজেই, এমন কি চুরির কাজেও, আদর্শ নিয়মগুলি শিখে নিতে হয়। যে কোন বৃত্তিতে শিক্ষানবিসীর প্রয়োজন। অধ্যাত্মজীবনে তা আরও বেশি করে দরকার। লাওৎসু-র শিষ্য বলে চললেন, 'সৎব্যক্তি ও দস্যু উভয়ের ক্ষেত্রেই জ্ঞানবান হবার নীতি অপরিহার্য। ... যেহেতু সৎ লোক অল্প আর বদলোকই বেশি, জগতে সৎলোক যত ভাল কাজ করে তা অল্প, বাকি লোকেরা যত অসৎকাজ করে তা প্রচুর।' পাশ্চাত্য জগতে ঘোরার ফলে —ধ্বংসাত্মক কাজে প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ শক্তির ব্যয় হচ্ছে তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কত সব সৈন্য, বিমানচালক, কারিগর, এমনকি বৈজ্ঞানিককে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া চলেছে? সে পরিমাণ সময় ও শক্তির সামান্য অংশও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে, আমাদের দিব্য জ্ঞান, আনন্দ ও শান্তি লাভের প্রশিক্ষণে, কেন ব্যয়িত হবে না?

মহান ঔপনিষদিক ঋষিরা যে আদর্শকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে আমাদের সামনে রেখে গেছেন, তা হলো আত্মোপলব্ধি। কিন্তু অধ্যাত্ম-জাগরণ ছাড়া সে আদর্শের উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়। ধর্মজগতে অবশ্য দেখা যায় যে, আচার-অনুষ্ঠান ও বাহ্য সমারোহই বেশি গুরুত্ব পায়—আধ্যাত্মিক উন্নতির ওপর খুব সামান্য গুরুত্বই দেওয়া হয়ে থাকে। সেই কারণে সত্য ধর্ম বা আত্মোপলব্ধির মহনীয়তার অপলাপ

হতে দেখা যাচ্ছে। তাই বর্তমানে যখন নৈতিক শুদ্ধতা অর্জনে নিশ্চেষ্ট পরমুখাপেক্ষীর দল খুব সহজেই মুক্তির প্রত্যাশী, তখন যারা ধর্মের ভান করে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার বড়াই করে, আর সহজে স্বর্গে পৌঁছবার ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করবে বলে লোককে বলে বেড়ায়, তাদেরই সংখ্যাধিক্য ঘটছে।

উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ তাঁরাই দেখাতে পারেন, যারা সেখানে পৌঁছেছেন বা অন্তত তার খুব কাছাকাছি গেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে সঠিক পথ নির্দেশনার গুরুত্ব সম্বন্ধে উপনিষদ্ ঘোষণা করেন ঃ

**—আত্মা সম্বন্ধে অনেকে শ্রবণ করতে পায় না। অন্য অনেকে শ্রবণ করেও এই বিষয়ে ধারণা করতে পারে না। সেই আত্মার উপদেশ যিনি দেন তিনি আশ্চর্য ব্যক্তি। যিনি এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন তিনিও আশ্চর্য। যিনি উত্তম আচার্যের কাছে শিক্ষালাভ করে এ বিষয়ে উপলব্ধি করেন, তিনি পবিত্র হয়েছেন।** [১]

**—প্রাকৃতবুদ্ধি ব্যক্তির উপদেশে আত্মা সম্যক্ জ্ঞাত হন না কারণ এ বিষয়ে নানা মত আছে। আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সব তর্কের অতীত। যে আচার্য ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভেদজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কাছে উপদেশ পেলেই জিজ্ঞাসুর উদ্দেশ্য সফল হয়, তিনি জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হন।** [২]

**—আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে উৎসুক ব্যক্তি যেন স্বর্গীয় ভোগসুখের ক্ষণিকত্ব নিখুঁতভাবে বিচার করে। নিত্যপদকে জানবার জন্য সে যেন বিনীতভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ শাস্ত্রবিদ গুরুর সান্নিধ্যে আসে। যে শিষ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শান্ত ও সংযত চিত্তে গুরুর সান্নিধ্যে আসে—সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু তাকে ব্রহ্মবিদ্যাটি বিনা দ্বিধায় যথাযথভাবে উপদেশ করেন, যার ফলে প্রকৃত সৎস্বরূপ অক্ষর আত্মাকে জানা যায়।** [৩]

## গুরুর করণীয়

আত্মোপলব্ধির অর্থ কি? এর অর্থ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ। নানা

---

১ *শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।*
*আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥* (কঠঃ ১.২.৭)

২ *ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।*
*অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥* (কঠঃ ১.২.৮)

৩ *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।*
*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥* (মুণ্ডক ঃ ১.২.১২)
*তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।*
*যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥* (মুণ্ডক ঃ ১.২.১৩)

অভিজ্ঞতা ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করে জীব ক্রমান্বয়ে পরমাত্মার কাছে এগিয়ে যায়, শেষে উপলব্ধি করে যে উভয়ে একাত্মা। উপনিষদে এই পদ্ধতিটির একটি ছবির মতো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

> **দুইটি সোনালী ডানাযুক্ত পক্ষী মিলিতভাবে একই গাছের ডাল আশ্রয় করে রয়েছে। তাদের একটি গাছের মিষ্ট ও কটু সব ফল আস্বাদ করে; অন্যটি কিছুই আস্বাদ না করে, শান্তভাবে এর সাক্ষী হয়ে দেখছে। জীবাত্মা নিজ দিব্যস্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্তিবশত বিপথে চলে সংসার জীবনে জড়িত হয়ে কষ্ট পায়। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে যে এই সন্তুজনীয় ঈশ্বরই তার প্রকৃত স্বরূপ, আর তাঁর মহিমাকে দেখতে পায়—তখন সে শোকমুক্ত হয়।**[৪]

আমরা আমাদের দিব্যসত্তাকে ভুলে গেছি। তাই ঈশ্বরের আরও কাছে না গিয়ে, আমরা আমাদের সাংসারিক জীবনে আরও বেশি করে ডুবে যাই। কোন একজনকে আমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি। যিনি এই কাজ করেন তিনিই *গুরু* বা আধ্যাত্মিক আচার্য। আচার্যের কাজ হলো শিষ্যকে বহুযুগের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে তাকে ঈশ্বরের দিকে যাবার পথটি দেখিয়ে দেওয়া। *গুরু* খ্রীস্টান ধর্মযাজকের মতো নন, যিনি মানব ও ঈশ্বরের মাঝে অবস্থান করেন। শব্দপ্রকরণ অনুযায়ী *গুরু* শব্দের অর্থ ঃ

> **যিনি অন্ধকার সরিয়ে আলো আসবার ব্যবস্থা করে শিষ্যকে আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান। আমরা নিজ নিজ সত্তা সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকি, তা দূর করে মোহমুক্ত হতে গুরুই আমাদের সাহায্য করেন।**[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ এক বাঘ-ভেড়ার গল্প বলতেন। কোন সময়ে এক বাঘিনী একপাল ভেড়ার ওপর লাফিয়ে পড়ে, কিন্তু মেষপালক বাধা দিলে সে এক পাশে প[illegible] যায় ও এক বাচ্চার জন্ম দিয়ে মারা যায়। বাচ্চাটির ওপর মেষপালকের দয়া হওয়ায় সে তাকে ভেড়ার পালের সঙ্গে পালন করতে লাগল। বাচ্চা অন্য ভেড়ার মতো ভেড়ার দুধ খেত, ভেড়ার মতো ডাকত আবার ঘাস খেত। কয়েক বছর পরে আর একটি বাঘ ঐ ভেড়ার পালে পড়ে; সে একটা বাঘকে ভেড়ার মতো ব্যবহার করতে দেখে সেই বাঘ-ভেড়াকে পাল থেকে টেনে পুকুরের কাছে এনে জলে তার ছবি

---

৪ *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।*
*তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥*
*সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।*
*জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্ অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥* (মুণ্ডক ঃ ৩.১.১,২)

৫ *গুকারোঽন্ধকারস্তু রুকারস্তন্নিবর্তকঃ।*
*অন্ধকারনিবর্ত্যা তু গুরুরিত্যভিধীয়তে॥*

(প্রতিবিম্ব) দেখায়। তারপর বড় বাঘটি বাচ্চা বাঘ-ভেড়ার মুখে একখণ্ড মাংস গুজে দেয় আর বলে যে সে ভেড়া নয় সত্যিকারের বাঘ। তখন সেই বাঘ-ভেড়া তার ভেড়া ভাব ছেড়ে সত্য বাঘ-ভাব ফিরে পেল।[৬]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ আচার্যকে রাজার মন্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করতেন। এক দরিদ্র লোক রাজদর্শনের সুযোগ করে দেবার জন্য মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানায়; রাজা থাকেন সাত দেউড়ির পারে। মন্ত্রী তার অনুরোধ মঞ্জুর করে তাকে একের পর এক দেউড়ির পার করে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেক দেউড়িতে একজন জমকালো পোশাকপরা রাজকর্মচারী দাঁড়িয়ে আছেন, আর প্রতিবার দরিদ্র লোকটি মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে—'এই কি রাজা?' মন্ত্রী প্রত্যেকবার উত্তর দেন 'না'। এই ভাবে সপ্তম দেউড়ি পর্যন্ত পার হয়ে দরিদ্র লোকটি যখন রাজার সামনে এসে পড়ে দেখল রাজ-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে তিনি সিংহাসনে বসে আছেন তখন সে আর কোন প্রশ্ন করল না। প্রাসাদের দেউড়ি আর দালানগুলি পার হওয়ার জন্যই তার একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন ঃ 'গুরুও সেই রকম। রাজমন্ত্রীর মতো তিনি শিষ্যকে আধ্যাত্মিক উন্মেষের বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে, ঈশ্বর সান্নিধ্যে ছেড়ে দেন।'[৭]

মানুষের ব্যক্তিত্বও এক বিরাট রাজপ্রাসাদের মতো একপ্রস্থ বাড়ি-উঠানের ভেতর আর একপ্রস্থ করে সাজানো রয়েছে। পরমাত্মা আমাদের কাছে আচার্যরূপে এসে আমাদের উপলব্ধি করতে শেখান যে আমরা দেহ নই, মন নই, অনুভূতি বা কল্পনা বা আবেগ নই, আমরা শাশ্বত আত্মা। যখন আমরা কোন অজানা দেশে যাই, সে দেশের পথ জানে এমন একজন পথ প্রদর্শকের সাহায্য নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। গুরুই আমাদের পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবেন।

## গুরুর প্রয়োজনীয়তা

ভারতে আমরা এটা সত্য বলে ধরে নিই যে আধ্যাত্মিক জীবনে একজন *গুরুর* প্রয়োজন। আমি যখন প্রথম ইউরোপে যাই, ওখানকার কয়েকটি ধর্ম সঙ্ঘের কথা শুনে আশ্চর্য হই, তাঁরা বলতেন—কোন বিশেষ শিক্ষণ ছাড়াই তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে

---

৬ গল্পটি স্বামী নিখিলানন্দের ইংরাজীতে অনূদিত "The Gospel of Sri Ramakrishna" (Madras. Sri Ramakrishna Math 1974) pp 306-07 থেকে নেওয়া। কিন্তু 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (পূর্বোল্লিখিত) শীর্ষক মূল বাংলা গ্রন্থে 'ছাগলের পালে পড়া বাঘে'র গল্পে ভেড়ার পরিবর্তে ছাগলের উল্লেখ আছে। দ্রঃ পৃঃ ৩৫৪।

৭ Sw. Prabhavananda, *The Eternal Companion* (Madras Sri Ramakrishna Math, 1974), p. 250

যোগাযোগ করেন, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনেন, অধ্যাত্মজীবন যাপনের পথ-নির্দেশ পান। আমি কয়েকটি ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখি যে আমি যেমনটি আশা করেছিলাম, ঐ লোকগুলি নিজেদের স্বরই শুনেছিলেন, অবশ্য সে কথাগুলি কখনো কখনো বেশ ভাল। অশুদ্ধ আত্মার কাছ থেকে ঈশ্বর ও তাঁর স্বর বহুদূর। একজন সুশিক্ষণপ্রাপ্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই অন্তর্যামী ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কিন্তু যখন কোন অশুদ্ধ অশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক ঐরূপ করেছে বলে দাবি করে সে কেবল নিজেকেই প্রতারণা করে। তবু তারা বলে যে, তাদের কোন বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। আমার আচার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, 'চুরি করা শিখতেও একজন শিক্ষকের দরকার। আর ব্রহ্মবিদ্যার মতো শ্রেষ্ঠবিদ্যা—ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান—অর্জন করতে কোন শিক্ষক লাগবে না?'[৮]

এতে কোন রহস্য নেই। লোকে Radium (রেডিয়াম) সম্বন্ধে জানতে মাদাম কুরীর (Madame Curie) কাছে যায়, পরমাণুর বিষয়ে জানতে রাদারফোর্ডের (Rutherford) কাছে যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিখতে যেমন একজন উপযুক্ত শিক্ষকের দরকার, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেও তেমনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির পদ্ধতি জানতে একজন গুরুর নির্দেশ একান্তই প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা এমন এক জায়গায় যাচ্ছি যার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। যারা কোন শিক্ষকের প্রয়োজন বোধ করে না, অথচ অন্যের শিক্ষাগুরু হবার জন্য অতি-আগ্রহী, তাদের মনে রাখা উচিত, যে একজন অন্ধের পক্ষে অপর অন্ধকে পথ দেখানোর চেষ্টা করা সমীচীন নয়।

হিন্দুশাস্ত্র গুরু করণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। ভগবদ্‌গীতার কথাই ধর। এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে কোন কিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ না দিয়ে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন। তখন অর্জুন তাঁকে নানা যুক্তি দেখিয়ে বললেন, 'আমি দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছি, সঠিক পথ সম্বন্ধে আমার মন মোহগ্রস্ত হয়েছে। শিষ্যের মতো আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন।'[৯] কেবল যখন অর্জুন কৃষ্ণকে গুরুর আসনে বসালেন তখনই সেই দিব্য আচার্য উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। শঙ্করের বিবেকচূড়ামণিতে আমরা পাই শিষ্য গুরুর কাছে আবেদন করছেন ঃ 'হে গুরু, আমি জন্ম-মরণ তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে পড়েছি; এই কষ্ট থেকে আমায় রক্ষা করুন।'[১০]

---

৮ Sw. Brahmananda, *Spiritual Talks*, (Kolkata : Advaita Ashram, 1944). pp. 42-43

৯ *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ২/৭

১০ *বিবেকচূড়ামণি*, ১৩৯

## আধ্যাত্মিক দীক্ষার শক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'বিকারহীন মরণহীন সদ্বস্তুকে জানতে হলে অন্তরাত্মাকে বা প্রত্যগাত্মাকে জাগাতেই হবে।' কেবল আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে পড়া বা আলোচনা করাই যথেষ্ট নয়। অন্তর-আলোকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি চাই।

প্রথম জাগরণ কিভাবে হবে? সত্যদ্রষ্টা আচার্য আধ্যাত্মিক দীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে শিষ্যের জন্য একাজ করেন। সব ধর্মেই দীক্ষানুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা রয়েছে; যেমন স্নান, ব্যাপটিজম, পবিত্র জল বা তেল ছিটিয়ে দেওয়া, পবিত্র শাস্ত্র থেকে আবৃত্তি, পূজানুষ্ঠান ইত্যাদি। এইসব অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দীক্ষিতদের সেই ধর্ম সম্প্রদায়গুলির সভ্য করে নিয়ে বিশেষ সুবিধাদি পাবার যোগ্য করে নেওয়া হয়। এই আনুষ্ঠানিক দীক্ষা আমাদের আলোচ্য আধ্যাত্মিক দীক্ষার থেকে অনেক তফাত।

এই কথা মনে রেখেই যীশু বলেছিলেন, 'আবার জন্ম না নিলে মানুষ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে না।'[১১] আবার জন্মানো মানেই আধ্যাত্মিক জাগরণ, দেহে আত্মবুদ্ধি বর্জন করে নিজের আত্মস্বরূপত্ব উপলব্ধি করা। 'যা দেহ থেকে জন্মেছে তা দেহই ; আর যা আত্মা থেকে জন্মেছে তা আত্মাই।'[১২] এর অর্থ ব্যাখ্যা করে যীশু-শিষ্য সেন্ট পিটার বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের কথায়, দোষযুক্ত নয় দোষমুক্ত বীজ থেকে আবার জন্ম হলে, সে জীবন তথা ঈশ্বরসান্নিধ্যে বাস হবে অনন্তকালের জন্য।'[১৩] তিনিই *গুরু* যিনি ঈশ্বরের বাণী পরম্পরাক্রমে প্রচার করে চলেন। ঈশ্বরের শক্তি আসে *মন্ত্র*-বাক্যের মাধ্যমেই আর *মন্ত্রের* মাধ্যমেই চেতনার উন্মেষ ঘটে।

ভারতে *দ্বিজত্বের* বা দুবার জন্মগ্রহণের আদর্শ আছে। আর *দ্বিজ* বলতে পাখিকেও বোঝায়। প্রথমে ডিম জন্মায়, পরে ডিম ফুটে জন্মায় পক্ষিশাবক যা পরে পরিণত পক্ষিরূপ ধারণ করে। সব ডিমই ফোটে না, সব শাবকই পরিণত পক্ষী হয় না। সেই রকম সব লোকই আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করে না। লোকে আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আছে। একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে ঃ স্বাভাবিকভাবে মানুষ শূদ্র বা অজ্ঞ হয়েই জন্মায়; শুদ্ধি সংস্কারের পর সে 'দ্বিজ' বা দুই-জন্ম বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়; অধ্যয়ন ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভে সে হয় 'বিপ্র' বা পণ্ডিত বা কবি; পরমাত্মার অনুভূতি লাভ হলে সে হয় ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিদ।[১৪] আধ্যাত্মিক দীক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানব যাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিদ হতে পারে সে বিষয়ে সুযোগ করে দেওয়া। উপনিষদ্ বলেন ঃ যিনি অক্ষর পুরুষকে জেনে ইহলোক

---

১১ *Bible*. St John. 3:3　　১২ *ibid*. 3:6　　১৩ *Bible*. I Peter. 1:23

১৪ জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।। (অত্রি স্মৃতি : পৃঃ ১৪১-৪২)

ত্যাগ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।[১৫] মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ), শ্রীরামকৃষ্ণের এক মহান সাক্ষাৎ শিষ্য, একবার আমাকে বলেন, 'যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছে সে সত্যই ব্রাহ্মণ।'

আধ্যাত্মিক দীক্ষা জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় সমন্বয় সাধন করে। এক চৈনিক ঋষি স্বাভাবিক সমন্বয়ের (তাও) তত্ত্বটি এইভাবে করে দেখিয়েছিলেন ঃ তিনি দুটি তারের বীণা নিয়ে এক সুরে বাঁধলেন। একটি বীণাকে পাশের ঘরে রেখে, হাতের বীণাটিকে 'কুং'সুরে আঘাত করলেন। অমনি দ্বিতীয় বীণাটি 'কুং'সুরে বেজে উঠল। যখন একটিতে 'চিও'সুর বাজানো হলো, অপরটিতে অনুরূপ সুরটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, কারণ দুটি বীণাই সমসুরে বাঁধা ছিল। একটি তারের লয় পালটে দেওয়া হলে অপরটিতে বেসুরো শ্রুতিকটু আওয়াজ হতে লাগল। আওয়াজ হলো কিন্তু সুরের প্রভাব গেল হারিয়ে। তেমনি আমরা পড়তে, ভাবতে, কথা বলতে পারি, কিন্তু এ সবের কোনই মূল্য হবে না যদি না আমরা নিজ নিজ আত্মার সুরকে বিরাট আত্মার বা পরমাত্মার সুরের সঙ্গে মেলাতে শিখি।

মন্ত্রশক্তি প্রকাশ পায় কেবল শুদ্ধ আত্মাতেই—যিনি ঈশ্বরের জন্য তীব্রভাবে ব্যাকুল হন। পতঞ্জলি তিন রকম শিষ্যের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়েছেন ঃ যিনি *মৃদু* তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার কঠোরতা সহ্য করতে পারেন না, *মধ্যমা* প্রথমটির থেকে বেশি চেষ্টা করে, *তীব্র* সাধক অনুভূতির জন্য কঠোর সাধনা করে, তারা বাহ্য বিক্ষেপ থেকে মনকে ভেতরে আকর্ষণ করার গুহ্য কৌশল শিখেছে, নিজ অন্তরে দৈবী সত্তার অধিষ্ঠান সম্বন্ধে সচেতন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য গভীর ব্যাকুলতা-সম্পন্ন।[১৬] ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতাকেই সর্বদা ঈশ্বরকৃপার সঙ্কেত বলে মনে করা উচিত।

আমার আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ায় এ পথ অত্যন্ত দুরূহ বলে মনে হতো। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'সংগ্রাম, সংগ্রাম'। *গুরুর* কাছে নির্দেশলাভই যথেষ্ট নয়; সাধককে অনুক্ষণ সংগ্রাম করে যেতেই হবে। সত্যবস্তু জানার জন্য শিষ্যকে প্রথমে অবশ্যই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ব্যাকুল হতেই হবে। যারা এর জন্য প্রস্তুত তাদের কাছেই এই জাগরণ সহসা উপস্থিত হয়। অন্য সংগ্রামী সাধকের কাছে এই জাগরণ আসে ধীরে ধীরে।

আমরা যখন আনন্দে মেতে থাকি, তখন সে আনন্দ অন্যদেরও দিতে পারি। সেই রকম, একজন উত্তম আধ্যাত্মিক আচার্য তাঁর শিষ্যে অধ্যাত্ম স্পন্দনসমূহ

---

১৫ 'অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥' —বৃহঃ উপ ঃ ৩.৮.১০

১৬ তুলনীয় ঃ পতঞ্জলি যোগসূত্র ঃ ১.২২

সঞ্চারণ করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্যবর্গকে অনেক ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে আমরা দেখেছি। তাঁরা অধ্যাত্মশক্তির বিরাট আধার ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তার ব্যবহার খুব সাবধানেই করতেন। সাধারণত *গুরু মন্ত্রের* মাধ্যমেই এই ক্ষমতা সঞ্চার করে থাকেন।

## মন্ত্রের শক্তি

একজন সন্ন্যাসী শিষ্য কোন সময়ে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রশ্ন করে, 'দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের আধ্যাত্মিক জাগরণ হয় না। তা সত্ত্বেও কি তারা উপকৃত হবে না?' মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, 'দীক্ষার সময় তাদের কোন রকম বোধ না হলেও, ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যের দেওয়া পবিত্র নামের শক্তি ব্যর্থ হয় না। অধ্যাত্মশক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হলে, কালে তার মধ্যে পরিবর্তন হয় ও পরে আধ্যাত্মিক জাগরণও আসে।'

উন্নত আত্মা পূর্ণজ্ঞানী না হয়েও যে দীক্ষা দেন তার কি ফল হয়? উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র যেমন নিজে কলেজের জন্য তৈরি হবার আগেই নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পারে, সাধারণ উন্নত আত্মাও সেই রকম শিষ্যকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পারে। সে যতই সত্যের দিকে অগ্রসর হবে, ততই অন্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাতে সচেষ্ট হবে। সাধারণ গুরু যদি অধ্যাত্ম জীবনে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করে থাকেন, তবে তিনিও কালে শিষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক জাগরণ আনতে পারেন যদি শিষ্য আন্তরিকভাবে অধ্যাত্ম পথ অনুসরণ করে। *মন্ত্রে* বা দৈবী নামেই প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। শ্রীচৈতন্য এ সত্যটি আমাদের শিখিয়েছেন : তুমি তোমার নামাবলি বহু প্রকারে প্রকাশ করেছ, তাতে তুমি তোমার সর্বশক্তি নিহিত রেখেছ, ঐ নাম স্মরণে কোন কালের বিধিনিষেধও তুমি আরোপ করনি।[১৭]

পতঞ্জলি, ওঁ এবং অন্য পবিত্র নাম জপের ফল সম্বন্ধে বলেছেন : উহা যোগ পথের নানা বিঘ্ন দূর করে ও অন্তরাত্মা সম্বন্ধে সচেতনতার পথে এগিয়ে দেয়।[১৮] বিঘ্নগুলি কি? বিঘ্ন হলো রোগ, সংশয়, মনের বিক্ষেপ ইত্যাদি। মন্ত্রজপ ব্যক্তিত্বে একটি নতুন ছন্দ, সমন্বয় এনে দেয়, যা স্নায়ুগুলিকে শান্ত করে ও মনের শক্তিগুলির মধ্যে সমতা আনে এবং ধীরে ধীরে অন্তরাত্মা সম্বন্ধে সচেতনতার দিকে এগিয়ে

---

১৭ নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। —শ্রীচৈতন্য, শিক্ষাষ্টকম্, ২

১৮ 'ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ॥' —পতঞ্জলি, যোগসূত্র, ১.২৯

নিয়ে যায়। ধ্যানশীল জীবনের গোড়ায় মন্ত্রের শক্তি বোঝা যায় না। কিন্তু যদি কেউ আন্তরিকতার সঙ্গে মন্ত্র জপ করে, তবে সে ক্রমে মন্ত্রের শক্তি অনুভব করতে পারবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, *'জপম্ জপম্ জপম্'* এমনকি কাজের সময়ও *জপ* অভ্যাস কর। তোমার সব কাজের মধ্যে ঈশ্বরের নামকে ঘুরতে দাও। তা যদি পার, হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। ঈশ্বরের নামের আশ্রয়ে বহু পাপী পবিত্র হয়েছে, মুক্ত হয়েছে ও দেবত্ব লাভ করেছে। ঈশ্বরের ওপর তাঁর নামের ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখ, জেনো যে নাম ও নামীর মধ্যে ভেদ নেই।'[১৯]

যেমন অতীতে সাধু সন্তগণ দেখিয়েছেন তেমন বর্তমানেও বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে ঈশ্বরের শক্তিই তাঁর নামের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়। যখন *গুরু* প্রদত্ত *মন্ত্রকে* সযত্নে অন্তরে রক্ষা করে, অনুক্ষণ তার ধ্যান করা হয়, তখন সাধকের অন্তরে এই শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই পদ্ধতিকে মুক্তার গঠনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। লোকের বিশ্বাস শুক্তি স্বাতি নক্ষত্র উদয়ের জন্য অপেক্ষা করে। যদি সে সময় বৃষ্টি হয় শুক্তি ঢাকাটি খুলে ঐ জল এক ফোঁটা ভেতরে নিয়ে নেয়। সেটি তারপর সমুদ্রতলে ডুব দিয়ে কয়েকমাস থাকে—যতদিন না ঐ জল সুন্দর মুক্তায় পরিবর্তিত হয়।[২০] সেই ভাবে ভক্তের হৃদয় সত্যবস্তু আহরণের জন্য উন্মুক্ত হবে এবং *গুরুর* আধ্যাত্মিক উপদেশ গ্রহণ করে, ঐটির ওপর তাকে একাগ্র যত্নে কাজ করে যেতে হবে যতদিন না আধ্যাত্মিক উন্মেষরূপ মুক্তাটির জন্ম হয়।

## শুদ্ধ মনই গুরুর কাজ করে

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, 'তোমার মনের থেকে আরো বড় কোন *গুরু* নেই।' মানুষ *গুরু* সব সময়ে কাছে থাকেন না। যথেষ্ট ভাগ্যের জোরে যদিও তুমি কোন উন্নত আচার্যের আশীর্বাদ ও উপদেশ পাও, তবু সব সময়ে তোমার প্রয়োজনে তাঁকে নাও পেতে পার। কিন্তু একজন অন্তরের আচার্য আছেন, যিনি শুদ্ধ মনরূপে সদা আমাদের অন্তরে বিরাজ করছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, 'যখন প্রার্থনা ও ধ্যানের সহায়তায় মন শুদ্ধ হয়ে ওঠে, সেই মনই অন্তর থেকে তোমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এমনকি তোমার দৈনন্দিন কাজে এই আন্তর *গুরু* তোমাকে পথ দেখাবে ও তোমাকে সাহায্য করবে যতদিন না লক্ষ্যে পৌছুতে পারছ।'[২১]

এর অর্থ কি? মন কিভাবে আন্তর *গুরুর* কাজ করবে? সমস্ত জ্ঞানের আকর,

---

১৯ পূর্বোল্লিখিত *The Eternal Companion*, p. 297

২০ *Teachings of Sri Ramakrishna*. [Kolkata : Advaita Ashrama 1975] pp. 180-81

২১ পূর্বোল্লিখিত *The Eternal Companion*, p. 251

সকল আচার্যের আচার্য, পরমাত্মা যে সদা প্রতি হৃদয়ে বর্তমান রয়েছেন। নৈতিক জীবন, প্রার্থনা, ধ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন সেই মন পরমাত্মার অন্তর্জ্যোতির সংস্পর্শে আসে। এই শুদ্ধ মনই তখন দৈব চেতনা প্রবাহের এক প্রণালী হয়ে ওঠে। মন, আচার্যের আচার্য যিনি, তাঁর কাছ থেকে সরাসরি আধ্যাত্মিক নির্দেশনা লাভ করে। মন যখন এইভাবে অন্তরের সত্যের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করতে শেখে, সে তখন নানা উৎস থেকে উপদেশ পেতে পারে। ভাগবতে এক পরিব্রাজক অবধূত বা সন্ন্যাসীর কথা আছে, যিনি অনেকগুলি প্রাকৃতিক বস্তুকে উপগুরু বা সহায়ক আচার্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মাতা ধরিত্রীর কাছ থেকে তিনি শিখলেন সহনশীলতার রহস্য, বাতাস থেকে অনাসক্তি (যেহেতু ভাল বা মন্দ গন্ধ তাকে প্রভাবিত করে না), আকাশ থেকে সমস্ত বন্ধন-মুক্তি ইত্যাদি।[১১]

আপনারা অনেকে জানেন আশ্রমের রন্ধনশালায় জীবন কাটালেও সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী মরমিয়া সাধক সেন্ট লরেন্স কিভাবে জ্ঞানালোক পেয়েছিলেন। শীতকালের মাঝামাঝি একটি পাতাশূন্য গাছ দেখে তার মনে চিন্তার উদ্রেক হয় যে আবার ঐ শূন্য ডালে পাতা, ফুল, ফল দেখা দেবে। এর থেকে তার উপলব্ধি হলো যে সব সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরের শক্তি লুকানো আছে। তখন তাঁর যে আধ্যাত্মিক জাগরণের অনুভূতি হয় তাতেই তিনি সারাজীবন যাপন করার শক্তি পেয়েছিলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে দিব্য-শক্তি চাপা থেকে, জাগরণের অপেক্ষায় আছে। আমাদের মধ্যে দৈব-চেতনার কেন্দ্রটিকে খুঁজে বার করে, সুপ্ত চেতনাকে আহ্বান করতে হবে। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের তাঁর পরিনির্বাণের পর এই আন্তর্গুরুকেই অনুসরণ করতে বলেছিলেন। তাঁর আদেশ ছিল, *'আত্মদীপো ভব'*—নিজের কাছেই নিজে আলোকবর্তিকা হও।'

কিন্তু আমাদের সাবধান থাকতে হবে, পাছে নিজেই নিজেকে প্রতারণা করে বসি। আমরা মনে করতে পারি যে আমাদের মন উত্তম *গুরুর* পর্যায়ে উঠেছে, আমরা সর্বত্র আদেশ পাচ্ছি; কিন্তু আমাদের নিজেদের বাসনা ও চিন্তাকে ঈশ্বরীয় প্রেরণা, ঈশ্বরের বাণী ইত্যাদি বলে ভুল করার বিপদ সব সময়েই রয়েছে। এ বিপদ থাকে না যদি আমরা আদেশ পাই একজন জীবিত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন আচার্যের কাছ থেকে এবং তাঁর দ্বারাই চালিত হই। মানুষ *গুরু* শিষ্যকে নৈতিক সংযম ও অনাসক্তভাবে কাজ করার অভ্যাসের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি বিধান করতে আদেশ দেন। শিষ্য ভুল করলে, *গুরু* তা লক্ষ্য করে তাকে আবার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। একজন উপযুক্ত মানুষ *গুরুর* নির্দেশ পাবার সৌভাগ্য যাদের

১১ শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।৭।৯

হয়েছে, তারা বিপথে যায় না। ধীরে ধীরে *গুরুর* আশীর্বাদে শিষ্যের স্বজ্ঞার উন্মেষ হয় এবং তখন থেকে তার শুদ্ধ স্বতঃলব্ধ জ্ঞান *গুরুর* কাজ করে। এই ভাবে নিজ মনই *গুরু* হয়ে যায়।

## অবতারই সর্বোত্তম আচার্য

*অবতার* বা ঈশ্বরের নররূপই নিশ্চয় সর্বোত্তম আচার্য; তিনি সহস্র সহস্র লোকের জ্ঞানোন্মেষ সাধন করতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে, অবতার হলেন *কপাল মোচন*—যিনি লোকের নিয়তি পরিবর্তন করতে পারেন, যিনি তাদের কপালের লিখন, অর্থাৎ কর্মফল, মুছে দিতে পারেন।[২৩] এরকম পরিবর্তন কোন সাধারণ আচার্যের দ্বারা সম্ভব নয়। যীশুর এইরূপ পরিবর্তন করার শক্তি ছিল, তাই তিনি স্পর্শ করে সরল জেলেদের জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। যে-সব অপবিত্র মানুষকে সাধারণ লোকে পাপী বলে—তাদের মধ্যেও পরিবর্তন আনার শক্তি তাঁর ছিল। যখন তিনি তাদের বলতেন, 'তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হলো; তোমাদের বিশ্বাসই তোমাদের পবিত্র করেছে; শান্তিতে থাক,' অমনি তাদের বোধ হলো যে তারা সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়েছে।

কিন্তু যীশুকে নিজেকেও দীক্ষার মাধ্যমে যেতে হয়েছিল। জর্ডন নদীতীরে যে জলসিঞ্চন (Baptism) হয়েছিল তা দীক্ষা ছাড়া আর কি? কারণ আমাদের বলা হয়েছিল যে সে সময়ে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল ও তিনি দেখেছিলেন যে ঈশ্বরের আত্মা ঘুঘু পাখির মতো নেমে এসে তাঁর ওপর বসলেন, আর তিনি এক বাণী শুনতে পেলেন ঃ 'এটিই হলো আমার প্রিয় পুত্র—এর ওপর আমি খুব প্রীত।' বর্তমানকালে মানব ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বোধে শ্রদ্ধা করছে। তিনিও একজন মানবশরীরধারী আচার্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের বলা হয়েছিল, কালী মন্দিরে পূজকের কাজ গ্রহণ করবার আগে তিনি কেনারাম ভট্টাচার্য নামে কলকাতার এক তান্ত্রিক আচার্যের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।[২৪] আচার্য যখন তাঁর কানে মন্ত্রটি বলেছিলেন, তিনি তখন জোরে চিৎকার করে উঠে ভাবাবেশে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। আচার্য বললেন, আমি অনেক শিষ্যকে মন্ত্র দিয়েছি কিন্তু রামকৃষ্ণের মতো কাউকেও দেখিনি।

প্রভুও যখন তাঁর মহান শিষ্য নরেনকে রাম মন্ত্রে দীক্ষা দেন, ঐ যুবকের

---

২৩ উদ্ধৃতিটি স্বামীজীর '*Guru, Avatara, Yoga, Japa, Seva*' শীর্ষক ইংরাজী প্রশ্নোত্তর মূলক আলোচনা (The Complete Works of Swami Vivekananda [Kolkata : Advaita Ashram 1973] vol-V, p. 324 থেকে গৃহীত। আলোচনাটি উদ্বোধন প্রকাশিত *বাণী ও রচনায়* নাই।

২৪ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, সাধকভাব, পৃঃ ৫৮

আধ্যাত্মিক অনুভূতির অতি উচ্চ স্তর পর্যন্ত আলোড়িত হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা সে ভাবের অবস্থায় বিভোর ছিল। পরবর্তী কালে এই শিষ্যই আবার স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক আধ্যাত্মিক শক্তির গোমুখ হয়েছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রার পূর্ব বৎসর মাদ্রাজের কোন কলেজের এক নাস্তিক অধ্যাপক ধর্মের সত্যবস্তুগুলি নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। বিবেকানন্দের সামান্য স্পর্শে ঐ সন্দেহবাদীর মন তখনি পরিবর্তিত হয়ে গেছিল। পরে ইনি সংসার ত্যাগ করে সন্তের জীবন যাপন করে দেহরক্ষা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, এমনকি সামান্য দৃষ্টি বা ইচ্ছাশক্তি সহায়ে, অন্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করে তাকে চেতনার উচ্চস্তরে তুলে দিতে পারতেন। স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) তাঁর নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন ঃ 'একদিন আমি ধ্যান করছি, এমন সময় প্রভু আমার কাছে এলেন। তিনি যেমনি আমার দিকে তাকালেন আমি কেঁদে উঠলাম। তিনি কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার ভেতর দিয়ে এক রকম শিরশিরানি ভাব বয়ে চলেছে অনুভব করলাম, আমার সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। ঐ অবস্থা লাভের জন্য প্রভু আমাকে সাধুবাদ দিলেন।'

পরে স্বামী শিবানন্দ নিজে, তাঁর অনেক গুরুভাই-এর মতো মহাশক্তিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক আচার্য হয়েছিলেন—তাঁর এই অবস্থাতেই আমরা তাঁর সাক্ষাৎলাভ করি। এই শক্তি তাঁর ভেতর আরও বিকশিত হয়েছিল যখন তিনি সঙ্ঘগুরুরূপে অধিষ্ঠিত হলেন। সম্ভবত ১৯২৩ খ্রীঃ এক সিন্ধুদেশীয় আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসু স্বামীর কাছে মন্ত্র দীক্ষার জন্য এসেছিল। ঐ ভক্তটি স্বপ্নে এক *মন্ত্র* পেয়েছিল, কিন্তু তার তাৎপর্য বুঝতে না পারায় তার মন চঞ্চল হয়। মহাপুরুষ মহারাজ তাকে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দেন ও কিছুক্ষণ ধ্যান করতে বলেন। পরে স্বামী আনন্দে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল ও দৈব প্রেরণায় অভিভূত মন নিয়ে তাঁর ঘরে ফিরে এলেন কারণ তিনি জেনেছিলেন যে ঠাকুর ঘরে একটা বিশেষ কিছু ঘটছে। নতুন শিষ্যটির এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হলো। পূত মন্ত্রটি পাবার মুহূর্তেই তার মধ্যে উন্মেষ হলো এক নতুন আধ্যাত্মিক চেতনা ও তার গণ্ডদেশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল, আর সে গভীর ধ্যানে ডুবে গেল। যখন সে *গুরুর* কাছে ফিরে এল, তখন বলল কিভাবে তাঁর কৃপায় তার হৃদয় দৈবী শান্তিতে ভরে গেছে। সে বলল, দীক্ষার সময় দেওয়া *মন্ত্রটি* আর স্বপ্নে পাওয়া *মন্ত্র* একই, কেবল দীক্ষার সময় এর তাৎপর্য তার কাছে উপলব্ধ হলো। মহাপুরুষ মহারাজ তাকে বললেন, 'বৎস, প্রভু স্বয়ং আজ তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন। কেবল তিনিই অপরের ওপর কৃপা বর্ষণ করতে পারেন। আমরা কেবল তাঁর হাতের যন্ত্রমাত্র। প্রভু স্বয়ং *গুরুর* হৃদয়ে বিকশিত

হয়ে শিষ্য-হৃদয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্প্রসারিত করেন। আমি প্রভুর কাছে তোমাকে সমর্পণ করেছি, তিনি এখন তোমার জীবন ও নিয়তির ভার নিয়েছেন।'[২৫]

## সর্বকালের আচার্য

প্রবাদ আছে, মানুষ *গুরু মন্ত্র* দেন শিষ্যের কানে, আর জগদগুরু ভক্তের হৃদয়ে কথা বলেন। প্রকৃত দীক্ষা তখনই হয় যখন ঈশ্বর সাধকের আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়ে তোলেন। প্রকৃত গুরু হলেন সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বর, অন্তর্যামী পরমাত্মা, যিনি—গন্তব্য স্থল, পরিচালক, প্রভু, সাক্ষী, বাসস্থান, আশ্রয়, হিতকারী বন্ধু, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও সংহারকর্তা, এর ভিত্তি, সমস্ত জ্ঞানের আধার এবং অক্ষয় কারণ।[২৬]

যখন সাধারণ আচার্য ও শিষ্যের সাক্ষাৎ হয় তাঁরা পরস্পরের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করতে চেষ্টা করেন। শিষ্য দেখে আচার্য যেন পরমাত্মার, সকল আচার্যের আচার্য যিনি তাঁর, চাক্ষুষ বিকাশ, যেন ঈশ্বরের কৃপা প্রবাহের একটি প্রণালী। এই ভাবেই সে তাঁর সেবা করে, তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁকে পূজা করে। এই ভাবই প্রকাশ পায় যখন সহস্র সহস্র ভারতবাসী বার বার উচ্চারণ করে এই প্রসিদ্ধ শ্লোকগুলি ঃ আমি সেই দিব্যগুরুকে নমস্কার করি, যিনি জ্ঞানের কাজল দিয়ে অজ্ঞানরোগে অন্ধত্বপ্রাপ্ত লোকের চোখ খুলে দেন। আমি সেই দিব্যগুরুকে প্রণাম করি, যিনি শিষ্যকে আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দান করে তার বহু জন্মের সঞ্চিত *কর্ম*-বন্ধন দগ্ধ করে দেন।[২৭]

আমি নমস্কার করি এই 'গুরুরূপধারী কল্যাণমূর্তিকে', যাঁর নিরপেক্ষ সত্তার আলোকের বহিঃপ্রকাশ হয় আপেক্ষিক জগতের মাধ্যমেই, যিনি শিষ্যদের "তুমিই সেই"-রূপ পবিত্র বাক্যের মাধ্যমে উপদেশ দেন, যাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করলে জীবাত্মা কখনো জন্ম-মৃত্যু সাগরে পুনরার্বতন করে না।[২৮]

জীবাত্মা বা ব্যক্তি আত্মা পরমাত্মার দ্বারা অনুস্যূত ও পরিব্যাপ্ত। কিন্তু অজ্ঞানের

---

২৫ *For Seekers of God*, Translated by Swami Vividishananda And Swami Gambhirananda. Advaita Ashram. 1975 pp. 164-65, গ্রন্থে-এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

২৬ গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।। (গীতা ৯.১৮)

২৭ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
অনেকজন্মসম্প্রাপ্ত ন কর্মবন্ধ ন বিদাহিনে। আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
(বিশ্বসারতন্ত্র—গুরুস্তোত্রম্, ৩.৯)

২৮ যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎ করণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ।।
(শ্রীশঙ্করাচার্য, দক্ষিণামূর্তি-স্তোত্রম্ ৩)

জন্য এই জীবাত্মা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। দীক্ষার উদ্দেশ্যই হলো এই অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচন করা। এই আবরণ একবার অপসারিত করে নিলে নিয়মিত আধ্যাত্মিক উপাসনার দ্বারা জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ রক্ষা করা যায়।

অধ্যাত্ম জীবনেও সর্বকালের সরবরাহ চাহিদার নিয়মটি খাটে। যদি কোন সাধক সত্যের আলোক পাবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করে, তবে সে আলোক কোন না কোন উৎস থেকে অবশ্যই তার কাছে আসবে। তার ভেতর কিছু ঘটে যায়, তার হৃদয় দৈব কৃপা লাভের জন্য খুলে যায়। আর ঈশ্বরীয় আলোকের ঝলকে সে উদ্ভাসিত হয়। আর যেমন সে চরম সত্যের কাছে আরও এগিয়ে যায়, সে দেখে পরমাত্মার আলোক সকল জীবের মধ্যে বিকশিত হচ্ছে। আর যখন সে পরমাত্মার, গুরুর গুরুর সঙ্গে একীভূত হয়, সেও তখন অন্যের মধ্যে দিব্যজ্ঞান সঞ্চারের একটি প্রণালী বা পথ হয়ে যায়। সে তখন সকল জীবের সেবা করে কেবল ঈশ্বরেরই সেবা করছি জেনে, যিনি সর্বকালের আচার্যরূপে সব জীবকে যুগ যুগ ধরে শিক্ষা দিচ্ছেন, জাগিয়ে তুলছেন, জ্ঞানালোক দিচ্ছেন এবং পথ নির্দেশ করছেন।

# নবম পরিচ্ছেদ

# জ্ঞানিজনের সংসর্গ

## সাধুসঙ্গ প্রয়োজন

সব ধর্মে ও অধ্যাত্ম সাধনার সব পথেই জ্ঞানী ও সাধুজনের সংসর্গ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সত্য কথা বলতে গেলে একজন সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এটি বিশেষ প্রয়োজন। একজন প্রবর্তকের জীবনে এটি একটি অপরিহার্য উপাদান। ভারতে আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীরা সকলেই সাধুসঙ্গে সর্বদা আগ্রহী। সাধুসঙ্গে কি লাভ? এ বিষয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে একটি বিশেষ আলোচনা আছে ঃ

একজন ভক্ত—এখন উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—উপায় ঃ সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা। বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না, সর্বদাই দরকার; রোগ লেগেই আছে। আবার বৈদ্যের কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়। তবে কোন্‌টি কফের নাড়ী, কোন্‌টি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়।

ভক্ত—সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। ...সাধুসঙ্গ করলে আর একটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ—নিত্যপদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য।[১]

অন্যভাবে বলা যায়, সাধুসঙ্গ আমাদের মনে ত্যাগবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। সর্বত্যাগী সাধুদের মধ্যে থাকলে, অন্যেরাও ত্যাগের মূল্য বুঝতে শেখে ও ত্যাগব্রত গ্রহণ করবার শক্তি অর্জন করে। এক মুসলিম সন্তের গল্প আছে, সে একদিন সুলতানের দর্শনে যায়। সম্রাট সন্তের ত্যাগবৃত্তির প্রশংসা করায় সন্ত উত্তর দেন ঃ 'আমার ত্যাগের কথা বলছ? তোমার ত্যাগ তো আরো অনেক বেশি। আমি তো

---

১ পূর্বোক্ত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৩৫-৩৬

কেবল এই সংসার আর সংসার সুখ ত্যাগ করেছি; আর তুমি তো ঈশ্বরকে আর সকল স্বর্গীয় সুখ ত্যাগ করেছ।'

সঠিক সংসর্গের প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এটি শ্রীবুদ্ধ-উপদিষ্ট 'সম্যক্ সঙ্কল্পের' সঙ্গে সম্পর্কিত আর বেদান্ত সাধনাতেও এর প্রয়োজনীয়তার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটি দাম্ভিকতাজনিত সঙ্গ বর্জনের বা সংবেদনশূন্যতা বা দয়াহীনতার প্রশ্ন নয়। বরং এটি পূর্ণ দয়া প্রবণতার কাজ রূপে গণ্য হতে পারে—বাহ্যত কতকগুলি লোকের সঙ্গে না মিশে কেবল পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও। বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ ও সন্ন্যাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও এটি সর্বজীবের প্রতি করুণার ধর্ম।

সহযাত্রীরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে। তাই সাধুসঙ্গের এত বেশি গুরুত্ব। পারস্পরিক সহায়তা ও সহমর্মিতা থাকা দরকার; কারণ এগুলি আমাদের শক্তি ও অধ্যবসায় বজায় রাখতে সহায়তা করে। আমরা যেন কখনও শিক্ষক হতে চেষ্টা না করি বরং সহপাঠী হয়ে সমর্থ হলে, অপরকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিই। আমরা যদি যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে কিভাবে থাকতে হয় তা জানি, তবে বুঝব এইটিই হলো নিরাপদ অবস্থান। এর ফলে আমরা নিজেরা নিজেদের ও অপরের বিপদের কারণ হব না এবং আমাদের মধ্যে অহংবোধ ও শ্রেয়োমন্যতা জেগে উঠে নিজের ও অপরের ক্ষতি সাধন করবে না।

'মা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।' আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, শ্রেয়োমন্যতা কখনই নয়। নেতা হবার আগে আন্তরিকতার সঙ্গে ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ বুদ্ধিতে তুমি অপরকে সেবা করতে শেখ। প্রায়ই উপযুক্ত শিক্ষা না নিয়েই আমরা অন্যের নেতা হতে যাই। উপযুক্ত দাম না দিয়েই আমরা ফল পেতে চাই।

ছোট ছোট ভক্তগোষ্ঠীর সুবিধা হলো, ছোট গোষ্ঠীতে অধিকতর সম-মানসিকতা পাওয়া যায়, ফলে সরাসরি উপদেশগুলির প্রয়োগ সম্ভব হয়। প্রবর্তক হলেও ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে অসাক্ষাতে নিন্দার অভ্যাস বর্জিত পারস্পরিক প্রকৃত সহানুভূতির ভাব সহজে পাওয়া যায়। প্রথমে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ, পরে তার বিস্তারই সর্বদা শ্রেয়স্কর। প্রতিটি দেশেই এমন কিছু একনিষ্ঠ মানুষের দল থাকা প্রয়োজন, যারা সম্পূর্ণ পবিত্রতা, ভক্তি ও সেবার উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য সচেষ্ট, সেই আদর্শ লাভের জন্য যারা সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেই আদর্শ উপলব্ধি করতে যারা সব রকম কষ্ট স্বীকারের জন্যও তৈরি। আমাদের যতই ইচ্ছা থাকুক বিরাট জনগোষ্ঠীকে কখনই এক সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে নিয়ে যেতে পারব না। যাদের সময় উপস্থিত হয়েছে এরকম কিছু কিছু আন্তরিক নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনই আমরা পরিবর্তন করতে পারি।

## মূর্খের সংসর্গ পরিহার কর

সংস্কৃতভাষায় একটি সর্বজনবিদিত উক্তি আছে ঃ স্বর্গে হলেও মূর্খের সঙ্গে বাস করার চেয়ে বনচরদের সঙ্গে বনে ঘুরে বেড়ানও ভাল।[২]

আমাদের সাধনকালে সৎ, শুদ্ধ, গভীর আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের সঙ্গ না পেলেও আমরা যেন মূর্খের অর্থাৎ সংসারী লোকেদের সন্ধান ও সংসর্গ না করি। আমাদের বর্তমান অবস্থায় তাদের অশুদ্ধ অনৈতিক চিন্তা-স্পন্দন অজান্তে আমাদের ক্ষতি করবে অথচ আমরা মনে করব যেন কিছুই হয়নি। যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন যুবা শিষ্য বরানগর মঠে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে অনুযোগ করে বললেন—এখনো যখন আমাদের ঈশ্বর উপলব্ধি হলো না, আমরা বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে সংসার-জীবন যাপন করি—তখন স্বামীজী উত্তর দেন ঃ 'রামকে পেলাম না বলে কি আমি শ্যামার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের) কাছে ছুটব? ঈশ্বরলাভে অক্ষম হলেই কি আমাকে সংসারে ফিরে যেতে হবে? না, কখনই না।' প্রত্যেককেই এই মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু সাধারণত মানুষ মানুষের সংসর্গ চায়, সে মন্দ লোক হলেও। তারা একা থাকতে চায় না। এই হলো সব অসুবিধার কারণ।

আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃত লক্ষণ হলো, ভক্ত কেবল ঈশ্বরীয় বা আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ শুনতে ও বলতে চাইবে। যদি দেখ যে কোন ভক্ত বৈষয়িক সংসর্গ বা বৈষয়িক কথাই পছন্দ করছে তবে জানবে তার ভক্তিতে কিছু খাদ মেশানো আছে এবং তার আন্তরিকতাও সন্দেহজনক। বাইরের বস্তু তখনই আমাকে আকর্ষণ করতে পারে যখন ভেতরের সায় থাকে ও সেটিকে পাবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা থাকে। একই ধরনের লোকের মন মেজাজ এক বলেই তারা এক জায়গায় জড় হয়। যারা সত্যসত্যই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক তারা বিষয়ী লোকের কথা বা সঙ্গ উপভোগ করতে পারে না। বিষয়ী লোক চালাক ও লেখাপড়ায় উন্নত হতে পারে কিন্তু বিজ্ঞ নয়, অধ্যাত্ম-সাধককে খেয়াল রাখতে হবে সে যেন এই সব নির্বোধদের সংসর্গে সময় নষ্ট না করে। বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের কয়েকজনকে এ বিষয়ে কেন আমি বারবার সাবধান করছি তা আমিই জানি।

## প্রথমে নিজে উদ্ধার হও

তোমরা কি দেখেছ যে কোন কোন লোক অপরের 'উদ্ধারের' জন্য বেশ ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? কেবল পাশ্চাত্য দেশেই এরকম লোক প্রায় নজরে পড়ে। এমন সব লোক আছে যারা অপরের আত্মাকে নরকাগ্নি থেকে উদ্ধার করতে সর্বদা ব্যস্ত।

২ *বরং পর্বতদুর্গেষু ভ্রান্তং বনচরৈঃ সহ।*
*ন মূর্খজন সম্পর্কঃ সুরেন্দ্রভুবনেষ্বপি॥* —ভর্তৃহরি, নীতিশতকম্ ঃ ১৪

মনে করো না যে তোমরা সাধুসন্ত হয়ে গেছ, যার তার সঙ্গে খুশি মিশতে পার। বুদ্ধ, খ্রীস্ট বা রামকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষ পাপীর কাছে যেতে পারেন, তাদের সঙ্গে থেকে তাদের উদ্ধার করতে পারেন। তোমার কথা আলাদা। নিজেকে উদ্ধার করার মতো তেজই এখনও তুমি সঞ্চয় করতে পারনি। আমার কথা যদি তুমি না বুঝে থাক, এগিয়ে যাও পাপীদের সংশোধনের চেষ্টা কর, দেখবে তোমার ক্ষেত্রে কি হয়? তোমার নিজের *সাধনা* নিয়েই এখন তোমার ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন। অধ্যাত্মজীবনের গোড়ায় নিজ আত্মা ও ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে মাথা গলাবে না। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে স্থির ও একাগ্রভাবে তোমার নিজের *সাধনা* নিয়ে চল। জপ, ধ্যান ও অধ্যয়নে আরো বেশি বেশি সময় দাও। তুমি যদি অধ্যাত্মজীবনে যথেষ্ট উন্নতি করতে পার, তবেই তুমিও অপরকে আধ্যাত্মিকতার পথে সাহায্য করতে পারবে।

কোন কোন লোক বিপরীত লিঙ্গের মোহিনীশক্তির প্রতি অন্যের থেকে বেশি অনুভূতিপ্রবণ। কোন কোন লোক অন্যের থেকে বেশি তাড়াতাড়ি দৈহিক প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়ে। এইসব লোকের অপরের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে, প্রলোভনের বস্তুর মাঝখানে ঘোরা ফেরার ব্যাপারে অধিক মাত্রায় সর্তক হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের লাটু নামে এক শিষ্য ছিল; প্রভুর কাছে আসবার আগে ছেলে বেলায় সে গরিব মেষপালক হিসাবে সমাজের নিচুস্তরের মধ্যে কাটিয়েছিল ও লোকেদের মদ্যপান করা দেখতে সে অভ্যস্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর যুবক লাটুকে একদিন মদের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে হয়েছিল, তাতে তার পুরান বাল্যস্মৃতি জেগে ওঠায় মন চঞ্চল হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ অপরের মনের কথা জানতে পারতেন, তাই তিনি তখনি মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ ধরে ফেলে লাটুকে মদের দোকানের কাছ দিয়ে যেতেই নিষেধ করলেন। যুবকটি এর পর থেকে শুধু মদের দোকানের রাস্তা নয় পাশাপাশি আরো কয়েকটা রাস্তা বাদ দিয়ে চলত। বেশি হাঁটতে ও কষ্ট করতে হলেও সে বেশি ঘুর পথেই যাতায়াত করত। পরে একজন উচ্চ পর্যায়ের প্রবুদ্ধ আত্মা হয়ে উঠা তার ক্ষেত্রে কি কোন আশ্চর্যের কথা? সাধুপুরুষেরা সব সময়ে জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে এমনিই নিখুঁত হন।

কখনো কখনো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কোন কোন লোককে দেখে আমি মানসিক আঘাত পাই। তাদের মুখে এত বেশি লাম্পট্যের ও লোলুপতার ছাপ থাকে যে তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের স্পন্দনও আমাকে আঘাত করে। এইসব লোকের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের কতই না সাবধান হতে হয়।

এক ভবঘুরেকে নিয়ে এক হাসির গল্প আছে। সে স্ফীত নদীতে কম্বলের মতো

একটা কিছু ভাসতে দেখল। অমনি সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে গিয়ে সেটিকে ধরল। কিন্তু তখনই সে সাহায্যের জন্য চিৎকার আরম্ভ করল। তীরের লোক তাকে চেঁচিয়ে বলল কম্বলটা ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতে। কিন্তু ভবঘুরেটি উত্তর দিলে, 'আমি তো কম্বলটি ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু কম্বল আমাকে ছাড়ছে না।' সে যেটিকে কম্বল মনে করেছিল সেটি ভালুক। আমাদের এইরকমই ঘটে থাকে। আমরা কোন জিনিস বা লোকের পেছনে ছুটি কিন্তু পরে দেখি তাদের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনা যাচ্ছে না।

## অপরকে নিন্দা করার প্রয়োজন নেই

সাধক নির্বিচারে সকলের সঙ্গে মিশবে না কিন্তু তার জন্য কোন দোষারোপ থাকবে না। অশুদ্ধ লোকেদের ওপর দোষারোপ করে নিজের শ্রেয়োমন্যতা গড়ে তোলার দরকার নেই। তোমার থেকে আমি পবিত্রতর এই মনোভাব সত্যই খারাপ, এতে আমরা অতিমাত্রায় আত্ম-বিশ্বাসী হয়ে অসাবধান হয়ে পড়ি। কিন্তু অধ্যাত্ম-সাধক আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে অসৎ লোক ও তাদের স্পন্দন থেকে আড়ালে রাখবে। আমরা অনেক উন্নত না হলে, অন্যকে পরিবর্তন করার মতো যথেষ্ট আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী না হলে, অসৎলোকের সংস্পর্শে আসা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সকলের মধ্যে আছেন কিন্তু তাঁর কতকগুলি প্রকাশ আমাদের বর্তমান অবস্থায় নিরাপদ নয়। ঈশ্বরের ঐ সৃষ্টিগুলিকে যথেষ্ট দূর থেকেই নমস্কার জানাতে হবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে অসৎ সংসর্গ আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না, তখন আমাদের কি করণীয়? তাদের প্রতি তাচ্ছল্য ভাবও দেখাবে না, উদাসীনও হবে না। খুব সজাগ থাকবে আর মনের ভেতর এক শক্ত বেড়া তুলে ধরবে। ভেতরের বর্ম দিয়ে নিজেকে রক্ষা কর। খুব আত্ম-বিশ্লেষণ কর, আর পাকাপাকিভাবে মনে বাসা বাঁধবার আগেই মন্দ প্রভাবগুলিকে দূর করার চেষ্টা কর। যে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক সাধক হবে সে সর্বদা বিচার করে চলবে। তার কাছে এটা অভ্যাসে পরিণত হবে। তার মতিগতি সব সময়ে ঈশ্বরোন্মুখ হওয়া উচিত। শিশু-ক্যাঙ্গারুর মতো হতে শেখ। বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই শিশু-ক্যাঙ্গারু মায়ের থলেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদ এড়ায়। সেইরকম যখনই বিপদ আসবে, আমরাও যেন ঈশ্বরের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে শিখি।

## আত্মম্ভরিতারূপ বাধা

সঙ্কীর্ণ লোভী ক্রূর ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকেদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে,

ততই সকল মানুষের সততার ব্যাপারে আমাদের ভাসাভাসা আশাবাদে ভাঁটা পড়তে থাকবে। তাহলে আমরা ক্রমে আশাহত ও দোষদর্শী হয়ে পড়তে পারি। এ এক মহাবিপদ! কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে জগতে খুব ভাল, সাধু ও আধ্যাত্মিক লোকও আছে। সেই রকম লোকের সঙ্গ আমাদের খুঁজতে হবে। অধ্যাত্মসাধকদের উচিত পরস্পরের সঙ্গ করা বিশেষত সাধনার গোড়ার দিকে। অধ্যাত্ম পথের সহযাত্রীদের দরকার নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা পরস্পরের মধ্যে মিলিয়ে দেখে নেওয়া। শুধু তাই নয়, সাধুসন্ত আমাদের সংশোধন করে দিলে তাও মেনে নেওয়া উচিত। অন্যের দ্বারা সংশোধিত হতে আমরা চাই না। কিন্তু আমাদের নিজ দুর্বলতা আমরা নিজে নিজে ধরতে পারি না। অন্যে আমাদের ভুল দেখিয়ে দিলে, তা সঠিক মনোভাবে গ্রহণ করা উচিত।

আধ্যাত্মিক জীবনে অহংকার একটি বড় বাধা। কেবল সাধুসঙ্গেই বোঝা যায় আমরা কত বড় অহংকারী। সাধু সঙ্গই অহংকারের মহৌষধ। সেই জন্য ভারতে সাধু সন্তগণ অশেষ শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকেন। হিন্দুদের পুরাণগুলি সাধুসঙ্গের স্তুতিতে ভর্তি। কেবল যারা কোন জ্ঞানী মহাত্মার সেবা করার সুযোগ পেয়েছে তারাই জানে এইরকম সেবার মূল্য কি।

কখনো কখনো আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পথে একরকম স্বাস্থ্যহানিকর অন্তর্মুখীভাব গড়ে উঠতে পারে। সাধুসঙ্গের দ্বারা এগুলিকে এড়াতে হবে। যখন আমরা মনমরা হয়ে পড়ি, যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, তখন সাধুদের সঙ্গ ও তাঁদের সঙ্গে সদালাপ আমাদের প্রভূত সহায়তা করে। অসুস্থ মনের অন্তর্মুখী লোক আধ্যাত্মিক লোকের সংসর্গ এড়িয়ে চলতে চায়। আবার বিমর্ষ বহির্মুখী লোক সাধুসঙ্গ করে কেবল গল্প করে সময় কাটাবার জন্য। যাদের স্বভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ তারা পবিত্র হৃদয় অধ্যাত্মসাধকের সঙ্গ করে আনন্দ পায়, তাঁদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করে নিজেদের বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক উজ্জীবনকে আরও দৃঢ় করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করতে সর্বদা উৎসাহিত করতেন।

যখন আমরা সাধুসঙ্গ করি তখনও আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমাদের মানবিক সংস্পর্শের পেছনে একটা ঈশ্বরীয় সংস্পর্শ তথা ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ রয়েছে। আমাদের জানা উচিত যে ঈশ্বরই আমাদের অন্তর্যামী, আমাদের যোগসূত্র। এই ঈশ্বরের মাধ্যমেই আমরা সর্বদা অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করব। শিষ্যদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর ভালবাসা ছিল কিন্তু তা ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ঐক্যবোধ উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একদিন তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রকে বলেছিলেন,

'আমি তোকে ভালবাসি, তোর মধ্যে নারায়ণকে দেখি বলে।' তাঁর ভালবাসা সব দেহবোধ-বিবর্জিত ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে সম্পর্কিত।

## নিজ গুরুকে কিভাবে দেখবে?

যারা কোন জ্ঞানী মহাত্মার নির্দেশ পেয়েছেন, তাঁরা সত্যই কৃতার্থ। তথাপি, গুরুর সংসর্গ লাভ ও তাঁর কাছে কিছু উপদেশ পাওয়াই যথেষ্ট নয়। তাঁর আদেশগুলির ওপর দৃঢ় প্রত্যয় রেখে সেগুলির অনুসরণ দরকার। আবেগের সঙ্গে তাঁতে আসক্ত ও তাঁর বাহ্যরূপের ওপর আকৃষ্ট হলে চলবে না। প্রকৃত আচার্য চাইবেন যে শিষ্য তাঁর থেকে ঈশ্বরকে বেশি ভালবাসুক, আর তাঁকে ঈশ্বরের যন্ত্ররূপে দেখুক।

প্রকৃত *গুরু*, যিনি আমাদের কাছে সত্যের বিকাশ ঘটিয়ে দেন, তিনি আছেন আমাদের নিজ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আর তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নন। ঈশ্বরের বাণী প্রায়ই কোন ব্যক্তির মাধ্যমে আসে, তাঁকেই *গুরু* আখ্যা দেওয়া হয়। তাই ঈশ্বরকে *গুরুর গুরু* বলা হয়। বাহ্য *গুরুর* কাছ থেকে আমাদের বেশি কিছু আশা করা উচিত নয় বরং যিনি আন্তরগুরু, আমাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বর, সকল আত্মার আত্মা, তাঁর সুরে সুর মেলাতে এবং তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞান ও অনুপ্রেরণা লাভ করতে চেষ্টা করা উচিত। তোমার 'ইষ্ট'কে (যে পূত ব্যক্তিত্বকে তোমার সব থেকে ভাল লাগে তাকে) সব *গুরুর* গুরুরূপে দেখতে পার।

আচার্য ও ছাত্র উভয়কে যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠতে হবে। এটা তখনই সম্ভব হয় যখন আচার্য ছাত্রের ভেতর ঈশ্বরকে দেখেন, ছাত্রও আচার্যের মধ্যে ঈশ্বরানুভূতি করেন। একজন অপরজনকে মনুষ্যবুদ্ধি না করে ভগবৎতত্ত্বের বিকাশরূপে ভাববে, আর নিজেকেও তাই। এই হলো কার্যে পরিণত বেদান্তের সূত্রপাত; কালে এই ভাব সমস্ত বস্তুকে, সমস্ত জীবকে ব্যাপ্ত করে ফেলবে।

প্রভু আমার কাছে ভক্তরূপে আসেন, আমার উচিত সেই ভক্তদের মধ্যে তাদের ব্যক্তিত্বের চেয়ে তাঁর উপস্থিতিকেই বেশি করে দেখা। শিষ্যেরও উচিত যিনি এই বাণী বহন করে আনবেন তাঁর অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া, নিজের অন্তরসত্তা সম্বন্ধেও একই আচরণ করা উচিত। তখনই আধ্যাত্মিক শিক্ষা সফল হয় এবং সাধক সকলের মধ্যে একই ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

## ভারতে গুরুবাদ

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে ও অন্যান্য স্থানে গুরু বা আধ্যাত্মিক আচার্য

সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে আসছেন। হিন্দুশাস্ত্র তো এত দূর এগিয়ে যে সেখানে বলা হয় যে *গুরুই* ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এমনকি পরম ব্রহ্ম স্বয়ং।[৫] অধিকাংশ লোকই, কিন্তু ভুলে যায় যে এ কথা আধ্যাত্মিক দিক থেকে বলা হয়েছে দেহগত ভাবে নয়।

অধিকাংশ অধ্যাত্ম-সাধকের বিপদ হলো তারা নিজ দেহে ও ব্যক্তিত্বেই আত্মবুদ্ধি করে কোন একটি দেব বা দেবীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে এবং সেখানেই আবদ্ধ থেকে যায়। আর যদি তাদের কোন আধ্যাত্মিক আচার্য থাকেন তবে তারা সেই আচার্যের মূর্তি ও ব্যক্তিত্বকে ঘিরেও পড়ে থাকে। এটি আধ্যাত্মিকতার রঙে রাঙানো জড়ভাব ছাড়া আর কিছু নয়। সাধনের গোড়ায় এর যতই উপযোগিতা থাকুক না কেন, এই আধ্যাত্মিক জড়ভাব কাটিয়ে উঠতেই হবে; কিন্তু প্রশ্ন হলো—কি করে তা করা যায়?

অধ্যাত্ম-সাধনার পথে যে কেউ অগ্রসর হবে তাকে বুঝতে হবে, সাধক হলো একটি জীবাত্মা আর সাধ্য হলেন স্বয়ং পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ নন। জীবাত্মা যেন অনন্ত আত্মা পরমাত্মার অংশ এবং গুরু তাঁর সত্যস্বরূপে দিব্যভাবেরই প্রকাশ—যাঁর মাধ্যমে ভগবৎকৃপা, জ্ঞান, ভক্তি ও আনন্দের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। আমাদের কর্তব্য হলো ভক্ত, ইষ্টদেবতা ও গুরু যে প্রকৃতপক্ষে একই জ্ঞানাতীত আত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তি—এই সত্যটি কিভাবে উপলব্ধি করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া।

ধ্যানের পূর্বে প্রথমেই শরীরকে মন্দির বলে ভাবা যাক। এখন আমরা এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারি হৃদয়ের সিংহদ্বার দিয়ে এবং লক্ষ্য করতে পারি যে আমাদের হৃদয় সেই অনন্ত জ্যোতি ও অনন্ত চৈতন্যের স্বরূপ পরমাত্মার অংশ জীবাত্মার আলোক ও চেতনায় পূর্ণ হয়ে আছে। আমাদের শরীর, মন এবং সমগ্র জগৎকে এই অনন্ত সত্তায় বিলীন করে দিয়ে ভাবা যাক আমরা যেন অনন্ত জ্যোতি ও অনন্ত চৈতন্যের দ্বারা অনুস্যূত ও পরিব্যাপ্ত এক একটি ছোট ছোট আলোক ও চেতনার গোলক। যেহেতু এ ধরনের ধ্যান সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে, তাই মনে করা যাক আমাদের জীবাত্মা একটি শুদ্ধ মানস শরীর ও একটি শুদ্ধ জড় শরীররূপ আচ্ছাদন গ্রহণ করেছে, আর পরমাত্মা একদিকে *গুরু*-র রূপ ও অন্যদিকে *ইষ্টদেবতার* রূপ ধরেছেন। *গুরুকে* প্রণাম করে, আমাদের উচিত তাঁর ব্যক্তিভাবকে *ইষ্টদেবতায়* লীন করে *ইষ্টমন্ত্র* জপ করতে করতে ইষ্টদেব বা দেবীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া।

---

৫ *গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।*
*গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥*—স্কন্দপুরাণ, গুরুগীতা ১/৪৬

প্রথম ধাপ হলো *রূপ ধ্যান*—অর্থাৎ দেবতার সমগ্র জ্যোতির্ময় আনন্দোজ্জ্বল মূর্তির ধ্যান। তারপর *গুণ ধ্যান*—অর্থাৎ দেবতার অনন্ত সদ্‌গুণরাশির যেমন পবিত্রতা, জ্ঞান, ভক্তি ও আনন্দের ধ্যান। তৃতীয় এবং শেষ ধাপ হলো *স্বরূপ ধ্যান*—অর্থাৎ সর্বব্যাপী চৈতন্যের শুদ্ধ সত্ত্ব গুরু ও শিষ্য যাঁর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ তাঁর ধ্যান। ধ্যানের পূর্ববর্তী ধাপেও এই অনন্তত্বের পটভূমিকাটি যেন আমরা কখনো না ভুলি।

অধ্যাত্ম-সাধকের সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে—মানব রূপকে দেবমূর্তিরূপে পূজা এবং মানব ব্যক্তিত্বকে অন্ধভাবে পূজা করা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে প্রচণ্ড বাধা; এতে *গুরু* ও শিষ্য উভয়েরই ক্ষতি হয়। প্রকৃত আচার্য মুক্ত আত্মা এবং তিনি বিশেষভাবে দেখতে চান যে তাঁর সব শিষ্যই নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছে, স্ব স্ব দেবত্ব উপলব্ধি করছে ও বিশ্বতোমুখী মনোভাব গঠনে উদ্যোগী হয়ে নিজ নিজ সমস্যার সমাধান করছে। শিষ্যরা যদি *গুরুর* ব্যক্তিত্বকে আঁকড়ে থেকে প্রতি পদে তাঁর সাহায্য ও নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে, তিনি পিছুটান অনুভব করেন ও তিনি নিজে যে আধ্যাত্মিক শক্তি ও মুক্তি লাভ করে আনন্দের অধিকারী হয়েছেন তাদের সেই অবস্থায় অধিষ্ঠিত করার অক্ষমতা তিনি জানিয়ে দেন। অন্ধের মতো অনুগামী তাঁর এমন একাধিক শিষ্য অপেক্ষা বরং তিনি একজন মুক্ত আত্মাকে শিষ্যরূপে পেতে চাইবেন।

তাই কোন প্রাজ্ঞ ধর্মগুরু ভারতে ভক্তদের মধ্যে অত্যধিক প্রচলিত এই অন্ধের মতো ব্যক্তিগত সেবার নিন্দা করেন। অধিকাংশ শিষ্যই ভুলে যায় যে আদর্শ অনুসরণ করা ও তদনুসারে জীবনযাপন করা *গুরুর* দেহযন্ত্রের পরিচর্যা করা অপেক্ষা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের নিজেদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে আমরা বাইরের আচার্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল না হয়ে অন্তর্যামী *গুরুর* ওপরই বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে অধ্যাত্ম চেতনার কোন এক স্তরে উঠে সেখানে যেন অবশ্যই স্থিতি লাভ করতে পারি, তা *গুরু* সশরীরে বর্তমান থাকুন, অথবা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, 'এঘর থেকে ওঘর' অর্থাৎ স্থূল চেতনার স্তর থেকে সূক্ষ্ম চেতনার স্তরে গিয়ে থাকুন।

'*গুরু*'বাদের অতি প্রচলিত ধারায় পড়ে যাওয়ার বিপদ কাটিয়ে ওঠা যায় কেবল (পূর্বকথিত) নিরাকার অনন্ত আত্মার ধ্যান অভ্যাসে, যে আত্মা অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম ও অসীম আনন্দস্বরূপ। আবার যখন ব্যক্তিত্বের স্তরে ফিরে আসি, তখনও আমাদের উচিত আত্মার ওপর বেশি আস্থা রাখা, সাকারের ওপর নয়। আত্ম-

প্রবঞ্চনা এড়াবার জন্য অসীম আত্মায় সব সাকার ভাবকে লয় করে তাঁর ধ্যান করা এবং বারংবার অভ্যাসের মাধ্যমে পরম চেতনায় স্থিতি লাভ করতে চেষ্টা করা ভাল। এতে শুধু শিষ্যকেই নয়, আচার্যকেও চরম মুক্তি ও শান্তি লাভে সহায়তা করা হবে।

## প্রবুদ্ধ আশীর্বাদ

সাধুসঙ্গের দ্বারা সুপ্ত *সুসংস্কারগুলি* উদ্বুদ্ধ হয় এবং মন্দ সংস্কারগুলি বাধা পায়। ভাগবতে এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি আছে ঃ

'পবিত্র ঋষিরাই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধিকারক। পবিত্র বারি প্রভৃতির দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধন সময় সাপেক্ষ কিন্তু পবিত্র মানব ক্ষণেকের মধ্যে অন্যকে কলুষমুক্ত করতে পারেন। এই পবিত্র মানবগণই তীর্থস্থানগুলিকে তীর্থে পরিণত করেছেন। তাঁরা তাঁদের হৃদয়-কন্দরে ঈশ্বরকে (ঈশ্বরানুভূতি) বহন করেন।' [৪]

ভাগবতে আছে, বৃন্দাবনের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাব সম্বন্ধে প্রথমে অজ্ঞ ছিল। তারা তাঁর দেহ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে দয়িতরূপে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করত। কিন্তু দিব্য রাখালটির সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হলো। স্থূল ভোগবাসনা ত্যাগ করে তারা শ্রীকৃষ্ণের পূত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করতে লাগল এবং কালে তাঁরই কৃপায় তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্মেষ হলো। [৫]

তুমি যদি কোন প্রবুদ্ধ আত্মার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আস, তবে তোমার উপলব্ধি হবে যে তোমার ওপর ঈশ্বর-কৃপার ধারাবর্ষণ হচ্ছে। সে কৃপা যে কোন দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে—হয়তো বা চিরতরে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিতীয়বার সে সৌভাগ্য লাভ নাও করতে পার। *'বিবেকচূড়ামণি'*তে শঙ্করাচার্য বলেছেন ঃ 'মনুষ্য জন্ম, মুমুক্ষা ও জ্ঞানিপুরুষের সঙ্গ লাভ অতীব দুর্লভ—ঈশ্বরানুকম্পা ছাড়া।' [৬]

প্রবুদ্ধ আত্মার সঙ্গলাভ অমূল্য সম্পদ কিন্তু অতি দুর্লভ। ঐ মহাপুরুষদের অপার ভালবাসার কথা তুমি জান না। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকজন সন্তানের দর্শন লাভ করেছি। তাঁরা সদাই আমাদের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন—কিভাবে আমাদের সাহায্য করবেন, কিভাবেই বা আমাদের সঠিক পথে চালিত করবেন। এই ভালবাসার কোন প্রতিদান নেই। এ অতি অদ্ভুত! কেউ কখনো এর প্রতিদান

---

৪ *শ্রীমদ্ভাগবতম্* ১০/৪৮/৩১; ১/১৩/১০

৫ তদেব, ১১/১২/১৩

৬ শঙ্করাচার্য, *বিবেকচূড়ামণি*, ৩ (প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য)

দিতে পারে না। কোন দিনই এর প্রতিদান দেওয়া যাবে না। কেবল এই হলো ভালবাসা—যাতে কোন দরাদরি নেই, যা প্রতিদানে কিছুই চায় না, কেবলই দিয়ে যায়, দিয়েই যায় কখনোই কিছু ফিরে নেয় না।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের (বিবেকানন্দের) সাহায্যের জন্য এক ধনী ব্যক্তিকে বলেন, কারণ নরেন তখন খুব কষ্টে পড়েছিল—বাড়িতে দুমুঠো অন্নও জুটছিল না। নরেন রুষ্ট হয়ে *গুরুকে* বলে, 'আপনি কেন আমার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার অন্যদের কাছে বলেন?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'হ্যারে, তুই কি দেখছিস না যে তোর জন্যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষেও করতে পারি?' এই হলো প্রকৃত ভালবাসা, এ জিনিস আমরা নিজেরা তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকবার দেখেছি—আমাদের 'সাধনা'র কালে। এ ভালবাসা আশীর্বাদস্বরূপ। এ ভালবাসা, আর সাধারণ সংসার জীবনের সম্পর্কে যাকে আমরা ভালবাসা নাম দিয়ে থাকি, এ দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত কারণ সাংসারিক ভালবাসা বস্তুত কোন না কোন উপায়ে স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস মাত্র। প্রকৃত ভালবাসা একেবারেই অন্যরকম। জ্ঞানদীপ্ত মহাপুরুষদের সংস্পর্শে না এলে তা ঠিক বুঝা যায় না।

ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী আত্মা কিন্তু এটি আমাদের সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তাঁর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে হবে। তখনই তাঁর শক্তি আমাদের মাধ্যমে কাজ করবে। জ্ঞানদীপ্ত মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে এরকমটি হয়ে থাকে। তাঁরা অন্যের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে স্পর্শ করলেন, অমনি ঐ যুবক অতীন্দ্রিয় চেতনার আভাস পেয়ে গেলেন। পরে নরেন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দরূপে অন্যের মধ্যেও এই পরিবর্তন এনেছেন। তিনি যখন মাদ্রাজের গণিতের তরুণ অধ্যাপক 'কিডি'কে স্পর্শ করেন, তখনই তার মধ্যে এক পরিবর্তন ঘটে যায়। তার নিরীশ্বরভাব দূর হয় ও সে একনিষ্ঠভাবে স্বামীজী ও বেদান্তের অনুগামী হয়ে পড়ে। এইরূপ শুদ্ধ পুরুষগণ শক্তিকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যুৎবাহী তারের মতো কাজ করেন। তাঁরা সব সময়েই ঈশ্বরের সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত। তাঁদের সসীম ব্যক্তিত্ব সব সময়ে অসীমের সঙ্গে সংস্পর্শযুক্তই থাকে। বিদ্যুৎবাহী তারের ছোঁয়ায় যেমন তোমার ভীষণ ধাক্কা (সক্) লাগে, তেমনি এই সব শুদ্ধ আত্মার স্পর্শে তাঁদের অন্তরস্থিত ঈশ্বরকেই স্পর্শ করা হয়। যীশুখ্রীস্ট যে বলেছিলেন, 'যে আমাকে দেখে সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকেই দেখে।'[৭]

নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যেই যেন সেই অনন্ত ঈশ্বর শুদ্ধ পুরুষদের দেহ ও

---

৭ *Bible*, St. John, 12 : 45 and 14 : 9

মন অবলম্বনে একটি পথ করে নিয়েছেন। যে কেউ কোন শুদ্ধ পুরুষের সংস্পর্শে আসে ও তিনি যা দেন তা গ্রহণে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বরেরই সংস্পর্শে আসে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় হলো এই যে পাবার জন্য তৈরি থাকতে হবে—তাঁর স্পর্শ অনুভব করবার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। তা না হলে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'সাধুর কমণ্ডলু চারধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে।'[৮] সাধুর কাছে যাবার সময় তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণোন্মুখ উপযুক্ত মন নিয়ে যেতে হয়। ঈশ্বর আমাদের সাধুসঙ্গ করার সুযোগ দেন কিন্তু আমাদের মন যদি খোলা না হয়, আমরা যদি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত না হই—তবে আমাদের কিছুই হবে না। সাধুসঙ্গকে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে তা তোমাদের শিখতে হবে। সাধুসঙ্গ থেকে তোমরা কিভাবে উপকৃত হতে পার তা তোমাদের জানতে হবে। যদি কোন সাধুর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখ, আর তোমার সব সমস্যার সমাধানের ভার তাঁর কাছে ছেড়ে দাও, তবে তিনি তোমার জন্য যা করা প্রয়োজন তা করবেন। তিনি তোমাকে সঠিকপথেই পরিচালনা করবেন। কিন্তু এর জন্য চাই তোমার সম্পূর্ণ আস্থা। 'দ্বিধাগ্রস্ত টমাসে'র মতো হলে চলবে না।

## নিজ ইষ্টের সঙ্গ

যদি তোমার মনকে সদা ঈশ্বরের সুরে বেঁধে রাখতে পার তবে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন নাও হতে পারে। অন্যথায়, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সাধুসঙ্গের সুযোগ না হলে কি করা যাবে? *ইষ্ট দেবতার*, তাঁর শুদ্ধ সাকার রূপের ধ্যান কর, তাঁরই সঙ্গ কর। *ইষ্টের* সঙ্গে কথা বলতে শেখ। যখনই তুমি সাধুসঙ্গের প্রয়োজন বোধ করবে ঈশ্বরের চিন্তা কর—তাঁর নাম জপ কর। তিনিই আমাদের পেছনে সর্ব শক্তির ধারক হয়ে রয়েছেন, তাঁকে বাদ দিলে আমাদের কোন অস্তিত্বই থাকে না। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা। এই অন্তরাত্মার সঙ্গে সংযোগসাধনের চেষ্টা কর। যখন তুমি এগিয়ে চলবে তোমার হৃদয়-গুহায় আসীন হয়ে তোমার ইষ্টদেবতা যেন তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তোমার চলার পথে তিনি যেন তোমার সঙ্গী হয়ে সব রকম হানি থেকে তোমাকে রক্ষা করেন এবং তুমি যেখানেই থাক তোমার অন্তঃকরণকে যেন শান্তিতে ভরে রাখেন। কোন অবস্থাতেই তাঁকে ভুলো না।

একলা থাকার এক সহজাত ভীতি সকলের মধ্যেই যেন আছে বলে মনে হয়।

৮ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১০৮

কোন রকম একটা সঙ্গী তাদের সর্বদা দরকার। লোকে অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপে আগ্রহী, আবার অন্যকেও কথা বলায়। এই প্রবণতার প্রধান কারণ হলো নিজের ক্ষুদ্র সত্তাকে (ছোট 'আমি'কে) আঁকড়ে থাকা। অহংত্ব হলো নানা ভাব, স্মৃতি ও উত্তেজনার এক গুচ্ছ, তাই এর কোন রকম একটা অবলম্বন চাই। সাধারণত লোকে অন্য লোকেদের সমর্থনকে অবলম্বন করে অহংত্ব বজায় রাখতে চায়। কিন্তু যারা অন্তর থেকে নিজ ব্যক্তিত্বকে (সত্তাকে) একটি পূর্ণ রূপ দিতে সমর্থ হয়েছে তাদের আর বাহ্য অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। তাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের ভরকেন্দ্র পুরাপুরি অন্তরেই থাকে। মানুষের জানা শ্রেষ্ঠ সমন্বয়ী শক্তি হলো মহত্তর আত্মা (পরমাত্মা)। শান্তিতে থাকবার জন্য এর ওর কাছে ছুটাছুটি করার প্রয়োজন নেই।

একলাই শান্তিতে থাক। কেবল একলা থাকলেই তুমি ভগবৎ সঙ্গ আরো স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারবে। ঈশ্বরের সঙ্গে একলা থাক। অন্তর দেবতার সঙ্গই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এ বিষয়ে একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

*হে প্রভু! তুমি আমার মাতা, তুমি আমার পিতা;*
*তুমিই আমার আত্মীয়, আমার বন্ধু;*
*তুমিই আমার বিদ্যা, আমার ধন;*
*তুমিই আমার সব।*[৯]

বুদ্ধের উপদেশ স্মরণ কর ঃ 'গণ্ডারের মতো একলা স্বাধীনভাবে বিচরণ কর।' এই ভাবটি ভাগবতের একটি অংশে 'উদ্ধব গীতা'য় সরল গল্পের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে—যাতে রয়েছে একটি কুমারী মেয়ের কয়েকজন পুরুষ অতিথিকে নিজ গৃহে আপ্যায়নের কথা। ভাত রাঁধবার মতো চাল বাড়িতে তৈরি ছিল না, তাই সে ধান ভাঙতে শুরু করল। কিন্তু তার হাতের চুড়িগুলি খুব শব্দ করায় সে ভাবল এতে তার পরিবারের দারিদ্র্য প্রতারিত হবে। তাই কেবল দু-হাতে একটি করে চুড়ি রেখে বাকিগুলি সে এক এক করে খুলে ফেলল। একটি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, এই সব দেখে নীতি শিক্ষা পেল ঃ

**বহুলোক একত্রে বাস করলে ঝগড়া হয়, এমনকি দুজন থাকলেও তারা কথা কইতে পারে। তাই এই কুমারীর চুড়ির মতো একলা থাকবে।**[১০]

যখন তুমি একলা থাকবে, শ্রীরামকৃষ্ণের পছন্দ মতো এই সুন্দর বাংলা গানটি

---

৯ *ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।*
*ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব॥* —স্বামী যতীশ্বরানন্দ, Universal Prayers, Madras Sri Ramakrishna Math, 1977, Verse 210

১০ *বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্তা দ্বয়োরপি।*
*এক এব চরেত্তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ॥* —শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/৯/১০

নিজে নিজে গাইবে ঃ

*'নাথ! তুমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার;*
*নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার॥*
*তুমি সুখ শান্তি, সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য, জ্ঞান বুদ্ধি বল,*
*তুমি বাসগৃহ, আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার॥*
*তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,*
*তুমি শাস্ত্রবিধি গুরুকল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার॥*
*তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমি হে উপাস্য,*
*দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি)॥'*[১১]

---

১১ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১৬৯-৭০

# দশম পরিচ্ছেদ

# ত্যাগ ও অনাসক্তি

## ত্যাগ প্রয়োজন

এটা সত্যি খুবই আশ্চর্য যে এত কষ্ট পেয়েও লোকের চৈতন্য হয় না, তবু সব রকম মিথ্যা পরিচয়কেই আঁকড়ে থাকে। সারা বিশ্ব কাম-কাঞ্চনে বদ্ধ। লোকে একেই জীবনের উদ্দেশ্য বলে ধরে আর পরিশেষে দুঃখ পায়। নিজ নিজ ও অন্যের দেহের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে আমরা যত রকমের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি ও অশেষ দুঃখ-দুর্দশা সৃজন করি। অবশ্য অনেকে এর মাধ্যমেই জাগতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পে যেমন আছে, কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে, তবু সে তা যেমন খাচ্ছিল খেয়েই যায়।[১] কিন্তু আধ্যাত্মিক পথের সাধক এভাবে বাঁচতে পারে না। সে নিজের উদ্দেশ্যকে উচ্চতর স্তরে ধরে রাখে ও জাগতিক বন্ধনের মধ্যে হারিয়ে যেতে চায় না। সুতরাং সে গভীর ভাবে ত্যাগ ও অনাসক্তির কথা ভাবতে আরম্ভ করে।

সব ধর্মেই আধ্যাত্মিক জীবনের মূল ভাবই হলো ত্যাগ। সব ধর্মশাস্ত্রে ও সব খাঁটি অধ্যাত্ম সাধকই—সম্পদ ও তার প্রতি লোভ, কাম ও কামাসক্তি এবং অহংবোধ—এই তিনরকম ত্যাগের ওপর জোর দিয়েছেন। ত্যাগ ছাড়া কোন অধ্যাত্ম জীবন গড়ে উঠতে পারে না। আর ত্যাগ মানে কেবল বাহ্যিক ত্যাগ নয়, মনের ত্যাগও চাই। নিজের ও অন্যের দেহ-মনের প্রতি আমাদের সব আসক্তি ত্যাগ করে সব দিক থেকে ঠিক ঠিক নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত হতে হবে। কেবল কোন কোন ব্যক্তি বা জিনিসের ক্ষেত্রে এভাব এল আর অন্য সবের প্রতি আসক্তি থেকেই গেল তা যথেষ্ট হলো না। যে সব ব্যক্তি বা বস্তুকে আমরা পছন্দ করি না তাদের পরিহার করে ত্যাগ করছি বলা খুবই সোজা। প্রকৃত ত্যাগ হলো সবের প্রতি আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন।

ত্যাগের দরকার কি? কেন আমরা এত বীতস্পৃহা ও অনাসক্তি অভ্যাস করব? যেসব বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গ সাধকের সহায়ক নয়, সেই সব পুরাতন সঙ্গ ত্যাগ না

---

১ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১১৫

করলে আধ্যাত্মিক সাধনায় সাফল্য অর্জন করা যায় না। আমাদের বাসনা-কামনা ও অন্যের প্রতি আমাদের প্রীতি বা ঘৃণা প্রসূত আকর্ষণ বা বিকর্ষণ আমরা যতটা ত্যাগ করতে প্রস্তুত প্রকৃত ধর্মানুশীলনে আমরা ততটাই সাফল্য অর্জন এবং উন্নতি করতে পারি। এ বিষয়ে তোমার মন যেন কখনো ভ্রান্ত পথে তোমাকে না নিয়ে যায়। মন সব সময়ে এটা ওটা সম্ভাব্য যুক্তি দেখিয়ে বোঝাবে যে আমরা এ জিনিস বা ও জিনিস ত্যাগ করতে পারি না বা এই এই লোকের সঙ্গ আমাদের করা উচিত অথবা ঐ পুরুষ বা নারী প্রভৃতির সঙ্গে বাক্যালাপ করা আমাদের কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে মনকে কখনো বিশ্বাস করবে না। মন সব সময়ে আমাদের প্রতারণা করতে চেষ্টা করে—অবচেতন বা অচেতন বাসনা কামনার হয়ে কথা বলে। সেজন্য আমাদের শুধু জপ, প্রার্থনা, ধ্যান ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়, ত্যাগেরও প্রয়োজন। বস্তুত জপ ধ্যানে ততটা ফলই পাওয়া যাবে, খাঁটি ত্যাগ ও অনাসক্তিতে আমাদের সাফল্য যত বেশি বেশি হবে। যখন আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও ত্যাগ একযোগে কাজ করে তখনই সম্ভব হয় মনকে সংযত করা এবং যুগ যুগ ধরে বহু জন্মে সঞ্চিত নানা গ্লানি দিয়ে ভর্তি মনের কোণ ও ছিদ্রগুলিকে পরিষ্কার করা।

অতিরিক্ত সংসারাসক্তি আগুনের মতো, এতে হৃদয় দগ্ধ হয়ে যায়। ফলে আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন বিষয়ে মানুষ নির্মম ও উদাসীন হয়ে যায়। সংসারাসক্ত লোক অধ্যাত্ম জীবনের আনন্দ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না। সংসারী লোকেদের স্বাভাবিক বোধশক্তি এতই নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে, সূক্ষ্মতর স্পন্দনগুলি তার মনে আর কোন সংবেদনা জাগাতে পারে না। আধ্যাত্মিক সত্যগুলি সম্বন্ধে তার কোন ধারণা থাকে না, সে কেবল তার বাসনা ও ভোগেচ্ছার কর্দমে গড়াগড়ি দিতেই থাকে।

## ভালবাসা ও আসক্তি

আমাদের ভালবাসার বস্তুগুলি বা ব্যক্তিগণই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে আসক্তি, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ভালবাসা আর বিদ্বেষ কেবল একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ, এ বিষয়ে বুঝতে কখনো ভুল করো না। সুতরাং তারা একই পর্যায়ের। ঘৃণা বা বিদ্বেষ হলো ভালবাসা বা আসক্তির উল্টো দিক। এগুলি মূলত ভিন্ন জিনিস নয়। সব রকম আসক্তি ও সব রকম ভয় থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে—আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থেকে বীতস্পৃহ ও মুক্ত হয়ে। আমরা আসক্ত না হয়েই দয়াপ্রবণ হব। কারো প্রতি বা কারো ভালবাসার প্রতি কোন ব্যক্তিগত দাবি যেন আমাদের না থাকে কিংবা আমাদের ওপর বা আমাদের প্রীতির ওপর অন্য কারও ব্যক্তিগত দাবিরও যেন আমরা প্রশ্রয় না দি।

আমরা অবশ্যই একমাত্র ঈশ্বরকেই ভালবাসব এবং অন্যকেও তা করতে দেব। যীশু বলেন, 'যে পিতামাতাকে আমার থেকে বেশি ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়; যে পুত্র-কন্যাকে আমার থেকে বেশি ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়।'[২] এর থেকে বেশি সত্য আর কিছুই নেই। এবং এও সত্য যে অপরে তাকে ঈশ্বর অপেক্ষা বেশি ভালবাসুক যে এরূপ চায়, সেও ঈশ্বরের যোগ্য নয় এবং সে কখনো ঈশ্বরলাভে সফল হবে না—বহু চেষ্টা সত্ত্বেও। আমরা যেমন বীজ বপন করব তেমনই ফসল পাব এবং যতদিন এই সব পছন্দ-অপছন্দকে তথাকথিত ভালবাসার শেকলে আমাদের ও অন্যদের বাঁধতে সুযোগ দেব, ততদিন আমরা ক্রীতদাস হয়ে থেকে নিজেদের ও অন্যদের ওপর অশেষ দুঃখ টেনে আনব। আমাদের আসক্তির জন্যই আমরা শাস্তি পেয়ে থাকি। কোন ক্ষেত্রে শীঘ্র, কোন ক্ষেত্রে দেরিতে তা আসে, কিন্তু সকলকেই নিজ নিজ ভুলের মাসুল দিতেই হয়।

যখন লোকে আমাদের ভালবাসে, আমরা প্রশংসিত বোধ করি। আমরা চাই লোকে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হোক, আমরা চাই অন্যে আমাদের ভোগের সামগ্রীর মতো ভালবাসুক। কিন্তু আমরা সাধারণত এত বেশি আবেগপ্রবণ ও চিন্তালেশহীন যে, এতে যে কেবল আমাদের ও অন্যের দুঃখদুর্দশাই টেনে আনছি এবং আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে, তা বুঝতে পারি না। আমাদের মর্যাদাসম্পন্ন হতে ও যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের এমন ভাব অবলম্বন করে চলতে হবে যে অন্যে যেন অন্যায় ভাবে আমাদের কাছে অগ্রসর হতে সাহস না করে। নারীদের আমি এবিষয়ে বিশেষ করে বলছি। অধ্যাত্ম জীবনে পশ্চিমী ধাঁচে রমণীদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের স্থান নেই।

ভক্তেরা ও অধ্যাত্ম সাধকগণ আমাদেরই লোক কারণ আমরা সকলে চিরন্তন ঈশ্বরীয় প্রেমের সমসূত্রে বাঁধা। আধ্যাত্মিক সতীর্থদের প্রতি ভালবাসা সাংসারিক ভালবাসার থেকে বহুগুণ প্রগাঢ় ও কল্যাণপ্রদ। যীশুখ্রীস্টের শিষ্যদের মধ্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখ। তাঁদের মধ্যে কি কোমল হৃদয়ের প্রেম, কি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার ভাবই না ছিল! অল্প বয়সে আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্যদের সান্নিধ্যে আসি, আমরাও তখন তাঁদের সেই তীব্র অথচ শুদ্ধ স্বার্থলেশহীন ভালবাসায় সিক্ত হয়ে গভীরভাবে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। একমাত্র আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের পক্ষেই অন্যের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা থাকা সম্ভব। সাংসারিক ব্যক্তিদের লৌকিক ভালবাসা প্রায়ই স্বার্থসিদ্ধির মার্জিত প্রকাশ মাত্র।

---

২ *Bible*, St. Mathew, 10:37

জ্ঞানদীপ্ত পুরুষেরা কারও প্রতি আসক্ত না হয়ে, সকলকেই সমভাবে ভালবাসেন কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছেন সেই সত্যটি, যা নিহিত আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই ঘোষণায় ঃ

—হে প্রিয়ে, পতির জন্যই যে পতি (জায়ার কাছে) প্রিয় হন, তা নয়; (পত্নীর) আত্মপ্রয়োজনেই পতি প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, পত্নীর জন্যই যে পত্নী (পতির কাছে) প্রিয় হন, তা নয়; (পতির) আত্মপ্রয়োজনেই পত্নী প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, পুত্রদিগের জন্যই যে পুত্রগণ (পিতামাতার কাছে) প্রিয় হয়, তা নয়; (পিতামাতার) আত্ম-প্রয়োজনেই পুত্রগণ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয়, তা নয়; আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়।[৩]

জ্ঞানী পুরুষদের জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে ত্যাগ ও অনাসক্তি মানে সহানুভূতিশূন্যতা বা উদাসীনতা নয়। সহানুভূতিহীনতা অনাসক্তি নয়; এ ভাব স্বার্থপরতা বা অহংবোধে জড়িয়ে থাকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। যতটা সামর্থ্যে কুলায় ততটা পরের সাহায্য করতে চেষ্টা কর, তবে তাদের প্রতি কোন আসক্তি যাতে না আসে সে বিষয়ে সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করে। যদি তা না পার, তবে পরের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। যদি তুমি আন্তরিকভাবে ও গভীরভাবে প্রার্থনা কর, তবে দেখবে যাদের তুমি সাহায্য করতে চাইছ তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছে গেছে। কিন্তু মনে রেখো, যদি পরের জন্য প্রার্থনা করতে চাও, তবে তোমাকে ঈশ্বরসান্নিধ্য-বোধে দৃঢ় হতে হবে। যদি তুমি অন্যের প্রতি আসক্তি ত্যাগ না করতে পার, তুমি বরং তাদের সাহায্যে এগিয়ে যেও না। তোমার পক্ষে প্রার্থনার পথ নেওয়াই ভাল। বাস্তবিকই প্রত্যেক একনিষ্ঠ সাধকের অবশ্য কর্তব্য হলো তার দৈনন্দিন অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে এই রকম পরহিতে প্রার্থনা করা।

সংসারজীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তরণের সময় তুমি হয়তো সাময়িকভাবে অন্যের প্রতি একটু উদাসীন হয়ে পড়তে পার। নিজেদের রক্ষা করার জন্য, আমরা উদাসীন মনোভাব গড়ে তুলতেও পারি, কিন্তু তা স্বল্প সময়ের জন্যই। যদি তুমি ঈশ্বরোপলব্ধির আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে পার আর শুদ্ধ জীবন যাপন করতে পার, কিছুদিন পরে দেখবে অন্যের প্রতি তোমার পূর্ব ভালবাসা ফিরে আসছে আরও শুদ্ধ ও সূক্ষ্মভাবে, কেবল এতে আসক্তি নির্মূল হয়ে প্রগাঢ় ঈশ্বর প্রেমে পর্যবসিত হয়েছে। তুমি তখন অন্যকে ভালবাস ঈশ্বরের জন্য, কোন

---

৩ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।... ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২/৪/৫; ৪/৫/৬

স্বার্থের জন্য নয়। এই হলো প্রকৃত ভালবাসা। আমাদের দুটি বিপদ থেকে দূরে থাকতে হবে ঃ মানবীয় প্রেমে অন্যকে ভালবেসে তাকেই *ঈশ্বর প্রেম* বলে ভ্রমে পড়া; আর সঠিক ভাবগুলির প্রতিও অতি উদাসীন হয়ে কর্তব্য কর্মে অবহেলা করা। দুটিই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর।

## প্রকৃত আত্মীয়

কারা তোমার প্রকৃত আত্মীয় ? শঙ্কর একটি স্তোত্রে বলেছেন, *বান্ধবাঃ শিব-ভক্তাশ্চ* [৪] অর্থাৎ শিবের ভক্তেরাই আমার আত্মীয়। প্রায়ই দেখা যায় আমরা যাদের প্রিয় ও নিকট বলে মনে করি তারা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তারা একটা চিন্তা জগতে বাস করে, আর আমরা বাস করি অন্য জগতে। যারা আধ্যাত্মিক পথের একনিষ্ঠ সাধক আর সাধনায় দ্রুত উন্নতি করতে আগ্রহী, তাদের নিজ গৃহেই বিদেশীর বেশে থাকতে শিখতে হবে। যদি তোমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সজ্জন ও অধ্যাত্ম-মুখী হয়, তুমি তাদের সঙ্গে মিশতে পার। কিন্তু যদি তারা বিষয়ী ও অধ্যাত্ম-ভাবহীন হয় আর তোমাকেও তাদের দলে টানার চেষ্টা করে—তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। তুমি যদি এগিয়ে যেতে চাও, আর অন্যরা শুয়ে থাকতে চায়, তবে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

যারা বাড়িতে বিষয়ী অধ্যাত্ম-ভাবহীন আত্মীয়দের সঙ্গে বাস করে, তাদের উচিত পান্থশালায় পথিকের মতো থাকা। তারা যেন অবশ্যই কর্তৃত্বভাব ছেড়ে অছির মনোভাব নিয়ে থাকে। অন্যের ওপর আবেগভরা দাবি কখনো করবে না। তারা তোমার সম্পত্তি নয়। যদি কিছু তোমার থাকে, জেনো তুমি সেটুকু রক্ষণাবেক্ষণ করতেই নিযুক্ত, তার অধিকারী নও—শাসন করতে হয় কর ঈশ্বরের অছিরূপে।

তোমার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে একটা সত্য ধারণা মনে আনতে শেখ। আসক্তি ও ইন্দ্রিয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা-জড়িত নিছক মানবিক ভালবাসা ও ঘৃণার পূর্বতন সম্পর্ক থেকে মনকে মুক্ত কর; কেবল তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধনা সম্ভব। তার পূর্বে যা কিছু করা যায় তা কেবল অধ্যাত্ম সাধনার প্রচেষ্টা মাত্র। ছেলেবেলায় আমি খুব আবেগপ্রবণ ছিলাম। মাত্র দু-এক দিনের আলাপেই মানুষের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়তাম। আমার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের স্নেহ-ভালবাসায় বিহ্বল হয়ে তাঁদের কথা খুব ভাবতাম। শেষে এ সব হৃদয়াবেগ আর বরদাস্ত করতে না পেরে নিজে শক্ত হয়ে ঠিক করলাম ঃ 'এ ভাব বদলাতেই হবে।' তখন আমি নৈর্ব্যক্তিক ভাবের দিকে বেশি করে ঝুঁকলাম। সকলের অন্তরে যিনি রয়েছেন

---

৪ *অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্*, ১২

একমাত্র সেই পরমাত্মার চিন্তার মাধ্যমেই আমাদের মানুষের প্রতি আসক্তি শিথিল হতে পারে। এই চিন্তা মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেলে এটাই বাস্তব বলে মনে হবে—প্রত্যক্ষ ও নিত্য বোধ হবে। অন্য লোকেদের সম্বন্ধে তোমার সব চিন্তা আজ না হয় কাল যখন বুদ্বুদের মতো ফেটে বেরিয়ে যাবে, তখন এই পরমাত্ম-চিন্তা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

## ঘৃণা আসক্তির মতোই নিন্দনীয়

ঘৃণা আসক্তির মতোই নিন্দনীয়, প্রকৃতপক্ষে একই জিনিস। আসক্তি আর ঘৃণা একই মুদ্রার দুটি পিঠ, আগে যেমন বলেছি। একটি অপরটির থেকে ভাল এরকম ভেবে নিজে বিভ্রান্ত হয়ো না। দুটিই বেড়ি, মানুষকে অবনতির পথে নিয়ে যায়, তাকে তার প্রকৃত স্বরূপে উঠতে বাধা দেয়। দুটিই একেবারে বর্জনীয়।

ক্রোধের কথা ধরা যাক, আমরা কেন ক্রোধের বশবর্তী হই? এর একমাত্র কারণ কোন লোক বা কোন জিনিস আমার মনোনীত ভোগ্যবস্তুটির প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করছে। এইটিই আমাদের সবরকম ক্রোধের একমাত্র কারণ। আমরা সব সময়েই দেখি নিজের অহংভাবের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার বা অত্যধিক ব্যক্তিত্ববোধের সঙ্গে ক্রোধের খুবই নিকট সম্বন্ধ। এই অত্যধিক অহংভাব এবং শারীরিক ও মানসিক ভোগের অসম-স্পৃহা ছাড়া আমাদের অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্রেক হতে পারে না। সুতরাং এই অহংভাব, এই ভোগেচ্ছাই আমাদের ক্রোধের একমাত্র কারণ। আমাদের ভোগেচ্ছা যদি না থাকে, যদি আমরা কারও কাছে কোন জিনিস আশা না করি বরং প্রতিদানের আশা ছাড়াই দান ও কাজ করে থাকি, তবে কখনই আমাদের অন্তরে ক্রোধের উদ্রেক হবে না। তাই আমাদের উচিত ক্রোধের ওপরই ক্রোধ করা, অন্যের ওপর নয়। ইন্দ্রিয় ভোগের ওপরই আমাদের প্রবল ক্রোধ হওয়া দরকার, ভোগ্য বস্তুর ওপর নয়। এর একমাত্র কার্যকর উপায় হলো ক্রোধের উদ্‌গতির সাধন করা, এবং কালে ক্রোধকে একেবারে নির্মূল করা। ক্রোধ ও তার সঙ্গে জড়িত অন্য দোষগুলি বহুলাংশে নির্মূল করতে না পারলে আমরা অধ্যাত্মজীবনে একটুও উন্নতি লাভ করতে পারব না। কাম ও ক্রোধ এ দুটি আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবলতম শত্রু। অতএব সাধকদের উচিত হবে যত্ন সহকারে এদের বর্জন করা।

এইরূপে দেখা যায়, যেখানেই ক্রোধ সেখানেই কিছু না কিছু আসক্তি, কোন কিছুর ওপর অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা বা অনুরাগ রয়েছে। সত্যিই কোন ব্যক্তি বা জিনিসের ওপর আসক্তি না থাকলে কোন রকম ক্রোধের উদ্রেক হতে পারে না।

কেবলমাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা ব্যাহত হলেই ক্রোধ সমুপস্থিত হয়। একথা স্থূলভাবের চেয়ে সূক্ষ্মভাবেই বোঝার চেষ্টা করা উচিত। তবে যেকোন ক্রোধের মূলে যে স্থূলতর আকাঙ্ক্ষা অপরিহার্যভাবে থাকবেই তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

কোন কোন লোক ত্যাগ-ব্রত পালন করার সময় আগ্রাসী মনোভাবগ্রস্ত হয়ে ওঠে। কারণ আসক্তির টান শিথিল হলে, বিদ্বেষের টান জোরদার হয়ে ওঠে। বহু আধ্যাত্মিক সাধক সাধনার গোড়ার দিকে সহজেই বিরক্ত এবং একটুতেই রেগে ওঠে। ত্যাগ-ব্রতে উৎসাহহীন প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়াই এর কারণ। বাইরের ত্যাগ হলেই যে ভেতরে অনাসক্তি আসবে তা সব সময় ঠিক নয়। বাইরে ত্যাগের সঙ্গে ভেতরের আসক্তির দ্বন্দ্ব হলেই মানসিক উত্তেজনা সৃষ্ট হয়। প্রকৃত ত্যাগে আসক্তি ও দ্বেষ উভয়েরই ত্যাগ হবে।

আমরা যখন প্রকৃত ত্যাগব্রত পালন করতে শুরু করি তখনই আমরা ধারণা করতে পারি যে পূর্বে আমরা কি হতভাগ্য জীবনই না যাপন করছিলাম। আমাদের আরও ধারণা হবে যে পূর্বজীবনের সংস্কারের প্রভাবই বর্তমানের বৃহত্তম বাধা। এ থেকেই মনস্তাপ ও অনুশোচনা আসে। কিছুটা কল্যাণকর ও মানবোচিত আত্ম-সমালোচনা করা যেতে পারে কিন্তু তা যেন কখনই ধ্বংসমূলক না হয় বা নেতিবাচক আবেগ প্রবণতায় শেষ না হয়। কখনো বলবে না, 'আমি কী পাপী, কত অধম জীব!' পরন্তু বলতে শেখ, 'আমি পূর্বে ভুল করে থাকলেও, সেদিন শেষ হয়ে গেছে। আমাকে জানতে হবে আমি কি ভুল করেছিলাম কিন্তু তাই নিয়ে যেন নিরাশ মনে শুধু ভেবেই না যাই। আমি যেন জীবনপঞ্জীর নতুন পাতা উলটে ভবিষ্যতে ভাল কাজ করি, আমি যেন ভবিষ্যতে চারিদিকে চোখ রাখি, মানুষের মতো মানুষ হতে শিখি, জন্তুর মতো নয়।' এই হলো ঠিক পথ। তুমি যুবাই হও আর বৃদ্ধই হও, তোমাকে অধ্যাত্ম জীবনে নতুন জন্ম নিতেই হবে, সত্যস্বরূপের দিকে যাত্রা শুরু করতেই হবে।

## প্রথমে সাবধানতা চাই

গোড়ার দিকে আধ্যাত্মিক অনুশীলন থেকে, ভাল মন্দ দুরকম ফল পাওয়া যায়। বাগানে সুষ্ঠভাবে জল সেচন করলে তুমি যেমন সুন্দর সুরভিযুক্ত গোলাপ পাবে তেমনি একই সঙ্গে প্রচুর আগাছাও জন্মাবে। তাই তোমাকে অনবরত আগাছা সাফ করার কাজ করে যেতে হবে। ত্যাগ-ব্রত হলো অন্তরের জঙ্গলকে নিরন্তর পরিষ্কার রাখার পদ্ধতি।

কখনো কখনো আমাদের অন্তরে ত্যাগের একটি বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে, কিন্তু

আমরা আবার তার ওপর সংসারের আবর্জনা জমা করতে থাকি যতক্ষণ না ঐ বহ্নিশিখা নিভে যায়। সংসারের প্রতি ভালবাসা, ঈশ্বর লাভের জন্য আমাদের যেটুকু অনুভূতি ও উৎসাহ আছে তাকে নিভিয়ে দেয়। ত্যাগ ও অনাসক্তির এই বহ্নিকে সর্বদা জ্বালিয়ে রাখতে হবে, কারণ দেহ-মনের নানা মন্দ সংসর্গ এবং আমাদের অশুদ্ধ মনের সব বহির্মুখীন প্রবণতাগুলির দ্বারা ঐ অগ্নি স্তিমিত হয়ে যাবার সব রকম সম্ভাবনা রয়েছে। শুরুতে অনাসক্তি যেন একটি চারা গাছ, যাকে চারদিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে সবরকম প্রবল ঝড় ও তুষারপাত থেকে রক্ষা করতে হবে; তা না হলে চারাটি বড় হয়ে শক্ত গাছে পরিণত হতে পারবে না—যাকে কোন ঝড়েই নড়াতে পারবে না। যখন আমরা সব ব্যক্তিগত সম্পর্ক, প্রতিক্রিয়া ও আসক্তি থেকে মুক্ত হব তখন আমরা আমাদের মধ্যে ত্যাগের বিশাল বহ্নি জ্বালাতে সমর্থ হব এবং সংসার থেকে মুক্ত হব।

আমরা অনাসক্তভাবে সুসমঞ্জস চিন্তা করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছি কারণ আমরা আমাদের মনকে শুদ্ধ ও নির্মল রাখার পরিবর্তে নানা রকমের অপ্রয়োজনীয় ও অশুদ্ধ চিন্তায় ভরিয়ে ফেলেছি। আমাদের মনগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে এবং তাই আমরা সর্বদা পীড়াদায়ক অসন্তোষে ভুগছি। আমাদের অসংখ্য পরিকল্পনার মধ্যে ভাল পরিকল্পনাও আছে, কিন্তু সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় এবং স্বতন্ত্রভাবে ও অনাসক্ত হয়ে চিন্তা করার সামর্থ্য নেই। প্রায়ই দেখা যায় যে আমাদের মনে একই চিন্তা বারবার আনাগোনা করছে, কিন্তু সে সবই নিরর্থক। যদি তুমি মনকে সংযত করতে চাও তোমাকে পর পর কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলা পালন করে চলতে হবে। প্রথমে তোমার আধ্যাত্মিক উপাসনার সময় নির্দিষ্ট কর এবং যথাসম্ভব নিভৃত জীবন যাপন কর। বিনা বিচারে অন্যের সঙ্গে মিশবে না। তোমার মনে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চিন্তাপ্রবাহ উঠছে তারা পরস্পর পরস্পরকে প্রশমিত করে দিচ্ছে; এদের থেকে নিজেকে মুক্ত কর। অন্যথায় তুমি কখনই মনের সুসমঞ্জস ও অনাসক্ত অবস্থা বজায় রাখতে পারবে না। আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে অনাসক্তি—যথার্থ অনাসক্তি সবিশেষ প্রয়োজন। বিষয়গুলি যেমন আছে তেমনি অবস্থায় তাদের সামনা-সামনি হতে হবে—আমার যেমনটি চাই সেরকম অবস্থায় নয়।

## প্রকৃত ত্যাগই ঈশ্বরানুরাগ

অধ্যাত্ম জীবনে ত্যাগ ও অনাসক্তিকে অবশ্যই ঈশ্বরপ্রীতির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। পরেরটির তীব্রতা বৃদ্ধি না করে আগেরটির তীব্রতা বৃদ্ধি করায় অনেকের অধ্যাত্মজীবন কষ্টকর হয়েছে। তীব্র ঈশ্বরপ্রীতি যুক্ত হলে ত্যাগের পথে অধ্যাত্মজীবন এক অতীব আনন্দের অভিযান হয়ে ওঠে। ঈশ্বরপ্রেমে সব

জিনিস সফল হয়ে ওঠে। তাই যে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসে, বাস্তবিকই তার পক্ষে পথ পরিহারের কিছু নেই, আছে কেবল সাফল্য লাভের পরিপূর্ণতা। প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতি মানব সাধারণের প্রতি প্রীতিতে প্রকাশ পায়, কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রীতিতে নয়। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমরা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে পারি, তবে আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসবে, কারণ এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সব রকম বাধা ভেঙ্গে দেয়, সব বন্ধন ছিন্ন করে দেয়। কর্মের প্রবণতাই জীবাত্মাকে নানা ভাবে বেঁধে বেড়ি দিয়ে আটকে ফেলে। কিন্তু আমরা যদি কর্মের সব ফল ঈশ্বরে অর্পণ করি, এই কর্মই বাধাগুলিকে ভেঙ্গে ফেলবে আর বন্ধনগুলিকে কেটে ফেলবে। তখন আমরা কেবল তাঁর হাতের যন্ত্রে পরিণত হব এবং আমাদের কর্তৃত্ববোধ চলে যাবে। মঠে, সংসারে, সর্বোপরি আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য আসন আমাদের অবশ্যই পেতে রাখতে হবে।

প্রকৃত ত্যাগ মানেই হলো অন্তরটিকে সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাবে ভরিয়ে রাখা। সাধারণত আমাদের মন বাসনা ও ভোগাকাঙ্ক্ষায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, আর যতটা এই ভার থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব, তত বেশি আমরা এই দিব্য আলোক অন্তরে অনুভব করতে পারব। আমাদের জ্ঞান দেহ-কেন্দ্রিক না হয়ে ঈশ্বর-কেন্দ্রিক যাতে হয়, সে চেষ্টা আমাদের করা উচিত। তখন আমরা দেখব আমাদের ও অন্য সকলেরই ঈশ্বরের মধ্যে স্থান রয়েছে।

## বৃথা আশা—পিঙ্গলার উপাখ্যান

*ভাগবতে* পিঙ্গলা নামে এক গণিকার উপাখ্যান আছে, সে অত্যন্ত অর্থলোভী ছিল। একদিন তার কাছে কেউ না আসায় সে নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

এই অর্থের আশায় বসে থেকে থেকে যখন তার মুখশ্রী তুবড়ে গেল, আর উৎসাহও একেবারে কমে গেল, তখন এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে তার নিজের ওপর বিরক্তি আসার ফলে সে সুখী হলো।[৫]

সে সত্যই একজন সৌভাগ্যবতী নারী ছিল। খুব কম লোকেরই তার মতো স্বাভাবিক বোধশক্তি ফিরে আসে। তারা একই ভুল বারবার করতে থাকে। অতীত সংস্কারের বশে তারা বার বার একই নোংরা অভিজ্ঞতা পেতে থাকে। মদীয় *গুরু* স্বামী ব্রহ্মানন্দ একসময় বলেছিলেন ঃ

> **তিন শ্রেণীর লোক আছে। প্রথম শ্রেণী অন্যের ভুল ও অভিজ্ঞতা দেখে শেখে এবং ঝামেলা এড়িয়ে চলে। মধ্যম শ্রেণী নিজে একটা ভুল করে তা থেকে**

---

৫ *শ্রীমদ্ভাগবতম্* ঃ ১১/৮/২৭

অভিজ্ঞতা লাভ করে শেখে। অধম শ্রেণী বার বার ভুল করে অভিজ্ঞতা লাভ করেও শেখে না।

সাংসারিক কোন ব্যাপারে আশা পোষণ করবে না, কেবল ঈশ্বরের জন্যই আশা আকাঙ্ক্ষা থাক। একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকেই জীবাত্মা আনন্দ পেতে পার। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সব কিছুর ওপর আমাদের এক রকম বিরক্তি বোধ আসা উচিত। সাংসারিক ব্যাপারের প্রতি আমাদের প্রকৃত অনাসক্তির এই হলো প্রথম নিদর্শন। ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও তার স্থূল বা সূক্ষ্ম ভোগে আসক্তিহীন না হলে কোন অধ্যাত্মজীবন বা উন্নততর প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। অধ্যাত্মজীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে অনাসক্তিই হবে আমাদের প্রধান গুণ।

প্রকৃতপক্ষে আমরা বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার মিথ্যা আশা নিয়েই বেঁচে থাকি। এ থেকে দুঃখ, বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্বই আমরা পেয়ে থাকি। আশা ছেড়ে দিলেই আমাদের সুখ বোধ হয়। আমাদের দেখা উচিত, একমাত্র যেন ঈশ্বরীয় বিষয়েই আমাদের আশা বলে কিছু থাকে। উত্তেজনা ও বাসনার সঙ্গে জড়িত অন্য সব আশা ত্যাগ করা উচিত। সাধারণত আমাদের আশাগুলি বাসনা বা অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল। আমরা ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে আশা করি না।

ঈশ্বর আত্মার আত্মারূপে আমাদের অন্তরে বিরাজমান। কিন্তু আমরা তাঁর দিকে না তাকিয়ে অন্যের ওপর নির্ভর করতে চেষ্টা করি। ঈশ্বরই সকল আনন্দের উৎস। বাহ্য বস্তুগুলি এই অপরিমিত ঈশ্বরীয় আনন্দের সামান্যই প্রতিফলিত করে। বাহ্য বস্তুর পেছনে ছোটা মানে প্রতিফলন ও ছায়ার পেছনে ছোটা।

মহাভারতে (ভাগবতেও) রাজা যযাতির উপাখ্যানে আছে, কোন অভিশাপের ফলে রাজা উদ্ভিন্ন যৌবনেই হঠাৎ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি তাঁর পুত্রের কাছ থেকে তার যৌবন ধার নিয়ে কয়েকশত বৎসর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেন। এমনকি এই দীর্ঘকাল ভোগের পরেও তিনি দেখলেন তাঁর ভোগের নিবৃত্তি হয়নি। তিনি তখন এই মীমাংসায় এলেন : ভোগেচ্ছা কখনই ভোগের দ্বারা প্রশমিত হয় না। এতে কামনা বাড়তেই থাকে ও ক্রমে তীব্রতর হয়, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তা আরও বেশি জ্বলে ওঠে।[৬]

ত্যাগের ভাব একদিন না একদিন আমাদের আসবেই। পিঙ্গলার ক্ষেত্রে যেমন হঠাৎ পরিবর্তন এসেছিল, সকলের ক্ষেত্রে সেই রকম হঠাৎ নাও আসতে পারে। কিন্তু আমরা যেন যযাতির মতো নির্বোধ হয়ে আমাদের সকল কামনা চরিতার্থ

৬ *ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।*
*হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।* —শ্রীমদ্ভাগবতম্ : ৯.১৯.৪ ও মনুস্মৃতি : ২.৯৪

হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করি। যদি আধ্যাত্মিক জীবন থেকে কিছু লাভ করতে চাই তবে অনাসক্তি যেন অবশ্যই আমাদের প্রধান গুণ হয়। পূর্ব সংস্কারবশেই নানা উত্তেজনা আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তা বলে অসহায়ের মতো এদের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হবে এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। এদের অবশ্যই দাবিয়ে রাখতে হবে এবং আমরা তা পারব, যদিও এতে হয়তো সাময়িকভাবে আমাদের অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হবে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে হবে। একদিন না একদিন আমাদের উত্তেজনাপূর্ণ জীবনকে থামিয়ে দিতেই হবে। তবে তা এখনই নয় কেন?

প্রকৃতপক্ষে আমরা কি করতে যাচ্ছি সে বিষয়ে যেন আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকে, আর আমরা যেন সর্বদা সাবধান থাকি পাছে—সূক্ষ্ম ভাবাবেগ ও কামনাগুলি আমাদের দিয়ে আমাদের অকরণীয় কাজগুলি করিয়ে নিতে না পারে। আমরা যদি লোকের সঙ্গে মিশতে চাই, তবে দেখতে হবে কেন আমরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি। আমরা যদি কিছু করতে চাই, তবে কেন আমরা ঐ কাজটি করতে চাই তা আমাদের জানতে হবে—জানতে হবে আমাদের ঐ চাওয়ার পেছনে উদ্দেশ্যটি কি। আমাদের কামনার মূলীভূত কারণকে অন্বেষণ করে তাকে তখনই সেখানে বিনাশ করতে হবে। সমস্ত ক্ষতিকর ভাব ও সঙ্গ তথা সবকিছু যা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী সে সব কিছু দূর করতে হবে। প্রকৃত অনাসক্তি ও ত্যাগ, সবরকম আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ক্ষেত্রেই অবশ্য পালনীয়। একে বাদ দিয়ে আমরা আধ্যাত্মিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিশেষ কিছু করতে পারব না।

এতে সময় লাগতে পারে, তবে আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করার আগেই আমাদের ত্যাগের ভাবটি থাকা উচিত। পবিত্রতার জন্য সঠিক আর্তি ও এষণা বিশেষ প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করতে এটিই সর্বনিম্ন আবশ্যকতা। এটি বিশেষ আয়াসসাধ্য। ইন্দ্রিয়-সংযম ও উত্তেজনা দমন করতে সাধককে কঠিন সংগ্রাম চালাতে হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যেক সাধককে এই প্রাথমিক স্তরটি অতিক্রম করতেই হবে। ত্যাগভাব হলো সব রকম প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধনার মূল ভিত্তি। এই অনাসক্তিভাব না থাকলে আমাদের অধ্যাত্মজীবনের কথা না ভাবাই ভাল। সময় কাটাবার জন্য অন্য কোন বিষয় অবলম্বন করাই সেক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ।

## বিরক্তি বোধ

জীবনের ভুল যখন বোঝা যায় তখন জাগতিক ভোগের প্রতি প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো বিরক্তি। পিঙ্গলার দেহের প্রতি যে বিরক্তিবোধ এসেছিল, তা সাধারণ মানুষের সংসারজীবনের শেষে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া আসে সেই রকম। কেবল পাপ বোধ

থেকে যে রূপান্তরের সূচনা হয়, এই প্রতিক্রিয়া তার থেকে পূর্ণতর রূপান্তরের ইঙ্গিত করে। যে তার পাপের কথা নিয়েই মনে মনে চিন্তাগ্রস্ত থাকে, সে তখনো পাপেই আসক্ত থাকতে পারে। কিন্তু বিরক্তি বোধ মানবকে তৎক্ষণাৎ সংসারজীবন থেকে অধ্যাত্মজীবনের দিকে ফেরায়। যে অধ্যাত্মজীবনের দিকে ফিরেছে সে নিশ্চয়ই পিঙ্গলার মতো নিজেকে বলতে পারবে ঃ

আমি ছাড়া আর কে এই শরীরকে নিয়ে দম্ভ করবে—যে শরীর কেবল মেরুদণ্ড, পাঁজর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে গড়া হাড়ের খাঁচা মাত্র (যেমন কুটির নির্মাণের দণ্ড, আড়া আর খুঁটি), যাকে চামড়া, চুল ও নখ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, যার ন-টি বাইরে বেরুবার দরজা আছে এবং যা ক্লেদে পূর্ণ? [৭]

নিজ শরীরের ওপর বিরক্তিবোধবশত আমরা অধ্যাত্ম জীবনের দিকে ফিরেছি কি না তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারি। এই বিরক্তি বোধ এসে থাকলে, স্ত্রী বা পুরুষ অন্য কোন শরীরই আর আমাদের আকর্ষণ করতে পারবে না। সেগুলি আর আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে চোরা গর্তের মতো হবে না। পতঞ্জলি 'যোগসূত্রে' বলেছেন ঃ বাহ্য ও অন্তরশুচি পালিত হলে, নিজ শরীরের প্রতি বিতৃষ্ণা হয় এবং অন্য শরীরের সংসর্গের প্রতিও বিরক্তি আসে। [৮]

আমরা যত বেশি বেশি অন্তর্দর্শী হব, আমাদের মন তত মানসিক এক্সরে যন্ত্রের মতো হয়ে যাবে আর আমরা পারিপার্শ্বিক জীবনধারা সম্বন্ধে তত গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করব। প্রথমে বিরক্তিবোধ আসে। তারপর আসবে মনুষ্য শরীরের সব নোংরা ও ময়লার পেছনে যে আত্মা আছেন তাঁর গৌরব সম্বন্ধে সচেতনতা। আত্মার প্রকৃত উপলব্ধি আরও অনেক পরে হয়, কিন্তু এই তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা গোড়ার দিকেও হতে পারে।

বুদ্ধিগত ধারণাই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়াও চাই। জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তীব্র বিরক্তি আমাদের সত্য সত্যই অনুভব করতে হবে। ভর্তৃহরির সঙ্গে আমাদেরও অনুভূতি হওয়া চাই যে ঃ ভোগ্যবস্তু ভোগ করা হয়নি, কিন্তু আমরা ভুক্ত হয়েছি; তপশ্চর্যাদি করা হয়নি, কিন্তু আমরা ক্লিষ্ট হয়েছি; কাল অন্তর্হিত হয়নি, কিন্তু আমরা অন্তর্হিত হচ্ছি; বাসনার ক্ষয় হয়নি, কিন্তু আমরা ক্ষীণ হচ্ছি।[৯]

---

৭ *শ্রীমদ্ভাগবতম্*, ১১/৮/৩৩

৮ *শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।* —যোগসূত্র, ২/৪০

৯ *ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।*
*কালো ন যাতো বয়মেব যাতাঃ তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥* —ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্, ৭

## সাধু-সন্তদিগের দৃষ্টান্ত

সাধু-সন্তদের জীবন থেকে আমরা নিষ্কাম হওয়ার অভ্যাস শিক্ষা করতে পারি। লালা বাবার কথাই ধরা যাক। তিনি ঊনবিংশ শতকে বাংলার একজন প্রখ্যাত বৈষ্ণব সন্ত ছিলেন। মধ্য বয়স পর্যন্ত তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। একদিন বাড়ি ফিরবার পথে তাঁর কানে এল, এক রজকের ছোট্ট মেয়েটি তার বাবাকে বলছে, 'বাবা বেলা যে বয়ে গেল, কখন *বাসনায়* আগুন দেবে?' বাংলা ভাষায় *বাসনা* কথাটির দু-টি অর্থ হয়। এক অর্থে কলাগাছের পেটো (খোলা), যাকে শুকিয়ে পুড়িয়ে সেই ছাই রজকেরা আগেকার কালে সাবানের বদলে ব্যবহার করত। অন্য অর্থে মনের চাপা স্মৃতি বা *সংস্কার* বোঝায়। লালা বাবা বালিকার কথাটি দ্বিতীয় অর্থেই নিয়েছিলেন। লালা বাবার হঠাৎ খেয়াল হলো, তাঁর বয়স বাড়ছে কিন্তু তখনো তিনি তাঁর পুরান অশুদ্ধ সংস্কারগুলি নাশ করতে পারেননি। তৎক্ষণাৎ তিনি সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন।

উত্তর ভারতের মহান সন্ত কবি তুলসীদাস আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে আসার আগে স্ত্রীর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। তিনি এতদূর মোহগ্রস্ত ছিলেন, যে একবার যখন তাঁর স্ত্রী পিতামাতাকে দেখতে গেছেন, তুলসীদাস একদিনের ছাড়াছাড়িও সহ্য করতে পারলেন না। সেই রাত্রেই দৌড়ে স্ত্রীর কাছে পৌঁছুলেন। তখন তাঁর স্ত্রী খুব ধমক দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমার শরীরের ওপর তোমার যত আবেগভরা আসক্তি শুধু সেইটুকু দিয়েও যদি ভগবানকে ভালবাসতে, তবে নিশ্চয়ই তোমার ভগবান লাভ হতো।' এই কথা কটি তার আত্মার ওপর থেকে অজ্ঞানের পরদাটিকে টুকরো টুকরো করে দিল, আর তুলসীদাস তৎক্ষণাৎ সর্বস্ব, মায় তাঁর স্ত্রীকে সুদ্ধ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জীবনের পথ ধরলেন।

## ত্যাগের রকমফের

সাধু-সন্তদের জীবনে অনাসক্তি ও করুণার তীব্রতা কিছুটা আমাদের জীবনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দরকার। সহসা এই সম্পূর্ণ ত্যাগের যে দৃষ্টান্তগুলি আগে দেওয়া হলো তা কদাচিৎই ঘটে থাকে। বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই এই ত্যাগাভ্যাস কেবল সাময়িক হয়ে থাকে, এমনকি জীবনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েও। তাদের মধ্যে অনেকেই আরও বেশি করে 'কাম-কাঞ্চনে' জড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের ভালবাসার পুতুল-নাচে মানুষ-পুতুল হয়ে যায়। তখন তারা বলে, 'ও হো! অধ্যাত্মজীবন কি আমরা তা জানি। আমরা নিজেরা কিছুদিন ঐ পথে চলেছিলাম। দেখেছি ওতে যত কষ্ট করতে হয়, তাতে মজুরি পোষায় না। এই সব মানবিক

সম্পর্ক নিয়ে সংসার জীবন যাপনই শ্রেয়। পারস্পরিক প্রয়োজন সিদ্ধিই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।' এ সব কথা দুর্বলতা ও হতবুদ্ধির চিহ্ন।

ত্যাগ তিনরকমের ঃ

১। মিথ্যা ত্যাগ ঃ যাতে মানুষ বাহ্যত কর্মত্যাগ করলেও অন্তরে জাগতিক বস্তু ও ভোগসুখের জন্য তীব্র লালসা পোষণ করে।

২। আন্তরিক ত্যাগ ঃ যাতে প্রকৃত অধ্যাত্ম সাধক ইচ্ছাশক্তির সহায়ে ত্যাগবৃত্তি রক্ষা করে, কিন্তু তখনও সে সত্যদৃষ্টি লাভে ধন্য হয়নি।

৩। প্রকৃত ত্যাগ ঃ উপলব্ধিবান পুরুষেরই তা হয়, যার সব দ্বন্দ্ব ও উদ্বেগ চিরতরে শান্ত হয়ে গেছে।

একটি সুপরিচিত শ্লোকে আছে ঃ ভোগে রোগ ভয় আছে, সমাজে কুলখ্যাতিতে দুর্নামের ভয় আছে, সম্পদ থাকলে রাজার কাছ থেকে ভয় আছে, মানসম্ভ্রম থাকলে মর্যাদাহানির ভয় আছে, বলবানের শত্রুভয় আছে, রূপবানের জরাভয় আছে, পাণ্ডিত্যে মতখণ্ডনের ভয় আছে, সদগুণীর কুৎসা ভয় আছে, জীবনে মরণভয় আছে। প্রকৃতপক্ষে সংসারে প্রতিটি জিনিসই ভয়ের সঙ্গে জড়িত। একমাত্র ত্যাগই আমাদের ভয়শূন্যতার পথে নিয়ে যায়।[১০]

## অন্তরের অনাসক্তি

কেবল বস্তুময় সংসার ত্যাগেই চিন্তায়, কথায় ও কাজে শুদ্ধ হওয়া যায় না। প্রথমে মন্দ কাজ, পরে মন্দ চিন্তা থেকে দূরে থাক—অবশ্য দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা কঠিনতর। বদ চিন্তার থেকে বদ অভ্যাস ত্যাগ সহজসাধ্য। চিন্তায় শুদ্ধিলাভ সব থেকে কঠিন। এরকম হয় যতদিন আমরা আপেক্ষিক নৈতিকতার স্তরে থাকি, তখন ভাল-মন্দ দুই-ই বাস্তব—কিন্তু আমরা মন্দটিকে বাদ দিয়ে ভালটিকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করি। পুরান প্রবণতা ও স্মৃতির দরুন, মন্দও আসতে চায় এবং কখন কখন ঢুকেও পড়ে। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এর জায়গায় সৎচিন্তা আনতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এইরকম দড়ি টানাটানি অনিবার্য। একটু অগ্রসর হবার পরই কেবল এই সংগ্রাম সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়—তখন আমাদের ভাল-মন্দের স্থূল ও অসংস্কৃত অবস্থা থেকে ওপরে উঠে তাদের সূক্ষ্মতর অবস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়।

অসৎ বন্ধুর সংসর্গ অতি সহজেই ছাড়া যায়। সাংসারিক ব্যক্তির সঙ্গ ও বৈষয়িক

---

১০ *ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥*
—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্য শতকম্, ৩১

কথাবার্তাও সহজে বর্জন করা যায়, কিন্তু সংসারের পুরান বন্ধুর ও তাদের সংসর্গজাত অশুদ্ধ চিন্তা অন্তরের সংসর্গ থেকে সরিয়ে ফেলা অতি কঠিনতর ও অতীব কষ্টকর। তাহলে কি করা যাবে? বর্জিত বন্ধুদের বাহ্য বাস্তব সংসর্গ অপেক্ষা তাদের বিষয়ে অন্তরের সংসর্গ আরো বেশি ক্ষতিকারক। প্রথমত দৃঢ়তার সঙ্গে পুরান সঙ্গীদের একেবারে ত্যাগ কর এবং বাহ্য জগতের নতুন কোন উদ্দীপন থেকে দূরে থাক। তারপর কিছু আত্মসমালোচনা কর। দেখ পুরান স্মৃতি তোমার মনে কোন্ পথে উদয় হয়। ক্রমাগত বিচার করে সমস্ত পুরান ছবির চিন্তা থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল। সর্বদা, মনে শক্তিশালী উপায়ের ইঙ্গিত নিয়ে এসে এই আসক্তি ও ঘৃণায় জর্জরিত জীবনের জঘন্যতা সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয়ে এস। এইভাবে স্তূপীকৃত সব ময়লা সরাতে থাক, আর সাবধান থাক যেন নতুন করে ময়লা না জমে। দেখবে তোমার মন ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছে।

স্থূল ও সূক্ষ্মস্তরে এই সংগ্রাম চালাবার সময় আমাদের যথাসম্ভব সৎ (ইষ্টনাম-রূপের) চিন্তায় মনকে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা, আর অসৎ চিন্তা দূর করার চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু সময়ে সময়ে কল্পনাশক্তি যেন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ও অশুদ্ধ চিত্রগুলি জ্বলজ্বল করে ওঠে, আর আমরা তা বহু চেষ্টাতেও সরাতে পারি না। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত *ইষ্ট মন্ত্র* জপের সঙ্গে নিজেকে অসৎ চিন্তার সাক্ষী বা দর্শকের আসনে বসিয়ে ঐ চিন্তা বন্ধন থেকে সরিয়ে নেওয়া। বিস্মৃতির মুহূর্তগুলিতে আমরা অসৎ চিন্তার সঙ্গে সামিল হয়ে পড়ি ও মন্দ কাজ না করেও আমাদের দেহ-মনকে ঐ চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত বোধ করি। যেমনই হোক, আমরা যত বেশি সতর্ক হব, অনাসক্তি অভ্যাস করব, ততই চিন্তাগুলি আমাদের সামনে প্রকাশ পাবার আগেই তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারব। উচ্চস্তরের এই অনাসক্তি, জীবাত্মার এই অন্তরের অনাসক্তি, অধ্যাত্মসাধকগণের প্রভূত সহায়তা করে। যখন তারা যথার্থই প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করে তখন এই অনাসক্তি হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত।

কোন কোন অবস্থায় মনে মন্দ চিন্তার উদয়কে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় না, কিন্তু অনুশীলনের মাধ্যমে এ অবস্থাকে মরীচিকার মতো মনে করা যায়, যার অবাস্তব প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের আগে থেকেই ধারণা রয়েছে। এ রকম ঘটনা একেবারে বন্ধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু একে এমন ঘটনা ভাববে যাকে সত্য মনে হলেও তার আসল প্রকৃতি হলো অবাস্তব।

নাম-রূপাত্মক ঘটনাবলীর অবাস্তবতা ও তার সঙ্গে আমাদের মিথ্যা সম্পর্ক সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে হলে—এর পেছনে বিরাজমান সেই ঈশ্বরকে দেখার চেষ্টা করতেই হবে। যখন আমরা সব রূপের পেছনে ঐশ্বরিক সত্তার ধারণা করতে

সক্ষম হব তখন সত্যিই আমরা তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারব। এই চেষ্টার সময় এদের কিছু না কিছু প্রভাব আমাদের ওপর পড়ছে মনে হতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে অযথা চিন্তা করতে নেই বরং যত বেশি সম্ভব ঈশ্বর চিন্তায় মনকে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা কর।

## সংসার বৃক্ষ

হিন্দু শাস্ত্রে সংসারকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জগৎ প্রপঞ্চকে একটি গাছ, বা সংসার-বৃক্ষরূপে ভাবনা এক প্রাচীন কল্পনা। ভাগবতে (১১.১২.২২) এর বর্ণনা এই রকম ঃ

> **এর দুটি বীজ, একশত শিকড়, তিনটি গুঁড়ি; পাঁচটি মূল শাখা এবং এগারটি উপশাখা; এর থেকে পাঁচ রকমের রস বেরোয়; এতে দুটি পাখির বাসা আছে; এটির মাথা সূর্যে গিয়ে ঠেকেছে, এর বল্কলের তিনটি স্তর এবং গাছটির দুরকম ফল হয়।**[১১]

এই বৃক্ষটি অণু-বিশ্ব ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দুই-এরই প্রতীক হতে পারে। কেউ যদি এই বৃক্ষ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করে তবে সে এর বাইরে যেতে পারে। নিজেদের সম্বন্ধে এবং জগতের সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হবে। এই বৃক্ষটি ঈশ্বরীয় শক্তির বিশাল ভিত্তির ওপরেই বৃদ্ধি পায়। ব্যষ্টি ও বিরাটের সংযোগ আবিষ্কার করতে হলে মনকে অবশ্যই উচ্চতর স্তরে তুলতে হবে।

গাছের শিকড়গুলি অসংখ্য বাসনা ও আবেগের প্রতীক। আমাদের সব দুঃখ কষ্টের মূল কারণ নিহিত এই বাসনায়, নিজ স্বাতন্ত্র্যে-র প্রতি এই আসক্তিতে, এই ইন্দ্রিয়ভোগ তৃষ্ণায়। ভক্তি ও নিষ্কাম সেবাই আমাদের মূলের বন্ধন ছেদ করতে সহায়তা করে।

সব শিকড়গুলি যদি কেটে ফেলা হয়, তবে গাছটি পড়ে যাবে। কিন্তু তা কদাচিৎ ঘটে থাকে। আমরা বড়জোর আমাদের বাসনার একটু অংশমাত্র নাশ করতে পারি। গাছটি বাকি শিকড়গুলির সাহায্যে বেঁচে থাকে। বাসনার সমস্ত মূল উৎপাটন করা সহজ নয়।

কিন্তু এতে আমরা যেন হতাশ না হয়ে পড়ি। যদি আমাদের আধ্যাত্মিক

১১ শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/১২/২২

শ্লোকে উক্ত দুটি বীজ হলো পাপ ও পুণ্য। অসংখ্য কামনা হলো শিকড়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ হলো এর গুঁড়ি। মাটি, জল, বাতাস, অগ্নি ও আকাশ এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান হলো শাখা এবং দশ ইন্দ্রিয় ও মন হলো এর এগারটি প্রশাখা। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হলো রস। জীবাত্মা ও পরমাত্মা হলো দুটি পাখি। স্নায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুসমূহ হলো তিন বল্কল স্তর। সুখ ও দুঃখ দুই ফল।

অনুশীলনাদি আমাদের নিম্ন প্রকৃতিকে বেশি করে প্রকাশ করে দেয় ভোগাকাঙ্ক্ষার মূলগুলিকে বেশি করে উন্মোচিত করে, আমাদের তাতে নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। বহু অসৎস্মৃতি ও সহজাত প্রবৃত্তি অবচেতন মনের গভীরে চাপা থাকে। আমাদের অজান্তেই তারা বেশ দীর্ঘকাল সেখানে রয়েছে। যদি তারা কখনো বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে, তাদের আবিষ্কার করেছি বলে আমাদের খুশিই হওয়া উচিত। আমাদের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা আমাদের উপলব্ধি করা উচিত এবং ধীরে ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের দুর্দশার প্রতিকারের উপায় বার করতে হবে। তা না করে যদি আমরা ঐ চিন্তাগুলি লুকোতে চেষ্টা করি, আর মনে করতে থাকি সেগুলি যেন নেই—তবে আমরা কেবল নিজেদেরই প্রতারণা করব। এতে আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধাই সৃষ্টি করব। নিজের কাছে সম্পূর্ণ খুলাখুলি হওয়া খুবই শক্ত। কিন্তু বাস্তবিকই খোলা মন হওয়া সব সময়েই উন্নতির চিহ্ন। যদি আমরা নিজের কাছেও নিজ দোষ স্বীকার করতে না চাই, তবে জীবনের সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়ার সাহস আমাদের কিভাবে আসবে? অবচেতন মনে কিছু চিন্তাকে লুকিয়ে রাখলেই সমস্যার সমাধান হলো না; এরকম চিন্তা করে আমরা বরং নিজেদেরই বোকা বানাই।

খ্রীস্ট ধর্মে দোষ স্বীকারের পদ্ধতিতে অবচেতন মনের চিন্তাগুলিকে বার করে দিলে এ সমস্যার আংশিক সমাধান হয়। কিন্তু এতে সব সময়ে সফল হওয়া যায় না, কারণ আধ্যাত্মিক সংযমের অভাবে মানবের অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকশিত হয় না। উপরন্তু এই পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মাত্রাধিক্য প্রায়ই নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে।

আর এক উপায় হলো, যখনই অবচেতন মনের আধেয়গুলি স্ফুটাকারে উথলে ওঠে তখনই তাকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা। তুমি ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে পার তোমার পূর্ব স্মৃতির প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের জন্য। প্রার্থনা অবচেতন মনকে পরিষ্কার করবার একটি শক্তিশালী উপায় হতে পারে। মনে নিম্নমানের চিন্তা উঠলে ভয় পেয়ো না। অন্য নৈবেদ্যের মতো সেগুলিকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর। অবশ্য, ঈশ্বরের ওপর যাদের খুব দৃঢ় বিশ্বাস তাদের পক্ষেই এমনটা করা সম্ভব।

আর এক উপায় আছে, হয়তো সেইটিই শ্রেষ্ঠ উপায়। তা হলো, যতই ভীতিপ্রদ হোক যা কিছু মনে উদয় হচ্ছে তার সাক্ষিস্বরূপ হয়ে থাক। প্রথমেই মন্দ উত্তেজনা বা ভাবটিকে চিনতে ও তার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে না পারলে বাস্তবিকই আমরা তা থেকে কখনই মুক্ত হতে পারব না। যদি শত শত অশুদ্ধ ভাব অবচেতন মনে

চাপা থাকে তাতে কি আসে যায়? যা বেশি দরকার তা হলো নিজে ওগুলির প্রতি অনাসক্ত থাকা। কেবল যখনই আমাদের সচেতন আত্মসত্তা ওগুলির প্রতি আসক্ত হয় বাস্তবিক তখনই সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আত্মা যে শুদ্ধ ও অনাসক্ত তা জানা থাকলে আমরা সাক্ষী হয়ে থাকতে পারি—আর অশুদ্ধ চিন্তাগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারি। একাজ সাধকের পক্ষে খুবই সহায়ক। তোমার নিজের প্রকৃত স্বরূপটির কথা বেশি করে চিন্তা কর, তোমার ভাল-মন্দ চিন্তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলার প্রবণতা ত্যাগ কর। ধীরে ধীরে তুমি তোমার চিন্তার ওপরে উঠতে পারবে ও আত্মস্বরূপে অবস্থান তোমার পক্ষে সম্ভব হবে।

### জ্ঞান-খড়্গ

আমরা *ভাগবতের সংসার বৃক্ষের* কথা বলেছি। কিভাবে তাকে কাটতে হবে? কিভাবে তা করা সম্ভব সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন ঃ

> **এই ভাবে স্থির ও সতর্ক হয়ে, একাগ্র ভক্তিতে গুরুসেবার সাহায্যে শাণিত জ্ঞানকুঠার দিয়ে আত্ম-মূল সংসার-বৃক্ষটি সম্পূর্ণ ছেদন করে পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে, তোমার অস্ত্র ত্যাগ করবে।**[১২]

মনের বিচার শক্তিই জ্ঞান কুঠার। ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে, স্থূলাগ্র মনের সাহায্যে কিছুই পাওয়া যায় না। নির্বোধ ও অলস মন দিয়ে তুমি কখনই *সংসার-বৃক্ষকে* ছেদন করতে পারবে না। যদি মনকে নিয়ত সংগ্রামের দ্বারা সূক্ষ্ম ও সতর্ক রাখা যায় কেবল তবেই এই ছেদন-ক্রিয়া শুরু করা যাবে। এতে সময় লাগে দীর্ঘকাল। যতদিন না মনের সঙ্গে একাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে প্রকৃত আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়, ততদিন অস্ত্র ত্যাগ করা চলবে না।

অনেকে অধ্যাত্ম জীবন যাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু অল্প লোকেই ক্রুশ বহন করতে ইচ্ছুক। এ থেকেই যত গণ্ডগোল। সব ধর্মের প্রাচীন ঋষিদের আহ্বানের প্রতিধ্বনি করে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন তা শোন ঃ

> **"(স্বর্গে গেলে) একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসময়ে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করবে—এর জন্য অপেক্ষা করো না। এখানেই একটা বীণা নিয়ে আরম্ভ করে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্য অপেক্ষা করা কেন? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে ফেলো। স্বর্গে বিবাহ করা নেই, বিবাহ দেওয়াও নেই—তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ করে দাও না কেন? এখানেই বিবাহ**

---

১২ *শ্রীমদ্ভাগবতম্* ১১/১২/২৪

তুলে দাও না কেন? সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন মুক্ত পুরুষের চিহ্ন। সংসারিত্বরূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দাও। মুক্তির পতাকা-গৈরিক বস্ত্র ধারণ কর।"...

"ঈশ্বরের বেদিতে পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্বোৎকৃষ্ট যা কিছু, তাই বলিস্বরূপ অর্পণ কর। যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখন করেন না, তার চেয়ে যিনি চেষ্টা করেন, তিনি অনেক ভাল। একজন ত্যাগীকে দেখলে—তার ফলে হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে লাভ করব—কেবল তাঁকেই চাই—এই বলে দৃঢ়পদে দাঁড়াও, দুনিয়ার যা হবার হোক; ঈশ্বর ও সংসার—এ দুয়ের মধ্যে কোন আপস করতে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, কেবল তা হলেই দেহবন্ধন হতে মুক্ত হতে পারবে। আর ঐরূপে দেহে আসক্তি চলে যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি 'আজাদ' বা মুক্ত হলে। মুক্ত হও, শুধু দেহের মৃত্যু আমাদের কখনও মুক্ত করতে পারে না। বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাভ করতে হবে। তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের আর পুনর্জন্ম হবে না।"...

" 'পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন করবেন।' যদি সব শাস্ত্র ও অবতার লুপ্ত হয়ে যায়, তথাপি এই একটি মাত্র বাক্য সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করবে। অন্তরের এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বরদর্শন হবে। সমগ্র বিশ্বসঙ্গীতে এই পবিত্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিত্রতায় কোন বন্ধন নেই। পবিত্রতা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর করে দাও, তাহলেই আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমরা জানতে পারব—আমরা কোন কালে বদ্ধ হই নি। নানাত্ব-দর্শনই জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ—সবকিছুকেই আত্মরূপে দর্শন কর ও সকলকেই ভালবাস। ভেদভাব সব একেবারে দূর করে দাও।"[১৩]

১৩ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৪র্থ খণ্ড, *দেববাণী*, পৃঃ ৩১৪, ৩২৪ ও ৩২৭

# একাদশ পরিচ্ছেদ

# মনের পবিত্রতা—অধ্যাত্ম জীবনের মৌলিক প্রয়োজন

## সম্পূর্ণ জাগরিত হও

সর্বদা নৈতিক পথ, আধ্যাত্মিক পথ, অনুসরণ করার চেষ্টা কর। অনেকের অপবিত্রতা সম্বন্ধে ধারণা নেই, তারা যতই ভুল করে ততই সে বিষয়ে গ্লানিবোধ-রহিত হয়ে ওঠে। তাদের সব রকম নৈতিক অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়। তাদের কোন লজ্জাবোধ থাকে না। কিন্তু প্রকৃত সাধক নৈতিক চেতনা সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। ব্যাসদেব পতঞ্জলির *যোগসূত্র*-ভাষ্যে *যোগীর* মনকে চক্ষু গোলকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সামান্য ধূলিকণা পড়লেই অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণটিতে যেমন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়, তেমনি সামান্য একটু দুঃখের কারণ ঘটলে *যোগীর* মনে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে।[১] এই রকম অনুভূতিসম্পন্ন ও সতর্ক মন ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন প্রচণ্ড ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা। মনের পবিত্রতাকে আধ্যাত্মিক জীবন থেকে তফাত করা যায় না। যদি দেখ কোন লোক আধ্যাত্মিকতার ভান করছে এদিকে অশুদ্ধ জীবন যাপন করছে, তবে তার থেকে দূরে সরে থাক। অশুদ্ধ লোকের কোন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বিশ্বাস করবে না। 'শুদ্ধখাদ্য থেকে মন শুদ্ধ হয়, মনের শুদ্ধি থেকে সত্য সম্বন্ধে স্থিরা স্মৃতি আসে, আর যখন কেহ এই স্মৃতির অধিকারী হয়, সে তখন হৃদয়ের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।'[২]

শুদ্ধ মনেই নিরবচ্ছিন্ন ধারার মতো ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধ হয়ে থাকে। উপরোক্ত মন্ত্রে 'খাদ্য' বলতে ইন্দ্রিয় সংস্পর্শজ সব কিছু বোঝানো হয়েছে। আমাদের দর্শনের জন্য পবিত্র রসদ চাই, পবিত্র রসদ চাই শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদির জন্য।[৩] ইন্দ্রিয় স্পর্শজ অন্য সব খাদ্যগুলির শুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কেবল পাকস্থলীতে শুদ্ধ ভৌত অন্ন দিলে কোন কাজ হবে না। 'শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে,

---

১ ব্যাসভাষ্য, পতঞ্জলির যোগসূত্র, ২/১৬

২ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥ —*ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ৭/২৬/২

৩ ছান্দোগ্য উপনিষদের ওপর শাঙ্কর ভাষ্য

সে লোক ধন্য। আর হবিষ্য করে যদি "কামিনী-কাঞ্চনে" মন থাকে, তাহলে সে ধিক্...।'[৪] শ্রীরামকৃষ্ণ এই রকমই বলতেন। আমরা যতই সাবধান হই, আমরা দেখি সারা দিনে অন্তত কিছু ময়লা আমাদের মনে জড় হয়। তোমরা দেখে আশ্চর্য হবে আমাদের মনের আনাচে কানাচে কত ময়লা জড় হয়েছে, আর আধ্যাত্মিকতার পথে সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হতে গেলে, কী পরিমাণ শুদ্ধিরই না প্রয়োজন হয়। এ ময়লা খুবই সূক্ষ্ম হতে পারে, যা মনের ওপর অধ্যাত্মজীবনের ক্ষতিকর কতকগুলি গভীর ছাপ রূপে থেকে যায়। তোমরা যে সংসর্গে রয়েছ, যেসব আলাপ-আলোচনা করছ, তাকে খাট করে দেখো না। সমস্ত গালগল্প, সমস্ত অলস এলোমেলো চিন্তা, সমস্ত আজেবাজে কাজকর্ম বন্ধ কর। অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে এগুলি সবই ক্ষতিকারক। তাই, এসব ব্যাপারে তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগে কৃতসঙ্কল্প হও। নতুন করে সাংসারিক সংসর্গে জড়িয়ে পড়ে নতুন ময়লা জড় করবে না। সারাদিনে তুমি এমনভাবে কাজ করবে যাতে তুমি তোমার ক্ষতিগুলি পূরণ করতে পার। শুদ্ধ কাজ ও চিন্তাধারার মাধ্যমে তোমাকে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যা দিয়ে পূর্বার্জিত দোষক্রটিগুলি সংশোধন করে নেওয়া যায়। পরিশেষে এই গুণ আর দোষগুলি মিলিয়ে হিসেব যেন শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু প্রথমে, জমাখরচ মেলাতে হবে; গুণ আর দোষ জড়ো করে, তাদের যোগফল যাতে শূন্য হয় তা দেখতে হবে। তোমার পুরান হিসাব একেবারে চুকিয়ে ফেলতে হবে। পুরাতন জীবনধারারও ইতি করতে হবে। নতুন করে জাগতিক সংসর্গ স্থাপনের বা জাগতিক আলাপ-আলোচনা ও আমোদপ্রমোদের কোন স্পৃহা থাকা উচিত হবে না। সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবনটিই গড়ে ওঠে এই রকম নির্ভীক জীবন বিন্যাসের ফলে। তোমাদের সকলের ক্ষেত্রেই হিসাবের খাতায় সদগুণ কম, তাই এখন তোমাদের যথেষ্ট পরিমাণে সদগুণ অর্জন করতে হবে, যাতে হিসাবের খাতায় এদিক ওদিক সমান হয়। তখন নতুন হিসাব আরম্ভ হতে পারে। আধ্যাত্মিক জীবন মানে নতুন হিসাবের খাতা খোলা।

আবার আমাদের মনকে ক্যামেরা-কাম-প্রোজেক্টার-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা যদি এর ভেতর লুকানো ছবিগুলি পরপর দেখাতে পারি তবে, কি সুন্দর চলচ্চিত্রই না হবে। প্রত্যেকটি জিনিসই নির্বিচারে ছবিতে ধরা পড়ে যাবে, আর মনের গভীরে লুকানো ছবিগুলি দেখতে পেয়ে আমরা মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠব কারণ মনের ওপর এই ছাপগুলি প্রায়ই অর্ধচেতন বা অবচেতন অবস্থায় নেওয়ায়—আমাদের কাছে অজানা *সাধনার* সময় আগে হোক পরে হোক এগুলি ভেসে উঠবে। অর্ধচেতন অবস্থায় অশুদ্ধ ও অশুভ চিন্তাধারা অত্যন্ত বিপজ্জনক;

---

৪ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৫৮৩

তা থেকে অনেক বেশি দুঃখ দুর্দশার উৎপত্তি হতে পারে কারণ এর ফলে ছাপগুলি আরও গভীর ও স্থায়ী হয়। আমাদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। একদিন তোমরা বুঝবে এ-কথাগুলি কতটা সত্য। কি ছাপ তোমরা নিতে দাও, কি আলোচনা তোমাদের প্রশ্রয় পায় বা তোমরা শোন, সে বিষয়ে তোমাদের খুব বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এগুলি মনের ওপর কি ছাপ ফেলছে তা তোমরা অনুভব করতে পার না বলে মনে করো না যে এতে কোন বিপদ নেই। ছাপগুলি পরে ফুটে উঠবে, আর তখন তোমার কি করণীয় তা তুমি বুঝে উঠতে পারবে না। পুরান ছাপগুলি নিয়ে, পুরান বন্ধুদের নিয়ে পুরান সাংসারিক সংসর্গ ও চিন্তা নিয়ে মনে কোন আলোড়ন উঠতে দেবে না—এমনকি অবচেতনভাবে বা অর্ধচেতনভাবেও না। সর্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও আচরণে পরিবর্তন আনা দরকার, এর পর আমাদের অবশ্যই নতুন বিষয়ে গভীর মননের দিকে যেতে হবে, আসবে নতুন সৎসঙ্গ, আসবে নতুন শুভ ও শুদ্ধ চিন্তা ও ভাব। সর্বদা সব অবস্থায় যতটা সম্ভব সজাগ ও পূর্ণ সচেতন থাক, যাতে চোখের বা কানের মাধ্যমে কোন মন্দ ছাপ মুদ্রিত না হয়ে যায়। যদি কোন ছাপ পড়ে যায়, তখনই তাকে সমূলে দূর কর। তুমি কাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, কোন্ বিষয়ে কথা শুনবে বা পড়বে সে সম্বন্ধে তোমার তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করবে।

### অধ্যাত্ম জীবনের সকল পথেই পবিত্রতার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে

এমনকি কর্মযোগেও নিষ্ঠার সঙ্গে নৈতিক নিয়ম অবশ্য পালনীয়, ঠিক যেমনটি দরকার অন্য তিনটি যোগের ক্ষেত্রে। একটা লৌকিক ধারণা আছে যে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের ক্ষেত্রেই নৈতিক নিয়ম পালন করতে হয়, আর কর্মযোগ খুব সহজ, কারণ এপথে যেমন খুশি জীবনযাপন করা যেতে পারে। এটা অবাস্তব কথা। সংযম, অহিংসা, সত্যবাদিতা, অচৌর্য, অদ্বেষভাব ব্যতীত কর্মযোগেও কোন সাফল্য লাভ করা যায় না। জগতে যত আধ্যাত্মিক পথ জানা আছে সবের গোড়াতেই পবিত্রতা অবশ্য পালনীয়। পবিত্রতা বলতে অনেক কিছু বোঝায়। এর দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এবং হৃদয় সব কিছুর পবিত্রতা বোঝায়। *ব্রহ্মচর্য* কেবল শারীরিক শুদ্ধতা নয়, অহিংসা বলতে কেবল শারীরিক অহিংসা নয়; অচৌর্য বলতে স্থূল ধরনের চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ নয়। এগুলির অর্থ সম্পূর্ণ আন্তর-শুদ্ধিও। যদি তুমি এই সব প্রারম্ভিক নিয়মগুলি একনিষ্ঠভাবে, কোন রকমভাবে পথভ্রষ্ট না হয়ে, আদর্শের জন্য সব কিছুকে নিঃশর্তে ত্যাগ করে—পালন না কর তবে তোমার *কর্ম* করা হবে বটে, কিন্তু তা কর্মযোগে পরিণত হবে না। এইখানেই বিশেষ তফাত। প্রত্যেকেই *কর্ম* করে কিন্তু খুব কম লোকেরই সঠিক কর্মযোগ অনুসারী কর্ম করা

হয়। যে কোন যোগের ক্ষেত্রেই নৈতিক নিয়মগুলির পালন অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে নিজেকে ঠকিও না। এ কর্তব্য সম্পূর্ণ পালন করার অর্থ স্থূল, বাহ্য, ভৌতিক রূপেই শুধু এই শর্তগুলি পূরণ করা নয়—তাদের সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনাতেও ঐসব শর্তের পূরণ।

জ্ঞানযোগে বলা হয়েছে ঃ শুদ্ধি সংক্রান্ত সব নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালনের পর সমগ্র মন ব্রহ্মে নিবদ্ধ কর। মনের শুদ্ধির জন্য সব সময়ে বিচারের পথ নেবে।

কর্মযোগে বলা হয়েছে ঃ মনকে শুদ্ধ করবে, ঠিক ঠিক নৈতিক সংস্কৃতি পালন করে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে আর নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করে।

ভক্তিযোগে বলা হয়েছে ঃ তোমার সমস্ত হৃদয়কে ও প্রেমের সমস্ত আবেগকে ঈশ্বরমুখী কর। জ্বলন্ত ঈশ্বর প্রেমে যেন হৃদয়ের অন্য সব প্রেমাবেগ আত্মভূত হয়ে যায়। ভক্তির প্রাবল্যে ওগুলিকে ধ্বংস করে ফেল, কেবল ঈশ্বর প্রেমই যেন থাকে।

এইভাবে দেখা যায় যে, সব কটি যোগের মূল সাধারণ বিষয়বস্তু হলো চিত্তশুদ্ধি ও আসক্তির বন্ধন ছেদন।

কর্মে এক মহা বিপদ হলো, আমরা ফলের কথা নিয়ে খুব বেশি চিন্তাভাবনা করতে পারি এবং এতে আমরা চঞ্চলও হয়ে পড়তে পারি। কিন্তু যদি আমরা জানি যে উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ অনাসক্তি ও পবিত্রতা, তবে আমরা ফলের জন্য ব্যস্ত হব না, আর মানসিক চঞ্চলতাও আমাদের পর্যুদস্ত করে দিতে পারবে না। যখন অধ্যাত্ম সাধক জানবে যে কর্মের উদ্দেশ্য হলো চিত্তশুদ্ধি, যা তার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন, তখন সে অধিকতর বিশ্বাস ও উৎসাহ নিয়ে সব কাজ করবে। তখনই কেবল কর্ম হয়ে উঠবে কর্মযোগ। কর্মফলের জন্য তুমি একটুও ব্যস্ত হয়ো না। কর্মযোগী হিসাবে তোমাকে চিত্তশুদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে, এইখানেই এর সমাপ্তি। ঈশ্বরই কেবল ফলদাতা, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

## পবিত্রতা ঃ পতঞ্জলি মতে

*যোগসূত্রে* পতঞ্জলি পবিত্রীকরণের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা দিয়েছেন। তাঁর মতে নৈতিক নিয়ম দু-রকমের ঃ *যম* (সাধারণ নিয়ম) আর *নিয়ম* (বিশেষ নিয়ম)। *যম* বলতে পাঁচটি অভ্যাস পালন, যা তাঁর মতে সব লোকের সর্বত্র সর্বদা পালনীয়।[৫] প্রথমে *অহিংসা* বা ভাল হোক মন্দ হোক কারও প্রতি অসদ্‌ভাব পোষণ না করা।

৫ "এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্।" —পতঞ্জলি, যোগসূত্র, ২/৩১

এই সব অসদ্‌ভাব মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দূর করে দেবে। বিক্ষুব্ধ মনে কোন রকম একাগ্রতা আসা সম্ভব নয়। মন একাগ্র করা আবার একই সময়ে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা—তা কখনো সম্ভব হতে পারে না। অবশ্য এখানে আমি উন্নত মানের একাগ্রতার কথাই বলছি।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো *ব্রহ্মচর্য*। *ব্রহ্মচর্য* ছাড়া কোন সত্যকার অধ্যাত্মজীবন হতে পারে না। যদি তুমি জীবন-বারিকে শরীরের ইঁদুর গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যেতে দাও—যৌন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ভোগ চরিতার্থ করে অপচয়ের মাধ্যমে, তবে উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য কোন শক্তি আর তোমার অবশিষ্ট থাকবে না। শক্ত করে তীরে নোঙ্গর ফেলে দাঁড় টানার কোন মূল্য নেই। আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করতে চাই। যৌন সম্ভোগের বাসনারূপ বাধা থাকলে ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব-বিনিময় অসম্ভব। ছেঁড়া টেলিগ্রাফ-তারের মতো। বিদ্যুৎ ও যন্ত্রচালক থাকলেও যতক্ষণ না তার জোড়া হচ্ছে বা তার থেকে অপরিবাহী প্রতিরোধটিকে সরানো হচ্ছে ততক্ষণ তার-বার্তা পৌছবে না।

তার পর *সত্য*। প্রত্যেকেরই বাক্যে, চিন্তায় ও কাজে সত্য পালন করা উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, তিনি সব ত্যাগ করতে পারতেন কিন্তু সত্যকে নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে কপটতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার কোন স্থান নেই।

এর পর অস্তেয়—অচৌর্য। কেবল স্থূল অর্থেই কথাটি নিলে চলবে না। অন্যকে বঞ্চনা করে কিছু পাবার ইচ্ছা—অসৎ উপায়ে কোন জিনিস পাওয়াই চুরি।

পঞ্চমত—*অপরিগ্রহ*। অধ্যাত্ম পিপাসুর অত্যধিক কর্ম-ভারে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবণতা ত্যাগ করা উচিত। তোমার যা প্রয়োজন নেই তা অন্যকে বিলিয়ে দাও। যদি দান গ্রহণ করতেই হয় তবে তাকে প্রতিদানে অন্য কিছু দাও। যদি তোমার দেবার অর্থ না থাকে তবে তাকে ভালবাসা, সেবা, জ্ঞান দাও।

*নিয়মেরও* পাঁচটি ধারা আছে। প্রথমটি *শৌচ* পবিত্রতা, অর্থাৎ দেহ ও মন দু-এরই পবিত্রতা। দেহ হলো ঈশ্বরের মন্দির, তাই একে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দ্বিতীয় ধারা হলো *সন্তোষ*—সন্তুষ্টি। প্রত্যেকেরই প্রাকৃতিক পরিবেশে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তুমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সন্তুষ্ট হতে পারছ না, কিন্তু তোমার এই অসুবিধার জন্য পরিবেশকে দোষ দিও না। যারা কেবল ওজর আপত্তি ও নালিশ করে, তারা বৃথাই সময় ও শক্তির অপচয় করে। অযথা অসন্তোষ সৃষ্টি করবে না। এর পর আসছে *তপঃ*—ইন্দ্রিয় সংযম। যে নিজেকে কোন রকম ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত হতে দেয়, সে কখনো মানসিক শান্তি পায় না। ব্যাসদেব বলেন, "যাদের

ইন্দ্রিয় সংযম নেই তাদের পক্ষে যোগ সম্ভব নয়।"[৬] এরপর স্বাধ্যায়। এর অর্থ কেবল পুস্তক অধ্যয়ন নয়, নিজ মনের পর্যালোচনাও এর মধ্যে পড়ে। সবশেষে *ঈশ্বর প্রণিধানম্*—ঈশ্বরের কাছে আত্ম-সমর্পণ, এতে সূক্ষ্ম অপবিত্রতা অর্থাৎ অহংবোধ দূরীভূত হয়। আর একটি বিশেষ কথা মনে রাখতে হবে ঃ আধ্যাত্মিক অনুশীলনে এর পরের ধাপে পা দেবার অর্থাৎ *আসন* অভ্যাসের আগে সাধককে সমস্ত নৈতিক সংস্কারের ভেতর দিয়ে যেতেই হবে। আধ্যাত্মিক জীবনের আচার্যগণ পবিত্রতা ও অনাসক্তির ওপর এতই মূল্য দিয়ে থাকেন।

## পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা কর

যথাযথভাবে মনকে শান্ত করার জন্য পবিত্রতার প্রয়োজন। মনকে শান্ত করা যায় কেবলমাত্র সৎ ও সম্পূর্ণ শুদ্ধ চিন্তার দ্বারা, কেবল সেই সব চিন্তার দ্বারা যা দেহ বা সংসারে বদ্ধ নয়। উপনিষদ্ বলেন, ব্রহ্মোপাসনার সময় সব সাধকের পক্ষেই মনকে শান্ত রাখা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।[৭] আধ্যাত্মিক জীবনে প্রকৃত ধ্যানের পূর্বে এটি অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

মানসিক পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টায় আমাদের ঈশ্বরে শরণাগত হওয়া উচিত। তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে আমাদের মনের সব ময়লা অপসারিত হয়। আমরা সাধারণত দেখি যে শুধু নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ নয়, অন্যদের কল্যাণের জন্যও এই প্রার্থনা খুবই সহায়ক। পবিত্রতা রক্ষা, একাগ্রতা, শান্তি, উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠা এবং তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য খুব গভীরভাবে প্রার্থনা করবে। অন্য সব জীবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যও প্রার্থনা করবে—যাতে তারাও পবিত্র, শান্ত, একাগ্র ও উন্নততর জীবনের প্রতি উৎসর্গীকৃত হতে পারে। অন্যের জন্য প্রার্থনার ফলে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা প্রশমিত হয়। প্রার্থনা মনকে উদার করে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ শেখাতেন ধ্যানের আসনে বসেই দক্ষিণ, পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম সব দিকে প্রাণীর প্রতি প্রেম চিন্তা ছড়িয়ে দেবে।[৮] তুমি দেখবে এটি প্রভূত উপকারী।

প্রতিদিন সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে কৃতসঙ্কল্প থাকবে। যদি কিছু একাগ্রতার সঙ্গে এ রকম প্রার্থনা করা যায় তবে এতে অন্যের কল্যাণ সাধিত হবে। শুধু তাই নয়, এতে আমাদের মনে প্রেমের ভাব জেগে উঠবে আমাদের

---

৬ '*নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি।*' —ব্যাসভাষ্য, পতঞ্জলি যোগসূত্র, ২/১

৭ 'ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।' —ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩/১৪/১, দ্রষ্টব্য কঠোপনিষদ্, ১/২/২৪

৮ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫

সহযোগী মানবের প্রতি, যারা উন্নততর জীবন যাপনের জন্য সংগ্রাম করছে ও প্রচণ্ড মানসিক ক্লেশ ও বাধার ওপর দিয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃত পবিত্রতা, মানসিক শান্তি ও ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রতার জন্য আত্মার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। তাই যখন আমরা অন্যের জন্য প্রার্থনা করি, আমরা তখন ক্রমেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এগিয়ে যাই।

## অতীত নিয়ে বেশি চিন্তান্বিত হবে না

নিজ অতীত তা সে যেরকমই হোক, তাই নিয়ে সব চিন্তা বন্ধ কর। যে কাজ করা হয়ে গেছে তা চিরকালের জন্যই হয়ে গেছে, তাকে আর বাতিল করা যায় না। তাই পবিত্রতার কথা চিন্তা কর, তুমি ভবিষ্যতে কি করবে তাই চিন্তা কর, আগে যা করেছ তা নিয়ে নয়। যে নিজেকে পবিত্র মনে করে সে পবিত্র হয়ে যায়। অতীতকে যথা সম্ভব পুঁছে ফেল। সব পুরান সংসর্গের কথা ও তাদের স্মৃতি ভুলে যেতে চেষ্টা কর, তার জায়গায় আরো ভাল আরো পবিত্র সংসর্গ ও স্মৃতির কথা ভাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হবে? ময়লা দ্বারা কি ময়লা দূর হবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর করা যায়?' [১] অপবিত্রতার কথা চিন্তা করে পবিত্র হওয়া যায় না, নিজেকে পাপী মনে করে পাপমুক্ত হওয়া যায় না। এটি ভুল মনস্তত্ত্ব, এতে উল্টো ফলই হয়। যদি আমরা এই সব পাপ ও অপবিত্রতার কথা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করি, তবে আমরা যে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা চালিয়ে সফলতা লাভ করতে পারি, সে সত্য আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। সর্বদা ইতিবাচক পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা কর। 'ওঃ আমি কী রকম পাপী, ওঃ আমি কত অপবিত্র' এ চিন্তার বদলে এই চিন্তা কর, 'পবিত্রতা আমার উত্তরাধিকার ও প্রকৃত সত্তা। আমি স্বভাবত মুক্ত। আমার স্বভাবই হলো শুদ্ধতা ও পবিত্রতা।'

সব অপবিত্রতার মূল কারণটিকে দূর করতেই হবে—তার বাহ্য প্রকাশটিকে শুধুমাত্র নয়। এটি করতে গেলেই আমাদের অনেকগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু ভয় পাবে না। দমন ও জটিলতার সৃষ্টি এমনিতে খারাপ নয়। পরবর্তী কালে মনকে উচ্চতর খাতে প্রবাহিত হবার প্রারম্ভিক অবস্থায় এগুলি কিছুদিনের জন্য প্রয়োজন। জটিলতার জন্য কেন অত শোরগোল তোল? আমরা যা কিছু করি তাতেই জটিলতা সৃষ্ট হয়। ভোগকে প্রশ্রয় দিলে একরকম জটিলতা হয়, আবার তা থেকে বিরত থাকলে অন্য রকম জটিলতা সৃষ্ট হয়। অতএব আমাদের এমন পথ বেছে নিতে হবে যা আমাদের উচ্চতর ও আরও ইতিবাচক কোন কিছুর দিকে

---

১ তদেব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯

নিয়ে যাবে, যা আমাদের মুক্তির দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে ও জীবনের মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। আপেক্ষিক স্তরে আমরা যা কিছু করি তাতেই অনবরত জটিলতা সৃষ্টি করছি। আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ম আছে, জড় জগতের নিয়মগুলিই যে কেবল মেনে চলতে হবে, তা নয়। এ সব ব্যাপারে মানুষকে নিজের পথ নিজে বেছে নিতে হবে।

প্রত্যেক প্রবর্তকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সবরকম বিপজ্জনক উত্তেজনা বর্জন করা, সেগুলি যে রূপ ধরেই আসুক না কেন। চারাগাছকে বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হবে। যেমন করেই হোক আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে হবে এবং তার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও একাগ্রতা গড়ে তুলতে হবে। অলস ও দুর্বলের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'যদি তোমার তেত্রিশ কোটি দেবতায় ...বিশ্বাস থাকে অথচ নিজের ওপর তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে কখনই তোমার মুক্তি হবে না।'[১০] কোন কোন মানসিকতার ক্ষেত্রে পাপ বোধে সুফল পাওয়া যায়, কেবল যদি তা উন্নতির পথে উদ্যমের দিকে প্রেরণা যোগায়। প্রেরণা অবশ্যই কোন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে হতে হবে। কিন্তু সব অপবিত্রতার কঠিন আস্তরণ থেকে মুক্তি পাবার আরও অনেক ভাল উপায় হলো আমাদের শাশ্বত সহজাত পবিত্রতা, যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, তার বিষয়ে চিন্তা করা। যদি স্বভাবকে 'দ্বিতীয়' প্রকৃতি বলা যায় তবে পবিত্র সত্তা হলো 'প্রথম' প্রকৃতি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা সকলেই আমাদের নিজ নিজ পূর্বপুরুষ, আমরা যে সব শস্য বপন করি তারই ফল আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু পুনর্জন্মই একেবারে সার কথা নয়। এই বর্তমান জীবনেই পূর্ণজ্ঞান লাভের জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। অতএব আধ্যাত্মিক জীবনে পরজন্মের ওপর কখনো বেশি গুরুত্ব দেবে না। যদি আমাদের বর্তমান জীবন পূর্ব পূর্ব জীবনের ফলশ্রুতি হয়, তবে আমরা আমাদের বর্তমানের চেষ্টায় আমাদের ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করতে সক্ষম। *কর্ম* আর ভাগ্য এক কথা নয়। কর্মের নিয়ম হলো আত্ম-প্রচেষ্টার নিয়ম—সজ্ঞান সচেতন আত্ম-প্রচেষ্টা, এটা কখনই অদৃষ্টবাদ ও আলস্যের শিক্ষা নয়। অদৃষ্টবাদী মনোভাবের চেয়ে বরং তীব্র *সাধনার* ওপর আমাদের জোর দেওয়া উচিত।

পবিত্র হৃদয়েই সত্য প্রতিফলিত হয়, তেমনই হয় শুদ্ধ চিন্তাশীল মনে। শুদ্ধ মনই ক্রমে ক্রমে উচ্চতর জীবনের আদর্শের প্রতি সজাগ হয়ে ওঠে। মন যত শুদ্ধ হবে তত বেশি বেশি জাগ্রত হবে, তত ভাল করে সত্যকে প্রতিফলিত করবে। উচ্চতম উপলব্ধিতে মন ও হৃদয় দুই-ই চরম সত্যে লীন হয়। আমরা যেমনই দাবি করি না কেন, নকল পুতুল ও প্রেমের প্রতিমার প্রতি যতদিন আসক্ত হয়ে থাকব,

১০ তদেব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৯

ততদিন একই সঙ্গে ঈশ্বরের জন্য আন্তরিক ও গভীর ব্যাকুলতা সম্ভব হবে না। আসক্তি ছাড়তে না পারলে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা সর্বৈব ভান মাত্র। কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একটা সময় আসতে পারে যখন এই সব পুতুলগুলি তাদের সব মনোহারিত্ব হারিয়ে ফেলে, তখনই কেবল আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি প্রকৃত ও গভীর ব্যাকুলতা আসে; তখন সংসারের সব জিনিসই *আলুনি* লাগে।

## কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন

আধ্যাত্মিক রাজ্যে বেদান্ত হলো 'এলোপ্যাথি', 'হোমিওপ্যাথি' একেবারেই নয়। যেহেতু সংসারিত্ব রোগ অতি কঠিন আকার ধারণ করেছে, জোরালো ওষুধ দরকার। বেদান্ত এ রোগের আমূল নিরাময়ের বিধান দেয়। বেশ জোরালো ইঞ্জেকশন আর বড় মাত্রার এলোপ্যাথি ওষুধের দরকার। বেদান্তে 'হোমিওপ্যাথি' বলে কিছু নেই। বৈদান্তিকের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলে না, কারণ পুরোপুরি কার্যকরী করতে হলে বেদান্তের কঠোরতা শিথিল করা চলবে না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, নিদারুণভাবে শিথিল করার ফলে খ্রীস্টের শিক্ষাগুলির কি অবস্থা হয়েছে?

বাসনা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি আমাদের সর্বক্ষণের শত্রু, অতএব সুশৃঙ্খল ও সুসংযত জীবন যাপন একান্ত দরকার। বাসনার সর্বগ্রাসী ক্ষমতার কোন সীমা নেই এবং যতক্ষণ একে আমাদের ওপর প্রভুত্ব করতে দেওয়া হবে, ততক্ষণ আমরা মহাপুরুষগণের দেওয়া আধ্যাত্মিক উপদেশগুলি অনুসরণ করতে পারব না। এ সত্যকে সচেতন বা অচেতন কোনভাবেই আড়াল করা উচিত নয়।

প্রত্যেকটি আকাঙ্ক্ষাকে ধরে ধরে তা থেকে মুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। না, সবগুলিকে নির্মমভাবে নির্মূল করতে হবে। আমরা যখন ঈশ্বরের দিকে ফিরব, তিনি যেন আমাদের মধ্যে ঐশ্বরিক আলো জ্বেলে দেন, তখন সব অন্ধকার একেবারে দূর হয়ে যাবে। তখন তিনি নিজে সংগ্রাম ক্ষেত্রে এসে আমাদের জন্য সংগ্রাম করবেন। প্রভুই তাঁর কাজ করেন কিন্তু যতক্ষণ আমাদের ব্যক্তিত্ববোধ আছে, যতক্ষণ আমরা নিজেকে নিজ কাজের কর্তা বলে মনে করি, ততক্ষণ আমাদেরও নিজ কর্তব্যটুকু অবশ্যই করে যেতে হবে। এই জগৎ-প্রপঞ্চের প্রতি আমাদের আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। সব শারীরিক ও বৈষয়িক বাসনা আমাদের পরিহার করতে হবে। সব আসক্তি আর সেই সংক্রান্ত 'কর্তব্য' ত্যাগ করতে হবে। সেইটিই একমাত্র উপায় যা দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের দুঃখ দুর্দশা থেকে ও আলোক-প্রতিরোধক অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি। আমরা যেন প্রভুকে আমাদের এই রূপান্তর সাধনে ও আমাদের মহত্তর জীবন যাপনের ক্ষমতা দানে সহায়তা

করি। আমরা যেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া সাংসারিক কোন বিষয়ে আর মাথা না ঘামাই। মঠেই থাকি আর মঠের বাইরেই থাকি, আমরা সব সময়ে সংসারেই আছি। আমরা সংসার থেকে পালিয়ে যেতে পারি না। কিন্তু সংসারকে আমাদের সমস্ত মনটাকে গিলে ফেলতে আমরা যেন কিছুতেই না দিই। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, 'নৌকা জলে থাকবে, কিন্তু জল যেন নৌকায় না থাকে।'[১১]

## আত্ম-চিন্তা কর

প্রকৃত পবিত্রতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় হলো—'আমরা স্বভাবত পবিত্র' এই চিন্তা করা আর পাপ, অপবিত্রতা, দুর্বলতা, দোষ সম্বন্ধে কখনো চিন্তা না করা। আমরা সবাই স্বভাবত পূর্ণ, কিন্তু আমরা আমাদের শাশ্বত পূর্ণতার কথা ভুলে গেছি, আর তাই অবিরত ভুল করে চলেছি। কিন্তু যখন আমাদের প্রকৃত সত্তার স্মৃতি ফিরে আসবে তখন অপবিত্রতা, পাপ, দোষ এগুলি কয়েকটি স্বপ্নের থেকে বেশি কিছু নয় বলে বোধ হবে।

পবিত্রতা ভেতর থেকে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে কারণ তা আমাদের নিজস্ব ও স্মরণাতীত কাল ধরেই আমাদের আছে। এটি কখনো বাইরে থেকে আসে না। এটি উপরন্তু এসে যুক্ত হয় না, নতুন করে তৈরিও হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনের অর্থ হলো ভেতর থেকে বৃদ্ধি পাওয়া, যদিও প্রকৃতপক্ষে এটি কোন বৃদ্ধি নয়, কেবল আবরণের উন্মোচনমাত্র কারণ, যদি পূর্ণতা ও পবিত্রতা আমাদের স্বভাবজ না হতো, তবে আমরা কখনই পবিত্র ও পূর্ণ হতে পারতাম না, আমরা মুক্তিও পেতাম না।

নিজের ভেতর থেকে রূপান্তর ঘটাও, তখন সেই রূপান্তর আপনিই বাহ্য জগতে প্রকাশ পাবে। আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকেই পবিত্র করতে হবে। দেখো তুমি যেন মাত্র ওপর ওপর কাজ করে ছেড়ে দিও না। প্রথমে, পুরাতন উপলেপনগুলিকে চেঁচে ফেলে দিতে হবে, পরে ঠিকভাবে জমি তৈরি করতে হবে। প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক সাধনা চালিয়ে যাও। ওইটিই তোমাকে তোমার মিথ্যা অপবিত্র ব্যক্তিত্ববোধের ওপরে উঠতে সাহায্য করবে। তোমার মিথ্যা ব্যক্তিত্ববোধের (অহং-এর) মাধ্যমে তোমার চিন্তাগুলি অপবিত্র ও কলঙ্কিত হয়। যদি তোমার আসল ব্যক্তিত্ব অপবিত্র হতো, তুমি কখনই পবিত্র হয়ে উঠতে পারতে না এবং তোমাদের কারোরই মুক্তির আশা থাকত না। কিন্তু আমাদের আসল ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ পবিত্র ও স্বয়ম্প্রভ এবং আমাদের নিশ্চয়ই সে অবস্থা ফিরে পেতে হবে। সৎচিন্তা, সৎকর্ম ও সদ্‌বাক্য এ বিষয়ে খুবই সহায়ক; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক অনুশীলন ছাড়া কেবল ঐ

---

১১ *Sayings of Sri Ramakrishna* [Madras : Sri Ramakrishna Math 1975], p. 99

সহায়কগুলিই যথেষ্ট নয় এবং তারা কখনই তোমাকে, তুমি এখন যা নও, তাইতে রূপান্তরিত করতে পারবে না।

নিজেদের প্রতি, জগতের প্রতি, সবরকম মানসিক চিত্র ও মনে ভেসে ওঠা সকল স্মৃতির প্রতি এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি চাই।

যখন মনে একটি কু-চিন্তা ভেসে ওঠে তখন আমাদের দুঃখিত বোধ করা উচিত, কিন্তু তাতে আমাদের মধ্যে এগিয়ে যাবার তাগিদ আরও বেড়ে ওঠা এবং আমাদের আগের থেকে আরও বেশি নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠা উচিত। আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে আমাদের মনের ঐ সব কু-চিন্তার অস্তিত্ব আমরা জানতে পেরেছি। যদি এগুলি আমরা জানতে না পারি, তাহলে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কখনই সফল হতে পারব না। কষ্ট যত বেশি হবে সংগ্রাম তত বীরোচিত হবে, সেগুলির উচ্ছেদ সাধনে আমাদের সঙ্কল্প তত দৃঢ় হবে এবং আমাদের অদম্য অনমনীয় ভাব বৃদ্ধি পাবে।

যদি সত্যই আমাদের মনে ময়লা ও নোংরা থাকে, সেটা আমাদের জানা উচিত এবং তা কতটা খারাপ তাও জানতে হবে। মন্দের স্বরূপটা কেমন তা জানতে পারলে যুদ্ধে অর্ধেক জিত হয়ে গেল। আমাদের মনের উগ্র মন্দ বৃত্তির সম্ভাবনা জানতে পারা সব সময়েই ভাল, তাতে আমরা সতর্ক হতে পারব ও এর শঠতা করার কলাকৌশল সম্বন্ধে পুরাপুরি সজাগ থাকব। কাম-লালসা, ক্রোধ, লোভ-হিংস্রতা প্রভৃতি আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করে মানুষ তার নিজের ও অপরের কতই না ভয়ঙ্কর পরিমাণ দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি করে থাকে। এই সব আবেগগুলিকে আমরা যদি না জানতে ও বিনাশ করতে পারি তবে সেগুলি আমাদের মনের গভীরে লুকিয়েই থাকবে। যদি মনকে সচেতনভাবে উন্নততর জীবনের দিকে না ফেরাই, তাহলে এই সব দিয়েই সর্বদা মন ভর্তি হয়ে থাকবে।

সাধকের পক্ষে সচেতনভাবে চেতনার কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করা অধ্যাত্ম জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মধ্যে একটি। সাধারণত আমাদের ব্যক্তিত্ব শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের মধ্যে কোন একটির চারিধারে কাজ করে। কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে সচেতনতার কেন্দ্র হলো পাকস্থলি, যেমন অতিভোজী ও মদ্যপ। কারও ক্ষেত্রে এই কেন্দ্র হলো হৃদয়ের নিম্নস্থলে—সাংসারিক আবেগের স্থলে। অধ্যাত্ম সাধককে শিক্ষা করতে হবে—চেতনার কেন্দ্রকে নিম্ন থেকে উচ্চভূমিতে উঠিয়ে আনার জন্য। প্রথমে তাকে নিজ আধ্যাত্মিক কেন্দ্রটিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং পরে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজ চেতনাকে সর্বক্ষণ ঐ কেন্দ্রে তুলে রাখতে হবে। চেতনাকে উচ্চ আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে তুলে রাখাই এক গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস।

## সূক্ষ্ম বাসনা

কখনো কখনো মনের অতি গভীরে উঁকি মারলে আমরা দেখতে পাব কিছু কিছু সূক্ষ্ম বাসনা মনের ছায়ায় বীজাকারে লুকিয়ে রয়েছে, আমরা যদি আমাদের আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হই, এগুলি কোন দিন উঠে পড়ে সুন্দরভাবে অঙ্কুরিত হয়ে বহু অনর্থের সৃষ্টি করবে। ঈশ্বর লাভের পূর্বে কঠোর সংযম পালন করলেও বাসনা ও প্রবণতাগুলি যেমন আছে তেমনই থেকে যায়, তাদের তখনো নাশ হয় না। তাদের কেবল আটকে রাখা হয়। তাই ঈশ্বরলাভ না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিরাপদ নই, আমাদের সমগ্র আচরণে, লোকের সঙ্গে মেলা-মেশায় ও ব্যবহারে যদি আমরা কঠোরতম বিবেক বোধ অবলম্বন না করি, তবে যে কোন দিন আমাদের পদস্খলন অবশ্যই হতে পারে। কঠোরতম সংযমী হলেও ভক্তের পক্ষে বেশি সাহস দেখানো কখনই ভাল নয়। এই রকম ব্যক্তির পক্ষেও কতকগুলি নির্দিষ্ট আচরণ বিধি ও নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করা দরকার যাতে অসতর্ক ব্যবহারে বা মন্দ সঙ্গের দোষে সে কখনো কোন কিছু অশুভ পরিণামের মধ্যে না পড়ে।

গীতায় বলা হয়েছে ঃ 'রস (আস্বাদ বা বিষয়তৃষ্ণা) সহজে আমাদের ছাড়ে না।'[১২] সত্য কথা বলতে গেলে, মহত্তম সংযমী পুরুষেরও ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের কিছু আস্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা বীজাকারে থেকে যায়, যতদিন না তা জ্ঞানাতীত বস্তুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। তারপর বাসনার আকার মাত্র থাকে, পোড়া দড়ির মতো—তা দিয়ে আর বাঁধা যায় না। এ রকম মানুষের চেতনার বিষয় একেবারে অন্যরকম, তিনি আর কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হন না।

যদিও আমরা জানি যে বীজ আবার অঙ্কুরিত হতে পারে, তবু আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। এ কথা জেনে আমাদের কেবল নিজ নিজ করণীয় কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। নিজেই নিজেকে বলা উচিত ঃ 'করণীয় কাজ এতই কঠিন যে আমার সঙ্কল্প, একাগ্রতা ও সতর্কতা আরো দৃঢ়তর হতে হবে।' বিপদকে বাড়িয়ে দেখাও ঠিক নয়, আবার খাট করাও ঠিক নয়। বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে ও নিজেকে শক্ত হাতে শাসন করতে হবে।

কখনো কখনো মনের গভীর স্তরে লুকানো ভয়ানক চিত্র হঠাৎ স্বপ্নে দেখা দেয়। কখনো কখনো, ধ্যানের সময় বিকট মূর্তি এসে মনে উঠে পড়ে আমাদের কাঁপিয়ে দেয়। মনের গভীরে এমন সব ময়লা ও নোংরার স্তূপ আছে যা একদিন ওপরে ভেসে উঠবে ও আমাদের টেনে নামাতে চেষ্টা করবে। এতে আমরা কখনই যেন স্নায়ুদুর্বল হয়ে না পড়ি বরং এ অবস্থাতে স্থির থেকে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে।

১২ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ২/৫৯

উচ্চ স্তরের উপলব্ধি না হয়ে থাকলে অতীব দৃঢ় সংযমী পুরুষেরও সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত কারণ, ঝঞ্ঝাট যে কোন সময়ে অতি সূক্ষ্মাকারে আসতে পারে—অন্যের সঙ্গে অসতর্ক মেলামেশায়, কোন কথার বা দৃশ্যের মাধ্যমে। নিজে সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে, সর্বদা সতর্ক থাকবে। আমরা সচরাচর প্রথমে সূক্ষ্মভাবে অসৎ চিন্তার কবলে পড়ি, তারপর ওটি ক্রমে বাড়তে থাকে, শেষে আরো আরো বড় হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়। যথোচিত সুরক্ষার ও সতর্কতার ব্যবস্থা না থাকলে এরূপ ঘটনার মুখে আমরা যে কোন মুহূর্তে পড়তে পারি।

যে লোক সত্যই সুরক্ষিত ও সদা জাগ্রত, সে সূক্ষ্ম কামনা এতটুকু মাথা চাড়া দিলেই সেটিকে বীজাকারে থাকতে থাকতেই নাশ করে ফেলে, এমনকি তাকে মনস্তরেও পুরোপুরি ভেসে উঠতে দেয় না। আমাদের সকলেরই উচিত কামনাগুলিকে বীজাবস্থাতেই আয়ত্তে আনা, আমরা যদি সত্যসত্যই সতর্ক ও বিচারপ্রবণ না হই তবে আমরা এ কাজ করতে পারব না। আমরা যদি যথাযথভাবে সতর্ক হই তবে বিপদটিকে বীজাবস্থায় ধরে ফেলে নাশ করতে পারব। এটি সম্ভব হয় একমাত্র যদি আমাদের ভগবৎ ভক্তি অত্যন্ত গভীর হয় এবং আমরা অবিরত তাঁর চিন্তা করি। এভাবে চলতে পারলে আমাদের মন সম্পূর্ণ সজাগ থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী পত্নী, শ্রীসারদা দেবী যিনি ছিলেন পবিত্রতা-স্বরূপিণী, তিনি বলতেন: "যদি মানুষ সদাই ঈশ্বর চিন্তা করে তবে মন্দভাব ঢুকবে কোন্ পথে?"

## আধ্যাত্মিক মানুষের অধিকতর দায়িত্ব

যদি অপরিণত কোন মানুষ কিছু ভুল কাজ করে সেটা তত দোষের হয় না, যতটা হয় সমুন্নত লোকের পক্ষে কিছু ভুল কাজ করায়। যদি সংস্কারবিহীন কোন লোক অশিষ্ট আচরণ করে সেটা ততটা খারাপ লাগে না, যতটা খারাপ লাগে সংস্কৃতি-সম্পন্ন লোক অসভ্য হলে। যে মানুষ যত বেশি উন্নত হবে তার দায়িত্বও তত বেশি হবে। আশা করা যায়, যার নৈতিক বিকাশের অভাব রয়েছে, তার চেয়ে অধিকতর নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কার্যপদ্ধতি আরো ভাল হবে। এ দুজনের দায়িত্বজ্ঞান সমান নয়।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের নৈতিক সংস্কৃতির দিক থেকেও বড় হতে হবে। সাধারণ লোক ডাহা মিথ্যা বলতেও বিশেষ মানসিক সঙ্কোচ বোধ করে না। বেশির ভাগ লোকের অল্প মিথ্যা বলতে কোন মানসিক সঙ্কোচ হয় না। সাধকের জীবনে এমন এক সময় আসে যখন সে এত সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল হয় যে এমনকি ঠাট্টার ছলেও সামান্য মিথ্যা বলতে যন্ত্রণা অনুভব করেন। যদি তোমাকে এ বিষয়ে রফা করে চলতে হয়, তবু কখনো নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করো না বরং

জানবে যে এই রফা কেবল রফাই তা কখনই আদর্শ নয়—তোমার ভুলকে ভুল বলে জান, তাকে সমর্থন করতে যেয়ো না।

যতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মন স্থূলস্তরে থাকে সে কেবল কাজকে এড়িয়ে চলে, যখন তা সূক্ষ্মতর হয় তখন সে চিন্তাকে এড়িয়ে চলে, আর চিন্তা সব সময়ে কাজের থেকে গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রিয়ার থেকে চিন্তার ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু স্থূল মনের দৃষ্টি এরূপ নয়। অনেক সময় অনুন্নত-মনা পুরুষ ভাবে সে প্রভাবান্বিত হচ্ছে না অথচ সে তখন বাস্তবিকই প্রভাবিত হয়েছে। এটাই বড় মজার কথা। মন্দ চিন্তা মন্দ কাজের মতোই মন্দ। শ্রেষ্ঠ নীতির ক্ষেত্রে এই শর্তটি পূরণ করা দরকার ঃ চিন্তা পবিত্র হবে, বাক্য পবিত্র হবে, কর্ম পবিত্র হবে। আর চিন্তার পবিত্রতা ছাড়া বাক্য পবিত্র হয় না, কর্মের পবিত্রতা তো দূরের কথা!

আমরা দেখি, যে পুরুষ উচ্চতম নৈতিক সংস্কারের অধিকারী, সে কখনো মন্দ কাজ করে না, করায় না, এমনকি অনুমোদনও করে না। তার এই ত্রিবিধ দায়িত্ব ঃ সে কোন মন্দ কাজ করবে না, করাবে না বা কোন মন্দ কর্মের অনুমোদনও দেবে না বা তার থেকে কোন মুনাফাও করবে না।[১৩]

## প্রলোভন এড়িয়ে চল

আমাদের অধ্যাত্ম শিক্ষার সময় যথাসম্ভব স্থূল বা সূক্ষ্ম সব রকম প্রলোভন এড়িয়ে চলার চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। কোন জিনিস থেকে প্রলোভিত হবার সম্ভাবনা থাকলে তাকে নিরাপদ দূরত্ব থেকে নমস্কার করাই আমাদের উচিত, তার কাছে আমাদের যাওয়া উচিত নয়। দীর্ঘসময়ব্যাপী আমরা নিজ সামর্থ্যের ওপর খুব বেশি নির্ভর যেন অবশ্যই না করি। নোংরা স্মৃতিতে ভরা আমাদের মন এমনই মলিন যে, যদি সত্যই সে একবার নাড়া খায় তবে তা অনন্ত অনর্থের সৃষ্টি করতে পারে। ইন্দ্রিয় ভোগের লালসা, ঘৃণা, লোভ, অভদ্রতা—এই সব মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, ওঁত পেতে অপেক্ষা করছে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। কাজেই আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।

ঝামেলা সব সময়ে আসে ক্ষুদ্র বিপদ ও আপাত-সামান্য মানসিক তরঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে। বাহ্য উত্তেজনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অতি সামান্যভাবে অনুভূত হলেও, ধীরে ধীরে মনকে প্রভাবিত করে। কখনো কখনো মনের ওপর পুরাতন অশুদ্ধ ছাপের স্মৃতিই আমাদের হতবুদ্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট, জীবাণু বা

---

১৩ দ্রঃ পতঞ্জলি, যোগ-সূত্র, ২.৩৪

বীজ তো সব সময়ে অন্তরে থাকে, বাহিরে নয়। বীজ ভেতরে না থাকলে তা থেকে কখনো অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না।

আসক্তি, তা যে আকারেই হোক না কেন বুদ্ধিকে তালগোল পাকিয়ে দিতে ও সাধক-মনের আধ্যাত্মিক প্রবণতাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে, আবার এই আসক্তি যখন ক্রোধ যুক্ত হয়, তখন সমস্ত মনটা উৎক্ষিপ্ত হয় আর সব অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়-ভোগের লালসা যখন কোন ব্যক্তির ওপর তার প্রভাব বিস্তার করে, তখন উন্নততর জীবন যাপনের সব চেষ্টা (সংগ্রাম) শেষ হয়ে যায়। সেইজন্য কোনরকম ক্ষতিকর উত্তেজনা, তা খুব সূক্ষ্ম হলেও সাবধানে বর্জন করা উচিত এবং আমাদের মনকে উচ্চ চিন্তায় ধরে রাখা উচিত। নিম্নতর কোন প্রবণতা বা উত্তেজনাকে ওঠবার কোন সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। আমাদের উচিত অপর লিঙ্গের ব্যক্তিদের ও সমলিঙ্গের যেসব ব্যক্তি কঠোর নৈতিক জীবন যাপন করে না, তাদের সঙ্গে মেলামেশা যথাসম্ভব বর্জন করা, অন্তত আধ্যাত্মিক শিক্ষা চলাকালে।

ভোগাকাঙ্ক্ষাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। মনের স্বভাবই হলো চিন্তা করা, আর আমরা যদি সমস্ত পুরাতন মন্দ সংসর্গ বর্জন করে মনকে ভাল ও পবিত্র চিন্তার খোরাক দিতে না পারি, তবে তা মন্দ ও অপবিত্র চিন্তা নিয়ে থাকবেই। তাই উঠে পড়ে লাগ, সর্বদা সতর্ক থাক, বুদ্ধিমানের মতো পথ চল, সৎপথে থাকার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম কর। 'যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়, যতক্ষণ না শরীরের পতন হয়, বৈদান্তিক চিন্তায় মনকে ভরিয়ে রাখ।' [১৪]

## নৈতিক জীবনই আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রদর্শক হবে

হিন্দুমতে প্রতিটি মানবের দেহমনযুক্ত ব্যক্তিত্ব ও জীবন তিন *গুণের* দ্বারা শাসিত হয়, তারা সর্বদা একত্রে মিশে থাকে। এর মধ্যে *তমস্* হলো জড়তত্ত্ব, *রজস্* হলো গতিতত্ত্ব, *সত্ত্ব* হলো জ্ঞানতত্ত্ব। মানুষের স্বভাব নির্ভর করে যে *গুণ* প্রবল হয় তার ওপর। জীবনের মূল সমস্যা হলো আমাদের এই তিন *গুণের* মধ্যে সামঞ্জস্য বিহিত করা। *গুণগুলি* মই এর মতো ছাদে পৌঁছে দেয়। অলস ব্যক্তিকে উঠে পড়ে কাজে লাগতে হবে, কর্মঠ ব্যক্তিকে পবিত্র হতে হবে। যখন *সত্ত্বের* প্রাধান্য হয়, মানুষের মন পবিত্র ও স্বচ্ছ হয়। *সত্ত্ব* হলো মই-এর উচ্চতম ধাপ যা সত্যের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু সেটাই সত্য-স্বরূপ নয়।

---

১৪ দ্রঃ প্রথম অধ্যায়, পাদটীকা ১৭

'আসুপ্তেঃ আমৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদান্ত চিন্তয়া।।'—সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ, আপ্পাইয়া দীক্ষিত, প্রথম অধ্যায়, পরিসংখ্যা বিধি বিচার

আমাদের পবিত্রতা অবশ্যই আমাদের ঈশ্বর-উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাবে। দেবত্ব-লাভই হলো সব গুণের পারে যাওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্পে *গুণ*গুলিকে তিন ডাকাতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ঃ

"একজন ধনী বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তাকে ঘিরে ফেলল ও তার সর্বস্ব হরণ করলে। সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে একজন ডাকাত বললে, 'আর একে রেখে কি হবে? একে মের ফেল'—এই বলে তাকে কাটতে এল। দ্বিতীয় ডাকাত বললে, 'মেরে ফেলে কাজ নেই, একে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া যাক। তাহলে পুলিশকে খবর দিতে পারবে না।' এই বলে ওকে বেঁধে রেখে ডাকতরা চলে গেল। খানিকক্ষণ পর তৃতীয় ডাকাতটি ফিরে এল। এসে বললে, 'আহা, তোমার বড় লেগেছে, না? আমি তোমার বন্ধন খুলে দিচ্ছি।' বন্ধন খুলবার পর লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাকাত পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলতে লাগল। সরকারী রাস্তার কাছে এসে বললে, 'এই পথ ধরে যাও, এখন তুমি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে পারবে।' লোকটি বললে, 'সে কি মশায়, আপনিও চলুন; আপনি আমার কত উপকার করলেন। আমার বাড়িতে গেলে আমরা কত আনন্দিত হব।' ডাকাতটি বললে, 'না, আমার ওখানে যাবার জো নেই, পুলিশে ধরবে।' এই বলে সে পথ দেখিয়ে চলে গেল।

"প্রথম ডাকাতটি তমোগুণ, যে বলেছিল, 'একে রেখে আর কি হবে, মেরে ফেল।' তমোগুণে বিনাশ হয়। দ্বিতীয় ডাকাতটি রজোগুণ; রজোগুণে মানুষ সংসারে বদ্ধ হয়, নানা কাজে জড়ায়। রজোগুণ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া, ধর্ম, ভক্তি—এসব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ। তারপরেই ছাদ। মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।"[১৫]

ঈশ্বর ও ঈশ্বরানুভূতি অর্থাৎ তাঁকে আমাদের অন্তরে অনুভব করাই হবে আমাদের লক্ষ্য, তারপরে সকলের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের আদর্শ হবেন এমন পুরুষ যিনি কোন *গুণের* দ্বারা বদ্ধ নন, যিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন এবং যিনি *গুণের* কার্যাবলীতে চিরঅনাসক্ত। সৎচিন্তার সাহায্যে মন্দ প্রবণতাগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করে, তিনি সত্ত্বগুণেরও অতীত হন এবং অতীন্দ্রিয় স্তরে পৌঁছে যান। তাঁর মন বড় জোর সত্ত্বের ধাপ পর্যন্ত নামতে পারে, কিন্তু কখনই আর তার নিচে যেতে পারে না।

কেবল নীতিজ্ঞান থাকলেই মানুষ আধ্যাত্মিক হয় না। কেবল নৈতিক চরিত্রই মানুষের আধ্যাত্মিকতার কোন প্রমাণ হতে পারে না। যাকে সাধারণত প্রোটেস্টান্ট

১৫ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* পৃঃ ১৮২-৮৩

ধর্মমত (Protestantism) বলে, তাতে নৈতিকতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে ধরাটাই খুব বড় ভুল হয়েছিল। নীতিকথার প্রয়োজন আছে এবং সম্পূর্ণ নৈতিক জীবনযাপন না করলে কোন আধ্যাত্মিকতা হতে পারে না কিন্তু কেবল নৈতিকতা থাকলেই আধ্যাত্মিকতার ওপর দাবি জন্মায় না—আধ্যাত্মিকতা নৈতিক স্তরেরও অনেক ওপরে।

বেদান্তীরা বলেন ঃ কেবল নিষ্কাম কর্ম করা ও নৈতিক জীবন যাপন করাই যথেষ্ট নয়, নিখুঁত ভাবে কর্তব্য করাই যথেষ্ট নয়—কিন্তু আরো কিছু দরকার; তোমাকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ দিব্যজ্ঞান লাভ করতে হবে এবং সেই উপায়ে তোমাকে নিজেকেই সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে।

নিষ্কাম কর্ম ও নৈতিক অনুশীলনগুলি মন-বুদ্ধির প্রয়োজনীয় শুদ্ধিকরণের উপায় ও ধাপ মাত্র, এছাড়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কেউই লাভ করতে পারে না। চরম লক্ষ্যটি কিন্তু পরম চৈতন্য ও আনন্দ লাভ করা। এই চৈতন্য ও আনন্দ সদা আমাদের অন্তরেই বিদ্যমান, সেগুলিই আমাদের প্রকৃত সত্তা। কেবল তারা মনের ময়লা দিয়ে ঢাকা পড়ে আছে। ময়লাগুলি সরিয়ে ফেললেই সত্য আত্মা বিভাসিত হয়ে উঠবে।

ময়লা বলতে কেবল অসঙ্গত আবেগ ও মন্দ চিন্তা নয়। এমনকি তথাকথিত সঙ্গত আবেগ ও চিন্তাগুলি ধ্যানের ও আত্মোপলব্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ, তাদেরও ময়লা বলেই ধরতে হবে। নৈতিক জীবনের পক্ষে মন্দ চিন্তা ও মনের ওপর মন্দ প্রক্ষেপগুলির বিনাশ অথবা উদ্গতি একান্ত প্রয়োজন। মনের আবেগগুলি জীবকে মানসিক ও দৈহিক স্তরে আবদ্ধ রাখে। আধ্যাত্মিক জীবনের অর্থই হলো এ দুটিরই পারে যাওয়া। সেইজন্যই অধ্যাত্ম সাধককে তথাকথিত মামুলি সৎস্বভাবের ওপরে উঠতে হবে।

আবেগের স্তরে কোন রক্ষা কবচ নেই। সাধককে আবেগ সংযত রাখতে হবে এবং সেগুলি প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষায় উদ্গত করতে হবে। সাধককে সর্বদা মনে রাখতে হবে সঙ্গত আবেগ থেকে মন্দ আবেগের ফারাক অতি সামান্যই।

## প্রকৃত উদ্দেশ্য

আত্ম-সমবেদনা বা অযথা দুঃখবোধের মতো কিছু একটা করে মনকে কখনো দুর্বল করবে না। যদি আমরা প্রবলতম আবেগ ও বাসনার সম্মুখীন হয়েও স্থির থাকতে পারি, তবে আমরা নতুন কিছু সৃজনধর্মী কাজ করে নব উদ্যমে এগুতে পারি। অতীত নিয়ে ভাবনা একটা রোগবিশেষ, অধ্যাত্ম সাধক, এ রোগের লক্ষণ টের পেলেই নিজ অন্তরেই তার প্রতিকার করবে। ধ্যানে মন লাগাতে হলে আমরা

যেন আগে থেকেই অসত্য বা অপবিত্র চিন্তা ও আবেগের বন্ধন নিজেরাই ছিন্ন করি।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা প্রার্থনা ও জপ করতে করতে ধ্যানে প্রবৃত্ত হব। তোতা পাখির মতো বার বার ইষ্টনাম উচ্চারণে মেতে যাওয়া নয়, সব সময় যে পবিত্র নামে মন ভরে আছে—তার অর্থ বোধ অবশ্যই হওয়া চাই। প্রার্থনা ও *জপ* নিয়মিতভাবে করা হলে এক নতুন সমন্বয়ের ভাব এসে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাকে শুদ্ধ করে তোলে—প্রকৃত ধ্যানের দিকে এ একটি বড় পদক্ষেপ।

আমাদের গুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা শুনুন ঃ 'মনকে পবিত্র ও স্থির করার সব থেকে সহজ উপায় হলো—নিরালায় চলে যাওয়া, সব আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করা ও নিজেকে মননে ও ধ্যানে লাগিয়ে রাখা। মনকে সৎচিন্তায় যত ভরিয়ে রাখবে, ততই আধ্যাত্মিক উন্মেষ হবে। গরুকে ভাল খাওয়ালে যেমন সে বেশি দুধ দেয় তেমনি আধ্যাত্মিক খাদ্যে মনের ক্ষুধা মেটালে আরো শান্তি পাওয়া যাবে। আধ্যাত্মিক খাদ্য বলতে বোঝায় ধ্যান, প্রার্থনা, মনন ও *জপ*।

'মনকে স্থির করার আর এক উপায় হলো, তাকে ঘুরে বেড়াতে দিয়ে তার বেড়ানোর ওপর নজর রাখা। খানিক বাদে মনই ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে দেখবে ঈশ্বরেই শান্তি। যদি তুমি মনের ওপর নজর রাখ, মন আবার তোমার ওপর নজর রাখবে।'[১৬]

কিন্তু কেবল এইরকম আত্মকেন্দ্রিক ধ্যানই যথেষ্ট নয়। আমরা যেমন পরমাত্মার ধ্যান করব, তেমনি আমরা যেন অবশ্যই সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করি। নিয়ত ধ্যান অভ্যাসে অন্তর্জ্যোতিঃ, স্বজ্ঞালব্ধ তেজ বিকশিত হয়—যা দিয়ে আত্মা পরমাত্মার স্পর্শ উপলব্ধি করে তাতেই নিমগ্ন হয়ে থাকে। তা থেকে যে ঈশ্বরীয় ভাবাবেশ সৃষ্ট হবে, তাতেই আত্মার পূর্ণ রূপান্তর ঘটে।

যখন ঐ দেবমানব ঈশ্বরানুভূতির পর নিম্নস্তরে নেমে আসেন, তিনি তাঁর সঙ্গে নতুন দৃষ্টি নিয়ে আসেন ও সেই পরমাত্মাকে যেমন নিজের মধ্যে তেমনি সব জিনিসের মধ্যে দেখেন। তাঁর মনে শান্তি বিরাজ করে, যে শান্তি দুঃখে বা সফলতায় বিচলিত হয় না। ভয়, আসক্তি বা ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর হৃদয় প্রেমে ও সর্ব জীবের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে থাকে। ঈশ্বর চেতনার অব্যর্থ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি এক নতুন শান্তি লাভ করেন যা জাগতিক কোন জিনিসের সংস্পর্শ-বর্জিত, কিন্তু তিনি এই শান্তি ও আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবার জন্য আগ্রহী হন।

---

১৬ *The Eternal Companion*. Sw.Prabhavananda. Madras. Ramakrishna Math 1971. pp 251-252

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

# আধ্যাত্মিক জীবনে কাম নিয়ে সমস্যা

### জীবনের ওপর কামের প্রভাব

আধ্যাত্মিক জীবনে কাম একটি বিশেষ সমস্যা। প্রত্যেক সাধককে জীবনে কোন না কোন সময়ে কামের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। যেমন কোন কোন আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দেখিয়েছেন, সাধারণ মানুষের জীবনে কামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং তার চিন্তার, অনুভূতির ও ইচ্ছার অনেকটাই এর কবলে পড়ে। যারা কঠোর আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাইবে তাদের উচিত হবে নিজ জীবনে কামের প্রাধান্য কমানো। যারা বাল্যকাল থেকে শুদ্ধজীবন যাপন করে এসেছে, তাদের কাছে সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু আধুনিক যুবক ঝুড়ি ঝুড়ি অসৎ চিন্তা সঞ্চয় করে অধ্যাত্মজীবনে পা বাড়ায়। সাধারণত তাকে এক বিরাট আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করতে হয়, তবেই সে সাফল্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করতে পারে।

কাম সম্বন্ধে বড় বাধা হলো, ব্যক্তিত্বের নানা স্তরে এর অবস্থান। কাম সবটাই দৈহিক নয়। শারীরিক উত্তেজনা ছাড়া, কাম মনের স্তরে সূক্ষ্ম আকর্ষণ ও মোহ রূপে থাকে। এ যেন জলে ভাসা বরফের চাঙড়, যার ওপরের অংশটুকুই জলের বাইরে দেখা যায়। সাধক যত অন্তর্মুখ হয়, ততই সে তার অন্তরস্থ কামের সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখাগুলিকে বুঝতে পারে। প্রায়শ লোকে এতে ভয় পায়। কামজয় যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায়, খুব কম লোকেই তার সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু পুরোপুরি এর মোকাবিলা না করলে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন হতে পারে না। এর জন্য সাধকের প্রচণ্ড চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দৃঢ়সঙ্কল্প প্রয়োজন। সাধারণ লোক যদি প্রকৃত অধ্যাত্ম সাধকের মনের মধ্যে একটু উঁকি মারে, তবে সে ভয়ে পালাবে। এ যেন লোহা গলানর চুল্লির (Blast Furnace) ভেতরের দিকটার মতো, যেখানে খাঁটি লোহাকে সর্বদা আকরের আবর্জনা থেকে তফাত করা হয়ে থাকে।

### চির কৌমার্য ও বিবাহ

আধ্যাত্মিক সাধকের প্রথমেই স্থির করা উচিত, চিরকুমার থাকবে না বিবাহ করবে। হিন্দুধর্মে বিবাহিত জীবনকে মন্দ হিসেবে দেখে না, তবে নিশ্চয়ই কিছু

বিধি নিষেধ আরোপ করে। কিন্তু চিরকুমারের ক্ষেত্রে এর নিয়মাবলী বেশ কঠিন। যারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চায়, তারা বুঝবে যে চিরকৌমার্য একান্তই প্রয়োজন। খ্রীস্ট বলেন ঃ

> **কতকগুলি খোজা আছে যারা মাতৃজঠর থেকেই ঐ ভাবে জন্মেছে, কতকগুলিকে পুরুষ থেকে ঐরূপ করা হয়েছে; আর কতকগুলি নিজেরাই ঐরূপ হয়েছে স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য। যে এই ভাব গ্রহণ করতে পারবে, তাকে করতে দাও।**[১]

শরৎ ও শশী (পরে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) যখন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে আসে, তিনি তাদের এই অনুচ্ছেদটি পড়তে বলেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, বিবাহই সব বন্ধনের মূল কারণ। সব বড় বড় অবতার-কল্প পুরুষই এ বিষয়ে এক মত, কিন্তু সংসারী লোক সর্বদা ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার জন্য কিছু করতে উদ্বিগ্ন, যেন ঈশ্বর তাদের সাহায্য চেয়েছেন। এসবই ভণ্ডামি ও অর্থহীন বাক্য। তাঁর সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর কারও সাহায্যের অপেক্ষা করেন না আর এই সব লোকগুলি প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে চিন্তাও করে না। তারা চায় তাদের ভোগ, ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। এক বিখ্যাত চিঠিতে সন্ত পল লিখেছিলেন ঃ

> **তাই আমি কুমারী ও বিধবাদের বলি। আমার কথা শুনে চললে তাদেরই ভাল হবে। তারা যদি সংযত থাকতে না পারে, তবে দগ্ধ হওয়ার থেকে বিবাহ করাই শ্রেয়।**[২]

এটি অতি কল্যাণকর নির্দেশ। আমরা বলি না যে সকলকেই সন্ন্যাসী হতে হবে। তা নির্ভর করে মানুষটি উন্নতির কোন্ স্তরে উঠেছে তার ওপর। সন্ন্যাসী হয়ে ব্রত ভঙ্গ করা অপেক্ষা গৃহী হয়ে থাকা ভাল। বাহ্য ত্যাগের পেছনে অন্তরের ত্যাগ চাই, অন্যথায় ঐ ত্যাগের কোন মূল্য নেই। সন্ন্যাসীর দুই ত্যাগই চাই, কেবল বাহ্য ত্যাগে কিছু হবে না। যারা দুর্বলতার জন্য অন্তরের ত্যাগ করতে পারে না—আর যারা সাংসারিক ধারণা, আশা ও চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তাদের পক্ষে ভণ্ড না হয়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপনই ভাল। যে ঠিক ঠিক অন্তরে ত্যাগ করেছে, সে সংসারে বাস করেও অখণ্ড *ব্রহ্মচর্যের* নিয়ম ও সব নৈতিক ব্যবস্থাদি পালনে সক্ষম হয় এবং অন্য কোন মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে বদ্ধ না হয়ে কামগন্ধহীন, হিংসা-দ্বেষ-আসক্তি বিহীন জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু এ কাজ অতীব দুরূহ এবং বহুলোকের পক্ষেই অসম্ভব, যদি না সে প্রাথমিক অধ্যাত্ম-শিক্ষা পেয়ে বহু বৎসর যাবৎ আধ্যাত্মিক উপাসনা করে থাকে। তারা অন্তত জানুক, যদিও এ ধরনের জীবন বিরল এবং অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে খুবই দুরূহ, তবু এ জীবন সম্ভব।

১ Bible, St. Matthew, 19:12

২ Bible, I Corinthians, 7 : 8,9

যারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে চায় বা সারাজীবন ব্রহ্মচারী থাকতে চায় তাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এক ইঁদুর সাধুর জীবন কি করে নষ্ট করেছিল—তোমরা কি সে গল্প জান? এক সাধু ছিল, একটা ইঁদুর রোজই তার ধ্যানের ব্যাঘাত করত। তাই কোন সহৃদয় লোক তাকে একটি বেড়াল দিল, ইঁদুরটি ধরবার জন্য। স্বভাবতই বেচারা সাধুকে বেড়ালটিকে দুধ খাওয়াতে হতো। কিন্তু দুধ পাওয়া দুষ্কর ছিল তাই সে একটি গরু কিনবে ঠিক করল। গরুটিকেও খাওয়াতে হবে, তাই লোকে পরামর্শ দিল, 'একটু জমি কেন না কেন?' পরামর্শটি পছন্দসই হওয়ায় সে জমি কিনল। কিন্তু কিছুদিন বাদে সে দেখল, জমিতে লাঙ্গল দিতে হবে এবং এতে এত কাজ যে সে নিজে একা পারবে না। তাই সে বিয়ে করল এবং সাধু জীবনের ইতি করল। মানব জীবনে প্রায়ই এই রূপকে বর্ণিত অবস্থার অনুরূপ হয়ে থাকে। একটা বাসনা আর একটা বাসনাকে নিয়ে আসে, শেষে তার সংখ্যা এত হয়ে যায় যে তাদের আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না।

## গৃহস্থের কর্তব্য

সব উচ্চ আধ্যাত্মিক পথেই ব্রহ্মচর্যের ওপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। হিন্দুধর্ম-পদ্ধতিতে ছাত্রকে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করতে বলা হয় এবং জ্ঞাতসারে এর অন্যথা যেন না হয় তাও বলা হয়। যখন সে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে, তখনো সে আত্মসংযমকে বাতাসে উড়িয়ে দেয় না। সে বিশেষভাবে সংযত জীবনের আদর্শটি সামনে রাখে। শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে তাঁর শেষ বাণীতে বলেছেন ঃ

> **'সন্তান উৎপাদন ব্যতীত অন্য সময়ে ব্রহ্মচর্য পালন, পবিত্রতা ও সন্তুষ্টির সঙ্গে নিয়মিত দায়িত্ব পালন এবং জীবজন্তুর প্রতি দয়া এগুলিই গৃহস্থের কর্তব্য।'**[৫]

আদর্শ গৃহস্থ হলেন একজন মহাবীর, কারণ তাকে প্রলোভন-পূর্ণ জগতে আধ্যাত্মিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। যারা সন্তান উৎপাদন করে তার মাধ্যমে সমাজের সেবা করে সংসার জীবন যাপন করবে তাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হলেও, অন্য সব অধ্যাত্ম সাধকেরই যৌন তেজ ও যৌন চিন্তাকে অধ্যাত্ম শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ কাজ সুপ্ত অধ্যাত্ম-চেতনার-জাগরণে ও উচ্চতর চেতনা-কেন্দ্রগুলিতে সেই চেতনার প্রবাহ বিস্তারে প্রভূত সহায়তা করে এবং সাধক নতুন আলো ও আশীর্বাদ লাভ করে। গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম করার কারণ বিবাহিত জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন

---

৫ ব্রহ্মচর্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্বেষাং মদুপাসনম্॥ (ভাগবত, ১১.১৮.৪৩)

কার্যত সম্ভব নয়। তবে একই সঙ্গে গৃহস্থকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ আত্মসংযমের দিকে যেতে বলা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'দু-একটি ছেলে হলে ভাই ভগ্নীর মতো থাকবে,'[৪] এই রকম আত্ম-সংযমের জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই একেবারে গোড়া থেকেই চেষ্টা করতে হবে। নীতি ভ্রষ্টতার অর্থ কেবল বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গে অর্জিত অপবিত্রতাই নয়; স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গেও মানুষ নীতিভ্রষ্ট হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে যদি কেউ অস্বাভাবিক যৌন সংসর্গে লিপ্ত থাকে তবে প্রকৃত আধ্যাত্মিক চেষ্টার জন্য যে তেজ ও উদ্যম একান্ত দরকার, তা সে কোথা থেকে পাবে? এই তথ্যটিকে আমাদের পরিষ্কারভাবে ও নিরাসক্ত চিত্তে মেনে নিতে হবে। উচ্চতর জীবন যাপনের জন্য আমাদের প্রভূত তেজের প্রয়োজন এবং আমাদের এই তেজ যা সত্যই একটি তেজ—তাকে যৌন খাতে নষ্ট হতে দেওয়া যেতে পারে না, যদি আমরা উন্নতি চাই ও পূর্ণতা অর্জনে সত্যই অভিলাষী হই। আধ্যাত্মিক জীবন শুধুমাত্র সামাজিক নীতি শাস্ত্রসম্মত ও সাধারণে যাকে সৎজীবন বলে থাকে তা নয়, আরো বেশি কিছু। এর জন্য প্রচুর আত্ম-সংযম ও পবিত্রতা প্রয়োজন। যে কেউ উচ্চতর জীবন যাপন করতে চাইবে, তাকে এর জন্য পুরা দাম দিতে হবে। এতে কোন দর কষাকষি চলতে পারে না। বিবাহিত ব্যক্তিদেরও প্রচুর আত্ম-সংযম অভ্যাস করতে হবে, যদি তারা আন্তরিকভাবে অধ্যাত্ম-জীবনের অভিলাষী হয়।

নিউ টেস্টামেন্টে (New Testament), (বাইবেলের অন্তখণ্ডে) যীশুখ্রীস্ট মৃত্যুর পর জীবাত্মার জীবন সম্বন্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছিলেন ঃ 'পুনরুত্থানের পর তারা বিবাহ করে না, কেউ তাদের বিবাহ দেয়ও না, কিন্তু তারা স্বর্গে ঈশ্বরের দূতের মতো থাকে।'[৫] মরণের পরে আমাদের জীবনের কথা আমরা কদাচিৎ চিন্তা করে থাকি। পর-জীবনে কি লোক বিবাহ করে সন্তানের জন্ম দেয়? মৃত্যুর পরে জীবাত্মার কি হয়? ভবিষ্যৎ বর্তমানের মতোই সত্য, কিন্তু খুব কম লোকেই তা নিয়ে মাথা ঘামায়। বর্তমান জীবনের নানা আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে আমরা কদাচিৎ ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করি।

গৃহস্থদের আর একটি বড় কর্তব্য হলো, বয়সে ছোট যেসব নর নারী আন্তরিকভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করে সন্ন্যাসীর বা সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে চায় তাদের উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা। শ্রীশ্রীমা প্রায়ই বলতেন, 'অবিবাহিত মানুষ অর্ধ-মুক্ত।'[৬] অনেক সময়েই বাপ-মা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্তানদের

---

৪ পূর্বোল্লিখিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৭৪১।

৫ Bible. St. Matthew. 22:30

৬ *At Holy Mother's Feet*. Kolkata : Advaita Ashrama. 1963. p 367

বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করাবার জন্য অতি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। তোমরা জান যে শ্রীরামকৃষ্ণের এক অতি বিশিষ্ট শিষ্য স্বামী যোগানন্দের কি হয়েছিল? যুবাবস্থায় তিনি বিবাহ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু মায়ের অনুনয় ও কান্না সহ্য করতে না পেরে তিনি শেষ পর্যন্ত বিবাহ করেন। তৎসত্ত্বেও তিনি ব্রহ্মচর্য পালন ও আধ্যাত্মিক সাধনা করে চললেন। তাই দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি তুই গৃহস্থের জীবন যাপন না করবি তবে কেন বিয়ে করলি?' উত্তরে নিরীহ যুবকটি বলে যে সে তাঁর জন্যই বিবাহ করেছে। মাতা বলেন, 'বাছা কেউ কি পরের কথায় বিয়ে করে? প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছাতেই বিয়ে করে।' এ কথায় যোগীন খুবই আঘাত পেয়েছিল। অনেক বাড়িতেই এমন হয়ে থাকে। বাবা-মা, এমনকি সন্তানের অমতেও তাদের বিয়ে দেয়, পরে তাদের নিজ ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়। অনেক সময়েই সন্তানদের বিবাহের পরেও বাবা-মা তাদের জীবনযাত্রায় অযথা হস্তক্ষেপ করে এবং তা থেকে পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এও সত্য যে সব যুবক-যুবতীই অবিবাহিত থাকতে চায় না। এ কথাও সত্য যে অনেকেই নিজ মনের খবর না জেনেই ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে কথা বলে থাকে। কিন্তু সব সময়েই কিছু সরল যুবক-যুবতী আছে, যারা পবিত্র হৃদয় এবং আন্তরিকভাবে একমাত্র ঈশ্বরের কাছে তাদের হৃদয় ও আত্মাকে সমর্পণ করেছে। কয়েকজনকে মঠে বা সেরকম অন্য কোথাও থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র জীবন যাপন করতে দাও না কেন? তাদের কয়েকজনকে পুণ্যভাবের ও পবিত্রতার সৌরভ উপভোগ করতে দেওয়া হবে না কেন?

শ্রীশ্রীমা তাঁর ভাইঝিকে একবার যা বলেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করলে ভাল হয়। একদিন মনসা নামে একটি যুবক শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা ও গেরুয়া নেবার ইচ্ছায় তাঁর কাছে আসে। শ্রীশ্রীমা আনন্দের সঙ্গে তার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। এতে সে খুবই খুশি হয়। সন্ধ্যার সময় সে কালী মামার বাড়িতে বসে জগন্মাতার স্তুতিগান করছিল। এই গান শ্রীশ্রীমায়েরও খুব পছন্দ। তাঁর ভাইঝি রাধু, মাকু ও নলিনী, তাঁর দু এক জন ভাই-বৌ ও অন্য ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে ছিল। তাঁর একজন ভাই-বৌ বলল, 'এই যুবাটিকে সাধু করে দিয়েছেন।' মাকু মন্তব্য করে, 'তা সত্যি, দেখ না পিসিমার কাজ। তিনি এই সব ভাল ছেলেগুলিকে সন্ন্যাস জীবন নেওয়াচ্ছেন। তাদের বাবা-মা কত কষ্ট করে এদের এত বড়টি করেছে। তাদের সব প্রত্যাশা ছেলেদের কেন্দ্র করে। তাদের ওপর কত আশাই না তারা পোষণ করে! সে সব এখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এই ছেলেরা এখন কি করবে? হয় তারা হৃষীকেশে গিয়ে ভিক্ষে করবে, নয়তো হাসপাতালে গিয়ে রুগীদের মলমূত্র পরিষ্কার করবে! কেন? বিয়ে করে সংসার করাও তো একরকম ধর্ম। আচ্ছা, পিসিমা, তুমি যদি এইসব ছেলেদের "সাধু" করে দাও, "মহামায়া" তোমার ওপর রাগ করবেন।

তারা যদি সাধু হতে চায়, তারা নিজের ইচ্ছেয় হোক। তাদের সন্ন্যাসী হবার ব্যাপারে তুমি কেন নিমিত্তের ভাগী হবে?' শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলেছিলেন, 'দেখ মাকু, এরা সব দেবশিশু। এরা সংসারে নিষ্কলুষ হয়ে বাস করবে অনাঘ্রাত ফুলের মতো। তার থেকে আর কি ভাল হতে পারে? তোরা তো নিজেরাই দেখছিস সংসারে কত সুখ। এতদিন আমার কাছে থেকে কি শিখলি? সংসারজীবনে এত আকর্ষণ কেন? এত পশুবৃত্তি কেন? তোরা কি পবিত্র জীবনের আদর্শ স্বপ্নেও ভাবতে পারিস না? এখনও কি তোরা তোদের স্বামীর সঙ্গে ভাই বোনের মতো থাকতে পারিস না? শূয়োরের মতো বেঁচে থাকার বাসনা কেন? জগতের এই দুঃখ আমার হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে।'

যারা বহু বছর ধরে কামেচ্ছাকে পুরোপুরি সংযত রাখতে পেরেছে এবং চিন্তায় কথায় ও কাজে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করতে পেরেছে, তারা উচ্চস্তরে অবিশ্বাস্য সৃজনী-শক্তি অর্জন করেছে। প্রকৃতপক্ষে কেবল তারাই জীবনটাকে ভোগ করে, দেহের দিক থেকেও, কারণ তারাই কেবল দেহ ও মনের প্রভু এবং তাদের খুশি মতো এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একজন ভাল সওয়ার ঘোড়ায় চড়ে, ঘোড়াকে তার মনোমতো চালিয়ে খুব সুখ পায়। সংসারী লোক জানে না—সম্পূর্ণ পবিত্র লোক তার দেহকে ভিত্তি করেই কত না সুখ ভোগ করে থাকে, মনোভিত্তিক সুখের তো কথাই নেই।

## অবিবাহিতদের প্রতি সাবধানবাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের, যারা অধিকাংশই ছিল যুবা, 'কামিনী-কাঞ্চনে'র (মেয়ে আর সোনা) ফাঁস থেকে সর্বদা সাবধান থাকতে বলতেন। কিন্তু যেসব মেয়ে তাঁর কাছে উপদেশের জন্য আসত তাদের বলতেন, 'পুরুষ মানুষের ফাঁস থেকে সাবধান থাকবে—তা সে নিকট আত্মীয় হলেও।' চিন্তায়, কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ পবিত্র না হলে কেউ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে পারে না। সাধক খাঁটি পবিত্রতা কতটা অর্জন করেছে—তার ওপরই নির্ভর করে তার সব উন্নতি। প্রত্যেকেরই অপর লিঙ্গের প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। খাঁটি পবিত্রতা বলতে কেবল যৌন সংসর্গকে এড়িয়ে চলা নয়, অসংখ্যগুণ বেশি আরও কিছু।

প্রত্যেক অবিবাহিত ব্যক্তিরই, সে যেই হোক, অপর লিঙ্গের ব্যক্তির [illegible] বা নারীর) সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত এবং সর্বদা সজ্ঞানে যৌনভাবের পরি[illegible] মগ্ন থাকা উচিত। বিশেষত আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ায়, অনেকের

---

৭ দ্রঃ Swami Tapasyananda, *Sri Sarada Devi, The Holy Mother* (Madras : [illegible] Math, 1969) pp. 417-18

প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যখন আমরা জমিতে ভাল করে জল ও সার প্রয়োগ করি যে চারাটির বৃদ্ধি আমরা আগে থেকে চেয়েছি, তার সঙ্গে আগাছাগুলিও বেশ ভালভাবে বৃদ্ধি পায়। একটু গজিয়ে উঠলেই আগাছাগুলিকে তুলে ফেলে দেওয়াই আমাদের কাজ হবে। অন্যথায় তারা ভাল চারাগুলিকে দমিয়ে অর্থাৎ মেরে ফেলবে। এর অর্থ আমাদের প্রচেষ্টার প্রথম কয়েক বছর আমরা যেন অন্তরঙ্গ সঙ্গী নির্বাচনে অত্যন্ত সর্তক হই। কখনো ভেবো না তুমি এত তেজস্বী যে, এসব উপদেশ শোনার ওপরে। যত পবিত্রই হও না কেন, অপর লিঙ্গের ব্যক্তির সংসর্গে বেশিক্ষণ থাকা এড়িয়ে চলবে। মহৎ লক্ষ্যের প্রতি প্রকৃত অনুধাবনের শেষ পর্যায়ে এসে, নিজের পূর্ণ সত্তার রূপান্তর হবার আগে, মনের একাগ্রতা যৌন কল্পনাকেও প্রভাবিত করে এবং আপাত নির্দোষ ছবিকেও আরো স্পষ্ট ও জীবন্ত করে তোলে ও আপাত নির্দোষ আবেগকেও অতি তীব্র কামেচ্ছায় পরিণত করে। এই কামাবেগ একেবারে স্থূলভাবে নাও হতে পারে। সূক্ষ্ম আকর্ষণ, সূক্ষ্ম উত্তেজনা ঐগুলির স্থূলভাবের থেকে বেশি অনিষ্টকর, কারণ প্রবর্তকদের ক্ষেত্রে ঐ সুখগুলি সহজে বোঝা যায় না, যেমন বোঝা যায় স্থূলগুলি। আমি অনেক সময় দেখেছি প্রবর্তকরা এই সব বিষয়ে অত্যন্ত অমনোযোগী এবং অনেকেই এর জন্য কষ্টে পড়েছে।

সঙ্গী পছন্দ করার ব্যাপারে সর্তক না হওয়ার ফল একটি কৌতুকপূর্ণ গল্পের মাধ্যমে বেশ ভাল করে বর্ণনা করা হয়েছে। একদা এক উট তার নাকটি এক আরববাসীর তাঁবুর দরজার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সে আপত্তি করায় উট বলল, 'ও! আমি মুহূর্তের জন্য তোমার ঘরে আমার নাকটি কেবল ঢুকিয়েছি। তার বেশি নয়।' কিন্তু আসলে সে একটু একটু করে তার কুৎসিত মাথাটি ঢুকিয়ে দিল, পরে তার পুরো শরীরটাই দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেয় এবং তখন তাঁবুতে ঢোকার জন্য মালিক প্রতিবাদ জানালে উট বলে, 'যদি তুমি তোমার বাড়িতে আমার উপস্থিতি পছন্দ না কর, তবে তুমি বরং বেরিয়ে যাও, আমি নয়।' কাম কখনো কখনো এই রকম কোন এক ভাবে আসে, 'কর্তব্য'রূপে, 'দয়া'রূপে 'সেবা'রূপে আমাদের মন সব সময়েই এ বিষয়ে তার প্রকৃত মতলব সম্বন্ধে আমাদের প্রতারণা করতেই থাকে। চিন্তায়, কথায় ও কাজে পবিত্রতা ছাড়া অধ্যাত্ম জীবনে কিছুই করা যায় না। অবচেতন বা অচেতন মন সর্বদাই আমাদের ক্ষতিসাধনে উন্মুখ এবং ধীরভাবে অপেক্ষা করে থাকে, ঐকাজ সাফল্যের সঙ্গে করবার সুযোগের জন্য। তাই যখন তখন তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করা উচিত। এই মনের ভেতর কিছু শক্তিশালী কর্ম প্রেরণার সঞ্চার কর, আর তাকে সংযত রাখ। যেমনই হোক, তুমিই প্রভু, মন নয়। উটকে ভেতরে ঢুকতে দিও না। একবার ঢুকতে দিলে, তাকে আবার বার করে দিতে অনেক অসুবিধা হবে।

## স্ত্রী-পুরুষ-তত্ত্বের পারে

যদি কোন মেয়ের কথা মনে হয়, তখনই তাকে শ্রীশ্রীমার অথবা তোমার মায়ের মূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে দাও। লিঙ্গ-চিন্তাকে তখনই নষ্ট করে ফেল। মনে মনেও নিজেকে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশতে দেবে না। তন্ত্রশাস্ত্রে একটি উপদেশে আছে, সব নারীমূর্তিকে 'উমা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেবে, আর সব নরমূর্তিকে 'শিবে'র সঙ্গে। আধ্যাত্মিক জীবনে এই মনোভাবের প্রভূত মূল্য। শঙ্করাচার্যের লিখিত একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোক আছে ঃ 'পার্বতী আমার মাতা, শিব আমার পিতা, শিবের ভক্তগণ আমার বন্ধু, ত্রি-ভুবন আমার স্বদেশ।'[৮]

যে সাধক ঈশ্বরকে নিজ পিতা ও মাতারূপে দেখে সে পৃথিবীর সর্বত্রই নিরাপদ। কিন্তু প্রবর্তকের পক্ষে এভাব ঠিক ঠিক আসে না। সেজন্য বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে চলা-ফেরা বা কথা বলার বিষয়ে তার সাবধান থাকা উচিত।

লিঙ্গ-চিন্তার প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখার আর একটি কার্যকর উপায় আছে। কয়েকজন নারী ও পুরুষের কথা একটু মনে কর যাদের যৌনজীবন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। এ রকম মনে করায় অনেক ভাল ফল হয়। যদি তুমি এরকম কোন পবিত্র লোকের কথা না জান, তবে শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীমার কথা চিন্তা কর, তাঁরা আজন্ম সব দিক থেকে যৌন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। এই ভাবটি প্রতিদিন চিন্তা কর, তোমার আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অঙ্গ করে নাও। তোমার নিজের আত্মা বা অহং ধীরে ধীরে এই পবিত্র ব্যক্তিত্বের উদার গুণগুলি গ্রহণ করতে থাকবে এবং ঠিক সময়ে রূপান্তরিত হবে।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হবে পুংতত্ত্ব ও স্ত্রীতত্ত্ব দুটোরই পারে যাওয়া এবং এমন এক স্তরে পৌছনো যেখানে কোন লিঙ্গ-তত্ত্ব একেবারেই নেই। জীবনের নিচের স্তরগুলিতেই আমরা পুরুষ ও স্ত্রী দেখে থাকি, কিন্তু উচ্চস্তরে লিঙ্গভাব মুছে যায়। অন্য একটি শ্লোকে শঙ্করাচার্য বলেছেন ঃ হে শিব! তুমি আমার আত্মা। জগন্মাতা আমার মন। আমার প্রাণগুলি তোমার প্রহরী ও শরীর তোমার আবাস। সব ইন্দ্রিয় সংযোগ তোমার পূজার অঙ্গ। আমার নিদ্রা তোমাতে 'সমাধি'-মগ্ন হয়ে থাকা। আমি যেখানেই যাই, তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা হয়। যেসব কথা বলি সবই তোমার স্তুতি। যেসব কাজে আমি নিযুক্ত থাকি, হে প্রভু! সে সবই তোমার পূজা।[৯]

---

৮ মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥ অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্, শ্লোক ঃ ১২

৯ আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সংচারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো যদ্যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥
শিবমানসপূজা, শ্লোক ঃ ৪

## কেবল বীরপুরুষই সত্যকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখে

সাধকের জীবনে লিঙ্গ-সচেতনতা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কাজ করে যে তাকে কখনই জাগিয়ে তোলা উচিত নয়, এমনকি ছবি দেখার সময়েও নয়। প্রথমে তোমার দেহ-চেতনাকে, যৌন-চেতনাকে কমিয়ে ফেল—'আমি একজন নর বা নারী' প্রভৃতি চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে ফেলতে তুমি যতটা সক্ষম হবে ততই তুমি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন প্রতিক্রিয়ার অংশীদার হবে। কোন কোন মানুষের চেতনা দেহ কেন্দ্রিক, তারা নিজেদের নর বা নারী ভাবতেই অভ্যস্ত, এই পরিবর্তন তাদের মধ্যে প্রথমে ভীতিপ্রদ অব্যবস্থার সৃষ্টি করবে। এসব লোকেদের এই সত্যটুকু বলাই চলবে না। সে ক্ষেত্রে অন্য কিছু মিশিয়ে সত্যকে এত লঘু করতে হবে যাতে তার মধ্যে সত্য অল্পই বর্তমান থাকে এবং যেটুকু থাকে তাকেই কার্যকর আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যেসব আধ্যাত্মিক সাধক খুব আগ্রহী কেবল তাদেরই এ ব্যাপারের পূর্ণ সত্য বলা চলবে। স্বামীজী তাঁর 'সন্ন্যাসীর গীতি'-তে জোর দিয়েই বলেছেন :

> সত্য সেথা নাহি আসে, যেথা কাম-যশ-লোভ বেঁধেছে বাসা,
> কামিনীতে স্ত্রীবুদ্ধি রয়েছে যাহার, নাহি তার পূর্ণত্বের আশা।
> ক্রোধ যারে করে বশ, কিংবা তুচ্ছ দ্রব্যে যার অধিকার,
> সে কভু নাহি পারে পার হতে মায়ার দ্বার।
> তাই, ছাড় ঐ সব, হে বীর সন্ন্যাসী!
> বল ওঁ তৎসৎ ওঁ।[১০]

এই সব সত্য অধিকাংশ লোকের পক্ষে খুবই অত্যধিক হয়ে পড়ে। তারা এসব সহ্য করতে পারে না, অব্যবস্থচিত্ত হয়ে পড়ে। তাই এদের অল্প মাত্রায় স্বল্প সময়ের জন্য এসব দিতে হবে, লঘু মাত্রায় সত্যের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে (ইন্‌জেক্‌সন)। কিন্তু একদিন প্রত্যেককেই এই সত্যের সামনা সামনি হতে হবে ও তার অনুসরণ করতে হবে—এতে তাদের হৃদয় চূর্ণ হয়ে গেলেও কিছু করার নেই। কেবল বীরেরই কাজ এ সত্যকে সহ্য করা। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনে দুর্বলচেতাদের স্থান নেই। সত্য ধর্ম, প্রকৃত বেদান্ত, পরিহাসের ব্যাপার নয়।

---

১০ পূর্বোল্লিখিত 'বাণী ও রচনা'র ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৬-এ স্বামী শুদ্ধানন্দকৃত সংশ্লিষ্ট স্তবকটি এইরূপ : পশিতে পারে না কভু তথা সত্য, কাম-লোভ-বশে যেই হৃদি মত্ত; কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যেজন, হয় না তাহার বন্ধন-মোচন; কিম্বা কিছু দ্রব্যে যার অধিকার, হউক সামান্য—বন্ধন অপার; ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পায়ে যার, হইতে পারে না কভু মায়া পার। ত্যজ অতএব এসব বাসনা আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা—ওঁ তৎসৎ ওঁ।

## তোমার মনের প্রতারণা থেকে সাবধান

সব লোভই মানসিক। সচরাচর আমরা যা করি তার থেকে আমরা যা ভাবি তা অনেক বেশি বিপদ ডেকে আনে। তাই তোমার কল্পনা সম্বন্ধে যত্ন নাও। অন্যের মানসিক স্পন্দন তোমার মনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে সে বিষয়ে সাবধান হও। উচ্চ সংবেদনশীলতাকে বেশি করে গড়ে তোল। 'আমি অপবিত্র কিছু করি নি' বললেই যথেষ্ট হলো না। অন্যের সংসর্গে তুমি কিরূপ বোধ কর, তুমি কি চিন্তা কর, তা বিশ্লেষণ করে দেখ; সেগুলি তোমাকে আকর্ষণ করে কি না? যে মুহূর্তে কোন কিছু আকর্ষণ বা বিকর্ষণবোধ মনে জাগবে, সাবধান হয়ে যাও। যারা তোমাকে প্রলোভিত করছে তাদের সকলকে দূর থেকেই প্রণাম কর। সূক্ষ্মভাবে দেখলে কোন আকর্ষণই নির্দোষ নয়। এ বিষয়ে নিজেকে প্রতারণা করো না। যেসব লোকের সঙ্গে মিশলে পুরান অপবিত্র সঙ্গগুলির কথা মনে উঠতে পারে তাদের সঙ্গে মিশবে না। যখন তুমি এ উপদেশ পালন করবে ও মনের মধ্যে তীব্র বিপরীত চিন্তাধারা ও ধ্যান অভ্যাস করবে, তখন তুমি অসাবধানতাবশত যেসব স্মৃতিকে মনের তলদেশে তলিয়ে দিয়েছিলে, সেগুলিকে ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হবে। কেবল তখনই তোমার অধ্যাত্ম জীবন কিছুটা নিরাপদ হবে। বিপরীত চিন্তাধারাকে বার বার ওঠালে প্রলোভন কমে যায় এবং শেষে নতুন আধ্যাত্মিক চিন্তাগুলি পুরান সঙ্গ ও তার স্মৃতির স্থান পুরাপুরি দখল করে নেয়, তবে উপদেশগুলির ঠিক ঠিক অনুসরণেই তা সম্ভব। তুমি সহসা মনকে শূন্য করতে পারবে না। প্রবর্তকের পক্ষে তা করতে যাওয়াও বিপজ্জনক। তাই প্রথমে সৎচিন্তা করতে শিখতে হয়। চিন্তান্তরের উৎক্রান্তির প্রশ্ন কেবল অনেক পরেই এসে থাকে।

মনের সংযম আসে ধাপে ধাপে অভ্যাসের মাধ্যমে, কিন্তু তোমার চলার পথে অসাবধান হলে মনঃসংযম কখনো আশা করা যায় না। যদি তুমি অন্যের প্রতি আকর্ষণকে তোমার ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দাও, তুমি যেভাবেই চেষ্টা কর না কেন মনকে বশে আনতে পারবে না। ফলে কিছুদিন পরে তোমার এক বিপজ্জনক পদস্খলন ঘটবে। যদি পুরুষ হিসাবে কোন নারীকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দাও, যদি কোন নারীকে তুমি তোমাকে আকৃষ্ট করার সুযোগ দাও, তবে মনকে বশে আনার কোন প্রশ্ন আর উঠবে না। তুমি সর্বদা এমন আচরণ করবে যাতে প্রত্যেক মহিলাই অনুভব করে যে, যৌন স্তরে তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাবে না, তুমি তার মধ্যে কোন নারীকে দেখছ না এবং কোন নারীর ব্যাপারে তুমি আগ্রহী নও। কিন্তু প্রবর্তকের পক্ষে যথাসম্ভব অন্য লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গ বর্জন করাই বিধেয়, অন্য লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলাও সর্বথা বর্জনীয়।

যদি অন্যে তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হলেও তুমি মন থেকে তাদের ঝেড়ে ফেলে দেবে। আমরা আগে যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকি না কেন, সম্পর্কের অবসান ঘটাতেই হবে। যে ভালবাসা বিপদসঙ্কুল তাকে যেমন করেই হোক বর্জ্জন করতে হবে। এ বিষয়ে ভাবপ্রবণতার উদ্রেক হতে দেবে না। অন্যথায় তোমার আহাম্মকি ও অহংবোধের জন্য তোমাকে মূল্য দিতে হবে।

অবিবাহিত যুবক ও অবিবাহিতা যুবতীর বন্ধুত্বের বিষয় খুব সাবধান হতে হবে । সাধারণত তারা এতই কাঁচা বয়সী ও ভাবপ্রবণ হয় যে নিজেদের মনোগত উদ্দেশ্য ধরতে পারে না। প্রায়ই যৌন আবেগ লুকিয়ে থাকে কর্তব্যের খোলস পরে। যখনই তোমার মনে হবে, 'পুরুষ বা স্ত্রীলোকটির প্রতি সমবেদনা জানানো আমার কর্তব্য' তখন অবশ্যই বিষয়টি বিশ্লেষণ করবে। নিশ্চয়ই দেখবে যে, এটি কোন সুন্দর খোলস পরা ও কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি তোমার আসক্তিকে সুন্দর ছলছুতায় ঢাকা দেওয়া যৌন আবেগ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রথমে উটের নাকটি দেখা যাবে। কখনো নিজ মনের ফাঁদে নিজেকে ধরা দেবে না। তুমি হয়তো শুনবে ঃ 'ওহো, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমার বুক ফেটে যাবে।' কোন কোন ক্ষেত্রে তোমাকে বুক ফাটতে দিতে হবে। এ রকম মনোভাবেরই দরকার হয়, যদি অপর ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে না যায়, আর তোমাকেও ঐ পথে যেতে বাধা দেয়। তুমি এ সব লোকের প্রতি সহানুভূতি দেখাও, এদের জন্য প্রার্থনা কর, কিন্তু তোমার নিজের পথ থেকে নড়বে না। অন্যথায় তোমরা দুজনেই সংসারে ডুবে যাবে। তোমার মনের খুব তেজ চাই। কৃতকার্য হতে হয়তো তোমার অনেক সময় লাগবে, কিন্তু তোমাকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে অবিরামভাবে ও খুব জেদের সঙ্গে। ওষুধ বিস্বাদ লাগলেও, রোগী নিরাময় হতে চাইলে তাকে তো ওটি সেবন করতেই হবে।

## অবিবাহিতদের প্রতি উপদেশ (ক্রমশ)

এই সব যৌনমদে মত্ত লোক, যাদের সঙ্গে তোমার নিত্য দেখা হয়, তারা তোমার অধ্যাত্মজীবনের সাধনাকে জোরদার করার পথে তীব্র বাধা। এই সব বিপদসঙ্কুল স্থানগুলি, আর এই 'লাগামহীন' লোকদের থেকে তফাতে থাকবে—এই সব তথাকথিত স্বাধীনতার গর্বে গর্বিত লোকেরা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত হীন দাসত্বের কবলে পতিত। যদি তুমি সম-লিঙ্গের লোক না পাও তবে সব সঙ্গ পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের সঙ্গে একলা থাক। অবিবাহিত নারী বা পুরুষের পক্ষে এই হলো মুক্তির একমাত্র উপায়। অপর-লিঙ্গের লোকের সঙ্গ বা তাদের প্রসঙ্গ বর্জন করবে।

যৌনতাপূর্ণ আবেদনের কোন ছবিও দেখবে না। এই সব বিষয়ের কোন নভেল বা অন্য কোন বই পড়বে না। যৌন আকর্ষণ আছে এমন কোন অভিনয় দেখবে না। যতদিন তোমার মনের ভেতর টানাটানি চলছে ততদিন বাইরের কোনরূপ যৌন প্ররোচনা বর্জন করবে। 'সাধনা'র সময় যৌন প্ররোচনামূলক কোন পাঠ বা কাজকে সাবধানে বর্জন করবে। যদি আমরা তা না করি, তবে আমরা উচ্চতর অনুশীলনের জন্য অপরিহার্য যে পবিত্রতা তা কখনই লাভ করতে পারব না এবং এখনই বা পরে তার জন্য কষ্ট পেতে বাধ্য। তাহলে আমরা মুক্তি বা নির্ভয়তা লাভ করতে পারব না, আমরা পূর্ণ মানুষের স্তরে উঠতে পারব না—চিরকাল কিঞ্চিদধিক মানসিক পরিণতি নিয়ে পশুর মতোই বেঁচে থাকব।

বিয়ে না করে যেসব নর নারী সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে চায়, তাদের পক্ষে এক খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর জীবনের এই গল্পটি জেনে রাখা ভাল হবে। এটি খুব শিক্ষাপ্রদ। একদিন তার একটি ভাই এক স্ত্রীলোকের করমর্দন করেছিল বলে অভিযুক্ত হয় ও তাকে যাজক সঙ্ঘের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সে যুক্তি দেখাল যে স্ত্রীলোকটি খ্যাতিসম্পন্না অতি পুতচরিত্রা ও ভক্তিসম্পন্না। কিন্তু যে মহান সন্ন্যাসীটি সঙ্ঘের সভাপতিত্ব করছিলেন, তিনি তার মুখের ওপর বললেন ঃ 'বৃষ্টি ভাল তাতে সন্দেহ নেই, মাটিও ভাল, তবু দুয়ে মিশে হয় কাদা, যা ভাল নয়। সেই রকম যদিও পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের হাতই ভাল, তবু তাদের অসাবধানে মিলিয়ে দিলে মনে-প্রাণে (চিন্তায় ও ভালবাসায়) অনেক অনর্থ ঘটতে পারে।' এই গল্পটি ব্রহ্মচারীদের কাছে মহৎ শিক্ষাপ্রদ। সব সময়ে কোন বিষয়ের মূলে যেতে শেখ, একটি কাজ বা চিন্তার প্রাথমিক বাহ্য ধারণাটুকু পেয়ে কখনো থেমে যেও না। এ বিষয়ে পূর্ব পশ্চিমে কোন ভেদ নেই। তুমি প্রাচ্যদেশবাসী হও আর পাশ্চাত্য-দেশবাসীই হও, তোমাকে অপর লিঙ্গের লোকের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এমনকি বিবাহিত লোকেরও এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। হিন্দুশাস্ত্রে বলে দেওয়া আছে যে, গৃহী নিজ স্ত্রী বাদে সকল নারীকে নিজ মাতার মতো দেখবে। তুলসীদাসের একটি বিখ্যাত দোঁহায় বলা হয়েছে, 'সত্য কথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃসমান—এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান।' —সত্য কথন, ঈশ্বর শরণ, পর-স্ত্রীকে মাতার সম্মান দেওয়া শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ কথা পালনে ঈশ্বরানুভূতি যদি না হয় তবে তুলসী মিথ্যাভাষী।[১১]

সত্য কথা বলতে কখনো ভয় পেও না, তাতে মৃত্যু ভয় হলেও না। সত্য যদি তোমার হৃদয় ভেঙ্গে দেয়, তাও মঙ্গল, তাও ভাল, যদি তাতে অপরের হৃদয় ভাঙে,

---

১১ দ্রঃ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৭৯৯

তাও ভাল। মিথ্যা ভানের থেকে সত্য কথা অনেক বেশি শক্তিশালী ও মঙ্গলজনক। সত্যের জন্য তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় হোক। যা কিছুকে প্রিয় বলে ভাবতাম, শুরুতে সত্য সে সবকে ধ্বংস করে দেয়। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এক নতুন ভিত দরকার এবং এই ভিতের ওপর ধীরে ধীরে সাবধানে নির্মাণ কাজ আরম্ভ কর। স্বাভাবিকভাবেই নতুন ভিত করতে গেলেই পুরানটি ভাঙতে হবে। কিন্তু শেষে এর ফলে আসবে শান্তি, সুখ এবং নিজের ও পরের মুক্তি। আমাদের চিন্তাশূন্য কর্ম ও বাসনা যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে, তাকে নির্মম ভাবে ছেঁটে ফেলতে হবে। বিষ-বৃক্ষটিকে লালন পালন করার পর কাটতে কষ্ট হলেও তাকে কাটতে হবে।

## শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হলো : আধ্যাত্মিক জীবন যাপন কর ও নিজে সত্য উপলব্ধি কর। আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের ফলে ঈশ্বরকে আমাদের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আনতে পারি। মানুষের জীবনে কামেচ্ছা ও লোভের মতো আসক্তি-গুলি বা তাঁর কথায় 'কামিনী-কাঞ্চন'ই বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণই দেখিয়েছেন কি করে অধ্যাত্মজীবনের উন্নতির পথে সব থেকে যা বড় বাধা—সেই কাম ও লোভকে কাটিয়ে ওঠা যায়। তাঁর ইচ্ছা, আমরা যেন আমাদের ও অন্যদের, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করি। পুরুষ ও নারী দুজনেরই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। তাদের দেখতে হবে তারা ও অন্যেরা সকলেই ঈশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ। তাদের ভাবতে হবে, তারা নিজেরা যেন বিভিন্ন শরীর মধ্যে আত্মা-রূপে বিরাজ করছে।

তাদের কখনই দেহ-বুদ্ধি নিয়ে থাকা উচিত নয়, পরন্তু চৈতন্য স্তরে উঠে থাকা উচিত। অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে বোঝা দরকার যে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান যুগে অন্য সবকিছুর থেকে এই বাণীরই প্রয়োজন বেশি। প্রভু আমাদের যে উপদেশ দিয়েছেন, সে সবই তাঁর নিজ জীবনে অনুভূত হয়েছে, পরে শ্রীশ্রীমার জীবনে। পবিত্রতা ছাড়া কোন আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে উঠতে পারে না। নিজের ও অন্য নর-নারীর মধ্যে ঈশ্বরদর্শনই হলো কাম ও তৎসংশ্লিষ্ট দুঃখকষ্টজনিত বর্তমান বিশ্বব্যাপী সমস্যার একমাত্র চরম সমাধান। সকলের মধ্যে ঈশ্বর দর্শনই হলো একমাত্র কার্যকর সমাধান এবং পূর্ব পূর্ব যুগ অপেক্ষা বর্তমান যুগে এ উপদেশের প্রয়োজনীয়তা বেশি। 'কাম ও কাঞ্চন' এ যুগের চিহ্ন, কারণ এখন বিশেষভাবে কামের ও ধন-দেবতা কুবেরেরই পূজার যুগ চলেছে। তাই নিম্নতর মনুষ্য-প্রবৃত্তিগুলির দমন বিষয়ে লোকশিক্ষা দেবার জন্য প্রভুকে এবার কাম ও লোভ বর্জনের একেবারে চরমে যেতে হয়েছিল। পশ্চিমী জীবনধারা যতই দেখা যায়,

ততই সর্বলোক কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

## আধ্যাত্মিক স্তরে সমাধান

কাম চিন্তার ওপরে উঠতে গেলে, কেবল নারী বা পুরুষকে ঘৃণা করলেই বা বহু আদি খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসী যেমন চেষ্টা করেছিলেন সেই রকম সংসার থেকে পলায়নেই তা সম্ভব নয়। আরো বেশি কিছুর প্রয়োজন। ঘৃণাও একরকম বিপরীত আকর্ষণ। কাম চিন্তার ওপরে ওঠবার উপায় সকল নর নারীর মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করা। এ বিষয়ে একটি ঔপনিষদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

তুমি নারী ও পুরুষ, কুমার ও কুমারী; তুমি লাঠি হাতে স্খলিতপদ বৃদ্ধ। তুমি একক হয়েও নানা রূপ ধরেছ।[১২]

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন করতে হলে নিজেকে দিয়েই তা আরম্ভ করা উচিত। বাইরের মহিলাটিই যে বিপজ্জনক তা নয়, বরং ভেতরের পুরুষটি। তুমি পুরুষ এ ধারণা মন থেকে সরিয়ে ফেল, তাহলে মহিলাটিও আর থাকবে না। মনে কর তুমি আত্মা—শুদ্ধ চৈতন্যজ্যোতিঃ যা সকল শরীরাভ্যন্তরেই জ্বল জ্বল করছে। চিরশুদ্ধ আত্মার ধারণাটিকে তোমার মনের গভীরে নিয়ে গিয়ে বসাও। অতি প্রত্যূষে আত্মচিন্তা কর, রাতে শোবার আগে গভীরভাবে আত্মচিন্তা কর; মন যেন সদাই আত্ম-চিন্তায় ভরে থাকে। অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে সর্বক্ষণ আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকা দরকার—অন্তত মনের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য।

আমি যেমন প্রায়ই বলি, নিজের সম্বন্ধে ধারণার ওপরই নির্ভর করে সত্যবস্তুর ধারণা। নিজেকে পুরুষ ভাবলে, নারীকে নারী না ভেবে তুমি পারবে না। কিন্তু তুমি যদি নিজেকে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে ভাব তবে প্রত্যেককেই ঈশ্বরের নভোমণ্ডলে এক একটি নক্ষত্ররূপে সন্নিবেশিত দেখা যাবে। নিজেকে আত্মরূপে দেখার ধারণা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ শিক্ষা বা মতবাদ। কিন্তু অতি অল্প লোকেই এ শিক্ষাকে কাজে লাগায়। এমনকি প্রকৃত জ্ঞানলাভের বহুপূর্বেই এই ধারণাই আমাদের মহান সহায়ক হয়। তুমি যদি তোমার মনকে এই ধারণায় পূর্ণ কর, তবে তোমার সমগ্র ব্যক্তিত্বই এর দ্বারা রাঙিয়ে উঠবে আর তোমার ভাবভঙ্গি পালটে যাবে। এই পাল্টানোই অধ্যাত্ম জীবনে একটি মৌলিক প্রয়োজন।

আমাদের সচেতনতার একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন চাই। সুচিন্তিতভাবেই আমাদের

---

১২ ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ঃ ৪.৩

চেতনাকে নিম্নতর কেন্দ্র থেকে উচ্চতর কেন্দ্রে সরিয়ে আনতে হবে। *কুণ্ডলিনী* নামে আধ্যাত্মিক শক্তি নিম্নতর কেন্দ্রগুলিতে পাকিয়ে থাকে। যতদিন লিঙ্গ-কেন্দ্র সক্রিয় থাকে, ততদিন *কুণ্ডলিনী* সুপ্ত থাকে। একে জাগাতে হলে লিঙ্গ-কেন্দ্রের ক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। যদি ঐ কেন্দ্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার আগেই কোন না কোন ভাবে (যেমন *প্রাণায়াম* করে), *কুণ্ডলিনী* জাগ্রতা হন, তবে ঐ কেন্দ্রের ক্রিয়াই বেড়ে গিয়ে সাধককে আকস্মিক দুর্বিপাকের পথে টেনে নামিয়ে আনতে পারে। তাই *কুণ্ডলিনীকে* জাগিয়ে তোলার আগে লিঙ্গ-কেন্দ্রকে বন্ধ করতেই হবে। শুধু তাই নয় উচ্চতর কেন্দ্রগুলিকেও খুলে দিতে হবে—অধ্যয়ন, প্রার্থনা, ধ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে। *কুণ্ডলিনী* জাগ্রতা হলে তাকে উচ্চতর কেন্দ্রগুলিতে প্রবাহিত করাতে হবে।

উচ্চতর কেন্দ্রগুলিকেও উদ্দীপিত করতে হবে। অচেতন মনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনতে হবে, এ যেন উর্বরভূমি ঃ সেখানে যে কোন ভাব রোপণ কর না কেন, তাতে শীঘ্রই শেকড় লেগে যাবে আর চারাটিও বাড়তে থাকবে; সেখানে সৎচিন্তা রোপণ করলে তাই বাড়তে থাকবে এবং ক্রমে দেখা যাবে যে আধ্যাত্মিক জীবনের আন্তর-বাধা কমে যাচ্ছে। যে মন এক সময়ে তোমার বিপক্ষে যেত তাই এখন তোমার সহায়ক হবে। এ বিষয়ে বাংলার সাধক কবির প্রসিদ্ধ গান আছে ঃ

> *মনরে, কৃষি কাজ জানো না।*
> *এমন মানব-জমিন রইল পতিত,*
> *আবাদ করলে ফলত সোনা।*[১৩]

যৌন-সমস্যার পূর্ণ সমাধান হতে পারে একমাত্র আত্মিক স্তরে। আত্মার লিঙ্গ নেই। আত্মজ্ঞানে লিঙ্গ বোধের কোন স্থান নেই। এই অন্তর্জ্যোতির উপলব্ধি না হলে লিঙ্গ-বোধ একেবারে যায় না। আমরা যখন এইটি উপলব্ধি করব তখন যে শান্তি, আনন্দ ও মুক্তির অনুভূতি আমরা লাভ করব, তা আমাদের সংগ্রাম, ব্যথা ও যন্ত্রণা ভোগের জন্য পুরস্কার লাভের থেকে অনেক বেশি।

---

১৩ পূর্বোল্লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পৃঃ ২২০

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

# ব্রহ্মচর্যব্রত বা ইন্দ্রিয় সংযম

## (চিরকুমারদের প্রতি বিশেষ উপদেশ)

### ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা

স্বামী বিবেকানন্দ ইন্দ্রিয় সংযমের ওপর বিশেষ জোর দিতেন। তিনি শিষ্যদের বলতেন ঃ 'ব্রহ্মচর্য, আগুনের মতো, তোমার শিরায় শিরায় শিহরণ জাগাবে।' ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে যৌন তেজ ওজঃ নামে উচ্চতর আধ্যাত্মিক তেজে পরিণত হয় এই প্রসঙ্গে 'রাজযোগে' তিনি বলেছেন ঃ

"যোগীরা বলেন, মনুষ্যের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া, কাম চিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, তা সংযত হলে সহজেই ওজোরূপে পরিণত হয়ে যায়। আর আমাদের শরীরস্থ নিম্নতম কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলে যোগীরা সেটির ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। যোগীরা সমুদয় কামশক্তিকে ওজোধাতুতে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। পবিত্র কামজয়ী নরনারীরাই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তকে সঞ্চিত করতে সমর্থ হন। এজন্যই সর্বদেশে ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হয়েছে। মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, অপবিত্র হলে এবং ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল, মানসিক তেজ—সবই চলে যায়। এ কারণেই দেখতে পাবে, জগতে যে-সব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বড় বড় ধর্মবীর জন্মেছেন, সে-সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এ-জন্যই বিবাহ-ত্যাগী সন্ন্যাসিদলের উৎপত্তি হয়েছে। কায়মনোবাক্যে পূর্ণব্রহ্মচর্যপালন করা নিতান্ত কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য ব্যতীত রাজযোগসাধন বড় বিপৎসঙ্কুল; তাতে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হতে পারে। যদি কেউ রাজযোগ অভ্যাস করে, অথচ অপবিত্র জীবনযাপন করে, সে কি করে যোগী হওয়ার আশা করতে পারে?"[১]

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ধর্ম প্রসঙ্গে উপদেশে আমরা পড়ি ঃ

'শরীরের, মস্তিষ্কের ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও তেজ লাভ করতে হলে *ব্রহ্মচর্য* অপরিহার্য। যারা কঠোর *ব্রহ্মচর্য* পালন করে তারা তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি ও অনবদ্য

১ পূর্বোক্ত বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬২-৬৩

ধীশক্তির অধিকারী হয়। *ব্রহ্মচর্যের* দ্বারা একটি বিশেষ নাড়ির প্রবর্তন হয় যা থেকে এই সব আশ্চর্যজনক ক্ষমতা আসে। তোমরা কি জান আমাদের মহান আচার্যগণ *ব্রহ্মচর্যের* ওপর কেন এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন? কারণ, তাঁরা জানতেন যদি মানুষ এই বিষয়ে অক্ষম হয় তবে তার সবই নষ্ট হয়। কঠোর ব্রহ্মচারী বীর্য নষ্ট করে না। সে *পালোয়ানের* (বড় খেলুড়ের) মতো দেখতে না হতে পারে কিন্তু তার মস্তিষ্কের বিকাশ এত সূক্ষ্ম হয় যে তার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা করবার ক্ষমতা আশ্চর্যজনক।'[২]

একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে বলেন, 'বৎস, যদি তোমার দেহ-মনকে সাংসারিক ভোগসুখে লাগাও তবে সংসার দুটিকেই নাশ করবে। যদি দেহ-মনকে ভগবান ও তাঁর সেবায় সমর্পণ কর তবে দেখবে তুমি দেহের স্বাস্থ্য, মনের শান্তি ও আধ্যাত্মিক আনন্দ সবই পাবে।[৩]

তোমার স্বাস্থ্য, সম্পদ, যৌবন, মেধা সব ঈশ্বরে অর্পণ কর। যদি তুমি এগুলিকে সংসারে অর্পণ কর তবে সংসার এগুলিকে নষ্ট করবে ও শেষে তোমাকে রিক্ত করে ছেড়ে দেবে। অবিদ্যার ও বিনাশের শক্তি সর্বত্র রয়েছে। এ কথা ভুলে যদি তুমি বিবেচনাহীনের মতো সংসার জীবনে প্রবেশ কর, তোমাকে ফল ভোগ করতে হবে।

ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের একটি বাধা হলো আমরা দেখি এ ছাড়াই লোকে বেশ চালিয়ে যাচ্ছে ও জীবনে সমৃদ্ধি লাভ করছে। সাংসারিক জীবনে এটি সত্য হতে পারে। *ব্রহ্মচর্য* তোমাকে বুদ্ধির জাহাজ বা কুস্তিগীর করে তুলতে না পারে, তবে তা নিশ্চয়ই দেহ-মনের উন্নতি সাধন করে। কিন্তু *ব্রহ্মচর্যের* প্রধান উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধি—স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে শক্তিকে 'মেধা নাড়ি' নামে আধ্যাত্মিক স্নায়ু বলে উল্লেখ করেছেন। দশ-বার বছর ব্রহ্মচর্য পালন করলে মানুষের বোধ হয় তার ঐ 'নাড়ি' বা শক্তি জেগেছে। এটি হলো অন্তর্জ্ঞান যা সব লোকের মধ্যেই সুপ্ত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ[৪] ও স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে বলেছেন। এটি শুধু তত্ত্ব কথা নয়।

অধিকন্তু মস্তিষ্কের পুষ্টি ও তেজের জন্য *ব্রহ্মচর্য* অপরিহার্য। যারা ব্রহ্মচর্য পালন করে না তারা ধ্যান করবার চেষ্টা করলে অল্প সময়েই দেখে যে মাথা গরম হয়ে গেছে। মস্তিষ্ক সমর্থ ও ঠাণ্ডা না হলে দীর্ঘস্থায়ী ধ্যান সম্ভব নয়। ব্রহ্মচর্য ছাড়া

---

২ Swami Prabhavananda, *The Eternal Companion*, (Madras, Sri Ramakrishna Math, 1978), P.234 (দ্রঃ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, উদ্বোধন, ২০০০) পৃষ্ঠা ৫৯।

৩ তদেব, ১৯৭১ সংস্করণ, পৃঃ ৮৪

৪ পূর্বোল্লিখিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৩৮৪-৮৫

বহুক্ষণ ধ্যান করার দরুন যে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম তা সহ্য করা যায় না।

সত্য কথা বলতে কি, উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনে *ব্রহ্মচর্য* একান্তই প্রয়োজন, যদিও সাধারণ লোকের কাছে সে কথা সহজভাবে বলা হয় না—পাছে অধ্যাত্মজীবনের গোড়াতেই তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। প্রকৃত সত্য হলো—চিন্তায়, কথায় ও কাজে অখণ্ড *ব্রহ্মচর্য* ছাড়া প্রকৃত ধ্যান বা কোন রকম উচ্চ উপলব্ধি সম্ভব নয়। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য ও পবিত্রতা ছাড়া উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবন স্বাভাবিক হয় না। কিন্তু সচরাচর আমরা এ বিষয়ে নরমভাবে ও একটু ঘুরিয়ে কথা বলি পাছে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়ে।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম কাজ হলো উচ্চতর চেতনাকেন্দ্রগুলিকে উন্মুক্ত করা। কোন একটি উচ্চস্তরের কেন্দ্রের ওপরই ধ্যান করতে হবে। তার জন্য সেই কেন্দ্রটিকে প্রথমে প্রস্ফুটিত করতে হবে। যদি নিম্ন কেন্দ্রগুলি অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল হয় তবে এ কাজ কি করে সম্ভব হবে? তেজের যেটুকু বাকি থাকে তার সবটাও উচ্চতর ক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই সবটাই যদি তেজের নিম্নতর কেন্দ্রের দিকে চালিত হয়, তবে উচ্চতর কেন্দ্রগুলি কোন দিনই বিকশিত হবে না।

যদি নিম্নতর কেন্দ্রগুলির ক্রিয়া বন্ধ না হয়, সাধক নিজেকে উচ্চতর স্তরে ধরে রাখতে পারবে না—লোকে তার সম্বন্ধে যাই বলুক বা ভাবুক না কেন। প্রকৃত কথা হলো, নিম্নতর কেন্দ্রগুলির ক্রিয়া চলতে থাকলে কোন আধ্যাত্মিক জীবনই সম্ভব নয়। তাদের ক্রিয়া বন্ধ কর। এ কাজ না করলে উচ্চতর কেন্দ্রগুলি কখনও ঠিক মতো কাজ করতে পারবে না। নিচের তলায় সব জলের কলগুলি খোলা থাকলে ওপর তলায় খুব অল্প জলই পাবে বা একেবারেই পাবে না।

কোন কোন লোক, কঠোরতম ব্রহ্মচর্য পালন না করেই হয়তো নিগূঢ় দর্শনের কিছু আভাস পেয়ে থাকে, কিন্তু তারা কখনই ঐ উচ্চস্তরে অবস্থান করতে সফল হয় না বা উচ্চতর অনুভূতি লাভে সক্ষম হয় না। কোন উচ্চতর জীবন ও উচ্চতর রূপের অনুভূতি লাভ করতে হলে সাধককে সব অবস্থাতেই ব্রহ্মচর্য পালন করতেই হবে। এছাড়া অন্য পথ নেই। আধ্যাত্মিক জীবনের এই হলো সহজ সত্য।

## পাশ্চাত্যে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা

পাশ্চাত্য দেশে মুশকিল হলো, ওখানে আধ্যাত্মিক আদর্শকে অনেক নিচে নামানো হয়েছে, সামান্য নৈতিক আচরণের স্তরে। জ্ঞানাতীতের প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। লোকে এমনই ভিক্ষুকের মতো আচরণ করে যে সামান্য কিছু পেলেই সন্তুষ্ট। একটু সৎভাবই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাই নিয়েই তারা হৈ চৈ

করে। নৈতিক জীবনই অধ্যাত্মজীবন নয়, যদিও একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক লোক সব সময়েই নীতিগত কাজই করে থাকে, কারণ এটা তার কাছে অভ্যাসে পরিণত হয়ে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। কেবল মামুলি নৈতিক আচরণগুলিই উচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জন্য যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন দরকার। এইটিই খ্রীস্টের "তোমরা পবিত্র হও, এমনকি স্বর্গস্থ পিতার মতো পবিত্র হও"—এই 'শৈলোপদেশ'-এর সারমর্ম।[৫] খ্রীস্ট যে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন তা মূলত সন্ন্যাস ধর্ম। প্রত্যেক সাধকের পক্ষেই সন্ন্যাস জীবনের কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ ও সংযম একান্ত প্রয়োজন, সে গৃহস্থ হলেও; তবেই সে প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতির সামান্য কিছু পেতে পারে। প্রোটেস্টান্ট খ্রীস্টানেরা ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসাশ্রম বর্জন করে পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে।

বর্তমানকালের মনস্তত্ত্ববিদগণ অচেতন অবস্থা, স্বপ্ন, প্রেরণা, জটিলতা, দমন প্রভৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণসাধন করেছেন। কিন্তু এদের অনেকগুলিই 'স্বাধীন ইচ্ছা' তত্ত্ব প্রচার করে আমাদের সমপরিমাণ ক্ষতিও করেছে। বহু খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদের এই মহান বিজ্ঞানের কদর্য প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি সত্ত্বেও, কাম-দমন যে ক্ষতিকারক, এই মত পাশ্চাত্য দেশে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ দিকে যোগশাস্ত্রের মনোবিদ্যা বিশ্বাস করে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনে সচেতনভাবে কাম-দমন ক্ষতিকারক তো নয়ই, বরং একান্তই প্রয়োজন। শুধুই দমন বিপজ্জনক হতে পারে, কিন্তু যৌগিক সংযমন তা নয়—কারণ এর পরেই ঈশ্বরভক্তি ও ধ্যানের মাধ্যমে কামের উদ্‌গতির ব্যবস্থা এতে আছে। প্রথমে এর থেকে কিছু মানসিক চাপ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু এমন কোন উচ্চতর অভিযান কি আছে যা কোন মানসিক চাপ বা সংগ্রামের সৃষ্টি করে না? প্রকৃত উদ্যোগী অধ্যাত্ম সাধক শীঘ্রই আভ্যন্তরীণ এইসব অসুবিধাগুলি অতিক্রম করে এবং ঈশ্বরের কৃপায় উচ্চতর স্তরে পৌঁছে যায়, যেখানে সে নিম্নস্তরের সব রকম দ্বন্দ্ব থেকে বিমুক্ত হয়।

আজকাল পাশ্চাত্য দেশে মনের পবিত্রতার ওপর জোর না দিয়েই বেদান্তকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলেছে। পাশ্চাত্যে অনেকেই মহিমান্বিত ভাবধারা ও যৌক্তিক সৌন্দর্যের জন্য বেদান্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বৌদ্ধিক প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। অনেকে মনে করে বেদান্তের পথে *ব্রহ্মচর্য* ও অন্যান্য নীতি পালনের প্রয়োজন নেই। তা ঠিক নয় বরং এ পথে মনের ও ইন্দ্রিয়গ্রামের কঠোর সংযমের একান্ত দরকার। *জীবন্মুক্ত* বা মুক্তপুরুষ সামাজিক প্রথাগুলির ওপর তেমন নজর না দিতে

---

৫ *Bible* St. Matthew 5:48

পারেন, কিন্তু তিনি দৈহিক শুচিতার মতো মূলধর্মনীতিগুলিকে অমান্যও করেন না। এগুলিই তাঁর দ্বিতীয় প্রকৃতি। *বেদান্তসারে* আমরা পাই 'যদি কোন ব্যক্তি অদ্বৈত সত্য জেনে তার স্বেচ্ছাচারী কাজ করে, তবে অশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণে তত্ত্বজ্ঞানী আর কুকুরের মধ্যে তফাত কোথায়?'[৬]

## মহান সন্তদের দৃষ্টান্ত

উচ্চ মার্গের খ্রীস্ট, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে পূর্ণ *ব্রহ্মচর্য* পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কথা আমরা, 'শৈলোপদেশ'-এ, বৌদ্ধদের 'বিনয় পিটকে', উপনিষদে, গীতায় ও ভাগবতে পেয়ে থাকি। যে ধরনের নৈতিক জীবন সমাজে অনুমোদিত কেবল তাই অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাকে নৈতিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে বিশেষত পবিত্রতায় চরমোৎকর্ষ লাভ করতে হবে। তার পক্ষে যৌন-প্রেরণায় সম্পূর্ণ সংযম অবশ্য কর্তব্য।

জগতের মহান মরমিয়া সাধকগণ পবিত্রতার ওপর অধিকতম গুরুত্ব দিয়েছেন। গাইল্‌স ভ্রাতা (Brother Giles) প্রথমে নিরক্ষর কৃষক ছিলেন কিন্তু পরে অ্যাসিসাইয়ের সেন্ট ফ্রান্সিসের (Francis of Assisi.) প্রধানতম শিষ্য হয়েছিলেন তাঁর এই কথাগুলি প্রত্যেক একনিষ্ঠ অধ্যাত্ম সাধকের স্মরণ করা উচিত:

'অন্যান্য সকল সদ্‌গুণের মধ্যে আমি দৈহিক শুচিতার গুণকে প্রথমে স্থান দেব, কারণ মধুর স্বভাবসুলভ শুচিতার মধ্যেই সকল উৎকর্ষ নিহিত রয়েছে; কিন্তু অন্য কোন সদ্‌গুণ নেই যা শুচিতা ছাড়া উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

'সত্য সত্যই, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বোধশক্তিগুলিকে একমাত্র ঈশ্বরে নিবেদনের জন্য শুদ্ধ ও নিষ্কলুষ অবস্থায় সুরক্ষিত রাখতে হলে শুচিতাই হলো সদা নিরাপদ আশ্রয়।

'প্রত্যেকটি পাপ কার্য পুণ্য শুচিতার নির্দোষ গৌরবকে বিঘ্নিত ও ম্লান করে দেয়, ঠিক যেমন উজ্জ্বল দর্পণ ধোঁয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, কেবল অশুদ্ধ মলিন বস্তুর সংস্পর্শে নয়, মানবের শ্বাস-প্রশ্বাস মাত্র তার ওপর পড়লেও। মানুষ যতদিন ইন্দ্রিয়জ কাম-লালসায় আসক্ত থাকবে তার পক্ষে কোনরূপ আধ্যাত্মিক কৃপা লাভ করা সম্ভব নয়, তাই তুমি যে অবস্থাতেই থাক নিজেকে ফেরাও, যতদিন না ইন্দ্রিয়জ পাপ জয় করতে পারছ ততদিন তুমি কিছুতেই আধ্যাত্মিক কৃপা লাভ করতে পারবে না। সুতরাং ভঙ্গুর শরীরের কাম প্রবণতার বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে

---

৬ সদানন্দ যোগীন্দ্র, *বেদান্তসার*, (ইং-অনুবাদ: স্বামী নিখিলানন্দ, কলকাতা, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৭৪, পৃঃ ১২১) (সুরেশ্বরের *নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি*, ৪/৬২ থেকে উদ্ধৃত)

যাও, এটিই তোমার সঙ্গে সব থেকে বেশি শত্রুতা করে দিনরাত যুদ্ধ চালাচ্ছে। আর জেনো, যে আমাদের এই মারাত্মক শত্রুকে জয় করেছে, সে প্রায় নিশ্চিতই অন্য সব শত্রুকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে আধ্যাত্মিক কৃপা ও নৈতিক সদ্‌গুণাবলী ও পূর্ণতা লাভ করবে।"[৭]

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে প্রথমেই ব্রহ্মচর্য দরকার। যে সব লোক চিন্তায়, কথায় ও কাজে পূর্ণ সংযম পালন করতে প্রস্তুত নয়, তারা উচ্চতর সত্যের কিঞ্চিৎ আভাস পেলেও উচ্চস্তরে কখনই থাকতে পারবে না। তারা বার বার নিচে পড়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি ও উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবন কখনো লাভ করতে পারবে না।

## ব্রহ্মচর্য পালন—বাস্তব সহায়তা

এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে কঠোর সংযম পালন করা যেতে পারে? কি কি নিয়ম পালন করতে হবে? সর্বপ্রথম মনে রেখো, শত্রুকে কখনো সরাসরি আঘাত করতে নেই। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লড়াই করার একটা কৌশল আছে, যা শিক্ষণীয়। কখনো অতি উগ্র হবে না। কখনো কখনো প্রথমে প্রয়োজনীয় মানসিকতা সৃষ্টি না করেই আমরা অতি উগ্র হয়ে ইন্দ্রিয় দমন করতে চাই। এটা খুবই বিপজ্জনক এবং কখনই তা করা উচিত নয়। কখনো কখনো নিচু মেজাজে থেকে, উচ্চস্তরে না উঠে, উগ্রভাবে আমরা নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করি। তখন স্বভাবতই অত্যন্ত উগ্র শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া এসে থাকে, ফলে সমস্ত অগ্রগতি মন্থর অথবা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। অতএব, ইচ্ছাশক্তির সহায়তায় প্রথমে মনকে উচ্চস্তরে তুলতে হবে ও উচ্চ মেজাজ সৃষ্টি করতে হবে, তখন অল্প শক্তির সাহায্যেই কার্য সমাধা হবে, উগ্র প্রতিক্রিয়ার দরুন বিপদের সম্মুখীন কখনো হতে হবে না। এই বিষয়ে গাইল্‌স ভ্রাতা (Brother Giles) বেশ সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন ঃ

'যে একটি বড় পাথরকে অথবা ভারি জিনিসকে সরাতে ও অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইবে, তাকে সরাসরি শক্তি প্রয়োগের চেয়ে কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তেমনি আমরা যদি অপবিত্রতার পাপ জয় এবং পবিত্রতার পুণ্য অর্জন করতে ইচ্ছা করি তবে অসতর্ক হঠকারী হয়ে অনুমানের ভিত্তিতে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পথে না গিয়ে বরং ধীরভাবে উত্তম আধ্যাত্মিক শিক্ষায় নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজে লাগতে হবে।'

কী চমৎকার উপদেশ! একবার লিভারযন্ত্রের কাজের কথা ভাব, যেমন শাবলের

---

৭ *Teachings of Brother Giles* [London : Burns, Oats, Washerbourne & Co. 1935]

কাজ। এই সরল কলটির সাহায্যে ভারি জিনিস তোলা যাবে, যা খালি হাতে কখনই নড়ানো যাবে না। এটা কৌতুকের কথা যে জাগতিক ব্যাপারে আমরা এত বুদ্ধিমান ও সতর্ক, এত উদ্ভাবন দক্ষ ও কার্যকুশল, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আমরা এত বোকা ও অসতর্ক। কিন্তু, মহান মরমী সাধকদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ভাবই সত্য; তারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে খুবই কার্য কুশল। তারা জাগতিক উন্নতির বিষয়ে উদাসীন, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে খুবই সর্তক ও প্রণালীবদ্ধ।

লোকে কামের তাড়না অতিক্রম করতে নানা রকম বাস্তব উপায় অবলম্বন করে থাকে। এদের কোন কোনটির সাহায্যে আংশিকভাবে সফল হওয়া যায় বটে কিন্তু এগুলির ওপর বেশি নির্ভর করা উচিত নয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন ঃ

> **কতকগুলি নিয়ম ব্রহ্মচারীকে অবশ্যই পালন করতে হবে। সে উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ করবে না, অতি-নিদ্রা যাবে না, অতি-শ্রম করবে না, আলস্য, অসৎসঙ্গ ও কদালাপ বর্জন করে চলবে।**[৮]

কেউ কেউ অত্যধিক শরীর চর্চার চেষ্টা করে। যদিও এতে শরীরের বাড়তি তেজটুকু সরিয়ে ফেলা হয় কিন্তু এটা কখনই সঠিক পদ্ধতি নয়। যারা ব্রহ্মচর্য পালন করতে চাইবে তাদের দেখা উচিত, যেটুকু তেজ তারা কাজে লাগাতে পারে তার বেশি তেজ যেন শরীরে না জমে। তারা যদি মনে করে শরীরে বাড়তি তেজ জমছে, তবে তাদের উচিত হবে কয়েকদিনের জন্য খাওয়া কমিয়ে দেওয়া।

সকলের মধ্যেই সৃজন করবার একটা মৌলিক প্রেরণা রয়েছে। যদি এর উদ্গতি সাধন করে একে উচ্চতর পথে না চালিত করা হয়, তবে তা নিম্নতর কেন্দ্রে প্রকাশ পাবে। যে সব প্রবর্তক বুঝবে সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা সম্ভব নয়, যারা সব তেজ ঈশ্বরের ধ্যানে, প্রার্থনায় এবং পূজায় রূপান্তরিত করতে না পারবে, তারা যেন নিজেদের কোন সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত রাখে। এর সঙ্গে অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তনও সহায়ক। সর্বদা উচ্চতর কেন্দ্রগুলিকে সক্রিয় রাখ।

নিয়ন্ত্রিত শ্বাসপ্রশ্বাসও মনকে শান্ত রাখার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। মন অশান্ত হলে নানা রকম আবেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সর্বদা ছন্দোবদ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস অভ্যাস কর। এ কাজ শরীরের ওপর সামগ্রিক সংযমের ভাব আনবে ও মনকে সজাগ রাখবে। একে 'প্রাণায়াম' বলে না, যা প্রর্বতক সাধকের পক্ষে অভ্যাস করা বিপজ্জনক হতে পারে। এর পরিবর্তে কেবল ছন্দোবদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস অভ্যাসই ভাল।

গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসের মধ্যে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা একটি, সকলের পক্ষেই এ অভ্যাস অবশ্য কর্তব্য। তোমার শরীর ও কাপড়চোপড় পরিষ্কার ও পবিত্র রাখবে।

৮ *The Eternal Companion*, op.cit. 1978 edn. p. 238

স্নান ও কাচাকুচিকে কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনে করা উচিত নয়, যেমন ভারতে প্রায়শই করা হয়ে থাকে। দেহের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে মনের পরিচ্ছন্নতাকে অবশ্যই যুক্ত রাখা উচিত। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মনের পবিত্রতা লাভ করা। পতঞ্জলি বলেন ঃ শৌচাভ্যাসে নিজ শরীরের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে ও অন্য শরীরের সংসর্গেও বিরক্তি আসে।[৯]

যাই হোক, এ থেকে যেন মনস্তাত্ত্বিকরা যাকে 'শুচিবাই' বলে থাকে, সে রকম মানসিক রোগ এসে না পড়ে। পতঞ্জলির ঐ সূত্রটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন ঃ

'যখন বাস্তবিক বাহ্য ও আন্তর—উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন শরীরের প্রতি অযত্ন আসে; কিসে তা ভাল থাকবে, কিসেই বা তা সুন্দর দেখাবে, এসব ভাব একেবারে চলে যায়। অপরে যে মুখ অতি সুন্দর বলবে, তাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন না থাকলে যোগীর নিকট তা পশুর মুখ বলে প্রতীয়মান হবে। জগতের লোক যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তার পশ্চাতে চৈতন্যের প্রকাশ থাকলে তিনি তাকে স্বর্গীয় মনে করবেন। এই দেহ-তৃষ্ণা মনুষ্যজীবনে সর্বনাশের কারণ। সুতরাং শৌচ প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি নিজে একটি শরীর বলে ভাবতে চাইবে না। আমাদের মধ্যে যখন এই শৌচ বা পবিত্রতা আসে, তখনই আমরা এই দেহ-ভাব অতিক্রম করতে পারি।'[১০]

সাধু সঙ্গ পবিত্র জীবন যাপনের বিশেষ সহায়ক। সংগ্রামী সাধকের ওপর পবিত্র-হৃদয় ও কঠোর ব্রহ্মচর্য-ব্রত-ধারী ব্যক্তির সঙ্গ বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু এই সঙ্গের সুযোগ পেতে হলে, সাধককে নীতিজ্ঞানহীন লোকের সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে। ব্রহ্মচর্যহানি ঘটানর পক্ষে অসৎ সংসর্গের জুড়ি নেই।

## মনের স্তরে কাম সংযমন

যাই হোক, কেবল দৈহিক উপায়ে কাম সংযমন সম্ভব নয়, কারণ এর মূল রয়েছে ব্যক্তিত্ব-কাঠামোর অভ্যন্তরে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানসিক স্তরেই এ সমস্যার নিষ্পত্তি করা। দেখা যায়, জীবনে কল্পনার এক প্রভাবশালী ভূমিকা রয়েছে। যৌন বিষয়ে উদ্ভট কল্পনা ছাড়া, লিঙ্গ নিয়ে টুকরো টুকরো সূক্ষ্ম চিন্তা আমাদের সাধারণ চিন্তার সঙ্গে মিশে যায়। যদিও ফ্রয়েড (Freud) নিঃসন্দেহে সাধারণ মানবের জীবনে কামের ভূমিকাকে অত্যধিক বাড়িয়ে দেখে থাকেন, প্রকৃত-

---

৯ শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ। পতঞ্জলি, 'যোগ-সূত্র', ২.৪০

১০ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮-৬৯

পক্ষে কাম ও মানবের কল্পনাশক্তির মধ্যে কিছু সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ প্রায়ই প্রবলতর হয়ে ওঠে ভুল সংসর্গের মাধ্যমে, ফলে বহু লোক ভুল জিনিস নিয়ে কল্পনা করে। এতে বিপর্যস্ত বোধ করার কিছু নেই, যদি স্থূলভাবে প্রলোভনের বিষয়কে এড়িয়ে চলা যায়, তবু মিথ্যা কল্পনা এবং অপরাধবোধ বহু সাধকের পক্ষে যন্ত্রণার বড় কারণ। কিন্তু অলস চিন্তা কেবল সমস্যাকে গুরুতর করে তোলে। কল্পনার সমস্যাটির সঙ্গে সুসম্বদ্ধ পদ্ধতিতে বোঝাপড়া করতে হবে।

মূল লক্ষণীয় বিষয় হলো মনে যেন কখনই ভুল ছবি না পড়ে এবং তা নিয়ে মন যেন নিরাশ হয়ে চিন্তা না করে। তা সম্ভব হয় একমাত্র মনে প্রতি-চিন্তার উদ্ভব ঘটাবার অভ্যাস থেকে। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে (২.৩৩)[১১] তাই উপদেশ দিয়েছেন ঃ যে চিন্তাগুলি যোগের শত্রু-স্বরূপ তাদের বিপরীত চিন্তা এনে সেগুলিকে বাধা দেবে। এই গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিটি আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে খুবই হিতকর। সর্বদা সৎচিন্তা নিয়ে থাকলে সমগ্র পুরাতন মন্দচিন্তার কাঠামোকে বদলে ফেলা যায়। স্থূলভাবে আমরা হয়তো মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর কাছে থাকতে পারি, কিন্তু একই সময়ে মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভাবে তার থেকে অনেক দূরে থাকা সম্ভব। কোন কিছুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে গেলে আমাদের উচিত হবে একটি শক্ত মানসিক দেওয়াল তুলে চিন্তাস্তরে নিজেদের আলাদা করে রাখা। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। এ হলো নেতিবাচক পন্থা। ইতিবাচক কাজও চাই, যথা আমাদের উচিত হবে গভীরভাবে ঈশ্বরের বা কোন পুতচেতা মহাপুরুষের চিন্তায় সমগ্র মনকে ভরিয়ে ফেলা। তোমার দেহ ও মনকে সরিয়ে নিয়ে এসে, তারপর তোমার সমগ্র মন ও দৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরে নিবদ্ধ কর এবং কখনো একে বিপথে প্রলোভনের বস্তুর দিকে যেতে দিও না। নিজেও সশরীরে বা মনে মনে এর কাছে যাবে না। তবেই আমরা সহজে ও স্বাভাবিকভাবে প্রলোভনের বস্তু ও ব্যক্তির কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে, তাদের ও আমাদের মাঝে শক্ত পাঁচিল গড়ে তুলতে এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে থাকতে শিখব।

শারীরিক সান্নিধ্যই একমাত্র বিপদ নয়। যে ব্যক্তি আমাদের প্রলোভিত করে তার শরীর হয়তো বহু দূরে রয়েছে কিন্তু চিন্তাস্তরে আমরা সেই নর বা নারীর প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করতে পারি। তাই যখন কোন ব্যক্তি আমাদের আকর্ষণ করে বা কোন বস্তু প্রলোভিত করে, তা স্থূলভাবে কাছে না থেকে চিন্তা জগতে থাকলেও স্থূল স্তরে করণীয় বলে আমরা যে উপদেশ পেয়ে থাকি, এ ক্ষেত্রেও সেগুলি ঠিক একই রকম নিখুঁতভাবে পালন করাই আমাদের কর্তব্য হবে, যথা—

---

১১ বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্‌॥—পতঞ্জলি যোগসূত্র, ২/৩৩

কোনভাবেই ঐ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বা তার (নর বা নারীর) সম্বন্ধে চিন্তা করা ঠিক হবে না, প্রলোভনের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত সব চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে তার সামনে একটি শক্ত বেড়া, এমনকি সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে অনীহা বা বিরক্তির ভাব গড়ে তুলতে হবে। এরপর দেখতে হবে আমরা যেন আমাদের সব চিন্তা ও ভাব একমাত্র ঈশ্বরে অর্পণ করি। প্রলোভনের বিষয়ের ওপর তীব্র অনীহা বা বিরক্তি সৃজন করাই চরম সমাধান নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই ভাব হৃদয়াবেগের ও কামনার উদ্গতি সাধনের একটি ধাপ হিসাবে খুবই সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাই এ পদ্ধতিটি কাজে লাগানো উচিত।

বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এ কাজ যেন সচেতনভাবে বিচার করে ও বিধিবদ্ধভাবে করা হয়। সেই সঙ্গে বেশি বেশি জপ করা, বেশি ধ্যানাভ্যাস ও প্রার্থনা করা, সদ্‌গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু প্রেরণাদায়ক অংশ পাঠ করাও ভাল—মন দ্বিধাগ্রস্ত বা অস্থির হলেও, মনে প্রচণ্ড টানাপড়েন চললেও এ কাজ চলতে পারে। সকল সাধকের পক্ষেই, কোন রকমে এর বিপরীতমুখী অধ্যাত্মচিন্তার এক তীব্র প্রবাহ স্রোত তুলতে হবে।

কার্যত, আমাদের সব যন্ত্রণার মূল কারণ শারীরিক থেকে মানসিকই বেশি। মানসিক যন্ত্রণা না থাকলে শারীরিক যন্ত্রণা কখনো হয় না। বাইরের যে কোন প্রেরণাকে গ্রহণ করার মতো কিছু আমাদের মধ্যে না থাকলে প্রলোভনের বিষয়ও থাকতে পারে না। কাজেই দোষ ত্রুটি বাইরের থেকে আমাদের নিজ অন্তরেই বেশি করে আছে।

যখনই অশান্তি আসে তখনই ঊর্ধ্বমুখী মনোভাব আনতে না পারলে, আমাদের উচিত হবে প্রথমেই প্রলোভনের ব্যক্তি বা বিষয় থেকে দূরে সরে আসা, পরে ঐ মনোভাব আনতে চেষ্টা করা। এরকম সব ক্ষেত্রেই সজ্ঞানে সুচিন্তিতভাবে সঙ্গ ছেদ করবে। যারা সব সময়ে ঊর্ধ্বমুখী মনোভাব নিয়ে থাকে তারা স্বল্পই প্রলোভিত হয়। কেবল যখন ঈশ্বরকে বা উচ্চতর আত্মাকে ভুলে মানব সংসার নিয়ে থাকে তখনই সে প্রায়শ প্রলোভনের শিকার হয়। সব সময় পবিত্র চিন্তা ও ভাবের রসদের জোগান রাখবে, যাতে অবাঞ্ছিত চিন্তা বা ভাব মনে এসে মানসিক বা দৈহিক স্তরে প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই, ঐগুলিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পার। মনে কর কোন ব্যক্তি তোমাকে আকর্ষণ করছে। তখনই ঐকান্তিক ভাবে একটি বিপরীত চিত্র তুলে ধর। মনে কর ঐ ব্যক্তি তোমাকে নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে গভীরভাবে তোমার 'ইষ্ট' চিন্তা কর, ঐ ব্যক্তির বিপরীতে তোমার 'ইষ্টের' ছবি বসিয়ে দাও। এই ভাবে প্রলোভনের বিষয়ের সূক্ষ্ম মনোহারিত্বকে এড়িয়ে

চলা সহজ হবে এবং তার সম্বন্ধে চিন্তা ও মনোভাব পরিবর্তনের সুবিধা হবে। কিন্তু তোমার মনোনীত আদর্শের প্রতি ভালবাসাকে সুদৃঢ় করতে হবে। ঈশ্বর প্রীতিতে যারা সুদৃঢ় তারা সহজে দেহের সৌন্দর্যে ও কামে মোহগ্রস্ত হয় না।

আর এক কার্যকর উপায় হলো, তোমার মনে যত রকম চিন্তা আসে সে সবকে তোমার সত্যস্বরূপ, তোমার মধ্যে সদা জাজ্বল্যমান আত্মার আলোয় ডুবিয়ে দেওয়া। কেবল অচেতন মনের অন্ধকারেই প্রলোভন এসে থাকে। আত্মার সন্ধানী আলোটি ছায়ায় ঢাকা জায়গাগুলিতে ফেল। সেখানকার গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে থাকা সব বিকটাকার ছায়ামূর্তিগুলো আত্মার আলোকচ্ছটায় লোপ পেয়ে যাবে। সব ডুবে থাকা মূর্তিগুলোকে উচ্চতর চেতনার আলোকের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসে দেখবে তখনই তারা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। চেতনার এমনই বিরাট শক্তি। কিন্তু অল্প লোকেই এ কাজ আগ্রহ নিয়ে করে থাকে।

দেখ, সব থেকে মুস্কিলের কথা হলো, আমাদের মনে ভেসে ওঠা ছায়ামূর্তিগুলিই বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ভুলে যাই যে ছায়া ছায়াই। প্রত্যেক ছায়াই যেন বাস্তব মানুষ হয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপে। এইসব ছায়ামূর্তির স্ফীত ধারণাকে খর্ব করে তাদের ওপর আরোপিত জীবন্ত ভাবকে দূর করতে শিখতে হবে। প্রথমে এ কাজ দুরূহ মনে হবে। পরে আমাদের আর একটি ভাল ছায়া মূর্তি আনতে হবে, মন্দ ছায়াগুলির প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠার জন্য। কিন্তু ছায়ামূর্তিকে চুপসে দেওয়ার পদ্ধতি আমাদের আজ হোক কাল হোক শিখতে হবে। যখন তুমি কোন ব্যক্তির আকর্ষণ অনুভব করবে, তখন যদি তাকে, সে নরই হোক আর নারীই হোক, অবাস্তব ছায়ামাত্র কিছু বলে মনে কর, তবে তোমার ওপর সেই নর বা নারীর সম্মোহন প্রভাব দূর হয়ে যাবে এবং সংগ্রাম খুব সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু সাধারণত আকর্ষণ এত বেশি হয়, আর আমাদের বুদ্ধি এতই বিভ্রান্ত ও ভুল ধারণায় ভরপুর যে, আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কাজ করতে চাই না।

## কাম দমনের আরো কিছু কার্যকরী প্রস্তাব

তোমার উচ্চতর কেন্দ্রগুলির বিষয় সচেতন হও। তোমার (হৃদয়স্থ বা মস্তিষ্কস্থ) উচ্চতর চেতনা-কেন্দ্রকে ধরে থাক। তাহলে দেখবে যে ব্যক্তি বা বিষয় তোমাকে প্রলুব্ধ করছে তার থেকে তুমি উচ্চতর স্তরে রয়েছ। তুমি যখন নেমে আস কেবল তখনই তুমি ধরা পড়। তুমি সর্বদা উচ্চতর ভূমিতে অবশ্যই থাকবে। যে কোন প্রবল প্রলোভনে পড়ার আগে চেতনা-স্তর নেমে আসে। অন্যের হাতে পড়ার আগে তাই সর্বদা উচ্চতর কেন্দ্র আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা কর।

যখন তুমি বুঝবে যে তোমার মন নিচে নামছে, তাকে বল ঃ 'ওপরে উঠে এস, কেন নিম্নস্তরে বসে থাকবে?' তাকে ভাল কথায় বোঝাও, 'হে আমার মন, তুমি এত নির্বোধ যে ভোগ আর কামের পেছনে ছুটছ! এর জন্য লজ্জিত নও? বস্তুত তোমারই তো আরো বেশি জানার কথা।' তোমার মনকে তোমারই একজন বন্ধু বলে মনে কর। অন্তরে শত্রু গড়ে তুলো না। অবশ্যই তোমার মনকে তোমার অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গী ও সহকারী করে গড়ে তোলো।

কখনো কখনো, বিশেষত যেসব লোক মানসপটে উচ্চতর দৃশ্যপট তৈরি করতে পারে না তাদের পক্ষে, দেহের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু কল্পনা করা ভাল। তুমি কি মিউজিয়ামে বা লেবরেটরিতে মানুষের কঙ্কাল দেখনি? যে সুন্দর চেহারাটি তোমাকে আকর্ষণ করে, তার পরিবর্তে বোকা বোকা হাসিমাখা সেই কঙ্কালটিকে, সেই অস্থি-সংগঠনটিকে দেখবে। যদি ইচ্ছা কর তার সঙ্গে রক্ত, নাড়িভুঁড়ি, স্নায়ু ও বিসদৃশ জিনিসগুলি এই কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত করতে পার। এটা কিছু মিথ্যা কল্পনা নয়। এইটাই মনুষ্য শরীর সম্বন্ধে সত্য কথা। আমরা কেবল এই সত্য ভুলে গেছি। আমরা কেবল গায়ের চামড়াটুকু দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। শারীরবিদ্যার সব কিছু জেনে ডাক্তাররাও এ সত্য ভুলে যায়।

কামের পীড়ন ও আকর্ষণ অতিক্রম করার সব থেকে কার্যকর উপায় হলো নিজেকে 'আত্মা'-রূপে দেখা। নিজেদের ও অন্যদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা দরকার। নিজেদের অন্যভাবে অধিকতর সত্যরূপে দেখার চেষ্টা করা উচিত। নিজেকে বার বার বল ঃ 'আমি নর নই, নারী নই, শরীর নই, আমি আত্মা। আমি অনন্ত চৈতন্য ও আনন্দ, কোন গুণের দ্বারা সীমিত নই। আমি এই শরীর নই যার সঙ্গে কিছু দিনের জন্য জড়িত রয়েছি। আমি লিঙ্গহীন' ইত্যাদি। যদি তুমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পরিবর্তন আনতে পার ও সত্যিই তা অনুভব কর, তবে তোমার অবস্থা নিরাপদ। এই ভাব তোমার মনের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দাও তোমার ধ্যানের সময়—প্রত্যুষে ও রাত্রে শয্যা গ্রহণের পূর্বে। প্রথমে মনে হবে এ সব অভিভাবনা মাত্র। কিন্তু বার বার অভ্যাসের ফলে এই ভাব তোমার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হবে এবং তোমার চিন্তা ও কাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

একই ভাব সর্বদা চিন্তা করলে তা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় এবং একবার এ রকম হলে সব কিছু সহজ হয়ে যায়। এবং চেতনার উচ্চতর স্তরে ওঠার চেষ্টা থাকলে, এই চিন্তা খুবই কার্যকরভাবে ও বিনা আয়াসে করা সম্ভব। একটি শিশু ক্যাঙ্গারুর উদাহরণই ধর না কেন। যখন কোন বিপদ আসে সে তখনই লাফিয়ে মায়ের থলেটিতে উঠে পড়ে। তোমার চেতনা-কেন্দ্রটি হবে ঠিক ক্যাঙ্গারু শাবকের কাছে

তার মায়ের থলিটির মতো। যে মুহূর্তে কোন ঝঞ্ঝাট আসবে, উচ্চতর কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত তোমার *ইষ্টের* সঙ্গলাভের চেষ্টা কর, তা হলেই তুমি নিরাপদ। বেশি সক্রিয় বাধা দিয়ে অযথা প্রতিক্রিয়া ডেকে এনো না। যে মুহূর্তে তুমি 'ইষ্ট' নিষ্ঠায় শৈথিল্য আসতে দেবে, জানবে মনকে নিচে নামার ও সংসারে আসক্ত হবার সুযোগ করে দিলে; আর তখনই তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।

তোমার সব চিন্তার সঙ্গে তোমার *ইষ্ট দেবতাকে* যুক্ত করতে শেখ। যারা তাদের *ইষ্ট দেবতাকে* খুব আন্তরিকতার সঙ্গে ভালবাসে, তারা কখনো কামের দ্বারা পীড়িত হয় না। আদর্শকে বস্তুনিরপেক্ষ বোধ হওয়ায় তার প্রতি ভালবাসার যে অভাব তাই হলো মানুষের কঠোর *ব্রহ্মচর্য* পালনে অসুবিধার প্রধান কারণ।

যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় ও কিছু বহিরাকর্ষণ বা মানসিক চিত্রের সঙ্গে সংগ্রামে রত, তখন ব্যবহারের জন্য কতকগুলি অস্ত্র আমাদের হাতের কাছে থাকা দরকার। কখনো একটি মাত্র অস্ত্রের ওপর নির্ভর করবে না। জপ, বারবার কিছু সৎগ্রন্থ থেকে পাঠ বা প্রার্থনা করা বা তীব্র ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে কোন পবিত্র আদর্শকে মানস পটে চিত্রিত করা, ছন্দোবদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস, সাধু সঙ্গ, বিপরীতমুখী চিন্তার উদ্ভাবন—এর যে কোনটি ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে।

## চেতনার পরিবর্তন—চরম সমাধান

সংযম সম্বন্ধে যেসব আলোচনা আমরা আগে করলাম তা অধ্যাত্ম জীবনের প্রবর্তকদের জন্য। যতদিন না সাধক সমস্যার গভীরে যেতে পারছে, ততদিন এই প্রাথমিক অভ্যাসগুলির প্রয়োজন। এর চরম সমাধান নিহিত আছে কিন্তু চেতনার রূপান্তরে। যৌন চেতনা দেহ চেতনারই একটি অঙ্গমাত্র এবং দেহ চেতনাকে জয় করতে না পারলে, চিন্তায় ও কাজে পূর্ণ সংযম আনা কঠিন। প্রবর্তকের আধ্যাত্মিক জাগরণের অভিজ্ঞতা না হলে এবং তার দেহ-চেতনা ইন্দ্রিয়াতীত চেতনায় পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত যৌন-বোধ যেতে চায় না, কোন না কোন আকারে থেকেই যায়।

*অনাহত চক্র* বা হৃদয় কেন্দ্রকে জাগাতে হবে। ইন্দ্রিয়াতীত আলোকের আনন্দ অনুভব করতে হবে। যৌন-সমস্যার মূল কামনা তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা তখনই লুপ্ত হয়, যখন সাধক আধ্যাত্মিক অনুভূতির আনন্দে নিমগ্ন হয়ে উঠতে পারে। *ব্রহ্মচারীর* পক্ষে অন্য সব বাসনার কতকটা তৃপ্তি হতে পারে। কিন্তু যৌন-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না। এ সমস্যার সমাধান কেবল তখনই হতে পারে যখন সাধক হৃৎপদ্মের আনন্দানুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। যখন হৃদয়-কেন্দ্র জেগে ওঠে তখন আত্মার আলোক দৃষ্টিগোচর হয়। এই আলোকের গৌরব ও অত্যুজ্জ্বল দীপ্তির কাছে জড়

দেহের সৌন্দর্য ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা লোপ পেয়ে যায়। বহু পুরুষ নারীর প্রতি যে মোহে মুগ্ধ হয়, তাকে অতিক্রম করার এই হলো একমাত্র উপায়।

সাধক যখন ঐ উচ্চতর অভিজ্ঞতা লাভ করে নেমে আসে তখনো, ঐ মহিমান্বিত অবস্থার স্মৃতি তার মনে থেকে যায় ও তাকে রক্ষা করে জাগতিক প্রলোভন থেকে, যা তখন তার কাছে সামান্য নগণ্য মনে হয়। সে তখন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করে কেবল আধ্যাত্মিক আনন্দই আকাঙ্ক্ষা করে।

সুতরাং সংযত জীবনের সমস্যা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের বৃহত্তর সমস্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। অবশ্য সাধকের প্রধান উদ্বেগের বিষয় হতে হবে—কিভাবে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, কি করেই বা দেহ চেতনার রূপান্তর ঘটানো যায়, কি করে উচ্চতর কেন্দ্রে যাবার পথ উন্মোচন করা যায়, কি করে উচ্চস্তরে মনের স্থিতি লাভ করা যায় ইত্যাদি। যখন এই চরম গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয় তার সমগ্র মনকে অধিকার করে থাকে ও তার কল্পনা শক্তিকে নিয়োজিত রাখে, তখন তার কাছে যৌন-সমস্যা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে শেষ পর্যন্ত লোপ পায়।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

## শক্তি

অধ্যাত্ম সাধকের একটি বিশেষ গুণ হলো শক্তি—শারীরিক ও মানসিক। আধ্যাত্মিক জীবনে দুর্বলদের স্থান নেই। উপনিষদ্ বলেন ঃ আত্মা দুর্বলের লভ্য নয়।[১]

### শারীরিক শক্তি

প্রথমত শরীর সবল হওয়া অবশ্যই দরকার। তোমাকে কুস্তিগীর হতে হবে না, কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনায় যে প্রচণ্ড মানসিক চাপ ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তা সহ্য করার মতো সুস্থ ও সবল হতে হবে। শরীরের প্রতি নেতিবাচক বা অগ্রাহ্যের মনোভাব এনো না। তোমার এই শরীর মহৎ বস্তু, ভগবানের মন্দির। এর সঙ্গে নিজে একাত্ম বোধ করার বা এর প্রতি আসক্ত হবার দরকার নেই। একে তোমার থাকবার বাড়ি বা কাজের যন্ত্র মনে করে চলবে। একে শুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত রাখবে। নিয়মিত ব্যায়াম কর। (যৌগিক) *আসন* অভ্যাস করা ভাল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐসব *আসন* করতে না পারলেও ফাঁকা জায়গায় কিছু সহজ ব্যায়াম করতে পার। আমি এসব বলছি কারণ আধ্যাত্মিক সাধকদের শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন হবার প্রবণতা থাকে। আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার গোড়ার দিকে, যখন তুমি বহুরকমের দ্বন্দ্বের মধ্যে আছ, তখন হয়তো তুমি বলশালী শরীরের সুবিধা কি তা ধরতে পারবে না। কিন্তু পরে, তোমার আধ্যাত্মিক জীবন যত সরল হয়ে আসবে ও তুমি বহুক্ষণ ধ্যান অভ্যাসে সমর্থ হবে, ততই তুমি বুঝবে স্বাস্থ্যবান শরীর কত বড় সম্পদ।

আমাদের এই শরীর যেন সংসার-সমুদ্রের পারে যাবার নৌকা। দেখ এতে যেন কোন ফুটো না থাকে। পাকস্থলীকে মাত্রাতিরিক্ত ভর্তি করবে না। খাদ্য অল্প অথচ পুষ্টিকর হবে। সব রকম যথেচ্ছাচার বর্জন করবে। মস্তিষ্ককে দৃঢ় অথচ শান্ত রাখতে হলে কঠোর সংযম চাই। যারা সংযম অভ্যাস করে না, তাদের মস্তিষ্ক সহজেই গরম হয়ে পড়ে। সংযম সাধন না করলে বহুক্ষণ ধ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় তেজের অভাব হবে মস্তিষ্কে।

---

১ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' —মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩/২/৪

ঠিক যেমন উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ায় চড়ে সুখ পাওয়া যায়, তেমনি স্বাস্থ্যবান সুসংযত দেহে বেঁচে থাকা খুবই আনন্দের বিষয়। যারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ তাদের ধারণা নেই সংযত পবিত্র দেহে কত আনন্দ লাভ করা যায়। আত্মসংযম ও পবিত্রতা অবলম্বনে হয়তো গোড়ার দিকে কিছু উদ্বেগ ও কষ্ট হতে পারে, কিন্তু পরে ঐগুলিই প্রভূত সুখ, শান্তি ও সন্তোষের উৎস হয়ে থাকে।

সুস্থ ও শক্ত মন অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বলচেতা লোক উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করতে পারে না—এর জন্য মূল্য দিতেও পারে না। আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে যে সংগ্রাম ও ত্যাগ জড়িত আছে, তা জেনেই তারা ভয়ে সরে যায়। তোমার মনকে শক্ত কর, তোমার ইচ্ছাকে দৃঢ় কর।

## মানসিক শক্তির পরীক্ষা—বিশ্বাস ও অধ্যবসায়

মানসিক শক্তির পরীক্ষা নেবার একটি উপায় হলো বিশ্বাস ও অধ্যবসায়। কেবল শক্ত মনেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। তোমাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেই হবে, 'আমি এমন একজন যে অধ্যাত্ম জগতে কিছু লাভ করার যোগ্য।' অধ্যাত্মজীবনের সাফল্য নির্ভর করে আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শকে দৃঢ় ও স্থিরভাবে ধরে থাকার ওপর। আপেক্ষিক (নামরূপের) স্তরে এই সব বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকারের মধ্যে আমাদের কাজ, ভাবনা, অনুভূতি ও ইচ্ছার একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে থাকতেই হবে। তা না হলে আধ্যাত্মিক জীবন অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। বহু আধ্যাত্মিক সাধক অতি উৎসাহের সঙ্গে এ জীবন আরম্ভ করলেও, যখনই নানারূপ বাধার, প্রায়শ নিজের সৃষ্টি করা বাধার, মুখোমুখি হয় তখনই উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। উদ্দেশ্যের প্রতি খুব দৃঢ় নিষ্ঠা চাই, স্বামী বিবেকানন্দ যে নিষ্ঠার ওপর জোর দিতেন তাঁর অনুগামীদের জীবনে।

মহান অবতারপুরুষ ও সন্তদের জীবনের দিকে তাকাও। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের দিকে তাকাও। কী প্রচণ্ড মানসিক শক্তি, কী বিশাল ইচ্ছা শক্তিরই না অধিকারী ছিলেন তাঁরা! অধ্যাত্ম জীবনে সাফল্য পেতে হলে তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তার ও সঙ্কল্পে স্থিরতার সামান্যও আমাদের মধ্যে থাকা চাই। আমরা অকৃতকার্য হলেও, আমরা যেন পরাজয় স্বীকার না করি, সংগ্রামে যেন ইতি না করি। আমরা পড়েও যেন আবার উঠে পড়ি। অধ্যাত্মজীবন কদাচিৎ স্বচ্ছন্দ হয়ে থাকে, তার গতি কদাচিৎ সরল পথে যায়। কিন্তু একেই যেন আমরা ক্রমাগত পতনের অজুহাত না করি। আমরা যদি আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাই, আর প্রত্যেকটি পতনের পর উঠতে শিখি, তবে আমরা প্রচুর মানসিক শক্তি ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী হব।

## সিদ্ধান্তে আসার পারদর্শিতা

স্থির সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা হলো মানসিক শক্তির দ্বিতীয় পরীক্ষা। সিদ্ধান্তে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব সব সময়েই মানসিক দুর্বলতার চিহ্ন। এতে বোঝা যায় যে তোমার মধ্যে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দ্বন্দ্বই ব্যক্তিত্বের সংহতিকে খর্ব করে। সিদ্ধান্তবিহীন অবস্থায় বেশিদিন থাকলে, সামর্থ্যলাভের পরিবর্তে আমরা সামর্থ্যহীন হব। সিদ্ধান্তবিহীন অবস্থায় থেকে মনকে শক্ত করার কথা ভাবা বাতুলতা। ছোট ছোট বিষয়ে আমাদের অবশ্যই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তখনই আমরা দেখব বড় বড় বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সহজ হচ্ছে। জীবনের ক্ষুদ্রতম কাজও আমাদের সচেতনভাবে, বুদ্ধি খাটিয়ে, স্থির সিদ্ধান্তে এসে—ভাবনা, চিন্তা ও ইচ্ছার সব শক্তি সহযোগে করতে হবে। সদভ্যাসের অনুশীলন বাল্যেই করা দরকার। সুনিয়ন্ত্রিত জীবন মানুষের বিরাট সহায়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যদি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলি, জীবনের অনেক ছোট খাট সমস্যা দ্বিধাসঙ্কোচ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করবে না। তখন আমরা বড় বড় বিষয়ে বেশি শক্তি ও সময় দিতে পারব। কি খাব, কি পরব, কিভাবে চলব, কিভাবে বসব ইত্যাদি ঠিক করা যারা কঠিন মনে করে—তারা কি করে সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করবে? তুমি নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে শুয়ে আধ ঘণ্টা ধরে চিন্তা করবে না—'আমি উঠব, কি উঠব না?' হয় এখনই ওঠ, না হয় আরো আধ ঘণ্টা ঘুমাও, কিন্তু কিছুতেই সমস্যাটি অমীমাংসিত রাখবে না। 'আমি ধ্যানে বসব, কি বসব না?' এখনই ঠিক করে ফেল। সিদ্ধান্তহীনতা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

তোমরা পড়াশুনা, ধ্যান, কাজ প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময়ে করে চল, তোমার ভাল লাগুক আর না লাগুক। জীবনের ছোট খাট বিষয়গুলি, যেন তোমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে না থাকে। আর তোমার শক্তির অপচয় না ঘটায়।

## সৎচিন্তাকেও সংযত রাখার সামর্থ্য

কেবল মন্দ চিন্তা ও আবেগকে সংযত করতেই শক্তির দরকার তা নয়, সৎ চিন্তার ক্ষেত্রেও দরকার। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, যারা সৎ ভাব ও আবেগ সংযমনে সমর্থ নয়, তারা মন্দ ভাব ও আবেগও সংযত করতে পারে না। ভাল মন্দ সব ভাবকেই সংযত রাখতে হয়। আমাদের সংযমন শক্তিকে অবশ্যই বাড়াতে হবে, এবং সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিজ অন্তরের ভাবের ওপরেও আমাদের প্রভুত্ব অর্জন করতে হবে এবং পূর্ণ সচেতন ও স্থির নিশ্চয় হতে হবে।

যদি আমরা সৎ ভাবকে মনের গভীরে প্রবেশ করাতে পারি, তবে তা আমাদের সত্তাকেই সেই ভাবে রাঙিয়ে তুলবে। সৎ ভাব ও সৎ অভিজ্ঞতার কথা অন্তরেই

রাখবে। এগুলিকে যখন তখন প্রকাশ করলে তাদের প্রেরণাশক্তির হানি হয়। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের চালনা-শক্তি আসে প্রচণ্ড বাষ্পচাপ থেকে। বাষ্পকে যদি ঘন ঘন ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে ঐ ইঞ্জিন আর নড়ে না। যেসব পবিত্র অনুভূতি ও ভাব আমরা সৎগ্রন্থ, সৎসঙ্গ ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদি থেকে পাই তা আমাদের অন্তরেই লালন করা উচিত, যতদিন না সেগুলি আমাদের চরিত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনছে। সেই কারণে স্বপ্নের বা আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা বলতে বারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণত লোকে তাদের এই তথাকথিত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলে বেড়ায়। এও এক রকমের ভোগ, অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে যার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। যারা প্রকৃত সাধক তারা তাদের আধ্যাত্মিক আবেগ সম্বন্ধেও দৃঢ় ও সংযত মনোভাব অবলম্বন করে থাকে। বাইরে প্রকাশ না থাকলেও তারা অন্তরে গভীর ভাব পোষণ করে।

যদি তুমি অন্তরের মহৎ ভাবগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পার, তবে মন্দ উত্তেজনা বা ভাব তোমার মধ্যে এলে তুমি তাদের শিকার হয়ে পড়বে। প্রথমে দৃঢ়চেতা হয়ে কিছু মূলধন তৈরি কর, পরে তার সুদটি খরচ কর। প্রথমে তোমাকে বেশ কিছু মূলধন জমাতে হবে, তা না করে মূলধন থেকেই খরচ করতে থাকলে তুমি তো দেউলিয়া হয়ে যাবে। তোমার ভেতর প্রচুর অনুভূতি আসুক, কিন্তু সেগুলির ওপর তোমার প্রভুত্ব যেন বজায় থাকে।

## নির্ভীকতা

মানসিক শক্তির আর একটি চিহ্ন হলো ভয়হীনতা। কখনো কখনো ভয়েই আমাদের তেজ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যেন অতি সাহসী না হই বা নিজেদের অতি নিরাপদ মনে না করি, কিন্তু যে সর্বদা পড়ে যাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত সে পড়েই যায়, ঠিক যেমন নিজের ওপর অতি বিশ্বাসী হলে পতনের সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। আমরা যতই উন্নত হব, ততই স্খলন হবার ও পড়ে যাবার বিপদ বাড়বে, কিন্তু তার জন্য সর্বদা পড়ে যাবার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কারণ নেই।

আপেক্ষিক স্তরে (কি ব্যবহারিক জগতে) কোন নিরাপত্তা নেই। একমাত্র ঈশ্বর দর্শনেই (বা ঈশ্বর নির্ভরতাতেই) ভয় একেবারে দূর হতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে ঃ 'হে জনক, এখন তুমি অভয়প্রাপ্ত হয়েছ।'[২] এই হলো পরম ভয়হীনতা—আত্মোপলব্ধি হলে যা লাভ করা যায়। উপনিষদ্ ভয়হীন অবস্থাকেই ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধের অবস্থা বলে থাকেন ঃ 'অভয়ত্বই ব্রহ্ম'[৩] অন্য উপনিষদে

২ অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি —*বৃহদারণ্যকোপনিষদ*, ৪/২/৪, ৪/৪/২২

৩ অভয়ং বৈ ব্রহ্ম। তদেব, ৪.৪.২৫

বলা হয়েছে ঃ 'যখনই লোকে দ্বৈতবোধ করে, তখনই সে ভীত হয়।'[৪] আমরা আমাদের সত্য আত্মাকে যত বেশি উপলব্ধি করব, ততই দেখব ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন, ততই আমরা অভয়প্রাপ্ত হব।

আর এক রকমের ভয় আছে—অপর লোকের কাছ থেকে ভয়। 'অন্যে আমার সম্বন্ধে কি ভাববে?' অন্যে যা ইচ্ছা ভাবুক। তোমার যদি দৃঢ়বিশ্বাস হয়ে থাকে যে তুমি ঠিক পথে চলেছ, তবে অন্যে তোমার সম্বন্ধে কিছু বলল বা ভাবল তাতে কি আসে যায়? আদর্শগত ব্যাপারে, যা তোমার সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে, কোন মতেই অন্যের কাছে নতি স্বীকার করবে না। হীনমনা লোকেদের ভয়ে, আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পদগুলি কখনো হারিও না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে প্রভু নরেন্দ্রকে বলেছেন, 'সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে। কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না।'[৫]

প্রভু আরও বলেন, 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।'[৬] সাধকের যতদিন লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় থাকবে, ততদিন সে আধ্যাত্মিক পথে এগুতে পারবে না। সকলকে খুশি করা সম্ভব নয়। কিছু লোকের আমাদের মতের সঙ্গে মিল না হলেও, অন্য অনেকের মিল হতে পারে। যেমনই হোক সবদিক ভেবে আমরা যা ঠিক বলে বিবেচনা করব, আমাদের তাই করতে হবে। কখনো কখনো আমি এমনও বলি, যদি কেউ সকলকে সন্তুষ্ট করতে চায় তবে তার ভেতরেই কিছু গলদ আছে। আমরা যদি নিজেদের ভেতর ঈশ্বরের গৌরবকে প্রতিফলিত করি, তবে দেখব অন্যে আমাদের সম্বন্ধে মনোভাব আপনা আপনি পরিবর্তন করতে আরম্ভ করছে।

অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে, আমাদের সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা উচিত, আবার সেই সঙ্গে অপরের ভাল করতে তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করা দরকার। আমরা স্বার্থশূন্য হব, তবে আমাদের কিছুটা শক্ত হওয়া দরকার যাতে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে অপরের সঠিক ধারণা হয়। আমাদের মনোভাব ও শক্তি এমনই হবে যাতে অন্যে আমাদের কাছ থেকে অযথা সুযোগ নিতে সাহস না করে।

আমাদের প্রতি অন্যের অন্যায় আচরণকে বা তাদের কোন অন্যায় কাজকে আমরা যদি উপেক্ষা করতে চাই, তবে আমাদের অবশ্যই শক্ত হতে হবে। আমরা যদি প্রতিশোধ নিতে চাই, তখনো আমাদের শক্ত হতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের শক্তি চাই। প্রতিশোধ না নিলেও আমাদের অন্তত ততটা শক্তি চাই যাতে অপরে

---

৪ যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। —*তৈত্তিরীয়োপনিষদ্*, ২/৭/১

৫ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ২২ ৬ তদেব, পৃঃ ৭২৫

সে শক্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকে। নীরব থাকার একটা নিয়ম আছে, তা এমন হবে যাতে অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবে ও নিজের ভুল বুঝবে। সে আর তোমার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করতে সাহস করবে না। অন্যকে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে, তবে তা অবিবেচকের মতো বা হিংসা প্রণোদিত হয়ে নয়, দৃঢ়তা ও মর্যাদার মাধ্যমে। জগতে এত মন্দ ও অপবিত্র লোক আছে যে আমরা যদি দুর্বল হই, তবে তারা সব সময়ে আমাদের থেকে সুবিধা নিতে চেষ্টা করবে। অতএব সাধককে প্রথমেই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, প্রকৃত অন্তরের শক্তি চাই, যা কখনো পরাজয় স্বীকার করবে না। তবে স্মরণ রাখবে, দৈত্যের শক্তি ধারণ করলেও তা দানবের মতো যথেচ্ছ ব্যবহার করা তোমার উচিত হবে না।

## অহিংসা

এবার আমরা শক্তির আর একটি চিহ্নের, যথা 'অহিংসা'র, কথায় আসি। যদি তুমি ভয়ে অহিংসা ব্রত অবলম্বন কর, তবে তার কোন মূল্য নেই। প্রকৃত অহিংসার অর্থ, মানবের অধিগম্য সর্বোচ্চ শক্তি ও সহ্যগুণ। এর অর্থ হলো সর্বোচ্চ সাহসের সঙ্গে সর্বোচ্চ প্রেম। এর অর্থ সম্পূর্ণ বিদ্বেষরাহিত্য। সে কথাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শেখাতে চেয়েছেন গীতার মাধ্যমে। তিনি অর্জুনকে কর্তব্য পালনে, এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে প্রণোদিত করেছিলেন—কিন্তু অপরকে বিদ্বেষ না করে।

বিদ্বেষ আসক্তির মতোই খারাপ। ক্রোধ লালসারই মতো মন্দ। এ বিষয়ে যেন ভুল না হয়। তুমি যখন আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করবে, অপরের বাধা সৃষ্টি করবে না, কারও প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রচার করবে না—সে যেমন লোকই হোক। অপরকে কৌশল করে সরিয়ে দিও না, অপরকে বলি দিও না—তোমার বা তোমার প্রিয়জনের স্বার্থের জন্য। পশুজগতে বাঁচার লড়াই চলতে পারে কারণ সেখানে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নিয়মটি খাটে। কিন্তু মানুষ তো পশু নয়, তার পশুসুলভ ব্যবহার করা উচিত নয়। তাকে পশুজগতের নিয়মের পারে যেতে হবে, ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে। ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ম হলো প্রেম ও ত্যাগ।

আধ্যাত্মিক লোকের আদর্শ হলো আসক্তি ও বিদ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। অপরের জন্য তার সহানুভূতি ও প্রেম থাকা উচিত। অন্য লোকেদের দুঃখে আধ্যাত্মিক মানুষের যে দুঃখবোধ হয়, তা তাদের নিজেদের দুঃখবোধের থেকে বেশি। যারা তার সঙ্গে দম্ভ বা হিংসার আশ্রয় নিয়ে ব্যবহার করে তাদের সঙ্গেও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন। নিজের বহু ক্ষতি স্বীকার করেও সে সর্বদা

তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সহানুভূতির নামে বিষয়ীভাবে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে না। অপরের স্বার্থসিদ্ধির কাজেও সে নিজেকে জড়ায় না।

এ জগতে 'বিদ্যাশক্তি' ও 'অবিদ্যাশক্তি'—জ্ঞান শক্তি আর অজ্ঞান শক্তি—দুই শক্তিই কাজ করছে। আধ্যাত্মিক সাধক আগেরটির কাছে নিজেকে খোলা রাখবে, পরেরটির কাছে নয়। এতে হয়তো একটু 'ফোঁস্' করতে হবে, কিন্তু কামড়াবে না।[৭] সে মনে ঘৃণা বা প্রতিশোধের ভাবও আসতে দেবে না তার চারিদিকে যেসব শক্তি খেলা করছে, সে সম্বন্ধে তাকে অবশ্য খুব সতর্ক থাকতে হবে।

প্রকৃত 'অহিংসা' খুব উঁচু আদর্শ। এই আদর্শের দিকে আমাদের অবশ্যই ধাপে ধাপে এগুতে হবে। মনকে সব রকম নোংরা চিন্তা বা উত্তেজনা থেকে পরিষ্কৃত রাখতে হবে। কেবল প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের পরেই আমরা প্রকৃত 'অহিংসা' ভাব অর্জন করতে পারি। 'অহিংসা'র তত্ত্ব রূপ আর যে 'অহিংসা' জীবনে পালিত হয়, তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ঈশোপনিষদে আমরা পাঠ করে থাকি ঃ 'যখন কেউ আত্মাকে সকল লোকের মধ্যে দেখে, আর সকল লোককে আত্মার মধ্যে দেখে, তখন সে কাউকে ঘৃণা করে না।'[৮] উপনিষদে বার বার এই ভাবটি এসেছে—যে আত্মানুভূতিই প্রকৃত অহিংসার ভিত্তি। যখন কোন সাধক আত্মানুভূতি লাভ করে তখন আর তার অন্যের প্রতি ঘৃণাভাব আসে না।

কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার দিকে সাধককে অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। *অহিংসার* নামে তার অতি নরম এবং নমনীয় হওয়া উচিত হবে না। যেসব লোক চারিত্রিক দৃঢ়তা অবলম্বন না করে অতি নরম প্রকৃতির হয় তাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক জীবন খুবই কষ্টদায়ক হবে। জগতের মন্দভাবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে প্রভূত শক্তির প্রয়োজন। যেখানে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি জড়িত সেখানে নরম বা ভাবপ্রবণ হবে না।

কিন্তু আমাদের নিজের সম্বন্ধেও কঠিন নিয়মানুবর্তিতা চাই। আমাদের মন থেকে হিংসা, ক্রোধ ও ঘৃণার সব ভাব অপসারিত করতে হবে। সময়ে সময়ে বাহ্যত অন্যের সঙ্গে মিশলেও, আমরা ভেতরে ভেতরে ক্রোধে দগ্ধ হই। এ রকম হওয়া খুবই ক্ষতিকর। অহিংসা প্রথমে অন্তরে পালন কর। তাতেই মনের জোর বাড়বে। একমাত্র বলবান লোকই অহিংস হতে পারে।

---

৭ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ২৩-২৪-এ বর্ণিত শ্রীরামকৃষ্ণের সুপরিচিত 'ব্রহ্মচারী ও সাপ'-এর গল্পের কথা এখানে বলা হয়েছে।

৮ যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ *ঈশোপনিষদ্*, ৬

## সত্যের ক্ষতিকর দিক

জ্ঞাতসারেই আমাদের হৃদয়কে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে, যেখানে আমাদের সমস্ত আসক্তি, কলুষ ও অহংকারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে। এই অনির্বাণ চিতাই হবে ঈশ্বরের পূজা, একমাত্র প্রকৃত পূজা এবং এতে আমাদের কখনো স্নায়ুদুর্বল হয়ে পড়া উচিত নয়। আমাদের অশান্তির কারণ হলো, আমরা কেবল সেই ভগবানের পূজা করি যিনি আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেন। কিন্তু দুঃখ কি তাঁর দান নয়? সর্বত্রই আমরা বরদাতা ঈশ্বরকেই পূজা করি। কিন্তু যখনই তাঁকে বিনাশের কর্তারূপে ভাবি, তখনই আমরা ভীত হই। শিব বর দেন তা বেশ। শিব যখন প্রলয় নাচনে মত্ত হন, তা আমাদের কাছে ভয়প্রদ! কেন? আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ঈশ্বর তখনই ঈশ্বর, কেবল যখন তিনি সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন—যখন বিনাশ হচ্ছে, ঈশ্বরের তখন তাতে কোন হাত নেই! না, তা হতে পারে না। ঈশ্বর তখনই ঈশ্বর যখন সব কাজই তিনি করছেন—যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের ঈশ্বর—সর্বোপরি যখন তিনি নিষ্ক্রিয়। তাই কেবল সৎ-ঈশ্বরের ধর্মের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রতিক্রিয়া প্রশংসনীয়। আধুনিক মনকে এক দয়ালু ও সৎ ঈশ্বর উপহার দিলে সে ছুড়ে ফেলে দেবে, কিন্তু তাকে প্রকৃত ঈশ্বর উপহার দিলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক মন তাকে গ্রহণ করে।

ঈশ্বর যখন সৃষ্টি, স্থিতি, আর বিনাশ করছেন তখন তাঁর মাতৃরূপ। আবার এসবের পারে, মাতা তাঁর নিরপেক্ষ [নির্গুণ] ভাবে শিবরূপ ধরেন। এইরূপে আপেক্ষিক [সগুণ] ভাবে, ঈশ্বর যেন মাতা; নিরপেক্ষ [নির্গুণ] ভাবে অর্থাৎ একই মাতা যখন তাঁর সৃষ্টি, স্থিতি আর বিনাশের পারে যান, তখন ঈশ্বর যেন শিব। মাতা শিবের ওপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের খেলায় মত্ত হয়ে নাচছেন, আর মায়ের পায়ের নিচে শিব স্থির হয়ে, উদাসীন ভাবে শবের মতো পড়ে আছেন। কী অদ্ভুত অতীব গভীর সত্যের প্রতীক এগুলি!

মৃত্যুকে কেন ভয়? মৃত্যু তো গৌরব-মণ্ডিত হতে পারে। মায়ের এই মহত্তম খেলা কোথায় দেখতে পাব? কেবল শ্মশানেই, আর শ্মশান ততটাই বাস্তব ও সত্য শিশু নিকেতনটি যতটা। জীবনে ও মরণে সাধকের কর্তব্য হবে মাকে, শুধু মাকেই আশ্রয় করে থাকা, জীবন ও মৃত্যু দু-এরই জন্য আসক্তি বা ভয় ত্যাগ করে।

সদাই দেখা যায়, যার সুখকর জিনিসের ওপর মোহ তাকে দুঃখ পেতে হয়। মনের কষ্টের কাছে দেহের কষ্ট কিছুই নয়। মনের কষ্ট সারা জীবন ভোগ করতে হয়। তাই আমাদের সব সময়েই জানা উচিত যে সত্য সুখ-দুঃখের পারে, এই দুইয়ের পারে যেতে পারলেই সত্য লাভ হবে।

রামপ্রসাদ গেয়েছেন (ইংরেজীর অনুবাদ) ঃ

*ও আমার চঞ্চল মন*
*যেমনই থাকো, মাতৃনাম ভুলোনা কখনো।*
*তুমি থাকো দুঃখ মাঝে,*
*আরো দুঃখ আসবে বুঝে,*
*তাতে কিই বা এসে যায়?*

দেহের কোন কষ্টকেই, মানব মনে যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় না; আর এসব ঝড় কোন দিনই পার হওয়া যাবে না—যতদিন আমরা জীবনের সুখটিকেই কেবল আকঁড়ে থাকব, আর তার ভীষণ কষ্টের দিকটিকে অস্বীকার করব বা করতে চেষ্টা করব। আমাদের পুরোপুরি তৈরি থাকতে হবে ঈশ্বরের সুন্দর ও ভীষণ দুটি রূপেরই পারে যাবার জন্য—যদি আমরা সত্যসত্যই তাঁর কাছে পৌছতে চাই এবং শান্তি ও আনন্দ চাই।

সত্যের বিনাশ ক্রিয়া দেখে স্থির থাকতে পারা বিশেষ প্রয়োজন। সত্য প্রথমে আমাদের সব রকম মিথ্যা আশা, মিথ্যা একাত্ম বোধ, প্রিয় ভাবগুলিকে, আমাদের সব মিথ্যা সাংসারিক আকাঙ্ক্ষাকে, আমাদের সব ক্ষুদ্র সামান্য মোহগ্রস্ত ভালবাসাকে দগ্ধ করে। তার পরেই কেবল সত্য প্রকাশিত হয়, তার আগে নয়। কিন্তু কজন চায় যে ওগুলি সত্য সত্যই দগ্ধ হোক, কে চায় এই মূল্য দিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌছে যাই? আমাদের কাছে উপায় আছে, মহান ঋষিদের উপদিষ্ট বিধিও আছে, কিন্তু আমরা এমনই নীতিভ্রষ্ট যে এ বিষয়ে আমদের চেষ্টাকে ক্রমান্বয়ে ফেলে রাখি, আর সত্যকে নিজে জানবার চেষ্টা না করে সে বিষয়ের পুরাতন ভাবনা চিন্তাগুলির নাড়াচাড়া করে এক বৌদ্ধিক ভোগে মত্ত হই। তাই আমরা লক্ষ্যস্থল থেকে বহুদূরেই থেকে যাই।

আমরা প্রায়ই আমাদের ভালবাসার ও প্রভুত্বের ও আত্মগরিমার দুঃখজনক, ঘৃণা-সূচক, তুচ্ছ, ছোট ছোট স্বপ্ন দেখতে চাই। সেগুলিকে আশা মিটিয়ে বুকে জড়িয়ে থাকতে চাই, যতক্ষণ সম্ভব সেগুলিতে আবদ্ধ থাকতে চাই—যতক্ষণ না সেগুলিকে আমাদের কাছ থেকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দেওয়া হয়।

যেমন বলেছি, যদি তুমি সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাও, তবে তোমাকে স্থূল সূক্ষ্ম সব রকম স্বপ্নকে দূর করে দিতে হবে, সেগুলি আপাত-দৃষ্টিতে ভাল হলেও। আমাদের অন্তরটাতে নির্দয়ভাবে ঘসা, মাজা, রদবদল করা চালাতে হবে। পুরান ধারণা, প্রিয় ভাবনা, সংস্কার প্রভৃতিকে বিসর্জন দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে হবে। প্রচণ্ড আপসহীন সাহসিকতা চাই। যাদের পুরুষোচিত

ভাব রয়েছে, যারা সাহসী, বলশালী, সঙ্কল্পে স্থির এবং নির্ভরযোগ্য, একমাত্র তারাই সত্য উপলব্ধি করতে পারে, অন্যে নয়। এটি এমনই আশ্চর্য দুঃসাহসিক অভিযান। বেদান্তে দুর্বলচেতাদের কোন স্থান নেই, স্থান নেই ধূলিচারী কীটদের, সেই সব পাপীদের যারা 'ওহো, আমি পাপী, আমি পাপী, আমি কী করতে পারি, আমি যে পাপী' এই রকম কথা বলে বেড়ায়—আর চালিয়ে যায় পাপ কাজ, কাদায় হাবুডুবু খায়, আর বিলাপ-ক্রন্দন করে বেড়ায়।

দুর্বলের কখনো সত্য উপলব্ধি হয় না। যদি পবিত্রতাতে আমাদের জন্মাধিকার তবে কেন আমাদের মধ্যে তার বিকাশ হবে না? যদি আনন্দে আমাদের জন্মাধিকার, তবে কেন তার বিকাশ ঘটবে না আমাদের মধ্যে? যদি মুক্তিতে আমাদের জন্মাধিকার, তবে কেন ইন্দ্রিয়-দেহ-মন-অহম্-এর দাস হয়ে রয়েছি? নির্দয় হয়ে এ স্বপ্ন ভেঙ্গে ফেল! নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে শেখ, মানুষের পায়ের ওপর, মানুষের মতো। স্বামী বিবেকানন্দ একটি কবিতায় বলেছেন ঃ

**অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে**
**সত্যগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে,**
**মিশি সত্যে যাও এক হয়ে।**
**মিথ্যা কর্ম-স্বপ্ন ঘুচে যাক—**
**কিংবা থাকে স্বপ্নলীলা যদি,**
**হের সেই, সত্যে গতি যার,**
**থাক স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার**
**আর থাক প্রেম নিরবধি।** (অনুবাদ ঃ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ)[১]

## আত্মার চিন্তা কর

আত্মার চিন্তা কর—যিনি তোমার দেহ মনের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঐটিই হলো আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। মিথ্যা ব্যক্তিত্বাভিমান থেকে আমরা যতটা সরতে পারব, আর আত্মার সঙ্গে একাত্ম বোধ করব—ততটাই আমরা অভী ও বলবান হব, পবিত্রতা ও শান্তি লাভ করব। অন্তরস্থ ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যতটা একাত্মবোধ করব, আমরা ততটাই সাধুতা লাভ করব। বহির্মুখী হলে মানুষ পাপী হয়; আত্মমুখী হলে সাধু হয়।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্যের রহস্য হলো নিজেকে এক আধ্যাত্মিক জীব, স্বভাব-পবিত্র ও মূলত স্বয়ং জ্যোতিঃরূপে দেখা। ধ্যানের সময় এই ভাবনাকে

---

১ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৭ম খণ্ড, পৃ ৪১১, প্রবুদ্ধ ভারত

আমাদের চেতনার গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে, তখন আত্মার এই পবিত্র স্বয়ংজ্যোতিঃ রূপ আমাদের দেহে ও মনে বিকশিত হবে।

যারা তাদের পাপের জন্যে কাঁদতে চায়, তাদের তা সর্বভাবে করতে দাও। এদিকে আমরাও যেন আমাদের অন্তরে দিব্য নিত্যশুদ্ধ, শাশ্বত সত্তা, আত্মার চিন্তা করি ও তাঁর গরিমা ঘোষণা করি। মন ঝাপসা হয়ে মন্দ চিন্তার দিকে ঝুঁকলেও আমরা যেন সর্বদা চেষ্টা করি স্বামী বিবেকানন্দের এই আশ্চর্য কথাগুলি স্মরণ করতে ঃ

> ওঠ, জাগো! আপনাদিগকে দুর্বল ভেবে তোমরা যে মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছ, তা দূর করে দাও। কেউই প্রকৃতপক্ষে দুর্বল নয়—আত্মা অনন্ত, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। ওঠ, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর—তোমার ভেতর যে ভগবান রয়েছেন, তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর। ... তোমরা নিজ নিজ স্বরূপের চিন্তা কর এবং সর্বসাধারণকে তা শিক্ষা দাও। ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। লক্ষ্য কর কিভাবে তিনি জেগে উঠছেন। আত্মা প্রবুদ্ধ হলে শক্তি আসবে, মহিমা আসবে, সাধুত্ব আসবে, পবিত্রতা আসবে—যা কিছু ভাল সবই আসবে।[১০]

---

১০ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮২

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

# ব্যক্তিত্ব ও আন্তরিক সমতার একীকরণ

## আমাদের ভর-কেন্দ্র

শৈশবে যাযাবরদের কাছে যে ধাতুর তৈরি ছোট দোয়াত কিনতে পাওয়া যেত তা আমরা খুব পছন্দ করতাম, কারণ তার তলাটা বেশ ভারি হওয়ায় উল্টে গিয়ে কালি পড়ে যেত না। সেটা আমাদের কাছে এক দুর্বোধ্য বিস্ময় ছিল, যতদিন না আমরা শিখেছি—দোয়াতটির ভরকেন্দ্র সব সময়ে তার ভেতরেই সুরক্ষিত থাকায় সেটি উল্টে পড়ে কালি ছেটায় না। এটি মাধ্যাকর্ষণের মতো বাহ্য-শক্তিগুলি পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখার দৃষ্টান্ত।

মানসিক আবেগের দিক থেকে, এ যেন জীবনের নানা গোলমেলে ঘটনাবলীর মধ্যে আন্তরিক প্রশান্তি বজায় রাখার মতো। এরই নাম সমতা। মানুষে কিভাবে প্রশান্তি ও সমতা লাভ করতে পারে?

যুবা অবস্থায় আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে এই সমতার খোঁজ করে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের মধ্যে এর সন্ধান পাই। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পদতলে বসবার সুযোগ আমার হয়েছিল; এই সমতার ওপর তাঁর এতদূর অধিকার ছিল যে সেটাও তিনি অপরের মধ্যে সঞ্চার করতে পারতেন।

এক সময়ে আমাদের মঠে দুজন তরুণ বয়স্ক সাধু ঝগড়া করে অপরের মধ্যে এক অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। স্বামী প্রেমানন্দ ব্যবস্থাপক হিসাবে মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমরা গুরুভাইরা, শান্তিতে মিলেমিশে কয়েক বছর কাটিয়েছি; কিন্তু এই ছেলেদের নিয়ে আমরা কি করব? এদের কি সঙ্ঘ থেকে দূর করে দেওয়া হবে?'

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ধীরভাবে উত্তর দিলেন, 'ভাই, এটা সত্যি যে ওরা গোলমাল করছে, কিন্তু এও মনে রেখো যে ওরা শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দময় শ্রীচরণের আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এখানে এসেছে। তারা তোমার কাছে উপদেশ চায়, নির্দেশ চায়।

নিশ্চয়ই আমরা ওদের জন্য এমন কিছু করতে পারি যাতে ওদের জীবনে রূপান্তর আসে, যাতে ওদের অন্তঃকরণে ভালবাসা আসে।'

স্বামী প্রেমানন্দ উত্তরে বললেন, 'ভাই, তোমাকেই তো ওদের আশীর্বাদ করতে হবে ও ওদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে।'

পরে স্বামী প্রেমানন্দ প্রবীণ ও নবীন সব সাধুকে জড় করে সারিবদ্ধ হয়ে মহান স্বামীর সান্নিধ্যে নিয়ে এলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এখন ভাব সমাধিতে মগ্ন হলেন এবং যেমন প্রত্যেকটি সাধু তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর পাদস্পর্শ করল, অমনি তিনি তার মাথাটি একটু স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। যারা আশীর্বাদ পেল তাদের মধ্যে একজন বলল, 'ঐ স্পর্শ যেন তপ্ত শরীরের ওপর শীতল বারিধারা সিঞ্চনের মতো বোধ হলো।' আবার সাধুদের হৃদয়ে ও মঠে শান্তি ফিরে এল।[১]

আবেগের স্তরে স্থৈর্যলাভ করা এক আশ্চর্যের ব্যাপার, কিন্তু আমাদের এযুগে এর সামান্যই নজরে পড়ে। তবে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে বহির্জগতে যত দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়, তা আমাদের মনের অভ্যন্তরে যা ঘটে কেবল তারই বাহ্য প্রকাশ। আমরা যদি আরো বেশি করে মনের যত্ন নিতে পারি ও বিচার বিশ্লেষণ করে একে কাজে লাগাতে পারি, তবে গোলমাল অনেকটাই কমে যেতে পারে। দেখা যায় যে আমাদের শরীর যেমন বিষ ও রোগ-জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তেমনি আমাদের মনও ক্ষতিকর আবেগের ফলে ক্লিষ্ট হয়। আমরা সর্বদা আমাদের বহিঃ-পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত আছি, কিন্তু অধিকতর সংঘর্ষ চলেছে আমাদের মনের গভীরে। আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছে বৃহত্তম সমস্যা।

## মনের জটিলতা (চিত্তাচ্ছন্নতা)—দ্বন্দ্বের কারণ

বর্তমান পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের আন্তর দ্বন্দ্বের কারণ হলো 'আদিম অহংকেন্দ্রিক কর্মোদ্যমে'র সঙ্গে জড়িত 'বিবেকের দংশন'। এ সম্বন্ধে মন্তব্য হয়ে থাকে যে, তাদের বিবেককে যদি সরিয়ে ফেলা যেত, তবে এ কাজকে তুচ্ছই বলা যেত! সৌভাগ্যই হোক বা দুর্ভাগ্যই হোক—আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই ঐ রকম নয়। আমরা চিরকালই আন্তর-দ্বন্দ্বে ভুগছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ—নিজেকে জাহির করা, যৌন সংসর্গ, সম্পদ আহরণ ও ভীতি, আমাদের মধ্যে অহংবোধ, গর্ব, ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা, ঈর্ষা, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদির আবেগ জাগিয়ে তোলে।

---

১ স্বামী প্রভবানন্দ, *The Eternal Companion*, (Madras : Sri Ramakrishna Math, 1971), pp. 76-77

আজকাল আমরা মানসিক জটিলতা বা চিত্তাচ্ছন্নতা, সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ-প্রবণতা সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাই। এগুলি কি? এদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক বলেন সহজাত প্রবৃত্তি আর আবেগের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মানসিক জটিলতা বা চিত্তাচ্ছন্নতার সৃষ্টি হয়। অন্যেরা এই সংজ্ঞাটিকে আরো সাধারণ ভাবে ব্যবহার করে এবং মনে করে জটিলতা হলো আবেগের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে বাঁধা ভাবনাগুচ্ছ। আবার কেউ কেউ বলেন আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগকে তিনটি মূল জটিলতায় ভাগ করা যেতে পারে ঃ অহংজ্ঞান-জাত জটিলতা, যৌন-সম্পর্কজনিত জটিলতা ও গোষ্ঠী-সংক্রান্ত জটিলতা। অহংজ্ঞান-জাত জটিলতার মধ্যে পড়ে আত্মসংরক্ষণ, সম্পদ আহরণ, কলহ, কৌতূহল, ঘৃণা, পলায়ন-প্রবৃত্তি; তদনুযায়ী আবেগ হলো ঃ যথাক্রমে শ্রেষ্ঠমন্যতা, গর্ব, অধিকারবোধ, ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়। যৌন-সম্পর্কজনিত জটিলতার মধ্যে পড়ে যৌন-প্রবৃত্তি ও জনকজননীগত-প্রবৃত্তি; আর তদনুযায়ী আবেগ হলো ঃ প্রেম, ভোগলালসা, ঈর্ষা, লজ্জাশীলতা, কোমলতা। গোষ্ঠীসংক্রান্ত জটিলতার মধ্যে পড়ে দলবদ্ধ হবার প্রবৃত্তি, চিন্তা-জাগানোর প্রবৃত্তি ও আবেদন করার প্রবৃত্তি; আর তদনুযায়ী আবেগ হলো ঃ একাকীত্ব, সহানুভূতি, দুর্দশা, আসক্তি, সহায়কতা ও বিশ্বাস।[২] স্পষ্টত জটিলতাগুলির মধ্যেই আমাদের আবেগ-তাড়িত জীবনের সব কিছু অন্তর্ভুক্ত।

মনের জটিলতা বা চিত্তাচ্ছন্নতা সব মানুষেরই আছে। তারা ভাল না মন্দ তা নির্ভর করে সেগুলিকে ভাল না মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরে—তারা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ ও ঔদার্য সাধনের দিকে পথ দেখায়, না, তার নাশ ও সঙ্কোচনের দিকে—তার ওপরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—নিজেকে জাহির করার প্রবৃত্তিগুলিকে উঁচু দিকে ফেরানো যেতে পারে। সেই প্রবৃত্তিগুলিকে কামেচ্ছা নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগানো যেতে পারে, এর দ্বারা যে তেজ সঞ্চিত হবে তাকে উচ্চতর উন্নয়নের কাজে, তথা প্রতিবেশীর কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে। কাজেই কিছু বিপথে চালিত লোকেদের মতো, এই জটিলতা নিয়ে হৈ চৈ করার দরকার নেই। জটিলতা সম্বন্ধে যেটা খারাপ তা হলো এদের কোন কোনটির প্রকৃতি ও তাদের কাজে লাগানোর পদ্ধতি। জটিলতাগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে, মন থেকে সরিয়ে দিয়ে বা দমন করার চেষ্টা করে বিশেষ সুবিধা হয় না। ভাল হোক মন্দ হোক আবেগগুলিকে লাগাম ছাড়া ভাবে প্রকাশ হতে দিলেও বেশি কিছু সুবিধা হয় না। যা দরকার তা হলো সমতা, ভারসাম্য রক্ষা করা। স্বামী বিবেকানন্দের মতো আধ্যাত্মিক পুরুষগণের মধ্যে আমরা পাই শিশুসুলভ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ও

২ Strecker And Appel, *Discovering Ourselves* [New York : The MacMillan Co. 1954] pp. 87, 97, 108

স্বাধীনতার সঙ্গে সন্ন্যাসজীবনের সংযম ও পবিত্রতা। এই মিশ্রণের ফল হলো—একটি বহুমুখী, নমনীয়, সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, একটি শক্তি ও শান্তির উৎস।

মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা আমাদের কাছে ক্রমাগত তুলে ধরছেন—এই আবেগগুলি কিভাবে আমাদের সঙ্গে চালাকি করে আমাদের মধ্যে নানা রকম শারীরিক ও মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। এদিকে, সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত হলে আমাদের এই আবেগ-গুলিই স্বাস্থ্য ও স্থৈর্য রক্ষায় সহায়তা করে। ডঃ ফ্ল্যাণ্ডার্স ডানবার (Dr. Flanders Dunbar) তাঁর 'Mind and Body' নামক পুস্তকে এক মনোবিজ্ঞানীর কথা বলেছেন, যার এক স্ত্রীরোগী এপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথার মতো ব্যথায় ভুগছিল; এদিকে তার মানসিক গোলযোগেরও কিছু লক্ষণ ছিল। মন বিশ্লেষণের মাধ্যমে যখন সে রোগের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছিল তখন ঐ ডাক্তারের মনে পড়ল যে তারই এক বন্ধু ডাক্তারের এই রকম এক রোগী এপেণ্ডিসাইটিস্ ফেটে মারা যায়। তাই সে নিজের রোগীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপচার করায় দেখা গেল, ঠিক সময়েই কাজটি করা হয়েছিল।

এদিকে ডাক্তারের নিজের মন অস্থির হয়ে পড়ল। ঘটনাটি খ্রীস্টমাসের সময় ঘটেছিল এবং তার স্মৃতিতে সেটি তখনো অম্লান ছিল; এমন সময়ে সে এক পারিবারিক পার্টিতে নিমন্ত্রিত হলো যখন তার যেতে মোটেই ইচ্ছা হলো না। তার পেটে তীব্র যন্ত্রণা বোধ হলো। এক ডাক্তার বন্ধু তাকে পরীক্ষা করে তখনই অস্ত্রোপচার করাতে বলেন। কিন্তু এখন ঐ মনোবিজ্ঞানী ইতস্তত করল। মনের চিকিৎসক হিসাবে সে যন্ত্রণার কারণ নির্ণয়ে লেগে গেল এবং শীঘ্র সিদ্ধান্তে এল যে পূর্ববর্তী এপেণ্ডিসাইটিসের রোগিণীর একটুর জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যাপারটিই যে উদ্বেগ সৃষ্টি করে তাতে তার মনে এপেণ্ডিসাইটিসের চিন্তা এসেছিল। উপরন্তু কয়েকদিন পূর্বেই তার মা—এপেণ্ডিসাইটিস্ থেকে তার বাপের মৃত্যুর ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এই সব থেকেই তার মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে এই ব্যথা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, আর বোধ হয় পার্টিতে যেতে অনীহাই তার মনে খ্রীস্টমাসের সময় হাসপাতালে কাটাবার এক অবচেতন বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। ঐ ব্যক্তি যেমনি কারণটি ধরে ফেলল, তার ব্যথা চলে গেল। সে পার্টিতে গেল ও আনন্দ উপভোগ করল।[৩]

যখন মনোবিশ্লেষণে শিক্ষিত একজন ডাক্তারেরই এমন হয় তখন আমরা অনেকেই যে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য মতো রোগ ভোগ বেছে নিতে পারি, আবার কখনো তা উপভোগও করতে পারি—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি এমন

---

৩ Flanders Dunbar, *Mind and Body* : Psychosomatic Medicine [N.Y. : Random House, 1947] p. 41

লোকেদের জানি যার কোন উদ্বেগ না থাকলেও তা তৈরি করে ও তাকে বাড়িয়ে তোলে, যারা অন্যের ব্যাপারে নিজে মাঝে মাঝে জড়িয়ে পড়ে নিজের ও তার সম্পর্কিত লোকেদের ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করে। মনে হয় তারা যেন মানসিক চাপে থাকলেই ভাল থাকে। আমরা যদি আমাদের মনের এই ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর ওপর নিয়মিত নজর রাখি, তবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা আবেগ-জনিত ঝঞ্ঝাটগুলি ধরে ফেলতে পারি এবং নিজ সৃষ্ট রোগ সারিয়ে ফেলে সুস্বাস্থ্য ও মানসিক সমতা উপভোগ করতে পারি।

## 'ব্যক্তিত্ব' কথাটির অর্থ

ব্যক্তিত্ব কাকে বলে? আমাদের অচেতন অংশ আর চেতন অংশ মিলে তৈরি হয় ব্যক্তিত্ব, পরিবেশের সংস্পর্শে এসে তা আবার দূষিতও হয়। মনস্তাত্ত্বিকরা যখন বলেন 'একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব হলো তার সামর্থ্য, স্বভাব ও ভাবভঙ্গির সমষ্টি, যা তাকে অন্য মানুষের থেকে পৃথক করে, তখন স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, যে চিন্তা করে, অনুভব করে, ইচ্ছা করে, কাজ করে, সে কে? কোন্‌টি সেই নিত্য উপাদান, যা নিজে অক্ষুণ্ণ থেকে দেহ, মন, অহং ও পরিবেশের নানা পরিবর্তনের মধ্যে স্বীয় অপরিবর্তিত ব্যক্তিরূপে অবস্থান-বোধ বজায় রাখতে মানুষকে সহায়তা করে? মনস্তাত্ত্বিকদের মত জেনেই দর্শন ও ধর্ম থেমে যেতে পারে না। তারা আরো গভীরে যেতে চায়।

মানুষের মধ্যে—অর্থাৎ আমাদের নিজ নিজ সত্তার মধ্যে—আমরা দেখি অহংবোধ, মন, ইন্দ্রিয়বর্গ ও দেহ, সংহত হয়ে এক 'সংমিশ্র যোগে'র রূপ নিয়েছে। এখন মানুষের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ উপাদান? তা হলো তার চৈতন্য। প্রথমে *আমি আছি* এবং পরে আমি চিন্তা করি, আমি অনুভব করি, আমি ইচ্ছা করি, আমি উপলব্ধি করি ও আমি কাজ করি। আমরা অপরোক্ষভাবেই স্বীয় চৈতন্যের অস্তিত্বের অনুভূতি লাভ করে থাকি, আর পরোক্ষভাবে অন্যের চৈতন্য সম্বন্ধেও। যেমনই হোক, মনে হয় যে আমাদের ব্যক্তি চৈতন্য একই উপাদানে গঠিত, যদিও তা স্বভাবতই ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে মিশে থাকে বা তাদের সঙ্গে একাত্ম-বোধ করে থাকে।

বাহ্য জগতের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম ছাড়া অন্তর্জগতের নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বও রয়েছে। তাই জীবন হয়ে দাঁড়ায় নিজ অন্তর্জগতের সঙ্গে এবং বহির্জগতের সঙ্গে একটি নিয়ত সমঝোতার ক্ষেত্র। সমঝোতায় বিফল হলেই সমতার অভাব ঘটে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী মেনিঙ্গার (Menninger) তাঁর একটি গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ 'আমাদের

সমঝোতার বিফলতা—পলায়ন অথবা সংঘর্ষ—দু-রকমের প্রতিক্রিয়ার কোন একটি ধরে রূপটি প্রকাশ পায়। দুই প্রতিক্রিয়াই ইঙ্গিত করে যে সমতার অভাব ঘটেছে। কখনো কখনো যন্ত্রণাদায়ক সব কিছু থেকে আমরা দূরে সরে যেতে চাই; ইচ্ছাকৃত রোগ ও পানোন্মত্ততা হলো পলায়ন বৃত্তির প্রকাশ। তারা যদি রোগ মুক্ত না হয়, তবে তাদের ব্যক্তিত্বের অবক্ষয় ঘটে। আক্রমণ-প্রতিক্রিয়া ঠিক মতো চালিত হলে নতুন ভাবে সমঝোতা হয়ে মোটামুটি পূর্ণ সমতা ফিরে আসতে পারে। সংঘর্ষের সঠিক মনোভাবের, অন্তরের শত্রুর সঙ্গে কিভাবে সংঘর্ষে নামতে হয় সেই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সমতা ও শান্তি অনেকটা লাভ করতে পারি।[৪]

আধ্যাত্মিক দিক থেকে অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিশীলতাই যথেষ্ট নয়। মনস্তত্ত্বের স্তরে অহংকেন্দ্রিক সমতা, কোন কঠিন পরীক্ষায় পড়লে ভেঙ্গে পড়তে পারে। অধিকাংশ মনস্তত্ত্ববিদ আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইবে যে, অন্তরের মূল সংঘর্ষের পূর্ণ সমাধান কখনই আশা করা যায় না। আমরা জীবনে যেসব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংঘর্ষের সামনে পড়ি সে ক্ষেত্রেও একথা সত্য বলে বোধ হয়। তবে অতি অসাধারণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবশ্য সংঘর্ষে এই জয়লাভ ও সমতার অর্জন—মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যতদূর ভাবা যেতে পারে তার থেকে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে।

## ব্যষ্টি ও বিশ্ব

তোমরা কি কখনো ভেবেছ যে চিন্তা প্রণালীর বিধান অনুসারে—বিশ্ব চেতনার অন্ততপক্ষে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছাড়া ব্যষ্টি চেতনা সম্পর্কে কোন ধারণাই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়? আমরা দেখেছি যে, যা কিছু আমাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত-ভাবে প্রয়োজন, সেসব শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্যদের মধ্যে অভিজ্ঞতা রূপে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁদের ব্যষ্টি চেতনা ছিল বিশ্বচেতনার একটি অংশ বা একটি প্রকাশ। এই বোধই তাঁদের অহংকেন্দ্রিক না করে বিশ্বকেন্দ্রিক করেছিল। তাঁরাই আমাদের ভাবতে শিখিয়েছিলেন, সব রকম ব্যষ্টি চেতনার সামগ্রিকরূপ-স্বরূপ যে বিশ্ব-চেতনা, তাই হলো বহুত্বের মধ্যে একত্বের ভাব।

চেতনাকে ব্যক্তিত্বের সার বলে ধরে নেওয়ার অর্থ এ নয় যে জ্ঞান ও কর্মের যন্ত্রস্বরূপ মন, ইন্দ্রিয়বর্গ ও দেহকে অস্বীকার করা। আমাদের মন অনুরূপ বহু মনের মধ্যে একটি, আমাদের দেহ বহু দেহের মধ্যে একটি; তাই এখানেও এসে পড়ে মন ও জড় বস্তুর স্তরে ব্যষ্টি ও বিশ্বের, অণুবিশ্ব ও মহাবিশ্বের প্রশ্ন।

8 William C. Menninger and Munro Leaf, *You and Psychiatry* [New York : Charles Scribner's Sons, 1948]

হিন্দু আচার্যেরা তিন রকম *আকাশের* কথা বলতেন ঃ *মহাকাশ* বা মৌলিক উপাদানের বা ভৌতিক স্তর, *চিত্তাকাশ* বা মানসিক স্তর এবং *চিদাকাশ* বা চৈতন্যের স্তর। ব্যষ্টি দেহ, সমষ্টি দেহ বা বিশ্বদেহের অংশ, সমষ্টি দেহ যেন জড় পদার্থের সমুদ্র। ব্যষ্টি মন হলো সমষ্টি মন বা মহাসাগররূপ বিশ্বমনের অংশ। ব্যষ্টি অহং বা চেতনা হলো সমষ্টি চেতনার বা বিশ্ব-চেতনার অংশ। মহাবিশ্ব যেন মহাসমুদ্র আর অণুবিশ্ব যেন তরঙ্গ। এখন, এই মহাসমুদ্র ও তরঙ্গ, এ দুই-এর মধ্যে কোন্‌টি বেশি সত্য? নিশ্চয়ই তরঙ্গ থেকে মহাসমুদ্রই বেশি সত্য। তরঙ্গেরও সত্যতা রয়েছে—তার সত্যতা মহাসমুদ্রের সত্যতার ওপর নির্ভরশীল। এ কথা আমাদের 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—যা আমাদের ব্যষ্টি চেতনা, আমাদের ব্যষ্টি মন ও আমাদের ব্যষ্টি দেহ নিয়ে গঠিত এবং তারা আবার যথাক্রমে এক বিশ্ব চেতনা, এক বিশ্ব মন ও এক বিশ্ব দেহের অংশ।

এখানে আমরা এসে পড়লাম—সমষ্টি সত্তা বা বিশ্ব সত্তার প্রাচীন ধারণায়, যার থেকে সব জীব ও জড় বস্তুর উৎপত্তি এবং যার মধ্যে তারা সকলে জীবন ধারণ ও চলাফেরা করছে। বেদ বলেন—'সেই বিরাট পুরুষ, তাঁর অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য পাদ। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করে আছেন, আবার তার পারেও আছেন। সেই পুরুষই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড—যা কিছু বর্তমানে আছে, অতীতে ছিল ও ভবিষ্যতে হবে। তিনি নানা রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি আবার প্রভু ও অমৃতত্ব-প্রদানকারী। প্রকটিত বিশ্ব তাঁর মহিমার প্রতিফলন, কিন্তু তা তাঁর সত্তার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; তাঁর অধিকাংশই অপ্রকটিত ও অপরিবর্তিতই থাকে।'[৫]

ব্যষ্টিকে বুঝতে হলে সমষ্টির বা বিশ্বের ব্যাপারটা কিছু কিছু জানতে হবে। তুমি কি সক্রেটিস্ ও ব্রাহ্মণ মুনির সেই পুরান গল্পটি জান? এক ব্রাহ্মণ মুনি গ্রীসে গিয়ে সক্রেটিসের সঙ্গে দেখা করেন, সক্রেটিস্ তাঁকে বলেন, 'সব থেকে বড় বিদ্যা হলো 'মানুষকে জানার বিদ্যা'। কিন্তু ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মানুষকে কি করে জানবে, যদি না সেই সর্বানুস্যূত-সত্তা ঈশ্বরকে জান?' বিশ্বসত্তার পটভূমিতেই আমরা ব্যষ্টি সত্তা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেতে পারি। আমরা বিশ্ব ব্যক্তিত্বের পটভূমিতেই ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্ব বুঝতে পারি।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে কেবল দেহ-মন দিয়ে নয়, তার সঙ্গে তার আত্মাও আছে। যে জীবাত্মা মন-ইন্দ্রিয়-

---

৫ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্। উতামৃতত্বস্য ঈশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩
(পুরুষ-সূক্ত, ঋগ্বেদ, ১০.৯০.১-৩)

দেহকে ধরে রেখেছে, তার পেছনে রয়েছে পরমাত্মা, বৌদ্ধদের নির্বাণ, *বেদান্তের* ব্রহ্ম, সর্ব ধর্মের ঈশ্বর। উচ্চতম আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে একজন বুদ্ধ, একজন খ্রীস্ট বা একজন রামকৃষ্ণ ভোগ লালসাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন, মৃত্যুও তাঁদের কাছে অমৃতত্বলাভের পথ মাত্র। মনস্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ব্যষ্টি সত্তার বা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানব সত্তার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা সম্ভব নয়। আংশিকভাবে প্রবুদ্ধ আত্মাও যে স্থিতিশীলতায় পৌঁছুতে পারে, তাও মনস্তত্ত্বের প্রতিশ্রুত স্থিতিশীলতা থেকে অনেক উঁচু স্তরের। মনস্তত্ত্ব, অনেক মূল্যবান সাহায্য দিতে পারে, প্রাথমিক প্রযুক্তি হিসাবে এর নিজস্ব মূল্য রয়েছে; কিন্তু ধর্ম আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায় সেখানে সে যে সাফল্য লাভ করে তাও মনস্তত্ত্বের পরিধিকে অতিক্রম করে অনেক উঁচুতে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের 'ব্যক্তিত্বের সংহতি' তত্ত্বটি মানব কল্যাণে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অচেতনত্ব আবিষ্কার করে, মনোবিজ্ঞানী দেখিয়েছে যে সাধারণ মানুষ স্বভাবত নিজ মনের গভীর প্রদেশের কথা খুব অল্পই জানে। অচেতন মনের দাপট বেশি হওয়া সত্ত্বেও চেতন মন স্বভাবত অচেতন মনের সংস্পর্শে আসে না। এই থেকে ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিভাজন ও দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হয়। মনোবিজ্ঞানী ডঃ জঙ্গ (Dr. Jung) ব্যক্তিত্বের অচেতন ও চেতন অংশের সংহতির প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছেন।

## ব্যক্তিত্বের সংহতি কাকে বলে?

এখন দেখা যাক সংহতি কথাটির অর্থ কি? কোন পূর্ণ সংখ্যা হলো নিরঙ্কুশ অখণ্ড বা সম্পূর্ণ সংখ্যা, ভগ্নাংশ বা মিশ্র সংখ্যা নয়। সংহত হওয়ার অর্থ পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হওয়া বা একতাবদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ বা যথাযথভাবে পরিপূর্ণরূপ প্রাপ্ত হওয়া।

নানা রকমের সংহতি রয়েছে। আধুনিক ভৌত বিজ্ঞানে পদার্থ বহু অণুর সম্মিলনে গঠিত হয়, অণু গঠিত হয় বহু পরমাণুর সম্মিলনে, পরমাণু আবার আরো ছোট ছোট কণার সম্মিলনে গঠিত হয়। আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান বলে পরমাণু গঠিত হয় কতকগুলি প্রোটন বা ধনাত্মক তড়িৎকণা আর সমসংখ্যক ইলেক্ট্রন বা ঋণাত্মক তড়িৎকণার সম্মিলনে। প্রোটনগুলি নিউক্লিয়াসে (বা পরমাণু কেন্দ্রে) কেন্দ্রীভূত থাকে, এখানে নিউট্রন নামে বিদুৎ-নিরপেক্ষ কণাও থাকে। ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের বাইরে তার চারিদিকে সদা ঘূর্ণায়মান।

তোমাদের কি ধারণা হচ্ছে যে, এর অর্থ—প্রত্যেকটি পরমাণু হলো সৌর জগতের মতো নিজের সব অংশগুলিকে নিয়ে সংহত এক একটি সম্পূর্ণরূপ প্রাপ্ত বস্তু। আবার পরমাণুগুলি সংহত হয়ে বৃহত্তর একক গঠিত হয়, তেমনি প্রত্যেকটি

দেহকোষ ক্ষুদ্র সৌর জগতের মতো এক একটি সংগঠন এবং নিজেরাই এক একটি সপ্রাণ দেহী। এই কোষগুলি মিলিত হয়ে বৃহত্তর একক গঠিত হয়, যার নাম দেওয়া হয় কোষ-কলা বা তন্তু; এই কোষকলা আবার সংহত হয়ে আরো বৃহত্তর একক গঠিত হয় যার নাম শরীর। একটি সংহত শরীরে সব অঙ্গগুলির প্রত্যেকটির যেমন নিজ নিজ ক্ষেত্রে নড়া-চড়া করার মতো চলন ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি আবার সে গতিগুলির প্রত্যেকটিকে অবশ্যই শরীরের সাধারণ গতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এটি না হলেই, সমন্বয়ের অভাবে রোগের উৎপত্তি হয়। তাই শরীর যাতে ঠিক মতো সংগঠিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে সে বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন। শরীরের সব অঙ্গকেই সুস্থ ও সবল রাখতে হবে, তারা যেন একযোগে সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করে।

এখন মনের কথায় আসা যাক। আমাদের মনও এক সংহত পূর্ণ সত্তা —যার অঙ্গ হলো বোধশক্তি, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তি। আমাদের বিচারবুদ্ধি, অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম পরস্পর বিরোধ বাধিয়ে নিজেদের ভেতরে তীব্র বিভ্রান্তি কিভাবে সৃষ্টি করে! বিরোধ হতে পারে কর্তব্য বোধ নিয়ে, নৈতিক মান নিয়ে, আধ্যাত্মিক আদর্শ নিয়ে. আমরা নানা আবেগের ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়তে পারি। তাই এখানেও সংহতির প্রয়োজন—যা হলো পবিত্রতা, বল ও সমন্বয়ের নামান্তর।

অহংবোধের কথা ভাবা যাক। আমরা সবাই জানি যে অহংবোধ আমাদের বিপথগামী করে এবং এও জানি কিভাবে ক্রমাগত তার ভর-কেন্দ্র পাল্টায়। এখন বাইরের জিনিসের সঙ্গে একাত্মবোধ করছে, পরক্ষণেই শরীরের সঙ্গে, তার পরেই ইন্দ্রিয় বা মনের সঙ্গে। অহংবোধ যেন মাতালের মতো, যে কোন মুহূর্তে হোঁচট খেয়ে পড়তে পারে। হায়! কিভাবেই না এ কখনো কখনো অত্যন্ত একমুখী হয়ে নিজেতেই কেন্দ্রীভূত হয়! আমরা ভুলে যাই যে আমাদের ব্যষ্টি চেতনা এক অনন্ত চেতনার অংশ; আমরা ভুলে যাই যে আমাদের প্রতিবেশীদের কল্যাণকে আমাদের নিজেদের কল্যাণ থেকে আলাদা করা যায় না; আমরা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ি, যা নিজেদের, পরিবারের ও সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই এখানেও আর এক রকমের সংহতি প্রয়োজন।

এইরূপে সংহতির ভৌতিক দিক, মানসিক দিক ও সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক দিকও আছে। সঙ্গতভাবে সংহত ব্যক্তিত্বে অহং বা ব্যষ্টি চেতনা বিশ্ব চেতনার সঙ্গে এক সুরে গাঁথা; এই সংহত ব্যষ্টি চেতনা মন ও দেহকে সমন্বয়পূর্ণ, বুদ্ধিযুক্ত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত পথে চলতে নির্দেশ দেয় ও পথ দেখায়। প্রকৃত সংহতি বলতে আমরা এই রকমই বুঝে থাকি।

## সংহতির পথে পদক্ষেপ

অনেকের পক্ষে এ আদর্শ অতীব উচ্চ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নিম্নমুখী আদর্শের থেকে ঊর্ধ্বমুখী আদর্শ ভাল। যাই হোক উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে সেই পথে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে ধাপে ধাপে আমাদের এগুতে হবে। যাত্রা আরম্ভ করার জন্য আমাদের জানতে হবে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। পাহাড়ে উঠতে গেলেও আমরা এই রকমই করে থাকি। নিজ নিজ জীবনেও উঁচু আদর্শ আয়ত্ত করতে হলেও আমাদের ঐ একই রকম করতে হবে। আমাদের বাস্তবোচিত হতেই হবে, খুঁজে বার করতে হবে আমাদের দেহ, মন ও অহং বাস্তবিক কোন্ অবস্থায় রয়েছে। আমার গুরু ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য শিষ্যদের পদতলে বসে আমি যেসব মহত্তম উপদেশ পেয়েছি তার একটি হলো—শারীরিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে সমন্বয়পূর্ণ উন্নতির আদর্শ।

দেহ আমাদের ভৌত যন্ত্র বিশেষ, একে সর্বদা কার্যক্ষম ও দক্ষ রাখতে হবে। শরীরের প্রতি আমাদের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। এটি একটি ইন্দ্রিয় ভোগের যন্ত্রও নয় বা ঘৃণ্য ও অবহেলার যোগ্য আবর্জনারাশিও নয়। আমাদের প্রাথমিক কাজ হলো শরীরকে ঐশ্বরিক চৈতন্যের এক মন্দিররূপে দেখা, ও একে অবশ্যই পরিচ্ছন্ন ও সবল করে রাখা। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে ঃ এই শরীর যেন ভেলা, *গুরু* যার কর্ণধার আর ঈশ্বরকৃপা যার অনুকূল বায়ু; মানব যদি একে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হবার জন্য ব্যবহার না করে, তবে তাকে আত্মঘাতী—নিজ আধ্যাত্মিক সত্তার হননকারী বলা উচিত।[৬]

যাতে শরীরের তেজ, বল, স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা আসে সেজন্য বিশুদ্ধ খাদ্য দিয়ে এর পুষ্টি বিধান করতে হবে। উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে শুদ্ধ বায়ু সেবন ও ব্যায়াম করা চাই, আর ক্ষতিকারক ওষুধ, উত্তেজক খাদ্য ও মাদকদ্রব্য বর্জন করতে হবে।

## অসংহতি থেকে সংহতি

যে মানুষে উচ্চতর নৈতিক চেতনা জেগেছে—যার মন সে দিকে যেতে চায়, সে যদি ইন্দ্রিয়ের দাস হয় শরীরকে দুর্বল করে ফেলে, তবে তার মধ্যে তীব্র বিরোধ ও অসঙ্গতি দেখা দেবে। তার ব্যক্তিত্ব টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এদিকে উদ্গতি-সাধন ও পবিত্রীকরণের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াসক্তিকে যদি আধ্যাত্মিকতার দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে ঐ সাধক নিজের মধ্যে আরো বেশি সমন্বয় ও সংহতির অধিকারী হবে।

---

৬ নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
মরানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎস আত্মহা॥ *শ্রীমদ্ভাগবতম্*, ১১/২০/১৭

আরো উচ্চতর সংহতির দিকে আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চালাতে হবে। সাধারণত এর মধ্যে একটি শক্তির সঙ্গে আমাদের চেতনা যুক্ত থাকে—যা অন্যগুলির ওপর আধিপত্য করে। আমরা অতি বুদ্ধিমান বা অতি আবেগপ্রবণ বা প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হয়ে যুক্তি অথবা উচ্চতর আবেগকে উপেক্ষা করে কাজ করে যেতে চাই। এতেই নিজ অন্তরে বিভেদ এসে পড়ে। সব রকম শক্তি মানসিক ক্ষমতার মধ্যে একটা সমন্বয়ের ভাব আনতে হবে—কিন্তু কি করে? সব রকম মানসিক ক্ষমতা থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে শিখে আমাদের ব্যষ্টি চেতনার দিকে ফিরতে হবে, এই চেতনাকে আমাদের ধ্যানের বস্তু করে তাতেই স্থির থাকতে হবে। এই নির্লিপ্ত অবস্থা থেকে যখন আমরা বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার দিকে ফিরব, তখন এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারব—সার্বিক কল্যাণের জন্য এক সুরসঙ্গতির ভাব নিয়ে এদেরকে কাজে নামাতে পারব। এটা একটা বিরাট সাফল্য।

এক প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর এক রোগী মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে মানসিক সমতা অনেকাংশে ফিরে পেয়েছিল। ঐ মনোবিজ্ঞানী মন্তব্য করেন, 'তার ভর-কেন্দ্রটি, যা অন্যের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল, এখন নিজের ভেতর এসে বিশ্রাম পেল।' এ কথা সত্য যে সঠিক মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় মনঃকেন্দ্রকে সংহত ব্যক্তিত্বের গভীরে নিয়ে এসে বিশ্রাম দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু উচ্চতম ও নিশ্চিন্ততম সমতা সাধারণ পর্যায়ের মানুষের ক্ষেত্রে আসতে পারে, একমাত্র বিধিবদ্ধ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে একটির পর একটি স্তর পার হয়ে।

ক্রোধ, ঘৃণা, অসত্য, লোভ, অসংযম বা অন্যের ওপর অসহায় নির্ভরশীলতা—এগুলি মনঃকেন্দ্রকে আমাদের অপরিহার্য সংহতি থেকে সরিয়ে দেয় ও বিরোধ-বিবাদ সৃষ্টি করে। অপর দিকে পবিত্রতা ও আত্ম-সংযম আমাদের নিজের ওপর প্রভুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে—সমন্বয় ও শান্তির উদ্ভব ঘটায়; অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা ব্যক্তিত্বের সংহতির দিকে নিয়ে যায়। ব্যক্তিত্বের সংহতির রহস্য রয়েছে ঠিক যেখানে আমাদের 'ভর-কেন্দ্রটি' রয়েছে সেইখানে। 'ভর-কেন্দ্র' বলতে আমরা আমাদের চেতনা-কেন্দ্রকে বুঝি—এখানে চেতনা অর্থে অহং-চেতনা। সংহতি লাভের প্রথম সোপান হলো এই 'কেন্দ্র'টির যে অবস্থান তার সঠিক নির্ণয়। অন্য লোক আমাদের চেতনা-কেন্দ্র হতে পারে, কিন্তু তা হলে আমাদের ভর-কেন্দ্র পুরোপুরি আমাদের বাইরে থেকে যায়, আর আমরা অন্যের মনোভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের দেহ বা আমাদের আবেগ আমাদের চেতনা-কেন্দ্র হতে পারে। এ সবও আমাদের ব্যক্তিত্বকে নড়িয়ে দিয়ে তার সংহতি নষ্ট করতে পারে। প্রথমেই আমাদের

'অহং'-চেতনাকে পৃথক করে তাকে আমাদের অন্তরতম প্রত্যগাত্মায় আশ্রিত করতে হবে।

আমাদের শিখতেই হবে দ্রষ্টা ও দৃষ্টের পার্থক্য বিচার করতে, আমাদের জানতেই হবে যে আমাদের আবেগগুলি—দ্রষ্টা বা প্রকৃত 'অহং' থেকে ভিন্ন। যে আবেগগুলির সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি, তার থেকে মুক্ত হবার কৌশল আমরা শিখতে পারি। যখনই আমরা ঐগুলিকে আমাদের প্রকৃত সত্তা থেকে ভিন্ন ভাবে দেখতে শিখব, তখনই তাদের স্বনিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে পারব। এ থেকে আমরা সাহসের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হতে এবং নিজ মন ও তার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য পাব।

## বিশ্ব-চৈতন্যে ব্যক্তিত্বের সংহতি

আমরা দেখেছি ব্যক্তিত্বের সংহতিতে পৌঁছবার প্রথম সোপান হলো আমাদের ভর-কেন্দ্রের, তথা চেতনা-কেন্দ্রের, অবস্থান নির্ণয় করে, তাকে স্বস্থানে স্থাপন করা। দ্বিতীয় সোপান হলো, এই 'কেন্দ্র'কে, তথা ব্যষ্টি-সত্তা বা অহংকে, বিশ্বসত্তার সঙ্গে যুক্ত করা। আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের সমর্থিত অহং-কেন্দ্রিক সংহতি—আমাদের অহংকে মন, ইন্দ্রিয় ও দেহের ওপর আধিপত্য দেওয়ার পক্ষে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন তা—যথেষ্ট নয়। আমরা এখনো উচ্চতম সংহতি লাভের জন্য প্রয়াসী হইনি; পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের তা করতেই হবে। ডঃ জঙ্গ (Dr. Jung) তাঁর 'Modern Man in Search of a Soul' গ্রন্থে লিখেছেন, '... এই অহংটি রোগগ্রস্ত, কারণ তা পূর্ণ সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, আবার মানবজাতির ও চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত।'[৭] অন্য এক গ্রন্থে তিনি আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঃ '*তাও*-তে অবস্থিতির অর্থই হলো সার্থকতা, পূর্ণতা, ...আমাদের অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের যে তাৎপর্য তার সামগ্রিক উপলব্ধি। ব্যক্তিত্বই *তাও*।'[৮] *তাও* হলো অদৃশ্য, হৃদয়ঙ্গমের অতীত, জীবনের অনন্ত উৎস—সত্যের অধিষ্ঠান, সর্ববস্তুর আদি। *তাও*ই হিন্দু ঋষিদের বিশ্ব-চৈতন্য, যা সর্বব্যাপী এক মহাজাগতিক সত্তা।

আমরা এই অহংকে ঐ বিরাটের সংস্পর্শে আনব কি করে? প্রার্থনা বা স্তোত্রপাঠ সহায়ে, মন্ত্র জপে ও মন্ত্রার্থ মননে, ঈশ্বরীয় সত্তার ধ্যানে আমরা আমাদের আত্মায় এমনই এক সুর সংলাপ, আমাদের অন্তরে এমনই এক সুরসঙ্গতির মূর্ছনা, সৃজন

---

৭ Carl G. Jung, *Modern Man in Search of a Soul*, (London, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1953), p. 141

৮ *The Intigration of Personality*, (London, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1952), p. 305

করতে পারি, যাতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, আমাদের ক্ষুদ্র অহং, আমাদের ব্যষ্টি চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে যাই। তখন আমরা স্পর্শ অনুভব করি প্রকৃত বিরাট অহং-এর, সেই সর্বানুস্যূত বিশ্ব চৈতন্যের। এই অবস্থাতেই সেই বিশ্ব চৈতন্য ব্যষ্টি চেতনার থেকে আরো বেশি সত্য বলে উপলব্ধ হয়। এইখানেই গভীরতম সংহতি সংঘটিত হয়। জীবাত্মা আবার যখন সাধারণ চেতনায়, আমি-আমার রাজ্যে, দেহ-মনের রাজ্যে ফিরে আসে, তখন তার এক আশ্চর্যজনক সংহতির অনুভূতি হয়। তখন ব্যষ্টি চেতনা বিরাটেই মূলীভূত থাকে এবং আধ্যাত্মিক অহং দেহ-মনের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা থাকায়, দেহ-মন তার অতি বাধ্য ভৃত্যের মতোই কাজ করে। এখানে ব্যক্তিত্ব নৈর্ব্যক্তিক বিরাট সত্তার সঙ্গে সংহত থেকে যায়।

একদা স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিম আমেরিকার এক গাভীনগর দর্শনে যান। সেখানে রাখালের কাজ করছিল এমন কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী যারা তাঁর মুখে দর্শনশাস্ত্রের কথাগুলি বেশ গুরুত্ব দিয়ে শুনত। স্বামীজী যখন বললেন, যে জ্ঞানদীপ্ত হয়েছে সে সব অবস্থাতেই নিজের সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তখন তারা স্বামীজীকে পরীক্ষা করবে ঠিক করল। তাঁরা স্বামীজীকে তাঁদের কাছে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানাল ও একটা কাঠের টবকে উল্টে দিয়ে মঞ্চ করল। স্বামীজী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে সেই বিষয়েই মগ্ন হয়ে গেলেন। হঠাৎ পিস্তলের গুলির ভয়ানক শব্দ হলো, কিছু গুলি তাঁর মাথার পাশ দিয়ে চলে গেল। কোন রকম বিঘ্নে মনোযোগী না হয়ে, স্বামীজী বক্তৃতা দিয়ে চললেন, যেন অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না।[১] এই হলো আধ্যাত্মিক সমতা, যা আসে আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্মেষের ফলে: তখন ভর-কেন্দ্র দেহ-কেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে ঈশ্বর-চেতনায়—আত্মার আত্মায়—অধিষ্ঠিত হয়। এই জ্ঞান নর-নারীর দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে বদলে নতুন করে দেয়।

সুফি মত ইসলামের মরমিয়া সাধনা। রাবিয়া ছিলেন মধ্যযুগের এক নারী সুফি সন্ত, যিনি ঈশ্বরীয় চেতনায় মগ্ন থাকতেন। একদিন কোন লোক তাঁকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি ঈশ্বরকে ভালবাস?' এর জবাবে তিনি বললেন, 'সত্যই আমি তাঁকে ভালবাসি।' আবার প্রশ্ন, 'তুমি কি মন্দকে একজন শত্রু মনে কর?' একটু হেসে মহিলা বললেন, 'আমি ঈশ্বরকে এতই ভালবাসি যে মন্দটি সম্বন্ধে আমি একটুও মাথা ঘামাই না।' ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগাযোগ থাকত এবং তাই তাঁকে কঠোর বহির্জগতের হিংসা ও বিক্ষোভের মধ্যেও বিব্রত না হয়ে থাকতে সাহায্য

১ Eastern and Western Disciples—*Life of Swami Vivekananda* [Calcutta, Advaita Ashram, 1974] p. 328

করত। সন্ত ও ঋষিদের কাছে আমরা এই শিক্ষাই পেয়ে থাকি। তাঁরা পরম অন্তঃসমতার অধিকারী হন। তাঁরা ব্যক্তিত্বগুলিকে সংহত করেছেন এবং দৈব দুর্বিপাকের নিদারুণ মুগুরাঘাত সত্ত্বেও অভঙ্গুরই থাকেন।

এ রকম বিরল আনন্দময় ব্যক্তিত্ব নিজ-অন্তরে ও সকল বস্তুর মধ্যে সেই পরম চৈতন্যকে দেখে থাকে। তার মন দুঃখে বিচলিত হয় না বা সুখে অভিভূত হয় না। সে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়। তার শরীর যথার্থ ঈশ্বরের মন্দির হয়ে যায়। তার থেকে পবিত্রতা ও প্রেম বিচ্ছুরিত হতে থাকে ও সে সকলের কাছে প্রেরণা ও আশীর্বাদের চিরন্তন উৎস হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক আচার্যদের কাছে শুনেছি যে চেতনাতীত অবস্থা লাভের পরই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়।[১০] কিন্তু আমাদের কাছে এটা এখন আদর্শ মাত্র, আর আমরা যেন আদর্শ নিয়ে বেশি মাথা না ঘামাই। আদর্শের সন্ধান পেয়ে, আমরা যেন সে দিকে যাবার পথে এগিয়ে চলি—নিম্নতর সংহতি থেকে উচ্চতর সংহতির দিকে। আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে যে আমরা যত নৈতিক উৎকর্ষ ও সংহতির উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে এগুব, ততই বেশি বেশি সমতা ও সমন্বয়, শান্তি ও আনন্দের ভাব উপভোগ করব। অতএব আমরা যেন জেগে উঠে চলতে থাকি যতদিন না আদর্শে পৌঁছাই।

১০ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন : 'যেখানে সমস্ত দ্বৈত চেতনা মুছে যায় সেই "নির্বিকল্প সমাধি" লাভ তোমাকে করতেই হবে। কেউ কেউ বলে এ অবস্থা আধ্যাত্মিক অনুভূতির শেষ স্তর, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এটিই প্রথম স্তর।' দ্রঃ স্বামী প্রভবানন্দ, *The Eternal Companion* (Madras : Sri Ramakrishna Math 1971) p. 366

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বরপ্রেম

## প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম

প্রেম ছাড়া কোন মানুষ বাঁচতে পারে না, প্রেমের পাত্রটিই জনে জনে তফাত হয় মাত্র। আমরা হয় কোন মানুষের ও ইন্দ্রিয়ভোগের পেছনে অথবা ঈশ্বর ও ঈশ্বরীয় আনন্দের পেছনে ছুটি। ঈশ্বরীয় বস্তুর পেছনে ছোটার মধ্যেই আধ্যাত্মিক জীবনের সব স্তরগুলি রয়েছে। যখন আমরা এটা অনুভব করব, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে। কিন্তু প্রথমে, আমাদের নিজ প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে অন্তত কিছু সচেতন হতে হবে—কারণ আমাদের প্রকৃত স্বভাব ঈশ্বরীয়। উচ্চ সত্তাটি পরমাত্মারই অপরিহার্য অংশ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'ধর্ম হলো অনন্ত আত্মা ও অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অনন্ত সম্বন্ধ।'[১] সেই জন্য অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে সত্য এবং সৎবস্তুর ধারণা পরিষ্কার থাকা বিশেষ দরকার—সে 'ভক্ত'ই হোক, 'জ্ঞানী'ই হোক অথবা 'যোগী'ই হোক।

ঈশ্বরপ্রেম নর-নারীর প্রতি প্রেমের মতো অন্ধ নয়। এটি সব সময়ে কোন এক উচ্চতর স্বত্তার ভিত্তির ওপর স্থাপিত। এ প্রেম জাগতিক প্রেম বলতে যা বোঝায় তা নয়। সাধারণত আমাদের প্রেম স্রোতের মতো নিম্নগামী। ঈশ্বরের ভালবাসা যেন নদীকে তার উৎসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, যে উৎস এক অফুরন্ত জলাধার, সব মানবীয় প্রেমের গোমুখ।

আমরা মনে যতটা শুদ্ধ হব, ততটাই আমাদের প্রকৃত উচ্চতর স্বভাবকে জানতে সক্ষম হব এবং নিজ অন্তরে স্থিত ঈশ্বর সংস্পর্শে আসতে পারব। এ কাজ করতে গেলে, আমদের নিম্নতর স্বভাবের উর্ধ্বে উঠতে হবে। জ্ঞানান্বেষু (জ্ঞানী) ইচ্ছাশক্তি সহায়ে মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। ঈশ্বর-প্রেমীর (ভক্তের) সব অনুভূতি ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে। একাগ্র ভক্তিতে আমাদের সব বাসনা দগ্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বর-ভক্তিই ভক্তের জীবনকে পবিত্র করে তোলার পক্ষে সর্বোত্তম সহায়ক।

ঈশ্বরভক্তিই শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ঐক্য সাধন করে। কিন্তু এ

---

১ পূর্বোল্লিখিত বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০

ভাবপ্রবণ লোকের ভক্তি নয়। এ আবেগের বুদ্বুদ নয়। এ হলো পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের তীব্র বুভুক্ষা। সাধারণত আমাদের ভক্তি মিশ্রাভক্তি। এতে কিছু আছে নিত্য আর কিছু অনিত্য। এটি শুদ্ধা ভক্তি নয়। ভক্ত শুদ্ধা ভক্তি লাভের জন্য ঈশ্বরের প্রতি শরণাগত হয়ে নিজ অপবিত্রতা থেকে অব্যাহতি পেতে চায়।

আমাদের ঐকান্তিকতা সব সময়ে সত্য হয় না। ঈশ্বরপ্রেমে কিছু ঐকান্তিকতা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা বাসনার সঙ্গে মিশে আছে, তাই খাঁটি নয়। আধ্যাত্মিক সাধনায় ঐকান্তিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কখনো কখনো আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি—নিজেকে খুব ঐকান্তিক মনে করে। এক জার্মান মহিলা এক সময়ে আমার কাছ থেকে কিছু উপদেশ চায়। তাকে দুর্বল বলে মনে হলো। সে সম্প্রতি রোগ থেকে সেরে উঠেছে—স্থান পরিবর্তনে যাচ্ছে। সেই সময়টুকু সে ধ্যান করে কাটাতে চায়। সে ঈশ্বরানুভূতির জন্য আগ্রহী। আমি তাকে উপদেশ গ্রহণের আগে শরীরটাকে সারিয়ে তুলতে বললাম। সে জিজ্ঞেস করল, 'স্বামি, আপনি কি আমার ঐকান্তিকতায় সন্দেহ করছেন?' আমি বললাম, 'না, আমি তা করি না। কিন্তু, তোমার ঐকান্তিকতা অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে রয়েছে।'

যে ঐকান্তিকতা হঠাৎ আসে, তা ক্ষণস্থায়ী হয়। আমরা অনেক জিনিস ভালবাসি তার মধ্যে ঈশ্বর একটি। ঈশ্বরে ভালবাসা প্রথমে সহজাত প্রবৃত্তিরূপে আসে, কিন্তু ক্রমে আমরা একজনের অস্তিত্ব অবশ্যই অনুভব করতে থাকি, যিনি পিতা, মাতা ও জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের থেকে প্রিয়তর। *সাধনার* সহায়ে মনকে শুদ্ধ করতে হবে এবং যে ঈশ্বরপ্রীতি নানা সাংসারিক বাসনার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে মিশে রয়েছে, এই মিশ্রণে সেই ঈশ্বরপ্রীতির ভাগ বাড়াতে হবে। আমাদের প্রেমকে সম্পূর্ণ একমুখী হতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটি ভাবকে ঈশ্বর-কেন্দ্রিক হতে হবে, অন্য কিছু যে আমাদের মনকে ঈশ্বরের দিক থেকে অন্য দিকে টানবে তা হতে দেওয়া চলবে না। এই ভাবে জ্ঞাতসারে ও ধীরভাবে আমাদের সমস্ত বাসনা ও কামনাকে ঈশ্বরমুখী করলে আমাদের অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতা শুদ্ধ ও উন্নত হবে। তখনই আমরা বুঝব প্রকৃত ভক্তি কি। এই পদ্ধতিতে, যোগ-প্রক্রিয়ার মহা বিপদকেও এড়ানো যেতে পারে। সে বিপদ হলো এই যে আমাদের মধ্যে অনুভূতি ও আবেগগুলির উদ্গতির ব্যবস্থা না করে সেগুলিকে ঘনীভূত করে ফেলা।

খাবার, বন্ধু, টাকা, সম্পত্তিতে আমাদের প্রীতি আছে। কিন্তু এ প্রীতি আমাদের ছোট 'আমি'কে কেন্দ্র করে। এই অহং কষ্টদায়ক সব দুঃখের উৎপত্তিস্থল। এক সরল গ্রাম্যলোককে জেলাশাসকের কাছে আনা হয়েছিল, তার স্ত্রীকে ফেলে পালানোর অপরাধে। সে আপত্তি জানিয়ে বলল, 'ধর্মাবতার, আমি পলাতক নই,

আমি আশ্রয়প্রার্থী।' মানব প্রীতি প্রায়ই বিপরীতমুখী হয়ে তীব্র স্বার্থপরতার রূপ নিয়ে থাকে।

এর সঙ্গে একবার তুলনা করা যাক, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কের কথা। এ প্রেমের গভীরতা ও শুদ্ধতা কথায় বর্ণনা করা যায় না। নরেন্দ্রনাথ (যিনি পরে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছিলেন) ছিলেন প্রভুর শিষ্যদের প্রধান। প্রভু তাঁকে অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে ভালবাসতেন এবং নানাভাবে তাঁর স্নেহ প্রকাশ করতেন। তাঁকে দেখলেই বিহ্বল হয়ে পড়তেন। কিন্তু এক সময়ে শিষ্যকে কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন। তিনি হঠাৎ তার প্রতি উদাসীন ভাব দেখাতে আরম্ভ করলেন। যখন নরেন্দ্র এসে প্রভুকে প্রণাম করত তিনি চুপ হয়ে যেতেন, কিন্তু পরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করতেন। প্রভু এই উদাসীনভাব কয়েক সপ্তাহ ধরে দেখিয়েছিলেন; নরেন্দ্র কিন্তু সে সময়েও প্রভুর কাছে নিয়মিত আসত। একমাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আমি তোর সঙ্গে একটা কথাও বলি না, তবু তুই আসিস। এ কি রকম?' নরেন্দ্র উত্তরে বলল ঃ 'আপনি কি মনে করেন, খালি আপনার কথা শুনতেই আমি আসি? আমি আপনাকে ভালবাসি, আর দেখতে চাই—তাই আসি।'[২] এই হলো অহৈতুকী ভক্তি।

একবার নরেন্দ্র নিজে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর প্রতি আসক্ত না হতে বলেন। এ কথা শুনে শিশুসুলভ প্রভু তখুনি মা কালীর আদেশের জন্য কালী মন্দিরে গেলেন। মা কালী তাঁর কাছে প্রকাশ করে দিলেন যে তিনি তাঁর যুবা শিষ্যকে ভালবাসেন কারণ তিনি, তার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন। যেদিন তিনি তা দেখবেন না সেদিন তাকে চোখে দেখাও তিনি সহ্য করতে পারবেন না।[৩] শিষ্যদের প্রতি প্রভুর প্রীতি সাধারণ ভালবাসার মতো ছিল না। এ হলো আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা, যা সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফল। এই রকম ভালবাসায় ছোট 'আমি' নয়, ঈশ্বর-চৈতন্যই আসক্তির কেন্দ্র।

শ্রীচৈতন্যের জীবনেও এই রকম ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি যখন পুরীতে থাকতেন, এক নীচ জাতীয় ভক্তকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন। সেই লোকটি ভয়ে পেছিয়ে গিয়ে বলল, 'প্রভু, নীচ জাতিতে আমার জন্ম, আমাকে স্পর্শ করা আপনার উচিত নয়।' শ্রীচৈতন্য উত্তরে বললেন, 'তুমি কি ভাবছ? তোমার স্পর্শে তো আমি নিজে পবিত্র হব!' ঈশ্বরপ্রতিম পুরুষেরা ঈশ্বরের সর্বব্যাপী সত্তাকে সর্বত্র অনুভব

---

২ Eastern and Western Disciples. *The Life of Swami Vivekananda*. [Kolkata : Advaita Ashrama, 1974] pp 67-68

৩ তদেব, পৃঃ ৫৯-৬০

করেন। তাঁর পক্ষে নীচু জাত আর উঁচু জাত, দারিদ্র্য আর সম্পদ—এ সবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

## ভক্তের রকমফের

'গীতা'য় বলা হয়েছে, চার রকম লোক ঈশ্বরের পূজা করে ঃ আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী। কৃষ্ণ বলেছেন, এরা সকলেই পুণ্যাত্মা, কিন্তু শেষেরটি অর্থাৎ *জ্ঞানী* প্রভুর প্রিয়তম।[৪] এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটির তাৎপর্য কি? প্রবুদ্ধ পুরুষ সর্বজীবে ঈশ্বর দর্শন করেন এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনি নিজের বা অন্যের মন্দ ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। উপনিষদের ঋষিদেরও এরকম উপলব্ধি হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন বলেছেন—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি যষ্টি হাতে কম্পমান বৃদ্ধ মানব, সত্যই তুমি নানারূপে প্রকাশিত হও।[৫]

যুবক সাধক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, সর্বদা *সমাধি*-মগ্ন হয়ে থাকতে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, এর চেয়েও উঁচু অবস্থা আছে, যেমন সর্বত্র সর্বজীবে ঈশ্বর-দর্শন।[৬] অবশ্য এ অতি মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি।

মানুষ নানা রকমের হয়। জীবন ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক প্রভেদ থাকে।

১। যাদের মন সংসারে একেবারে ডুবে আছে, সাধারণত ঈশ্বরকে মোটে গ্রাহ্য করে না; তারা জীবন-ভোগের ও ইন্দ্রিয়-সুখের আকাঙ্ক্ষায় অত্যধিক ব্যাকুল—আর দুঃখকষ্টকে মৃত্যুর বিভীষিকা বলে মনে করে।

২। আর এক রকমের সংসারী লোক ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা ঈশ্বরকে অভীষ্ট-সিদ্ধির কর্তা রূপে দেখে, যিনি পার্থিব সমৃদ্ধি, পার্থিব ভোগসামগ্রী দান করে থাকেন। তাদেরও প্রচণ্ড ভোগ লালসা থাকে আর জীবনের দুঃখ কষ্টকে ভয় করে।

৩। অন্য কিছু লোকের মন—কতকটা সংসারী, আর কতকটা আধ্যাত্মিক; তারা ঈশ্বর-উপাসনা করলেও সাংসারিক ভোগে ভয়ানক আসক্ত, তারা দুর্ভোগকেও ভোগ মনে করতে চেষ্টা করে, যদিও সেই সঙ্গে দুঃখও অনুভব করে।

৪। কিছু বাস্তব সচেতন মানুষ ঈশ্বরের কথা না ভেবে, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা

---

৪ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৭/১৬-১৮

৫ ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*, ৪.৩

৬ পূর্বোল্লিখিত *Life of Swami Vivekananda*. p. 131

করে চলে, তারা জীবনের সুখ ও দুঃখকে অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নেয়, আর যে জিনিস যেমন তাকে সেইভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে।

৫। কিছু আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন লোক জীবনের সুখ-দুঃখ উভয়কেই শান্তভাবে নিজের ভাল-মন্দ কাজের ফল বলে মনে করে এবং যথাসম্ভব ভাল ভাবে জীবন যাপন করার প্রয়াস পায়।

৬। অন্য কেউ কেউ সব কিছুই ঈশ্বরের দান বলে মনে করে, যথাসম্ভব অনাসক্ত ও সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করে, আর এদিকে তার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে পুণ্যের ও কর্তব্যের পথে চলতে কঠোর পরিশ্রম করে।

৭। অন্যে সুখ-দুঃখকে গ্রহণ করে সাংসারিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিপরীত রূপ হিসাবে এবং তা সব সময়ে কর্মফল অনুযায়ী পুরস্কার ও দণ্ড নাও হতে পারে। তারা চেষ্টা করে এক অনাসক্ত, পবিত্র, আধ্যাত্মিক সাধনপুষ্ট, কর্তব্যপরায়ণ, নিষ্কাম সেবাময় জীবন যাপন করতে—আর চেষ্টা চালায় সাংসারিক ভাল মন্দের পারে ঈশ্বরীয় ভাব উপলব্ধি করার জন্য। তারা, যেমন সাংসারিক সুখে তেমন সাংসারিক দুঃখে সমান ভাবে স্থির থেকে উচ্চতর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, বৈপরীত্যের কাছে নতিস্বীকার করে সমতা হারিয়ে পথভ্রষ্ট হতে চায় না।

একরকম প্রেম আছে যেখানে প্রেমিক বা প্রেমিকা কেবল নিজ সুখের কথাই ভাবে। অন্য এক রকমের ভালবাসায় দেওয়া নেওয়া চলে; প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের সুখের কথা ভাবে। তৃতীয় রকমের ভালবাসায় প্রেমিক বা প্রেমিকা নিজের সুখের কথা একেবারেই চিন্তা করে না, তার সমস্ত মন পড়ে থাকে প্রেমাস্পদের সুখ সাধনের ব্যবস্থায়।

ঈশ্বরপ্রেমে আমরা যদি শান্তি ও আনন্দ না পাই তবে সে প্রেমে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি আছে। পবিত্র প্রেম যদি সংসার বাসনায় রঞ্জিত না হয়, তবে তা নিশ্চয়ই প্রচুর আনন্দ ও সাফল্য নিয়ে আসে। যেসব জিনিসে আমাদের বেশি আসক্তি, প্রভু প্রায়ই সেগুলিকে সরিয়ে নেন, যাতে তাঁর প্রতি নিখুঁত নিঃস্বার্থ প্রেম আমরা লাভ করতে পারি। প্রায়ই আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে শারীরিক স্তরে দারিদ্র্য ও দুঃখ জড়িত থাকে, কিন্তু পবিত্র প্রেম এবং তা থেকে পরম আনন্দ লাভের জন্য এগুলির প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং তা সংগ্রহ করতে হলে আমাদের কাঁচের পুঁতি ও রঙ্গিন চুমকি ফেলে দিতে হবে।

## ঈশ্বরপ্রেমের শক্তি

কেবল *সৃষ্টি, স্থিতি* ও *লয়* এর মধ্যেই যে ঈশ্বর শক্তির বিকাশ তা কিন্তু ভেবো

না। ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ঈশ্বরীয় ভক্তির মাধ্যমে যে শক্তি আসে তার কথা ভাব। শক্তি, দৈহিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক হতে পারে। সব রকম শক্তির আদি উৎস, সেই দিব্য জননীর (জগদম্বার) দিকে তাকাও। মাতৃভক্তি তোমাকে অনন্ত শক্তি দেবে। তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। কিন্তু যন্ত্রও কাজ করে, আর মনে রেখো যন্ত্র হিসেবে তোমার শক্তি অনন্ত।

ঠিক যেমন তোমার ভেতর জগদম্বা রয়েছেন, তেমনি তিনি সকলের মধ্যে রয়েছেন—এইভাবে চিন্তা কর, তা না হলে আজকের ভালবাসা আগামী কাল বিদ্বেষে পরিণত হবে। আমাদের ভালবাসা বিদ্বেষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে বিজড়িত। কিন্তু ভালবাসাকে কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসা হতে হবে। যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখা না যায়, তবে প্রথম প্রথম বরং একটু দেওয়া-নেওয়ার ভাব রাখ। পরে এমন অবস্থা আসবে যে তুমি পাওয়ার থেকে বেশি দিতে চাইবে। উচ্চতম অবস্থা হলো—নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া, কিছু পাওয়ার আশা না রেখে কেবল দিয়েই যাওয়া।

বর্তমানে আমাদের ভালবাসা স্বার্থজড়িত। তোমরা কি 'পঞ্চাশ-পঞ্চাশ' গল্পটি জান? একটি হোটেল খরগোসের মাংসের রোলের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। একবার এক খরিদ্দার লক্ষ্য করল যে রোলের স্বাদ বদলে গেছে। পুলিশ ডাকা হলো। হোটেল-রক্ষিকা মহিলাটি বলল, 'মহাশয় আমি কি করতে পারি? খরগোস-মাংস সহজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই কিছু ঘোড়ার মাংস মিশিয়েছি।' পুলিশ জিজ্ঞেস করল, 'কি অনুপাতে?' মহিলা উত্তর দিল, 'পঞ্চাশ-পঞ্চাশ।' অর্থাৎ একটি খরগোসের সঙ্গে একটা ঘোড়া। অন্যের প্রতি আমাদের তথাকথিত ভালবাসা খরগোসের ওজনের, আর নিজের প্রতি ভালবাসা ঘোড়ার ওজনের—পঞ্চাশ-পঞ্চাশই তো বটে। সাধারণ লোকে, সেই সঙ্গে আমরাও বিশ্বাসযোগ্য নই। ভালবাসার সেই অনন্ত উৎসের দিকে তাকাও। সেই প্রকৃত ভালবাসার এক কণিকামাত্র আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু তা আমাদের স্বার্থপরতার সঙ্গে মিশে অতিরিক্ত ভেজাল মেশানো হয়ে গেছে। একে ভেজাল মুক্ত করতে হবে। নিজের প্রতি ভালবাসা সকলেরই রয়েছে। সমস্যা হলো এর উদ্‌গতি নিয়ে। বিজ্ঞানে উদ্গতির অর্থ হলো শুদ্ধিকরণ। খ্রীস্টানেরা একে বলে (Purgation) প্রায়শ্চিত্ত। এই ভালবাসাকে শুদ্ধ করা—হলো আমাদের জীবনের কর্তব্য।

তোমার ঈশ্বর-প্রীতি, পরমাত্মার প্রতি প্রীতি, বাড়িয়ে চল। তখন পর-প্রীতিও বাড়বে। মা আমাদের সকলকে মিলিয়ে দেন। প্রথমে আসে ব্যক্তি-প্রীতি। পরে ধীরে ধীরে আমাদের উপলব্ধি হয় যে আমরা এক একটি আত্মা, অনন্ত চৈতন্যের

এক একটি অংশ মাত্র। তখন অন্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। মানব-প্রীতি তখন আধ্যাত্মিক সম্পর্কে পর্যবসিত হয়। আসক্তির বদলে আসে মুক্তি। স্বার্থের বদলে সেবা। এই প্রীতিকে বাড়াও, অন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দাও—তাদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার কর। প্রত্যেকের অন্তরস্থ দিব্য-সত্তাকে চিন্তা কর। স্বজন-প্রীতি বা বন্ধু-প্রীতি স্বার্থজড়িত। জেনে রেখো যে এই প্রীতি অনন্ত ঈশ্বর-প্রীতির এক কণিকামাত্র। একে ঈশ্বর-প্রীতির সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা কর। তোমার আধ্যাত্মিক উপাসনার পর ঈশ্বরকে প্রণাম কর, যিনি অধিষ্ঠিত তোমার পিতার মধ্যে মাতার মধ্যে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এমনকি যাদের তুমি অপছন্দ কর তাদের মধ্যেও। প্রত্যেককে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে চেষ্টা কর।

আমাদের এমন এক চেতনাস্তরে উঠতে হবে, যা বাসনা কামনার ঊর্ধ্বে, যেখানে ভাল-মন্দ সবই সমান। সর্বদা মনে রাখবে যে, ভাল আবেগ থেকে মন্দ আবেগের দূরত্ব অল্পই। আবেগ যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তাকে আধ্যাত্মিক পথে চালিত করতে শেখ। ঐহিক স্তরে অন্যের প্রতি ভালবাসা দেখানোর চেষ্টায় সতর্ক হবে। যদি কাউকে সত্যই ভালবাস তাকে অনাসক্ত ভাবে সেবা করার চেষ্টা কর। যদি তা না পার, সরে এসে তার জন্য নিভৃতে প্রার্থনা কর। যেসব অধ্যাত্ম-সাধকের কিছুটা মানসিক পবিত্রতা হয়েছে, তাদের পক্ষে কামনা-বাসনার বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে আরো বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোমল আবেগ ও অনুভূতির ব্যাপারে তারা যেন বিশেষভাবে সতর্ক থাকে।

আমাদের মনের ওপর সর্বদা নজর রাখা দরকার। ছোটখাট দৈনন্দিন ব্যাপারে যদি মন সতর্ক না থাকে, তবে ধ্যানের সময়ে তা অসতর্ক হবেই। ধ্যানে বসার সময় আমরা একটি নতুন মন পাই না। একই পুরান মন সব সময়ে রয়েছে, যদি তা অন্যসময়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত হয়, তবে কি করে আশা করা যেতে পারে যে তা ধ্যানের সময় স্থির থাকবে? আমরা যতটা ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি দিতে পারব, তাঁকে সেবা করতে যতটা আগ্রহী হব, আমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা ততই বেশি বেশি সুস্থির ও সফল হবে।

ঈশ্বরকে যে কোন ভাবেই হোক সঙ্গে নিয়ে চল, এমনকি যখন তুমি কাজে লেগে আছ, এমনকি তোমার মন যখন জাগতিক বস্তুর পেছনে ছুটতে চাইছে তখনো। একমাত্র ঈশ্বর-প্রেমকে অবশ্যই বাড়িয়ে তুলতে হবে; আর তা নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমেই করতে পারা যায়। বর্তমানের তুলনায় মনকে আরো বেশি করে অবশ্যই জাগিয়ে তুলতে হবে, অবশ্যই সচেতন করে তুলতে হবে। প্রভুকেই তোমার জীবনের ধ্রুবতারা কর।

যে ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা নেই সে বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে পারে না। আধ্যাত্মিক জীবনের সব থেকে বড় জিনিস হলো আমাদের মানব-প্রীতিকে ঈশ্বর-প্রীতিতে পরিণত করা। সব থেকে নিম্ন ধরনের আসক্তির কেন্দ্রেও থাকে বিশুদ্ধ প্রেমের সূক্ষ্ম অস্তিত্ব। ময়লাটা পুড়ে গেলে শুদ্ধ প্রেমই পড়ে থাকে।

ঠিক জেনে রেখো, মানুষ তোমাকে কোন না কোন কারণে পরিত্যাগ করলেও প্রভু তোমাকে ফেলতে পারেন না, কারণ তুমি যে তাঁরই এক শাশ্বত অংশ, যেমন কৃষ্ণ বলেছেন ঃ

*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।*
*মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।*[৭]

—এ সংসারে আমারই সনাতন জীবরূপ অংশ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে এ সংসাররূপ কর্মভূমিতে আকর্ষণ করে থাকে।

তোমার সব ভালবাসা তাঁর দিকে ফেরাও, তাঁর ভালবাসার মাধ্যমে অন্য সকলকে ভালবাসতে শেখ। অর্থাৎ, অন্যদের ভালবাসতে শেখ, ব্যক্তিগত ভালবাসার মাধ্যমে নয় ঈশ্বর-প্রীতির মাধ্যমে ও ঈশ্বরের জন্যে। অন্যদের প্রতি আমাদের ভালবাসায়—মানবের প্রতি ঈশ্বরের শুদ্ধ ভালবাসার একটু ছোঁয়া যেন অবশ্যই থাকে।

## ঈশ্বরের দিকে মোড় ফেরাও

অহংবোধ বার বার আস্ফালন করে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, একে ঈশ্বরের দাস করে রাখ।[৮] কামনা বাসনা সংযত হতে চায় না। তাদের তীব্রতা বজায় রেখে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দাও। নর-নারীর সঙ্গ লাভে ব্যাকুল না হয়ে ঈশ্বর-সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হও। একমাত্র তাঁর দর্শনেই আত্মার ক্ষুধা তৃপ্ত হতে পারে। কেবল তিনিই আত্মার শূন্যতাকে ভরে দিতে পারেন ও তাকে শাশ্বত শান্তি ও আনন্দ দিতে পারেন।

তোমার স্থূল ও সূক্ষ্ম ভোগের পথে যারা বাধা দেয় তাদের ওপর রাগ না করে, ঈশ্বরের পথে যারা বাধা দেয় তাদের ওপর রাগ কর। তোমার নিচুস্তরের বাসনার ওপর, তোমার বিক্ষুব্ধ আবেগের ওপর, তোমার রাগের ওপর রাগ করতে শেখ—তারাই তোমার সব থেকে বড় অদম্য শত্রু মনে করে তাদের এড়িয়ে চলতে শেখ। আর একটি 'মানুষ পুতুল' বা ক্ষণস্থায়ী জাগতিক সম্পদের অধিকারী হবার

৭ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১৫/৭

৮ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১৩৮

ইচ্ছা পোষণ না করে, ঈশ্বর ও তাঁর অফুরন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ আকাঙ্ক্ষা কর, যা কোনদিন হারাবে না, আর একমাত্র তাই আমাদের চিরন্তন শান্তি দিতে পারে। ভাগবতে বলা হয়েছে ঃ

**কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহম্ ঐক্যং সৌহৃদ্যম্ এব চ।**
**নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥**[৯]

—কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সখ্যকে ঈশ্বর-সত্তার দিকে ফিরিয়ে দিলে তন্ময়তা লাভ হয়।

ঈশ্বররূপ পরশ পাথরের ছোঁয়ায় বাসনা-কামনা, লোভ-ক্রোধ তাদের মন্দ প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধা ভক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখনই আত্মায় আনন্দ ও অমৃতত্ব অনুভূত হয়।

'ভগবদ্ গীতায়' শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

**অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্।**
**সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥**
**ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।**
**কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥**[১০]

—অতি দুষ্ট লোকও যদি অনন্য ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বররূপী আমাকে ভজনা করে, তবে তাকে সাধু বলেই মনে করবে, কারণ তার সঙ্কল্প অতি শুভ। সে শীঘ্রই ধার্মিক হয় ও চিরশান্তি লাভ করে। সাহসের সঙ্গে ঘোষণা কর, যে আমার ভক্ত সে কখনো কষ্টে পড়ে না।

এমন হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি কামনা-বাসনার মন্দ ফল সম্বন্ধে সবই জানে, কিন্তু তবু তাদের থেকে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখতে পারে না। তার পক্ষে কি করণীয়? সে কিভাবে ও-সবের ওপরে উঠতে পারে? এক উপায় হলো ওগুলিকে ইচ্ছাশক্তির সহায়ে নিয়ন্ত্রণ করা। অন্য উপায় হলো, সেগুলিকে সাক্ষীর দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যাস করা। এর কোনটাই সহজ নয় এবং আধ্যাত্মিক জীবনের শুরুতে একাজ প্রায় অসম্ভব। অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে উপায় কি? তাকে এর সবগুলিকে সরাসরি বা কারও মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তার পক্ষে প্রত্যেকটি বাসনাকে, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়জ আবেগকে, প্রত্যেকটি কামনাকে সচেতনভাবে জেনে শুনে, ইচ্ছাশক্তি সহায়ে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তার যদি চারুকলা বোধ আর তা উপভোগ করার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হয়, তবে কোন

---

৯ শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ ২৯ ১৫

১০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯ ৩০-৩১

পবিত্র চারুকলার কাজ বেছে নিয়ে, তাকেই সোপান হিসাবে ব্যবহার করে ভগবানের রাজ্যে ওঠার চেষ্টা চালানোই তার উচিত হবে। জাগতিক সঙ্গীত না শুনে ভগবৎ সঙ্গীত সে শুনুক, অন্য লোকের উদ্দেশে গান না গেয়ে ঈশ্বরের জন্য গান করুক, এই রকমই করে চলুক। যদি সে ফুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য পছন্দ করে ও তা উপভোগ করতে চায়, তবে সে যেন ফুল তুলে ভগবানকে নিবেদন করে, তাই দিয়ে বেদিটিকে সুন্দরভাবে সাজায়। যদি সে কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে বা তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তবে সে যেন ঐ ব্যক্তির মধ্যে যে ভগবৎভাব রয়েছে তাকেই ভালবাসুক ও তার ফলে ভগবানের দিকে সরাসরি আকৃষ্ট হোক।

সচেতনভাবে ও অবহিত চিত্তে করলে এই সব কাজই—শ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কৌশলরূপে ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামকরূপে বাসনার উদ্গতি ঘটাতে, তাকে উঁচুদিকে ফেরাতে এবং আরো বেশি পবিত্র হতে আমাদের সাহায্য করবে। এ ক্ষেত্রেও সাধকের চরম উদ্দেশ্য হবে মনকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা ও ঈশ্বরোপলব্ধি করা। অন্য সব কাজই এই উদ্দেশ্য লাভের সোপান মাত্র। এই ক্রমোন্নতির পথ ধরে উঠতে পারলে আমরা তাড়াতাড়ি হোক বা দেরিতে হোক নিশ্চয়ই একদিন আধ্যাত্মিক প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারব।

সমস্ত বাহ্যবস্তুর সম্পর্কে আমাদের এই ঈশ্বরমুখী ভাব আনতেই হবে। ঈশ্বর সর্বত্র ও সর্বভূতে বিরাজমান। কিন্তু তা অবহিত হতে হলে আমাদের আরো বেশি সজাগ ও সচেতন হতে শিক্ষা করতে হবে। আমরা যেন আরো চিন্তাশীল হই, আর ভাল বা মন্দ কোন উত্তেজনা ও সহজাত প্রবৃত্তির বশে কাজ করাটা যেন কমাতে পারি। কিন্তু এ সব ব্যাপারে আমাদের সতর্কতার এত অভাব আর এত ঢিলে ঢালা ভাব যে, ঠিক এর বিপরীত পথেই আমরা চলি—ফলে অশেষ কষ্টেও পড়ি।

সকলের আত্মাই ঈশ্বরে একীভূত—এ তত্ত্বটিকে আমাদের সঠিক উপায়ে পুরোপুরি বুঝতে হবে। এখন আমরা এ তত্ত্বটি কতকটা হালকা মনে নিয়ে থাকি। সত্য কথা বলতে কি, ঠিক ঠিক নিষ্কাম ও নিরাসক্ত না হলে এ তত্ত্ব সর্বান্তঃকরণে বুঝতে ও সেই মতো কাজ করতে আমরা পারব না। আমরা যদি নিঃসন্দেহে বুঝি যে এক ভেদাতীত তত্ত্ব সকলের মধ্যেই রয়েছে, তবে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির ওপরে গভীর বিদ্বেষ বা প্রবল পাশব ভালবাসা আমাদের হতেই পারে না, পরন্তু ভালবাসার পাত্র পুরুষ হোক বা স্ত্রী হোক তার পেছনে যে তত্ত্ব আছে কেবল সেই দিকেই আমরা তাকাব। এর অর্থ এই নয় যে আমাদের আচরণ বোকার মতো হবে, আর আমরা আমাদের সঙ্গীদের সম্বন্ধে কোন ভাল-মন্দ বিচার করব না।

না—এক অভিন্ন তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি জেনেও, এগিয়ে গিয়ে বাঘের সঙ্গে আমাদের কোলাকুলি করা উচিত হবে না। যতক্ষণ আমরা সাংসারিক জগতে আছি—সকল নর-নারীর মধ্যে ভগবৎ তত্ত্বের অস্তিত্বকে আমাদের জানতে হবে, কিন্তু তা বলে তাদের সম্বন্ধে বাছবিচার না করা বা সতর্ক না হওয়া উচিত হবে না। সংসারে অশুদ্ধ ও অনৈতিক জীবন যাপন করছে এমন লোকের পেছনে সেই অদ্বৈত তত্ত্বকে লক্ষ্য করব, কিন্তু তার কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করা উচিত হবে না। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ নিয়মে কাজ না করলে একদিন আমাদের পদস্খলন হবে—ও আমাদের দুঃখ-দুর্দশা অবধারিত। সাধক এ বিষয়ে কখনই অতি সাবধানী না হয়ে পারেন না। সর্বভূতে এই অভিন্ন তত্ত্বের অস্তিত্ব আমরা যতটা বুঝব, আমাদের সব বিদ্বেষ, আমাদের তথাকথিত মানবপ্রীতি, আমাদের আসক্তি ততটা কমে যাবে এবং তারা শক্তি ও প্রভাব হারাবে। যখনই দেখা যায় সাধক নির্বিচারে সংসারী লোকের সঙ্গে, বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে মিশতে চায়, বুঝতে হবে তার মধ্যে কোথাও বিশেষ কিছু গোলমাল আছে। জাগতিক বস্তুর আকাঙ্ক্ষা ও তার ভোগ-স্পৃহা এখনও তার মধ্যে খর্ব হয়নি, সে এখনো চিত্তশুদ্ধি লাভ করেনি এবং তার পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং ঈশ্বরানুভূতি লাভ মোটেই সম্ভব নয়।

সাধারণত আসক্তিই আমাদের সমগ্র বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করে রাখে। রূপের থেকে, ব্যক্তিত্বের থেকে, ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তুর থেকে—চৈতন্যের ওপরই আমাদের অবশ্যই বেশি জোর দিতে হবে; কিন্তু যতদিন আমাদের ইন্দ্রিয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা, নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের ওপর আসক্তি আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে থাকবে ততদিন আমরা সেই এক অভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারব না এবং সেজন্য আমরা একই পুরান ভুল বারবার করে চলব। তাই সব সাধকদের উচিত যথাসম্ভব অনাসক্তির উৎকর্ষ সাধন। এ ছাড়া কোন কিছু ইতিবাচক বস্তু লাভ করা যায় না।

অনাসক্তির নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি দিক আছে। আমাদের উচিত নিজেকে অন্য সব বিষয় থেকে যথাসম্ভব সরিয়ে এনে, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করা, যাতে পরে অন্যের সঙ্গে সব যোগাযোগ ঈশ্বরের মাধ্যমে হতে পারে—কখনই আবার সরাসরি নয়। মানবপ্রীতি ভগবৎপ্রীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু সে রকম যুক্ত না থাকলে তার ক্রমিক অধোগমন ঘটে এবং তা দুঃখ-দুর্দশায় পর্যবসিত হয়। আমাদের যেসব সম্পর্ক সরাসরি গড়ে ওঠে তা দেহজাত এবং তা অন্যের সংসর্গে আসে দেহেরই মাধ্যমে। সেগুলিতে স্থায়ী এমন কিছু নেই যা আমাদের কাউকে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে।

সাধারণত দেহ, ইন্দ্রিয়, কামনার সঙ্গে আমাদের এত ভয়ানক একাত্মবোধ যে আমরা ঈশ্বরকে ঠেলে সরিয়ে রেখে দিই। যখনই ঈশ্বরের সম্বন্ধে সন্দেহ আসে, তখনই অহং-এর ওপর, ইন্দ্রিয় ভোগের ওপর, ভোগ্যবস্তুর ওপর মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি দেখা যায়, সেই কারণেই ঈশ্বরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। যতদিন ব্যষ্টি মানব ইন্দ্রিয়ভোগ ও সম্পদের বাসনায় মগ্ন এবং অহংকার ও গর্বে পূর্ণ থাকবে, ততদিন তার জীবনে ঈশ্বরের স্থান নেই। যদি মন বাসনা ও কামনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়, তখনই মানবের ঈশ্বরানুভূতি হয়। তাই যদি আমাদের ঈশ্বরানুভূতি না হয়, যদি সত্যের সামান্যতম আভাসও না পাই, তবে এর কারণ খুঁজে বেড়াতে হবে না। আমাদের জানতে হবে যে আমাদের অচেতন ও অবচেতন মনে তখনো প্রবল বাসনা রয়েছে এবং সেই বাধাগুলিকে সবার আগে অপসারিত করতে হবে। যতদিন আমরা সেগুলিকে থাকতে দেব, ঈশ্বরোপলব্ধির কথা উঠতেই পারে না।

আমাদের ওপর যে আবেগের প্রভাব রয়েছে, তাকে চূর্ণ করতে হবে। যখনই আমাদের মনে আবেগগুলি মাথা চাড়া দেবে, তখনই আমাদের উচিত চেতনার বিস্তৃতি ঘটাতে চেষ্টা করা, কারণ তখনই সমুদ্রের ওপর ঢেউ-এর মতো আবেগগুলি অন্তর্হিত হবে। চেতনাকে কিভাবে বিস্তার করতে হয়, কিভাবে উচ্চতর চেতনা লাভ করতে হয় তা যে জানে, মনে আবেগ উঠলেও সে তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এই আবেগের ওপরে ওঠার সব থেকে কার্যকর উপায়ের মধ্যে একটি হলো আমাদের মধ্যে সদা বিরাজমান ঈশ্বর-চেতনার—তাঁর অনন্ত অস্তিত্বের—সংস্পর্শে আসা এবং তারপর আমাদের সব চিন্তাকে একমাত্র তাঁর সঙ্গেই যুক্ত করা।

## সব ভ্রান্ত ইষ্টগুলিকে সত্য ইষ্ট দেবতায় মিশিয়ে দাও

সামাজিক হবার জন্য আমরা কতই না সময় নষ্ট করি! অন্যের বিষয়ে চিন্তা করেই বা আমরা কত না সময় নষ্ট করি! এ ঠিক যেন তপস্যা বেশ কঠোরও বটে, তবে ভ্রান্ত ছবি ও ভ্রান্ত অনুভূতিগুলিকে জাগাবার জন্য। এ উপায়ে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি হয় না। ছোট ছোট খেলার পুতুল আর নাচের পুতুলগুলির ওপরে আমাদের উঠতে হবে, যেতে হবে তাঁর কাছে যিনি সুতো ধরে টেনে এদের ভীষণভাবে নাচাচ্ছেন। নিষ্কাম ভাবে নিজ অন্তরে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখব, সেখানে কতো মজার জিনিসই না ঘটছে। অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে, যদি আমরা সেই সময়ে সবটা *ইষ্ট দেবতা* বা *ইষ্টের* চিন্তায় দিই, কি অদ্ভুত উন্নতিই না আমরা করতে পারি! পুতুল-নাচের সুতো ধরে পুতুলকে যিনি নাচান তিনি যদি না থাকেন তবে পুতুল আর কি জন্য? পুতুলের মূল্যই বা কি? তবে *ইষ্টের* ওপর আমাদের সব হৃদয়াবেগ কেন্দ্রীভূত না করে, কেন-ই বা এই সব আসক্তি ও বিদ্বেষ, কেন-ই

বা এই সব পছন্দ অপছন্দ? *ইষ্ট* তো সদাই তোমার অন্তরে রয়েছেন। তিনি কখনো তোমাকে বিপদে ফেলে পালান না, কখনো হতাশ করেন না, তিনি কখনো তোমার জন্য দুঃখ কষ্ট বা ব্যর্থতা নিয়ে আসেন না, কিন্তু তোমাকে জানতে হবে—কি করে তাঁকে তোমার একান্ত আপন করে নিতে হয়, কি করে তাঁর সঙ্গে থাকতে হয়, কি করে একমাত্র তাঁতেই নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কখনো কখনো এমন হয় যে *ইষ্ট দেবতার* ওপর যথেষ্ট প্রীতি আমাদের থাকে না। আমরা বেশির ভাগ সময়ে মানুষের চিন্তা করি ও মানুষ পুতুলের দাসত্ব করতে চাই। যদি একটি শুদ্ধ চরিত্র ব্যক্তিত্বকে আমাদের *ইষ্ট* রূপে ধরি, তবে শত শত ভ্রান্ত মানবরূপী *ইষ্টের* চিন্তা থেকে রেহাই পেতে পারি, যা আমাদের জগৎ প্রপঞ্চের সঙ্গে বেঁধে রেখে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা দেয়। তাদের সবের ওপরে না উঠলে, আমরা কখনই প্রকৃত প্রেম ও মুক্তি কি বস্তু তা জানতে পারব না।

প্রথমত নিজের সম্বন্ধেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুল রয়েছে। অতএব স্বভাবতই অন্য সকলের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল হয়ে পড়ে। নিজে সতর্ক থাক, ও নিজ চিন্তারাজিকে নির্দয়ভাবে বিশ্লেষণ কর। পুতুলগুলিকে অদৃশ্য বেড়ি বিস্তার করে তোমাকে বাঁধতে দেবে না। যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাগুলিকে নজরে রাখি তবে দেখব যে, আমাদের নির্বাচিত দেবতার বদলে শত শত বৈষয়িক *ইষ্ট* আমাদের চিন্তার জীবন ও আবেগের জীবনকে অধিকার করে আছে। আমাদের সত্য *ইষ্টের* প্রতি নিষ্ঠা রেখে অন্য সব ভ্রান্ত *ইষ্টকে* সত্য *ইষ্ট* দেবতায় মিশিয়ে দিতে হবে। প্রবর্তকের কাছে যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক, এ ছাড়া অন্য কোন সমাধান নেই। মনের অন্তঃস্রোতকে সর্বদা তোমার *ইষ্টের* সঙ্গে যুক্ত রাখ। তোমার প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর সব মূর্তিকেই বদলে ফেলে ঈশ্বরমূর্তি বসাও—তখনই তোমার জীবন সুখী হবে, সব আসক্তি থেকে মুক্ত হবে ও সত্যসত্যই সফল হবে। এ জীবনে কোন ব্যর্থতা বলে কিছু থাকবে না।

কখনো কখনো কিছু লোকের কথা ভাবলে তোমার কাঁপুনি লাগে, কখনো ঘৃণা বোধ হয়, কখনো বা প্রবল যৌন-আকর্ষণ বা তথাকথিত ভালবাসার উদ্রেক হয়। এই সব বোধকেই, যদি তুমি তৎক্ষণাৎ সচেতনভাবে ও নিবিড়ভাবে তোমার *ইষ্টের* সঙ্গে যুক্ত করে দাও, তবে তুমি শক্তির অপচয় কমাতে পারবে, আর এই সব ঝামেলা এড়াতে পারবে। অন্য লোকের কথা মনে পড়লেই, তার জায়গায় তোমার *ইষ্ট* চিন্তা নিয়ে এস, তাদের মূর্তির বদলে তোমার *ইষ্ট দেবতার* জ্যোতির্ময় মূর্তি স্থাপন কর। এইভাবে তোমার শক্তির অপচয় যথাসাধ্য কমিয়ে আনতে পারবে, শুধু তাই নয় এই রকম অনুশীলনের মহৎ আধ্যাত্মিক মূল্য আছে।

যেহেতু এখনো আমাদের প্রবল দেহবোধ রয়েছে, তাই এখনো আমাদের সব চিন্তাই দেহ-কেন্দ্রিক। যখন দেখবে তোমার ভেতর থেকে কোন লোক সম্বন্ধে চিন্তা উঠছে—যা অপ্রয়োজনীয় এবং বিপজ্জনক, যা আকর্ষণীয় বা বিতৃষ্ণাজনক—কিন্তু তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক নয়, তৎক্ষণাৎ তার বদলে তোমার *ইষ্ট-চিন্তাকে* সেখানে নিয়ে এসে একাগ্রভাবে সেই চিন্তাই কর, আর জপ কর। ঈশ্বরই আমাদের সমস্ত মন জুড়ে থাকুন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর দেববাণী[১১] গ্রন্থে যেমন বলেছেন—আমাদের দৈনন্দিন সব চিন্তাই ঈশ্বরের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

মানব মন সৃজনশীল, তা কোন না কোন কিছু সে সৃজন করেই যাবে। যদি তুমি সচেতনভাবে এই সৃজনশীলতাকে ঠিক পথে চালিত করে উন্নততর সৃষ্টির দিকে নিয়ে না যাও তবে তা নিম্নতর স্তরে সৃষ্টি করবে। সাধারণ লোকের এই ক্ষতিকর কাজ ও সৃজনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রকৃষ্ট উপায় হলো এই শক্তিকে উঁচু দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। দৈহিক সৃষ্টি আছে, মানসিক সৃষ্টি আছে, আবার আধ্যাত্মিক সৃষ্টি আছে। কেন উচ্চতর ও উচ্চতম সৃষ্টির দিকে তুমি যাবে না? দৈহিক স্তরে আমরা ক্রিয়া-চঞ্চল থাকতে চাই। আধ্যাত্মিক স্তরেও কেন আমরা ক্রিয়া-চঞ্চল না হব?

একটি কবিতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সন্ত-কবি রামপ্রসাদ গেয়েছেন ঃ

**মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।**
**গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবা নিশি জপ করে॥**
**শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,**
**আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে॥**
**যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে।**
**কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥**
**আনন্দে প্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্ব ঘটে।**
**নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥**

এই সুন্দর গানটির অন্তর্নিহিত ভাব হলো সচেতনভাবে প্রত্যেকটি কাজকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করা।

## ধর্ম সম্বন্ধে অতি গোঁড়া হয়ো না

পাশ্চাত্য দেশে অনেকেই চরম তত্ত্বের ধ্যানে মগ্ন হতে চায়। তাদের বোঝানো শক্ত যে নিরাকারের ধ্যানে পৌছবার সোপান হিসাবে ঈশ্বরের সাকার রূপের ধ্যান প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা হলো ঃ যে ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্ব

১১ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৫-৩২৮ দ্রঃ

নির্বিচারে তাদের সকলের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে তারা আকৃষ্ট হতে পারছে না। তাদের পছন্দ মতো অন্য কোন ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্বের ওপর ধ্যান করতে বললে তারা আনন্দে তা করবে, এ কাজ নিশ্চয়ই তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে। কিন্তু কোন এক ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্বের ওপর ধ্যান যেন আমাদের ধর্ম বিষয়ে গোঁড়ামিতে পর্যবসিত না হয়। সকল পবিত্র ব্যক্তিত্বই পরমাত্মার এক একটি বিশেষ অভিব্যক্তি এটি বোঝবার মতো উদার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের থাকা উচিত।

ধর্ম বিষয়ে বা মতবাদ সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সত্য সম্বন্ধে একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই হয়ে থাকে। আমরা মাত্র একটা স্তরে উঠেই সেখান থেকে সত্যের একটি রূপ দেখে, যারা সত্যের অন্য একটি একদেশদর্শী রূপমাত্র দেখেছে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হই। আমরা ভুলে যাই যে আমরা যা জানি তা সত্যের নানা রূপগুলির মধ্যে একটি রূপ মাত্র। এই একদেশদর্শী রূপগুলি সচেতনতার কোন একটি স্তর থেকে সত্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়। জ্ঞানাতীত নিরপেক্ষ স্তরে উঠলেই সত্যের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি হতে পারে, তখনই আমরা প্রত্যেকটি একদেশদর্শী রূপের যথাযথ স্থান নির্ণয় করতে পারি।

আদিকাল থেকেই ভারত এই নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে, তাই এখানে ধর্মের নামে নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি তত বেশি হয়নি। ভারতে—আধ্যাত্মিক জীবনকে ছকে বাঁধা ও কেবল একজন অবতারকেই সত্য বলে ঘোষণা করার মতো ভুল করা হয়নি। পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক মরণের কারণ হলো ধর্মমতের সঙ্কীর্ণতা।

আমরা যখন যীশুখ্রীস্টের উপাসনা করি, তখন আমাদের খ্রীস্ট-চেতনা জাগে। যখন আমরা কৃষ্ণের উপাসনা করি, তখন আমাদের কৃষ্ণ-চেতনা জাগে। যখন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উপাসনা করি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-চেতনা জাগে। এর প্রত্যেকটিই আমাদের জ্ঞানাতীত নিরপেক্ষ-চেতনায় পৌঁছে দিতে পারে, কারণ এই সব মহাত্মারা সেই জ্ঞানাতীত নিরপেক্ষ অবস্থার সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা উপলব্ধি করেছিলেন। প্রত্যেকটি অবতার যেন সেই জ্ঞানাতীত নিরপেক্ষ অবস্থার দ্বার-স্বরূপ হয়ে কাজ করে থাকেন। যদি খ্রীস্ট-রূপ আমায় প্রেরণা না দেয়, তবে আমি খ্রীস্টের উপাসনায় উপকৃত হব না, আমার সমস্ত আধ্যাত্মিক জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি নিশ্চয়ই সেই মহৎব্যক্তিকে অনুসরণ করব—যাঁর সঙ্গে আমার মানসিক প্রবণতার সাযুজ্য আছে, যিনি আমাকে আমার আদর্শ অনুযায়ী তৃপ্তি দিতে পারেন। যে ব্যক্তির খ্রীস্টকে অনুসরণ করা উচিত, তাকে বুদ্ধকে কিংবা কৃষ্ণকে উপাসনা করার কথা বলা উচিত হবে না, তাহলে তার অধ্যাত্ম জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ধর্ম বিষয়ে যারা গোঁড়া তারা সাধারণত এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে না। নিজে

অন্ধ হয়ে অন্য ব্যক্তিকেও তারা অন্ধ করে রাখতে চায়। জগতের মহান অবতার পুরুষগণ ও পয়গম্বরগণ সকলেই একই ঈশ্বর তত্ত্বের ভিন্ন প্রকাশ। সকলের জন্য কেবলমাত্র একজন ত্রাতা আছেন এমন নয়। সকলের ওপর একই ত্রাতাকে চাপিয়ে দেওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর মনোভাব।

কেবল অবতার উপাসনার ক্ষেত্রেই যে গোঁড়ামি রয়েছে, তা নয়। এমনকি অদ্বৈতবাদীও গোঁড়া হতে পারে। দেব, দেবী ও অবতারাদি মায়ার সৃষ্টি, অতএব ভ্রান্তিমাত্র—প্রতিজনে একথা প্রচার করাও নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত। অদ্বৈতবাদীদেরও সর্বভূতে ঈশ্বরীয় প্রকাশ উপলব্ধি করতে হবে। অনেকের কাছে *নির্গুণ* ব্রহ্মের গুরুত্ব *সগুণ* ব্রহ্মের মতোই। জ্ঞানাতীত নিরপেক্ষ তত্ত্বে পৌঁছবার পথ—তাঁর সর্বভূতে পরিব্যাপ্তির ভাবের মাধ্যমেই রয়েছে। প্রথমে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে—পরে অন্যের অন্তরে—পরিশেষে আমাদের নাম-রূপের অতীত হয়ে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি মিথ্যা হতে পারে একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রে যাঁরা সেই চরম নিরপেক্ষ তত্ত্বে পৌঁছেছেন—অন্যের ক্ষেত্রে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বব্যাপক অনুভূতিতে সমস্ত নাম-রূপের অতীত অনন্ত চৈতন্যই অভিব্যক্ত হন—সকল জীব রূপে, সর্ব জীবের ও বিশ্বের নিয়ন্তা ঈশ্বর রূপে। তিনিই আবার অভিব্যক্ত হন দেব-দেবীরূপে এবং ঈশ্বরাবতার রূপেও।

অনন্ত চৈতন্য মনের ধারণার বাইরে, *অবাঙ্‌মনসগোচরম্*। সেটি উপলব্ধি করতে হলে সাধককে অভিব্যক্ত জগৎ থেকে আরম্ভ করতে হবে, কোন পবিত্র রূপ ও পবিত্র নামকে অবলম্বন করে এগুতে হবে। ঐ পবিত্র রূপ পরম চৈতন্যেরই এক বিশেষ অভিব্যক্তি। এইটিই আমাদেরকে ধীরে ধীরে তাঁর কাছে নিয়ে যায়। পবিত্র নামটিও অনন্ত চৈতন্যের এক বিশেষ অভিব্যক্তি। ঠিক যেমন সাকার আমাদের নিরাকারে নিয়ে যায়, নামও আমাদের নামহীনের কাছে নিয়ে যায়।

আমাদের মতো সাধারণ অধ্যাত্ম অনুসন্ধানীর পক্ষে ঝামেলা হলো, আমরা নিজের পছন্দ মতো ব্যক্তি-রূপটিকে ধরে থাকতে চাই—তা সে নর-রূপ হোক বা নারী রূপই হোক এবং অনুগত থাকতে চাই একটি পবিত্র দিব্যরূপেতে, তা সে পুরুষ দেবতাই হোক আর স্ত্রী-দেবতাই হোক। আর এই স্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থান থেকে আমরা নড়তে চাই না। প্রথমেই নিজেদের ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই জড়বাদী ধারণা থেকে আমাদের সরিয়ে আনতে না পারলে, প্রকৃত অর্থে অগ্রগতি যাকে বলে, তা আমরা করতে পারব না। আমি এ কথা বলি না যে, তোমার নিজেকে একজন ভক্ত এবং কোন বিশেষ দেব-দেবীর পূজারী রূপে চিন্তা করাটা খারাপ। অবশ্যই এ

চিন্তা খুব ভাল ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু তোমার একথা ভাবা ঠিক হবে না যে, এইটিই উচ্চতম অবস্থা।

যদিও বর্তমান অবস্থায় আমরা অনন্ত চৈতন্যের ধ্যান করতে পারি না, তবু আমরা কিছু *ভাবনা* বা কল্পনা করতে পারি। সচরাচর আমরা ভাবি আমাদের নিজের রূপটি সম্পূর্ণ সত্য, আমাদের ব্যক্তিত্বও সম্পূর্ণ সত্য। আসুন, প্রথমে আমরা চিন্তা করি যে আমরা দেহ-মন থেকে পৃথক পৃথক এক একটি জীবাত্মা। তারপর নিজ আত্মাকে একটি আলোক-বিন্দু ভাবি, যা ঈশ্বরের অনন্ত আলোকের অংশ। দৃঢ় নিশ্চয় করে ভাব—তোমার আত্মার পেছনে এক আলোর সমুদ্র রয়েছে, যা তাকে ভাসিয়ে রেখেছে। এতেই ডুবিয়ে দাও তোমার দেহ-মনকে। অন্তত এই *ভাবনাটুকুই* করা যাক—এতে আমরা যে ধরনের উপাসনা করে থাকি তার জড়ভাবকে খর্ব করা যাবে।

আধ্যাত্মিক অনুশীলন আরম্ভ করার সময়, আমরা যদি মনে রাখি যে আমরা এক একটি জীবাত্মা, তাতে সব সময় আমাদের উপকার হবে। প্রত্যেকটি জীবাত্মা একটি করে মানসিক বা মনোময় শরীর ও ভৌতিক বা অন্নময় শরীর ধারণ করে, জীবন নাটকে অংশ নেবার জন্য। জীবন নাটকটি ভাল করেই অভিনীত করতে হবে। আমরা যেন মনে না করি যে জীবন-নাটক বলতে কেবল সংসার জীবন বোঝাচ্ছে। এটি, চিন্তা-জগতে ও চৈতন্য-জগতে যে নাটক অভিনয় করতে হবে, তাও বটে।

## ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক প্রেম

আমরা প্রত্যেকেই নিজের চারধারে এক চিন্তাজগৎ গড়ে তুলেছি, এইটিই আমাদের সীমানা। আমার রূপ কিভাবে এল? আমার ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি কিভাবে হলো? এভাবে চিন্তা করলে, আমরা পাই আমাদের 'আমি'টি ধীরে ধীরে নিরাকার সত্তায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন মহান অবতার পুরুষগণের জীবন আলোচনা করি, তখন দেখি—তাঁরা সকলেই পরম চৈতন্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা উপলব্ধি করেছিলেন।

আমরা যখন তাঁদের চেতনার সংস্পর্শে আসি আমরাও আমাদের সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত হই। আমাদের সীমিত অস্তিত্বের বন্ধন বিস্ফোরিত হয়, আর আমরাও সেই বিশ্ব-চেতনার অনুভূতি লাভ করি। আমরা বুদ্বুদের মতো, কিন্তু মহান অবতার-পুরুষগণ পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গের মতো, সদা নিজের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন, সদা মহাসমুদ্রের গতির সংস্পর্শে বিদ্যমান। আমাদের চেতনা অশুদ্ধ ও সীমিত। তাঁদের

চেতনা শুদ্ধ ও অসীম। ব্যক্তিত্ব তত্ত্বে বিলীন হতে পারে, কিন্তু সমগ্র তত্ত্ব কখনই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের সীমিত অহংবোধের পেছনে রয়েছে অখণ্ড *সৎ-চিৎ-আনন্দ*। ভাবের তীব্রতার মাধ্যমে আমরা বিশ্ব-মনে এমন আলোড়ন তুলতে পারি, যা থেকে এক জ্যোতির্ময় ঈশ্বরীয় রূপের আবির্ভাব হয়। কিংবা, ঐ রূপের আবির্ভাব যদি নাও হয়, আমরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি।

যদি তুমি একটি দীঘিতে পাথর ছুঁড়ে ফেল, তার প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে তরঙ্গের আকারে, কিন্তু এর জন্য তোমাকে দীঘি তৈরি করতে হবে না। জল রয়েছে, কেবল পাথর ফেলাতেই আলোড়ন সৃষ্ট হয়ে তরঙ্গ উঠে পড়ে। সেই ভাবেই, বিশ্ব-চেতনা বরাবরই রয়েছে; যখন তুমি একাগ্রভাবে প্রার্থনা কর---তাতেই আলোড়ন সৃষ্ট হয়—ফলে নিরাকার থেকেই ঈশ্বরীয় রূপের আবির্ভাব হয়। কিন্তু প্রেমের প্রগাঢ়তা থাকা চাই। অধ্যাত্ম সাধকের জীবনে তীব্র একাগ্রতা হলো সেরা গুণগুলির একটি। আত্মানুভূতির জন্য তীব্র আকুতির ফলেই ঈশ্বর-কৃপার উদ্রেক হয়ে থাকে। এই হলো প্রকৃত *ভক্তি*।

সাধক অধ্যাত্মজীবনে যত অগ্রসর হয়, সে দেখে নিরাকার থেকে যে সাকার রূপের আবির্ভাব হয় তাই আবার নিরাকারে লীন হয়ে যায়, ব্যক্তি ঈশ্বরে প্রেম নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানাতীত নিরপেক্ষ তত্ত্বের প্রতি প্রেমে—পর্যবসিত হয়। প্রকৃত ভক্ত সবই ঠিক ঠিক দেখে। সে জানে, সাকার নিরাকার বা ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক সেই এক চরম সত্যেরই দুটি দিক। সাংসারিক আসক্তির বন্ধনের ওপরে ওঠায়, তার সম্পূর্ণ মন ও হৃদয় ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হয়। নানা অভিব্যক্তির মধ্যে বিরাজিত ঈশ্বরকে সে ভালবাসে। এই ভালবাসার কোন সীমা নেই।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

# আত্ম-সমর্পণ

## ঈশ্বরীয় দিব্যশক্তি

আধ্যাত্মিক জীবন কেবল সবলের জন্য। তবে এ বল—এ শক্তি—কেবল দৈহিক শক্তি নয়, মনের শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তিও বটে। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে ও সংযম অভ্যাসের ফলে মানুষ অন্তরে প্রচণ্ড শক্তি লাভ করে। কিন্তু এ ছাড়া আর একটি শক্তি আছে যা হলো ঐশী শক্তি। প্রকৃত ভক্ত অনুভব করে যে, সে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নির্ভয় আশ্রয়ে রয়েছে, আর তার বোধ হয় যে, সে অনন্ত শক্তির আধার। মধ্যযুগের এক মহান উত্তর ভারতীয় সন্ত সুরদাস গেয়েছিলেন ঃ 'বৃন্দাবনের সেই দিব্য-কিশোরটির কৃপায় আমি বুঝেছি রামই দুর্বলের শক্তি।'

ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণই এক উচ্চ *সাধনা*। লোকে যতটা সহজ মনে করে এ সাধনা ততটা সহজ অবশ্য নয়। সাধারণত মানুষে যা করতে পারে তা হলো দিনের বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা, আর তাঁর শরণাগত হওয়া এবং বারবার নিজ দেহ, মন ও আত্মাকে *ইষ্টদেবতার* চরণে নিবেদন করা।

'ভগবদ্গীতায়' শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ঃ

> **ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।**
> **ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥**
> **তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।**
> **তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥**
> **ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।**
> **বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥**[১]

—প্রভু সর্বজীবের হৃদয়ে থাকেন এবং নিজ মায়ার সাহায্যে যেন যন্ত্রে বসিয়ে জীবকে ঘুরপাক খাওয়ান। (পুতুল নাচের খেলোয়াড় যেমন পুতুলগুলিকে নাচায়।) সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় নাও, তাঁর কৃপায় তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান লাভ করবে। এই ভাবে আমি তোমাকে গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ দিলাম। তুমি এ বিষয়ে পুরোপুরি বিবেচনা করে তোমার ইচ্ছামতো কাজ কর।

---

১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ ৬১-৬৩

যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে সরে যাই, তখন আমরা বেশি স্বার্থ-কেন্দ্রিক হয়ে যাই ও উচ্চতর পথ থেকে আমাদের অধোগতি হয়। স্বার্থপর না হয়ে, আমরা যেন ঈশ্বরের শরণ লই এবং তাঁকেই আমাদের চেতনার কেন্দ্র বিন্দু করি। তখনই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সহজ হয়ে যায়। মন যখন নিচের দিকে যেতে চায় তখন আমাদের তীব্র প্রার্থনায় মনোনিবেশ করা উচিত। তখনই দেখব কোন শক্তি যেন এসে আমাদের ওপরে উঠিয়ে দিচ্ছে।

## অনিশ্চয়তার আশীর্বাদ

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে খুব একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা ভাল। তুমি যার যার ওপর নির্ভর কর সেগুলিকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, তুমি জাগতিক সব সহায়তা থেকে যদি বঞ্চিত হও, তাতে তোমার মঙ্গল হবার সম্ভাবনাই বেশি। যদি সব অতীত মূল্যবোধ, বন্ধুত্ব, আসক্তি ভেঙে যায়, আর দেখ যে তুমি যে সব জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে ছিলে, সে সবই শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তবে তা তোমার মঙ্গলেরই চিহ্ন। সব রকম বাহ্য সান্ত্বনা, অন্যের কাছ থেকে সব আশ্বাস যদি চূর্ণ হয়ে যায়, তাও মঙ্গল। কারণ তখনই তুমি বাধ্য হবে ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরাতে, যিনি আমাদের শাশ্বত ও একমাত্র প্রকৃত বন্ধু ও পথ প্রদর্শক।

এ অভিজ্ঞতা খুবই কষ্টদায়ক, কিন্তু অনেকের পক্ষে এটি খুবই প্রয়োজনীয়। তা না হলে তারা ঈশ্বরকে এবং তাদের নিজ আধ্যাত্মিক নিয়তিকে বিস্মৃত হয়ে যায়। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ কিছুই জান না। তুমি অনিত্য বস্তুর ওপর নির্ভর করতে পার না। কিন্তু লোকে তাই করে। অনেক সময় রোগের থেকে তা সারাবার ব্যবস্থা বেশি কষ্টদায়ক, কিন্তু তা সহ্য করতেই হবে। রোগ যত কঠিন, তার চিকিৎসাও তত কঠিন। পাশ্চাত্যে 'কামিনী-কাঞ্চন'—রোগই অতীব তীব্র। তাই এর জন্য চাই জোরালো ইন্‌জেক্সন ও ওষুধ। সব রোগের ক্ষেত্রে নিরাময়েই সমস্যা দেখা দেয়, আর এটাই হলো সম্পূর্ণ নিরাময় হবার দিকে একটি পদক্ষেপ।

কখনো কখনো আমি প্রার্থনা করি, 'প্রভু, ভক্তদের দুঃখ দাও, বিপদ দাও'— যাতে তারা দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়ে সম্বিৎ ফিরে পায়। মায়ার এতই শক্তি যে লোকে পূর্ব দুঃখ সব ভুলে গিয়ে সেই পুরান পথেই চলে। প্রতিনিয়ত ঈশ্বরকে স্মরণ করানর জন্য কিছু ব্যবস্থার দরকার।

সব দুঃখই আমাদের শিক্ষার জন্য। আমাদের স্বভাবজ প্রবণতাগুলিকে সংযত রাখতে হবে, আধ্যাত্মিক সাধনার আগুনে পোড়াতে হবে। যখন লোহার শলাকা বেঁকে যায়, তাকে সোজা করতে হাতুড়ি পেটার দরকার। অহমিকা আমাদের ভুলিয়ে

রাখে যে, হাতুড়ি আর নেয়াই-এর মাঝে আমাদের সন্তর্পণে ধরে রাখা হয়েছে। তাই যখন হাতুড়ি পড়ে, আমরা হঠাৎ সরে এসে চিৎকার করি, 'ওঃ! আমাদের কি হলো!' প্রথমেই বলা যেতে পারে, 'কে তোমাকে ওখানে ঢুকতে বলেছিল?'

এ দুঃখ কেবল স্থূল স্তরেই থাকবে এমন নয়। আধ্যাত্মিক সাধকের জীবনেও মাঝে মাঝে খরা আসতে পারে, যখন সে আগের মতো আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ অনুভব করে না, যখন সে দেখে যে, সে যেন 'অন্ধকার রাত্রি'তে বাস করছে। এ অভিজ্ঞতা সংসারী লোকের দুঃখের মতোই বেশ কষ্টদায়ক হতে পারে।

## অহমিকাই দুঃখের প্রধান কারণ

লোকে প্রায়ই ঈশ্বর কৃপার অনাদর করে বা সে কথা ভুলে যায়। তারা আপন শক্তির ওপর অত্যধিক আস্থা রেখে অসাবধান হয়ে পড়ে। এতে তার ঔদ্ধত্যও জাগতে পারে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে একটি মজার গল্প আছে। একদা এক মুনির আশ্রমে একটি ইঁদুর বাস করত। একদিন একটা বেড়াল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুনি তার ওপর দয়াপরবশ হয়ে তাকে বেড়ালে রূপান্তরিত করে দিল। এবার একটা কুকুর নতুন বেড়ালটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে গেল, মুনি তখন তাকে কুকুরে পরিণত করল। কুকুর বেচারা আবার নেকড়ের অত্যাচারে পড়ল; মুনি তাকে বাঘে রূপান্তরিত করল। কিন্তু যখন সে বাঘ হলো—সে মুনিকেই বধ করতে উদ্যত হলো। মুনি তখন বলল, "আচ্ছা বেশ! তুই আবার ঠিক আগের মতো ইঁদুরই হ।"

আধ্যাত্মিক সাধকের ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যাপার ঘটে। তাদের ওপর ভগবৎকৃপা বর্ষণের ফলে তারা অনেকটা শুদ্ধ হয়, তখন তারা কতকটা একাগ্রতা ও স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এতেই তারা অহমিকাপূর্ণ হয়ে নিজেদের অর্জিত সাফল্যকে খুব বড় করে দেখে অসাবধান হয়ে পড়ে ও সংসারের নিন্দা ও তার সংস্কার করতে পর্যন্ত অগ্রসর হন। তখন একদিন যখন হঠাৎ ঈশ্বর-কৃপার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়, তারা ভীষণ শূন্যতার মুখোমুখি হয়ে পড়ে নিজেদের নিঃসঙ্গ বোধ করে।

আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে, যারা যথার্থত এবং সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক পথে চলে, তারা কম অহংকেন্দ্রিক ও বেশি স্বার্থত্যাগী, দয়াপ্রবণ ও অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। আমাদের দাতা হতে হবে, ভিখারি নয়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই ভিখারি, তারা অন্যের কাছে বহু জিনিস চায়, তবু তারা অহমিকাপূর্ণ। অহংবোধ যত কম হয়, সুখ ও শান্তি তত বেশি হয়। আর আমাদের কাজও তত সুষ্ঠু হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের আশীর্বাদকে তুমি খাট করে দেখো না। সব সময়ে নিজ দুর্বলতা ও পূর্ব ভুলভ্রান্তি নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না, বরং মনকে সদা জাগ্রত রাখার অভ্যাস কর। ভক্তিপথেও অনুক্ষণ বিচার করা অবশ্য কর্তব্য। ঈশ্বর আমাদের ওপর যে আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন তা থেকে উপকৃত হতে হলে মনকে সদা জাগ্রত রাখতেই হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন, 'তুমি যদি ঈশ্বরের দিকে এক পা বাড়াও, তবে তিনি তোমার দিকে দশ পা এগিয়ে আসেন।'

## দুঃখ ভোগকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর

প্রকৃত ভক্ত ঈশ্বরের কাছে টাকা কড়ি বা বিষয় চায় না। তারা দুঃখ কষ্টের অবসানও প্রার্থনা করে না। তারা চায় দুঃখ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে ঃ

**তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।**
**তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস সহিবারে দাও ভকতি।**
**আমি তাই চাই ভরিয়া পরান দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,**
**তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।**
**দুখ হবে মোর মাথার মাণিক, সাথে যদি দাও ভকতি।**
**যত দিতে চাও কাজ দিয়ো, যদি তোমারে না দাও ভুলিতে—**
**অন্তর যদি জড়াতে না দাও জালজঞ্জালগুলিতে।**
**বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে, মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,**
**ধূলায় রাখিয়ো পবিত্র করে তোমার চরণধূলিতে।**
**ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ো না ভুলিতে।**[২]

আবার শ্রীকৃষ্ণের কাছে কুন্তীর সেই সুন্দর প্রার্থনাটি ঃ হে জগদ্‌গুরু! সব দিক থেকেই আমাদের বিপদ আসুক, কারণ তা হলেই আমরা তোমার দর্শন পেয়ে থাকি—যে দর্শন পেলে পুনর্জন্মচক্রের অবসান হয়।[৩]

যেহেতু, যে ভাবেই হোক অসুখকর অভিজ্ঞতা আমাদের হবেই, সেগুলিকে উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারলেই ভাল। দুঃখ, কষ্ট, মর্যাদাহানি কোন না কোন আকারে জীবনে এসে থাকে, তা কেউ এড়াতে পারে না। যেমন আসে আসুক, তারা যেন আমাদের উচ্চতর উদ্দেশ্যের দিকে প্রেরিত করে। আমরা যেন সেগুলিকে দিব্যজীবনে উত্তরণের খাপ হিসাবে ব্যবহার করি। এর অর্থ এই নয় যে, কোন কোন লোকের মতো, স্বাভাবিক জীবনধারার বাইরে

২ দ্রঃ নৈবেদ্য-২০, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬৮-৬৯ (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩৬৮)

৩ বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো। ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভবদর্শনম্।। *ভাগবত*, ১/৮/২৫

গিয়ে দুঃখ কষ্টের সন্ধান করতে হবে। আমাদের দুঃখও চাইতে হবে না, সুখও চাইতে হবে না, চাইতে হবে একমাত্র ঈশ্বরকে যিনি এ দুয়ের পারে।

ঈশ্বর কৃপায় আমাদের যে সবরকম দৈহিক দুঃখ শোক দূর হবেই, এমন নয়; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা লাভ করলে, জীবনের অগ্নি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারব—আর একাজে আমাদের ভেতর যে আবর্জনা আছে, তাও পুড়ে যাবে। এতে বৃদ্ধি পাবে আমাদের আন্তরিক পবিত্রতা ও শরণাগতির মনোভাব। আমাদের দুঃখ কষ্ট আশীর্বাদ হয়ে উঠবে যদি সেগুলি আমাদের কাছে শুদ্ধ জ্ঞান ও অচলা ভক্তি এনে দেয়। আমি জীবনকে যতই দেখি, ততই বুঝি যে ঈশ্বরকৃপা বলতে কেবলই দুঃখকষ্ট দূর হওয়া নয়। কিন্তু ঈশ্বর কৃপা ভক্তের অন্তরে এক অদ্ভুত সমতা ও শক্তি এনে দিয়ে তাকে সব রকম সমস্যা ও বাধার মুখোমুখি হবার উপযুক্ত করে, তাকে পবিত্রতর করে ও ঈশ্বরের অস্তিত্ববোধে সমর্থ করে—যা তীব্রতম দুঃখ যন্ত্রণার মাঝেও তার অন্তরে শান্তি এনে দেয়। প্রকৃত শান্তি নিদ্রার মতো নয়। এ হলো মনের এমন এক শান্ত অবস্থা, যা তোমাকে দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তির মাঝে অবিচলিত থাকতে, আর এক বিরাটতর সত্যের সংস্পর্শে আসতে সহায়তা করে। যারা জীবনের বাধা-বিপত্তি থেকে দূরে পালায়, তারা নিজেদের দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে ফেলে। যারা সব সময় সুখ খোঁজে, আর কর্তব্য কর্ম এড়িয়ে চলে—তাদের জীবনের উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। তারা কখনো আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় পৌঁছুতে পারে না—আর ঈশ্বর তাদের ওপর যে কৃপা বর্ষণে সদা উন্মুখ তারও সুযোগ তারা নিতে পারে না।

যে কৃপা আমরা আগেই লাভ করেছি, আমরা যেন তার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করি। সময়-সুবিধার অভাবের অনুযোগ না করে, যে সময় ও সুবিধা আমরা পেয়েছি তার সর্বোত্তম ব্যবহারে আমরা যেন মনোযোগ দিই—শরণাগতির মনোভাব নিয়ে—আমরা যেন ঈশ্বর উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। তুচ্ছ পার্থিব বস্তু কেবল ঈশ্বরকে ও আমাদের আধ্যাত্মিক নিয়তিকে ভুলিয়ে দেয়, তাই তা লাভের চেষ্টা না করে—আমাদের উচিত হবে আরো ঈশ্বরকৃপা ও আরো ঈশ্বরপ্রেম লাভে মনোযোগ দেওয়া।

ঈশ্বরের দিকে দ্রুত অগ্রগতির মনোভাব আমাদের সব সময়েই থাকা উচিত।

## কর্ম ও ভগবৎ কৃপা

দুঃখ যন্ত্রণার মাধ্যমেই কতকগুলি বিশেষ ধরনের *কর্ম* করতে হয়। তাই দুঃখ যন্ত্রণা এলে আমাদের কিছুটা অব্যাহতি বোধ করা উচিত, কারণ দুঃখ যন্ত্রণাই ইঙ্গিত করে যে কতক *কর্মের* বোঝা কমে গেল। তা ছাড়া, দুঃখ যন্ত্রণা ভোগে যে অসহায়

ভাব আসে, তাকে আধ্যাত্মিকতার দিকে কাজে লাগিয়ে, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ভাব অভ্যাসে আরো বেশি মন দিয়ে। দুঃখে-সুখে, জীবনে-মরণে, প্রভুই আমাদের আপন জন। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের প্রাণের প্রাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, রোগ ভোগ হলো শরীরে বাস করার জন্য আমাদের ট্যাক্স দেওয়ার মতো।[৪] কখনো কখনো এই ট্যাক্সের দাখিলা আমাদের বেশি পরিমাণে করতে হয়। আবার কখনো রেহাই পাওয়া যায়। তাঁর শেষ অসুখের সময় প্রভুকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত, 'শরীর যন্ত্রণা ভোগ করুক, ও আমার মন! তুমি আনন্দে থাক।'[৫]

বেশি তাড়াহুড়ো করার চেষ্টা না করে এগিয়ে চল। যদি তাড়াহুড়ো কর, তবে তোমাকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সমেত খেসারৎ দিতে হবে। নিশ্চয়ই, ঈশ্বরানুভূতিই আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু এ উদ্দেশ্যে পৌঁছুতে হবে কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে নয়, তার সঙ্গে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপও চাই। তবে যে কোন উপায়ে অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয় কাজ কর্ম বর্জনের চেষ্টা আমাদের করতে হবে। অতএব অন্তরের আদর্শ আর বাইরের কাজ দুটি ব্যাপারেই আমরা যেন সতর্ক থাকি। তোমার *কর্ম*-ক্ষয়ের মাধ্যমে ধীরে একনিষ্ঠভাবে এগিয়ে চল। অন্তর্যামী ঈশ্বরের সুরে সুর বাঁধ, আর সেই সঙ্গে তোমার কাজের বিষয়ে সজাগ থাক। চিন্তা ও কর্ম দুই স্তরেই ভুল সংশোধন করা সব সময়েই আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

অধিকাংশ লোকের দুঃখের কারণ হলো, তাদের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, আর তাদের সংসার জীবনে যে কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে সঙ্গতির অভাব। দুঃখ যন্ত্রণার নিজস্ব কোন দোষ নেই। এমনকি তা কারো কারো পক্ষে ভালও হতে পারে, যদি অন্তরে আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য লাভে তা প্রেরণা যোগায়। সে ব্যক্তি তখন ক্রমে ক্রমে অনুভব করতে থাকে—এ জগতে বাস করতে হলেও সে প্রকৃতপক্ষে এ জগতের মানুষ নয়।

একদিক থেকে, আমরা যা পাবার যোগ্য তাই পেয়ে থাকি। আমরা কোন জিনিস চাইলে তা পাই, তবে তার সঙ্গে যে ভাল-মন্দ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তাও পাই। আমরা এক রকমের সুখ খুঁজি, আর স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেন—'দুঃখের রাজমুকুট মাথায় পরে সুখ মানুষের সামনে হাজির হয়।'[৬] আমরা একটাকে ছেড়ে অন্যটা নিতে পারি না। আমরা কোন জাগতিক বাসনা পূরণের ইচ্ছা করি। আমরা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেতেও পারি, কিন্তু তার সঙ্গে জড়িত ঝামেলাগুলিও আমরা পাব। আমাদের বর্তমান অবস্থা হলো আমাদের অতীত ও বর্তমান বাসনাগুলির ফল।

---

৪ Sayings of Sri Ramakrishna. (Madras Ramakrishna Math. 1975) p.133

৫ Life of Sri Ramakrishna [Kolkata : Advaita Ashrama 1974] p. 489

৬ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১

আমরা যেন যতটা সম্ভব বাসনাশূন্য হতে শিক্ষা করি—তবেই যেসব পরিস্থিতি আমরা সৃষ্টি করেছি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলতে পারব ও পরে সে সবের ওপরে উঠতে পারব। আমরা যেন আমাদের অদৃষ্টকে মুছে ফেলে *কর্ম* নির্ধারণ করার জন্য আরো বেশি বেশি ঈশ্বর-নির্ভর হতে শিখি। জগৎ তখন আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠবে, আর এরই মাধ্যমে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে পৌঁছে যাব। তখন বাহ্যত সংসারে থাকলেও, আমরা আর সংসারের মানুষ হয়ে থাকব না; যেখানেই থাকি আমরা তখন ঈশ্বরের সন্তান।

## জগন্মাতার লীলা

সব কিছুই জগন্মাতার লীলা খেলা। তিনি বহুরূপে আমাদের সামনে আসেন—গুরু-শিষ্য রূপে, মিত্র-শত্রু রূপে। তাই আমরাও যেন আমাদের অংশটুকু ভাল করে খেলি, আর একই সঙ্গে আসক্তিশূন্য হয়ে আমাদের এই খেলার দর্শকও হয়ে থাকি।

আমাদের চারিদিকে যা দেখি, আমাদের যা কিছু হয়, সবই হলো তাঁর খেলার, তাঁর *লীলার*, তাঁর আনন্দের প্রকাশ। ভক্ত যখন দেখে তিনি তাঁর কৌতুকে মেতেছেন, মানুষের হৃদয় নিয়ে খেলছেন—দুঃখ সুখ সৃষ্টি করছেন, তখন সে বলে ফেলে, 'পাগলি মেয়ে, তুই কি করছিস?' কখনো কখনো সমস্ত সৃষ্টির কাজে কোন ছন্দ বা কারণ আমরা খুঁজে পাই না, কিন্তু পাগলামি, নৃশংসতা, দুঃখ, সুখ নিয়ে সৃষ্টির সমস্ত কাজই মায়ের মস্ত কৌতুক-ভাবের, তাঁর লীলা-জনিত আনন্দের প্রকাশ। আমাদেরও উচিত তাঁর লীলাকে খেলাভাবে নিয়ে সেই খেলায় অভিনেতার মতো অভিনয় করে যাওয়া, কিন্তু জানব যে আসলে এতে আমাদের কিছু করার নেই, এ সবই হলো তাঁরই খেলায় বিরাট মজার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে গান গাইতেন (সেগুলি প্রায় সবই রামপ্রসাদ ও বাংলার অন্যান্য সাধক-কবির রচিত) তার প্রায় সবই মহাজাগতিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতীকী চিত্রকল্প। সংসারী লোক অমার্জিত মনে সেগুলিকে অশুদ্ধভাবেই নেয়, কাজেই তারা এর সম্পূর্ণ গভীর তাৎপর্য বোঝে না। গানে এই সব প্রতীকের ব্যবহার সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার এবং কথার মাধ্যমে সত্যকে যতদূর প্রকাশ করা যায় তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। জগন্মাতার ঘুড়ি ওড়ানোর গানটি শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। আমরা সবাই যেন ঘুড়ি আর জগন্মাতা আমাদের আকাশে ওড়াচ্ছেন, আর যাতে পালাতে না পারি তাই আমরা একটা একটা আলাদা সুতো দিয়ে বাঁধা হয়ে আছি। কিন্তু কোন কোন ঘুড়ি খুব সেয়ানা—তারা সুতো কেটে বেরিয়ে দূরে চলে যায় আর ফেরে না; আর তখন মা আনন্দোল্লাসে আত্মহারা হয়ে হাততালি

দেন, যদিও তিনি নিজেই ঘুড়িগুলোকে সুতোয় বেঁধে রেখেছিলেন।[৭] তাই আমাদের কাজ হবে, মায়ের খেলার জন্য এই জগৎপ্রপঞ্চের সঙ্গে আমরা যে সুতো দিয়ে বাঁধা আছি তাকে কেটে দেওয়া। তখনই আমরা মুক্ত হব, আর মা আমাদের মুক্তিতে আনন্দ করবেন। অন্যথায় খেলা অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতে থাকবে—আর তার সঙ্গে অনন্তকাল ধরে চলবে হর্ষ-বিষাদ, সাফল্য-নৈরাশ্যের পালা—এ সবই জগজ্জননীর দিক থেকে যেন মত্ত কৌতুকের বিরাট এক পর্ব, আর আমাদের দিক থেকে যেন অপরিসীম এক ভয় যন্ত্রণা ও বন্ধনের কালচক্র।

তোমার নিজের তুচ্ছ স্বতন্ত্র বাসনাকে একেবারে সরিয়ে দিয়ে, তোমাকেও মার মত্ত নাচনের সঙ্গে মহা উল্লাসে নাচতেই হবে। মজাটা হলো এই যে, যখন নানা উদ্দীপনা আমাদের মনে ওঠে, আমরা মনে করি সে সব আমাদের ভেতর থেকেই উঠছে, তারা বুঝি আমাদেরই উদ্দীপনা, তারা আমাদের বাসনারই অন্তর্গত। আমরা স্বীয় দাসত্বের প্রকৃতরূপটি বুঝিও না। আমাদের যখন এই বিরাট সৃষ্টির নাচে অংশ নিতে হবে, তখন জানা উচিত যে এসব খেলামাত্র, খেলা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়, আর আমরা হলাম এ সবের ভেতরে থেকে কোন রকম একাত্মবোধ-বর্জিত দর্শক মাত্র। আমাদের তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যও সৃষ্টি প্রপঞ্চের একটি প্রকাশ মাত্র; কিন্তু আমরা সেই সৃষ্টিতত্ত্ব, সেই জগজ্জননী, যিনি নাচ আরম্ভ করে নাচিয়ে চলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছেদ করে নিজেদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলি।

দেখ, ফুটন্তজলে আলু সিদ্ধ করার সময়, আলুগুলোও খুবই হাস্যকরভাবে নাচতে থাকে—ডেকচির ভেতরে; আমরা যেন এই আলুর মতো। তাদের যদি চিন্তাশক্তি থাকত, তারাও হয়তো ভাবত যে তারা নিজের ইচ্ছাতেই নাচছে, তাদের কেউ নাচাচ্ছে না। তোমাদের এই সত্যটি পুরোপুরি বুঝতে হবে। এ ধারণায় প্রতিষ্ঠিত থাকলে ঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে।

## ঈশ্বরের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হও

যখন তুমি মহাজাগতিক-সত্তার সঙ্গে এক সুরে বাজতে পারবে, কেবল তখনই তুমি স্বাধীনতার একটু স্বাদ পাবে। অন্যথায় আমরা সাধারণত যাকে স্বাধীনতা বলি, তা কেবল পশুর স্বাধীনতা, সহজাত প্রবৃত্তির স্বাধীনতা—সহজাত প্রবৃত্তির বশ্যতা থেকে মুক্তি নয়। ইন্দ্রিয়ের কাজ, মহাজাগতিক শক্তিরই অচেতন প্রকাশ। আমরা যত বেশি ঐ ধরনের স্বাধীনতার প্রত্যাশী হব, আমরা যত বেশি অচেতন স্তরে থাকব, তত বেশি বদ্ধ হয়ে থাকব। প্রবৃত্তিমুখী জীবনযাপন না করে, সচেতন স্তরে বৌদ্ধিক স্তরে জীবন যাপন কর। প্রবৃত্তির স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা, তা মোটেই স্বাধীনতা

৭ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৮৬

নয়। এই রকম স্বাধীন লোক প্রকৃতপক্ষে তার মেজাজের, তার প্রবৃত্তির দাস। যেহেতু সমস্ত জগৎ এই রকম 'স্বাধীন' লোকে ভর্তি, তাই দিনে দিনে জগৎ মন্দ থেকে আরো মন্দ হচ্ছে। এরা সব অদ্ভুত ধরনের 'স্বাধীন' সত্তা—জগজ্জননীর মায়াশক্তির প্রভাবে পুতুল নাচের পুতুলের মতো অত্যন্ত হাস্যকরভাবে সুতোয় ঝুলছে।

অধ্যাত্ম-সাধককে ভাবতে হবে সে যেন মহাজাগতিক-শক্তির হাতে যন্ত্রস্বরূপ। নিজের সম্বন্ধে কর্তা নয়, প্রতিনিধি নয়, যন্ত্র-ভাবই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। দৃষ্টান্তস্বরূপ : ভিন্ন ভিন্ন ঘড়ি রয়েছে—সবগুলিই একই বিদ্যুৎশক্তিতে চালিত। যদি প্রত্যেকটি ঘড়ি মনে করে যে সে তার নিজ শক্তিতে চলছে, তবে ভয়ানক ভুল হবে। আমরা সকলে নিজ নিজ সত্তার মাধ্যমে ক্রিয়াশীল এক বিরাট শক্তি-প্রবাহের এক একটি অংশ বিশেষ। আমাদের সব সময়ে বিশ্ব-কেন্দ্রিক হয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ে যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক হতে চেষ্টা করা উচিত। এই দেহ-মন এক মহাতেজের যন্ত্রস্বরূপ। আমরা যতটা বিশ্ব-কেন্দ্রিক যত বেশি নৈর্ব্যক্তিক হতে পারব, কর্তৃত্ববোধ ত্যাগে আমরা ততটাই সফল হব ও শান্তি লাভ করব। আমরা ঈশ্বর থেকে যত দূরে যাব তত বেশি দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত হব।

সত্য কথা বলতে কি, এ দেহকে কি তুমি বাঁচিয়ে রেখেছ, না ঈশ্বরের যে তেজ তোমার মাধ্যমে সক্রিয় রয়েছে সেই এ কাজ করছে? বিশ্ব-তেজের সঙ্গে তোমার সক্রিয় সংযোগ রয়েছে, তোমার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। খাদ্যের তেজে দেহ যেমন পুষ্ট হয়, ঠিক তেমনি জীবাত্মা বিশ্ব-অধ্যাত্ম তেজের দ্বারা পুষ্ট হয়। এই তেজ যে মুহূর্তে সরিয়ে নেওয়া হয়, তুমি প্রাণহীন জড় পদার্থ হয়ে পড়। তোমার নিজের ওপর কোন কিছুর কর্তৃত্ব আরোপ করো না, প্রতিটি জিনিসের কর্তৃত্ব ঈশ্বরীয় তেজের ওপর আরোপ করতে শেখ। পক্ষান্তরে, সেই তেজ প্রকাশের উপযুক্ত প্রণালী হতে চেষ্টা কর। বিনয় ও শরণাগতি অভ্যাস করে নিজ অন্তরে এই সামর্থ্য গড়ে তুলতে চেষ্টা কর। কিন্তু এর জন্য নিরন্তর চেষ্টা চাই। অহমিকাই ঐ ঈশ্বরীয় তেজের সাবলীল প্রবাহকে ব্যাহত করে, আমাদের সেই ভাগবত উৎস থেকে সরিয়ে দেয়। সেজন্যই আমরা দুঃখ পাই।

প্রকৃতপক্ষে আমরা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র মাত্র। কাশ্মীরে স্বামী বিবেকানন্দের কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা কি তোমরা মনে রাখ না? মুসলমান বর্বরতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মন্দিরে বসে তিনি আপন মনে ভাবলেন, তিনি থাকলে এ কাজ কখনই হতে দিতেন না। হঠাৎ জগন্মাতার কণ্ঠস্বর শুনলেন : 'আমি তোকে রক্ষা করছি, না, তুই আমাকে রক্ষা করছিস?'[৮] স্বামীজী আত্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন তাই জগন্মাতার ঐ কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন।

---

৮ Eastern & Western Disciple, *Life of Vivekananda* (Kolkata-Advaita Ashrama, 1974) p. 598

সাধারণ লোকের নিজের স্বরকে ঈশ্বরীয় কণ্ঠধ্বনি বলে ভুল করা উচিত নয়, কারণ ঈশ্বরীয় কণ্ঠধ্বনি লোকে যত সহজে মনে করে অত সহজে শোনা যায় না। কেবল যখন আমাদের মন শুদ্ধ হয় ও আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত হয়, তখনই ঐ স্বর শোনা যায়। আমাদের সমস্ত শরীরকে অবশ্যই ঈশ্বরীয় স্পন্দনে স্পন্দিত হতে হবে তবে ঐ স্বর শোনা যাবে। আর এও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঐ স্বর যুক্তিকে লঙ্ঘন করে না, বরং ছাড়িয়ে যায়। আজকাল 'অন্তরের স্বর' শুনতে পাওয়া একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে, আর এগুলি প্রায় সবই সন্দেহজনক।

আমাদের পক্ষে যা বিশেষ প্রয়োজন তা হলো আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তাগুলিকে সচেতনভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করা। আমরা যতক্ষণ জেগে থাকি, ততক্ষণ যেন এর জন্য পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা চালাই, আর যখন শুতে যাই তখন যেন মনে করি ঈশ্বরীয় শক্তিই আমাদের সে সময়ে রক্ষা করে। আমরা সব সময়েই 'আমি', 'আমি', 'আমি', করছি ! তবে, যখন এই অদ্ভুত 'আমি' ঘুমায়, তখন কে তাকে রক্ষা করে? তখন কে এই শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে? আমাদের মুস্কিল হলো আমরা মনে করি যে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বটির একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। না, তা নয়। এটি অনন্ত সত্তারই অংশ মাত্র।

আমাদের পক্ষে ক্ষুদ্র সত্তার বা অহং-এর প্রেরণায় সাড়া দেওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি বৃহত্তর সত্তার প্রেরণায় সাড়া দেওয়াও সম্ভব। আমাদের পক্ষে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় সাড়া দেওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি তার পেছনে যে আদর্শ রয়েছে, তার প্রেরণায় সাড়া দেওয়াও সম্ভব। ঠিক যেমন একজন মানুষকে ভালবাসা যায় তেমনি ঐ আদর্শকেও ভালবাসা যায়। যদিও এ ভালবাসা মানবিক ভালবাসার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

নিরাকার নিরপেক্ষ সত্তার ধারণা অপেক্ষা তেজ বা শক্তিরূপী ঈশ্বর তোমার কাছে বেশি প্রেরণা যোগাতে পারে। কিন্তু ঐ ধারণাটিকেও ভালবাসতে শিখতে হবে ও তাতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ কাজ সহজ হবে যদি আমরা নিজেদের আত্মারূপে ভাবি, আর ঈশ্বরকে ভাবি সমষ্টি-আত্মা বা সর্ব আত্মার আত্মারূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন ঃ

**সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,**
**তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।**
**** **** **** ****
**আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরনী,**
**আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।**[৯]

---

৯ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৮৭৮

অবশ্য এটা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে ঐ গানের ভাব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থারই ইঙ্গিত করে, আর ঐ অবস্থা কেবল বহুদিনের সাধনা ও সংগ্রামের ফল। যে বাস্তবিকই কঠোর আত্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে এসেছে, কেবল সেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ও বিনা শর্তে ভগবৎ-পদে নিবেদন ও আত্ম-সমর্পণ করতে পারে। সব রকম আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা মনকে পবিত্র ও উপযুক্ত করে তোলে এই সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের জন্য—যা কার্যত কেবল তার পক্ষেই সম্ভব হয়, যে তীব্র অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সঙ্গে লেগে থেকে তার আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলি সম্পন্ন করেছে।

আত্ম-সমর্পণভাব কেবল তখনই আসে যখন আমাদের ডানাগুলি একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পের পাখিটির মতো। একটা পাখি জাহাজের মাস্তুলে বসেছিল, জানতে পারেনি যে জাহাজটি চলছে। যখন সে হঠাৎ এই অবস্থার কথা বুঝতে পারল, তখন সে তীরের খোঁজে উড়তে আরম্ভ করল—একবার পূর্বদিকে, একবার পশ্চিমদিকে, একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, কিন্তু সব দিকেই দেখল কেবল অনন্ত সমুদ্র। শেষকালে যখন ডানাগুলি একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ল সে ফিরে এসে মাস্তুলে বসল—জাহাজ যে দিকে নিয়ে যায় সে দিকেই যাবে বলে।[১০] যে আত্ম-প্রচেষ্টার শেষ পর্যায়ে গেছে, কেবল সেই জানে প্রকৃত আত্ম-সমর্পণ কাকে বলে। কেবল 'সকলি তোমারি ইচ্ছা' এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়। আত্ম-সমর্পণ হলো মনের একটি ভাব, যা মানুষ লাভ করে—স্বীয় আত্মা বিশ্বাত্মারই অংশ, নিজ দেহ-মন এক উচ্চতর শক্তির যন্ত্রমাত্র—এই চেতনার মাধ্যমে। প্রকৃত আত্ম-সমর্পণ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষানুভূতির পরেই কেবল এসে থাকে।

## কিছু প্রায়োগিক প্রস্তাবনা

নিজ জীবনের একটি প্রতিচিত্র তৈরি করতে যেও না। তার অর্থ এ নয় যে তুমি একটা মোটামুটি ছক স্থির করে রাখবে না, তোমার ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিকল্পনা কর, কিন্তু তারপর সব প্রভুর ওপর ছেড়ে দাও। তিনি তোমাকে দিয়ে যা করাতে চান, তা তাঁকে করতে দাও।

আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের জন্য আমরা যেন দৃঢ় সঙ্কল্প হই। কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি যেন আমরা ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিই। যেহেতু আমরা সব সময়ে সব কিছু পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাই না, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা ও পরিকল্পনা না করে পারি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ সব ঈশ্বরের ওপর ছাড়তে হবে। ধীরে ধীরে আমাদের শিখতে হবে ঈশ্বরের সুরে সুর বাঁধতে, তাঁর ইচ্ছাকে অনুসরণ করতে। যদি এ কাজে আমরা আন্তরিকভাবে লেগে

১০ হুদ্দে, পৃঃ ৮৫১

থাকি, আমরা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছব, যখন আমাদের সম্পূর্ণ সত্তার সুর ঈশ্বরের সুরে মিলে যাবে।

মনে রেখো, যদি কেউ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করা অভ্যাস করে, সে কিছুতেই ভুল পথে যায় না। লোকে প্রায়ই খুব সহজভাবে বলে ফেলে, 'আমি সব ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিয়েছি'—আবার এদিকে নিজের খেয়াল খুশিমতো চলে ও কাজ করে। যে মানুষ জাগতিক বস্তুতে ও নিজ বাসনায় ও সংস্কারে আসক্ত, সে কখনো আত্ম-সমর্পণের কথা ভাবতে পারে না। আমাদের সব সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যে অনাসক্তির একটা নিম্নতম মানে পৌঁছতে না পারলে আত্ম-সমর্পণ অসম্ভব। পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের জন্য সম্পূর্ণ আসক্তিহীন হতে হবে।

যে গরিব তার পক্ষে নিজ প্রয়োজনের থেকে বেশি চাওয়া উচিত নয়। যে ধনী তার পক্ষে মনে মালিকানা-ভাবের বদলে অছিভাব নিয়ে আসা উচিত। পরে ঈশ্বর যাকে যা দেন তার উৎকৃষ্ট ব্যবহার করা উচিত। এ কথা শুধু ধনসম্পদ অধিকারের ক্ষেত্রেই যে সত্য তা নয়, পরন্তু জ্ঞান ভাণ্ডার এমনকি আধ্যাত্মিক কৃপার ক্ষেত্রেও। তোমার যা আছে—সঙ্গীত প্রতিভা, কর্মদক্ষতা, বৌদ্ধিক ধ্যানধারণা, প্রেম—সে সবকেই ঈশ্বরের দান বলে মনে করে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। তোমরা প্রাচীন সুসমাচারে জব (Job)-এর গল্প জান। তার যা ছিল সবই সে হারিয়েছিল, কিন্তু কেবল বলল ঃ 'প্রভু দিয়েছিলেন, প্রভুই নিয়ে নিয়েছেন; প্রভুর নামই সত্য হোক।' [১১] উপযুক্ত লোককে আমরা যা পারি তাই আমাদের দেওয়া উচিত। তবে যা কিছুই আমরা দিই না কেন, এই দেওয়ার ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক হতে হবে। আত্ম-সমর্পণের নামে নির্বিচারে দান করা ঠিক নয়। প্রকৃত ভক্ত ঠিক সময়ে ঠিক নির্দেশ পায়—কিভাবে, কখন ও কাকে দান করতে হবে।

এখনই শান্ত-ভাব লাভ করার জন্য তোমাকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে হবে না। দু রকমের শান্ত-ভাব আছে ঃ অহং-কেন্দ্রিক আর বিশ্ব-কেন্দ্রিক। কোন কোন লোককে শান্ত দেখায়, অন্যের প্রতি তাদের প্রীতি ও সহানুভূতির অভাবের জন্য। অন্য লোকের দুঃখকষ্টে তারা ব্যস্ত হয় না ও লোককে দেখায় যে তারা কতটা সমতাপূর্ণ ও শক্ত। কিন্তু নিজেদের কিছু ঘটলে তারা ভেঙে পড়ে। এ রকম শান্ত-ভাব না থাকাই ভাল। বিশ্ব-কেন্দ্রিক শান্ত-ভাব আসে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ থেকে, তাঁর সংস্পর্শে আসার পর। যখন আমরা বিশ্ব-চেতনায় স্থিত হই, একমাত্র তখনই আমরা সর্বাবস্থায় প্রকৃত শান্ত-ভাব ও সমতা লাভ করতে পারি।

বেশি আত্ম-সমালোচনা করে নিজেকে দুর্বল করবে না। লোকে নিজ জীবন

১১ *Bible*. Job. 1:21

সম্বন্ধে দোষ-দর্শন করে থাকে, কারণ তারা ঐ দোষের কারণগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। আমরা যদি অন্তরের পরিবর্তন না করি, আমাদের মনের আমূল সংস্কার না করি, তবে তা আমাদের কষ্ট দিতেই থাকবে। তোমরা কি শ্রীরামকৃষ্ণের পোষা কুকুরের গল্পটি জান? একটা কুকুরকে গোড়ায় এত আদর দেওয়া হয়েছিল যে প্রভুর শরীরের ওপর লাফিয়ে পড়া তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল। পরে প্রভু বারণ করলেও সে মানত না। এমনকি তাকে মারলেও সে প্রভুর শরীরের ওপর লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করত।[১২] আমাদের মন এই কুকুরের মতো। এতদিন তাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় এখন তাকে সংযত করে প্রভুর পায়ে সমর্পণ করা কঠিন। কিন্তু বার বার অভ্যাস করতে করতে আমাদের মনকে ঈশ্বরে সমর্পণ করাতেই হবে।

প্রথমে নিজ জীবনে অন্তত কিছুটা রূপান্তর ঘটাও, নিয়মিত *সাধনার* মাধ্যমে, তারপর 'কর্ম ও উপাসনা'-র আদর্শ গ্রহণ কর। কেবল দেখবে, তুমি আনন্দের সঙ্গে যতটা কাজ করতে পার তার বেশি কাজ যেন নেওয়া না হয়। শুরুতেই প্রভুর স্মরণ অনুক্ষণ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই, তুমি যা যা কাজ কর, কাজের আগে ও শেষে সে সব প্রভুকে অর্পণ কর এবং সম্ভব হলে কাজ করতে করতেও।

যখন তুমি জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যাও, যখন ভুলে যাও যে যা কিছু করছ তা ঈশ্বরানুভূতির উদ্দেশ্যে, তখনই কেবল কাজকে গতানুগতিক বলে মনে হয়। যন্ত্রের মতো কাজ করে যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই। কতটা কাজ আমরা করি তা নিয়ে তত ঝামেলা নয়, যত ঝামেলা কাজের গুণগত মান নিয়ে, কিভাবে কাজ করা হচ্ছে তাই নিয়ে। ঈশ্বরে উৎসর্গ করছি এই ভাব নিয়ে কাজ করতে না পারাই— আধ্যাত্মিক অনুশীলন হিসাবে কাজ করার প্রধান বাধা। আর, ঈশ্বরোপলব্ধিই জীবনের উদ্দেশ্য—এভাব যদি সর্বদা মনে জাগরূক না থাকে তবে কোন রকম উৎসর্গের মনোভাব কখনই আসবে না।

আমাদের ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ভাবের পরীক্ষা হলো বয়োজ্যেষ্ঠদের আজ্ঞাবহতা। কিন্তু যে বলে বয়োজ্যেষ্ঠদের আজ্ঞা পালন করলে তার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস সব ত্যাগ করতে হবে, সে আত্ম-সমর্পণের ভাবটি বোঝেনি। আমরা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ভাব যতই অনুশীলন করতে থাকব, আমাদের অহং ততটা নাশ হয় না, যতটা রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তি চেতনা প্রসারিত হয়ে তার মধ্যে সকলের স্থান করে দেয়—জ্যেষ্ঠদের, কনিষ্ঠদের ও সমকক্ষদের। প্রকৃত আত্ম-সমর্পণ মানুষকে উচ্চতর স্থান ও মর্যাদায় ভূষিত করে, যা অন্য লোককে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা থেকে বিরত করে।

---

১২ Tales and Parables of Sri Ramakrishna, (Madras : Sri Ramakrishna Math, 1974), p. 23?

আত্ম-সমর্পণের অর্থ এ নয় যে, তোমাকে বোকার মতো আচরণ করতে হবে। একদা এক পণ্ডিত ছিল। তার স্ত্রী একদিন কোথাও গেছল, যাবার সময় তাকে বলে গেছল, তার ফেরবার আগে সে যেন উনুনে ডালগুলোকে সিদ্ধ করে রাখে। রান্না হতে হতে ডালগুলি থেকে ফেনা বেরুতে, আর ঝোল উথলে পড়তে থাকে। ঐ পণ্ডিত তখনই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বসে গেল। স্ত্রী ফিরে এসে স্বামীর কাণ্ড দেখে জিজ্ঞেস করল সে কি করেছে। স্ত্রী তখন তাকে এই বলে বকতে লাগল ঃ 'আরে মূর্খ, ডালের ওপর একটু তেল ছড়িয়ে দিতে পারনি?' ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময় আমরা যেন বিচারবুদ্ধি চাই—মিথ্যা থেকে সত্যকে, মন্দ থেকে ভালকে, ভুল থেকে নির্ভুলকে তফাত করার জন্য। তিনি যে বোধশক্তি আমাদের আগেই দিয়ে রেখেছেন, তাই দিয়ে আমরা যেন যথাসাধ্য ভালভাবে কাজ করে যাই, আর আমরা যত অগ্রসর হব তিনি আরো আরো বুদ্ধি দিয়ে আমাদের ভরিয়ে দেবেন।

বাইরের সাহায্যের ওপর বেশি নির্ভর করা ও বার বার অন্যের পরামর্শ চাওয়া একটি বড় বন্ধন। তুমি যত অন্তরের পরামর্শদাতার দিকে তাকাবে, তত মুক্ত হতে পারবে। ঈশ্বরের ওপর অসীম আস্থা স্থাপন করে বীরের মতো জীবনের সমস্ত কর্তব্য পালন কর। তোমার হাত কাজে ব্যস্ত থাক, আর মন ঈশ্বর চিন্তায় ভরে থাক। তোমাকে যদি বুদ্ধির কাজই করতে হয়, আর তোমার মনকে যদি জাগতিক চিন্তাতেই মগ্ন থাকতে হয়, তবে তোমার অন্তঃকরণ, তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন প্রভুর ওপর দৃঢ়ভাবে ন্যস্ত থাকে। তোমার অহংকে ঈশ্বরে সমর্পণ কর।

কাজ ও উপাসনাকে এক সঙ্গে চালাতেই হবে। আমাদের আদর্শ হলো কাজকে উপাসনায় রূপান্তরিত করা, কিন্তু তা বহুদিনের অভ্যাসেই উপলব্ধি করা সম্ভব। এতে সফল হতে হলে কাজের সময়েও তোমাকে কিছুটা প্রার্থনা ও মননের ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। সব সময়ে সাফল্য লাভ না হলেও ক্ষতি নেই। এই নিষ্ফলতাই যেন তোমার পরবর্তী সাফল্যের সোপান হয়। আমাদের মনের খানিকটা ঈশ্বরচিন্তায় দিতে হবে, বাকিটা দিয়ে জীবনের কর্তব্য কর্ম করতে হবে—অবশ্য আমরা কি করছি, সে দিকে নজর রেখে, আর কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে। এসবই নিঃসন্দেহে বেশ কঠিন কাজ, কিন্তু আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

তোমরা কি শ্রীরামকৃষ্ণের চিড়ে তৈরি করা মেয়েটির গল্প জান না? তাকে এক হাতে ঢেকির চাল উল্টে দিতে হয়, অন্য হাতে কোলের ছেলেকে মাই দিতে হয়, সেই সঙ্গে সব সময়ে পরিজনের সঙ্গে কথা বলতে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে দরাদরি করতে হয়।[১৩] আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় ঐ রকম কর্মকুশলতার খানিকটা আমাদের আনতে হবে।

১৩ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৩৬১, ৪২৮-২৯

শঙ্করের সেই সুপরিচিত গানটি তোমরা জান, যেখানে তিনি বলেছেন—আমি যা যা করি, হে প্রভু তা তোমারই পূজা।[১৪] কাজে যদি তোমার প্রীতি থাকে তবে এ দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই আসে। আর তোমার যে কাজ তা যদি সত্যই তোমার পছন্দমতো না হয়, তার অন্তর্নিহিত কোন ত্রুটির জন্য—তবে প্রভুর কাছে জানাও তোমার অসুবিধার কথা, আরো জানাও যে অবস্থার চাপেই ঐ কাজটি তুমি করে চলেছ। তুমি যদি চাও, তাঁকে অনুরোধও করতে পার ঐ কাজটির বদলে তোমায় অন্য কোন সুবিধাজনক কাজ দেবার জন্যে। তিনি নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন, অবশ্য যদি তা তোমার নিজের পক্ষে কল্যাণকর হয়। অন্যথায় তুমি জানবে যে পুরান কাজ করে যাওয়াই তোমার পক্ষে কল্যাণকর, সে ক্ষেত্রে ঐ অপছন্দসই কাজ থেকে তুমি অপ্রত্যাশিত কিছু ভাল ফল পেয়ে যেতে পার।

আমি ঠিক জানি না শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কোন ধাক্কা দেন কিনা। আমাদের দুঃখযন্ত্রণাগুলি আমাদেরই কর্মের ফলে হয়ে থাকে। তাই প্রভুকে দোষারোপ না করে, আমরা যেন আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করি, সে অভিজ্ঞতা যত তিক্তই হোক, আর যেন বেশি বেশি নিরাসক্ত হই এবং সর্বদা ঈশ্বরকে ধরে থাকি। তিনি আমাদের সব পরীক্ষার সাক্ষীই শুধু তা নয়—পরন্তু আমাদের সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। প্রভু আমাদের নিয়ে এসেছেন তাঁর আধ্যাত্মিক স্রোতের নিকট সংস্পর্শে। সেই স্রোত অনুসরণ কর, আর সেই স্পর্শ বজায় রাখ। সময়মতো তোমার অন্তরস্থিত ঈশ্বর-সত্তার নিরন্তর অনুভূতি তোমার হবে, তুমি চুপচাপ বসেই থাক আর হাড়ভাঙা পরিশ্রমই কর।

কাজ ও উপাসনা যেন নিশ্চয়ই হাতে হাত মিলিয়ে চলে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ধ্যান প্রভৃতির সঙ্গে সভক্তি উপাসনা যতটা গ্রাহ্য, ঠিক ভাব নিয়ে কাজ করাও ততটা গ্রাহ্য। আমার আচার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ 'তুমি কাজ আরম্ভ করার আগে প্রভুকে স্মরণ করবে ও তাঁকে প্রণাম করবে। কাজ করার সময়ও মাঝে মাঝে এরূপ করবে, কাজ শেষ হলেও আবার।'

ঈশ্বর কৃপায় আমাদের দুঃখ ও শোক দূর হবেই এমন নয়, কিন্তু আমাদের ওপর কৃপা থাকলে আমরা জীবনের অগ্নিপরীক্ষায়—আমাদের মালিন্যকে পুড়িয়ে ফেলে অন্তরের পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে—সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হব, উপরন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর আরো বেশি নির্ভরশীল হব। তখন আমাদের দুঃখ কষ্ট ভোগ সত্যই সার্থক হবে, যদি তা আমাদের স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি ও অচলা ভক্তি এনে দেয়।

---

১৪ যদ্যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্—শিবমানসপূজা, ৪

ঈশ্বরের নাম জপ কর, অন্তরের দেবতাকে স্মরণ কর, তাঁর ইচ্ছাতে নিজ ইচ্ছাকে সমর্পণ করে সেই শুদ্ধ সত্তাকে অনুভব কর এবং শান্তিতে থাক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি তোমার মনে ও হৃদয়ে নতুন আলো ও বল দেন।

সব জিনিস যেমন আছে তেমনভাবেই গ্রহণ করে যতদূর সম্ভব ভাল করে কাজ করা ছাড়া তুমি আর কি করতে পার? তুমি জান আর নাই জান তোমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে প্রভুর ওপরেই। আমাদের পক্ষে সব থেকে ভাল হলো যতটা সম্ভব আমাদের কাজটুকু ভাল করে করা আর যতখানি সম্ভব তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করা।

প্রত্যেককেই মাঝে মাঝে খুবই অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে জীবন কাটাতে হয়। যখন যে কোন কারণেই হোক তোমার উদ্বেগ হবে, ঈশ্বরের নাম জপ কর, তাঁকে স্মরণ কর এবং তাঁতে আত্ম-সমর্পণ অভ্যাস কর। আমি নিশ্চিত জানি যে এ নিয়মে চললে ঠিক সময়ে তোমার প্রভূত বল ও শান্তি আসবে।

প্রভুর উদ্দেশ্যে সেবা করতে পারাতেই আনন্দ। আমি ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন নই, কারণ আমি জানি, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁর ওপরেই নির্ভরশীল। সব থেকে ভাল যা আমরা করতে পারি তা হলো তাঁকে স্মরণ ও তাঁতে আত্ম-সমর্পণ এবং তাঁর অনন্ত সত্তায় প্রেমে ও আনন্দে মগ্ন হওয়া।

যিনি তোমার অন্তঃকরণে রয়েছেন ও তোমার অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর ওপরেই তোমার সব কর্মফল অর্পণ করে শান্তিতে থাক। এমনকি তুমি যদি মনে কর সমগ্র জগৎ তোমাকে ত্যাগ করেছে, নিশ্চিত জেনে রেখো যে প্রভু তোমার সঙ্গে তোমার অন্তরে বিরাজিত রয়েছেন। কাজেই দিব্য প্রভুর কাছেই প্রার্থনা কর যাতে তিনি তোমার সহায় হন ও তোমার পথ আলোকিত করেন। তোমার জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে আলোকের জন্য, নির্দেশের জন্য, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে চল এবং নানা পরীক্ষা ও অসুবিধার মধ্যেও তাঁর দিব্য সত্তা অনুভব করতে চেষ্টা কর। প্রভু তোমাকে তোমার যত বল ও সাহস দরকার তা দেবেন।

যদি মনে শান্তি চাও তো কারো কাছে কিছু আশা করবে না। যদি কিছু পাও ধন্য জ্ঞান কর, যদি না পাও তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। অন্তরের অন্তস্তলে জানবে যে প্রভুই কেবল তোমার আপনার, তোমার আত্মার আত্মারূপে তিনি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারেন না, তুমিও তাঁকে ছাড়তে পার না।

কোন কর্মোদ্যোগের সাফল্য কেবল আমাদের চেষ্টার ওপর নির্ভর করে না আরো অন্য কারণও থাকে, সবগুলির মিলনেই সাফল্য সম্ভব হয়। যাই হোক,

আমাদের চেষ্টা যখন কার্যত নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়, তখনও মনের দিক থেকে একটা সাফল্য বোধ হতে পারে—যদি আমরা সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে কঠোর পরিশ্রম করে থাকি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

**কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।**

—কাজেই তোমার অধিকার, তার ফলে নয়।[১৫]

জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনেও, আমাদের বড় দায়িত্ব হলো রূঢ় বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি তা জানা ও সাহসের সঙ্গে সমস্যার মুখোমুখি হওয়া। এর সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের নিজেদের উন্নতি চাই। যদি আমরা পরিবেশের উন্নতি করতে পারি, তবে তা ভাল কথা; অন্যথা, আমরা যে অবস্থায় রয়েছি, সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আমাদের করণীয় অংশটুকু যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে করতে হবে।

জীবনযুদ্ধ থেকে পালাতে চেষ্টা করা ও মৃত্যুর আশ্রয় নেবার কথা চিন্তা করা নিতান্তই কাপুরুষতা। এ যেন ভাজার চাটু থেকে আগুনে লাফ দেওয়া, কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লোকেরই এ চিন্তা মনে আনা উচিত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্যগণ আমাদের শিখিয়েছেন যে অধ্যাত্ম সাধকের ঠিক কলের পুতুলের মতো সর্বদা অন্যের দ্বারা চালিত হবার জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত নয়। আমাদের ব্যক্তিত্বের ওপর সচেতন নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করতে শিখতে হবেই এবং সেবা, প্রার্থনা ও আত্ম-সমর্পণের মাধ্যমে ভগবৎ-ইচ্ছার সঙ্গে সুর বাঁধতে চেষ্টা করতে হবে এবং ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে।

আমি ঈশ্বর-ইচ্ছা-রূপ এমন এক বস্তুকে জেনেছি—যা মানুষের ইচ্ছার মাধ্যমে কাজ করে থাকে—সেই মানুষের ও অন্যের কল্যাণের জন্য। প্রার্থনা, জপ, ধ্যান ও পূজার মাধ্যমে ঐ বস্তুর সংস্পর্শে আমাদের আসতে হবে।

তোমার উচ্চ নৈতিকতাবোধকে অনুসরণ করে, অনাসক্ত হয়ে পূজার ভাবে তোমার কর্তব্য কর্ম সুসম্পন্ন করে, নিয়মিত ভক্তিভাবে তোমার আধ্যাত্মিক অনুশীলন চালিয়ে তোমার সর্বশক্তি প্রয়োগ কর। এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার মধ্যে প্রকটিত ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে যারা এসেছে, তারা ভাগ্যবান। ঈশ্বরের কৃপা-বাতাস সব সময়েই বইছে, তোমার পাল যত খুলবে ঐ বাতাস তত বেশি বেশি তোমার পালে লাগবে।

নুনের পুতুলের তুলনামূলক গল্পটি তোমরা জান, পুতুলটি সমুদ্র মাপতে গিয়ে

১৫ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২/৪৭

গলে গেল। এ রকম ঘটতে পারে. পুতুলটি যদি কেবল শুদ্ধ লবণের হয়, কিন্তু পুতুলটি যদি বালির অথবা প্রচুর লবণ ও বালি দিয়ে তৈরি হয় তবে নয়। আমাদের সকলের মধ্যে 'লবণ' ও 'বালি' দুই-ই রয়েছে। পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ অভ্যাস করতে হলে 'বালি' বাদ দিতে অথবা তাকে 'লবণে' রূপান্তরিত করতে হবে। অভিমান ও অসংখ্য বাসনাযুক্ত আমাদের অহংকে সহজে রূপান্তরিত করা যাবে না, কিন্তু একটু একটু করে চেষ্টা করতে হবে যাতে কালে এই 'বালি' সরে যায়। ততদিন পর্যন্ত, বানর শিশু যেমন মাকে আঁকড়ে থাকে আমাদেরও তেমনি থাকতে হবে, আর অনুসরণ করতে হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ঃ 'মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ' —আমাকে স্মরণ কর আর জীবন-যুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাও।

যখন 'লবণ' ভাবের প্রভাব প্রবল হয়ে, প্রেমের একটি বিশাল তরঙ্গে আমরা অভিভূত হই, সেই সময়েই আত্ম-সমর্পণ সহজ হয়ে যায়। কিন্তু তারপর, হয়তো অব্যবহিত পরেই, প্রাধ্যান্য বিশিষ্ট 'বালি'-ভাব প্রবল হয়ে ওঠে আর সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে সময়ে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, বরং শান্ত ভাবে থাকার চেষ্টা করা উচিত।

অহংকেন্দ্রিক কর্ম প্রচেষ্টার সঙ্গে আমাদের উচিত, ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সাধ্য মতো আত্ম-সমর্পণ করতে চেষ্টা করা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দুটি, কখনো কখনো তিনটি ব্যক্তিত্ব থাকে আর এগুলিই আমাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তার কোন বিরাম নেই। একটি ভাব অপরটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আর বিভ্রান্তিকে আরো শোচনীয় করে তোলে।

এ সময়ে আমাদের মানসিক বিপর্যয় ঘটতে না দিয়ে, আমরা যেন অবশ্যই 'জপ', 'ধ্যান' অভ্যাস করতে থাকি, আর সেই সঙ্গে কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত থাকার সময়েও যেন প্রভুকে স্মরণ করি এবং সমস্ত কর্মফল তাতে সমর্পণ করি।

আত্ম-সমর্পণ অভ্যাস করতে হলে তিনটি স্তরের ভেতর দিয়ে যেতে হয় ঃ

১। আধ্যাত্মিক অনুশীলনই হোক আর কর্তব্য কর্ম সম্পাদনই হোক, প্রথমে আমরা সেগুলিকে অহং-কেন্দ্রিকভাবেই করে থাকি।

২। এরপর আমরা শিখি ঈশ্বরীয় সত্তাকে আমাদের কর্মফল নিবেদন করতে।

৩। শেষ স্তরে, আমাদের সব কাজই করি প্রভুর প্রীতির জন্য। আমাদের মন যত শুদ্ধ হয়, আমরা ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করি এবং কেবল তখনই আমাদের উপলব্ধি হয়—প্রভুই যন্ত্রী (যন্ত্র চালক), আমরা যন্ত্রমাত্র।

দ্বিতীয় পর্ব

# আধ্যাত্মিক অনুশীলন

## (খ) প্রণালী
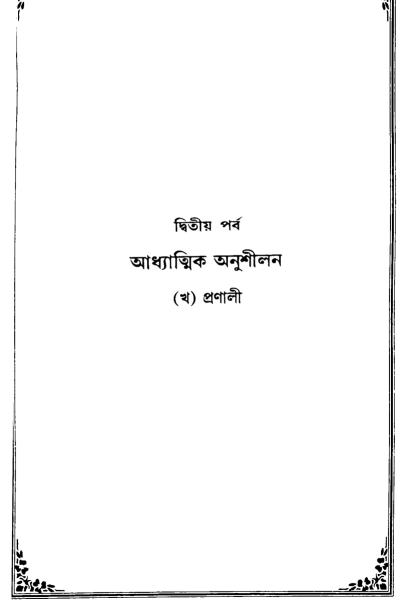
# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## যোগ-বেদান্ত সংশ্লেষণের পথ

প্রারম্ভের পূর্বেই, আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*-এর কিছু কিছু অংশ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি মাটির প্রতিমাপূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয় সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যার জগৎ তিনিই এ-সব করেছেন—অধিকারী ভেদে।...

মাস্টার (বিনীত ভাবে)—ঈশ্বরে কি করে মন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভেতর ও বিষয়কাজের ভেতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড় কঠিন।

যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গোরুতে খেয়ে ফেলে।

ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ—কি না নিত্যবস্তু আর সব অসৎ—কি না অনিত্য। এই চিন্তা করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।

মাস্টার (বিনীতভাবে)—সংসারে কিরকম করে থাকতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা—সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।...

মাস্টার—ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নামগুণ-গান, বস্তু বিচার—এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।[১]

---

১ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১৯-২১

ওপরের কথাগুলির মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণ যোগ ও বেদান্তের, ভক্তি ও জ্ঞানের, কর্ম ও পূজার সংশ্লেষণের পথে যা যা একান্ত দরকার তা বলে দিয়েছেন। বর্তমান যুগে এই হলো সব থেকে উপযুক্ত পথ। পূজা, প্রার্থনা, ধ্যান, বিচার, সেবা—সবেরই স্থান রয়েছে এ পথে। আত্ম-বিচার বা জ্ঞানযোগের পথে সাধনায় কিছু বাছাই-করা লোকই সফল হতে পারে। অন্য সকলের পক্ষে সংশ্লেষণ পথই সব থেকে সহজ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের পদপ্রান্তে বসে এই পূর্ণাঙ্গ পথের কথাই আমরা শিখেছিলাম।

## প্রাথমিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন

মহাজনেরা প্রথমেই আমাদের নৈতিক জীবনের গুরুত্বের কথা শিখিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন যে আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবন চালিয়ে যেতে হবে। সাংসারিক ব্যাপারে যেমন, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি পদ্ধতিগত অনুশীলন চাই। আধ্যাত্মিক পথে চলার মতো ঠিক ঠিক মেজাজ আনতে গেলে আমাদের সে বিষয়ে তৈরি হতেই হবে। সাধু দুর্গাচরণ নাগ বা নাগ মহাশয় নামে শ্রীরামকৃষ্ণের এক মহান শিষ্য ছিলেন। তাঁর পিতা পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ খুব জপ করতেন। একদিন তাঁকে বলা হয়, 'আপনার পিতা খুব ভক্ত', তাতে নাগ মহাশয় বলেন, 'তিনি কি ফল লাভ করতে পারবেন? তিনি যে আমার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। আর নঙ্গর ফেলে দাঁড় টানলে নৌকো এগুবে না।' এ কথার পেছনে একটি গল্প আছে। এক চাঁদনি রাতে কয়েকজন মাতাল মনে করল—একটু নৌকো ভ্রমণ করে আসি। তারা ঘাটে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে, হালে বসল আর দাঁড় টানতে লাগল। তারা সারা রাত ধরে দাঁড় টানল। ভোরে, যখন তাদের মদের ঝোঁকটা কেটে গেছে, তখন তারা একটুও এগোয়নি দেখে আশ্চর্য হলো। 'ব্যাপারটা কি?' 'ব্যাপারটা কি?' এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। আসলে ওরা নঙ্গরটি তুলতেই ভুলে গেছল।

আমি নিয়তই লোকেদের কাছ থেকে অভিযোগ শুনি : 'আমরা সাধন করছি, তবু আমাদের একটুও উন্নতি হচ্ছে না।' উত্তর এখানেই রয়েছে : সাধন-ভজনের সময় তুমি কি কিছুক্ষণের জন্যও মনকে সাংসারিক ব্যাপার থেকে মুক্ত করতে পার, আর সেই শুদ্ধ মন ঈশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ করতে পার? এই হলো আসল কথা : সব পথেই আমাদের প্রশিক্ষণ দরকার। তোমরা কেউ কেউ হয়ত স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞান-যোগ, কর্ম-যোগ, ভক্তি-যোগ ও রাজ-যোগ বইগুলি পড়েছ মানুষ যে কোন পথেই যাক, সংযম চাই, মনের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ চাই, ঠিক ঠিক মেজাজ গড়ে তোলা চাই। যদি মন শিক্ষা পেয়ে থাকে, আর ঠিক ঠিক মেজাজ

গড়ে উঠে থাকে, তবে মানুষ অধ্যাত্ম-সাধনে এগিয়ে যেতে পারে আর বেশ সাফল্যও লাভ করতে পারে। আমাদের গোলমাল হলো, আমরা সাংসারিক ব্যাপারে গোছাল হতে পারি, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে শিশুদের মতো এলোমেলো আর আবেগপ্রবণ। আমি দেখেছি, বয়স্ক লোক, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও কখনো কখনো শিশুদের মতো কথা বলে। সর্বপ্রথম মনের অভ্যন্তরে একটি পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে হবে। আমরা অনেকেই ব্যক্তি বটে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্ব নেই। আমরা স্বতন্ত্র কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য নেই। নিয়ম-নীতি পালন, কর্তব্যকর্ম সম্পাদন ও নিয়মিত পূজানুষ্ঠানের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে হবে। কেবল তখনই আমাদের অধ্যাত্ম-সাধন সফল হবে। কেবল তখনই আমাদের জপ-ধ্যান মহান আশীর্বাদের উৎস বলে প্রমাণিত হবে।

আমি আবার বলি, সব পথেই, সব যোগেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা চাই। আমি যদি কর্ম-যোগের পথে চলি, আমার মনকে সম্পূর্ণ শান্ত হতে হবে। জগতের সকল বস্তু ও কর্ম ফল থেকে আমাকে নির্লিপ্ত হতেই হবে। আমি যদি ভক্তি-যোগের পথে চলি, আমাকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ভাব আনতেই হবে। উপরন্তু, তীব্র ব্যাকুলতা অবশ্যই চাই—ঈশ্বর লাভের জন্য—সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুধার জন্য, যা জগতের কোন কিছুর দ্বারা মিটবে না। প্রার্থনা, জপ, ধ্যান ও শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সংস্পর্শে এসেই অধ্যাত্ম সাধক এই আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটায় ও ঈশ্বরানুভূতিতে পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। অনেকে জ্ঞান যোগের পথ ধরতে চায়, কিন্তু এক্ষেত্রে—'আমি দেহ নই, আমি মন নই, আমি অহং বা ইন্দ্রিয় নই, আমি চিৎস্বরূপ'—এই চরম আত্ম-বিশ্লেষণের পথে চলবার মতো করে মনকে গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য জ্ঞান যোগের আচার্যগণ কতকগুলি প্রাথমিক গুণের ওপর জোর দেন। সাধককে ইহজীবন ও পরজীবনের ভোগাকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থাকতে হবে এবং নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচারে তার সামর্থ্য থাকা চাই। উপরন্তু, সে সাধকের থাকা চাই আত্ম-সংযম, পরম-চেতনায় *শ্রদ্ধা,* সহনশীলতা এবং একাগ্রতা অভ্যাসের সামর্থ্য। সর্বশেষ তার থাকা চাই বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রবল এষণা।

অনেকে বলে, 'ওঃ! আমি একাগ্রতা অভ্যাস করতে পারি না।' ঐ লোকগুলি ও তাদের মন যথেষ্ট শুদ্ধ নয় জেনে, আমি তাদের বলি, 'তোমরা যে মনকে একাগ্র করতে পার না তা ভাল।' যদি অশুদ্ধ মন একাগ্র হয় তবে তা বোমার মতো হবে। যখন আমরা ক্রুদ্ধ হই, ঘৃণা ও ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি—তখন কি আমরা একাগ্র হই না? সে রকম একাগ্রতা ভাল নয়। কার্যত তা বিপজ্জনক। তাই গোড়াতেই

কিছুটা আধ্যাত্মিক নিয়মশৃঙ্খলা একান্ত দরকার। পতঞ্জলির মতে যোগের পথে আটটি ধাপের বা আটটি বিষয়ে সংযমের কথা রয়েছে। এগুলির সুসম্বদ্ধ অনুশীলন চাই। হঠাৎ আধ্যাত্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না।

## ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে প্রভু বার বার বলেছেন, 'ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই।'[২] আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ক্ষুধার মতো। যখন লোকে আমাকে প্রশ্ন করে, 'কেন আমি ধ্যান করব?' অমি উত্তরে বলি, 'কেন তুমি তা করবে? করো না।' যদি তোমার ব্যাকুলতা থাকত, তবে তুমি বোকার মতো প্রশ্ন করতে না। যখন তোমার প্রকৃত আধ্যাত্মিক ক্ষুধা হবে, তখন তুমি ঈশ্বর-চিন্তা না করে পারবে না, তাঁর কাছে প্রার্থনা না করে পারবে না, তাঁর নাম জপ এবং তাঁর মহিমা চিন্তন না করে পারবে না। এই ক্ষুধা জাগিয়ে তুলতে হবে। এই ক্ষুধাকে বজায় রাখতে হবে। তা সম্ভব হবে যদি তুমি তোমার আধ্যাত্মিক সাধন নিয়মিত চালিয়ে যাও। তুমি জড় দেহকে জড় খাদ্য দাও, তোমার মনকে খাওয়াও নতুন নতুন ভাব দিয়ে—অধ্যয়ন-আলোচনার মাধ্যমে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচুর্যের ভেতর থেকেও জীবাত্মাকে অনশনে রেখেছ। তুমি কি নিজেকে উপবাসী ভাব না? জীবাত্মা অনন্ত চৈতন্যের অনুভূতির জন্য ব্যাকুল, সে অনন্ত ব্যাপ্তি, ভগবৎ প্রেম ও পরমানন্দ উপলব্ধি করার জন্য ব্যাকুল, আর আমরা সে ব্যাকুলতা পরিপূরণের চেষ্টা করছি না। কিন্তু যখন আমরা তা করতে চেষ্টা করব, আমাদের নতুন জীবন শুরু হবে।

প্রভু বলেছিলেন যে সৎ-সঙ্গ দরকার,[৩] এমন লোকের সঙ্গ চাই যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে চলেছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে চলতে আমাদের শক্তি যোগাবেন, যাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা কিছুটা প্রতিফলিত হয় ও যাঁরা নিজে আচরণ করে আমাদের শিক্ষা দেবেন। উপরন্তু তাঁদের সংস্পর্শে এলে আমাদের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা জাগবে।

এ বিষয়ে তোমাকে এক বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তা হলো সেই অশুদ্ধ যা জাগতিক ভোগের দিকে ছোটে। স্বভাবতই শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের মহিমা প্রতিফলিত হয়, সেই মনই ঈশ্বরমুখীন হয়, তাঁরই চিন্তা করে, তাঁর দিব্য অস্তিত্ব, প্রেম ও আনন্দ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। মনকে কিভাবে শুদ্ধ করা যায়? প্রথমেই, তোমাকে অসৎ চিন্তা, অসৎ ভাব, অসৎ কাজ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। সৎ-চিন্তা, সৎ-ভাব গ্রহণ করবে ও সৎ-কাজ করবে। এ হলো প্রথম ধাপ। সব সময়

---

২ তদেব, পৃঃ ২১

৩ তদেব, পৃঃ ৩৫

মনে রাখবে যে আমরা এক একটি জীবাত্মা, যা স্বরূপত আত্মাই। এই আত্মাই মানবীয় ব্যক্তিত্বের রূপ ধারণ করেছেন—নিখিল বিশ্বের জীবন নাটকে কোন এক ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য। যে ভূমিকাই আমাদের দেওয়া হোক, আমরা যেন তা ভাল করে অভিনয় করি। এর অর্থ, জীবনের কর্তব্য সব করে যেতে হবে এবং কাজ করতে হবে অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরের সেবা বোধে। কিন্তু, কেবল নৈতিক অভ্যাস ও কর্তব্য সম্পাদনই মানসিক শুদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাঁর ধ্যান করতে হবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যিনি পবিত্রতা, জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, প্রেম ও আনন্দের অফুরন্ত উৎস।

## ক্রম-বিন্যস্ত পথ

আমাদের অবশ্যই সঠিক পথ ধরে চলতে হবে। মনে কর বিজন বনানীর মধ্যে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। তখন ভুল পথে চললে আমার অবস্থা কি হবে? সেই অরণ্যানীর ভেতরে আরো বেশি ঢুকে পড়ব। ঠিক পথে চললে, এই অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। একটা গল্প মনে পড়ছে। এক মোটর চালক অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছনো তার উদ্দেশ্য ছিল। সামান্য কিছু ভূগোল পড়েছে এমন একটি স্কুলের ছাত্রকে সে জিজ্ঞেস করল ঃ 'খোকা, এই পথে গেলে কি আমি ঐ জায়গায় পৌছতে পারব?' ছেলেটি বলল ঃ 'হ্যাঁ মহাশয়, আপনি পৌছতে পারবেন।' মোটর চালক জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটি কতদূর?' ছেলেটি উত্তরে বলে, 'মহাশয় আপনাকে ২৫,০০০ মাইল যেতে হবে।' মোটর চালক প্রশ্ন করল, 'অন্য পথে গেলে কতদূর?' ছেলেটি বলে, 'তবে মাত্র দু মাইল।' ভাবটা বুঝতে পেরেছ? প্রথম পথে তোমাকে গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে হবে। অন্য পথে মাত্র দু-মাইল। অধ্যাত্ম জীবনেও সেই রকম, উপযুক্ত মেজাজের, উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন করে ও উপযুক্ত নির্দেশ নিয়ে চললে তুমি তাড়াতাড়ি পৌছে যাবে ও দ্রুত উন্নতি করবে। তোমার মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন আসবে। কিন্তু বেশি তাড়াতাড়ি পা ফেলতে যেও না। আস্তে অথচ দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে চল—নির্দিষ্ট পথে। ক্রমে ক্রমে তুমি সর্বোচ্চ সত্যে পৌছতে পারবে।

আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনে আমরা যেন অবশ্যই ধাপে ধাপে অগ্রসর হই। প্রথমে প্রতিমা পূজা অর্থাৎ আকৃতি, প্রতীক, ছবি বা পুতুল অবলম্বনে প্রভুর পূজা। তারপর, তাঁর নামজপ, তাঁর বিষয় চিন্তন ও তাঁর মহিমা কীর্তন। আরো পরে, মন একটু ভাবস্থ হলে, তোমার বোধ হবে ঈশ্বর যেন কাছে রয়েছেন। এই হলো *ধ্যান*; *ধ্যানই* কালে উচ্চতম চেতনাতীত উপলব্ধিতে পৌছে দেবে। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্পে আছে, এক গরীব কাঠুরেকে বলা হয়েছে, ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে—চন্দন

কাঠের বন থেকে রূপার খনিতে, সেখান থেকে সোনার খনিতে ও শেষে হীরার খনিতে।[৪] সেইভাবে আমরা যদি আধ্যাত্মিক পথে নিষ্ঠার সঙ্গে চলি এবং আদি থেকে আরম্ভ করি, আমরা সত্যে পৌঁছবই। কিন্তু আমরা যদি অন্ত থেকে আরম্ভ করি, তবে দিশেহারা হয়ে কোথাও পৌঁছতে পারব না। কেউ কেউ অদ্বৈত *সাধনা* করতে চায়। আমি তাদের বলি, 'আমি অদ্বৈত *সাধনার* কিছু জানি না, অন্য কোন আচার্যের কাছে যাও। কিন্তু তুমি যদি আদি থেকে আরম্ভ করতে চাও, তবে আমি তোমাকে এ বিষয়ে কিছু বলে দিতে পারি।'

প্রথমেই, ঈশ্বরের সাকার উপাসনা নিয়ে আরম্ভ কর। আমার *দেহাত্মবুদ্ধি* রয়েছে। আমার বোধ হচ্ছে, আমি একজন *দেহধারী* জীব, বহুজনের মধ্যে আমি একজন ব্যক্তি। আমি কি করে নিজেকে সেই অনন্ত সত্তারূপে ভাবব? আমি তা পারি না। তাই আমরা যেন দেহাত্মবুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে, সামনে কি আছে—তা দেখবার চেষ্টা করি। হনুমানকে শ্রীরাম প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমাকে তুমি কিভাবে দেখ?' হনুমান বললেন ঃ হে প্রভু! যখন আমি নিজেকে দেহ ভাবি, আমি তোমার দাস। যখন আমি নিজেকে একটি স্বতন্ত্র জীবাত্মা ভাবি, আমি তোমার অংশ। আর যখন আমি নিজেকে চৈতন্যরূপে ভাবি, আমি তোমার সঙ্গে একাত্মা। এই আমার নিশ্চিত ধারণা।'[৫]

তাই আমরা যেন আদি থেকেই আরম্ভ করি।

## গুরুকরণ কি অত্যাবশ্যক

এ প্রশ্ন অনেকেই করে থাকে। যখন তারা তাদের শিশুদের স্কুলে কলেজে বা সঙ্গীত বিদ্যালয়ে পাঠায় তখন এ প্রশ্ন করে না। কেবল অধ্যাত্মজীবনের বিষয় চিন্তা আরম্ভ করলেই গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ আসে। আগে যেমন বলেছি, অধ্যাত্ম জীবনের কথা হলে বেশির ভাগ লোকই যেন শিশুমাত্র। কেবল বয়স ও শরীরের বৃদ্ধি হলেই যথেষ্ট হলো না। যদি কোন অনন্যসাধারণ জীব থাকে, যারা ঈশ্বরীয় চেতনা নিয়েই জন্মায়, যারা জন্মাবধি ভগবৎসত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে, তবে তাদের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক গুরুর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু অন্য সকলের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। এক সময়ে এক ভক্ত মদ্‌গুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে প্রশ্ন করেছিল ঃ 'মহারাজ গুরুকরণ কি দরকার?' স্বামী হেসে বললেন ঃ 'বৎস! যখন

---

৪ তদেব, পৃঃ ৫৬, ৪৫৫

৫ দেহবুদ্ধ্যা তু দাসোঽস্মি জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ। আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।। এই জনপ্রিয় শ্লোকটির উৎসটি সঠিক জানা নেই। তবে দ্রঃ স্বামী যতীশ্বরানন্দ, *Universal Prayers*, p. 228-30, সুত্রে দ্রঃ *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৫২, ৫৯৪।

কেউ চুরি করা শিখতে চায় তখন তার গুরুর প্রয়োজন হয়। আর মহান *ব্রহ্মবিদ্যা*—ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করতে হলে গুরু চাই না?'[৬] তুমি জানবে যে পকেটমারদেরও *গুরু* থাকে, কারণ তাদের প্রচণ্ড শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের ভেতর দিয়ে যেতে হয় আর তার জন্য একজন পাকা পকেটমারের পথনির্দেশ চাই।

এই ব্যাপারে, একটি গল্প বলতে চাই। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, যিনি বাংলার বিখ্যাত লেখক ও নট ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একজন মহান ভক্তও ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। প্রভুর নাম নিয়ে তিনি ঔষধ দিতেন। তাঁর অসাধারণ স্বতঃজ্ঞান-শক্তির ফলে তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে সফলকাম হয়েছিলেন। একদিন এক বয়স্ক ও সুশ্রী ভদ্রলোক তাঁর পাশে বসেছিল, এমন সময় একটি যুবক এসে বলল ঃ 'মহাশয়, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমি আমার ঘড়িটি হারিয়েছি।' অপর ভদ্রলোক অনুসন্ধিৎসু হয়ে জিজ্ঞেস করলে ঃ 'কখন কোথায় ঘড়িটি হারিয়েছেন?' যুবকটি বলে ঃ 'মশায়, আমি সেটি এই সময়ে এই জায়গায় হারিয়েছি।' বয়স্ক লোকটি বলল, 'তুমি ওটি ফিরে পাবে।' তিনি কি করে এই রকম আশ্বাস দিলেন? কারণ ঐ সুশ্রী ভদ্রলোকটি পকেটমারদের একজন সর্দার, তাদের একজন *গুরু*।

তোমাকে আর একটা উদাহরণ দিই। তুমি জ্যোতির্বিদ্যা শিখতে চাও, একখানা বই নিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর বিশেষ কিছুই বুঝবে না। কিন্তু জ্যোতির্বিদ কিছু আশ্চর্য কথা বলেন। প্রতিদিন তুমি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখ, এইখানেই একজন এসে বলল, সূর্য কখনো উদয় হয় না, কখনো অস্তও যায় না; এই সমস্তই হয়ে থাকে পৃথিবীর গতির জন্য। যদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকেই বিশ্বাস করে চলি, তবে আমরা এ সব ধারণা করতে পারব না। এ বিশ্বাস যদি না করি তবে আমাদের জ্যোতির্বিদের কাছে যেতে হবে, তার কাছে অধ্যয়ন করতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে এবং তখনই কেবল প্রমাণের দ্বারা আমাদের দৃঢ়-প্রত্যয় হবে যে আমরা চোখে যা দেখি তা ভ্রান্ত আর জ্যোতির্বিদ যা বলেন তাই সত্য।

আধ্যাত্মিক গুরুও এসে কিছু আশ্চর্য কথা বলেন। আমরা সকলে আমাদের দেহ সম্বন্ধে সচেতন, আমরা মনে করি আমরা সকলে নর ও নারী। কিন্তু আধ্যাত্মিক গুরু বলেন, আমরা আত্মা, যা শুধু শরীর কেন মন ও অহঙ্কারের থেকেও স্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু অনেক লোকের মতোই তুমি যদি মনে কর, 'ওঃ! ঐ লোকটি প্রতারক।' তবে ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন! *গুরুকে* সন্দেহ না করে তুমি নিজেকে সন্দেহ কর। 'আমি কি এই মাংসপিণ্ড, এই নোংরা বস্তু পিণ্ড? কিংবা আমার মধ্যে কি

---

৬ Spiritual Talks [Kolkata, Advaita Ashrama 1968] p.43

প্রাণবন্ত কিছু আছে, চৈতন্যবন্ত কিছু বা একটি জীবাত্মা কি আমার মধ্যে আছে? যখনই এই ভাবের চিন্তা করতে তুমি শুরু করবে, তখনই তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু হবে। এমত অবস্থায় আমি এমন এক গুরুর কাছে যাই যিনি আধ্যাত্মিক পথে চলেছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, অপার সহানুভূতি, প্রেম, করুণা ও দয়ার অধিকারী হয়েছেন। আমি তাঁর পদতলে বসে তাঁর কাছে কিছু আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা করি এবং নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদি করি। আমার মন যত শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হতে থাকে, সেই চৈতন্যলোকের কোন কিছু আমি লাভ করি এবং আমার *ইষ্টদেবতা* আমার কাছে চিন্ময় হয়ে ওঠেন। আমার অন্তরে কোন কিছুর অস্তিত্ব আমি অনুভব করতে থাকি—যা আমার সমগ্র সত্তায় অনুস্যূত, আবার সর্বজীবের সত্তাতেও অভিব্যক্ত।

*ছান্দোগ্য উপনিষদের* সপ্তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎকুমার—দুই ঋষির মধ্যে এক কথোপকথন পাই। ঋষি-মুনিরা আকাশ থেকে পড়েন না। তাঁরাও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঋষিরা পূর্ণজ্ঞান নিয়েই জন্মান না—তাঁদের সেই পূর্ণতার বিকাশ ঘটাতে হয়। *সাধনার* মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের ঈশ্বরীয় সম্ভাবনাকে বিকাশ করেন। নারদের ছাত্রাবস্থার নির্দিষ্ট দিনগুলি অতীত হয়েছে, শাস্ত্র, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা প্রভৃতি সব বিষয়েই তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই সব বিষয় অধিগত করেও তিনি তাঁর মধ্যে কোন কিছুর অভাব বোধ করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, তিনি নিজের সম্বন্ধে, তাঁর প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আমরা বহির্জগৎ সম্বন্ধে পড়ে ও জেনেই বেশ সন্তুষ্ট থাকি, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানলাভেও আমরা যত্নবান হই না। এটি অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। ব্রিটিশ নভোবস্তুবিদ এডিংটন (Edington) বলেছেন, 'যার ওপর সত্য নির্ভর করে, বাস্তব জগতে তার স্থান থাকতেই হবে।' এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান না থাকলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ জগৎ অর্ধ-শিক্ষিত লোকে ভর্তি, যারা নিজেদের সম্বন্ধে কিছু জানে না, যারা মহত্তর সত্য সম্বন্ধেও কিছু জানে না, কিন্তু আচার্য বা জগতের ত্রাণকর্তা বলে নিজেদের জাহির করেন। এ সব লোক জগৎকে ধ্বংস করতে উদ্যত। এখন আবার সেই উপনিষদের আখ্যানে ফিরে আসা যাক। সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কতদূর জেনেছেন। নারদ তাঁর ব্যাকরণ, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া, বেদ প্রভৃতি সমেত অধীত বিষয়ের দীর্ঘ তালিকা দিলেন। এবং সেই সঙ্গে বললেন : 'আমি কেবল শাস্ত্রের মন্ত্রই শিখেছি, আত্মার বিষয়ে কিছু শিখিনি। শুনেছি যে আত্মাকে জেনেছে, সেই দুঃখের পারে যেতে পারে।'[৭] সনৎকুমার অসীম দরদ দিয়ে কথাগুলি শুনলেন। তিনি নারদকে ব্রহ্মবিদ্যা শেখাতে লাগলেন। প্রথমে বললেন,

৭ ছান্দোগ্য উপ:, ৭।১।৩

বাক্ই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের বিকাশের একটি দিক। বাকের উর্ধ্বে মন, মনের উর্ধ্বে সঙ্কল্প, তার উর্ধ্বে মনের উপাদান, আরো উর্ধ্বে ধ্যান, অন্তর্জ্ঞান, পঞ্চভূত, প্রাণাদি; উচ্চতম স্তর হলো আনন্দ। বোধশক্তি উন্মেষের বিষয়ে শিষ্যকে ধাপে ধাপে উপদেশ দিয়ে সনৎকুমার এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘোষণা করলেন ঃ 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি'—যা অসীম একমাত্র তাতেই আনন্দ। যা সীমিত তাতে কোন আনন্দ নেই।[৮]

## মনকে কি করে শুদ্ধ করা যায়

সমস্যা হলো আমাদের জীবাত্মা চায় অসীম আনন্দ, অসীম প্রেম, অসীম দিব্যানন্দ, কিন্তু আমরা তা পেতে চেষ্টা করি সীমার মধ্যে; আর সফল না হলে হতাশ হয়ে পড়ি। *গুরু* বলেছেন, 'তুমি যদি প্রকৃত আনন্দ, সীমাহীন আনন্দ চাও, তোমাকে সেই অসীমের বা ভূমার কাছে পৌঁছতে হবে।' নারদের পরবর্তী প্রশ্ন হলো ঃ 'অসীম' বা 'ভূমা' কথাটির অর্থ কি? 'ইনি সেই সর্বানুস্যূত সদ্‌বস্তু যা সর্বত্র বিরাজমান—উপরে, নিচে, দক্ষিণে ও উত্তরে। তাঁকে লাভ করলে তুমি অন্য কিছুকে দেখবে না, শুনবে না, জানবে না। ইনি অনন্ত চৈতন্য।'[৯] কিন্তু এঁকে লাভ করা যাবে কিভাবে? এই ভূমাকে এখনই সরাসরি লাভ করতে কিসের বাধা? এইখানেই প্রাচীনযুগের এই মহান আচার্য সনৎকুমার অধ্যাত্ম সাধনার সংক্ষিপ্ত-সার অল্প কথায় বলেছেন ঃ

**আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ**
**স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।**

—যখন *আহার* (যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি) শুদ্ধ হয়, আমাদের মন শুদ্ধ হয়, আর যখন মন শুদ্ধ হয়, আমাদের স্মৃতি স্থির হয়, অর্থাৎ আমরা আমাদের অধ্যাত্ম সত্তাকে স্মরণ করতে পারি এবং ধীরে ধীরে অধ্যাত্ম-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হই। এর ফলে হৃদয়ের বন্ধন খুলে যায় ও আমরা মুক্তির পথে চালিত হই।[১০]

আমরা যখন অনন্ত চৈতন্যকে উপলব্ধি করি তখনই সব বন্ধন ও দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করি। যখন আমরা অনুভব করি যে আমরা সেই অনন্ত চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত, তখনই আমাদের জীবন-মৃত্যুর সর্বৈব সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়।

এখন *আহার* কথাটির অর্থ একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। আমরা যা কিছু অন্তরে গ্রহণ করি তাই *আহার*। খাদ্যই কি এর একমাত্র অর্থ? পবিত্র সাত্ত্বিক খাদ্য? পবিত্র নিরামিষ আহার! এর থেকে কতটা সাহায্য আমরা পেতে পারি? এতে সামান্যই সাহায্য হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি মনকে শুদ্ধ করার উপায় না জান

---

৮ ছান্দোগ্য উপঃ, ৭/২৩/১ ৯ তদেব, ৭/২৪/১; ৭/২৫/১ ১০ তদেব, ৭/২৬/২

বিশেষ কিছুই হবে না। বহু দুষ্ট প্রকৃতির লোক নিরামিষাশী। তারা কি রকম নিরামিষাশী? প্রভুর আশীর্বাদ তাদের ওপর বর্ষিত হোক। বিষধর সাপকে খাঁটি দুধ খাওয়ালে সে কেবল বিষই উৎপাদন করে। তাই শুদ্ধ খাদ্যে পেট ভর্তি করলেই হবে না আমাদের বিষ-বৃত্তিকেই দূর করতে হবে। তাই শঙ্কর উপরোক্ত উদ্ধৃতির ভাষ্যে বলেছেন ঃ

> **যা গ্রহণ করা হয় তাই আহার, যথা শব্দাদির অভিজ্ঞতা যা গ্রহীতার অভিজ্ঞতার জন্য গ্রহণ করা হয়; আর যখন এই বিষয়-বোধ শুদ্ধ হয় অর্থাৎ যখন এই বিষয়-বোধ দ্বেষ, আসক্তি বা ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়—তখন এই বোধের যে অধিকারী তার অন্তঃপ্রকৃতি শুদ্ধ হয়।**[১১]

তোমরা কেউ হয়তো 'তিন জাপানী বানরকে' দেখেছ। এরা হলো তিনটি বানর-পুতুল। একটা বানর দুটো কানকেই চাপা দিয়ে রেখেছে, আর একটা দুটো চোখকে, আর তৃতীয়টা মুখকে। আমি ইওরোপে সুইজারল্যাণ্ডের এক হ্রদের তীরে খোদাই করা এক প্রস্তর ফলক দেখেছিলাম। তাতেও তিনটি বানর ছিল, তবে তফাত এই যে; একটির কেবল এক চক্ষু বন্ধ, অপরটির কেবল এক কান বন্ধ আর তৃতীয়টির আধখানা মুখ ঢাকা। আমি মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে এসে গেল এর অর্থ। 'যা মন্দ তা দেখ না, যা ভাল তাই দেখবে। যা মন্দ তা শুনবে না, যা ভাল তাই শুনবে। যা মন্দ তা বলো না, যা ভাল তাই বলবে।' প্রথমে ভেবেছিলাম ভাবটি মৌলিক আবিষ্কার। পরক্ষণেই সেই বৈদিক প্রার্থনার দিকে মন গেল ঃ

> **ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।**
> **স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।**[১২]

—হে দেবগণ! আমরা যেন কানগুলি দিয়ে কল্যাণ বচনই শুনি। হে যজনীয় দেবগণ! আমরা যেন চোখগুলি দিয়ে শুভবস্তু দেখি। আমরা যেন আপনাদের স্তুতিগান করতে পারি ও দৃঢ় অবয়ব ও শরীর নিয়ে দেববিহিত জীবন যাপন করি।

এখন এগুলি আমাদের অভ্যাস করতে হবে। কিছুদিন এভাবে চলার পরে আমাদের মন কিছুটা শুদ্ধ হবে। তোমার স্বরযন্ত্রের সদ্ ব্যবহার কর। তুমি বাজে কথা বললে তার অপব্যবহার করা হয়। তা করো না। প্রভুর নাম কীর্তন কর—যে নাম তোমার পছন্দ। তোমার ভাল লাগে প্রভুর এমন একটি রূপ তুমি ধ্যান কর—যথেষ্ট ভক্তি ভরে। কিছুদিন পরে দেখবে তোমার মন শুদ্ধ হয়ে আসছে। ঈশ্বরের

---

১১ ডঃ গঙ্গানাথ ঝা কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত, *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*, (মাদ্রাজ, ভি. সি. শেষাচারী, ১৯২৩), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৯

১২ ঋগ্বেদ, ১/৮৯/৮

নাম জপে ও তাঁর রূপ দর্শনে তোমার উন্নতি হবে। পরে, তুমি তোমার **ইষ্ট** *দেবতার* ক্ষণিক দর্শন পেতে পার, এমনকি বিশ্ব-চৈতন্যের ক্ষণিক দর্শনও পেতে পার।

## যোগের আটটি ধাপ

কিভাবে আরম্ভ করবে? মহান যোগাচার্য পতঞ্জলি আমাদের সামনে আটটি ধাপের একটি আধ্যাত্মিক সোপান রেখেছেন, যা দিয়ে আমরা পূর্ণতায় পৌঁছতে পারি।

> **যম-নিয়মাসন-প্রাণায়ম-প্রত্যাহার-**
> **ধারণা-ধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি॥**[১৩]

—*যম* নামে প্রথম ধাপের অর্থ হলো পাঁচটি ব্রত পালন ঃ *অহিংসা* (বল-প্রয়োগ বর্জন), *সত্য* (সত্যপথে চলা), *অস্তেয়* (অচৌর্য), *ব্রহ্মচর্য* (ইন্দ্রিয় সংযম) এবং *অপরিগ্রহ* (অন্যের দান গ্রহণ না করা)। তারপর আসছে *নিয়ম* বা পাঁচটি চারিত্রিক বিধি। প্রথমটি হলো *শৌচ* বা দেহ-মনের পবিত্রতা রক্ষা। তারপর *সন্তোষ* বা পরিতৃপ্তি গড়ে তোলা। খুঁতখুঁতে ও পরের দোষ দেখা স্বভাব হলে, সে মন নিয়ে এই জগতে বা আধ্যাত্মিক জগতে কোন কাজে সাফল্য লাভ হবে কি করে? জগতের সব জিনিসের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে নিজের উন্নতি করতে সচেষ্ট হতে হবে। তৃতীয় নিয়ম হলো *তপঃ*। জীবনে কিছু কঠোরতা অভ্যাস করা দরকার। অধ্যাত্ম-সাধনায় কঠোর ভাবে নিয়মপালন না করায় প্রতিটি যুগ পূর্বযুগের তুলনায় শিথিল হয়ে পড়ছে। শৈথিল্য-পরায়ণ লোকেরা উন্নতি করতে পারে না। চতুর্থ নিয়ম, *স্বাধ্যায়*, বা নিজে অধ্যয়ন। আমরা বই পড়ি, কিন্তু তার কতটা আমাদের মনে প্রবেশ করে? আমরা কোন বক্তৃতা শুনে বলি খুব চমৎকার হয়েছে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কি শুনলে?' আমরা কিছুই পুনরাবৃত্তি করতে পারি না। বক্তৃতার কথাগুলি যেন এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। ভাবগুলি ধরে রাখা হয় না। *স্বাধ্যায়* মানে যা অধ্যয়ন করা হয় তার অনুধ্যান করা—সেটি নিজের করে নেওয়া। উপনিষদ্[১৪] বলেন ঃ *শ্রোতব্যঃ*, প্রথমে শুনতে বা পড়তে হবে। পরে *মন্তব্যঃ*, যা শুনেছ বা পড়েছ তা নিয়ে অনুধ্যান করতে হবে। এই হলো উপায়। নৈতিক পথে যখন কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হব, একমাত্র তখনই আমরা আধ্যাত্মিক সাধনায় উপকার পেতে থাকি। পঞ্চম নিয়ম হলো *ঈশ্বর প্রণিধান* বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। তোমার সব—দেহ, মন, আত্মা—তাঁতে সমর্পণ কর।

পতঞ্জলির মতে আধ্যাত্মিক সোপানের তৃতীয় ধাপ হলো *আসন*। তুমি তৈরি

---

১৩ পতঞ্জলি, যোগ-সূত্র, ২.২৯

১৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২.৪.৫ ও ৪.৫.৬

করা মূর্তির মতো কয়েক ঘণ্টা বসে থাকতে পার, তাতে কি পাও? প্রায় কিছুই না। অন্তত আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই; তবেই তোমার বসার ধরন আধ্যাত্মিক সাধনায় তোমাকে কিছু সহায়তা করবে।

চতুর্থ ধাপ বা অনুশীলন হলো *প্রাণায়াম*। *প্রাণায়াম* অভ্যাসে তুমি নিঃশ্বাস বন্ধ কর। কি লাভ কর? এ যদি কেবল দেহের ক্রিয়া হয়, তবে ফুটবলের ব্লাডার নিশ্চয়ই একজন বড় যোগী। শ্বাসরুদ্ধ করে তুমি কি পাও? এমনিতে কিছুই না। কিন্তু যখন মন খুব সংযত হয়, যখন মন আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্বুদ্ধ থাকে, *প্রাণায়ামের* সাহায্যে চেতনার উচ্চতর স্তরে ওঠা যায়।

পঞ্চম ধাপকে বলা হয় *প্রত্যাহার* বা অনাসক্তি। প্রত্যেকটি জিনিস থেকে মনকে সরিয়ে নিতে হবে। যখন তুমি কোন কাজে মন দাও, মন থেকে অন্য সব চিন্তা সরিয়ে দিয়ে ঐ বিশেষ কাজেই মনোনিবেশ কর। অনাসক্তি অভ্যাস না করতে পারলে তুমি নানা উদ্বেগ ডেকে আনবে। যখন ঘুমাতে যাও, তখন নানা রকম চিন্তা করলে ঘুম হবে না, তুমি অনিদ্রায় ভুগে অসুস্থ হয়ে পড়বে। সেই রকম, যদি তুমি ধ্যান করতে চাও, মনকে যথা সম্ভব সব জাগতিক বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত—এমনকি তোমার অন্তরে যেসব রূপ, চিন্তা ও আবেগ ওঠে সেগুলিকেও। কিন্তু এই অনাসক্তির জন্য তোমার মন যেন শূন্য হয়ে না পড়ে। শূন্য মন ঘুমিয়ে পড়বে। অনেকের ক্ষেত্রে ধ্যানে যেন ঘুমেরই আমন্ত্রণ হয়। সদা জাগ্রত থাক। নিজ ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা একটু বেশি করে কাজে লাগাও। ধ্যানের সময় প্রভুর নাম নিতে থাক, তা হলে ঘুমিয়ে পড়ার কোন ভয় থাকবে না। বরং মন উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকবে।

এইবার আমরা আসি ষষ্ঠ ধাপ বা অনুশীলনে, যার নাম হলো *ধারণা*। এর অর্থ মনকে খানিকক্ষণের জন্যে, একটি বিশেষ চেতনা-কেন্দ্রে—কোন ঈশ্বরীয় বিষয় বা পবিত্র শব্দ বা পবিত্র ও আনন্দময় রূপ স্থির করে রাখা। প্রথমে তোমার চেতনা-কেন্দ্রটিকে তোমার অনুভূতিতে নিয়ে এস, পরে সেখানেই মনকে কেন্দ্রীভূত কর।

সপ্তম ধাপ হলো *ধ্যান* বা মনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটি একনিবিষ্ট চিন্তা চালাতে থাকা। এখানে একাগ্রতা গভীরতর ও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়। তুমি ঈশ্বর চেতনায় নিবিষ্ট থাক, তাই তোমায় এগিয়ে নিয়ে যাবে উচ্চতম অবস্থায়, *সমাধি* বা চেতনাতীত অবস্থায়। *ধ্যান* হলো অতীন্দ্রিয় সাধনা, চৈতন্যস্বরূপে ও সত্যস্বরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করার প্রয়াস।

আরো এগুবার আগে আমরা যেন নিজেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি আমরা শরীরের সঙ্গে নিজেদের একাত্মবোধ করে থাকি, আর ভাবি আমরা নর ও নারী; আমরা কোন একটি দেবতার—দেব অথবা দেবীর—আরাধনা করি। আমরা

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন ঐভাবে আরম্ভ করি, শেষও করি ঐভাবে; কিন্তু এতে কি লাভ করি? আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়াতেই, আমরা কি করছি, সে বিষয়ে আমাদের পক্ষে সচেতন থাকা অবশ্য কর্তব্য। কিভাবে আরাধনা আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত?

## ঈশ্বরোপাসনা

*ঈশ্বরোপাসনা* বলতে আমরা কি বুঝি? ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিরূপ? ইওরোপে এক ভক্ত আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'স্বামী, ঐ *গড়* কথাটা কখনো উচ্চারণ করবেন না। এতে আমাদের ছেলেবেলার ভাবনায় মেঘের পরপারে থাকা এমন একজনের ছবি মনে ভেসে আসে, যিনি তাঁর নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের শাস্তিবিধানে সদা উন্মুখ। আমি সে চিন্তা করতে পারি না।' আমি বলি, 'আচ্ছা, *ঈশ্বর* কথাটি ব্যবহার কর। আমি ব্রহ্ম কথাটিই ব্যবহার করে থাকি।'

যদি আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি, আমরা অবশ্যই অনুভব করব তাঁর সান্নিধ্য। সচরাচর আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা রূপে চিন্তা করে থাকি। তিনি সব জিনিসকে নিজের কাছেই ফিরিয়ে নেন; তাকেই আমরা বলি সংহার (বা লয়) করা। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি এ সবের থেকে বহুগুণ বেশি ঃ তিনি আমাদের সকলের আত্মার আত্মা বা পরমাত্মা, সব থেকে যা কাছে তার থেকেও কাছে, সব থেকে যা প্রিয় তার থেকেও প্রিয়। এ সত্য উপলব্ধি করতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে যে, আমরা এক একটি আত্মা। আমাদের জানতে হবে যে, আমরা পরমাত্মা-স্বরূপ—মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়বর্গ ও দেহ থেকে স্বতন্ত্র। আমরা এক একটি আত্মা—অনন্ত চৈতন্যের অংশ; এ কথা না জেনে আমরা ঈশ্বরকে, যিনি সকল আত্মার আত্মা পরমাত্মা, পরম চৈতন্য, তাঁকে জানতে সক্ষম হব না।

তিনি আমাদের কাছে পিতা মাতা রূপে আসেন। তিনি আমাদের কাছে 'গুরু' রূপে আসেন এবং আরো আসেন আমাদের *ইষ্ট দেবতারূপে*, যে মনোনীত দেবতার আরাধনা আমরা করে থাকি। দ্বৈত বেদান্তের মতে—আর আমাদের অধিকাংশই দ্বৈতভাবে সাধনা আরম্ভ করে থাকি—আত্মা ও প্রত্যগাত্মা, আত্মা ও পরমাত্মা সদা স্বতন্ত্র, কিন্তু সদাই যুক্ত। উপাসনার শুরুতেই আমাদের জানা থাকা চাই যে, অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার রয়েছে চিরন্তন সম্পর্ক। এঁদের মিলন শাশ্বত; তবু মনের মালিন্যের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ছেড়ে তাঁর সৃষ্টিতে আসক্ত হয়ে পড়ি। সাধারণ ধার্মিক লোকেদের ব্যবহারিক জীবন দেখে এক বিখ্যাত পশ্চিমী মনস্তাত্ত্বিক একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'লোকে ঈশ্বরকে চায় না, তারা তাঁকে কাজে লাগাতে চায়!'

তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তিনি যেন তাদের বাসনাগুলি পূর্ণ করে দেন। তিনি যদি বাসনা পূরণ না করেন তবে সে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে বলে, 'ওহো! ঈশ্বর নেই, আর যদি তিনি থাকেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বধির ও অন্ধ। তিনি সাড়া দেন না।' ওই রকম বালকের মতো ধারণার কোন মূল্য নেই। তুমি চাওয়া মাত্র সর্বদা তোমার বাসনা পূরণ করবেন, তুমি কেবল এ রকম ভাল ঈশ্বরকেই চাও, যেন তোমাকে বর দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ নেই।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরম চৈতন্যের উপাসনায় প্রথমে সৃষ্টি শক্তির একটি প্রতীক রূপে—কালীমূর্তিকে অবলম্বন করেছিলেন। কালী প্রতিমা একটি প্রতীক বটে, কিন্তু খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। এক হাতে তিনি সৃষ্টি করছেন, অন্য হাতে তিনি পালন করছেন, তৃতীয় হাতে তিনি সংহার করছেন এবং চতুর্থ হাতে তিনি কাটা মুণ্ড ধরে আছেন। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যা বলা হয়েছে, এ কেবল তারই স্থূল প্রতীক। পুত্র পিতাকে জিজ্ঞেস করল, 'পিতঃ! আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিন।' পিতা উত্তর দিলেন ঃ

**যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।**
**যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।**[১০]

—তাঁকেই উপলব্ধি কর, যাঁর থেকে অখিল ভূতবস্তুর উৎপত্তি, যাঁর দ্বারা এই সব ভূতবস্তু জীবন ধারণ করে থাকে এবং শেষে যাতে ফিরে যায়, তিনিই ব্রহ্ম।

আমাদের ভক্তি শাস্ত্রে ব্রহ্মকে আমরা নানা নামে ডেকে থাকি—যেমন কালী, নারায়ণ বা শিব। বেদান্তে একেই ঈশ্বর বা সচ্চিদানন্দ, অনন্ত অস্তিত্ব-চেতনা-আনন্দ বলা হয়। তিনি থাকেন আমাদের জীবাত্মায়—আত্মার আত্মারূপে। আবার আমরাও তাঁতেই থাকি। আমাদের এটি অনুভূতিতে আনতেই হবে, অন্তত তাঁর সান্নিধ্য। যদি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে নাও পারি, তবে তিনি যে আমাদের নিকটতম থেকে নিকটতর, প্রিয়তম থেকে প্রিয়তর, এই চেতনা আমাদের ভেতর জাগিয়ে তুলতেই হবে।

আমি যেমন আগে বলেছি, এর জন্য আমাদের চাই—ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা। কিন্তু আমাদের ধারণায় আনার পক্ষে ঈশ্বর খুবই বিরাট। আমি একটা উদাহরণ নিই ঃ আমরা যেন ছোট ছোট জল বুদ্বুদ। মহাসাগর এত বড় যে আমাদের ধারণারও বাইরে। তাই আমাদের কি করতে হবে? বড় বড় ঢেউ আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, তাদের দিকে এগুতে হবে—তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে হবে এবং সময় হলেই, তাদের মাধ্যমে আমাদের মহাসাগর সম্বন্ধে ধারণা হবে। ঠিক সেই

১১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১।১

রকম আধ্যাত্মিক পথে আমাদের *ইষ্ট দেবতা* রূপ এক বিরাট পর্বতপ্রতিম ঢেউকে অবলম্বন করে আমরা যাত্রা আরম্ভ করি। আমরা তাঁর উপাসনা করি, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, আর এই সবের মাধ্যমে এক উচ্চতর চেতনা লাভ করি এবং সত্যবস্তু সম্বন্ধে বিস্তৃততর ধারণা পাই। *ইষ্ট দেবতা* বলে দেন ঃ 'এই দেখ, আমি একটা বড় ঢেউ হতে পারি, আর তুমি একটি ছোট বুদ্বুদ হতে পার; কিন্তু আমাদের সকলের পেছনে রয়েছেন সেই অনন্ত মহাসাগর।' যখন উপযুক্ত সময় আসে, তিনিই আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ সত্যকে উদ্ঘাটিত করেন। তিনি প্রকাশ করে দেন যে—অনন্ত চৈতন্য ছাড়া তিনি অন্য কিছু নন।

## জপ ও ধ্যান

অনন্ত চৈতন্যের উপলব্ধি সহসা হয় না। আমরা যেখানে রয়েছি, সেখান থেকেই আমাদের আরম্ভ করতে হবে ও এমন পথ ধরতে হবে যার সাহায্যে আমরা শেষ পর্যন্ত সেই চৈতন্যে পৌঁছতে পারি। অধ্যাত্ম জীবন পর্বত আরোহণের মতো। আমাদের ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠতে হবে, ধীরে ও সাবধানে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন ঃ

> **বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোকের উদাহরণ নেওয়া যাক; সে ছাদে উঠতে চায়, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে না উঠে, সে চাইল কেউ তার শরীরটাকে ছুঁড়ে দিক। কি ঘটল? সে মারাত্মক ভাবে আঘাত পেল। আধ্যাত্মিক জীবনেও সেই রকম হয়।**[১৬]

রাতারাতি এক প্রবুদ্ধ-আত্মা হয়ে পড়বে সে আশা করো না। সহজ অনুষ্ঠান দিয়ে আরম্ভ কর। প্রথম ধাপ হিসাবে *জপ*—বার বার ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ খুবই ফলপ্রদ। কিন্তু তোতাপাখির মতো জপ করলে হবে না। পতঞ্জলি বলেছেন ঃ *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।*[১৭] যেমন বার বার নাম উচ্চারণ করবে, তেমন তার *অর্থভাবনা* করতে থাকবে। *অর্থভাবনা* কাকে বলে? অর্থ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করা। *মন্ত্রের* অর্থ কি? অধ্যাত্ম-জীবনে এগুতে থাকলে *মন্ত্রের* গভীর থেকে গভীরতর অর্থ ক্রমে বোঝা যায়। প্রথমত *ইষ্ট-দেবতার* তেজোময় আনন্দময় মূর্তি চিন্তা কর। পরে তাঁকে অনন্ত পবিত্রতা, জ্ঞান, ভক্তি, করুণা, প্রেম ও আনন্দের প্রতিমূর্তিরূপে চিন্তা কর। তারপর ভাব যে তিনি অন্য কেউ নন—তিনিই পরমাত্মা যিনি সর্বানুস্যূত চৈতন্যরূপে সর্বজীবের অন্তরে বিরাজ করছেন।

আমরা *ধ্যানের* কথা বলি। তুমি বল 'আমি ধ্যান করছি।' তুমি কিসের ধ্যান

---

১৬ Swami Prabhavananda, *The Eternal Companion* [Madras : Sri Ramakrishna Math, 1971] p. 245

১৭ পতঞ্জলি, যোগসূত্র, ১.২৮

করছ? এটার ওটার চিন্তায় মনটাকে ভরিয়ে রাখছ তো? *ধ্যান* বলতে তা বোঝায় না। *ধ্যান* হলো চেতনার উচ্চতর আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে অবস্থিত উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোত। তুমি যখন প্রভুর চিন্তা কর, তুমি দিব্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাও। কিন্তু এই মগ্নতা হঠাৎ আসে না। *জপ* হলো ঐদিকে যাবার একটি সোপান। ঈশ্বরের নাম জপ কর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তা কর, তখন মন কিছুটা শান্ত হবে এমনকি শব্দও থেমে যাবে। এইভাবে তুমি যতই তাঁর চিন্তা চালিয়ে যাবে, অন্য সব জাগতিক বস্তুর চেয়ে *ইষ্ট দেবতা* আরো বেশি বেশি বাস্তব রূপ নেবেন। স্বাভাবিক ভাবেই মন তাঁতেই আবিষ্ট হয়ে থাকবে আর তুমি ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় সত্তা, প্রেম ও আনন্দের আস্বাদ পেতে থাকবে। ঈশ্বর আমাদের কাছে আসতে পারেন *ইষ্ট দেবতা*রূপে, আবার পরম চৈতন্যরূপে, সচ্চিদানন্দরূপে অর্থাৎ অনন্ত অস্তিত্ব-চেতনা-আনন্দরূপে। আধ্যাত্মিক অনুশীলন নিয়মিত করে চললেই এগুলি ঘটে থাকে।

প্রথম প্রথম *ইষ্ট দেবতার* ছবির সাহায্য নেওয়া ভাল। ঐ ছবির দিকে তাকিয়ে থাক, ঐ ছবিতে মন একাগ্র কর। আরো ভাল হবে যদি ঐ ছবি, ঐ পবিত্র মূর্তি তোমার অন্তরে বসাতে পার। তা হলে আর তোমাকে কোন বাইরের জিনিসের ওপর নির্ভর করতে হবে না। তোমার যখনই প্রয়োজন হবে, অন্তরে দৃষ্টি ফেরালেই দেখবে *ইষ্ট দেবতা* বসে রয়েছেন, আর তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবে। তাঁর নাম জপ কর, তাঁরই ধ্যান কর—প্রথমে তাঁর মূর্তির, পরে তাঁর গুণের, শেষে তাঁর অনন্ত *স্বরূপের*। এই ভাবেই ধ্যানের পথে এগুনো যায়।

আমাদের 'হৃৎপদ্মে' ধ্যান করতে বলা হয়। এই হৃদয়টি কি? এটি কি দেহের হৃদ্‌যন্ত্র? না, আমরা সেখানে কিছুই করতে পারি না। এখানে হৃদয়ের রাজ্যে অনুভূত আমাদের অন্তরতর চেতনা কেন্দ্রটিকে বোঝানো হয়েছে। আমাদের আত্ম-চেতনাই আমাদের দেহ-মনে অনুস্যূত হয়ে আছে। এ সেই আত্ম-চেতনা যা পরমাত্মার চেতনা থেকে অভিন্ন। এর ভেতর কোন বস্তু না থাকায় একে আকাশের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, তাই এর নাম *চিদাকাশ*। এই *চিদাকাশেই* আমাদের ধ্যান করতে হবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে, আমরা যেন ভক্ত আর *ইষ্ট-দেবতা* যেন পরমাত্মার প্রকাশ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের বলতেন, 'আপন হৃদয়-মন্দিরের ভেতরে ধ্যান করতে চেষ্টা কর। এই অভ্যাসটি চালিয়ে গেলেই এই মন্দির যে কি তার অনুভূতি তোমার হবে।'[১৮] সেটাই একমাত্র সত্য। *চিদাকাশ* বা হৃদয় কি বস্তু তা জানতে হলে আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন। প্রথমে তুমি মনে করতে পার এটি যেন *মহাকাশ* বা

১৮ পূর্বোল্লিখিত *The Eternal Companion*, p. 269

বহিরাকাশের মতো, পরে তুমি মনে করতে পার এটি যেন ব্রহ্মাণ্ড মনোজগৎ। প্রকৃত হৃদয় বা 'চিদাকাশ' রয়েছে শুদ্ধ-চেতনার রাজ্যে। সেখানে জীবাত্মা বা চেতনার একক, অনন্তকাল ধরে অনন্ত চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে আছেন। ঐ হৃদয়াকাশেই *ইষ্ট-দেবতার* ধ্যান করতে হবে তোমাকে।

ফিরে যাওয়া যাক পতঞ্জলির যোগসূত্রে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তিনি বলেছেন কি করে *জপ* করতে হয়—যথা, *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্* (জপ কর, সঙ্গে সঙ্গে ঐ শব্দের তাৎপর্য, বিষয়বস্তু ও গূঢ়ার্থ চিন্তা করতে থাক)। তা করলে কি হবে? পতঞ্জলি বলেন,

**ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥**

—বাধাগুলি দূর হবে, আর নতুন আধ্যাত্মিক চেতনা জেগে উঠবে।[১৯]

*জপ* ও সহজ *ধ্যানের* সাহায্যে বাধাগুলি দূর হয়ে যায়। কি করে তা হয়? এইভাবে তা বোঝানো যায় ঃ আমরা সব সময় ঝঞ্ঝাট ও উদ্বেগ সৃষ্টি করছি, সর্বদা অসৎ চিন্তার উৎপত্তি ঘটাচ্ছি। এই অসৎ চিন্তাগুলি মনকে অশান্ত করে ও শরীরকে দুর্বল করে। আমরা সৎচিন্তা যত করব, শুদ্ধ মন্ত্র যত বেশি জপ করব আর ঈশ্বরের আনন্দময় রূপের ধ্যান যত করব—মন পর্যাপ্ত সমন্বয়ে তত বেশি স্থিতি লাভ করবে। অসুস্থতা, যা নিজেরই সৃষ্টি, তাও ঝরে পড়বে। মনে সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হলে, শরীরের ওপর বাহ্যত তার প্রতিফলন হয়। তাই, ঈশ্বরের নাম জপ করলে মানসিক স্বাস্থ্য ও কিছুটা শারীরিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় এবং নামের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা হয়। পবিত্র মূর্তিধ্যানের শক্তি সহায়ে গুপ্ত সম্ভাবনাপূর্ণ এক নতুন আধ্যাত্মিক চেতনা আত্মপ্রকাশ করেন। তখন আমরা আবিষ্কার করি যে, আমরা এই সব শরীর মাত্র নই, পরন্তু কতকগুলি আত্মা। আরো আবিষ্কার করি যে, *ইষ্ট দেবতা*—পরমাত্মা—পরম শান্তি, পরম আনন্দ ও পরম প্রেমের উৎস ছাড়া অন্য কিছু নন। ঈশ্বরের নামের এমনই শক্তি।

## আধ্যাত্মিক জীবন সেবার জীবন

যোগের সাতটি ধাপ সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। অষ্টম ধাপটি কি? পতঞ্জলির মতে অষ্টম ধাপ হলো 'সমাধি', যে অবস্থায় তুমি পরমাত্মাকে, সেই পরম আধ্যাত্মিক আনন্দের উৎসকে উপলব্ধি করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তিন রকম 'আনন্দের' বা সুখের কথা বলেছেন।[২০] প্রথমটি হলো

---

১৯ পতঞ্জলি, যোগসূত্র, ১/২৯

২০ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৪৮১

*বিষয়ানন্দ* অর্থাৎ যে সুখ আসে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে। দ্বিতীয়টি হলো *ভজনানন্দ*—যে আনন্দ আসে *ভজন* (বাক্যগত উপাসনা), *জপ* ও *ধ্যান* এর মাধ্যমে। শেষে আসে *ব্রহ্মানন্দ*—যে পরম আনন্দ উদ্ভূত হয় *সমাধি* কালে অনন্ত আত্মার উপলব্ধিতে। *ব্রহ্মানন্দ* লাভ করা কঠিন। এ হলো কঠোর সাধনার পরাকাষ্ঠা এবং ঈশ্বরের কৃপা লাভ। কিন্তু সে আনন্দ লাভ করার আগেও আমরা উপাসনার আনন্দ ভোগ করতে পারি। আধ্যাত্মিক জীবনে যতটা সম্ভব *ভজনানন্দ* লাভের চেষ্টা করতে হবে। এটি আমাদের নাগালের মধ্যে। *জপের* মাধ্যমে, প্রভুর আনন্দময় রূপের *ধ্যানের* মাধ্যমে যে আনন্দ পাই—তা যেন আমরা সঙ্গী অধ্যাত্ম-সাধকদের সঙ্গে ভাগ করে নিই। তাই এইরকম আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ভক্তেরা যখন জড় হয়, তারা তখন ঈশ্বরের নাম জপ করে ও তাঁর মহিমা কীর্তন করে। অন্তত কিছু সময়ের জন্য তারা জগতের দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকে। মন উচ্চস্তরে উঠে যায় আর পরম সত্তায় যে আনন্দ তার কিছু অংশ, পরম চৈতন্যে যে শান্তি তার কিছু, তাদের জীবাত্মায় এসে পৌঁছয়, কিন্তু যেমন বলেছি, এইখানেই সাধকের থেমে থাকা উচিত হবে না। আমাদের মহান আচার্য আমাদের বলতেন, 'তুমি যেমন এগিয়ে যাবে, অন্যদেরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।' যে জ্ঞান লাভ করেছে, একমাত্র সেইই প্রকৃত আচার্য হতে পারে কিন্তু অপরের সেবার উদ্দেশ্যে এ কাজে প্রথমেই পূর্ণ জ্ঞানী হবার প্রয়োজন নেই। আমি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র, শিক্ষকের অভাব হলে আমি নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতে পারি এতে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের কিছু সেবা করা হলো। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ জ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক স্তরেই আমাদের সাধন পথের সাথীদের কিছু সেবা করা সম্ভব।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্যদের পদতলে বসে আমরা যে ধর্ম শিখেছি, তাতে অহং-কেন্দ্রিক না হয়ে, সর্বভূতে বিরাজমান ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে শেখানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের কিছু কথা সর্বদা আমার মনে আসে, 'আমরা যেন আগে নিজেরা ঈশ্বর হই, পরে অপরকে ঈশ্বর হতে সহায়তা করি।'[২২] কি অর্থে স্বামীজী এ কথা বলেছিলেন? আমাদের প্রত্যেকেরই এমনভাবে জীবন যাপন করা উচিত যাতে আমরা যেন শুধু নিজেরাই আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ক্ষান্ত না হই, পরন্তু অন্যের কল্যাণে কাজ করতেও যেন সক্ষম হই। আমাদের ঈশ্বরোপলব্ধি করতে হবে, আপন সত্তার অন্তরতম প্রদেশে। পরে আমাদের অনুভব করতে হবে, তিনি যেন সর্বভূতে অভিব্যক্ত রয়েছেন। স্বামীজীর নিজের এরকম অখণ্ড দর্শন হয়েছিল এবং তাঁর এই উপলব্ধিই হলো

২২ The Complete Works of Swami Vivekananda. (Kolkata, Advaita Ashrama, 1972) Vol-IV, p. 351

রামকৃষ্ণ আন্দোলনের নানা সেবা কার্যের অনুপ্রেরণা ও ভিত্তিস্বরূপ ঃ যে আন্দোলনে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষণ সেবা, প্রচার ও প্রকাশন। উদ্দেশ্য হলো সর্বভূতে বিরাজমান ঈশ্বরের সেবা। ঠিক যেমন আমরা নিজে মুক্তিলাভের চেষ্টা করি, আমাদের উচিত অপরকেও মুক্তিলাভে সহায়তা করা। এই হলো সেই অখণ্ড পথ, সমন্বয়ের পথ যাকে আমরা সবাই কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি। এর মধ্যে সব কটি যোগই রয়েছে—*কর্ম, ধ্যান, ভক্তি* ও *জ্ঞান*।

স্বামীজী যেমন বলেছেন, শ্রেষ্ঠ আদর্শ হলো ঃ প্রথমে আমরা নিজেরা ঈশ্বর হই, পরে অপরকে ঈশ্বর হতে সাহায্য করি। আমরা যদি নিজেরা কিছুটা এগিয়ে যাই, তবে অপরকেও কিছুটা এগুতে সাহায্য করতে পারি। এই ভাবেই আমাদের স্বামীজীর ঃ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—'নিজ উপলব্ধি ও বন্ধন-মুক্তির চেষ্টার সঙ্গেই অপরকে সেবা করা'-রূপ মহান আদর্শকে কাজে লাগাতে হবে।[২২] আমরা নিজেরা যেমন উন্নত হব, তেমনি আমরা যেন আমাদের অল্প সামর্থ্য অনুযায়ী অপরের সেবাও করতে চেষ্টা করি। আমরা যেমন নিজ নিজ আধ্যাত্মিক সাধনা করে থাকি, যেমন আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হই, তেমনি যেন অপরের সেবা করতেও চেষ্টিত হই—এই দুদিক দিয়ে কাজ আমাদের অন্তরের পবিত্রতা লাভে সহায়তা করবে, তাই আবার আমাদের সাহায্য করবে দৈব সত্তা, দৈব প্রেম ও দৈব আনন্দ লাভে। আমাদের সামনে এই মহান আদর্শ রয়েছে, সেই আদর্শে পৌঁছবার জন্যে আমরা প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ পথে ধাপে ধাপে, জমির প্রতিটি ইঞ্চি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে এগিয়ে যাই।

---

২২ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

# ধ্যানশীল জীবনে যা অবশ্য করণীয়

## আমাদের সামনে যে পথ রয়েছে

প্রথমত আধ্যাত্মিক আদর্শটিকে স্পষ্টভাবে সামনে তুলে ধরা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সাংখ্য নামে প্রাচীন চিন্তাধারায় দু-রকমমাত্র সত্তার কথা আছে—পুরুষ বা আত্মা যা শুদ্ধ-চেতনাস্বরূপ, আর প্রকৃতি বা সৃষ্টি-শক্তি। বেদান্তে মানবের গূঢ় সত্তাকে *আত্মা* বলে, আর সব আত্মাই এক অনন্ত সর্বানুস্যূত পরম চৈতন্যের অংশ—ঐ পরম চৈতন্যকেই *পরমাত্মা* বা *ব্রহ্ম* বলা হয়। তাই বেদান্তে আত্মানুভূতি বলতে ঈশ্বরানুভূতি বোঝায়। আমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে, আত্মা বা জীব-সত্তা ও পরমাত্মা বা সকল আত্মার আত্মা আছেন, তাদের আকাঙ্ক্ষা হলো নিজের ও সকল জীবের অন্তরে তাঁর (পরমাত্মার) সঙ্গে মিলিত হওয়া। আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের উদ্দেশ্য হলো এই সর্বানুস্যূত ঈশ্বরের অনুভূতি।

ছাত্র অবস্থায় আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্যদের কাছে যেতাম, তাঁরা আমাদের কাছে এই আত্মানুভূতির আদর্শই রাখতেন। কিন্তু আত্মানুভূতি বলতে তাঁরা সাধারণের পক্ষে অগম্য এমন একটা কিছু বোঝাতেন না। তাঁরা স্পষ্টভাবে আমাদের বলতেন যে, নিজ উচ্চ সত্তা বা জীবাত্মার দিকে যত এগুবে, ততই পরমাত্মার অনুভূতি হতে থাকবে, ততই বোধ হবে সবের মধ্যেই তিনি প্রকাশিত তারপর সাধকের মনে সকলের অন্তরস্থ প্রভুর সেবা করার বাসনা জাগবে। কিন্তু তার আগে প্রার্থনা ও উপাসনার মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণ করে, নিজ আত্মা ও প্রত্যেকের অন্তরে যে দেবতা রয়েছেন তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করে নিতে হবে।

এই হলো আদর্শ। এখন প্রশ্ন উঠবে : আমরা কোন্ পথ অনুসরণ করব? এক্ষেত্রে তাঁরা মুক্তি ও সেবা রূপ দ্বিমুখী আদর্শ রেখেছেন। কাজ আর পূজা এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলবে। কাজ করতে হবে সর্বভূতে যে ঈশ্বর রয়েছেন তাঁর সেবা করছি মনে করে। আমরা অনেক রকম কাজ করি, কিন্তু আমরা জানি না, কিভাবে তা করতে হয়, কিভাবে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হয়, কিভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে নিজেদের নানা কাজে যুক্ত রাখা যায়। প্রথমে

কর্তব্যবুদ্ধি নিয়েই কাজ করতে হবে। সর্ব অবস্থাতেই কর্তব্য কর্ম করতেই হবে এবং পরে যত অগ্রসর হব, আমাদের অনুভূতি হবে যে, সমস্ত কর্মফল সকল কর্মের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই পরম চৈতন্যে সমর্পণ করতে হবে। এর পরে এক সময়ে আমরা প্রশ্ন করি, কেন আমরা কাজ করব? উত্তর মনের মধ্যে এসে যায় ঃ প্রভুর প্রীতির জন্য। পরে আবার এক সময়ে আমাদের অনুভূতি হয় যে, ঈশ্বরীয় সত্তা আমাদের মধ্যে অনুস্যূত ও ওতপ্রোত হয়ে আছে। তখনই আমরা দিব্যশক্তির প্রবাহ মুখ হয়ে যাই—সেই দিব্যশক্তি যা মানবকল্যাণে ব্রতী হয়।

## তোমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা হোক

কাজ যেমন করতে হয় ঠিক ভাবটি নিয়ে, তেমনি উপাসনাও করতে হয় সঠিক পদ্ধতিতে। আমাদের সকলকেই কোন না কোন কাজ করতে হয়। কাজ বাধ্যতামূলক, কিন্তু উপাসনা হলো ঐচ্ছিক। অধিকাংশ লোকের কোন রকম উপাসনা বা *জপ* বা ধ্যান করায় আগ্রহ বোধ হয় না, আর তা খুবই দুঃখের বিষয়। আমাদের যদি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা থাকে, তবেই আমরা আধ্যাত্মিক খাদ্য গ্রহণে উদ্যোগী হব। আমরা শরীরকে খাওয়াই, পুষ্টিকর খাদ্য দিয়েই শরীরকে খাওয়ানো উচিত। আমরা মনকে খাওয়াই অধ্যয়নের মাধ্যমে—তাতে ভাল ভাব থাকা চাই। সেই রকম মানবাত্মারও খাদ্য চাই। তা কিভাবে দিতে হবে? উপাসনা, *জপ*, ধ্যানের মাধ্যমে।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি রূপক কাহিনী আছে ঃ এক শিশু শুতে যাবার সময় মাকে বলল, 'মা, আমার ক্ষিদে পেলে, আমাকে জাগিয়ে দিও।' মা বললে, 'আমাকে তা করতে হবে না, তোমার ক্ষিদেই তোমাকে জাগিয়ে দেবে।'[১] আত্মচেতনার ক্রমবিকাশের পথে এমন সময় আসে যখন আমরা আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় ক্ষুধিত হয়ে বহু যুগের নিদ্রা থেকে জেগে উঠি। কিন্তু কেবল জাগাই যথেষ্ট নয়। আমাদের খুব খাটতে হবে। শ্রীশ্রীমায়ের একটি চমৎকার কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন ঃ 'ঘরে নানা রকম খাদ্যের উপকরণ থাকতে পারে, কিন্তু কাউকে রাঁধতে হবে। যে আগে আগে রাঁধবে, সেই আগে খেতে পাবে।'[২] আমরা অনেকেই অলস, আমরা ঠিক সময়ে রাঁধতে চাই না; হয়তো আমরা রাঁধতে চাই, কিন্তু দেরিতে—সন্ধ্যার সময়; আর কোন কোন লোক এত অলস যে তারা উপোস করবে, তবু রাঁধবে না! কাজেই তারা আধ্যাত্মিক জীবন থেকে বিশেষ কিছুই পায় না, দুঃখ পায়।

---

১ *The Gospel of Sri Ramakrishna*, trans. Swami Nikhilananda. (Madras : Sri Ramakrishna Math 1974), pp. 93, 424 বি. দ্রঃ *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে* (পৃঃ ১২৮ ও ৪৭২) এই কাহিনীটি একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে।

২ *Sri Sarada Devi*, The Holy Mother [Madras : Sri R.K. Math 1958] p. 520

## স্বামী ব্রহ্মানন্দ কি শিখিয়েছিলেন

যখন আমরা স্থির হয়ে বসে কোন রকম মানসপূজা, কোন রকম *জপ* বা ধ্যান করতে চেষ্টা করি, প্রথমে আমরা অনেক বাধা পাই। এটাই স্বাভাবিক—এই ভাবেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের বলতেন। এখানে, স্বামীর আধ্যাত্মিক উপদেশ সম্বলিত বইখানি থেকে কিছু পড়ব। তিনি বলতেন ঃ

'*জপ* ও ধ্যান নিয়মিত অভ্যাস কর। একদিনও যেন বাদ না যায়। মন দুষ্ট শিশুর মতো—সদা চঞ্চল। ইষ্ট দেবতায় মনঃসংযোগ করে বার বার মনকে স্থির করতে চেষ্টা কর, শেষে তুমি তাঁতেই মগ্ন হয়ে যাবে। তুমি যদি দু-তিন বছর এই অভ্যাস চালিয়ে যাও, তুমি অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করতে আরম্ভ করবে আর মন স্থির হয়ে আসবে। প্রথম প্রথম *জপ* ও ধ্যানের অভ্যাস নীরস মনে হয় তেতো ওষুধ খাওয়ার মতো। তোমাকে জোর করে মনে ঈশ্বর চিন্তা আনতে হবে, এ রকম করতে থাকলে তুমি আনন্দের বন্যায় ভেসে যাবে। পরীক্ষা পাসের জন্য ছাত্রকে কী ভয়ানক কঠোরতাই না পালন করতে হয়। ঈশ্বরানুভূতি তার থেকে অনেক সহজ কাজ। শান্ত হৃদয়ে তাকে আন্তরিক ভাবে ডাক।'[৫]

যে শিষ্যটির সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন সে বলল, 'কখনো কখনো মনে হয় সব চেষ্টা সত্ত্বেও কোন উন্নতি হচ্ছে না। এ সবই যেন মিথ্যা। হতাশা আমাকে পেয়ে বসে।' স্বামী তাকে সাহস দিয়ে বললেন ঃ

'না না। হতাশার কোন কারণ নেই। ধ্যানের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। তুমি ফল পাবেই যদি তোমার *জপ* সভক্তি হয়, ভক্তি ছাড়াও ফল পাবে, কারণ ভক্তি এর পরেই আসবে। তোমার নিয়মিত জপ-ধ্যানের অভ্যাস আরো কিছুদিন চালিয়ে যাও। তুমি শান্তি পাবে। যে ধ্যান করে তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

'প্রাথমিক স্তরে ধ্যান করা যেন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করা। চেষ্টা করে চঞ্চল মনকে সংযত করে প্রভুর চরণে রাখতে হবে। কিন্তু প্রথমে খেয়াল রাখবে মাথায় যেন বেশি চাপ না পড়ে। ধীরে ধীরে এগোও পরে চেষ্টা জোরদার করবে। নিয়মিত অভ্যাসে মন স্থির হবে ও ধ্যান সহজ হবে। কয়েক ঘণ্টা মননে বসলেও তুমি আর কষ্ট বোধ করবে না।

'ঠিক যেমন গভীর নিদ্রার পর শরীরে ও মনে নতুন শক্তি সঞ্চার হয়েছে বোধ হয়, ধ্যানের পর সেই রকম বোধ হবে এবং এরপর আসবে সুখের তীব্র অনুভূতি।

'শরীর ও মন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। শরীরের গোলমাল হলে মনও বিক্ষুব্ধ হয়। অতএব শরীর সুস্থ রাখতে খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

৫ Swami Prabhavananda, *The Eternal Companion*, (Madras : Sri R.K. Math, 1971), pp 335-6

'ধ্যান সে রকম সহজলভ্য বস্তু নয়। খাওয়া বেশি হলে, মন চঞ্চল হয়ে পড়ে। আবার কাম, ক্রোধ, লোভ ও এইরকম সব আবেগকে সংযত না রাখলে মন অস্থির হয়ে থাকবে। অস্থির মনে কি করে ধ্যান করবে?

'ধ্যান না করলে মনকে সংযত করতে পারবে না, আর মন সংযত না হলে তুমি ধ্যান করতেও পারবে না। তুমি যদি মনে কর, "আগে মনকে সংযত করি, পরে ধ্যান করব", তুমি কখনই সফল হবে না। তোমাকে অবশ্যই একই সঙ্গে মনকে স্থির করতে হবে, ধ্যানও করতে হবে।

'যখন ধ্যানে বসবে মনে করবে মনের আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বপ্ন মাত্র। মনে করবে তারা অবাস্তব, তারা কখনই মনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। নিজেকে শুদ্ধ মনে করবে। এইভাবে মন ধীরে ধীরে পবিত্রতায় পূর্ণ হয়ে যাবে।...

'তুমি যদি ঈশ্বরোপলব্ধি চাও ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অধ্যাত্ম-সাধন পদ্ধতি অনুশীলন করে চল। সময়ে তোমার উপলব্ধি হবে।'[৪]

যখন পরম সত্তার উপলব্ধি হয়, প্রবুদ্ধ মানবাত্মা শান্তি ও সুখ লাভ করেন এবং তা ভাগ করে নেন তাঁর সাথীদের সঙ্গে। স্বামী ঐ আদর্শই আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, আর ঐ আদর্শ উপলব্ধির জন্য যেসব সাধন আমাদের করতে হবে তাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

## প্রাথমিক পর্যায়গুলি

যেমন আগে বলেছি, যখন আমরা স্থির হয়ে বসতে চাই নানা ধরনের গোলযোগ মনে উঠতে থাকে। কখনো কখনো আমরা ধ্যানে না বসেই কিছুটা শান্তভাব অনুভব করতে পারি; কিন্তু ধ্যানে বসলেই মনে আলোড়ন উঠতে থাকে। শুধু তাই নয়; শরীরে ব্যথা বোধ হতে থাকে, ইন্দ্রিয়গুলো আবার হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয় আর অনন্ত উদ্ভট সব চিন্তা মনে উঠতে থাকে। তখন *জপ*-ধ্যান যেন এক বিরাট সংগ্রামের রূপ নেয়, কিন্তু এ সংগ্রামের ভেতর দিয়েই যেতে হবে।

সব ধর্মের মরমী সাধকরা প্রথমে পবিত্রতার ন্যূনতম ভিত্তিতে পৌঁছবার আদর্শকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, দেহের পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়ের পবিত্রতা, মনের পবিত্রতা আর অহংবোধের পবিত্রতা অর্জন আমাদের আগে করতে হবে। শরীর রোগগ্রস্ত হতে পারে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সঠিক সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করতে নাও পারে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সব বহির্মুখী, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের স্পর্শ পেতে ব্যগ্র। পূর্বতন সংস্কারের প্রভাবে মন দোলায়মান হয়। মনে আবার আর এক

---

৪ ibid., pp. 336-39

রকমের দ্বন্দ্ব রয়েছে ঃ আমাদের চিন্তা একদিকে যায়, আর হৃদয়ের আবেগ যায় অন্যদিকে, ইচ্ছা চলে তৃতীয় দিকে এবং এ ছাড়া আমাদের অহংত্বও বিপথগামী। অহংত্ব ছোট্ট বুদ্বুদের মতো, কিন্তু সেই বুদ্বুদটিই নিজেকে অনেক বড় মনে করে। সে ভুলে যায় অন্য বুদ্বুদগুলির কথা, এমনকি সমুদ্রকেও ভুলে যায়, আর নিজে বাড়তে চায়। কি হয়? বুদ্বুদটি ফেটে যায়। বহু মানবসত্তার ক্ষেত্রে বাস্তবিক এই রকমটাই ঘটে থাকে।

এখন, আমরা যেন এই সব বিপদের সামনে পড়ে ভয় পেয়ে না যাই। *ভগবদ্‌গীতায়* আমরা দেখি অর্জুন শ্রীভগবানের কাছে অনুযোগ করছে ঃ 'তুমি মনঃসংযমের কথা বলছ, আত্মোপলব্ধির কথা বলছ। কিন্তু আমি দেখছি আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল, একে নিয়ন্ত্রণে আনা আমার সাধ্য নয়।' প্রভু শিষ্যের অসুবিধা বুঝতে পেরে খুব সহানুভূতির সঙ্গে আদর করে বললেন, 'তুমি যা বলছ তা ঠিক, কিন্তু সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনাসক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান অভ্যাস করলে, এই চঞ্চল মন নিয়ন্ত্রণাতীত মনে হলেও নিয়ন্ত্রিত হয়।'[৫] ক্রমে আমরা সেই পরম সত্তা—আমাদের সকল আত্মার আত্মা—সারা মহাবিশ্বের যিনি আত্মা—তাঁর সংস্পর্শে আসি।

## পরিবেশের নিন্দা করো না

প্রথমেই আমরা যেন মনে রাখি, যে আমরা প্রায়ই পরিবেশ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি নিন্দা করে থাকি। বাস্তবিকই, সব সময়ে পরিবেশের সম্বন্ধে নিন্দা করা ছাড়া আমরা আর কিছু করতে চাই না। মনে কর পরিবেশ পাল্টানো হলো—তবু, একই নিন্দা চলতে থাকবে। আমরা কোথাও আদর্শ পরিবেশ পাই না ঃ এর অস্তিত্ব নেই। তোমার অনুযোগ হলো ঃ 'পরিবেশ অনুকূল নয়, কি করে ধ্যানাভ্যাস করব?' উপায় নেই, ঠিক এই পরিবেশেই তোমাকে ধ্যানাভ্যাস করতে হবে। অত্যন্ত কষ্টকর পরিবেশের মধ্যে তুমি কি ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা কর না? সেই রকম, পরিবেশ যেমনই হোক তোমাকে ধ্যানাভ্যাসের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিভাবে? ঠিক যেমন ঘুমের আগে তুমি করে থাক, বাইরের কলকোলাহল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে। অভ্যাসের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়। এরপর আবার আমাদের শরীরের ঝামেলা আছে। হয়ত শরীরের কোন কষ্ট রয়েছে। প্রায়ই অনুযোগ শোনা যায় ঃ 'ওঃ! স্বামীজী ধ্যানে বসলে আমার মাথা ধরে।' হ্যাঁ, অনেকের পক্ষে ধ্যানই মাথা ধরার সামিল। যাই হোক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে চেষ্টা কর। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *গীতার* ধ্যানযোগে (৬.১৭) বলেছেন ঃ

---

৫ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬.৩৩-৩৬

**যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।**
**যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥**

—যার আহার, বিহার, কর্ম, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তাঁর পক্ষে যোগ সহজ ও দুঃখনাশক।[৬]

অতি ও অল্প দুই-ই বর্জন করে সাধকের মধ্যপন্থা অনুসরণ করাই উচিত। এতে সে আধ্যাত্মিক পথে চলার মতো শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করে।

## প্রথমে শরীরের প্রশিক্ষণ

আমাদের শরীর যাতে কতকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় সেজন্য কতকগুলি নিয়মশৃঙ্খলা পালন করতে হবে। পরে ইন্দ্রিয়ের ও মনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শুধু তাই নয় অহংবোধেরও প্রশিক্ষণ চাই।

শরীরকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দেবে? খাদ্যের বিষয়ে যত্ন নাও ঃ অতিরিক্ত ভোজন বর্জন করে যে খাবার তোমার সহ্য হয় ও শরীরে সামঞ্জস্য আনে তাই বেছে নেবে। অনেকেই মনে করে খাদ্য গ্রহণই পাকস্থলীর মস্ত ব্যায়াম। সেটাই যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাওয়া ছাড়া তোমাকে সব অঙ্গের কিছু কিছু ব্যায়াম করতে হবে, বিশেষ ভাবে পাকস্থলীর ব্যায়াম যাতে তোমার হজম, পুষ্টি ও বিরেচন যথাসম্ভব ভালভাবে হয়। এই নিয়মগুলি যাকে প্রাথমিক নিয়ম বলা যেতে পারে তা পালন করতে হবে। আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ বলেছিলেন, 'প্রথম কর্তব্য হলো শরীরের যত্ন নেওয়া, সেটিই হলো অধ্যাত্ম জীবনের পথে অগ্রসর হবার উপায়।'[৭] কখনো কখনো কোন শীর্ণকায় লোককে বলতে শুনি 'আমি আমার শরীরকে ভুলতে চাই।' তাদের কি রকম শরীর আছে? কেবল কতকগুলি হাড় ও মাংসের স্তূপ। শরীরকে উপযুক্ত ভাবে তৈরি কর। শরীর সুস্থ অবস্থায় না থাকলে তুমি কখনই শরীরকে ভুলতে পারবে না।

## নৈতিক শৃঙ্খলা

অধ্যাত্ম সাধক যদি *যম* ও *নিয়ম*-এ কিছুটা প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে যোগশাস্ত্রের আচার্য পতঞ্জলি তাকে *আসন* বা বসার নিয়ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে চাইতেন না। অধ্যাত্ম সাধক অহিংসা ব্রত পালন করবে, সত্য কথা বলবে, লোভী হবে না ও যথাসম্ভব ব্রহ্মচর্য পালন করবে এবং অসহায়ভাবে পর-নির্ভর হবে না। এ হলো *যম*।[৮] এও যথেষ্ট নয়। তিনি আরো বলেন, কিছুটা বাইরের ও অন্তরের পবিত্রতা

---

৬ তদেব, ৬/১৭

৭ শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্॥

৮ পতঞ্জলি, *যোগসূত্র* ২.৩০—'অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।'

রক্ষা করতে হবে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা চাই। শরীর, কথা ও মন এই তিনটি বিষয়ে সংযম অভ্যাস করা উচিত। উপরন্তু শাস্ত্র অধ্যয়নে ও ভাব গ্রহণে যত্নবান হতে হবে। তাও যথেষ্ট নয়, অহংকেন্দ্রিক কাজ ভাল নয়। অবশ্যই সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ চাই সেই পরম চৈতন্যের কাছে, তিনিই যে সকল আত্মার আত্মা—ভক্ত তা পরে আবিষ্কার করে। এই সব পড়ে 'নিয়মে'র মধ্যে।[9]

স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের বলতেন, ' "আমি কাম জয় করব, আমি ক্রোধ-লোভ জয় করব", এইভাবে যদি তুমি অগ্রসর হও, তবে তুমি কোনদিনই ওগুলিকে জয় করতে পারবে না; কিন্তু মনকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট করতে পারলে, ইন্দ্রিয়ের আবেগগুলি নিজেরাই তোমাকে ছেড়ে যাবে।' 'ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে নৈতিক জীবনে তুমি কখনই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না।'[10] ঈশ্বর বলতে তিনি কোন বিশ্বাতীত সত্তাকে বোঝাতে চাননি। প্রথমে আমরা ঈশ্বরকে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী এক সত্তা বা শক্তি রূপে ভাবতে পারি। আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে আমরা দেখি ঐ শক্তি, যাকে বহিস্থ ভাবা হয়েছিল তা কেবল একটি শক্তি নয়, অন্তস্থ একটি সত্তাও বটে এবং আরো এগিয়ে গেলে আমরা সকলের মধ্যেই ঈশ্বরীয় সত্তাকে দেখব ও অনুভব করব।

## মানসিক সমন্বয়সাধনে ব্রতী হও

কখনো কখনো লোকে এসে বলে, 'স্বামী, আমি সব ভুলে যেতে চাই, মনকেও।' তাদের মন কি রকম? স্বামী বিবেকানন্দ 'মন' কথাটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে কৌতুক করতেন। বাংলা ভাষায় 'মন' কথার আর একটি অর্থ, ৪০ সের ওজন। নবীনরা তাঁর কাছে গেলে মহান স্বামী তাদের জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমার মনের ওজন ৪০ সের না মাত্র এক ছটাক? কি রকম মন তোমার?' মনকে গড়ে তুলতে হবে। ইচ্ছাশক্তিকে উন্নত করতে হবে। চিন্তা ও বোধশক্তির উৎকর্ষ চাই। কেবল তখনই মনের পারে যাবার কথা উঠতে পারে। এটা শক্ত কাজ, তবে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা থাকলে এ সব সহজ হয়ে যায়। ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা থাকলে, পথ হয়ে যায়।

যখন তুমি কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাও (বিশেষত ভারতে, যেখানে প্রত্যেকটি যুবক জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের বদলে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কোন রকম একটা চাকরি যোগাড় করতেই অত্যধিক ব্যাকুল) তখন তোমাকে কত কষ্ট করতে হয়। তোমার আদর্শে পৌঁছবার জন্যই এ কষ্ট

৯ যোগসূত্র ২.৩২—'শৌচ-সন্তোষ-তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।'

১০ পূর্বোল্লিখিত *The Eternal Companion*, পৃঃ ২৪৫

স্বীকার। অধ্যাত্ম জীবনেও তুমি যদি তোমার আধ্যাত্মিক আদর্শকে সজীব ও উজ্জ্বল করে তোমার সামনে ধরে রাখ, সবই সহজ হয়ে যাবে। তুমি যত সব কষ্ট করছ, তাও সার্থক হবে।

'কঠোপনিষদে'র সেই চমৎকার উপমাটি স্মরণ করা যাক। ঐ উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

> **আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।**
> **বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।**
> **ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু ...** [১১]

—শরীর যেন রথ, ইন্দ্রিয়গুলি ঘোড়ার মতো, মন যেন লাগাম, বুদ্ধি যেন সারথি, আর আত্মা হলেন রথস্বামী। রথ চলতে চলতে চাকা খুলে বেরিয়ে গেলে রথ কি চলতে পারে? ঘোড়াগুলি ছটফট করছে, বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ঘোড়াদের বশে রাখতে হলে লাগাম টানতে হবে। আর রথস্বামী সারথিকে বলবেনই, সদা জাগ্রত থাকতে। কিন্তু সাধারণত যা ঘটে ঃ রথস্বামী নিদ্রা যান, সারথি মাতাল হয়ে পড়েন, লাগাম ঢিলে হয়ে যায়, তখন ঘোড়াগুলি এদিক সেদিক ছোটে, সৌভাগ্যের বিষয় কোন বড় বিপদ ঘটে না। তাই, কোন বড় বিপদ হবার আগে আমরা যেন সজাগ হই; রথস্বামী যেন সজাগ থাকেন। তিনি যেন সারথিকে সতর্ক হয়ে মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে ঠিক পথে চালিত করতে বলেন। তবেই রথ ঠিক মতো চলবে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে আধ্যাত্মিক সাধনায় কেউ হঠাৎ সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় আনতে হলে সাধন পথে ন্যূনতম কিছুটা অগ্রগতি হওয়া চাই। আর অহংবোধের, বিপথগামী অহংবোধের, আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছার পেছনে যে বিরাট মহাজাগতিক ইচ্ছা রয়েছে, তার সংস্পর্শে আসার জন্য একটা মনোভাব থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে আমরা যখন অন্তত কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হব সমন্বয় গড়ে তোলার ব্যাপারে—প্রথমে শরীরের মধ্যে, পরে মনের ও ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে, যখন আমরা আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলতে সফল হব—তখনই আমাদের আসন শুরু করা উচিত। সেই আসনই হলো ধ্যানের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

## দেহের অঙ্গবিন্যাস (আসন)

মনে রাখতে হবে যোগাচার্য পতঞ্জলি আমাদের বলেছেন, কোন রকম

---

[১১] *কঠোপনিষদ্*, ১/৩/৩

অঙ্গবিন্যাস অবলম্বনে (আসনে) বসবার আগে আমরা যেন নিশ্চয়ই *যম* ও *নিয়মে* কিছুটা অভ্যস্ত হই। কোন্ আসনটি আমরা বেছে নেব? আসনের সংজ্ঞা হলো : 'স্থির-সুখমাসনম্'—সেইটিই আসন যা স্থির ও সুখকর।[১২] সেই আসনই বেছে নেবে যাতে তুমি স্থিরভাবে ও সুখে বসে থাকতে পার। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পার : 'আমি কি শুয়ে পড়তে পারি?' হ্যাঁ, তুমি শুয়ে পড়ে সেই অঙ্গ বিন্যাসকেই *আসন* রূপে অভ্যাস করতে পার, কিন্তু এতে অনেকটা ঝুঁকি আছে : এই অঙ্গবিন্যাস স্বভাবতই নিদ্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। শুয়ে শুয়ে ধ্যানাভ্যাস করতে গিয়ে তোমার কোন উন্নতি নাও হতে পারে। তোমার হয়ত একটু ঘুম হবে, তাতে তুমি আবার সতেজ হয়ে উঠবে কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে জড় হয়ে যাবে। বাদরায়ণ-ব্যাসদেব বলেছেন : 'আসীনঃ সম্ভবাৎ'—উপাসনা বসা অবস্থাতেই সম্ভব।[১৩] বসা অবস্থাই ভাল কিন্তু সাবধান তা যেন সহজ অবস্থান হয়, যাতে তুমি শরীরে ও মনে শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হতে পার। তুমি যদি ব্যায়ামের জন্য *যোগাসন* অভ্যাস করতে চাও, তা অন্য সময়ে করবে। কিন্তু যখন তুমি ধ্যানে বসবে তখন শান্ত উদ্বেগশূন্য শরীরে ও মনে স্থির হয়ে বসবে।

## সকলের জন্য প্রার্থনা করবে

বসে ঈশ্বর চিন্তা করবে। তিনিই আমাদের আদর্শ। তিনিই অন্তর্যামী আত্মা। তিনি যেমন অন্তরে আছেন তেমনি বাইরে। তুমি কোন প্রার্থনা-মন্ত্র আবৃত্তি করতে পার। একটু সুর করেই তা করবে। তাতে তোমার মন, ইন্দ্রিয়নিচয় ও শরীর একটু আধ্যাত্মিক ভাবে স্পন্দিত হোক। তারপর পরম সত্তাকে প্রণাম কর। অধ্যাত্ম জীবনে একটি বিশেষ পথে চলার ভয়ানক বিপদ হলো, আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড গোঁড়ামি এসে পড়তে পারে। তাই পরম সত্তাকে প্রণাম করার সঙ্গে স্বদেশের ও ভিন্‌দেশের মহান আচার্য ও সাধুসন্তদেরও প্রণাম করা খুব ভাল। তাতে কি হয়? মন উদার হয়।

অধ্যাত্ম জীবনে আর একটি বিপদ হলো অত্যন্ত স্বার্থপর হওয়া। অনেক সময় আমি দেখেছি, অধ্যাত্ম জীবনের গোড়ায় সাধক নিজের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে। তারা অন্যদের কথা ভুলে যায়। তাই কেবল নিজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা না করে, সকলের জন্য প্রার্থনা করা ভাল। ঠিক যেমন তুমি নিজে শান্তি চাও, পবিত্র হতে চাও, চৈতন্য লাভ করতে চাও, সেই রকম প্রত্যেকের শান্তি, শুদ্ধি ও চৈতন্য লাভের জন্য প্রার্থনা করবে—'সকলে সেই পরম সত্তার দিকে চলুক, সকলে শুদ্ধ হোক, সকলের চৈতন্য হোক।' এ রকম প্রার্থনা মনের উদারতা বাড়ায়।

---

১২ পতঞ্জলি, যোগসূত্র, ২।৪৬

১৩ বাদরায়ণ, *ব্রহ্মসূত্র*, ৪/১/৭

তুমি দেখে আশ্চর্য হবে এই রকম প্রার্থনার ফলে কত শীঘ্র তোমার স্নায়বিক যন্ত্রণার উপশম হবে, তোমার মন শান্ত হবে। আমাদের চেতনার কিছুটা বিস্তার হওয়া ছাড়া এ রকম প্রার্থনা ও প্রণাম ধ্যানাভ্যাসে আমাদের পক্ষে খুবই সহায়ক হয়।

## শ্বাসগ্রহণের তাৎপর্য

এই স্তরে এলে একটু ছন্দোবদ্ধ শ্বাসগ্রহণের অভ্যাস খুবই উপকারী। গভীর শ্বাসগ্রহণ করে তা আস্তে আস্তে ছেড়ে দাও। শ্বাসরোধ করে বা নাসারন্ধ্র বন্ধ করে রাখার দরকার নেই। কেবল দু-নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ কর আর ধীরে ধীরে নিয়মিত ভাবে তা ছেড়ে দাও। কিন্তু মনে করতে থাক যে, 'আমি প্রশ্বাসের সঙ্গে পবিত্রতা, শক্তি ও শান্তি গ্রহণ করছি।' সেই অনন্ত সত্তাই সব শান্তির উৎস। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্ম জীবনে আমাদের যথেষ্ট পবিত্রতা, যথেষ্ট শক্তি ও শান্তি থাকে না; যত পাই, ততই ভাল। নিজেদের ঈশ্বরীয় পবিত্রতা, ঈশ্বরীয় শক্তি ও ঈশ্বরীয় শান্তিতে ভরিয়ে ফেল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে পবিত্রতা বেরিয়ে আসুক। পবিত্রতার স্রোত প্রত্যেকের কাছে পাঠিয়ে দাও। সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হও। যদি তুমি এই মনোভাব গড়ে তুলতে পার তবে তোমার পক্ষে চেতনার উচ্চতর স্তরে ওঠা কত সহজ হবে, তা দেখে আশ্চর্য হবে; কারণ আমরা যখন এই মনোভাব নিয়ে থাকি, তখন ইন্দ্রিয়গুলোকে তাদের বিষয় থেকে সরিয়ে আনা সহজ হয়।

## বাসনাগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাব আরোপ কর

ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসতে চায়। তাদের সংযত কর, তাদের ভেতরের দিকে ফিরিয়ে দাও, যেমন উপনিষদের ঋষিরা করতেন। ইন্দ্রিয়ের কাজগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাব আরোপ কর। বৈদিক প্রার্থনায় যেমন আছে ঃ

> **ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা**
> **ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।**

—হে দেবগণ, আমরা কানগুলি দিয়ে যেন কল্যাণ বচন শুনতে পাই; হে পূজনীয়গণ, আমরা চোখগুলি দিয়ে যেন কল্যাণকারী বস্তু দেখতে পাই।[১৪] যে শব্দ ভাল তাই শোন, যে কথা ভাল তাই বল, যে দৃশ্য ভাল তাই দেখ। ইন্দ্রিয়গুলোকে সৎ পথে নিয়ে চল। তারা যেন আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হয়।

এর পর আসছে মন, যা সব সময়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। মনকে কিভাবে শান্ত করা যাবে? সব রকম কামনা বাসনাগুলিই মনে ঝঞ্ঝাট পাকায়। আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তি, একটু উদার চেতনার মনোবৃত্তি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কর। কামনা-বাসনা

---

১৪ ঋকবেদ, ১/৮৯/৮

মনে যেসব বিকার নিয়ে আসে সেগুলো ভ্রান্ত ও স্বপ্নতুল্য বলে ভাবতে থাক। নিজেকে সাহস দিয়ে বল ঃ 'কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, গর্ব ও দ্বেষ—এগুলি থেকে ভয় পেও না; একেবারেই ভয় পাবে না।' তাদের আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত কর। ঈশ্বরের সঙ্গে সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও। তোমার ক্রোধের ওপরেই ক্রোধ কর, ক্রোধ কর তোমার পথে যেসব বাধা রয়েছে তাদের ওপর—অন্য লোকের ওপর নয়। পরম সত্তার ওপরই লোভ কর, কারণ তিনিই তো শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যদি গর্ব করতে চাও তো 'আমি ঈশ্বরের সন্তান' এই ভেবে গর্ব কর, এই রকম আরো সব আছে। তখন কি হবে? আমাদের সব বাসনার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হবে আধ্যাত্মিকতার দিকে। তারা তখন আর আমাদের ঝামেলায় ফেলবে না বরং সেগুলি আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের সহায়ক হবে।

কতকগুলি লোকের ভুল ধারণা রয়েছে। কোন কোন স্বল্পজ্ঞানী মনস্তাত্ত্বিক অধ্যাত্ম সাধকদের বলে ঃ 'তোমরা সবাই তোমাদের আবেগগুলিকে দমন বা সংযত করছ।' আমরা কিন্তু সে রকম কিছুই করছি না। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের তেজকে সঞ্চয় করে রাখতে চাই। আমরা সেই তেজকে আধ্যাত্মিক পথে চালিত করতে চাই। আমরা প্রভুর গৌরব গাথা গাইতে চাই। আমরা পরম সত্তার মূর্তিটি দর্শন করতে চাই। আমরা চাই ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখী হোক, যাতে অধ্যাত্ম সাধকের জীবনে এমন সময় আসবে যখন তার মধ্যে ফুটে উঠবে নতুন চোখ—দর্শনাতীতকে দেখার জন্য, নতুন কান—ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর বা 'সর্বলোকের সুর' শোনার জন্য, সবের মধ্যে যে চিরন্তন খেলা চলেছে তা উপভোগ করার জন্য। ঈশ্বরীয় সত্তার সঙ্গে খেলা করা যায়, এ সবই কিন্তু কেবল চলার পথের ঘটনা। আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে।

## ঈশ্বরের মন্দির

*কঠোপনিষদের* যে সুপরিচিত উপমাটি আগেই উল্লিখত হয়েছে, তাতে শরীরকে রথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর একটি উপমায় শরীর হলো মন্দির—তার মধ্যে হৃদ্দেশটি হলো গর্ভ মন্দির। এটি একটি চমৎকার কল্পনা। এই মন্দিরে তুমি ভক্তকে দেখতে পাবে, আবার দেবতাকেও দেখতে পাবে। তোমাকে এ দুটির মিলন ঘটাতে হবে। কিন্তু মন্দিরটি বেশ অদ্ভুত ধরনের। আমাদের ক্ষুদ্র স্থূল শরীরে অনুস্যূত ও পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে আমাদের মনোময় শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীরে আবার পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট ও অনুস্যূত হয়ে আছেন জীবাত্মা (ব্যষ্টি আত্মা), আর জীবাত্মা হলো পরমাত্মার অংশ। আর যখন আমরা স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হব তখনই আমরা আমাদের অন্তরে বিভাসিত দিব্য আলোকের বিষয়ে আরো বেশি বেশি সচেতন হব। এইভাবে

আমরা হৃদয় গহ্বরে প্রবেশ করে দেখি 'হৃদয়' আত্মার আলোকে পরিপূর্ণ, আর এই আলোক পরমাত্মারই অংশ।

## কিভাবে ধ্যান করতে হবে

তুমি যদি নিরাকার ধ্যানের পথে যেতে চাও তোমার শরীর, মন, সর্বজগৎ এবং প্রত্যেকটি বস্তুকে ঈশ্বরে লয় কর। মনে কর ঃ 'আমি আলোকের একটি ছোট্ট মণ্ডল, আর পরম সত্তা হলেন আলোকের অনন্ত মণ্ডল, সর্বত্র আলো দিচ্ছেন।' কিন্তু যতক্ষণ আমাদের শরীর-চেতনা ও অত্যধিক ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি রয়েছে, এ ধরনের ধ্যান অভ্যাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, এখন মনে কর যে তোমার আত্মা একটি শুদ্ধ সূক্ষ্ম শরীর (অর্থাৎ মনোময় শরীর) ও একটি শুদ্ধ স্থূল শরীর ধারণ করেছে, আর অনন্ত চৈতন্য আমাদের *ইষ্ট দেবতা,* যে ঈশ্বরীয় ভাব আমরা পূজা করি, তার রূপ নিয়েছে।

এখন কল্পনা নেত্রে দেখ ঃ অনন্ত প্রেম ও অনন্ত আনন্দস্বরূপ অনন্ত দিব্য আলোকের মধ্যে ভক্ত ও অনন্ত আলোক, অনন্ত প্রেম ও আনন্দের বিগ্রহস্বরূপ দেবতা অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কোন নির্দিষ্ট ঈশ্বরীয় নাম (*মন্ত্র*) জপ কর ও তাঁর ধ্যান কর।

প্রথমে *ইষ্ট দেবতার* আনন্দময় দীপ্তিমান দিব্য রূপটির ধ্যান কর। তারপর তাঁর অনন্ত পবিত্রভাব, অনন্ত প্রেম, অনন্ত করুণার ধ্যান কর। শেষে ধ্যান কর তাঁর অনন্ত চেতনার, যার মধ্যে তিনি যেন ডুবে রয়েছেন।

কি হতে থাকে? সাধক যেমন ঈশ্বরীয় নাম জপ করতে থাকে ও ভাব থেকে ভাবান্তরগ্রাহী ঈশ্বর সত্তার ধ্যানে মগ্ন হয়, এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন আগে বলেছি, নৈতিকতা অভ্যাসের ফলে আমরা কিছুটা সমন্বয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সফল হই; কিন্তু ঈশ্বরের ধ্যানে যে সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তা উঁচু ধরনের। যখন প্রকৃত সমন্বয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের মনে আমাদের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের বোধ হয় যেন আমরা মহাবিশ্ব-সমন্বয়ের (বা সৃষ্টি-শৃঙ্খলার) সংস্পর্শে রয়েছি। আমাদের শরীরও যেন বিশ্ব-শরীরের—*বিরাট পুরুষের*—অংশ বিশেষ। আমাদের মন যেন বিশ্ব-মনের—*হিরণ্যগর্ভের*—অংশ। আমাদের আত্মা যেন বিশ্ব-চৈতন্য তথা ঈশ্বরের অংশ। যারা আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধ্যান অভ্যাস করে থাকে তাদের মধ্যে অনেকেই সচেতনতার এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। আমরা যদি জপ-ধ্যানের পথে ঠিক মতো চলি, আমরা নিশ্চয়ই কোন না কোন দিব্য রূপের দর্শন ও দিব্য ভাবের অনুভূতি লাভে ধন্য হব। এতে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হবে ও মন ধ্যানের পথে স্থির হবে।

আমাদের মন ধ্যানের বস্তু থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়। কিন্তু নৈতিক সংস্কৃতিতে

অভ্যস্ত থাকলে আমরা মনের এই চঞ্চলতাকে কমিয়ে ফেলতে পারব। উপরন্তু, আমরা যখন জপ-ধ্যান করি তখন মনের কিছু খোরাকের ব্যবস্থাও করি, যেমন, যে দিব্য নামটি জপ করছি সেই নামটি বা যে দিব্য রূপটি দর্শন করছি সেই রূপটি। এ সবের সাহায্যে আমরা মনকে কেন্দ্রীভূত করে অন্তর্মুখীন অবস্থায় রাখতে পারব। আমরা অবশ্যই একটু ভালবাসা দিয়ে হৃদয়দেশে তাঁর চিন্তা করব। যখন ইষ্টদেবতার প্রতি আমাদের হৃদয়ে কতকটা প্রেম ও ভক্তি সঞ্চিত হবে, তখন জপ-ধ্যানের পথে চলা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

জপ-ধ্যানে কি ফল হয় ঃ ওগুলি মনকে কাজে নিযুক্ত রাখে, তাকে অন্তরে ধরে রাখে। নাম, ঈশ্বরীয় রূপ ও ভাব, তার সঙ্গে ভগবৎ-প্রেম মনকে অন্তরে কেন্দ্রীভূত করে রাখে। যখন বাইরের বিষয়ের থেকে ধ্যানের বিষয়ে আমাদের আগ্রহ বেশি হবে, ধ্যানের বিষয় আমাদের কাছে আরো বাস্তব হয়ে উঠবে। অন্তত অল্পক্ষণের জন্যও মন পরমাত্মায়, তাঁর দিব্য আনন্দময় রূপে, তাঁর মহৎ গুণাবলীতে স্থিতি লাভ করে। তখনই সাধকের দিব্য-উপস্থিতির অনুভূতি হয়। অধ্যাত্ম-সাধকগণের জীবন পর্যালোচনায় জানা যায়, এই অবস্থায় তাঁদের অনেকেই দিব্য রূপের আধ্যাত্মিক দর্শন লাভে কৃতার্থ হয়েছেন। ঈশ্বরীয় সত্তা নিজেকে কোন না কোন রূপে প্রকাশ করেন, তিনিই তখন *গুরু* হন।

## গুরু অন্তরে বিরাজ করেন

আমাদের আচার্যগণ বলে দেন যে, *গুরু* অন্তরেই আছেন। অধ্যাত্ম জীবনের গোড়ার দিকে আমরা একজন বাইরের আচার্যের সাহায্য নিতে পারি, এ জীবনে যতই অগ্রসর হব, ততই দেখব প্রকৃত *গুরু* অন্তরে। তখন আমরা যেন এই অন্তরস্থ দিব্য *গুরুর* পাদপদ্মে অবশ্যই আত্ম-সমর্পণ করি। তিনি শিষ্যকে ধাপে ধাপে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার নিম্নস্তর থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যান। সাধু সন্তদের ক্ষেত্রে এরকমই হয়ে থাকে, এমন সাধুদের সঙ্গ আমরা করেছি। আমরা যদি মনের সুরকে ঠিকমতো বাঁধতে পারি তবে এই সব সাধুসন্তদের—অভিজ্ঞতার কথা, তাঁদের সঙ্গীত, তাঁদের হৃদয়ের ব্যাকুলতার স্পন্দন, তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির বাহ্যপ্রকাশ, তাঁদের উপদেশ—'শোনা' আমাদের ভাগ্যে হতে পারে। এ অভিজ্ঞতা বাস্তবিকই হয়ে থাকে। যদি আমরা কতকগুলি পূর্বশর্ত পূরণ করে ঐকান্তিক ভাবে আধ্যাত্মিক পথে চলি তবে আমরা নিশ্চয়ই কিছু আধ্যাত্মিক ফল পাব।

## ঈশ্বরের কাছে আত্ম-সমর্পণ

ধ্যানের ফল আমরা নিশ্চয়ই পাব, কিন্তু যখন আমরা *জপ*-ধ্যানে রত থাকব

তখন যেন আমরা তার ফলের জন্য খুব বেশি প্রত্যাশা না করি। ফল আপনিই ফলবে। ফলের জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগ থাকলে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ঠিক মতো করতে ভুলে যাব, আর এখানেই আসছে আত্ম-সমর্পণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যোগাচার্য পতঞ্জলি বলেন, ঈশ্বরে সর্বস্ব বলি দিলে *সমাধি* হয়— 'সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।'[১৫] সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন কর, তোমার সমস্ত শ্রমের অধ্যাত্ম সাধনার ফল সমর্পণ কর সেই পরম সত্তার কাছে। তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে ভগবদ্ ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করতে শেখ, তখনই অলৌকিক সব ঘটনা ঘটতে থাকবে। যে সত্য, যে বাস্তব সত্তা অন্তর আলোকিত করছে, যিনি আবার বহিঃস্থ সব জীবের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন—তিনিই স্বগৌরবে সকলের মধ্যে প্রকাশিত হন এবং তখনই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের এক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ঃ এ হলো 'অনন্ত আত্মার সঙ্গে অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত সম্পর্ক।'[১৬] কিন্তু তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অনন্যমনা ভক্তিতে নানা পথে অনুশীলন করে যেতে হবে।

## একটি নির্দিষ্ট ভাব গড়ে তোল

এখানেই আসছে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—তোমার অবস্থিতি কোথায় তা অনুসন্ধান কর। খোঁজ কর, কি ভাব নিয়ে সেই পরম সত্তার দিকে এগুবে। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছে যারা সেই পরম সত্তাকে সকল আত্মার আত্মা রূপে গ্রহণ করে তাঁর দিকে যেতে পারে। আমরা শিশুর মতো। ঠিক শিশু যেমন পিতা বা মাতার ওপর নির্ভর করে, আমরাও চাই সেই ঈশ্বর-সত্তার ওপর নির্ভর করতে। আমাদের প্রয়োজন একটি বন্ধুকে, একটি জীবন-সঙ্গীকে, এমন একজনকে—যে আমাদের ভালবাসবে—যাকে আমরা আমাদের ভালবাসার কেন্দ্র করতে পারব—যাঁকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের হৃদয়াবেগ নিবেদন করতে পারব। এখন ঈশ্বর রয়েছেন এই সব অসংখ্য ঈশ্বরীয় রূপ ও ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। এর যে কোন একটিকে ধর। হিন্দু ধর্মের নানা সম্প্রদায়ের কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি—কোন ভক্ত তার অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভ করছে ঈশ্বরকে প্রভুরূপে, পিতারূপে, মাতারূপে, অথবা এমনকি দিব্য শিশুরূপে পর্যন্ত পূজা করে। কোন কোন ভক্ত আছে ঈশ্বরকে ভালবাসতে চায়, শিশু-কৃষ্ণ রূপে বা শিশু-রাম রূপে। অন্য ভক্তেরা বিশ্ব-মাতাকে দুর্গা, কালী, উমা বা কুমারী রূপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে পূজা করতে চায়। এই সব নানা ধরনের পূজা ও ধ্যানের মাধ্যমে মন ও হৃদয়

---

১৫ পতঞ্জলি, *যোগসূত্র*, ২/৪৫

১৬ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০

শুদ্ধ হয়। আগে যেমন বলা হয়েছে, নৈতিক আচরণের মাধ্যমে আমরা যে পবিত্রতা লাভ করি, তাই যথেষ্ট নয়। আর এক উন্নততর ধরনের পবিত্রতা চাই, যে পবিত্রতার সহায়ে আত্মার সঙ্গ-বিচ্যুতি ঘটবে কেবল শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন থেকে নয়, পরন্তু তার ক্ষুদ্র অহংবোধ থেকেও—যেটি হলো শেষ বন্ধন, যার পারে যেতে হবে জীবাত্মাকে এবং এ কাজ সম্ভব একমাত্র উন্নততর ধরনের উপাসনা বা ধ্যানের মাধ্যমে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

## একই আত্মা সকলের অন্তরে

আত্মা ও পরমাত্মায় যোগ সাধন করতে হবে। আর পরম সত্তা, তথা পরম আচার্য যেমন তাঁর মহিমার বিকাশ করেন, ভক্তের উপলব্ধি হয় যে ঈশ্বরের উপাসনা সে এতদিন করছে, তিনি শুধু তার নিজ অন্তরেই অধিষ্ঠিত নয়, পরন্তু সকলের মধ্যেই তাঁর প্রকাশ। তখনই এক নতুন জীবনের, এক সম্পূর্ণ জীবনের সূচনা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভগবদ্ গীতায় বলেছেন ঃ

**সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।**
**ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥**

—যোগ-সমাহিত অন্তঃকরণ হয়ে, সর্ববস্তুতে সমদৃষ্টি লাভ করে, তিনি সর্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্ববস্তুকে দেখেন।[১৭] এ অবস্থায় ভক্ত উপলব্ধি করে, যে আত্মা অন্তরে, তিনিই আবার বাইরে এবং সকলের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখে সে (ভক্ত) প্রত্যেকের মধ্যে তাঁরই উপাসনা করে।

## নিজ মুক্তি ও জগৎ কল্যাণের জন্য

এখন, এখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে। এমনকি এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের বহু পূর্বেই, এমনকি যখন আমরা ঈশ্বরকে কেবল সাকারভাবে উপাসনা করছি তখন থেকেই, এই উন্নততর সর্ব-ব্যাপিতার দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা গড়ে তুলতে হবে। আমি যদি ঈশ্বরকে প্রভুরূপে দেখে দাস ভাবে তাঁর উপাসনা করি, তখন যেন আমার সহগামীদের কথা ভুলে না যাই। আমরা সকলেই পরম চৈতন্যের দাস। আমরা যদি ঈশ্বরকে পিতা বা মাতারূপে দেখি, আমরা যেন আমাদের সহগামীদের একই ঈশ্বরের সন্তান রূপে দেখি। আমরা যদি যথেষ্ট সাহসী হয়ে ঈশ্বরকে আমাদের সকলের আত্মার আত্মারূপে ভাবি, আমরা যেন মনে রাখি যে আমরা সকলেই সহগামী আত্মা—পরম চৈতন্যের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে যুক্ত, আর পরম চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের যোগ থাকায় আমরাও পরস্পর যুক্ত। তখন

---
১৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ ২৯

আমাদের জীবন এক নতুন দিকে মোড় ফিরবে। যে সব মহাজন আমাদের বলেছিলেন, 'কর্ম ও উপাসনা হাতে হাত মিলিয়ে চলবে', তাঁরা আরো বলেছিলেন, 'এ আদর্শটি তোমাদের সামনে ধরে রাখ ঃ "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"— "নিজ-মুক্তি ও জগৎ-কল্যাণের জন্য"।' নিজ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের জন্য যেমন তোমাকে উদ্যম করতে হবে, একই সঙ্গে সকলের কল্যাণ সাধনের জন্যও তেমনই উদ্যম কর। জ্ঞানদীপ্ত আত্মাই কেবল সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শনে সক্ষম, আর তাঁর সেবাভাব আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কিন্তু যারা এখনো অজ্ঞানের অন্ধকারে রয়েছে তাদের দৃঢ়ভাবে কল্পনা করতে হবে ঈশ্বর-চৈতন্যের মাধ্যমে আমরা পরস্পরযুক্ত, আমরা নিজেদের কল্যাণ কর্মে যেমন সচেষ্ট থাকব, তেমনিই যেন আমরা সকলের কল্যাণ কর্মেও সচেষ্ট থাকি।

'কাজ ও উপাসনা হাতে হাত মিলিয়ে চলবে'—এই উপদেশটি আমরা যে পেয়েছি, এখানে তার এক নতুন অর্থ পাওয়া গেল। ধ্যানে আমাদের যেমন ক্রমোন্নতি হবে, অন্তরের দিকে উন্নতি করতে আমরা যেমন চেষ্টা করব, তেমনই আমাদের কাজ করে যেতে হবে, কেবল আমাদের পরিবারবর্গের জন্য নয়, পরন্তু অন্যদের কল্যাণের জন্যও। এ উপদেশ যদি কাজে পরিণত হতো তবে পৃথিবীতে কী সুন্দর সমাজ ব্যবস্থাই না হতো! যদি আমরা প্রত্যেকেই নিজের জন্য যেমন ভাবি তেমনি অপরের জন্য ভাবতাম, তবে নিশ্চয়ই আমরা অনেক বেশি কিছু পেতে পারতাম। সাধারণত স্বার্থপর মনোভাব নিয়ে আমরা চিন্তা করি, 'কেবল আমার নিজের জন্য আমার আগ্রহ।' কিন্তু যখন দৃষ্টিভঙ্গি উদার হয় আর আমাদের বোধ হয় আমরা সকলে এক বৃহত্তর পূর্ণসত্তার এক একটি অংশ, তখন প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাবোধ আর সান্নিধ্যবোধ নিবিড় হয়। আর প্রত্যেকেই যখন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'কাজ ও উপাসনা'র আদর্শটিকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবে, আমাদের জীবন আরো মধুর ও সফল হবে ও অধ্যাত্ম জ্ঞান এক কাজে পরিণত ঘটনা হবে।

আর আমরা যখন অধ্যাত্ম সাধনা ও সেবার কাজ করি তখন যেন অহংকেন্দ্রিক না হই। আমরা যেন আমাদের সব কর্মের ফল পরম চৈতন্যে সমর্পণ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমরা যদি ঈশ্বরের দিকে এক পা এগিয়ে যাই, তিনি আমাদের দিকে দশ পা এগিয়ে আসেন।' অধ্যাত্ম জগতে এ তথ্য উপলব্ধি করতে হবে। তাহলে এগিয়ে পড়। পরম চৈতন্য যেন সর্বদা তোমাদের রক্ষা করেন, পথ দেখান, তোমাদের অন্তঃকরণকে তাঁর ঈশ্বরীয় সত্তায়, পবিত্রতায়, প্রেমে ও আনন্দে পরিপূর্ণ করেন।

# বিংশ পরিচ্ছেদ

# একাগ্রতা ও ধ্যান

## সব রকম একাগ্রতাই ধ্যান নয়

সাধারণ একাগ্রতা আর ধ্যানের তফাত কি তা জানা থাকা দরকার। ইংরাজীতে 'মেডিটেশন' (Meditation) শব্দে আমরা বুঝি *ধ্যান* বা গভীর চিন্তন। একে সাধারণ একাগ্রতা বলা চলে না। এ এক বিশেষ ধরনের একাগ্রতা। প্রথমত, ধ্যান একটি সম্পূর্ণ সচেতন ক্রিয়া পদ্ধতি, ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন। দ্বিতীয়ত, ধ্যানের অর্থ হলো একটি আধ্যাত্মিক ভাবের ওপর একাগ্রতা, যাতে আগে থেকে ধরে নেওয়া হয় যে সাধক পার্থিবভাবের ওপরে উঠতে সক্ষম। এবং পরিশেষে, ধ্যান সাধারণত করা হয় কোন একটি বিশেষ চেতন-কেন্দ্রে। এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে প্রকৃত ধ্যান স্পষ্টত এক উন্নত অবস্থা, যা অনেকদিনের অভ্যাসের ফলেই লাভ করা যায়। এটি বহু বছরব্যাপী সাধনের ফল।

সাধারণত যাকে ধ্যান বলা হয়, তা ঐ নামের যোগ্য নয়। মন নানা মন্দ চিন্তায় ও প্রবণতায় বিক্ষিপ্ত হয় এবং জাগতিক বিষয় মনকে ঈশ্বর-চিন্তা থেকে সরিয়ে দেয়। বেশির ভাগ অধ্যাত্ম সাধকের ক্ষেত্রে মনকে বহুবার প্রত্যাহার করে এনে ঈশ্বরে স্থির করতে হয়। সাধারণত এই অবস্থাকেই *ধ্যান* বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ হলো *প্রত্যাহার*—বহির্মুখী মনকে ফিরিয়ে আনা। মনকে একই বিষয়ের চিন্তায় অল্প সময়ের জন্য স্থির রাখা হলো পরবর্তী স্তর যাকে *ধারণা* বলা হয়। যখন বহির্মুখী প্রবণতাগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, আর মনের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোত ঈশ্বর-চিন্তার প্রবাহে পর্যবসিত হয়, সেই অবস্থাকেই প্রকৃত *ধ্যান* বলে।

বিষয় বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে—সংসারী লোকের স্থূল জড় বস্তু প্রাপ্তির, তার থেকে লাভের ও ভোগের ওপর মনঃসংযোগ; বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা যথা, অণুর কাঠামো, গাছের গঠন প্রভৃতির ওপর তার মনঃসংযোগ; মনস্তাত্ত্বিকের চিন্তার গতি ও নিয়মের ওপর মনঃসংযোগ; *যোগীর* অহমিকা ও অহংশূন্যতার বিচারের ওপর মনঃসংযোগ—এ সবই বিভিন্ন ধরনের মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা। কিন্তু বিষয়ীর দিক থেকে বিবেচনা করলে, এদের বিষয় বস্তুর মধ্যে বিস্তর তফাত রয়ে গেছে ও

এগুলি একেবারে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার ও ফলের দিকে নিয়ে যায়। যে পথেরই সাধক হোক না কেন, কেবল অধ্যাত্ম সাধকের মনঃসংযোগকেই *ধ্যান* বা ইংরাজীতে 'মেডিটেশন' (Meditation) বা কনটেম্‌প্লেশন (Contemplation) বলা হয়।

ঈশ্বর-বিশ্বাস বলতে সাধারণত যেমন বোঝায়, তেমন ঈশ্বর-বিশ্বাস না থাকায় সত্যানুসন্ধিৎসু যোগী, প্রথমে দেশ-কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন স্থূল উপাদানেরই ধ্যান করে, পরে দেশ-কালাতীত উপাদানের ধ্যান করে। এরও পর সে সূক্ষ্ম উপাদানকেই মানসিক একাগ্রতার ও ধ্যানের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করতে পারে, প্রথমে দেশ-কালের পরিধির মধ্যে, পরে তার বাইরে। আরো অগ্রসর হলে, সে মনকে বা 'অন্তরেন্দ্রিয়'কে ও পরে অহংভাবকে তার একাগ্র মনঃসংযোগের ও ধ্যানের বস্তু করতে পারে। এই বস্তুগুলির প্রকৃত সত্তা জানা হলে সে আর এই সব সীমাবদ্ধ উপাধির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে না এবং নিজের প্রকৃত আত্মার আরো কাছে এসে অদ্ভুত আনন্দ ও দিব্যজ্ঞানের অবস্থা উপভোগ করতে থাকে।

যেসব বৈদান্তিক সাধক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে, প্রথম প্রথম তারা ধ্যান করতে পারে কোন মহৎ পবিত্র ব্যক্তিত্বের সাকাররূপের (মূর্তি বা ছবির), অথবা ঈশ্বরের প্রতীকের—যিনি প্রথমে দেশ-কালের সীমার মধ্যে বিদ্যমান ও পরে যিনি এই সীমার অতীত। আরো অগ্রসর হয়ে সে ধ্যান করতে পারে পবিত্র ব্যক্তিত্বের 'হৃদয়ে'র বা দিব্য মনের এবং ক্রমে তৎসংশ্লিষ্ট উদার গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে। আরো পরে, সে ব্যষ্টি বা সমষ্টি, শুদ্ধ চৈতন্যের ধ্যান করতে পারে, ফলে স্বীয় অশুদ্ধ সীমাবদ্ধ চৈতন্যের শুদ্ধি ও সম্প্রসারণে সফল হয়ে নিজ অন্তরস্থ অনন্ত সত্তার স্পর্শ লাভ করতে পারে, এমনকি আরো অগ্রসর হয়ে সেই উচ্চতম ঈশ্বরোপলব্ধির স্তরে পৌঁছতে পারে, যেখানে ধ্যাতা (সাধক), লবণের পুতুলের সমুদ্র-সংস্পর্শে আসার মতো, জ্ঞানাতীত ঈশ্বর তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। এই ভাবে, ব্যষ্টি-চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ধরনের একাগ্রতা ও ধ্যানের মাধ্যমে সূচনা করে সে পৌঁছতে পারে উচ্চতম অতিচেতন অবস্থায়—পরম সত্তায়, সেই অদ্বৈত-তত্ত্বে যেখানে সব রকম বিষয়-বিষয়ী সম্পর্ক তথা, সব আপেক্ষিকতার সীমা পুরোপুরি অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

নিছক একাগ্রতার কোন আধ্যাত্মিক মূল্য নেই। আগে যেমন বলা হয়েছে, এতে সাধকের সমূহ বিপদও ঘটতে পারে যদি সে আগেই কিছুটা মানসিক পবিত্রতা অর্জন না করে থাকে, আর সেই সঙ্গে মানসিক উদ্‌গতির কাজ না চালিয়ে যায়। উপর্যুপরি মন্দ চিন্তা ও কাজের দরুন যেসব বাজে চিন্তা, মলিনতা, মন্দ সংস্কার ও প্রবণতা মনে জমেছে তা থেকে মন যতটা মুক্ত হয়ে শুদ্ধ হবে, একাগ্রতা ও ধ্যান সেই অনুপাতেই

আধ্যাত্মিক ফল লাভের সহায়ক হবে। একমাত্র তীব্র অনাসক্তি ও কঠোর পবিত্রতা অর্জনের ফলেই সাধক উচ্চতর একাগ্রতা ও ধ্যান পদ্ধতি অবলম্বনে সফলকাম হতে পারে, ও শেষ পর্যন্ত উচ্চতম ঈশ্বরীয় অনুভূতি ও মুক্তি লাভ করতে পারে।

প্রত্যেক সাধারণ মানুষই একাগ্রতা অভ্যাসের সামর্থ্য রাখে, যদিও তা সাধারণত সংসারে প্রাপ্তব্য ও ভোগ্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে ফেরানো থাকে। অধ্যাত্ম জীবন ধারণের পথে চলতে সহসা বিশেষ কোন নতুন মনন-শক্তি বিকাশের প্রয়োজন নেই। পুরাতন সামর্থ্য ও প্রবণতাগুলির তীব্রতা একটুও না কমিয়ে সেগুলিকে ঈশ্বরমুখী করতে হবে, তবেই সংসারী মানুষ আধ্যাত্মিক সাধকে পরিণত হবে। তাই খাঁটি ভক্ত প্রার্থনা করবে, 'হে প্রভু, জ্ঞানহীন বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি যে তীব্র প্রীতি তোমার প্রতি সেই প্রীতি নিয়েই যেন আমি তোমার চিন্তা করতে পারি, আমার হৃদয়ের সেই প্রীতি যেন কখনো শুকিয়ে না যায়।'[১]

## নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন

আমাদের মন সব সময়েই আমাদের ভুল পথে চলতে ও আমাদের সঙ্গে চালাকি করতে চায়। তাই আমরা যা কিছু করি সে সবেতেই কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় মানসিক শিক্ষণ কিভাবে পাওয়া যাবে? ধ্যানপরায়ণ জীবনের এইটি প্রধান সমস্যা। মনে বিভিন্ন চিন্তা সব সময়েই উঠছে। যখনই আমরা মনকে শান্ত করতে চাই, মন তখনই অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যে মুহূর্তে আমরা একাগ্র হতে চেষ্টা করি, সে মুহূর্তেই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মন, হঠাৎ এক বিশাল সমুদ্রের রূপ ধারণ করে, তাতে আমাদের ডুবে যাবার মতো সঙ্কট সৃষ্ট হতে পারে। প্রবল চিন্তা তরঙ্গ মনের ওপর বিক্ষোভ সৃষ্টি করে আর আমরা তাকে যতই শান্ত করতে চেষ্টা করি বিক্ষোভ ততই বেড়ে যায়। তাই, প্রথম প্রথম ধ্যানাভ্যাসে আমরা প্রশান্তিলাভ না করে ও আলোকপ্রাপ্ত না হয়ে, বরং অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ি।

ঘোড়াকে পোষ মানাতে তার শিক্ষাদাতা সহিসকে যেমন বেশ বেগ পেতে হয়, তেমন মনকে 'পোষ মানাতে' আমাদের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা, খুব জেদ ভরে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক নিয়মশৃঙ্খলায় প্রত্যেকটি ব্যাপারেই খুব সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমাদের দু-নৌকায় পা দিয়ে চললে কিছুতেই কিছু হবে না। আমরা যদি একদিন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছব বলে মনে করে থাকি, তবে আমাদের অনন্য মনে ধাপে ধাপে একটি নির্দিষ্ট পথে চলা শিখতেই হবে।

---

১ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাঽপসর্পতু॥ *বিষ্ণুপুরাণ*, ১/২০/১৭

সাধারণত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের আসক্তি ও বাসনাই প্রকৃত ধর্মের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত তোমরা জীবনে যে সব ফাঁকিবাজি দেখে থাক, যেমন উপাসনার স্থানে যাওয়া, ধর্মোপদেশ শোনা, আর তারপর ইচ্ছামতো সব কিছুই করে চলা, এগুলি প্রকৃত ধর্ম নয়। এ ধরনের আচরণ চার্চের পক্ষে খুবই লাভজনক হতে পারে, কিন্তু তাকে খ্রীস্টোপদেশ পালন বলা চলে না। সব রকম আধ্যাত্মিক অনুশীলনেই ঠিক ঠিক নিয়মশৃঙ্খলা অবশ্যই পালনীয়, আর আধ্যাত্মিক অনুশীলন ছাড়া প্রকৃত ধর্মের মতো কোন কিছু লাভ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন খ্রীস্টানরা এ কথা খুব ভাল করে জানতেন, মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকদের মধ্যেও অনেকে তা জানতেন। কিন্তু এখন পাশ্চাত্যে সে ঐতিহ্য একেবারেই হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়, তাই পাশ্চাত্য আজ পাশবিক স্তরে অধঃপতিত হচ্ছে।

আগে যে কথা বলেছি, মন বহুলাংশে অসংযত (দুষ্ট) ঘোড়ার মতো, তাকে পোষ মানাতে হবে। আমরা যখন ঘোড়ায় চড়তে চাই, ঘোড়া দুভাবে ঝামেলা করতে পারে : হয় সে খুবই চঞ্চল হয়ে ওঠে, অথবা কেবল শুয়ে পড়ে, আর নড়তে চায় না। সে স্থির হতে চায় না। মনরূপ অসংযত ঘোড়াকে বশে আনতে হলে কিছুটা নৈতিক সংস্কার দরকার। যতদিন কাম-কাঞ্চনের চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে ততদিন মনকে বশে আনা যাবে না।

## মনের শুদ্ধি প্রয়োজন

মনের পবিত্রতা অর্জন না করে তুমি যদি ধ্যান করার চেষ্টা কর, তবে মানসিক একাগ্রতা ঈশ্বরের ওপর কেন্দ্রীভূত না হয়ে মনের কালিমাগুলির ওপরই বেশি কেন্দ্রীভূত হবার সম্ভাবনা। সাধকের পক্ষে উচ্চতর চিন্তা নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে হলে তার মনের উচ্চতর কেন্দ্রগুলিকে অবশ্যই উন্মুক্ত হতে হবে। এখানেই প্রার্থনা ও সৎকর্মের গুরুত্ব।

নতুন সাধককে কখনই কর্ম-বিবর্জিত ধ্যানের পথে যেতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে এ জিনিস হতে দেওয়া হয় না। অধ্যাত্ম জীবনের গোড়ায় যতদিন না তুমি তোমার চিন্তার ওপর পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করছ, ততদিন অত্যধিক ধ্যান তোমার পক্ষে বিপজ্জনক। যখন তুমি একলা বসে মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করবে, তখন নিষিদ্ধ অশুদ্ধ চিন্তাগুলি তোমার মনে উঠতে আরম্ভ করবে আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। তারা তোমাকে পরাভূতও করতে পারে। সাধনার গোড়ায় অল্পক্ষণ মাত্র ধ্যান করাই ভাল। বাকি সময়টুকু অবশ্যই কর্ম, সেবা বা অধ্যয়ন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতে হবে।

এ কথাই খ্রীস্টান সন্ন্যাসীরা জেনেছিল প্রাচীন খ্রীস্টীয় সন্তদের জীবন থেকে। তখন থেকে ক্যাথলিক সম্প্রদায় (Catholic Church) প্রাজ্ঞের মতো ধ্যানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ বাধ্যতামূলক করে রেখেছেন।

যারা উচ্চতর জীবনের জন্য নিজেদের ঠিক মতো গড়ে তোলেনি সেই সব মানুষের ক্ষেত্রে কিছুটা উদ্‌গতি এবং অনুভূতি ও বাসনার পবিত্রতা অর্জন না করে মনের একাগ্রতা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এর খুব খারাপ ফল হতে পারে। এক দিক থেকে আমরা মনকে একাগ্র করি, কিন্তু তারপর তাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তা জানি না। এই একাগ্র মন, একাগ্র হয়েছে বলেই, আরো বেশি তীব্রতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ আর সব রকম জাগতিক বিক্ষেপ ও বিষয়ের দিকে ছুটবে। তাই যদি আমরা মনকে ঠিক মতো চালাতে না পারি তবে তা বিপথগামী হয়ে পড়বে। যদি ধ্যানের সঙ্গে মনের উদ্‌গমন ও শুদ্ধিকরণ না চলতে থাকে, তবে ধ্যানে মনের একাগ্রতা না আনাই ভাল। অতএব চিন্তায়, কথায় ও কাজে পবিত্রতা, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির ওপর খুব বেশি জোর দিতে হবে। আমাদের সব বাসনা ও স্পর্শজনিত অনুভূতির উদ্গতি না হলে আমরা অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হতে পারব না। কঠোর নৈতিক ও চারিত্রিক বিধিব্যবস্থা মেনে চলার পরেই কেবল মনের একাগ্রতা ও ধ্যান অভ্যাসের চেষ্টা করা উচিত। মনকে যদি আগে শুদ্ধ না করা হয়ে থাকে, তবে একাগ্র হবার পর তা সাক্ষাৎ দানবের রূপ নেয় ও অধ্যাত্ম সাধকের অশেষ দুর্গতি সাধন করে।

শুধু শরীরের নয় মনেরও পবিত্রতা একান্ত দরকার। কখনো কখনো আমরা ভুলবশত কেবল শরীরের পবিত্রতার ওপর জোর দিয়ে থাকি, কারণ প্রকৃত মানসিক পবিত্রতা অর্জন করা বেশি কষ্টসাধ্য। অনেকে স্নান করেই সন্তুষ্ট, কিন্তু তারা মনের পবিত্রতা অর্জনে বিশেষ তৎপর হয় না। যেমনই হোক, মলিন মনকে একাগ্রভাবে উচ্চতর বিষয়ে নিয়োগ করা যায় না। যতদিন পর্যন্ত কোন পুরুষের মনে নারী সম্বন্ধে অথবা নারীর মনে পুরুষ সম্বন্ধে অপবিত্র চিন্তা রয়েছে, সেই পুরুষ বা নারীর পক্ষে প্রকৃত উচ্চতর বিষয়ে একাগ্রতার প্রশ্নই উঠতে পারে না। স্থূল শারীরিক সম্বন্ধ না থাকলেও, এ একই রকম যৌনভাব, আর যতদিন কোন রকম যৌনভাব থাকবে, পবিত্রতা অর্জিত হয়নি বুঝতে হবে—আর পবিত্রতা ছাড়া উচ্চতর অধ্যাত্ম জীবন বহু দূরেই থেকে যাবে।

## আসন

পরবর্তী বিষয় হলো দেহের এক স্থির ভঙ্গিমা (*আসন*), সাধারণত এ এক রকম

বসার ভঙ্গি। পতঞ্জলির নির্দেশ হলো : 'স্থিরসুখমাসনম্'—যেভাবে অনেকক্ষণ সুখে বসে থাকা যায় তার নাম *আসন*।[২] এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, যে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসা খুবই সহায়ক আসন বলে গণ্য হতে পারে, এই ভঙ্গিতে শরীরের ওজন সম্পূর্ণ সমভাবে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু এটিকে অবশ্যই সহজ হতে হবে, অন্যথা হলে সাধনায় যত্নশীল সাধকের মনোবিক্ষেপ ঘটবে। ভারতীয়দের কাছে এ আসন স্বাভাবিক, কিন্তু বহু পাশ্চাত্যবাসীর কাছে একাজ বেশ কিছুদিন অভ্যাস সাপেক্ষ, কেউ কেউ এ আসনে বসতেই পারে না। যাই হোক, যারা পারে তাদের কাছে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসাই অধ্যাত্ম সাধনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আসন।

## ছন্দোবদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস

অনেকে ছন্দোবদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাসে (বা প্রাণায়ামে) বেশ উপকার পায়। মন ও শ্বাস সব সময়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একে অপরকে প্রভাবিত করে। যখন *প্রাণায়াম* করবে, শ্বাসগ্রহণ, রক্ষণ ও নিঃসরণের অনুপাত ১:৪:২ হওয়া উচিত। কিন্তু যারা অত্যন্ত ব্যস্ত বা অমিতাচারী তাদের পক্ষে প্রাণায়াম করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু সরল নিয়ন্ত্রিত শ্বাস সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। অবশ্য কেবল শ্বাসরক্ষণই যথেষ্ট নয়। তাই যদি হতো, ফুটবলের ব্লাডার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ *যোগী* হতো। ছন্দোবদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে, আমাদের অবশ্যই পবিত্রতা সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। 'প্রত্যেক জিনিস পবিত্র, আমি নিজে পবিত্র, আমি পবিত্রতার প্রতিমূর্তি'—এই রকম দৃঢ় ধারণা মনের মধ্যে নিয়ে এস। অনুভব করতে থাক যে প্রতিবার শ্বাসগ্রহণে তোমার শরীর-মন পবিত্র থেকে পবিত্রতর হচ্ছে। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসের পবিত্রতাকে যাওয়া-আসা করতে দাও, পবিত্রতাতে নিজেকে ভরিয়ে ফেল। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শান্তভাবকে যাওয়া-আসা করতে দাও, নিজে পুরোপুরি শান্তভাবে ভরে ওঠ। কিংবা প্রশ্বাসে প্রশান্তির ভাব গ্রহণ কর আর নিঃশ্বাসে মানসিক অশান্তির ভাব ত্যাগ কর। অনাসক্তি ও ত্যাগের মনোভাব গ্রহণ কর প্রশ্বাসের সঙ্গে, আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বার করে দাও শরীর মনে যা কিছু অপবিত্র ভাব আছে। প্রশ্বাসের সঙ্গে শক্তি গ্রহণ আর নিশ্বাসের সঙ্গে দুর্বলতা ও ভয় বর্জন কর। মনকে এই সব গভীর ইঙ্গিতগুলি বারংবার দিতে থাক। তারপর যথার্থ ধ্যানে বসবে।

## ধ্যানের বিষয়বস্তু

শূন্যতার ওপর ধ্যানে মগ্ন হতে নেই। প্রবর্তক সাধকের পক্ষে কখনই নিজের মনের মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। সে যদি তা করে তবে তার ঘুম আসতে

২ পতঞ্জলি, *যোগসূত্র*, ২/৪৬

পারে অথবা সেই শূন্য স্থান অপবিত্র চিন্তায় ভরে যাবে। ধ্যানের জন্য যেন কোন রকম নির্দিষ্ট ইতিবাচক আধ্যাত্মিক বিষয় বস্তু অবশ্যই থাকে। যাদের কাছে নিরাকারের ধ্যান অতি সূক্ষ্ম বলে বোধ হবে তাদের উচিত হবে নিজ অনুভূতিকে কোন পবিত্র মূর্তিতে কেন্দ্রীভূত করা। দু-রকমে এর ফল পাওয়া যায়। এতে অহং-বোধ দূরীভূত হবে, আর অনুভূতির উদ্‌গতি হবে। যদি কখনো তোমার প্রীতি বা ঘৃণা-ভাজন কোন ব্যক্তির ছবি তোমার অসুবিধা সৃষ্টি করে, তবে তোমার আদর্শের (*ইষ্টের*) উজ্জ্বল পবিত্র মূর্তিটি তার বিপরীতে খাড়া কর। ইষ্টের প্রতি যে অনুভূতি তুমি পোষণ কর তাকে খাড়া করা উচিত ঐ কষ্টদায়ক স্মৃতি-বিজড়িত ব্যক্তির প্রতি তোমার যে মনোভাব তার বিপক্ষে। জাগতিক চিত্র ও ভাবকে ঈশ্বরীয় চিত্র ও ভাব দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। যারা এরূপ করতে পারে তারা অধ্যাত্ম জীবনে বিশেষ অসুবিধায় না পড়ে দ্রুত উন্নতি করে। যে তার *ইষ্ট দেবতার* প্রতি তীব্র ভালবাসা ও আকর্ষণ অনুভব করে, তার পক্ষে ধ্যান অভ্যাস সহজ হয়।

নৈতিক সংস্কৃতি ছাড়া আমরা কখনই ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করতে পারি না। অন্তরকে সম্পূর্ণ শূন্য করে যদি আমরা সুষ্ঠু চিন্তা করতে পারি, তবে তা উত্তম কথা। তাহলে এ অভ্যাস খুবই উপকারী হতে পারে। কিন্তু প্রবর্তক সাধকের পক্ষে তা খুবই বিপজ্জনক, মনকে শূন্য করার পর সে সেখানে সুষ্ঠু চিন্তা আনতে পারে না, পরন্তু ঘুমিয়ে পড়ে বা অবচেতন মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রবর্তকের পক্ষে তার মনের চেতন স্তরের সীমারেখার নিচে পড়ে যাবার সমূহ বিপদ সব সময়ে রয়েছে।

অনেকেই চায় মই-এর উচ্চতম ধাপ থেকে অধ্যাত্মজীবন শুরু করতে, কিন্তু তা পারা যায় না। অধ্যাত্ম জীবনে ডিঙ্গিলাফের মতো কিছু ব্যবস্থা নেই, প্রথমে নিজের বর্তমান অবস্থিতি সঠিক না জেনে কোন কিছু লাভও করা যায় না। উপলব্ধি বলতে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বে পৌছনো ও অধিবিদ্যার বিস্ময়কর স্বপ্ন দর্শন বোঝায় না, আর এগুলি নিজের শক্তিতে কখনোই উপলব্ধির পথে নিয়ে যায় না, পরন্তু নিয়ে যায় কেবল ভাবগত ও অতি সূক্ষ্ম দূরকল্পনার দিকে—যার সঙ্গে বাস্তব বা ব্যবহারিক জীবনের কোন রকম সম্পর্ক নেই। ঐগুলি প্রশ্রয় পেয়েও কারও জীবনে কোন ভাবে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি তা জেনে নিয়ে, সেখান থেকে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমরা অবশ্যই প্রবর্তকের মতো আরম্ভ করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলব। আদর্শ হিসাবে, অদ্বৈতবাদ আমাদের পক্ষে বেশ ভাল হতে পারে; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নামলেই আমরা দ্বৈতবাদী, আর ভবিষ্যতে বহুদিন আমরা দ্বৈতবাদীই থাকব। কেউ কেউ জ্ঞানাতীত অবস্থা, তত্ত্ব, জ্ঞান প্রভৃতি

নিয়ে অতি উচ্চ পর্যায়ের কথা বলছে শুনলে আমার হাসি পায়, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওগুলি শূন্যগর্ভ দূরকল্পনা ও অসার কথা মাত্র। ঐ কথাগুলি থেকে কোন লোককে, অদ্বৈত পথে সাধনার উপযুক্ত বলেও বোঝা যায় না। কেউ যদি দ্বৈতভূমির কোন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তাকে অদ্বৈতবাদী বলা যায় না—অদ্বৈতবাদ তার ভাল লাগুক আর না লাগুক।

প্রায়ই আধুনিক মানবের মন কঠোর বিধিবদ্ধ ধ্যানের কথায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে বলে, 'ওসব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব কেন? সংসারের একঘেয়েমি কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়? তবে যেসব অভ্যাস আমাদের ভাল লাগে না, তা আমরা মেনে চলতে যাব কেন? আমরা তো চাই জ্ঞানাতীত নিরপেক্ষ অবস্থা, তবে *জপ*, ঈশ্বরীয় মহিমা বা ঈশ্বরের বিভিন্নরূপ—এ সবের কি দরকার? একেবারে জ্ঞানাতীত চরম অবস্থাতে পৌঁছবার চেষ্টা করি না কেন? ঈশ্বরকে "ভাব-স্বরূপে, সত্য-স্বরূপে" উপাসনা করি না কেন?' এ সব কথা শুনতে নিঃসন্দেহে খুবই চমকপ্রদ ও অত্যন্ত আধ্যাত্মিক, কিন্তু যখনই বাস্তব জীবনে নেমে আসা যায়, আমরা দেখি যে এ রকম চিন্তায় কিছু ফল হয় না। দৈনন্দিন কাজ-কর্মে এ সব লোক বেশির ভাগই দ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরকে 'ভাব-স্বরূপে ও সত্য-স্বরূপে' উপাসনা করা আদর্শ হিসাবে খুব ঠিক। কিন্তু কয়জন তা করতে পারে?—তাই বিচার্য। বেশির ভাগ লোকের কাছে এর অর্থ অস্পষ্ট ভাব মাত্র, অস্পষ্ট চিন্তা মাত্র এবং ভাব ও সত্যের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন কর্ম মাত্র।

## চেতনার কেন্দ্র

এরপর কি? আসন ও প্রাণায়ামের পরে ধরতে হবে ঈশ্বরচিন্তাকে। ঈশ্বরচিন্তা কোথায় করবে? ব্যক্তি-চেতনার কেন্দ্রকে কোথায় রাখবে? হয় মাথায়, নয় হৃদয়ে। এ দুটি কেন্দ্র সকলের পক্ষেই নিরাপদ। হৃদয়ের নিচে কোন স্থানে যেন ঐ কেন্দ্রকে স্থাপন করা না হয়। এখানে উপদেশ কেবল ব্যষ্টি হিসাবেই দেওয়া যেতে পারে, কারণ তারা একে অন্যের থেকে পৃথক, কিন্তু মস্তিষ্ক ও হৃদয় সকলের পক্ষেই নিরাপদ। আমরা যদি সচেতনভাবে, স্নায়বিক অনুভূতি প্রবাহকে অন্তত ভৌতিক হৃদ্‌যন্ত্রের সংস্থান অনুযায়ী কোন স্তর পর্যন্ত তুলতে না পারি, তবে কোন আধ্যাত্মিক ধ্যান সম্ভব হবে না। কোন ব্যক্তির অনুভূতি প্রবাহের এ রকম সচেতন ঊর্ধ্বগতি তাকে সব ইন্দ্রিয়সম্ভোগের প্রলোভনের পারে নিয়ে যায়, আর চারিত্রিক ও নৈতিক সংস্কৃতিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই হৃদয়-দেশে ধ্যানই যুক্তি-যুক্ত। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ লোকের পক্ষে হৃদয়কেন্দ্র সুবিধাজনক না হতে পারে, এবং তা বর্জন বিধেয়; তাদের পক্ষে মনকে মস্তিষ্কে একাগ্র করতে অভ্যাস করাই

ভাল। তারা পরে তা হৃদয়ের স্তরে নেমে আসতে পারে, কারণ হৃদয়ই হলো চেতনাতীত অবস্থায় পৌঁছবার দ্বার-স্বরূপ।

## চেতনাকেন্দ্র-স্বরূপ হৃদয়

আমরা 'হৃদয়' কথাটি খুবই অবাধে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কি? এর অর্থ কি দেহের হৃদ্‌যন্ত্র—গহ্বর বিশিষ্ট পেশীবহুল অঙ্গ যা পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরের রক্ত সঞ্চালন বজায় রাখে? এক সময়ে একজন শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রশ্ন করেছিল, 'মহারাজ, আমি কোন্ কেন্দ্রে ধ্যান করব? হৃদয়ে না মস্তিষ্কে?' স্বামী ব্রহ্মানন্দ উত্তরে বলেন, 'বাবা, তোমার পছন্দ মতো যে কোন কেন্দ্রেই ধ্যান করতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে পরামর্শ দেব প্রথমে হৃদয়ে ধ্যান করতে। তোমার *ইষ্ট দেবতাকে* হৃদ্‌পদ্মে ধ্যান কর।' শিষ্য আবার প্রশ্ন করে, 'মহারাজ, হৃদয় তো রক্তমাংসে তৈরি। ঈশ্বরের ধ্যান সেখানে কি করে সম্ভব হবে?' স্বামী ব্রহ্মানন্দ উত্তরে বলেন, 'আমি শরীর যন্ত্রের হৃদ্‌পিণ্ডের কথা বলিনি। হৃদ্‌পিণ্ডের কাছে যে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র রয়েছে তার কথা চিন্তা কর। প্রথম প্রথম শরীরের অভ্যন্তরে ঈশ্বর রয়েছেন একথা ভাববার সময়, তুমি রক্তমাংসের কথা ভাবতে পার। কিন্তু শীঘ্রই তুমি শরীরের কথা ভুলে যাবে, আর দেখবে যে, সেখানে কেবল ইষ্ট দেবতার আনন্দময় মূর্তিই রয়েছে।'[৫]

কখনো কখনো হৃদয়াবেগের স্থান বলতে আমরা শরীরের হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করে থাকি। আমরা বলি 'হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে' ইত্যাদি। একে আবেগের 'হৃদয়' বলা যেতে পারে।

শরীরের হৃদ্-যন্ত্র ও আবেগের হৃদয় ছাড়া আর একটি হৃদয় আছে, যার নাম আধ্যাত্মিক হৃদয় বা হৃদয় কেন্দ্র বা '*অনাহত চক্র*', প্রায়শই যাকে পদ্মরূপে—'হৃৎপদ্ম রূপে' চিত্রিত করা হয়। এ হলো উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনার স্বজ্ঞার কেন্দ্র।

মনুষ্য দেহরূপ এই বিস্ময়কর ব্যাপারটিতে নানা *চক্র*—চেতনা কেন্দ্র রয়েছে। প্রত্যেকটি চক্রই ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শরীরগুলির মিলন কেন্দ্র। নিম্নতর চক্র তিনটির স্থান হলো—মলদ্বার, জননেন্দ্রিয় ও নাভি দেশ। এগুলি মানুষের নিম্নতর জীবন, পশুজীবন, ইন্দ্রিয়সম্ভোগের জীবনের সঙ্গে জড়িত। যে কেন্দ্রটি হৃদয় দেশে রয়েছে তা চতুর্থ এবং এর নাম *অনাহত চক্র*, এটির অবস্থান নিম্নতর তিনটি, আর উচ্চতর তিনটি কেন্দ্রের মাঝামাঝি জায়গায়। হৃদয় ও উচ্চতর তিনটি কেন্দ্র মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। উচ্চতর তিনটি কেন্দ্র রয়েছে যথাক্রমে

---

৫ Swami Prabhavananda, *The Eternal Companion* [Madras : Sri Ramakrishna Math, 1971] pp. 347-48

কণ্ঠ দেশে, ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে ও শীর্ষদেশে। শারীর বিদ্যার সাহায্যে এই কেন্দ্রগুলিকে বুঝতে যেও না। এগুলি অধ্যাত্ম চেতনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দ্বার-স্বরূপ।

তন্ত্রের আচার্যদের মতে *কুণ্ডলিনী* বা মানবের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম তেজ অথবা বলা যায় শুদ্ধ চেতনা যা আদিতে শীর্ষকেন্দ্রে বা *সহস্রারে* অধিষ্ঠিত ছিল, তাই ক্রমে *সুষুম্না* নামে অধ্যাত্ম নালীর মাধ্যমে চেতনার নানা কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে নেমে এসে মেরুদণ্ডের তলদেশে পৌঁছেছিল। এখানে এসে সে নিজের স্বরূপকে ভুলে গেল। ফলে অজ্ঞানের প্রভাবে পড়ে বাসনা ও কামনার দ্বারা তাড়িত হতে লাগল। সে ফেরার পথই গেল ভুলে। অধ্যাত্ম জীবনের দায়িত্বই হলো নিজ প্রকৃত স্বরূপের স্মৃতি ফিরিয়ে আনা, আর নিজ চেতনাকে ঊর্ধ্বমুখী করা—নিম্নতর কেন্দ্র থেকে উচ্চতর কেন্দ্রের দিকে। যেহেতু হৃদয়ের অবস্থান হলো নিম্নতর ও উচ্চতর কেন্দ্রগুলির মাঝামাঝি, হৃদয়কেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমাদের পক্ষে সেখানেই ধ্যানাভ্যাস করা সহজ।

## হৃদয়কেন্দ্রের গুরুত্ব

আবার, হৃদয়কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই আমরা আমাদের আত্মার আত্মারূপে আমাদের অন্তরে অবস্থিত পরম চৈতন্য জ্যোতিকে প্রথম অনুভব করে থাকি। এখানেই হলো সাকাররূপী ঈশ্বরের বিশেষ আসন। ঈশ্বর-ভক্তদের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে হৃদয়কেন্দ্রই হলো ধ্যানের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ

> **"তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন, সেখানে বিশেষ শক্তি। জমিদার সব জায়গায় থাকেন। কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায় বসেন। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়।"[৪]**

ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মস্তিষ্ককেন্দ্রে মনকে একাগ্র করা বেশি সহজ মনে করে। কিন্তু তাদের পক্ষেও হৃদয়কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করা ভাল। উপনিষদে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে *জ্ঞানের* উপদেশ দেওয়া হলেও—হৃদয়কেই চেতনার মূল কেন্দ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

> **যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।**
> **দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥**
> **মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।**
> **তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥[৫]**

---

৪ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৩৬৫

৫ *মুণ্ডকোপনিষদ্*, ২/২/৭-৮

—যিনি সর্বব্যাপী, যিনি সর্বজ্ঞ পরমাত্মা, যাঁর মহিমা এই বিশ্বে প্রতিফলিত হচ্ছে, তিনি ব্রহ্ম নগরীতে জ্যোতির্ময় আকাশ মধ্যে বসে আছেন। তিনি মন, প্রাণ ও সূক্ষ্ম শরীরের কর্তা হয়ে পথ প্রদর্শকরূপে হৃদয়ে অবস্থান করছেন। সেখানেই তাঁকে উপলব্ধি করে জ্ঞানদীপ্ত ব্যক্তিরা অমৃতত্বের ও পরম-আনন্দের অধিকারী হন।

আমাদের অধ্যাত্ম বিষয়ের আচার্যদের মতে, হৃদয় হলো সেই পবিত্র কেন্দ্র যেখানে পরমাত্মার বিশেষ আসন পাতা আছে। এখানেই তিনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন, আমাদের আত্মাগুলির আত্মারূপে। অত্যধিক আবেগপ্রবণ লোক অল্পক্ষণের জন্য ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থলে বা মস্তিষ্ককেন্দ্রে মনকে একাগ্র করতে পারেন—তাদের আবেগকে নিম্নতর কেন্দ্রে পতন থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি উদ্‌গত হয় হৃদয়কেন্দ্র থেকে।

হৃদ্‌যন্ত্রের সংস্থান অনুযায়ী যে চেতনা স্তর সেখানেই ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপের দর্শন লাভে কৃতার্থ হয়। সে 'অন্তর্জ্যোতি' আর 'ইষ্ট দেবতা'র জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে। এ রকম দর্শনের সঙ্গে সর্বদাই তার এই ধারণাও হয় যে, সে দেহ থেকে পৃথক একটি আত্মা। ভক্ত তখন উপলব্ধি করে যে সে শুদ্ধ মনোময় দেহ ও শুদ্ধ ভৌত দেহধারী এক আত্মা, আর পরমাত্মাও এক আনন্দঘন মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন তাকে আশীর্বাদ করার জন্য।

ভক্ত যখন হৃদয়কেন্দ্রে প্রবেশে সফলকাম হয়, তার শরীর বোধ চলে যায়, আর অন্তত সেই সময়ের জন্য সে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় ও আনন্দঘন উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন থাকে। এ রকম তখনই সম্ভব হয় যখন, আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদির ফলে তার মধ্যে এক সূক্ষ্মবোধ জেগে ওঠায় সে হৃদয়কেন্দ্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। তখনই সে হৃদয়কেন্দ্রে ধ্যানের তাৎপর্য ও ঈশ্বরীয় অস্তিত্বের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

## হৃদয়কেন্দ্রটি কোথায়?

যখন আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা জেগে ওঠে, তখনই নিত্য আত্মার সঙ্গে নিত্য ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আমরা অনুভব করি। কিন্তু এ সব নিজে পরীক্ষা করে দেখবার মতো লোকের ধৈর্য কোথায়? তারা কেবল আসে আর প্রশ্ন করে। অনেকবার এমন হয়েছে যে, আমি তাদের হৃদয়কেন্দ্রের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবার পর, ভক্তদের একটু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে বলেছি, কিন্তু তারা কিছু না করে এসে প্রশ্ন করে : 'হৃদয়কেন্দ্রটি কোথায়? এটি ডান দিকে, না বাঁদিকে রয়েছে?' তোমাকেই তা খুঁজে বার করতে হবে। এটি তোমার হৃদয়, আমার নয়। তোমাকেই তা খুঁজতে হবে।

এটা একটা চিরন্তন প্রশ্ন। অধ্যাত্ম সাধকের প্রকৃত দায়িত্ব হলো এই সূক্ষ্ম আন্তর অববোধ জাগিয়ে তোলা। পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য ও তীব্র অধ্যাত্ম ক্ষুধা ছাড়া হৃদয়কেন্দ্র অনুদ্ঘাটিত ও অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়।

এখানে একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। চীন দেশে এক মার্কিন ডাক্তার ও এক চৈনিক ডাক্তারের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলেছিল। মার্কিন ডাক্তার বলেছিল, 'আমাদের শারীরতত্ত্ববিদদের মতে হৃদয় বাঁদিকে।' চৈনিক ডাক্তার বলেন, 'আমাদের শাস্ত্রে আছে, হৃদয় ডানদিকে।' সামান্য আলোচনা ভীষণ বাক্‌যুদ্ধের রূপ নিল। একে অপরকে যুক্তির সাহায্যে ডুবিয়ে দিতে চাইল। তখন একজন বৃদ্ধ চৈনিক এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে বালকরা, তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা এ রকম ঝগড়া করছ কেন?' ডাক্তার দুজন তাদের সমস্যা বুঝিয়ে দিল। বৃদ্ধটি হেসে বলল, 'বালকরা হৃদয় ডান দিকেই থাকুক আর বাঁদিকেই থাকুক তাতে কি এসে যায়? হৃদয়কে তার নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে দাও।' তাই শারীরবিদ্যার হৃদয় ও অন্য সব তত্ত্ব ভুলে গিয়ে আমাদের উচিত কাজ হবে, হৃদয়ের সঠিক অবস্থানটি খুঁজে বার করা।

বহু আধ্যাত্মিক সাধক মনে করে হৃদয় ডান দিকেও নেই, বাঁদিকেও নেই, কিন্তু বুকের মাঝামাঝি আছে, সাধারণত যেখানে আমরা আমাদের সুখকর বা অসুখকর আবেগের প্রতিক্রিয়া অনুভব করে থাকি। কিন্তু কেউই একে শারীরবিদ্যার হৃদয় বলে মনে করে না। তারা মনে করে শরীরের মাঝামাঝি একটি অঞ্চল আছে যার মধ্যে *আকাশ* নামে একটু খালি জায়গা আছে, যাকে 'ইথার'ও বলা যেতে পারে। ধ্যান ঐ *আকাশে*-ই করতে হয়—যে আকাশ হৃদয়ে রয়েছে, যা আবার হৃদয়কে পূর্ণ করে তার বাইরেও বিস্তৃত।

হৃদয় নামে যে আধ্যাত্মিক কেন্দ্রটি আছে—এখন তার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা কর। সেখানকার অল্প চেতনাকে অনুভব করতে চেষ্টা কর, তারপর অল্প বিচার-শক্তির সাহায্যে চিন্তা কর, 'এখানকার অল্প চেতনাই সম্পূর্ণ দেহে অনুস্যূত চেতনা' এ কথা সত্য নয় কি? আমরা শরীরের যে কোন অঙ্গই স্পর্শ করি না কেন, সেটি যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত না হয়—তবে আমাদের স্পর্শ-চেতনার অনুভূতি হয়। এই চেতনাই আবার আমাদের সমগ্র মনোময় দেহে অনুস্যূত। মনও পদার্থ, তবে সূক্ষ্ম পদার্থ। চেতনার স্পর্শ পেয়েই তা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। হাড়-মাসের এই দেহ—সবই জড় পদার্থ—কিন্তু আত্ম-শক্তির স্পর্শে সেটি সজীব বলে মনে হয়।

## হৃদয়েই জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ হয়

পুরাকালে ঋষি ঘোষণা করেছিলেন ঃ

**দহ্রং বিপাপং পরমেশভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্য-সংস্থম্।**
**তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকং তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ॥**[৬]

—শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, নিষ্পাপ, পদ্মাকার একটি আসন দেহ মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অশোক সূক্ষ্ম *আকাশ*। ধ্যান ঐ আকাশেই করতে হবে।

তুমি যাকে হৃদয় বল, তার মধ্যে যে *আকাশ* বা শূন্যস্থান রয়েছে তার কথা চিন্তা কর। ঐ আকাশ যা এখানে রয়েছে, তা আমাদের ভৌত শরীরে ও মনোময় শরীরে অনুপ্রবিষ্ট ও অনুস্যূত আকাশেরই অংশ। এটি আমাদের আত্মার বা জীবাত্মার আসন, তাই আবার সর্বত্র অনুস্যূত পরমাত্মা বা নারায়ণরূপ আকাশের অংশ।

*আকাশ* কথাটির গূঢ় অর্থ আছে। যে আকাশ ঘরের মধ্যে রয়েছে, তাকে সীমাবদ্ধ মনে হয়। কিন্তু তা কি সত্যই সীমাবদ্ধ? না তা হতে পারে না। যে আকাশ ঘরে রয়েছে তাকে বাইরের আকাশের থেকে পৃথক করা যায় না, কেবল দেওয়ালগুলিই যেন একে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। তেমনিই মনে হয় হৃদয় যেন চৈতন্যকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। যাকে সীমাবদ্ধ মনে হচ্ছে তাকে কিন্তু অসীম থেকে পৃথক করা যায় না। এই কথাই উপনিষদের ঋষি 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে'র 'অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে' বলেছেন ঃ

**যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং**
**যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥**
**যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ ...॥ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্ ...॥**[৭]

—অনন্ত চৈতন্য রয়েছেন মাটিতে, জলে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বাতাসে, স্বর্গে, সূর্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে; তিনি রয়েছেন চক্ষে, মনে, বুদ্ধিতে—তিনি সবের ভেতরে অনুস্যূত। তিনিই অন্তরস্থ নিয়ন্তা ও তোমার নিজ অমর আত্মা। কিন্তু অধ্যাত্ম সাধককে তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে ধ্যানযোগে। আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করাই যথেষ্ট নয়; সাধকের পক্ষে তাঁর সম্বন্ধে অনুভূতি চাই, অনুসন্ধান চাই ও পরিশেষে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাই।

বৈদান্তিক চিন্তায়, ব্যষ্টি আর সমষ্টি অবিচ্ছেদ্য। ঠিক যেমন আমাদের দেহ আছে ও তার হৃদয়ে *আকাশ* রয়েছে, তেমনি এভাবেও বলা যায় যে, বিশ্ব হৃদয়েও *আকাশ* আছে। একই *আকাশ* আমাদের মনোময় শরীরে ও বিশ্ব শরীরে অনুস্যূত হয়ে আছে। একই চৈতন্য ব্যষ্টি আত্মায় ও বিশ্ব আত্মায় অনুস্যূত হয়ে আছেন। সব নামের, সব রূপের পারে একমাত্র তিনিই আছেন, যিনি যেমন ব্যষ্টি-রূপে তেমন মহাজগৎরূপে নিজেকে প্রকাশ করছেন।

---

৬ *মহানারায়ণ উপনিষদ্*, ১২/১৬   ৭ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, ৩/৭/ ৩-৫

'দহ্রম্ বিপাপম্' বাক্য দিয়ে যে মূলপাঠের সূচনা তার বহু ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সমস্ত দার্শনিক মতভেদ সরিয়ে রেখে, আমরা নির্বিবাদে ধরে নিতে পারি যে ব্যষ্টি আত্মার আবাস 'হৃদয়াকাশে', আর পরম চৈতন্যের আবাস ব্যষ্টি আত্মায়—সকল আত্মার আত্মা রূপে। আমাদের সব আচার্যই বলেন যে আমাদের ব্যষ্টি চেতনা মহাবিশ্ব-চেতনারই অংশ। ব্যষ্টি কখনো স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে না। বুদ্বুদ কখনো কি সাগরের বাইরে থাকতে পারে? অনন্ত আলোকচ্ছটা ছাড়া কি একটি আলোক রশ্মির অস্তিত্ব ভাবা যায়। অনন্ত আকাশ ছাড়া হৃদয়াকাশের অস্তিত্ব কি সম্ভব? না, ব্যষ্টি ও বিশ্ব অবিচ্ছেদ্য। হৃদয় কেন্দ্রে এই ব্যষ্টি ও বিশ্বের চিরন্তন সংযোগ আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

হৃদয় কেন্দ্রের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা কর, ও একে ভগবৎ-চেতনার কেন্দ্ররূপে কল্পনা কর। ভাব, যে ভগবৎ-চেতনা তোমার মধ্যে আছেন, তা আবার বাইরেও আছেন—অনন্ত চেতনার অবিভক্ত ও অবিভাজ্য অংশরূপে।

সূচনায় এই চেতনাকে আলোক হিসাবে ভাবতে পার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হলো বুদ্ধির আলোক, অর্থাৎ দিব্য আলোক; আর এই দিব্য আলোক, যেমন আমার মধ্যে তেমনি একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত এবং তা এক ও চিরকালই অবিভাজ্য। আমাদের এই শরীর ব্রহ্মপুর-স্বরূপ। সবর্দা স্মরণ রাখবে ঃ প্রত্যেকটি শরীরই ব্রহ্মপুর।

এই সব করার পর, তোমার চেতনাকে ভগবৎ-চেতনায় লীন করে দাও, যেমন লবণের পুতুল সমুদ্রে লীন হয়ে গেছল। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই নুনের পুতুলের গল্পটা তো তোমরা জান।[৮] আমাদের দেহ-চেতনাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, আর যেমনই আমরা একে ভগবৎ-চেতনায় লীন করতে যাই, আমাদের মনে ধারণা আসে যে আত্মা তো দেহ নয়।

প্রথম প্রথম এ সবই কল্পনা মাত্র, কিন্তু মনে রেখো যে এ কল্পনা সত্যবস্তু সম্বন্ধে বৃথা কল্পনা নয়। যদি আমরা আন্তরিকভাবে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চালিয়ে যাই, তবে একদিন আমরা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারব, যে সত্যকে নিয়ে আমরা এতকাল ধরে কল্পনা করে চলেছি।

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো, এবারে তার উপসংহার করা যাক। *ধ্যান* সাধারণ একাগ্রতা মাত্র নয়। এ বিশেষ ধরনের একাগ্রতা—যা আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক উৎকর্ষের ফল। অবশ্যই এতে আধ্যাত্মিক উপাদান আছে। একটি বিশেষ চেতনা কেন্দ্রেই ধ্যান করণীয়। প্রবর্তক সাধকদের পক্ষে হৃদয় কেন্দ্রে ধ্যানই প্রশস্ত। শেষ পর্যন্ত ধ্যান বলতে বোঝায় জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগ।

৮ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৫০

# একবিংশ পরিচ্ছেদ

# ধ্যানশীল জীবনের জন্য কিছু কার্যকর পরামর্শ

## ধ্যানেই বিশ্রামের অনুসন্ধান

কখনো বলবে না : 'ওঃ, আমার মন খুব বেশি চঞ্চল। কেমন করে আমার পক্ষে ধ্যান করা সম্ভব?' তোমার মন এত বেশি চঞ্চল বলেই তোমাকে অবশ্যই আরো বেশি বেশি ধ্যান করতে হবে। যার মন সম্পূর্ণ শান্ত তার পক্ষে এত বেশি ধ্যানের প্রয়োজন হয় না।

লোকে কখনো কখনো কিছু না করার মধ্যে বিশ্রাম পাবার চেষ্টা করে—কেবল আলস্যের মাঝে—কিন্তু তাদের মনে নানা বাজে জিনিসের চিন্তা নিয়ে কাজ চলতেই থাকে। ঠিক ঠিক ধ্যানই হলো—বিশ্রাম, ক্লান্তির উপশম ও সমতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। অনেকের ধারণা যে নানা ভাবে চিত্তবিনোদনে ও নোংরা আমোদ প্রমোদেই ক্লান্তির উপশম হয়। ধ্যান ও *জপ*-ই হলো বিশ্রামের ও মনকে নতুন সজীবতায় ভরে দেবার স্বাভাবিক উপায়। তাদের মাধ্যমেই মনের প্রবাহ স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে সকল তেজের যা উৎস সেই আত্মার দিকে, আর তখনই দেহ-মন এই তেজে আবার ভরপুর হয়ে ওঠে। সব শক্তি, সব তেজ, সব সমতা আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। আর ধ্যানই হলো এই উৎসমুখ উন্মুক্ত করার প্রত্যক্ষ উপায়।

যদি কোন দিন ধ্যান করার পক্ষে নিজেকে খুবই বিক্ষিপ্ত বা ক্লান্ত বোধ হয়, তবে তুমি কেবল কয়েক মিনিট বসে পড়ে ঈশ্বরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, 'তুমি পবিত্র, আমায় পবিত্রতা দিয়ে পূর্ণ কর। তুমি তেজ, তেজ দিয়ে আমায় পূর্ণ কর। তুমি বল, বল দিয়ে আমায় পূর্ণ কর।' যেমন শুক্ল-যজুর্বেদীয় সংহিতায় আছে :

**তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।**
**বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি ॥**
**বলমসি বলং ময়ি ধেহি।**
**ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি ॥**[1]

---

[1] *শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা*, ১৯/৯

এই রকম প্রার্থনা মনকে শান্ত করবে। সমতা, শান্তি ও প্রকৃত মানবিক দক্ষতার পূর্ণরহস্য আমাদের মধ্যেই আছে। তবুও লোকে এর খোঁজে বাইরে যায়!

যদি সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর রাত্রে তোমার ঘুম পায় আর স্বভাবতই দেখ যে ধ্যান করা সম্ভব নয়, তবে অল্পক্ষণ ঈশ্বর চিন্তার পর তাঁর নাম জপ করে ঘুমাতে যাও, যখন উঠবে দেখবে শরীর ও মন নতুন তেজে পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রায়ই দেখা যায়, একটু ঘুমিয়ে নিলে সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। কিন্তু একে ধ্যানের সময় ঝিমিয়ে পড়ার একটা ওজর করে তুলো না। নিয়মিত ধ্যান ঘুমের পরেই করা উচিত।

## নিজের মধ্যেই নির্জনতা খোঁজ

অধ্যাত্ম জীবনের গোড়ায় তোমার উচিত ধ্যানের জন্য একটি নিভৃত স্থানে স্থিরভাবে বসে থাকা। কিন্তু তোমার এও মনে রাখা উচিত যে কেবল বনে বা গুহায় গেলেই নির্জনতার অনুভূতি হয় না। বাহ্য নির্জনতা কেবল তখনই তোমার সহায় হবে, যখন তুমি অন্তরেও শান্ত হতে পারবে। প্রকৃত নীরবতা হলো মনের নীরবতা। এ হলো মনকে স্তব্ধ করে তা থেকে অবাঞ্ছিত চিন্তাগুলিকে দূর করে দেওয়া। প্রথমে ঈশ্বর চিন্তায় স্থির হও, পরে ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করা যায় না এমন সব চিন্তাকে দূর করতে চেষ্টা কর। 'কেবল বাহ্য নির্জনতাই জগৎ ভুলিয়ে দেয় না, কেবল সেই নির্জনতাই সত্য যা জগৎ ভুলিয়ে দেয়, কেবল সেই নির্জনতাই সত্য যাতে সাধক ব্রহ্মে লীন হতে পারে।' যখন তুমি ধ্যানে বসবে, সব জগৎ-বুদ্ধি মন থেকে মুছে ফেল আর কেবল প্রভুরই চিন্তা কর।

## নির্দিষ্ট কার্যসূচী পালন কর

অধ্যাত্ম জীবনে প্রত্যেকটি কাজকে স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট হতেই হবে। প্রত্যেক সাধকেরই প্রথম কাজ হবে একটি নির্দিষ্ট কার্যসূচী তৈরি করা, আর যেমন করেই হোক তাকে মেনে চলা। কেউ কেউ ভয় করে এ রকম কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতায় জীবন যন্ত্রবৎ হয়ে উঠবে। তা সত্য নয়। বিশেষত প্রবর্তকের পক্ষে নির্দিষ্ট কার্যসূচী ছাড়া চলা সম্ভব নয়। ওই হলো অবাধ্য ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণে আনার একমাত্র উপায়। আমাদের জাগ্রতকালকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ছকে ফেলতে হবে—কিভাবে দৈনন্দিন কাজ করতে হবে, অবসর সময়ে কি করতে হবে, কি কি বিষয়ে চিন্তা করতে হবে ইত্যাদি। অধ্যাত্ম সাধকের জীবন নিশ্চয়ই সচেতন ও সতর্ক হবে। তোমার অচেতন মনের চিন্তা ও কাজ কমিয়ে ফেল। আরো বেশি সতর্ক হও।

অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে ও তাকে দৃঢ় করতে হবে। তবেই অধ্যাত্মজীবন সহজতর হবে। আর প্রাথমিক প্রচেষ্টার যে আয়াস তাও কমে যাবে। নির্দিষ্ট সময়সূচী মেনে চল। তাহলে মন অত্যন্ত অস্থির হলেও ধ্যান করা সম্ভব হবে। আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদির সময় সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ নিয়মানুগ হতে হবে, কারণ কেবল তাতেই মন এই কার্যসূচীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। সব অবস্থাতেই দৈনিক *জপ* ও ধ্যানের একটা—নির্দিষ্ট ন্যূনতম মাত্রা সম্বন্ধে খেয়াল রাখতে হবে। ন্যূনতম *জপ* শেষ না করে প্রাতরাশ করবে না। নতুন সাধকের উচিত হবে আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদির সময় ধীরে কিন্তু নিয়মিত ভাবে বাড়ানো। যারা সাধনায় বেশ এগিয়েছে, তাদের মনে ভক্তির একটা অন্তঃস্রোত বইতে থাকবে, যার ফলে সে বাইরে যে কাজই করুক তার মনের এক অংশে সর্বদা ভক্তি নিবেদন চলবে। এ অবস্থায় পৌছবার আগে সব সাধকেরই অধ্যাত্ম সাধনার সময় ও পদ্ধতিগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে খুবই নিয়মিতভাবে মেনে চলতে হবে।

আমরা এখনো যথেষ্ট অনুভূতিপ্রবণ হইনি। আমরা এখনো আমাদের উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি না। কখনো কখনো আমরা আমাদের মনকে আমাদের কষ্ট ও চিন্তার সুন্দর সম্ভবপর ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করে আমাদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ দিয়ে থাকি। যদি সে অধ্যাত্ম সাধনের তীব্র কষ্টের কথা বলে নালিশ করে, তাহলে মনকে বল ঃ 'দেখি তুমি ভেঙ্গে পড় কি না,' যদি উচ্চতর জীবন যাপন করতে চাও, তবে সে চেষ্টায় মৃত্যুর সম্ভাবনাতেও বিচলিত হবে না। মন বহুদিন পর্যন্ত বিদ্রোহ করবে আর নালিশ করে চলবে। সে বলবে, 'আজ তোমার খুব অল্প ঘুম হয়েছে। এতে তোমার স্নায়ুর পক্ষে খারাপ হবে। সাবধান হও, যেন তুমি স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভেঙ্গে না পড়। দু-একদিন তোমার সাধনা বন্ধ রাখ।' এ ক্ষেত্রে মনকে বেশ ভাল রকম ধাক্কা মার, ভাল করে চাবুক মার, এ রকম মন্দ মনের ওপর খুব কঠোর হও। ঘোড়া যখন নড়তে চায় না তখন সওয়ার যেমন তাকে চাবুক মারে, তেমনি বিদ্রোহ করলে তোমার মনকেও ভাল রকম পিটন দাও।

দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক সাধনের জন্য সময় যদি করে নিতে না পারি, তবে আমরা কোন দিনই উন্নতি করতে পারব না। অনেকে এ সত্য একেবারেই বোঝে না বলে মনে হয়। বাজে চিন্তা, গালগল্প, উদ্দেশ্যহীন কাজ ও ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতিতে সময়ের অপচয় আমাদের অবশ্যই কমাতে হবে। তাহলে আমরা আমাদের অধ্যাত্মসাধনের জন্য প্রচুর সময় পাব। দিনে কয়েক মিনিট মাত্র এলোমেলো ধ্যান করে কিছুই হয় না। যথা সম্ভব সময় বাঁচাতে হবে, এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে শারীরিক তেজের অত্যধিক ব্যয় আমাদের কখনই করা উচিত নয়। বর্তমানে শারীরিক তেজের অত্যধিক অপব্যবহার হচ্ছে, মনেও অত্যধিক চাঞ্চল্য রয়েছে।

চারিদিকে ঘূর্ণিপাক। যদি তীব্র অধ্যাত্ম সাধনের জন্য সঠিক মনোভাব গড়ে তুলতে চাও, তবে এই ঘূর্ণিপাকগুলিকে ভেঙ্গে ফেল।

## ধ্যানের উৎকর্ষ বাড়াও

ধ্যানে গভীরতা আনতে শেখ। পরিমাণের থেকে উৎকর্ষের দিকে বেশি নজর দাও। যারা অত্যন্ত ব্যস্ত, তাদের অন্য কোন উপায় নেই। ধ্যানের জন্য যেটুকু সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছ তার সদ্‌ব্যবহার করা উচিত। মনকে একাগ্র করার ক্ষমতা বাড়াও। সেই ভাবে তোমার অধ্যয়ন-আলোচনার বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ বাড়াও। যখন কোন বই পড়বে তা একাগ্রতার সঙ্গে ও একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পড়বে।

ধ্যানের সময় অন্যমনস্কতা কেবল সময়ের অপব্যবহার নয়; অধ্যাত্মভাবের প্রতি আগ্রহে শৈথিল্যের নিশ্চিত লক্ষণ। অনেকেই ধ্যানের নামে জাগতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করে। যদি দেখ মন অত্যন্ত তামসিক (জড়বুদ্ধি) বা রাজসিক (চঞ্চল) হয়ে পড়ছে, আসন ছেড়ে উঠে মনোভাবের উন্নতি হয় এমন কিছু পাঠ করা উচিত, পরে যখন আধ্যাত্মিক ভাব ফিরে আসবে, তখন আবার আসনে বসবে। ধ্যানের সময় মনে তন্দ্রালু অবস্থা আসতে দেওয়া উচিত নয়। অনেকের কাছে ধ্যান যেন নিদ্রাকে আমন্ত্রণ জানানো! এটি পরে বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

## শুভ দিনগুলি

ঈশ্বরের নাম জপ বা তাঁর ধ্যানের জন্য দিনপঞ্জি বা পঞ্জিকা দেখার দরকার নেই। ঈশ্বরচিন্তার জন্য প্রত্যেক দিনই শুভ। প্রতিদিন আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। অতএব একটা দিনও যদি প্রভুকে স্মরণ না করে কেটে যায়, তবে সে দিনটি বিফলে গেল। হিন্দু ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিবারে কারও জন্ম বা মৃত্যুর পর কয়েকদিন ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু তা কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, *জপ* বা ধ্যানের ক্ষেত্রে নয়। আধ্যাত্মিক অনুশীলন—সব দিন ও সর্ব অবস্থাতেই করণীয়।

কোন কোন লোকের জ্যোতিষ বিদ্যায় খুব বিশ্বাস। বঙ্গদেশে অপরাহ্ণ বেলাকে অশুভ বলা হয়। ১৯১১ খ্রীঃ আমি যখন মাদ্রাজে প্রথম যাই, আমি দেখলাম বেশির ভাগ দিনই সকালটাই হলো রাহুকালম্ (যে সময়টাকে হিন্দুরা কোন কাজের পক্ষে অশুভ মনে করে)। যারা অলস প্রকৃতির লোক তাদের কাছে কার্যত সারা দিনই অশুভ!

একবার ১৯২৯ খ্রীঃ আগস্ট মাসে কোন কাজের জন্য আমি বেলুড় যাই। মহাপুরুষ

মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) তখন মঠের অধ্যক্ষ। তিনি মাদ্রাজের কাজ সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী ছিলেন। যখন বেলুড়ে যেতাম তিনি আমাকে শীঘ্র ফিরে যেতে বলতেন, যাতে মিশনের কাজের কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু এবারে আমি বেলুড়ে কয়েকদিন বেশি থাকতে চাই। তাই মহাপুরুষ মহারাজ যখন অন্যবারের মতো জানতে চান—কবে ফিরব, আমি বলি যে পর পর কয়দিন অশুভ। আসলে আমি শুভ-অশুভ দিনকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না। এটা ছিল বেলুড় মঠের আধ্যাত্মিক পরিবেশে কয়েকদিন বেশি থাকার জন্য অজুহাত মাত্র। এই ক্ষেত্রে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে যা উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে আমাদের সকলেরই চোখ খুলে যাওয়া উচিত।

মহাপুরুষজী ঃ ...কিন্তু তোমরা কাজের লোক। তোমাদের পক্ষে শুভদিন দেখতে গেলে চলবে না। যাদের কোন কাজ নেই তাদের পক্ষে প্রত্যেক পদক্ষেপে পঞ্জিকা দেখা সম্ভব হতে পারে। ঠাকুরও বলতেন, 'যাদের এই সবের ওপর বিশ্বাস তারাই এতে প্রভাবিত হয়; অন্যেরা নয়।' তা ছাড়া তোমরা মায়ের ভক্ত। তিনি সর্বাবস্থায় তোমাদের রক্ষা করছেন, ও সদা-সর্বদাই তা করবেন। যদি কেউ প্রভুর নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করে, তবে সে কষ্টে পড়বে না। তাঁর নামের জোরে চরম দুর্দশাও আশীর্বাদে রূপান্তরিত হয়।

এ কথা বলে তিনি গাইলেন ঃ

**দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে পথে চলে যায়।**
**শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করে তায় ॥**

তুলসী দাসের দোঁহাতেও একই ভাব ঃ

**প্রতি তিথি-ই শুভ, প্রতিদিনই শুভদিন;**
**অশুভদিনের প্রভাব তারই ওপর, যে প্রভুকে ভুলেছে।**
**যে দিন কেউ সর্বান্তঃকরণে প্রভুর নাম করে সেই দিনটিই তার ভাল দিন![৫]**

১৯৩৩ খ্রীঃ আমার পশ্চিম যাত্রার প্রথম পর্বে যখন আমি জাহাজে উঠি, সে দিনটি শুভদিন কি না তা নিয়ে আমি একটুও ভাবিনি। আমার সবই ভালভাবে কেটে গেছিল। প্রভুর কাজে যাচ্ছি এই ভাব নিয়েই আমি গেছিলাম। যদি মন শুদ্ধ হয়, পঞ্জিকা দেখার কোন দরকার নেই। যদি প্রভুর নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করে, প্রত্যেকটি সময়ই শুভ। আমি যখন ইউরোপে তখন অনেকেই আমার হস্তরেখা ও কোষ্ঠী বিচারে আগ্রহ দেখাত। আমার কোন কোষ্ঠী ছিল না। এক ভক্ত প্রশ্ন করে, 'স্বামী, আপনি কি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করেন না?' আমি বলি ঃ 'আমি এমন একটি নিয়ন্তার হাতে রয়েছি, যিনি গ্রহ-নক্ষত্রেরও নিয়ন্তা।'

---

৫ সভী তিথিয়াঁ, সভী বার শুভ হৈ, জো ভগবানকো ভূলাতা হৈ, উসীকা দিন অশুভ হোতা হৈ।
জিসে দিন হৃদয়ঃ সে ভগবান কা নাম লিয়া জায় বহী শুভ দিন হৈ। আনন্দধাম কী ঔর, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৬০

মহাপুরুষদের জন্মতিথির দিন, স্মৃতিচারণ, ধ্যান ও প্রার্থনাতে আমাদের যত বেশি মন দেওয়া উচিত, তত বেশি উচিত হবে বাহ্য বিক্ষেপ বর্জন করা। ঐ দিনগুলি যেন কেবল বাহ্য উৎসব ও সামাজিক আমোদ আহ্লাদের দিন না হয়ে দাঁড়ায়, ঐ দিনকে নিজ অন্তরতম আত্মায় প্রবেশের দিনও হতে হবে, যেখানে আমরা তাঁদের সংস্পর্শে আসতে পারি—যদি তাঁদের চেতনান্তরে পৌছবার সামর্থ্য আমাদের থাকে। এই সব মহাপুরুষরা চলে গেছেন ভাববে না। তাঁরা এখনো বর্তমান, ঠিক যেমন তাঁদের জীবিতকালে ছিলেন। যারা কপটতাশূন্য হবে ও নিজ চেতনাকে স্থূল স্তর থেকে তুলে মহাপুরুষদের ও তাঁদের আদর্শের ওপরে স্থাপন করতে শিক্ষা করবে, তারা প্রত্যেকে তাঁদের সংস্পর্শে আসতে ও তাঁদের সঙ্গ করতে পারবে। মনে করবে না যে যীশু কেবল দুহাজার বছর পূর্বেই বেঁচে ছিলেন। মনে করবে না যে বুদ্ধ মৃত, তিনি চলে গেছেন। তাঁরা অমর। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আজও জীবিত। তাঁদের জীবন্ত প্রভাব হাজার হাজার মানুষকে পথ দেখাচ্ছে ও তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দিচ্ছে।

## ধ্যানের সময়

স্বামী ব্রহ্মানন্দ যেমন বলতেন, ভোরে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে, দিনে এই চারবার ধ্যানাভ্যাস করবে। এই ক্ষণগুলিতে প্রকৃতি শান্ত হয় ও আমাদের অন্তরে ও বাইরে আধ্যাত্মিক স্পন্দনের প্রবাহ বদলে যায়। যারা এই সব ক্ষণে ধ্যান করতে পারে না, তাদের উচিত অন্তত ভোর ও সন্ধ্যা এই দুটি সময়কে ধরে থাকা।

আমরা প্রতিদিন কতবার খাই? আমরা যদি স্থূল খাদ্যগ্রহণে যথেষ্ট সময় পাই, তাহলে কি সুস্থ মানসিকতার জন্য যা অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই অধ্যাত্ম খাদ্য গ্রহণের জন্য খানিকটা সময় বার করে নেবার চেষ্টা আমাদের করা উচিত নয়? যখন আমাদের খিদে পায় তখন দৌড়ে গিয়ে আমরা খানিকটা খাদ্য ছিনিয়ে নি। অধ্যাত্ম ক্ষুধার বোধও আমাদের অবশ্যই চাই। তখন আর আমরা সময়াভাবের ওজর তুলতে পারব না।

ধ্যানের জন্য ভোর বেলাই সব থেকে ভাল সময়। রাতের ঘুম আমাদের অনেক স্মৃতিকে বিলুপ্ত বা শান্ত করে দেয়। তখন মনকে একাগ্র করা আরো সহজ হয়। ঘুম ভাঙ্গলেই প্রভুকে প্রণাম করে তাঁর পবিত্র নাম জপ কর। মনকে মন্ত্র ও পবিত্র বিগ্রহমূর্তি দিয়ে ভরিয়ে ফেল, জাগতিক বিষয়ে চিন্তা আসার আগেই। যখনই বিছানা ছাড়বে তখনই মনে বিষয় চিন্তা যেন বাসা না বাঁধে। সে সময় চেতন মন ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে না, অচেতন মনই বেশি সুপরিগ্রাহী থাকে। তাই সে সময়ে মনকে যা

কিছু ইঙ্গিত কর তা অচেতনের অতল গহ্বরে ডুবে যায়। ভোর হবার পুর্ব মুহূর্তগুলি অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে সব থেকে মূল্যবান সময়, 'জপ'-ধ্যান করে তার পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করা উচিত।

ধ্যানের পর আসনে কিছুক্ষণ বসে থাকা ভাল। আমাদের উচিত শান্তভাবে বসে থেকে ধ্যানের বিষয় নিয়েই চিন্তা করা—একটু শিথিল ভাবে। তাহলে আমাদের মন নতুন অধ্যাত্ম চিন্তায় ভরে যাবে, আর আমরা এক উচ্চতর আনন্দানুভূতি লাভ করব। এ অনুভূতি কোথা থেকে আসে? এ আসে মনের গভীরতর স্তর থেকে। এই হলো *ভজনানন্দ*, পূজা বা ধ্যানের থেকেই এ আনন্দের অনুভূতি। ফলে আমাদের অন্তরে ও সংসারে শান্তি বিরাজ করবে। এরপর একই ধারায় কিছু প্রার্থনা ও স্তুতি আবৃত্তি করবে, ধ্যানের মনোভাবকে ও অন্তরের আনন্দানুভূতিকে আরো তীব্র ও সুস্থিত করার জন্য। আসন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারো সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়, বরং ধ্যানমুখী ও শান্তমনা হয়ে থাকা উচিত। এ অভ্যাস ধ্যানের নিরবচ্ছিন্ন আন্তর স্রোতকে পুষ্ট করে, ও মনকে উচ্চস্তরে তুলে রাখতে সহায়তা করে।

ধ্যানের পর এই বসে থাকাটা স্বল্পস্থায়ীই হওয়া উচিত। পনের মিনিট ধ্যান করে তুমি কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসে থাকবে? যদি তুমি এক বা দেড় ঘণ্টা ধ্যান কর তুমি আরো পনের মিনিটের মতো বসে কাটাতে পার—এতে তোমার আধ্যাত্মিক মনোভাবটি সাংসারিক চিন্তার দ্রুত আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদের এই রকম করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন।

## ঘুম সম্বন্ধে নির্দেশ

অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। আট ঘণ্টা হলে সাধারণত খুব বেশি হলো। ঘুমটা তত বেশি দরকার নয়, যত দরকার সারা দিনের স্নায়বিক ও মানসিক চাপকে সচেতনভাবে কমিয়ে আনা। ধ্যানে বসার যোগ্যতা লাভের জন্য নিজেকে কিছুটা ঢিলে দিতে পারা চাই, আমাদের প্রথমে জানতে হবে কিভাবে স্নায়ুর চাপ কমানো যায়। বেশি স্নায়বিক দুর্বলতা থাকলে কেউ ধ্যানে বসতে পারে না। এরপর, আমাদের আবেগ ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত—সেগুলি ভাল ও পবিত্র বা উন্নতিকারক হলেও। আমাদের উচিত আত্ম-সমর্পণের ভাব গড়ে তুলে আমাদের মনকে শান্ত ও অনন্তের সুরে বেঁধে রাখা, আর তারই সহায়ে সব উদ্বেগ ও তীব্র স্নায়বিক ও মানসিক চাপ কমিয়ে ফেলা। এ কাজে সফল হলে, এমনকি প্রকৃত ধ্যান হবার বহু পূর্বেই আমরা এক ধরনের শান্তি অনুভব

করব। আমাদের উচিত ধ্যানের চেষ্টা করার আগেই যথা সম্ভব ঢিলে ভাবে থাকার দিকে নজর রাখা।

দুপুরে খাবার পর, বেলা দুটো নাগাদ অল্প সময়ের বিশ্রাম দরকার। এমনকি অল্পক্ষণের জন্য 'চেয়ারে বসে ঘুম'ও মনকে অনেকটা চাঙ্গা করে। এটা খুবই দরকার, কিন্তু অনেকের পক্ষে এ রকম অভ্যাস করা খুবই কঠিন। মনকে উত্তেজনাপূর্ণ ও অস্থির কার্যকলাপ থেকে এই সামান্য বিরাম দিয়ে, তাকে আবার পবিত্র প্রতিচ্ছবি ও পবিত্র শব্দের সমন্বয়ী স্পন্দনে ভরিয়ে দেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন।

আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, শুতে যাবার আগে বা ঘুমানর আগে আমরা যেন কখনো জাগতিক বিষয় সংক্রান্ত কোন কিছু, যথা উপন্যাস, কল্পকাহিনী বা গল্প না পড়ি। সে সময়ে আমাদের পক্ষে দরকার কিছু পবিত্র চিন্তায় ও শব্দে মনকে নিবিষ্ট রাখা। চিন্তা কর তুমি যেন ঈশ্বরের কোলে শুতে যাচ্ছ বা আলোকবিন্দুর মতো তোমার আত্মা দিব্য আলোকের সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে বা এই রকম কোন ভাব। ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমাদের সমস্ত মন যেন দিব্য ভাবে ভরে থাকে। যদি আমরা জাগতিক কোন বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ করে নিই, তবে তা আমাদের অচেতন মনে কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ আমরা ঘুমিয়ে থাকব, এর ফল হবে খুব খারাপ। সন্ধ্যার পর কি বিষয় নিয়ে মনকে ব্যস্ত রাখব, সে সম্বন্ধে আমাদের খুব সতর্ক হওয়া দরকার। আমাদের উচিত, একাগ্র ও শান্তভাবে মনকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে রাখা—বিগ্রহ মূর্তি, বা নাম, বা দুইই হতে পারে—যা সব থেকে বেশি কার্যকর হবে। একমাত্র এইভাবেই আমরা আমাদের অবচেতন মনের আধেয়কে রূপান্তরিত করতে ক্রমে ক্রমে সফল হতে পারি। ঘুমাবার আগে জাগতিক বিষয় নিয়ে লেখা, বই পড়া খুবই ক্ষতিকর, কিন্তু সাধারণত এ বিষয়ে অসাবধান হওয়ার ফলে আমরা নিজেদের কতখানি ক্ষতি করে থাকি, তা ধারণা করতে পারি না। ঘুমের সময়ে অবচেতন মনের কার্যকলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা উপেক্ষা করা উচিত নয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ও শুতে যাবার আগেই ঈশ্বর-স্মরণ করা যদি কঠিন মনে হয়, তবে কাছেই তাঁর একটি ছবি রেখে দাও, আলো নিভিয়ে দেবার সময় আর সকালে ঘুম ভাঙ্গলেই, ঐ ছবির দিকে তাকানো অভ্যাসে পরিণত কর। ছবির দিকে তাকানোর স্বভাবটি যদি অভ্যাস করতে থাক, শীঘ্রই দেখবে—তাঁর বিষয় চিন্তা না করে শুতে যাওয়া বা ঘুম থেকে ওঠা, তোমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে হবে; যদি রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন অযথা কষ্টসাপেক্ষ অন্য কিছু না করে ধীর শান্তভাবে *জপ* আরম্ভ করে দাও। কিন্তু এই

অভ্যাসের সময় যেন *জপ*-এর সঙ্গে ঘুমের কোন সম্পর্ক না থাকে। সেটা খুব খারাপ। শুতে যাবার সময় ১০০ থেকে ১০০০ বার *জপ* করবে, পবিত্র শব্দে নিজেকে ভরে ফেল আর স্থির করে ফেল যেন সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত *জপ* না থামে।

## একটি নির্দিষ্ট চেতনা-কেন্দ্রকে ধরে থাক

তোমাকে একটি নির্দিষ্ট চেতনা-কেন্দ্রকে ধরে থাকতেই হবে। এটি তুমি পেতে পার একমাত্র—'অহং'-চেতনার উৎস সন্ধান করে বা ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করে। সব সময়ে এই চেতনা-কেন্দ্রকেই ধরে থাকবে। হৃদয়ের নিচে কোন কেন্দ্রকে বেছে নেবে না। নিচের কোন কেন্দ্রে মন স্থির করতে কখনো চেষ্টা করবে না, তন্ত্র শাস্ত্রে এর ব্যবস্থা থাকলেও না। প্রবর্তকের পক্ষে নিম্ন কেন্দ্রে মনঃসংযোগ থেকে যৌন ও অন্যান্য আবেগ জেগে উঠতে পারে।

## আহার সংযম

অধ্যাত্ম সাধক কখনই অতিরিক্ত আহার করবে না। অধ্যাত্ম জীবনে আহারকে তার সঠিক স্থান দিতে হবে। এ যেন এক রকম বদ্ধ-সংস্কার হয়ে না দাঁড়ায়। তোমার যা সয় সেই রকম ও সেই পরিমাণ আহারই তোমার জন্য নির্দিষ্ট রাখবে। প্রায় পনের দিন অন্তর একদিন উপবাস ভাল, কিন্তু সব সময়েই সামঞ্জস্য করে চলা ভাল। কোন কোন শরীরের গঠন এমন যে তাতে উপবাস সহ্য হয় না। সে সব লোকের পক্ষে উপবাসের বাসনা ত্যাগই ভাল। এমন লোক আছে বার বার উপবাস করতে চেষ্টা করে, পারে না। তারা এ বিষয়ে সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা না করে, এই সব অনর্থক চেষ্টার অনেক সময় ও শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

## আসন

*আসন* সম্বন্ধে তোমার উচিত দু-রকম আসনের জন্য প্রস্তুত থাকা, তা হলে একটিতে অনেকক্ষণ বসার ফলে ক্লান্তি এলে অপরটিতে বসতে পার। *সাধনার* মূল বিষয় হলো ধ্যান, আর অন্য সব কিছু মনকে সঠিক ভাবে আনার প্রস্তুতি মাত্র। সঠিক ভাব এসে গেলে, ধ্যান সহজ হয়ে যায়। ভারতে বর্তমানে নানা আসনের অভ্যাস আবার চালু হচ্ছে। সব আসনই অধ্যাত্ম জীবনে কাজে লাগে না। যা বিশেষ দরকার তা হলো, শরীর ও শির খাড়া রেখে, স্থৈর্য, আলগা ভাব ও আরাম বোধ করা। কেবল যথেষ্ট অভ্যাসের ফলেই এ কাজ সহজ ও স্বাভাবিক হয়।

## ছন্দোবদ্ধ শ্বাসক্রিয়া (প্রাণায়াম)

অধিকাংশ লোকই সংযত শান্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত নয় বা কোন উপযুক্ত আচার্যের উপদেশ মতো সর্বদা চলতে পারে না—এদের ক্ষেত্রে *প্রাণায়ামের* অভ্যাস বিপজ্জনক। কিন্তু দম বন্ধ না করে নিয়ন্ত্রিত শ্বাস প্রশ্বাসের অভ্যাস কোন ক্ষতিকারক নয়। প্রথমে এ অভ্যাস নির্দিষ্ট সময়ে সময়ে করা যেতে পারে। পরে তা অন্য সময়েও করা যেতে পারে। সর্বদা ছন্দোবদ্ধ শ্বাসক্রিয়া চালাবার চেষ্টা কর, যতদিন না তা অভ্যাসে পরিণত হয়। অসম শ্বাসক্রিয়ায় শক্তির প্রভূত অপচয় হয়, এতে মনও অস্থির হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রাখতেই হবে, মনকে ছন্দোবদ্ধ করতেই হবে, সম্পূর্ণ শারীর-যন্ত্রের চাকাগুলিকে তোমার নিয়ন্ত্রণে আনতেই হবে। তখনই দেহ-যন্ত্রকে চালিয়ে আনন্দ পাবে।

## সদা সতর্কতা প্রয়োজন

সর্ব অবস্থায়, জীবনের সব পরিস্থিতিতে যাতে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে পার সেই শিক্ষা নাও, আর প্রত্যেক কাজে তোমার নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা জানতে শেখ। কঠোরভাবে নিজের সমালোচনা কর, কিন্তু তা যেন সর্বদা গঠনমূলক হয়, কেবল বিনাশাত্মক যেন কখনো না হয়—তবেই তা তোমার আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ও উন্নতির সহায়ক হবে। নেতিবাচক—যেমন 'আমি পাপী' এমন—ভাব তোমাকে কেবল আরো পাপী করে তুলবে, আর তোমার সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রেরণা নষ্ট করে দেবে।

বার বার এক কাজ করলেই তা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কাজের পরিবর্তনে স্বভাবেরও পরিবর্তন আনা সম্ভব। স্বভাব আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতি মাত্র, আমাদের সত্তার অপরিহার্য অঙ্গ নয়। তাই নিয়মিত অভ্যাসের ফলে অত্যন্ত কদর্য স্বভাবকেও পাল্টে দেওয়া যায়। স্বভাব যত পুরান হবে, তাকে কাটিয়ে ওঠা তত কঠিন। বার বার পাল্টাবার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন বদ স্বভাব থেকেই যায়, তাতে দমে যাবে না। যদি কেউ নিজেই নিজের অচেতন মনের কাজকর্ম সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখে আর সতর্ক থাকে, আর আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলে, তবে সব বদ স্বভাবই শীঘ্র ক্ষীণ হয়ে যাবে ও ক্রমে লোপ পাবে। কিন্তু এর জন্য অধ্যবসায় ও ধৈর্য চাই। সঙ্কল্প থাকলে উপায়ও হয়ে যায়। দেখো যেন তুমি নতুন কোন বদ স্বভাবের শিকার হয়ে যেও না। পুরান স্বভাবগুলিই যথেষ্ট বিঘ্নদায়ক।

একটা লোহার শেকলের জোর নির্ভর করে তার সব থেকে দুর্বল পাবটির জোরের ওপর, তেমনি মন্দ সঙ্গ বা সংসর্গের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার

সামর্থ্য বিচার করা যায় আমাদের দুর্বলতম মুহূর্তে এর দ্বারা কতটা প্রভাবিত হই তার ওপর। অতএব আমাদের সতর্ক থাকা উচিত মন্দের প্রভাব থেকে নিজেকে যথা সম্ভব রক্ষা করার জন্য, আর সব শক্তি দিয়ে আমাদের চরিত্রের দুর্বলতম দিকটিকে শক্তসমর্থ করতে সচেষ্ট হতে হবে—শুদ্ধ চিন্তা ও শুদ্ধ আচরণের মাধ্যমে, আত্ম-সমালোচনা, প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে।

যদি আমরা সত্যিই সতর্ক থাকি, আর খাঁটি সাধকের জীবন যাপন করতে চেষ্টিত হই, তবে আমরা আমাদের মনের সব গতিবিধি ও তার ভেতর যেসব চিন্তা ও প্রেরণা জাগছে তা দেখতে পাব। সাধারণত আমরা এসব বিষয়ে এমনই স্থূলবুদ্ধি ও অসতর্ক যে আমাদের মনোরথের অশ্বটি আমাদের খানায় ফেলে দেওয়ার পরেই কেবল আমরা আমাদের বিপজ্জনক অবস্থার কথা টের পাই। কিন্তু ওখানে পৌঁছবার আগে, রথটি একেবারে অজান্তেই খানা পর্যন্ত এতটা পথ চলে গেছে, তা কেবল আমাদের সতর্কতা ও যথোপযুক্ত প্রচেষ্টার অভাবের জন্য।

লাগামটি শক্ত করে টেনে রাখ! পথের সব বিপদ অসতর্কতার জন্যই ঘটে থাকে। তাই নজর রেখে চল। সব সময়ে সতর্ক থাক। নজর না রেখে মনকে ছেড়ে দিও না, একটি মিনিটের জন্যও নয়। সব সাধকের পক্ষেই এই হলো সাধারণ নিয়ম—তারা যে পথেই চলুক না কেন।

## তোমার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা

যেখানেই থাক এক আধ্যাত্মিকতার আবহাওয়া সৃষ্টি কর। তোমার ঘরটিকে মন্দিরে রূপান্তরিত কর। যখন কোন পুণ্যস্থান বা আশ্রম দর্শনে যাবে ওখানকার পুণ্য পরিবেশ উপভোগ করাই যথেষ্ট নয়, ওতে তোমারও কিছু অবদান থাকা উচিত। পাশ্চাত্য দেশের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক আবহাওয়া প্রায় ক্ষীণ হয়ে গেছে। ভারতেও ঐ অবস্থা হতে পারে, যদি না আমরা এতে কিছু অবদান রাখতে শিখি। বিশাল বিশাল বাড়ি আর চিত্রশিল্পই যথেষ্ট নয়। অনেক সময় আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে এগুলি পাওয়া যায়।

পরিবেশের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে কোন লাভ নেই। তোমার জন্য জগৎটা বদলে যাবে না, তোমাকে নিজেকেই বদলাতে হবে। তোমার সুরকে ঠিক ঠিক মিলিয়ে নিয়ে তোমাকেই সেই বিরাট সত্তার ও উচ্চতর সত্যের সংস্পর্শে আসতে হবে, অধ্যাত্ম সাধনার সময় কেবল ঈশ্বর আর নিজের কথাই চিন্তা আমাদের করা উচিত। অন্য সব বিষয় আমাদের ভুলে যেতে হবে। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হবে না। একমাত্র ঈশ্বরকে নিয়েই আমাদের জীবন

যাপন করা উচিত। এ কথা সত্য যে এ অবস্থাই আমাদের চরম প্রাপ্তব্য নয়, কিন্তু চরম প্রাপ্তির পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাপ। শেষ পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে সকলের মধ্যে একই দিব্যসত্তা বিরাজমান, অবশ্যই ভালবাসতে হবে সকলকে একমাত্র তাঁরই কারণে, তাঁরই জন্যে, তাঁরই মাধ্যমে।

## ঈশ্বরের প্রতি একটা নির্দিষ্ট ভাব গড়ে তুলতে চেষ্টা কর

অধ্যাত্ম সাধককে ঈশ্বরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ভাব বা সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রথমে, ঈশ্বরের কোন বিশেষ ভাবকে বা কোন পুণ্য ব্যক্তিত্বকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে। তারপর তাকে অবশ্যই শিখতে হবে সাকার ঈশ্বরের পেছনে বিশ্বসত্তার দর্শন পেতে, তারও পরে বিশ্বসত্তার পেছনে চরম নিরপেক্ষ সত্যের দর্শন পেতে হবে। পুণ্য ব্যক্তিত্ব, অবতারপুরুষ বা সাকার ঈশ্বর আমাদের ধাপে ধাপে নিয়ে যাবে সেই চরম জ্ঞানে। নিরপেক্ষ জ্ঞানাতীত সত্যের উপলব্ধি সব সময়েই সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বর তত্ত্বের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়া কেউই এক লাফে নিরপেক্ষ সত্যে পৌঁছতে পারে না, ধীশক্তির কাছে তার আবেদন যত বেশিই হোক না কেন। আমরা নিজ নিজ অন্তরে বিরাটের দৃষ্টিভঙ্গিটি গড়ে তুলতে যত বেশি সফল হব, তত বেশি আমাদের বোধ হবে যে নরও নেই নারীও নেই, বিষয়ীও নেই, বিষয়ও নেই—সকলেই কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের মাধ্যমে একই সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র।

আমরা অবশ্যই সবের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরকে দেখতে শিখব, এমনকি সব ভীতিপ্রদ, ভয়ঙ্কর বস্তুর মধ্যেও, অবশ্য আমাদের মনের ওপর তাদের কোন রকম অধিকার বিস্তার করতে না দিয়ে। এমনকি সব স্থূল, অপবিত্র, ভীতিপ্রদ ও অশালীন বিষয়ের মধ্যেও তিনি আছেন, কিন্তু তাঁর এই অভিব্যক্তিগুলিকে কখনই আমাদের মনের ওপর দাগ কাটতে বা মনকে অধিকার করতে দেওয়া উচিত হবে না। এই বিরাট রূপের ভাবনা গড়ে তুলতে না পারলে আমরা মনে সাম্য ও শান্তি আনতে পারব না।

সর্বভূতে কেবল একরূপের দর্শনলাভে আমরা যতটা সফল হব, ততটাই আমরা ভুলতে পারব—সব সীমাবদ্ধ ভাবকে, জোড়ায় জোড়ায় বিপরীত ভাবকে এবং জগৎ প্রপঞ্চের সব লীলা খেলাকে। এ সফলতা আমরা লাভ করতে পারি, যদি আমরা দেখি যে ঈশ্বর ছাড়া অন্য সব কিছুর মূল্য তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী, গৌণ—যেন ছায়া মাত্র, অবাস্তব চলমান দৃশ্য মাত্র। ইন্দ্রিয়জ মানসিক প্রলোভন থেকে মুক্ত হতে না পারলে, অদম্য মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে, যথার্থভাবে ঈশ্বরমুখীন হওয়া ও তাঁকে জীবনের মূল কেন্দ্র করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সব বস্তুর যথাযথ রূপটি দেখতে শেখ। বাহ্য ব্যাপারের স্তরে তুমি সর্বত্র দেখতে পাবে পঙ্ক আর পঙ্কজ পাশাপাশি রয়েছে। যতদিন আমরা অভিব্যক্তি-স্তরের, বিপরীত জুটির স্তরের পারে না যাচ্ছি, ততদিনই এই দ্বন্দ্বভাব চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। তোমার *সাধনার* গোড়ার দিকে এই জগৎ ও জাগতিক সুখের প্রতি একটা বিরাগভাব আনতে চেষ্টা কর। পরে এই বিরক্তিকে অতিক্রম করে জগৎকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতে পারবে।

## নিজ মনকে নিপুণভাবে চালাতে শেখ

কিভাবে মনকে তার সঠিক বিন্দুতে স্পর্শ করা যায়, তা তোমাকে শিখতেই হবে। গোরুকে ঠিকমতো দুইতে না জানলে, তুমি দুধ পাবে না। পরিমাণে সব থেকে বেশি দুধ পেতে হলে, তোমাকে দোহন কার্যে দক্ষ হতে হবে। সেই ভাবেই, তুমি যদি তোমার মনকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করতে না পার, তবে তুমি পুঁথিগত বিদ্যার সদ্ভাবনা দিয়ে মনকে যতই ভরে ফেল না কেন, তা থেকে খুব বেশি উপকার পাবে না। দুধের বদলে কেবল কয়েকটা লাথিই পেতে পার।

মনের অনেকগুলি কোষ আছে। তার কতকগুলিকে তুমি অবশ্যই সাবধানে চাবি দিয়ে রাখবে, অর্থাৎ মন্দ আবেগকে ও মন্দ স্মৃতিকে দমন করতেই হবে। আর অন্যগুলির দ্বার খুলে দিতেই হবে অর্থাৎ, অনাসক্তি, ভক্তি প্রভৃতি সদভাবের প্রবণতাকে অবশ্যই উৎসাহ দিতে হবে। কিন্তু শেষে অবশ্যই সব কোষগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে, কারণ সত্যবস্তু—ভাল-মন্দ দুই-এরই পারে।

## সর্বদা একমাত্র ঈশ্বরমুখী হও

সংসারের প্রতিটি খোঁচা, প্রতিটি ধাক্কা, প্রতিটি লাথি যেন আমাদের ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দেয়, আর জগতের অবাস্তবতাকে মনে করিয়ে দেয়। ফলে আমাদের সব নৈরাশ্য, সব দুঃখ আশীর্বাদে পরিণত হবে। তুমি যদি কোনভাবে দায়গ্রস্ত হয়ে থাক, তবে ঈশ্বরীয় ভাবের স্রোত ভেতরে নিয়ে এসে বইয়ে দাও সমগ্র আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে। যখন বাষ্প অনেকটা জমে যায়, তখন তার কিছুটা ছেড়ে দিলে সময়ে সময়ে উপকার হয়, কিন্তু তাও কেবল ঈশ্বরের দিকেই ছাড়বে। তুমি যদি চাও তাঁকে তোমার বন্ধুর মতো, তোমার খেলার সাথীর মতো, তোমার সহকর্মীর মতো—ভর্ৎসনা করতে পার। সত্যিই তাঁর সংস্পর্শে আসার উপায় জানা থাকলে, দেখা যাবে তিনি তোমার কত কাছে। খোলাখুলি কথা বলায় তিনি একটুও বিরক্তি বোধ করেন না। দেখ, অধ্যাত্ম জীবনে একটি মহৎ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ঈশ্বরের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা।

অধ্যাত্ম সাধকের উচিত সব অবস্থায় একমাত্র ঈশ্বরের ওপরেই নির্ভর করা। প্রথম প্রথম সে মানুষের বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে পারে, কিন্তু ক্রমে তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকেই বেশি বেশি প্রেরণা লাভ করতে শিখতে হবে।

যখন আমরা নিজেকে দুর্দশাগ্রস্ত মনে করি, তখনই আমাদের মন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ সত্ত্বেও আমাদের বলা উচিত, 'হ্যাঁ, আমার শরীর-মনে এই সব বোধ হচ্ছে বটে, কিন্তু আমার আত্মাকে এরা স্পর্শ করতে পারে না, আমার আত্মা তাদের হাতে বন্দী হতে পারে না।' সর্বদা, সব সময়ে, তোমার আত্মার গৌরব ও মুক্তি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে থাক। উপলব্ধিবান পুরুষ দুঃখ বোধ করলেও, তাঁরা নিজেকে তার সাক্ষী স্বরূপ করে রাখেন। তাঁরা তখনই তাঁদের মনকে উর্ধ্বমুখী করে নিতে পারেন, আর কোন অবস্থার দ্বারাই প্রভাবিত হন না।

নিজ নিজ হৃদয়ে অন্তরাত্মার অনুভূতি লাভের সামর্থ্য ক্রমে ক্রমে বাড়াতে হবে। আমাদের সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতি যেন আমাদের অন্তরস্থ দিব্য চৈতন্যের দিকে ফেরানো থাকে। এ বিষয়ে সচেতন থাক। বাহ্য জগতে এত দুঃখ, এত নৈরাশ্য, এত কষ্ট ও যন্ত্রণা। এ চিরকাল এরকমই থাকবে। এই জগৎ-প্রপঞ্চ জোড়া জোড়া বিপরীত ভাব ছাড়া থাকতে পারে না। তাই ভাল-মন্দ, দুঃখ-যন্ত্রণা সব সময়েই থাকবে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখনই পাওয়া যাবে না। আর এই অবস্থাকে কখনই বদলানোও যাবে না। যা তুমি পার, তা হলো আরো বেশি করে ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরতে, আর ঈশ্বরের প্রতি এক আন্তরিক শরণাগতির ভাব গড়ে তুলতে। শান্তি ও স্বর্গীয় আনন্দ লাভের এই হলো একমাত্র পথ। এটা পলায়নী মনোবৃত্তি নয়, বরং তোমার সকল উপলব্ধির ও ভাবপ্রবণ মনোবৃত্তির সার্থক উত্তরণ। এ একটি কার্যকর সমাধান। এই সব বাইরের ঝঞ্ঝাট, যে বিষয়ে তুমি সর্বদা খিটখিট করছ, বিশ্বের এই সব উত্তেজনা, যা থেকে সংঘর্ষ ও বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বাধতে পারে—এ গুলিই আমাদের বাধ্য করবে সর্ব শান্তির আকর ঈশ্বরের সন্ধানে বেরুতে। আমাদের সব দুঃখ, সব ঝঞ্ঝাট ও হতাশা যেন সব সময়ে জগতের ক্ষয়িষ্ণুতার কথা মনে করিয়ে দেয়। এ জগতে এমন কিছুই নেই, যা আমাদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে। এ জগৎ থেকে কোন স্বস্তি, কোন আনন্দ যেন আমরা আশা না করি। ঈশ্বরই আমাদের কাছে একমাত্র শক্তির উৎস। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরা যেন তাঁতেই যুক্ত হতে পারি। খাঁটি অধ্যাত্ম সাধক যে হবে, এইই হবে তার দৃষ্টিভঙ্গি।

## সরলতার প্রয়োজন

তোমার সব ব্যবহারে অকপট হও। কপটতা ও আত্ম-শ্লাঘা পরিত্যাগ কর।

বালকের মতো সরল হও, বালসুলভ নির্বুদ্ধিতাকে আশ্রয় করো না। সংসারী লোকের সঙ্গে ব্যবহারে, উদ্ধত ভাব ত্যাগ করে স্বমর্যাদায় সংযত বাক্ ও নির্লিপ্ত হয়ে থাক। ব্যক্তিগতভাবে নিজে জড়িয়ে না পড়ে, অপরের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হতে পার, তবু নির্লিপ্ত ও সংযত ভাবে থাকবে, আর কাউকে তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে দেবে না।

আমরা নিজেরা সরল হলেই প্রত্যেকটি বিষয় সরল হয়ে যায়। আমাদের জীবন হওয়া উচিত দেবদূতের মতো, ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানের মতো। আমাদের শিখতে হবে— শিশুর সরলতা ও পবিত্রতাকে বয়স্কের পরিণত বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মেলাতে।

সকলের কাছে তোমার হৃদয় খুলে দিও না, কিন্তু পবিত্র ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কাছে খুলবে। তোমার ব্যক্তিগত ত্রুটি সাধারণের কাছে প্রকাশ করার দরকার নেই। দুষ্ট লোক তোমার স্বীকারোক্তির সুযোগ নিয়ে সেগুলিকে তোমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে তোমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। কিন্তু তুমি একজন বিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তির কাছে তোমার মনের কথা সব সময়ে খুলে বলতে পার, যিনি অধ্যাত্ম জীবনে আগে থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও এ পথের বাধাগুলির বিষয়ে নিজে অভিজ্ঞ। অযোগ্য ও সংসারী লোকের কাছে কখনো মনের কথা বলবে না। কোন অসুবিধায় পড়লে, যদি পরামর্শ নেবার মতো লোক না পাও, তবে ইষ্টের শরণাগত হও। সংসারী লোক তোমাকে কোন উপদেশই দিতে পারবে না। নির্বোধ লোকের উপদেশ শোনা আমাদের দুঃখের অন্যতম বড় কারণ।

তারা নিজেরাই নিজেদেরকে জানে না, তা কি করে তারা তোমাকে সাহায্য করবে? তারা সদিচ্ছা-সম্পন্ন হলেও, তোমার সারা জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সব অধ্যাত্ম বিষয়ে কোন সদুপদেশ তারা তোমাকে দিতে পারবে না। এর জন্য আর একটি বোধশক্তি প্রয়োজন, যা বিষয়ী লোকেদের থাকে না। তাদের আয়না এত ময়লা যে আলো প্রতিফলিত হয় না বা প্রতিফলিত হলেও ছবিটি এত অস্পষ্ট ও বিকৃত হয় যে তাতে কেবল ভ্রান্তিই বেড়ে যায়।

## প্রথমে যথার্থ ভদ্রলোক হও

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : আধ্যাত্মিক মানব বা মানবী হবার আগে তোমাদের সঠিক অর্থে ভদ্র মানব ও ভদ্রা মানবী হতে হবে। ভদ্র মানব ও ভদ্রা মানবীই কেবল আধ্যাত্মিক মানব ও মানবী হতে পারে। সব সময়েই আমি লোকেদের বার বার বলে থাকি : ভক্ত হবার আগে, অধ্যাত্ম জীবন যাপনের কথা

চিন্তা করারও আগে, দেখ যে তুমি একজন ভদ্র মানব বা একজন ভদ্রা মানবী হয়েছ কি না। ভক্ত তখনই একজন ভদ্র মানুষ হতে পারে যখন সে অধ্যাত্ম জীবনের দিকে যাবার প্রাথমিক অনুশীলনে অন্তত খানিকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কখনো কখনো লোকে অত্যন্ত অমর্যাদাসূচক অসভ্য ব্যবহার করে থাকে। প্রায়ই বয়স্ক লোক শিশুর মতো ব্যবহার করে থাকে। তাদের শৈশব নিশ্চয়ই বুড়ো বয়স পর্যন্ত চলেছে। কখনো কখনো লোকে সারা জীবনই অভদ্র ও মর্যাদাবোধশূন্য থেকে যায়, কারণ তারা সঠিক সামঞ্জস্য করতে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আনতে পারে না। এটি ত্রুটিপূর্ণ শৈশবের ফলশ্রুতি। অপরিণত বৃদ্ধির জন্যই এমন হয়। আমি প্রায়ই লোকেদের ডেল কার্ণেগী 'Dale Carnegie'-র লেখা কি করে বন্ধুত্ব অর্জন এবং মানুষকে জয় করা যায় 'How to Win Friends and Influence People' এবং উদ্বেগহীন নূতন জীবন 'How to Stop Worrying and Start Living'—বইগুলি পড়তে বলি, অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভ করার আগেই। আমাদের অনেক সমস্যা থাকে যার সঙ্গে অধ্যাত্ম জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, সেগুলি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার আচরণ থেকে উদ্ভূত সমস্যা মাত্র।

অপরিচিত লোকে যদি আমাদের ভাল বলে জানে সেটাই যথেষ্ট নয়, আমাদের দেখতে হবে যে কাছের মানুষও যেন আমাদের সৎ ও পূর্ণ সংযত মানুষ বলে জানে। অপরিচিত লোকেদের কাছে সুন্দর হাসি মুখ দেখানো খুবই সহজ। যাদের সঙ্গে আমাদের কদাচিৎ দেখা হয়, তাদের মতের থেকে আমাদের কাছের মানুষের মতামতের ওপর বেশি মূল্য দেওয়া উচিত।

## ধৈর্যশীল হতে শেখ

মানবের অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি থেকে এইটুকুই বোঝা যায় যে, তার কোনদিনই কোন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বা যথাযথ দৃঢ় বিশ্বাস হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গি নাস্তিকের, যে হতাশার ফলে মরিয়া হয়ে কোন মতবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকে কারণ, সে তার অন্তরের গভীরে নিহিত নিজ সংশয়গুলিকে সচেতনভাবে জয় করতে পারে না। যারা প্রকৃত বিশ্বাসী তারা সকল মতের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন হয় এবং অন্য ধার্মিক ও আন্তরিক সাধকদের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না। ধর্মের নাম করে দুর্বলের ওপর নির্মম অত্যাচার করা ধর্মীয় কপটতার এক নিশ্চিত চিহ্ন।

অধ্যাত্ম সাধককে অবশ্যই সব অবস্থাতেই ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হতে শিক্ষা করতে হবে। জাগতিক ব্যাপারগুলি আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চেহারা নেয় না। অপ্রীতিকর ও প্রতিকূল অবস্থার সামনা-সামনি হতে হবে। তুমি সব সময়েই ধ্যানের অনুকূল

অবস্থা আশা করতে পার না, বিশেষ করে আধুনিক শহরে। সময়ের ও যে পরিবেশে তুমি রয়েছ তার পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করতে শেখ। আমাদের অবশ্যই পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে জীবন যাপন করতে শিখতে হবে।

ক্রোধের কারণ হলো অন্তরে সামঞ্জস্যের অভাব। মানুষ পরের ওপর ক্রুদ্ধ হবার আগে, নিজের অন্তরে ক্রুদ্ধ হয়। নিজেকে ঘৃণা করা অন্যকে ঘৃণা করার মতোই খারাপ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে এইটাই বহু সমস্যার মূল কারণ।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সংযোগ যেসব প্রণালী দিয়ে হয়, তার মুখ প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। এগুলিকে পরিষ্কার করতে হবে। তা না হলে অন্তরে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটবে ও অন্যের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেবে। যারা ঈশ্বরের সুরে সুর বেঁধে চলে, তারা সব সময়ে সমন্বয়ের মাঝেই থাকে।

চঞ্চল হয়ো না। শারীরিক ও মানসিক চঞ্চলতা ছাড়া, এক রকম অবচেতন মনের চঞ্চলতা আছে। মানুষ নিজে সে বিষয়ে সচেতন নাও হতে পারে। এই রকম অচেতন মনের চঞ্চলতা বহু শক্তিক্ষয় করে।

## নালিশ করা বন্ধ কর

লোকে প্রায়ই নালিশ করে, বহুদিন আধ্যাত্মিক সাধন করেও কোন ফল পায়নি বলে। যদি আমরা তাদের মনগুলিকে বিশ্লেষণ করি, তবে দেখব যে তারা সব সময়েই এই রকম চিন্তা করে ঃ 'আমি *প্রার্থনা* করি, *জপ* করি, কিন্তু কোন ফলই পাই না।' এখন, এ রকম চিন্তায় শক্তি ব্যয় না করে যদি তারা ঈশ্বরের ওপরে মনঃসংযোগ করত, তবে অনেক বেশি উপকার পেত। সর্বদা এই 'আমি'র চিন্তা করে আমরা অহং-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ি। আমরা মনে করি, যে কেবল আমরাই একমাত্র ভক্তগোষ্ঠী। এ বিষয়ে ভক্তদের বাস্তবিকই খুব সাবধান হওয়া উচিত। যদি তারা প্রথম অবস্থাতে এই 'অহং'-কেন্দ্রিক চেতনাকে সমূলে নষ্ট করতে না পারে, তবে পরে তা করা অত্যন্ত কঠিন হবে। শ্রীশ্রীমা তাই বলেছিলেন, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি নিজে বিচার করতে যাওয়া তো অহমিকা। তোমার *সাধনার* ফল ঈশ্বরে অর্পণ কর: তুমি যা কিছু কর সবই তাঁর উদ্দেশে অর্পণ কর।

কোন না কোন ভাবে তোমার সব কাজকেই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত কর। যা কিছু কর সবই তাঁর উদ্দেশেই কর। জীবনের সব কর্তব্য কর্মই করে যাও, কিন্তু মূল চিন্তা হওয়া উচিত ঈশ্বর বিষয়ে। এই অভ্যাসে স্থির থাকতে পারলে মহৎ ফল পাওয়া যাবে। অধ্যাত্ম জীবনে কোন অলৌকিক বা ঐন্দ্রজালিক ঘটনা ঘটে না। এ জীবন অতি সরল, কিন্তু কঠিন।

*গুরু* প্রদত্ত *মন্ত্র* জপ করে যাও। যখন একা থাকবে উচ্চস্বরে জপ করতে পার। তবে মনে মনে জপ ও তা শোনাই সব থেকে ভাল। তোমার সম্পূর্ণ মনকে তারই স্পন্দনে ভরিয়ে রাখ। ঈশ্বরের নামের অনেক শক্তি, কিন্তু তা কেবল সম্ভাবনাময়। নিরন্তর অভ্যাসের ফলেই এই শক্তির প্রকাশ ঘটে। নিরন্তর জপই *মন্ত্রকে* চালিত করে মনের অন্তরতর স্তরে, যেখানে এর কাজ হলো মন্দ চিন্তার উদয়কে রুদ্ধ করা। তুমি নিজেই দেখতে পাবে, নিরন্তর *জপের* অনুপুঙ্খ অভ্যাসে কী মহৎ ফলই না পাওয়া যায়।

অযথা অসন্তোষ ডেকে এনো না। কোন কোন লোক, মনে হয়, চাপা উত্তেজনা থাকলে তবেই বেশ চনমনে থাকতে পারে। যখন তাদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই তখনো তারা কিছু নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করে নেয়। তারা তাই নিয়ে চিন্তা করে করে উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে। বাঁদরের পাঁচড়া হয়েছে। সে ওটা চুলকাচ্ছে। ফলে ওখানে একটা ছোট ক্ষত হয়। সে তখনো চুলকোয়। ক্ষতটি বড় ঘা হয়ে ওঠে। আমাদের ব্যাপারটিও কি ঐরকম নয়? আমাদের ঝঞ্ঝাটগুলি নিয়ে অযথা ভাবনা করে করে আমরা ওগুলিকে অনেকগুণ বাড়িয়ে তুলি। তার বদলে, ঈশ্বরকে নিয়ে চিন্তা করতে থাক না কেন?

জীবনে দুঃখ কষ্ট এড়িয়ে চলা যায় না। প্রত্যেককেই এর ভাগ নিতে হয়। যদি কেউ কেউ সুখে থাকে, তার কারণ হলো তারা এগুলিকে কাটিয়ে ওপরে উঠতে শিখেছে। কেউ কেউ আবার আত্মহত্যা করতে চায়। তাতে কি তাদের সমস্যার সমাধান হয়? সমস্যাগুলিকে অন্য স্তরে সরিয়ে দেওয়া যায় মাত্র, কারণ শরীরের নাশ হলেও মানবাত্মার অস্তিত্ব বজায় থাকে। তাকে একইভাবে আবার সমস্যার সামনা-সামনি হতে হয়। কোন অস্বাভাবিক উপায়ে জীবন নাশ করার অর্থ হলো বহু অমূল্য সময় এবং শেখার ও উন্নতি করার বহু অমূল্য সুযোগ হারানো। তাই এ রকম বোকার মতো চিন্তা পরিহার করাই ভাল।

কখনো কখনো মন বেশ খোশ মেজাজে থাকে। তার কারণ মনে *সত্ত্বগুণের* আধিক্য। কিন্তু এ অবস্থা বরাবরের জন্য বজায় থাকে না। গুণগুলি সর্বদাই বদলাচ্ছে, এই হলো প্রকৃতির নিয়ম। তাই কখনো কখনো *রজঃ* ও *তমঃ* তোমার মনে প্রাধান্য লাভ করে, তখন তুমি অস্থির বা একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়। এ সব এড়ানো যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের নাম জপ করে ও নৈতিক জীবন যাপন করে তুমি তোমার অন্তরের *সত্ত্ব*-গুণ বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি কর। তখন তুমি সুখ শান্তি বোধ করবে। অভ্যাসের ফলে এই মেজাজকে আরো দীর্ঘস্থায়ী ও সুস্থিত করে তোলা যায়।

## অন্তরে ও বাইরে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা কর

আধ্যাত্মিক আদর্শ খুব দৃঢ় না হলে, মন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের নাম জপ ও তাঁকে স্মরণ মনন করতে থাক। তাতেই নেতি-বাচক মনোভাব দূর হয়ে যাবে।

আমাদের একটা নিজস্ব মেজাজ আছে, নানারকম ভাল লাগার ব্যাপার আছে। তাই আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে মন-খোলা হতে পারি না। এটা স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটিয়ে এই স্বভাবের ওপরে ওঠাও যায়।

ধ্যানের সব থেকে বড় বাধা হলো, নিজ মনের অপবিত্রতা, বাসনা ও কামনা, এবং নিজের ও অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতি আসক্তি-ভিত্তিক প্রবণতা ও প্রভাবগুলি। এর প্রতিকার হলো আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলা, আর চিন্তা করা যে আমরাই সেই আত্মা যা পরমাত্মারই একটি অভিব্যক্তি বা প্রকাশ স্বরূপ।

সূক্ষ্ম শরীর ভৌত শরীরে অনুস্যূত ও পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এটি ভেতরেও আছে বাইরেও আছে। তেমনি আত্মা—ব্যষ্টি চেতনা—সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের ভেতরে ও বাইরে অনুস্যূত রয়েছে। অনন্ত চৈতন্য সব জীবে ও বস্তুতে অনুস্যূত ও পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার, স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের মিলন বিন্দুগুলিকেই চক্র বলে। আমরা যেমন এগিয়ে যাব স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীরের দিকে, তারপর জীবাত্মার দিকে, তার চিত্রটি এই রকম দেখায় ঃ

| | | |
|---|---|---|
| **জীবাত্মা বা কারণ শরীর** | — | অন্তরতম |
| **সূক্ষ্ম শরীর** | — | মধ্যবর্তী |
| **স্থূল শরীর** | — | বাহ্যতম |

**কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি এই রকম ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| **জীবাত্মা বা কারণ শরীর** | — | বাহ্যতম |
| **সূক্ষ্ম শরীর** | — | মধ্যবর্তী |
| **স্থূল শরীর** | — | অন্তরতম |

জীবাত্মা এবং আরো বেশি করে, পরমাত্মা—সূক্ষ্মতম থেকে সূক্ষ্মতর ও বিশালতম থেকেও বিশালতর। *অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্*। তাহলে যা *অণু* (সূক্ষ্ম) তাই আবার মহৎ (বিশাল)।

*সৎ-চিৎ-আনন্দের* মূর্ত রূপমূর্তির ধ্যান করে, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাও, আর দিব্য প্রেম ও আনন্দ প্রত্যেকের সঙ্গে ভাগ করে নাও। এই হলো আমাদের জীবনকে পূর্ণতর, মধুরতর ও নিজ-পর সকলের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ করে

তোলার উপায়। প্রথমে নিয়মিত *সাধনার* মাধ্যমে নিজের জীবনে অন্তত খানিকটা পরিবর্তন নিয়ে এস, তারপর 'কর্ম ও উপাসনা'র আদর্শ গ্রহণ কর। তোমাকে কেবল এইটুকু সতর্ক থাকতে হবে যে, যতটা কাজ করে আনন্দ পাও, তার থেকে বেশি কাজের ভার নিও না। আলোক ও নির্দেশের জন্য অন্তরাত্মার কাছেই প্রার্থনা করবে।

শান্তি পাবার কেবল একটি উপায়ই আমি জানি, আর তা হলো অধ্যাত্ম সাধনা তথা প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে, তোমাদের প্রত্যেককে আমি সেই পরামর্শই দিতে পারি।

সাধক যে অস্থিরতা ও শূন্যতা বোধ করে, তা দূর হয় একমাত্র দিব্য চৈতন্যের—আমাদের আত্মার আত্মা ও সর্বজীবের আত্মার—সংস্পর্শে এসে। এই যোগাযোগ কালে স্থাপিত হয়—অধ্যাত্ম পথ অনুসরণ করে—পরম চৈতন্যে অর্পিত [illegible] ও তাঁর প্রতি ভক্তির মাধ্যমে।

আধ্যাত্মিক জীবন যদি ভক্তকে অপরের সম্বন্ধে সুবিবেচক ও দয়াপ্রবণ না করে তবে সে জীবনের কি প্রয়োজন? *গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ *ভক্তের* লক্ষণ সম্বন্ধে যা বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলি আমাদের সকলের স্মরণ করা উচিত ও তাঁর পদানুসরণ করা উচিত ঃ

> **অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।**
> **নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥**
>
> **সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।**
> **ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥** [৪]

—যে কোন জীবকে ঘৃণা করে না, সকলের প্রতি প্রীতি ও দয়াসম্পন্ন, যে 'আমি' ও 'আমার' বোধ থেকে মুক্ত ও সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি; যে ক্ষমাশীল, সদাতুষ্ট এবং ধ্যানে স্থির; যে আত্ম-সংযমী, স্থিরবুদ্ধি ও মন-বুদ্ধি আমাতেই স্থাপন করে রেখেছে—যে এই ভাবে আমার প্রতি অনুরক্ত, সে আমার প্রিয়।

তোমাকে যাতে খুব বেশি মাথা ঘামাতে না হয়, আর কোন স্ক্রু যাতে ঢিলে করে না ফেল অর্থাৎ বেসামাল যাতে না হতে হয়—সে বিষয়ে যত্ন নেবে! একমাত্র নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমেই একাগ্রতা আসতে পারে। গোড়ার দিকে এ অনুশীলন করে যেতেই হবে, মন ঠিক ঠিক মেজাজে থাকুক আর না থাকুক। মন অস্থির হলেও উদ্বিগ্ন হয়ো না। ধ্যানের বিষয় অন্য বিষয়ের থেকে যত বেশি আকর্ষণীয় হবে—মন তত বেশিক্ষণ ঐ বিষয়ে লেগে থাকতে চাইবে। ঈশ্বরের নামের এমনই শক্তি যে ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তা শরীর ও মনে একটা সাম্যভাব গড়ে তোলে,

---

৪ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১২/১৩-১৪

উপরন্তু শীঘ্রই একটা সঠিক বোঝাপড়ায় পৌঁছে দেয় এবং অধ্যাত্ম বিষয়ে আরো বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

আমাদের সবাইকে একথা মনে রাখতে হবে যে, যারা বাস্তবিকই সঠিক আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণ করে চলে, তারা কম অহং-কেন্দ্রিক ও বেশি স্বার্থশূন্য, অন্যের প্রতি দয়াপ্রবণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়। আমাদের দাতা হতে হবে, ভিক্ষুক নয়। এ কাজে আমরা যত সফল হব, ততই নিজেরা মুক্ত, আনন্দিত ও শান্ত বোধ করব।

তাঁকে যদি তোমার 'সর্বস্ব' বলে মনে কর, তবে তাই যথেষ্ট। আমার কাছে তিনি আমার আত্মার আত্মা, উপরন্তু আর যা কিছু সব। আমি আমার ব্যক্তিত্ব বা চেহারার প্রতি আসক্ত থাকতে চাই না, এমনকি আমার *ইষ্ট দেবতার* মূর্তির প্রতিও নয়, কিন্তু আমি অনুভব করতে চেষ্টা করি যে আমি এমন এক আত্মা, যা চিরকাল আমার আত্মার যিনি আত্মা—সকলের আত্মার যিনি আত্মা—তাঁরই সুরে বাঁধা। এই অনন্ত চৈতন্যই *ইষ্ট দেবতার* রূপ ধরেন। *জপের* মাধ্যমে এটি উপলব্ধি কর ও ধ্যান কর তাঁর আনন্দঘন মূর্তির।

আমাদের পক্ষে অধ্যাত্ম সাধনের নির্দিষ্ট কাল ও কালের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে খুব বেশি কড়াকড়ি করার দরকার নেই। আমরা যেন সাধ্যমতো সাধন করে চলি, শরীর ও মনকে আলগা দিয়ে; কিন্তু সব সময়ে সতর্ক থাকতে হবে যেন নিম্নতর মন আমাদের ঠকাতে না পারে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা *জপ* ও ধ্যান না করে মাঝে মাঝে বিরাম দিয়ে পড়াশুনা বা একটু আধটু প্রয়োজনীয় কায়িক শ্রম করাও ভাল।

কেবল যখন সেই অনন্তের একটু আভাস আমরা পাব, তখনই সাকার ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু ধারণা করতে পারব। সমুদ্র সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা না হলে, তার তরঙ্গকে কি কেউ জানতে পারে? অসীম আকাশের একটা ধারণা না হলে সসীম আকাশের ধারণা কি করে হবে? অনন্ত আলোকের কিছু জ্ঞান না হলে আলোকরশ্মির ধারণা কি করে হবে?

ধ্যান করার বিধি এই রকম : মনে কর তোমার হৃদয় ভরে আছে তোমার আত্মার আলোকে, আর সেই আলোক তোমার দেহ-মনের অন্তরে-বাহিরে অনুস্যূত হয়ে আছে; এরপর চিন্তা কর যে এটি সেই জ্যোতির্ময় অনন্ত চৈতন্যরই অংশ, যা সর্বত্র আলোক বিতরণ করছে। তোমার দেহ-মন এবং সমগ্র জগৎকে এঁর মধ্যে লয় করে, চিন্তা কর তুমি যেন এই অনন্ত চৈতন্যের অংশস্বরূপ একটি ছোট্ট আলোকের গোলক।

এ রকম নিরাকার ধ্যান তোমার ভাল না লাগতে পারে এবং লাগলেও এ রকম ধ্যান বেশিক্ষণ করা শক্ত। তাই মনে কর, তোমার আত্মা যেন একটি শুদ্ধ মানস শরীর ও একটি শুদ্ধ স্থূল শরীররূপ পোশাক পরেছেন আর পরমাত্মা যেন তোমার *ইষ্ট দেবতার* রূপ নিয়েছেন। *ইষ্ট-মন্ত্র* জপ আর তাঁর জ্যোতির্ময় রূপ ধ্যান কর। মনে কর যিনি তোমার *ইষ্ট-দেবতা* রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনি সর্বত্র বিভাসিত অনন্ত চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নন।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

# অধ্যাত্ম জীবনে প্রার্থনার স্থান

## প্রার্থনা—সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক

যাজক-পল্লীর যাজক একটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি কি প্রতি রাত্রে তোমার প্রার্থনাটি উচ্চারণ কর?' সে উত্তর দেয়, 'না মহাশয়। কোন কোন রাত্রে আমার চাওয়ার কিছু থাকে না।' একটি শিশুর কাছে প্রার্থনা মানে ঈশ্বরের কাছে নানা রকমের জাগতিক জিনিস চাওয়া, ঠিক যেমন বাবা-মার কাছে, তেমনি ঈশ্বরের কাছেও সে নানা জিনিস চায়। প্রার্থনা সম্বন্ধে শৈশবের ধারণা কৈশোরেও চলতে থাকে। লোকে ঈশ্বরকে এক মহান বর-দাতা রূপে দেখে। তারা তাঁর কাছে এটা সেটা চাইতেই থাকে, এ সব প্রার্থনার 'উত্তর' না পেলে, তারা তাঁর অস্তিত্বেই সন্দিহান হয়ে পড়ে। এখন এই ভয়ানক যুদ্ধ চলেছে।* যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির—জার্মানী, ইটালি, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার—জনগণ তাদের দেশের জয় লাভের জন্য প্রার্থনা করছে। গির্জাগুলিও ভাগাভাগি হয়ে গেছে, আর পুরোহিত ও যাজকরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, যাতে তিনি তাদের দেশের দিকে আসেন। এই সব লোক ঈশ্বরকে কি ভেবেছে? তিনি কি আকাশের ওপর একজন অত্যাচারী শাসক যিনি নিচের জনগণের প্রতি নিষ্ঠুর ও পক্ষপাত-দুষ্ট, তাদের লোভ ও ঘৃণার মত সহজাত প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে খেলা করছেন?

প্রথম খ্রীস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদী দার্শনিক ফিলো জুডিয়াস (Philo Judaeus)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—ঈশ্বর সর্বশুভের উৎস পবিত্রতাস্বরূপ, আর জড়বস্তু অশুভের আকর। মানবের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের পরিপূর্ণ শুভের কাছে ফিরে যাওয়া। খ্রীস্টান ধর্ম তত্ত্বে এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য। শয়তানই হলো অশুভশক্তির মূর্ত প্রতীক। শুভ অশুভের মূর্ত প্রতীকের দ্বৈতভাব প্রথমে জরথুস্ত্রের মতবাদ থেকে আসে। খ্রীস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যীশুখ্রীস্ট অশুভকে জয় করেছিলেন।

হিন্দুমতে শুভ-অশুভ মায়ার স্তরের ব্যাপার, ঈশ্বর তার পারে। ঈশ্বর হলেন পূর্ণ চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ, তিনি অনন্ত সত্তাস্বরূপও। সৃষ্টি-লয়, শুভ-অশুভ, এগুলি

---

* ১৯৪৪ সনে ফিলাডেলফিয়ায় মহারাজজী এই উক্তিটি করেছিলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল।

মায়া শক্তি নামে একই শক্তির এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। এই সব শক্তিগুলির খেলা নির্ভর করে মানবের অন্তর্নিহিত প্রবণতার ওপর। মানবের মধ্যে দুটি প্রবণতা রয়েছে—*বিদ্যা* আর *অবিদ্যা*। *বিদ্যা* নিজেকে প্রকাশ করে—পবিত্রতা, অনাসক্তি, ঈশ্বর প্রেম ও বিচার বুদ্ধি রূপে। *অবিদ্যা* নিজেকে প্রকাশ করে—ভ্রান্তি, ক্রূরতা, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি রূপে। জীবাত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই এ সব প্রবণতার অস্তিত্ব, আর তা পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সংস্কারের ফল। এইখানেই এসে পড়ে মানবের দায়িত্ব। সে *বিদ্যার* বা *ধর্মের* পথ বেছে নিয়ে ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে পারে ও শেষে ঈশ্বরের কৃপায় শুভ-অশুভ দু-এরই পারে যায়। অথবা সে *অবিদ্যা* বা *অধর্মের* পথ বেছে নিয়ে, ঈশ্বরের থেকে দূরে গিয়ে নিজের ওপর ক্রমান্বয়ে দুঃখের ভাব চাপাতে থাকে। যদিও ঈশ্বর শুভ ও অশুভ দুয়েরই পারে, তিনি মানব কল্যাণে নিজেকে প্রকাশ করেন মানবরূপে—ঈশ্বরাবতার রূপে।ঈশ্বরাবতার মানবকে অধ্যাত্ম সাধনার পথ দেখান, প্রায়ই তা হয় এক নতুন পথ, যা মানবকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় তার প্রকৃত আবাসের ও সারতত্ত্বের দিকে, পূর্ণতার দিকে।

ঈশ্বর সর্বভূতে সাক্ষিরূপে রয়েছেন। অধ্যাত্ম জীবন হলো সকল আত্মার আত্মাকে আবিষ্কার করা। প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। প্রার্থনাই আমাদের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার বলেছেন—প্রার্থনা আন্তরিক হতে হবে। মন ও হৃদয় এক করে প্রার্থনা করতে হবে। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তরে যে ব্যবস্থা নেন তাতে আমাদের কল্যাণই হয়। মানব প্রায় জানে না কিসে তার মঙ্গল হবে। তাই, এটা ভালই হয় যে মানবের স্বার্থপর বৈষয়িক প্রার্থনাগুলির উত্তর তারা একেবারেই পায় না। যদি ঈশ্বর প্রত্যেকের প্রত্যেক ইচ্ছা পূরণ করতেন, তাহলে জগতে বিশৃঙ্খলাই হতো, আর যারা শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকত তারা প্রত্যেকেই পাগল হয়ে যেত। একটি ছোট মেয়ে প্রতিদিন রাত্রে নিয়মিত প্রার্থনার পর একটি বাড়তি প্রার্থনা করত ঃ 'কৃপা করে সুন্দর তুষার পাঠিয়ে দিও যাতে শীতের সময় ফুলগুলি গরম থাকে।' পরে সে মায়ের কাছে স্বীকার করেছিল ঃ 'ঐ সময়ে আমি ঈশ্বরকে বোকা বানিয়েছিলাম, আমি তুষারপাত চেয়েছিলাম যাতে আমি বরফের ওপর স্লেজগাড়ি চালাতে পারি।' আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে বোকা বানাতে পারি না।

প্রার্থনায় বিশ্বাসই হলো মূল বস্তু। আমরা যদি চাই প্রার্থনা সফল হোক, তবে তা—সব অবস্থায় ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—এই সত্যের ওপর ভিত্তি করেই করতে হবে। দুটি লোক খোলা নৌকোয় সমুদ্রের ওপর দিয়ে দিকহারা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাদের মধ্যে যে খুব মদ খেত—সে প্রার্থনা করল ঃ 'হে প্রভু! আমাকে রক্ষা কর, আমি আর কখনো মদ খাব না।' তার সাথী পরামর্শ দিল,

'একটু অপেক্ষা কর, বেশিদূর এগিয়ো না, আমি দেখছি একটা জাহাজ আসছে।' প্রার্থনা করার সময় এই ভাবেই মানুষ চিন্তা করে।

লোকে প্রার্থনা করে ভয়ে বা উদ্বেগে বা হয়রান হয়ে। আদিম মানুষ নিজের রক্ষার জন্য নানা প্রাকৃতিক শক্তির কাছে প্রার্থনা করত। জুলু পূজকরা ঈশ্বরকে ভয় দেখায় ঃ 'আমার কথা শোন, না হলে তোমাকে বিছুটি গাছ খেয়ে থাকতে হবে!' আধ্যাত্মিক মানুষ প্রার্থনা করে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে। তার প্রার্থনা হলো জীবাত্মার মুক্তির জন্য ব্যাকুলতার প্রকাশ। প্রকৃত ভক্ত প্রার্থনা করার সময় নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। এ হলো প্রকৃত আলোকের জন্য প্রার্থনা। প্রাচীন হিন্দু প্রার্থনা মন্ত্র গায়ত্রী, যা আজও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আবৃত্তি করে থাকে, মহত্তম প্রার্থনাগুলির মধ্যে একটি ঃ

**'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।**
**ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥'**[১]

—'যে দিব্যসত্তা ত্রিলোককে প্রকাশ করেন, আমরা তাঁর পরম মহিমার (দ্যুতির) ধ্যান করি। তিনি যেন আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়ে দেন।' শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা হলো 'ধ্যান'; তখন মনের প্রবাহ সম্পূর্ণ নিঃশব্দে ঈশ্বরের দিকে ছুটে চলে।

স্বামী বিবেকানন্দ তখনো কৈশোরে, এমন সময় তাঁর পিতার দেহত্যাগ হলে তাঁকে তাঁর মা, ছোট ভাইদের ও আত্মীয়বর্গের ভরণ পোষণের ভার নিতে হয়। পরিবারটি প্রতিপালনের কোন রকম ভদ্র ব্যবস্থা করার সকল চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, খুব কষ্টে পড়ে তিনি তাঁর প্রিয়তম প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলেন, ও তাঁকেই তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে বললেন। কিন্তু, ত্যাগের প্রতিমূর্তি প্রভু বললেন ঃ 'মন্দিরে জগদম্বার কাছে গিয়ে নিজেই তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। তিনি নিশ্চয়ই তোমার কথা শুনবেন।' যুবা বিবেকানন্দ যখন মার সামনে দাঁড়ালেন, তিনি মার দিব্য ঐশ্বর্য দেখলেন ও তাঁর চিন্ময় অস্তিত্ব অনুভব করলেন। তখন তিনি নিজ পরিবার ও জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে একেবারে ভুলে গিয়ে মার কাছে বার বার কেবল ভক্তি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রার্থনা করলেন। এ 'ভুল' তাঁর মনে পড়ল কেবল প্রভুর কাছে ফিরে আসার পর, তিনি তখন তাঁকে আবার একবার জগদম্বার কাছে পাঠালেন। কিন্তু আবার, বিবেকানন্দ কেবল জ্ঞান ও ভক্তি প্রার্থনাই জানালেন। এ রকম কয়েকবার চলল। শেষে প্রভু তাঁর প্রতি সদয় হয়ে আশীর্বাদ করলেন যে তার পরিবারের লোকেদের জীবন ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার অভাব হবে না।[২]

---

১ ঋগ্বেদ, ৩/৬২/১০

২ স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, ২য় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৪৪ (কলকাতা, প্রথম সপ্তর্ষি সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০)

এটি আমাদের সকলেরই শিক্ষণীয়। আমরা যেন কেবল ভক্তি, শক্তি ও পবিত্রতা প্রার্থনা করি। এই হলো আধ্যাত্মিক প্রার্থনা। এ নানা রকমের হতে পারে। কিন্তু তাদের সব কটিরই উদ্দেশ্য হলো—জীবাত্মাকে ঈশ্বরের আরো কাছে নিয়ে যাওয়া। প্রকৃত *ধ্যানের* প্রথম পদক্ষেপ হবে আধ্যাত্মিক প্রার্থনা।

## হিন্দুধর্মে আধ্যাত্মিক প্রার্থনার ধারা

সব যুগে, সব ধর্মে, অধ্যাত্ম সাধক ও ভক্তগণ স্তুতি, ধর্ম-সঙ্গীত ও প্রার্থনার মাধ্যমেই তার অন্তরতম ব্যাকুলতা ও উদারতম ভাবাবেগগুলির স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটিয়েছে। কখনো কখনো তারা দুশ্চিন্তা ও অভাবের স্পর্শবিহীন উচ্চভাবে অবস্থান করে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা থেকে গান গায় বা প্রার্থনা করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসামর্থ্য ও অসম্পূর্ণতার চেতনা বা দুঃখ ও অসহায়তা বোধ, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে ক্লান্ত জীবকে সান্ত্বনা ও সাহায্যের জন্য সর্ব-শক্তিমান সদা-পূর্ণ সত্তাটির দিকে ফেরায়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন 'ভগবদ্‌গীতায়' বলেছেন ঃ

**চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।**
**আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।**[৫]

—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, আর্তিযুক্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সুখকামী ও তত্ত্বজ্ঞানী—এই চার রকম সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার (ঈশ্বরের) ভজনা করে।

এটা স্বাভাবিক যে, অধ্যাত্ম-বোধসম্পন্ন মানব তার উপচেপড়া প্রেম ও ভক্তি থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করবে, তাঁর গৌরব কীর্তন করবে। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তা অন্যভাবে হয়ে থাকে। জীবনের দুঃখ দুর্দশার ধাক্কা খেতে খেতে বা পাপবোধে ক্রমাগত উৎপীড়িত হয়ে, মানবীয় সহায়তার নিষ্ফলতা হৃদয়ঙ্গম করে, দুশ্চিন্তা-ক্লিষ্ট জীব ঈশ্বরের দিকে ফেরে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য। ভোগান্বেষী মানুষ সমস্ত মানবীয় প্রচেষ্টার বিফলতা লক্ষ্য করে, নিজে অসহায় বোধ করে ঈশ্বরের দিকে তাকায় তার বাসনা পূরণের জন্য। জ্ঞানান্বেষীর ক্ষেত্রে সাংসারিক কষ্ট বা বিষয়-বাসনা তার অশান্তির কারণ না হতে পারে, কিন্তু সে হৃদয়কন্দরে অনুভব করতে থাকে আত্মার এক বুভুক্ষা, এক শূন্যবোধ বা সীমিত সত্তাজনিত দুঃখ, জাগতিক কোন বস্তুই যা দূর করতে পারে না। তার আত্মা এক উচ্চতর জীবনের জন্য ব্যাকুল হয়ে তারই খোঁজ করতে করতে শান্তি ও দিব্যানন্দের উৎসমুখ সেই ঈশ্বরের কাছে এসে পৌঁছয়।

এই সব নানা রকমের ভক্তেরা অত্যন্ত প্রয়োজনের তাগিদেই দিব্য সহায়তা ও

৫ *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা,* ৭/১৬

কৃপার খোঁজ করে। এইভাবে ঈশ্বর তাদের কাছে এক প্রকৃতিগত প্রয়োজন। এ প্রয়োজন এতই বেশি যে এমনকি নাস্তিক ব্যক্তিদেরও অসহায় ও হতাশ অবস্থায় শান্তি ও সহায়তা পাবার আশায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ডাকতে শোনা গেছে। তথাকথিত অজ্ঞাবাদীর প্রার্থনা—'হে ঈশ্বর, যদি ঈশ্বর বলে কিছু অস্তিত্ব থাকে, আমার আত্মাকে উদ্ধার কর। অবশ্য যদি আমার আত্মা বলে কিছু থাকে।'—যা প্রথমে যতই কৌতুকপূর্ণ বোধ হোক না কেন, তার মধ্যে যে এক গভীর সত্য নিহিত রয়েছে তা ধর্মীয় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ছাত্রের কাছে ধরা না পড়ে পারে না। অজ্ঞাবাদীও সময়ে সময়ে বিলীয়মান জীবনের কথা বোধ না করে পারে না। অধ্যাত্ম সাধক এ কথা তীব্র ভাবে বোঝে ও অনুভব করে এবং হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকে, তিনি যাতে তার সাহায্যার্থে ত্বরায় এসে পড়েন ঃ

**আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং**
**প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।**
**লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং**
**তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥**[৪]

—হে প্রভু, প্রতিটি দিন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আয়ু কমে যায়, যৌবন ক্ষয় হয়। যে দিন চলে যায় তা আর ফেরে না; কাল বাস্তবিকই জগতের ভক্ষক। সৌভাগ্য-লক্ষ্মী জলের উপরিতলে তরঙ্গ ভঙ্গের মতো চঞ্চলা ও ক্ষণস্থায়ী। জীবন বিদ্যুৎ-বিস্ফুরণের নিমেষমাত্র কাল স্থায়ী। তাই হে সর্ব-শরণ, তুমি এখন তোমার শরণাপন্ন আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

উন্নত সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সর্বব্যাপ্ত ও অতীন্দ্রিয় সত্তার সঙ্গে শুচিতা ও শুদ্ধতার ভাব যুক্ত করে, সেই অনুভূতি থেকে কথা বলেন। কিন্তু অপরিণত পূজক অবশ্যই ঈশ্বরের সু-উচ্চ ভাব তার ধারণার মধ্যে পোষণ করতে পারে না। নিজেকে সর্বানুস্যূত চৈতন্যে বিশ্বাসী বলে স্বীকার করলেও, সে তাঁকে মানবাকৃতি ও মানবানুভূতি বিশিষ্ট সর্বশক্তিমান সত্তারূপেই কল্পনা করে থাকে। সে তার দেবতাকে সকল ভক্তের প্রতি সমপ্রীতি বিশিষ্ট মনে করলেও, তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ ও ভয়প্রদরূপও চিন্তা করে, তিনি যেন সব সময়ে তাঁর ভক্তদের শত্রুকে শাস্তি দিতে আর 'অবিশ্বাসী'র প্রতি অনন্ত নরক ভোগের আদেশ দিতে উদ্যত। আর এই ভক্ত পূজক তার প্রেমের দেবতার উদ্দেশে যে সঙ্গীত নিবেদন করে তাতে নিছক ঈর্ষা কিছু কম বর্ষিত হয় না। আর সে দেখে যে অন্যের মধ্যে বাস্তব ও অবাস্তব নানা অশুভ বৃত্তি রয়েছে, কিন্তু তার নিজের মধ্যে যে অনেক বেশি অশুভ বৃত্তি পাওয়া

---

৪ শ্রীশঙ্কর, শিবাপরাধক্ষমাপন স্তোত্রম্, ১৩

যেতে পারে সে বিষয়ে তার চেতনা নেই। পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় সব ধর্মে ও সব মতবাদে এই রকম পরিস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু সাধক যত তার আদিম কল্পনার ওপরে উঠতে থাকে, সে ঈশ্বর সম্বন্ধে তত উদারতর ভাব হৃদয়ে পোষণ করতে থাকে, যাঁকে সে কেবল সর্বশক্তিমান নন, সকল পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতার আকর-স্বরূপ বলেও গ্রহণ করে।

অধিকন্তু, ভক্ত তার নিজের সম্পর্কে আরো বেশি বেশি অন্তর্দৃষ্টিও লাভ করতে থাকে, আর এইটিই প্রকৃতপক্ষে তার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির মুখ্য নিদর্শন। অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হলে, দেহ-মনের কলুষ সৃষ্টিকারী অশুভ ও অপবিত্র বিষয়গুলিকে সে সহজে চিনতে পারে। পাপ ও অপূর্ণতা বোধে উৎপীড়িত হয়ে সে চায়, ঈশ্বরের—তথা মহান শোধন কর্তার—কৃপায় ও স্পর্শে এগুলি বিদূরিত হোক। উপনিষদের ঋষিদের মতে ঃ

**স পর্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।**[৫]
**দহ্রং বিপাপং পরমেশভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।**[৬]
**নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ।**
**নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ ॥**[৭]

—সেই ঈশ্বর 'সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, আকারহীন (অশরীরী, ক্ষতহীন, শিরাহীন), শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি নিষ্পাপ হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত।' 'যে দুষ্টপ্রবৃত্তি থেকে বিরত হয়নি, মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করেনি, (একাগ্রচিত্ত হয়নি, সমাধির জন্য অস্থিরতা বর্জন করেনি) এমন সাধক তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না।'

## ঈশ্বরই শোধনকর্তা ও পরিত্রাতা

ঈশ্বরের চিরশুদ্ধ ও শোধনকর্তা রূপ কল্পনা *ঋগ্বেদ সংহিতাতে*ও পাওয়া যায়—যেখানে ঋষি বিশ্বের মহান নীতি-বিধায়ক বরুণের কাছে প্রার্থনা করছেন, পাপ ও অশুভের বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য, পাপ থেকে ক্ষমা লাভের জন্য ঃ

**বি মচ্ছ্রথায় রশনামিবাগ ঋধ্যাম তে বরুণ স্বামৃতস্য।**
**মা তন্তুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে মা মাত্রা শার্ষপসঃ পুর ঋতোঃ ॥**[৮]

—হে বরুণ আমার পাপ দূর করুন, সেটি যেন দড়ি—ঐভাবে, তোমার কাছ থেকে আমরা যেন একটি জল (ভর্তি) পয়ঃপ্রণালী পাই। আমি যে পুণ্য কর্মের বয়নে (ব্যস্ত) তার তন্তু তুমি যেন ছেদ করো না; পবিত্র অনুষ্ঠানাদি ফলপ্রসূ হবার সময়ের আগেই তার উপাদানগুলিকে নষ্ট করে দিও না।'

---

৫ *ঈশোপনিষদ্*, ৮
৬ *মহানারায়ণ উপনিষদ্*, ১২.১৬
৭ *কঠ উপনিষদ্*, ১.২.২৪
৮ *ঋগ্বেদ*, ২/২৮/৫

এ চিন্তা বহু বৈদিক ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মসাহিত্যে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। উপনিষদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন ঃ

**চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি।**
**তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতাঃ অতিপাপ্মানমরাতিং তরেম ॥** [৯]

—মন, সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের পবিত্র, সর্বানুস্যূত ও শাশ্বত অবস্থিতির ফলে পবিত্র হয়ে অশুভ থেকে মুক্ত হয়। আমরাও যেন শোধনকর্তার সদা পুণ্য অবস্থানের ফলে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের মহাশত্রু-স্বরূপ পাপের স্পর্শ থেকে দূরে সরে যেতে পারি।

যেহেতু পবিত্রতাই হলো ঈশ্বর-কৃপা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও মুক্তি অর্জনের শর্ত ভক্ত প্রার্থনা করে ঃ

**যন্মে মনসা বাচা কর্মণা বা দুষ্কৃতং কৃতম্।**
**তন্ন ইন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিঃ সবিতা চ পুনন্তু পুনঃ পুনঃ ॥** [১০]

—আমি চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে যা কিছু পাপ করেছি (ইন্দ্র-বরুণ-বৃহস্পতি-সূর্যরূপ) পরমেশ্বর যেন তার জন্য আমাকে ক্ষমা করেন ও সেগুলি থেকে আমাকে মুক্ত করেন।

বাস্তবিকই উপনিষদের ভক্ত এই ভাবে সদা প্রার্থনা জানায় ঃ

**যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।**
**হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বম্ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥** [১১]

—যিনি দেবগণের স্রষ্টা ও পোষণকর্তা এবং সকলের প্রভু, অশুভ-সংহর্তা রুদ্র, মহান দ্রষ্টা, যিনি বিশ্ব প্রপঞ্চেরও (হিরণ্যগর্ভের) স্রষ্টা, তিনি যেন আমাদের শুভ চিন্তায় ভরিয়ে দেন।

অশুভ ও অপবিত্র ভাব যে রূপেই আসুক তা খাঁটি সাধকের পক্ষে সব চেয়ে বড় দুঃখের কারণ, যেহেতু সেটিই তার কাছে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে আসার পক্ষে বড় বাধা। তাই, তার মর্ম-বেদনায় সে বার বার প্রভুর, শোধনকর্তা ও পরিত্রাতার কাছেই প্রার্থনা জানায়। আর প্রভুও তাঁর অসীম কৃপায় তাকে আশার বাণী শুনান ঃ

**অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।**
**সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥** [১২]

—যদি তুমি সকল পাপীর মধ্যে নিকৃষ্টতম পাপীও হও, তবু তুমি ঈশ্বরীয় জ্ঞানরূপ ভেলায় চড়ে পাপ সমুদ্র পার হতে পারবে।

---

৯ মহানারায়ণ উপনিষদ্ ১.১১
১০ তদেব, ১.১২
১১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩.৪
১২ ভগবদ্গীতা ৪.৩৬

প্রেমের দেবতা ভক্তকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজেকে তাঁর কাছে শরণাগত হতে বলেন ঃ

**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।**
**অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥** [১৩]

—সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মের পথ ছেড়ে আমার আশ্রয় নাও, আমি তোমাকে সব রকম পাপ থেকে মুক্তি দেব। দুঃখ করো না।

বাস্তবিক পবিত্রতা ও সাধুতার ভাব আর সেই সঙ্গে ক্ষমা ও দয়ার ভাব এতই ওতপ্রোত ভাবে হিন্দুর ঈশ্বরীয় ধারণার সঙ্গে যুক্ত যে এটিকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়। আর ভক্তহৃদয়ের গভীরদেশ থেকে প্রার্থনা উচ্চারিত হয় ঃ

**সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব জয় জয় করুণাব্ধে ...।**[১৪]

—হে প্রভু, তুমি আমার সব পাপ ক্ষমা কর; হে করুণার সাগর, তোমার জয় হোক।

**অপরাধসহস্র সঙ্কুলে পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।**
**অগতিং শারণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥**[১৫]

—আমি সহস্র পাপ করে ভীষণ সংসার সাগরে পড়ে গেছি। হে প্রভু আমি সহায়হীন, তোমার শরণ নিয়েছি। তুমি আমাকে তোমার নিজের করে নাও।

## ভক্তের ঈশ্বর প্রেমের গভীরতা

ক্রমবিকাশের একটা স্তরে পাপ-চেতনা ও ঈশ্বরানুকম্পায় আস্থা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অবশ্যই অপরিহার্য। কিন্তু হিন্দুধর্মে উচ্চতর পর্যায়ে এই ভাবগুলির প্রভাবের প্রাধান্য দেখা যায় না, কারণ সব হিন্দু সম্প্রদায় ও মত প্রকৃত মানব সত্তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব ও পবিত্রতায় এবং সর্ববন্ধন থেকে সহজাত মুক্তিতে বিশ্বাসী। হিন্দুভক্তের হৃদয় অন্য কোন বস্তুর চেয়ে ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-সংযোগ ও আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের জন্য বেশি ব্যাকুল হয়ে থাকে। ঈশ্বরের সাকার-নিরাকার ভাবের মধ্যে সে সাকার ভাবের ওপরই জোর দেয়।

সে চায় তাঁর চিন্ময় স্পর্শ লাভ করতে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে, আর সেই উদ্দেশ্যে সফল হবার চেষ্টায় সে নানা রকম ভাব প্রবণতা ও মনোভঙ্গি প্রকাশ করে থাকে, যার গভীরতা বাইরে থেকে সহজে ধরতে পারা যায় না। এই ভক্তের চিন্তায় ঈশ্বর কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বানুস্যূত আশ্রয়স্থল, সব রকম সদ্‌বস্তুর কারণ

---

১৩ তদেব, ১৮/৬৬ ১৪ শ্রীশঙ্কর, শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্, ১৬

১৫ Sw. Yatiswarananda, *Universal Prayers*, verse 252

নন উপরন্তু তিনি প্রেমের দেবতাও—যিনি তাঁর দিব্য মহিমা ভক্তের সঙ্গে পিতা, মাতা, প্রভু, সখা ও সন্তানরূপ সহজাত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মাধ্যমেও প্রকাশ করে থাকেন। যে মানবাত্মা নিজ সত্তার অন্তস্তল থেকে দয়িতের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়, তার কাছে তিনি চির প্রেমিক-রূপেও দেখা দেন। এই ব্যাকুলতাকেই *ভক্তি* বলে, যা নারদের মতে 'অনির্বচনীয়া' ঃ

**অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্।**[১৬]

এই ব্যাকুলতাই, 'ঈশ্বরে সর্ব কর্ম সমর্পণ, আর তাঁর অস্তিত্ব বিস্মরণে মানসিক যন্ত্রণাবোধ' ঃ

**'নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা**[১৭] **তদ্‌বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতেতি।**[১৮]

সাধারণত ভক্ত ঈশ্বরকে দিব্য গুরু, পিতা বা মাতা রূপে পূজা করে থাকে, তাঁর চির-প্রেমিক রূপটি তাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু তবু কোন কোন মানব, যারা সব রকম ভাব সম্বলিত এবং সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা ও উপলব্ধির উপায়স্বরূপ, এক সর্বগ্রাসী ও সর্বাবগাহী প্রেম নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হবার যোগ্যতা লাভ করে, তারা ধন্য। যমুনাচার্যের হৃদয়োত্থিত এই প্রার্থনাটি খুবই মর্মস্পর্শী ঃ

**ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকম্ অগ্রতঃ।**
**যদি মে ন দয়িষ্যসে ততো দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ ॥** [১৯]

—হে প্রভু, প্রথমে আমার প্রার্থনা শোন, আমি কেবল সত্যই বলছি, মিথ্যা নয়। যদি তুমি আমাকে তোমার কৃপা প্রদর্শন না কর, তবে তুমি আমার থেকে বেশি উপযুক্ত এমন আর কাউকে পাবে না।

**পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ।**
**ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুমসি গতিশ্চাসি জগতাম্।**
**ত্বদীয়স্ত্বদ্ ভৃত্যস্তব পরিজনস্ত্বদ্গতিরহং**
**প্রপন্নশ্চৈবং সত্যহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ ॥** [২০]

—তুমি পিতা, মাতা, স্বামী ও পুত্র। তুমি প্রিয়, সখা, আত্মীয়, আচার্য ও জগতের গতি। আমি তোমারই, তোমার ভৃত্য, তোমার সেবক । তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। আমি তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি এবং বাস্তবিকই হে প্রভু, আমার ভার তুমি বহন করছ।

এক অনতিক্রম্য আবেগপূর্ণ প্রেমে শ্রীচৈতন্যও তাঁর দয়িতের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ঃ

---

১৬ নারদীয় ভক্তিসূত্র, ৬.৫১
১৯ স্তোত্র রত্ন, ৫০
১৭, ১৮ তদেব, ১.১৯
২০ তদেব, ৬০

**ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং**
**কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।**
**মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে**
**ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥** [২১]

—হে জগতের প্রভু, আমি ধন,জন, সুন্দরী স্ত্রী বা কবিত্ব কামনা করি না। তুমি আমাকে কেবল এই বর দাও, আমার যেন জন্মে জন্মে তোমার প্রতি শুদ্ধা ও অহৈতুকী ভক্তি হয়।

## হিন্দু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সর্বগ্রাহী প্রসার

আবেগপূর্ণ প্রেমের গভীর আনন্দোচ্ছ্বাস মানবাত্মাকে বেঁধে ফেলে। কিন্তু এতেই হিন্দু ভক্তের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ফুরিয়ে যায় না। এমন সব অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মানবাত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের অভিজ্ঞতার পরিধি সাকার ও নিরাকার দুই ভাবকেই জুড়ে থাকে। তাদের আধ্যাত্মিক সচেতনতা খর্ব বা সীমাবদ্ধ হতে চায় না। তারা সব রকম ভাব গ্রহণ করে সব রকম ঈশ্বরীয় প্রকাশও উপলব্ধি করে। তারা তাদের ভালবাসার পাত্রকে নানা ভাবে সম্ভোগ করে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো অসীমের জন্য এক অন্তর্দাহী ক্ষুধা তাদের অন্তরাত্মাকে অধিকার করে বসে। তারা নিরপেক্ষ তুরীয় ভাবের গভীর অন্তরে ডুব দেয় ও নিজেদের জ্ঞানাতীত সচ্চিদানন্দে হারিয়ে ফেলে। আবার যখন তারা আপেক্ষিক (আমি-আমার) জগতে ফিরে আসে, তারা দেখে প্রত্যেকটি জিনিসই যেন সেই অসীমের দীপ্তির প্রতিফলন। এ বিষয়ে উপনিষদ্ বলেন ঃ

**ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং**
**নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।**
**তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং**
**তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।**[২২]

—সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্রও না, তারাও না, বিদ্যুৎও না, অগ্নির তো কথাই নেই। প্রত্যেকটি জিনিসই প্রকাশ পায় তাঁরই মহিমাকে প্রতিফলন করে। সারা বিশ্ব তাঁরই আলোকে বিভাসিত।

সর্বভূতের অন্তরে ইন্দ্রিয়াতীতের, সব ব্যক্তিত্বের অন্তরে নিত্যতত্ত্বের, বহুর ভেতরে একের উপলব্ধি করে তারা সকলকে ভালবাসে, সকলকে পূজা করে, সকলকে নিয়ে আনন্দ করে। তাদের কাছে আপেক্ষিক ভাব যেমন স্বাভাবিক, নিরপেক্ষ ভাবও তেমন। এই *সর্বগ্রাহী* আধ্যাত্মিক দর্শনের আভাস আমরা পাই

২১ শ্রীচৈতন্য, *শিক্ষাষ্টকম্*, ৫

২২ *মুণ্ডক উপনিষদ্*, ২/২/১০

শ্রীশঙ্করাচার্য রচিত স্তোত্র ও স্তুতিতে। এই মহান অদ্বৈতবাদী সাধক প্রতি বস্তুর পেছনে সেই এক সত্তাকেই দেখেন, যেমন দেখেন আপন আত্মার অন্তরে। তিনি এঁরই ধ্যান করেন ও উপলব্ধি করেন যেন তিনি ব্রহ্ম ছাড়া আর কেউ নন ঃ

**প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং**
**সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।**
**যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তমবৈতি নিত্যং**
**তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ ॥** [২৩]

—প্রাতে আমি আমার অন্তরে সেই স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মার সচ্চিদানন্দ নিরপেক্ষ তুরীয় সত্তার—শ্রেষ্ঠ ঋষিদের গতি স্বরূপের, ইন্দ্রিয়াতীত ও নিত্যের ধ্যান করি, যিনি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থার পারে রয়েছেন। আমি অবশ্যই সেই অখণ্ড ব্রহ্ম, বস্তু-সংগ্রহ নই।

শ্রীশঙ্কর একজন যথার্থ দ্রষ্টা পুরুষ, তিনি সকল দিব্য ভাবের মধ্যে একই ঈশ্বরতত্ত্বের অবস্থিতি স্বীকার করেন। গুরুর মধ্যে ঐ একই শাশ্বত অনন্ত সত্তাকে দেখে, তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেছেন ঃ

**বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং**
**পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।**
**যঃ সাক্ষাৎকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং**
**তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥** [২৪]

—আমি প্রণাম করি, সেই মঙ্গলময় সত্তাকে, যিনি গুরুমূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, যিনি মায়াশক্তির মাধ্যমে নিদ্রায় যেমন দেখা যায়—তেমন নিজ সত্তার অন্তরস্থ বিশ্বকে দেখাচ্ছেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর মতো বাস্তবরূপে; যিনি তাঁর প্রবুদ্ধ অবস্থায় আপন প্রকৃত সত্তা রূপে অদ্বৈত ব্রহ্মই উপলব্ধি করেন।

শঙ্করের কাছে শিব, বিষ্ণু ও অন্য সব দেব দেবী একই অনন্তের কথা বলেন, যা থেকে ঈঙ্গিত বস্তুর প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। শিবের কাছে তিনি নিবেদন করেন ঃ

**পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং,**
**নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।**
**যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং,**
**তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥** [২৫]

—আমি বন্দনা করি সেই প্রভুকে, একরূপ পরমাত্মাকে, বিশ্বের আদি বীজকে,

২৩ শ্রীশঙ্কর, প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্, ১
২৪ ঐ, দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রম্, ১
২৫ শ্রীশঙ্কর, বেদসার শিবস্তোত্রম্, ৫

কামনাশূন্য নিরাকার সত্তাকে, যাঁকে ওঙ্কার-প্রতীকের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, বিশ্ব যাঁর থেকে সৃষ্ট হয়, যাঁর দ্বারা পালিত হয়, যাঁতে লয় প্রাপ্ত হয়।

গভীর অনুভূতি নিয়ে তিনি বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করছেন ঃ

**অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।**
**ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ ॥** [২৬]

—হে সর্ব ব্যাপ্তিমান প্রভু, আপনি আমার অহংকার সরিয়ে দিন, আমার মনকে শান্ত করুন, বিষয়-তৃষ্ণার ভ্রম দূর করুন, সর্বভূতে আমার ভালবাসা আরো বাড়িয়ে দিন, সংসার সাগর থেকে আমায় উদ্ধার করুন।

তিনি আরো প্রার্থনা করে চললেন ঃ

**সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।**
**সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥** [২৭]

—তরঙ্গই সমুদ্রে লীন হয়ে যায়, সমুদ্র কখনো তরঙ্গে লীন হয় না। ঠিক তেমনি হে প্রভু, যখন সমস্ত ভেদ দূরীভূত হয়, তখন আমি তোমাতে হারিয়ে যাই, তুমি আমাতে হারাও না।

ঐ মহান অদ্বৈতবাদী দার্শনিকের হৃদয় মাতৃ স্নেহের আহ্বানে খুবই দরদের সঙ্গে সাড়া দেয়, ও তিনি নিজেকে সাধারণ ভক্তের স্তরে এনে করুণ ভাবে বলেন ঃ

**পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ**
**পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ।**
**মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে**
**কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥** [২৮]

—হে জননি, পৃথিবীতে তোমার বহু সুযোগ্য সন্তানের মধ্যে আমি হলাম একটি খেয়ালী চিত্তের নিদর্শন। তবু হে মঙ্গলময়ি, আমার মতো সন্তান তোমাকে ত্যাগ করলেও তোমার পক্ষে আমাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, কখনো কখনো কুপুত্র জন্মাতে পারে, কিন্তু কুমাতা তো কখনো নয়।

আর তাঁর কাছে মাতাই হলেন একমাত্র আশ্রয় ঃ

**ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং।**
**ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্ ॥**
**ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং।**
**গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥** [২৯]

---

২৬ শ্রীশঙ্কর, *বিষ্ণুষট্‌পদী*, ১ — ২৭ তদেব, ৩
২৮ শ্রীশঙ্কর, *দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্*, ৩ — ২৯ শ্রীশঙ্কর, *ভবান্যষ্টকম্*, ৩

—হে মাতঃ, আমি কোন দান করিনি, আমি কোন ধ্যান করিনি; আমি কোন আনুষ্ঠানিক যোগসাধনা করিনি; আমি কোন পবিত্র নামও জপ করিনি; আমি কোন পূজা করিনি; আমি উপযুক্ত ন্যাস মন্ত্রাদির সহায়ে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির শুচি বিধানও করিনি। অতএব হে বিশ্বজননি! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

কিন্তু মর্মস্পর্শী আবেগের সঙ্গে আশ্চর্য খেলা খেললেও, তাঁর কাছে ভগবতী জননী ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়, আর মানব ব্যক্তিত্ব হলেন তাঁরই প্রতিবিম্ব মাত্র। ক্রীড়াচ্ছলেই মাতা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ চরম জ্ঞানস্বরূপকে ঈশ্বর ও বিভিন্ন আত্মায় ভাগ করেছেন। এবং এই মাতৃসত্তাতেই তিনি (শঙ্কর) নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান ঃ

**কদা বা হৃষীকাণি সাম্যাং ভজেয়ুঃ**
**কদা বা ন শত্রুর্ন মিত্রং ভবানি।**
**কদা বা দুরাশাবিষূচীবিলোপঃ**
**কদা বা মনো মে সমূলং বিনশ্যেৎ ॥** [৩০]

—হে বিশ্বজননি! আমার ইন্দ্রিয়গুলি কবে সংযত হবে? কখন আমার শত্রু-মিত্র কিছুই থাকবে না? কখন আমি নানা মিথ্যা ও ভ্রান্ত আশা থেকে মুক্ত হব? কখন আমার মন সমূলে বিনাশ পাবে?

বাস্তবিক আমরা যদি হিন্দুদের স্তব ও প্রার্থনাগুলি বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা করি তবে আমরাও বৈদিক ঋষিদের সঙ্গে ঘোষণা করব ঃ 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি...'[৩১] —সত্য একটিই, মুনিঋষিরা তাকে নানা নামে ডাকেন। এই ভাবটিই খুব পরিষ্কার ও আন্তরিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে শিবমহিম্নঃ স্তোত্রের একটি শ্লোকে ঃ

**ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি**
**প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।**
**রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং**
**নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥** [৩২]

—বেদে, যোগশাস্ত্রে, শৈব ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে নানা পথ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কেউ একটিকে, কেউ বা অন্যটিকে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করে। ভক্তেরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা অনুযায়ী এই সব, সহজ বা কুটিল, নানা পথ অনুসরণ করে থাকে। তবু হে প্রভু, সমুদ্রই যেমন নদীগুলির একমাত্র গতি, তেমনি তুমিই সব মানুষের একমাত্র গতি।

---

৩০ শ্রীশঙ্কর, দেবী ভুজঙ্গপ্রয়াত স্তোত্রম্, ২০
৩১ ঋগ্বেদ, ১/১৬৪/৪৬
৩২ পুষ্পদন্ত, শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্, ৭

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সব রকম সাধনের ক্ষেত্রেই কোন না কোন রকম প্রার্থনা করা একটি অবশ্য কতর্ব্য। এতে ঈশ্বরের প্রতি জীবের আকুতি প্রকাশ পায়। সাধক নিজের প্রিয় দেবতার প্রতি যতটা প্রেম ও আকুতি অনুভব করে, ততটাই করতে পারে অনন্তের প্রতি। এ কেবল সাধকের মানসিক প্রবণতার প্রশ্ন। *ভক্তের* প্রার্থনায় বহিঃপ্রকাশ ও আবেগ বেশি। *জ্ঞানীর*—জ্ঞানান্বেষীর প্রার্থনা কথায় প্রকাশ না পেতে পারে, সে নীরব থাকতেও পারে। কিন্তু তার অন্তরের গভীর নীরবতাই এক রকম মহান আন্তর প্রার্থনা। কখনো কখনো আমরা দেখি, একই লোকের মধ্যে দু রকম ভাব পর্যায়ক্রমে আসা-যাওয়া করছে। যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো অতি-চেতনা উপলব্ধির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা। যারা নীরব প্রার্থনার মাধ্যমে এই ব্যাকুলতা রক্ষা করে চলতে পারে না, তারা মৌখিক প্রার্থনার সাহায্য নিতে পারে—যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আরো একটি বিশেষ কথা, প্রার্থনা জানাবার সময় আমরা যেন স্বার্থপর না হই। আমরা নিজেদের জন্য যেমন প্রার্থনা জানাই, ঠিক তেমনিই যেন অন্যের জন্যও প্রার্থনা জানাই। যারা তোমার কাছের, যারা তোমার প্রিয় তাদের জন্য প্রার্থনা জানাও। পরে যারা সৎ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য সাধন করছে, তাদের জন্যও প্রার্থনা কর। শেষে সব জায়গার সকল লোকের, সকল জীবের জন্য প্রার্থনা কর। দিকে দিকে কল্যাণময় প্রার্থনা বাক্য ছড়িয়ে দাও। তোমার কাছ থেকে চারিদিকে শান্তি ও কল্যাণময়ী বাণী ছড়িয়ে পড়ুক।

(স্বামী যতীশ্বরানন্দ আলোচনা সভায় বা বক্তৃতা মঞ্চে আবৃত্তি করতেন—এমন কয়েকটি প্রার্থনা ও ধ্যানের বিষয় নিচে তুলে দেওয়া হলো—সঃ)

**আসুন আমরা প্রণাম জানাই সেই সর্ব-ব্যাপ্ত, সর্ব কল্যাণময় সত্তার কাছে, যিনি আমাদের সকলের হৃদয়ের অন্তস্তলে রয়েছেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের প্রভু। তাঁকে উপলব্ধি করলে মানুষ ভয়ের পারে যায় ও শান্তিলাভ করে। তিনিই অস্তিত্বের পরম তত্ত্ব, পরম সত্য, পরম জ্যোতিঃ ও পরমাত্মা। সেই সর্বব্যাপ্ত, সর্ব কল্যাণময় দৈব সত্তা থেকেই আমাদের উদ্ভব, তাঁর মধ্যেই আমাদের জীবন ধারণ, তাঁতেই আমাদের ফিরে যাওয়া। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।**

**আসুন আমরা দেহ-মনকে আলগা দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে বসি। আসুন আমরা প্রণাম জানাই সেই পরম, সর্ব-ব্যাপ্ত সত্তাকে। তিনি যেন আমাদের বোধশক্তিকে পথ দেখান। আসুন আমরা প্রণাম জানাই সকল মহান আচার্যদের ও সন্তদের—যাঁদের শিক্ষার উত্তরাধিকার আমরা লাভ করেছি। তাঁরা যেন আমাদের মধ্যে সত্য-প্রীতি জাগিয়ে উৎসাহিত করেন।**

সেই পরম সত্তাই সকল পবিত্রতার উৎস। আসুন আমরা পবিত্রতার স্পন্দনেই শ্বাস গ্রহণ করি, আর তা যেন আমাদের সব অপবিত্রতা ধ্বংস করে দেয়; আমাদের নিঃশ্বাসে যেন পবিত্রতার স্পন্দনই বইতে থাকে। আসুন আমরা শক্তির স্পন্দনেই শ্বাস গ্রহণ করি, আর তা যেন আমাদের সকল দুর্বলতা নাশ করে; আমাদের নিঃশ্বাসে যেন শক্তির স্পন্দনই বইতে থাকে। আসুন আমরা শান্তির স্পন্দনেই শ্বাস গ্রহণ করি, আর তা যেন আমাদের সব অশান্তি দূর করে দেয়; আমাদের নিঃশ্বাসে যেন শান্তির স্পন্দন বইতে থাকে। আসুন আমরা পবিত্রতা, শক্তি ও শান্তির স্রোত বইয়ে দিই আমাদের সব সঙ্গী-সাথীদের দিকে; পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে। আসুন আমরা নিজেদের ও সারা জগৎকে নিয়ে শান্তিতে থাকি।

আসুন আমরা সাক্ষী বা দ্রষ্টার ভূমিকা নিই, আর মনকে সরিয়ে নি সব রকম বিক্ষেপ থেকে, শব্দ থেকে, ও অন্যান্য ঝঞ্ঝাট থেকে। আসুন আমরা আমাদের সরিয়ে নিই অন্তর থেকে স্ফুরিত সমস্ত চিন্তা, ছবি ও অনুভূতি থেকেও। আমরা যেন পূর্ণ জাগ্রত হই। আমাদের দেহ হলো দেবতার মন্দির। আসুন আমরা আমাদের চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করি আমাদের হৃদয় কন্দরে, আর সেখানে অনুভব করতে থাকি যে আমাদের আত্মা যেন একটি ছোট্ট আলোক-গোলক, আর সেই ছোট্ট আলোক-গোলকটি সেই সর্বত্র দীপ্তিমান অনন্ত চৈতন্যেরই অংশ। ঐ অনন্ত সত্তাই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন সূর্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে ও গ্রহে। ঐ অনন্ত চৈতন্যই সকল জীবের অন্তরে জ্যোতিষ্মান হয়ে আছেন। ঐ চৈতন্যই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন আমাদের চক্ষুতে, কর্ণে ও সকল ইন্দ্রিয়ে। ঐ দৈব চৈতন্যই জ্যোতিষ্মান হয়ে আছেন আমাদের মনে। ইনিই জ্যোতিষ্মান হয়ে আছেন আমাদের হৃদয়ে। আসুন আমরা সকলে তাঁর স্পর্শ অনুভব করি।

অদ্বৈতবাদী ঐ পরম চৈতন্যকে 'সৎ-চিৎ-আনন্দ', অনন্ত সত্তা-চেতনা-আনন্দ, রূপে ধ্যান করে। ভক্ত ঐ একই সত্তাকে পিতৃ-রূপী ঈশ্বর, মাতৃ-রূপী ঈশ্বর, বন্ধু-রূপী ঈশ্বর, প্রিয়তম-রূপী ঈশ্বর এই রকম নানারূপে উপাসনা করে। ঐ অনন্ত চৈতন্য নিজেকে প্রকাশ করেন বিভিন্ন মহান দেব-দেবীরূপে। তিনিই আবার, যেন পৃথিবীতে নেমে আসেন ভগবৎ অবতার-রূপে মানব জাতিকে আশীর্বাদ করতে। আমাদের ধ্যানের জন্য, আমাদের পছন্দমতো একটি বিষয় বস্তু আমরা বেছে নিতে পারি, কিন্তু যখন ধ্যান করতে থাকব, আমরা সকলে যেন অনুভব করি যে উপাসক ও উপাস্য উভয়েই এক 'সৎ-চিৎ-আনন্দে'—অনন্ত সত্তা-চেতনা-আনন্দে নিমগ্ন হয়ে আছে।

প্রকৃতপক্ষে এক অনন্ত সত্তাই একদিক থেকে ভক্তরূপে, আর অন্য দিক থেকে দেবতারূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। আমরা যেন হৃদয়ের অন্তরে দিব্য স্পর্শ

অনুভব করি, দিব্য অবস্থিতি যেন আমাদের স্নায়বিক উত্তেজনা উপশম করে, আমাদের মনকে স্থির করে হৃদয়কে শান্ত করে। দিব্য চৈতন্যই যেন আমাদের বোধশক্তিকে পথ দেখান ও আমাদের চেতনাকে উদ্দীপিত করেন।

আসুন আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাদের যে কোন পছন্দমতো সেই সর্বব্যাপ্ত সর্বানন্দময় চৈতন্যের যে কোন রূপের ধ্যান করি। কিন্তু যে ভাবেই হোক আমরা যেন দিব্য স্পর্শ অনুভব করি।

সেই সর্বব্যাপ্ত সর্বানন্দময় চৈতন্য, আমাদের আত্মার আত্মা যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করেন, তিনি যেন আমাদের পথ দেখান, তিনি যেন আমাদের সকলের পুষ্টি বিধান করেন। যে উপদেশ আমরা শিক্ষা করি তা যেন, তাঁর কৃপায়, ফলবতী ও বলবতী হয় আমাদের মধ্যে যেন শান্তি ও সমন্বয় বিরাজ করে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হে প্রভু, সব আধ্যাত্মিক পথই যেন নদীর মতো তোমার দিকে—সেই এক সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ সাগরের দিকে—এগিয়ে চলে।

হে প্রভু, তুমি আমাদের সকলের আত্মার আত্মা।

তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পিতা। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের সখা। তুমি আমাদের জ্ঞান। তুমি আমাদের সম্পদ। তুমি আমাদের সর্বস্ব।

তুমি আমাদের অসৎ থেকে সতের দিকে নিয়ে চল। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে চল। মরণ থেকে অমৃতত্বের দিকে নিয়ে চল।

আমাদের আত্মার গভীর অন্তরের ভেতর দিয়ে তুমি আমাদের কাছে এস, আর তোমার প্রেরণাদায়ী উপস্থিতির ফলে, আমাদের ওপর আরো বেশি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে তোমার দেখা পাই। আমরা যেন আমাদের সব সাথীদের অন্তরে তোমাকে পাই। আমরা যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি, আর সবার মধ্যে তোমার সেবা করতে পারি।

জগতে যেন শান্তি বিরাজ করে। সকলে যেন বিপদমুক্ত হয়। সকলের মধ্যে যেন শুভবুদ্ধির উদয় হয়। সকলে যেন মহৎ চিন্তার মাধ্যমে কর্ম প্রেরণা লাভ করে। সকলে যেন সর্বত্র সুখী হয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। *

---

* স্বামী যতীশ্বরানন্দের 'Universal Prayers' নামে পুস্তকে (মাদ্রাজ : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ১৯৭৪) আরো অনেক প্রার্থনা মন্ত্র পাওয়া যাবে।

# ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

# মরমী সাধনা

## সব ঈশ্বরকে নিবেদন কর

> যদ্ যদ্ ইষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
> তৎ তৎ নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ [১]

—যা যা সাধারণ লোকের কাছে সব থেকে লোভনীয় এবং যা কারো কাছে বিশেষ প্রিয়, সে সবই আমাকে নিবেদন করা উচিত, এই নিবেদন অনন্ত ফলদায়ক।

আমরা তাঁর কাছ থেকে যা পাই তা দিয়েই তাঁর পূজা করে থাকি। আমরা ফুল সৃষ্টি করি না, অগ্নিও সৃষ্টি করি না। এগুলি আমাদের হাতে আসে, আর আমরা যেভাবে সেগুলিকে ব্যবহার করি, তাতেই পার্থক্য এসে পড়ে। ভক্ত যা পায় সবই প্রভুকে নিবেদন করে। তাতে মজাটা কি? তাতে তুমি তোমার সত্তার বিস্তার সাধন কর। ঈশ্বর যা দেন তাই তাঁকে নিবেদন করে তুমি নিজে শুদ্ধ বোধ কর, আর তোমার সত্তা প্রসারতা লাভ করে ঈশ্বরের আশীর্বাদের আরো বেশি অংশকে অঙ্গীভূত করে। ঐ সব জিনিস তোমার নিজের বলে যত সরিয়ে রাখবে, তোমার সত্তা তত সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

ঈশ্বরকে সব কিছুই নিবেদন করা চলে : তোমার খাবার, নতুন জামা, গাড়ি, যা কিছু তুমি পাও। ব্যবহার করার আগে, মনে মনে সেটিকে প্রভুর কাছে নিবেদন করবে। একে একটি মন্ত্রপূত বস্তু বলে গ্রহণ করে, সাবধানে ব্যবহার করবে। এতে মন পবিত্র ও উন্নীত হয়। ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ শোধন কর্তা। যা কিছু তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাই পবিত্র হয়ে উঠবে। পবিত্রীকৃত বস্তু ব্যবহারে, আমরা নিজেদের কলুষমুক্ত করি, পবিত্র করি। আমাদের 'আশ্রম'গুলিতে, নতুন কোন গ্রন্থ বা আমন্ত্রণ লিপি ছাপা হলে তা প্রথমেই মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঈশ্বরকে নিবেদন করার পরেই সেগুলির বিতরণ আরম্ভ হয়। এটা ভাল অভ্যাস, বাড়িতে যা কিছু নতুন জিনিস কেনা হয়, সেগুলিকে তোমরা ঐভাবে নিবেদন করতে পার।

এই কাজ তেমন কিছু মহৎ না হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে এরকম শত

---

১ শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১১।৪১

শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের, শত শত নিবেদনের ফল কয়েক বছর ধরে সঞ্চিত হলে, তা সত্যিই বিরাট হয়। ক্রমেই, এক আত্ম-সমর্পণ ও অনাসক্তির ভাব আমাদের মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ করবে। বস্তুত অন্য কোনরূপে এই ভাব লাভ করা যায় না। আত্ম-সমর্পণের ভাব ও পবিত্রতা হঠাৎ আসে না। এগুলি এই সব শত শত ক্ষুদ্র কর্ম-ফলেরই সমষ্টি।

ভক্তিপথে, বিশেষত বৈষ্ণবদের মধ্যে সাধুসেবা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে সেবার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। ঈশ্বরকে সর্বস্ব অর্পণ করার পর তা নিজের জন্য ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। এ কাজ তোমাকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। কিন্তু তোমার আন্তরিকতার প্রমাণ কি? তুমি যে ঈশ্বরের উদ্দেশে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তা তুমি কি করে জানবে? এর একমাত্র প্রমাণ হলো, উৎসর্গব্রতে তোমার সদা প্রস্তুতি। ঈশ্বরের উদ্দেশে সর্বস্ব উৎসর্গ করতে তোমাকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। সেবাই হলো উৎসর্গ-ব্রত উদ্‌যাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়। স্বভাবত সেবা বলতে কোন রকম উৎসর্গকেই বোঝায়। যখন কোন ক্ষুধার্ত লোক তোমার কাছে আসে, তোমার খাবার থেকে তাকে কিছু দাও; যখন কোন দরিদ্র লোক তোমার কাছে আসে, তোমার অর্থসম্পদের কিছু অংশ তাকে দাও। তেমনি যারা পীড়িত, অজ্ঞ বা আর্ত তাদের জন্য তোমাকে কিছু সময়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শক্তি ইত্যাদি উৎসর্গ করতে হবে। প্রত্যেককে ঈশ্বরের মন্দিররূপে ভাবতে থাক। মানব-সেবার মাধ্যমে তুমি প্রভুর পূজাই করবে। এই মহান ভাবই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ দর্শনের পেছনে। যে দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত, তার কাছে আধ্যাত্মিকতার কথা বলে কোন ফল হবে না। তাকে প্রথমে খাদ্যই দেওয়া উচিত। এও প্রভুর পূজার একটি পথ। পুষ্প ও সুগন্ধ নিবেদন করাই পূজার একমাত্র পথ নয়।

আমরা যেন এক সমন্বয়ী ভাব, উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলি। আমাদের সীমিত অস্তিত্ব, সীমিত চেতনা, সীমিত উল্লাসের পেছনে এক অখণ্ড অনন্ত সত্তা রয়েছেন, যিনি প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন সত্তার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করছেন। তাঁকে সর্বস্ব অর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ পূজা। আমরা যদি এরকম পূজা করতে পারি, তবে কেবল নিম্ন স্তরের পূজায় সন্তুষ্ট থাকি কেন?

## উপাসনা বা মানস পূজা

ঈশ্বরকে স্থূল উপচার দিয়ে পূজা করা ছাড়া অন্য এক ধরনের পূজা আছে—মানস পূজা, যা বাস্তবিকই এক উচ্চ স্তরের পূজা। সংস্কৃত ভাষায় এর নাম *উপাসনা*.

এর আক্ষরিক অর্থ হলো (দেবতার) 'কাছে বসা'। কার্যত এর অর্থ 'ধ্যান' বা ঈশ্বরের 'চিন্তা'। এই রকম মানসপূজা দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের মূল অধ্যাত্ম সাধনা। এই দুই সাধন-পদ্ধতিতে ঈশ্বর আর জীবাত্মা দুটি পৃথক সত্তা। সাধক চেষ্টা করে এ দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠতার তারতম্য অনুযায়ী নানা ধরনের মিলন ঘটাতে; কিন্তু দেখে যে এ দু-এর বৈশিষ্ট্য যেন কখনই সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে না যায়। ভক্ত প্রথমে নিজে দাসরূপে থেকে ঈশ্বরকে প্রভুরূপে দেখে। উচ্চ পর্যায়ে, ভক্ত নিজে জীবাত্মারূপে থেকে ঈশ্বরকে সকল আত্মার আত্মা বা পরমাত্মারূপে দেখে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অদ্বৈতবাদের পথে যাবার একটি পদক্ষেপের কাজ করতে পারে।

যাদের স্বভাব নিরাকার ঈশ্বরের দিকে ঝোঁকে তাদের পক্ষে প্রথম প্রথম ব্রহ্ম বা পরম চৈতন্যকে সাগররূপে কল্পনা করা আর জীবাত্মাকে তরঙ্গরূপে দেখা সহায়ক হতে পারে। সে অবস্থায় জীবাত্মার 'আমিত্ব' পরম চৈতন্য থেকে স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র, কিন্তু বাস্তবে তার অস্তিত্ব কেবল মহাবিশ্বের সঙ্গে অণু-বিশ্বের সম্পর্কের মতো। সর্বদা তরঙ্গের ধ্যান না করে কেউ কেউ একাগ্রভাবে সাগরের ধ্যান করতে পারে। তরঙ্গ তার জলের উপাদানের সঙ্গে একাত্ম। সাগর নামে বিস্তৃত জলরাশি, আর তরঙ্গ নামে ক্ষুদ্র জলকণা—উভয় অবস্থাতেই জলের অস্তিত্বকে সনাক্ত করা যেতে পারে। সাধক অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হতে হতে শেষে উপলব্ধি করতে পারে যে জলই একমাত্র সদ্‌বস্তু, তরঙ্গ অসৎ। ব্যক্তি বিশেষ আর বিশ্বজনীন, অণু-বিশ্ব আর ব্রহ্মাণ্ড—এদের মধ্যে পার্থক্যটুকু হারিয়ে যায়, এবং নিরপেক্ষ গুণাতীত সত্য, *একমেবাদ্বিতীয়ম্‌*-ই কেবল বর্তমান থাকে।

অবশ্য, অধিকাংশ লোকের পক্ষে ঐ অবস্থা লাভ করা খুবই কঠিন। কারণ তাদের পক্ষে ধ্যানের জন্য পূজার উপযোগী কোন প্রতীকের প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা না হলে তাদের মন কেবল এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াবে। একাগ্রতা আনার সুবিধার জন্য কোন পবিত্র বস্তুকে প্রতীক বলে গ্রহণ করা হয়। কোন বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতীকরূপে গ্রহণ করে এ রকম পূজা করা ঈশ্বরের সাকারভাবের ভক্তদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত, যারা ঈশ্বরের নিরাকার ভাবের ধ্যান করে তাদের মধ্যেও। ঈশ্বরের পূজা প্রতীক রূপটিতে হয় না, হয় প্রতীকের 'মাধ্যমে'। যেহেতু, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'[১] এই সংজ্ঞা অনুযায়ী—ঈশ্বর হলেন পরম চৈতন্য, যাঁর থেকে সকল বস্তুর অস্তিত্ব সূচিত হয়, যাঁর দ্বারা সকল বস্তু পালিত হয় এবং যাঁতেই সব বস্তু সংহৃত হয়—তাই একরকমভাবে যে কোন বস্তুই ঈশ্বরের প্রতীক হবার যোগ্য। কিন্তু বিশ্বের ধর্মগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে কতকগুলি প্রতীককে বিশেষরূপে পবিত্র বলে চিহ্নিত করেছেন।

---

১ ব্রহ্মসূত্র, ১ ১ ২

সূর্য বিশ্বশক্তির উৎসরূপে, আলোক ও উত্তাপরূপে, ঈশ্বরের একটি উপযুক্ত প্রতীক, আর এক সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে সূর্য উপাসনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা ও জরথুস্ত্রীয়রা অগ্নিকে ঈশ্বরের প্রতীক রূপে উপাসনা করে। বেদে অগ্নিকে মর্তবাসীর মধ্যে বসবাসকারী অমর সত্তা বলা হয়েছে, আবার তাঁকে 'দেবতাদের মুখ' স্বরূপও বলা হয়েছে—যাঁর মাধ্যমে দেবতারা তাদের উদ্দেশে অর্পিত আহুতি গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আমরা যেন সব সময়ে মনে রাখি যে প্রতীক কখনো ঈশ্বর *নন*। ধ্যানে যেন আমরা অবশ্যই কেবল অগ্নিকে অথবা সূর্যকে না দেখে, তার পারে দৃষ্টিপ্রসার করি ও দেখি সেই শাশ্বত স্বয়ং জ্যোতিঃকে—প্রতীকগুলি যাঁর এক একটি অভিব্যক্তি মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম, স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন ঃ

'বিভিন্নরূপে উপাসনা করার ঝোঁক মানুষের রয়েছে। নানা ধরনের মানব-প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করতে শাস্ত্র, ঈশ্বর লাভের জন্য চারটি স্বতন্ত্র পথের কথা বলেছেন। একটি হলো আনুষ্ঠানিক পূজা—যথা মূর্তি বা প্রতীক অবলম্বন করে ঈশ্বরের পূজা। এর থেকে উচ্চতর পথ হলো, প্রার্থনা ও *জপের* সাহায্যে ঈশ্বরের পূজা। সাধক ইষ্টের তেজোময় মূর্তি ধ্যান করে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে ও *জপ* করে। আরো উচ্চতর পথ হলো ধ্যান। ঈশ্বর-মুখী চিন্তাধারা সর্বদা চালিয়ে যাওয়া। যখন মানুষ এই সাধন পথে চলতে থাকে, সে ইষ্ট দেবতার চিন্ময় উপস্থিতির ভাবে বিভোর হয়ে থাকে। এখানে প্রার্থনাও নেই জপও নেই। কিন্তু দ্বৈতভাব থাকে। তিনি 'আছেন', আর আমিও 'আছি'। উচ্চতম পথ, যা সরাসরি ঈশ্বরের দিকে ও তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়, তা হলো আত্মার (জীবাত্মার) সঙ্গে ব্রহ্মের (পরমাত্মার) একত্বের ধ্যান করা; অনুক্ষণ ব্রহ্মভাবে থাকা, সর্বদা এই জ্ঞান থাকা যে তিনি 'রয়েছেন'। এ হলো সর্বব্যাপ্ত সত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। এই সব স্তরের ভেতর দিয়েই সাধকের অগ্রগতি হয়। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকেই মানুষকে যাত্রা শুরু করতে হবে।'[৩]

একটি সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

**উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।**
**স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বহিঃপূজাধমাধমা ॥**[৪]

—উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপাসনা হলো ব্রহ্ম চৈতন্য উপলব্ধিতে অভ্যস্ত হওয়া। এক ধাপ নেমে ধ্যান। স্তুতিগান করা ও ঈশ্বরের নাম জপ—নিচের দিকে তৃতীয় ধাপ। সর্বশেষে হলো প্রতিমায় বাহ্য পূজা।

---

৩ স্বামী প্রভবানন্দ, *The Eternal Companion*, Madras : 1971

৪ *মহানির্বাণ তন্ত্র*, ১৪/১২২

অন্য একটি শ্লোক অনুযায়ী ঃ

**প্রথমা প্রতিমা-পূজা জপস্তোত্রাদি মধ্যমা।**
**উত্তমা মানসী পূজা সোঽহং পূজোত্তমোত্তমা ॥** [৫]

—প্রতিমা পূজা প্রথম ধাপ; এর থেকে ভাল হলো—নাম-জপ ও ঈশ্বরের নাম-গুণ গান। আরো ভাল হলো—ধ্যান বা মানসচিন্তা, আর শেষ ও উচ্চতম অবস্থা হলো 'আমিই তিনি' এরূপ উপলব্ধি করা।

উত্তর-গীতার একটি শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ 'দ্বিজ যাজক ঈশ্বরের উপাসনা করে অগ্নিতে। ধ্যানী পুরুষ অন্তর্নিহিত আত্মারূপে তাঁর স্তুতি করে। জড় বুদ্ধি সাধক তাঁর পূজা করে প্রতিমার সাহায্যে। সমদর্শী প্রবুদ্ধাত্মা তাঁকে সর্বত্র দেখতে পায়।'[৬]

উন্নত সাধকেরা বাহ্য প্রতীকের কথা ভাবেই না; তারা দেবতার ধ্যান করে, পরিব্যাপ্তরূপে, নিজ নিজ অন্তরে অধিষ্ঠিত আছেন এই ভাবে। স্থূলবুদ্ধি লোক অধ্যাত্মজীবন আরম্ভ মাত্র করতে পারে দেবতাকে প্রতীকের সাহায্যে উপাসনা করে, সেটি যেন তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে টাঙ্গিয়ে রাখার একটি পেরেক। এদিকে প্রবুদ্ধ সাধকের পক্ষে প্রতীকের প্রয়োজনই হয় না, কারণ তারা দৈব সত্তাকে একই সময়ে ভেতরে ও বাইরে, পরিব্যাপ্ত ও জ্ঞানাতীত, বলে ধারণা করে।

অদ্বৈত নিরপেক্ষ সত্তায় লীন হয়ে যাওয়াই অদ্বৈত অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য। এ অবস্থায় পৌঁছনো যায় চরম সত্যের, তথা সতত-পরিবর্তনশীল বিশ্ব-প্রপঞ্চের অপরিবর্তনীয় ভিত্তির অনুসন্ধানে নিজ চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আপসহীন বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। যারা এই পথে চলে, তারা চরম পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে, আত্মার সমস্ত বন্ধন অস্বীকার করে এবং তারই মাধ্যমে চরম সত্যে পৌঁছে যায়। এই পথ, যা *নিদিধ্যাসন* নামে প্রসিদ্ধ তা হলো এক ধরনের (বহির্বিষয় থেকে) প্রত্যাহার অথবা নিজ সত্তার গভীরে অন্বেষণ।

জীবাত্মা ও পরম চৈতন্যের একত্বভাবে পৌঁছবার জন্যে অল্পগুণসম্পন্ন অধ্যাত্ম সাধক *অহংগ্রহ উপাসনা* করতে পারে, যে উপাসনায় সাধক নিজের ও উপাস্যের—ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের বা কোন বিশেষ দেবতার—একত্ব ভাবনা করে নিজ সত্তারই ধ্যান করে। সাধক ও সাধ্য দেবতার একত্ব ধ্যান করতে করতে অদ্বৈত তত্ত্বের উপলব্ধি হতে পারে।

## প্রতীকের মাধ্যমে সাধনা

যারা এই পদ্ধতিকেও কঠিন মনে করে, তাদের জন্য *প্রতীকোপাসনা* বা কোন

---

৫ [illegible]

৬ উত্তর গীতা, ৩/৭

উপযুক্ত প্রতীক অবলম্বন করে উপাসনা বিহিত আছে। এ ক্ষেত্রে দেবতা প্রতীকরূপে পূজিত হন না, প্রতীকের *মাধ্যমে* পূজিত হন। উদ্দেশ্য হলো সীমিত প্রতীকের মধ্যে নামরূপের সব রকম সীমার অতীত সর্বব্যাপ্ত সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন মন্তব্য করেছেন : 'যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য, *প্রতীক* কেবল তার প্রতিনিধিস্বরূপ।'[৭] *প্রতীক* অন্তর্নিহিত হতে পারে যেমন, মন, বুদ্ধি বা সাধকের সত্তা অথবা বহির্ব্যক্ত হতে পারে; যেমন সূর্য, *আকাশ* (স্থান), অগ্নি (আগুন) বা ওঁ-কারের মতো শব্দ প্রতীক প্রভৃতি। নিয়ম অনুসারে ধ্যান করে যেতে পারলে এই আত্মাই শেষ পর্যন্ত অন্তর ও বহিঃ দুই স্তরের অবস্থিতিতে ব্যাপ্ত ও তদতীতরূপে উপলব্ধ হন।

যারা উপাসনার উপরোক্ত প্রতীকগুলিকেও অত্যন্ত ভাবমূলক ও দুর্বোধ্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে উচিত হবে কোন *প্রতিমার বা মানবরূপী* মূর্তির ব্যবহার। এখানেও পরিষ্কারভাবে বুঝে রাখা চাই যে ঐ মূর্তিকে ঈশ্বরের বা পরম চৈতন্যের প্রতীকরূপেই উপাসনা করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেন : 'যদি প্রতিমা কোন দেবতা বা সাধুসন্তের সূচক হয়, তাহলে সেরূপ উপাসনাকে ভক্তি বলা যাবে না, সুতরাং তা থেকে মুক্তি লাভ হবে না। কিন্তু তা সেই এক ঈশ্বরের সূচক হলে, তার উপাসনায় ভক্তি ও মুক্তি—উভয়ই লাভ হয়।'[৮]

ভারতে দুর্গার বা গণেশের বাৎসরিক পূজা মাটির প্রতিমায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। উৎসবাদির শেষে মূর্তিগুলিকে নদীতে বা হ্রদে বিসর্জন দেওয়া হয়। এক সময়ে, দক্ষিণেশ্বরের বিশাল কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রানী রাসমণির জামাতা, মথুর বাৎসরিক দুর্গাপূজার পর প্রতিমাটিকে বিদায় দিতে খুবই কষ্ট বোধ করেছিলেন। যে মূর্তিটিকে তিনি কয়েকদিন ধরে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে পূজা করেছেন, তাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ভেবে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। কেউ যেন প্রতিমাটিকে না নড়ায়, এই হুকুম দিয়ে তিনি অধীর বালকের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও কর্মচারীরা সাহায্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে মথুরকে বললেন : 'মা কি কেবল ঐ প্রতিমাতেই রয়েছেন? তোমার হৃদয়ই তো তাঁর চিরন্তন আবাস, তাঁকে সেখানে অধিষ্ঠিত করে তাঁর মাটির প্রতিমাটি ফেলে দাও না কেন?' ঈশ্বরী মাতা চিরকালই তাঁর হৃদয়ে রয়েছেন, এ চিন্তা যেমনি মথুরের মনে উঠল, তিনি তখনই তাঁর স্বাভাবিক সত্তা ফিরে পেলেন, আর বিসর্জনের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল।[৯] এই সামান্য ঘটনাতেই হিন্দুর প্রতিমা-পূজার প্রকৃত ভাবটি প্রকাশ পায়।

---

৭ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০    ৮ তদেব, পৃঃ ৪০

৯ স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, প্রথমভাগ, ৩য় খণ্ড, গুরুভাব (পূর্বার্ধ), সপ্তম অধ্যায়, ৪৬১-৬২, (সপ্তর্ষি, কলকাতা, ১৩৯০)

ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁর বহুভাব। যেহেতু, তাঁর পূর্ণাঙ্গভাবে ও মহিমায় তাঁকে উপাসনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আমরা প্রভুর কোন বিশেষ একটি ভাব বা অপর কোন ভাব আশ্রয় করে থাকি। কিন্তু, এমনকি শিব বা বিষ্ণু বা দৈবশক্তি রূপ তাঁর কোন একটি সাকার ভাব অবলম্বন করে তাঁর কাছে পৌঁছতে গেলেও আমাদের বিভিন্ন—স্থূল, বাচনিক বা মানসিক—প্রতীকের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় এবং তার জন্য এককভাবে একটি বা যুক্তভাবে একাধিক প্রতীক গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতীকই প্রকৃত সত্তা নয়। ওটি কেবল ভাব অবলম্বনে তাঁকে স্মরণ করবার একটি উপায় মাত্র।

অধ্যাত্ম জীবনে যে সবেমাত্র দীক্ষিত হয়েছে সে দেব-প্রতিমা বা *যন্ত্রের* (আদর্শের প্রতিরূপ নকশার) মতো স্থূল প্রতীকের সহায়তা নিতে পারে। সাধনায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে স্থূল সহায়তা ছেড়ে দিয়ে দিব্যভাব জাগিয়ে তুলতে শব্দ প্রতীক ব্যবহার করতে পারে। আরো অগ্রসর হলে, সে স্থূল ও বাচনিক দু-রকম প্রতীকই সরিয়ে দিয়ে, শান্তভাবে ধীরে ধীরে মননের স্তরে শুদ্ধ মানসিক উপাসনার পথে এগিয়ে চলতে পারে। আর একেও সে ছেড়ে দিতে পারে, যখন দিব্য চিন্তা মাত্রই, সে—নুনের পুতুলের মতো—তার নিজ ক্ষুদ্র সত্তাকে হারিয়ে ফেলে অনন্ত অস্তিত্বের সাগরে, যেখানে উপাসক আর উপাস্যের মাঝখানকার সব রকম স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

আমাদের দৃষ্টি সীমিত; আর আমরা যা কিছু দেখি তাও এই সীমার দ্বারা রঞ্জিত। আমরা যা দেখি তা আলোকের স্বরূপ নয়, আলোকের প্রতিফলন মাত্র, আর তাও একটা নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে। আমাদের বোধশক্তিও গণ্ডিবদ্ধ। আমরা চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা যা জানি, তা জানতে পারি আমাদের মন-উপাধির সীমার মাধ্যমে, শঙ্করাচার্য কথিত '*কাল*' '*দেশ*' ও '*নিমিত্ত*' এর মাধ্যমে। প্রত্যেকটি অনুভূতি মন, তার তরঙ্গ আর ছবি দিয়ে অনুরঞ্জিত করে রাখে। সংক্ষেপে, আমরা প্রতীকের রাজ্যে বদ্ধ হয়ে আছি, যে প্রতীক সত্যের দিকে সঙ্কেত করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে লুকিয়েও রাখে।

যাই হোক, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে নানা প্রতীক রয়েছে, আসল প্রতীক আবার নকল প্রতীক। মরীচিকা দেখতে জলের মতো, কিন্তু সেটি এক ভ্রান্তি-সৃজনকারী ব্যাপার, যার সঙ্গে জলের কোন সম্পর্ক নেই; অথচ তরঙ্গকে সমুদ্রের একটি আসল প্রতীক বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে, কারণ এটি সমুদ্র থেকেই *ওঠে*, সমুদ্রের সংস্পর্শে থাকে, আবার সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যায়। সমুদ্র যে পদার্থে গড়া, তরঙ্গও সেই জল নামক পদার্থ দিয়েই গড়া।

আবার নিম্নতর ও উচ্চতর প্রতীক আছে। একটি বাক্যের অক্ষরগুলি নামের শব্দ প্রতীক, তা আবার মনের ভাব মূর্তির প্রতীক, ভাবমূর্তি নিজেই চিন্তা প্রণালীর প্রতীক, এমনকি চিন্তাও সেই সত্য বস্তুর প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যাকে সে প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু তা কেবল ঐ রকম পরোক্ষভাবেই পারে। সত্য বস্তু আর তার প্রকাশের মাঝখানে অনেকগুলি প্রতীকী ব্যবস্থার আড়াল থাকে। ভারত বহুকাল পূর্বেই এই গভীর রহস্য বুঝেছিল। সেইজন্যই ভারতে নানা প্রতীক পূজাকে গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের সংস্কার বিধানও করা হয়েছে। প্রবুদ্ধ ঋষিরা সব আড়াল কেটে গভীরে প্রবেশ করেছেন—একেবারে সেই সত্যবস্তুর সারটুকুর কাছে—এবং পদচিহ্ন রেখে গেছেন, নিম্ন অধিকারী সাধকেরা যাতে সেই পদচিহ্ন ধরে তাঁদের অনুসরণ করতে পারে।

হিন্দুধর্মে প্রতীক ও ঈশ্বরের সাকার উপাসনার এলাকাটি বহু বিস্তৃত, তাই এখানে কেবল কয়েকটি প্রতীক ও ঈশ্বরের সাকারমূর্তি নিয়ে আলোচনা করব—যেগুলি বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ঈশ্বরকে কোন না কোন ভাবে উপলব্ধি করার জন্য পূজায় ও ধ্যানে ব্যবহৃত বা পূজিত হয়ে থাকে।

## হিন্দুদের কয়েকটি ধর্মীয় প্রতীক

শিব পূজিত হয়ে থাকেন মূর্তিতে অথবা *লিঙ্গের* আকারে কোন বস্তুতে—যার আদি তাৎপর্য কিছু থাকলেও তা শিবপূজকের মনে পুরুষাঙ্গ-সংক্রান্ত কোন চিন্তার উদ্রেক করে না। তাদের কাছে, *লিঙ্গটি* পরম চৈতন্যের—নর বা পশু সম্বন্ধীয় নয় এমন কোন রকম প্রতীক মাত্র—যিনি নানা রূপে মূর্ত হলেও সর্বরূপাতীত। তান্ত্রিক ভক্তরা *লিঙ্গকে* ঈশ্বরীয় স্ত্রী-পুরুষরূপী সৃষ্টি-শক্তির প্রতীক রূপে দেখে। শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত আর একটি মনুষ্যেতর প্রতীক, যে বিষ্ণু প্রায়ই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তিতে অথবা রাম, কৃষ্ণ, প্রভৃতি রূপধারী তাঁরই ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত হয়ে থাকেন। তান্ত্রিক উপাসকরা এবং অন্যেরাও, কখনো কখনো, দেবতাকে দিব্য সত্তার ভাবমূর্তির প্রতীকরূপ যন্ত্র বা জ্যামিতিক নক্শার মাধ্যমে উপাসনা করেন। কখনো কখনো ত্রি-মাত্রিক মূর্তির পরিবর্তে *পট* বা দ্বি-মাত্রিক রঙিন চিত্র বা ছবি (গ্রীক চার্চের 'আইকন' বা মূর্তি) অবলম্বনে দেবতাকে আহ্বান করা হয়। অনেক রকম গুহ্য পূজায় নিরাকার সর্বানুস্যূত সত্তার প্রতীকরূপে একটি জলপূর্ণ *ঘট* (পাত্র) ব্যবহৃত হয়, এককভাবে অথবা অন্যমূর্তির সঙ্গে। অন্য সব প্রতীকের মধ্যে *অগ্নি* বা আগুনও একটি প্রতীক হতে পারে। প্রজ্বলিত অগ্নিকে ঈশ্বরের শরীর জ্ঞানে, তাতেই নৈবেদ্য ও ঘৃতাদি উৎসর্গ করা হয়।

নানা সূক্ষ্ম উপাসনায় একটি *মন্ত্র* যেমন ওঁ বা কোন ঈশ্বরীয় নামই প্রতীকের স্থান নেয়। আক্ষরিক ভাবে *মন্ত্র* হলো 'একটি শব্দ-প্রতীক, যার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে ও মননে জীবাত্মার বন্ধন মুক্তি হয়।'[১০]

শব্দ প্রতীক হিসাবে, ওঁ হলো অব্যক্ত বা অখণ্ড ব্রহ্মের প্রতীক, অন্য সব *মন্ত্র* বা নাম একই ব্রহ্মের ব্যক্ত বা 'খণ্ড' প্রতীক। ভিন্ন ভিন্ন তান্ত্রিক দেবতার উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ *বীজমন্ত্র* নির্দিষ্ট আছে, যেগুলির ধ্যানমগ্ন ভক্তের সামনে নিজ নিজ ঈশ্বরীয় রূপ বা অভিব্যক্তির সৃষ্টি বা উদ্ভাবন ঘটাবার শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

পবিত্র নামগুলি ভগবৎ শক্তির শাব্দিক প্রকাশ, *জপ* বা পুনঃপুনঃ মন্ত্রোচ্চারণ ও তার অর্থ বোধের মাধ্যমে ঐ শক্তি ভক্তের মধ্যে জেগে ওঠে। শ্রীচৈতন্য বলেছেন, 'হে প্রভু, আপনার নানা নাম, তার প্রত্যেকটিতে আপনার পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করে রেখেছেন'—'নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা।'[১১] দেবতার বহু নাম, সেগুলি তাঁরই নানাভাবের প্রতীক—যা উপলব্ধ হয় *জপের* মাধ্যমে। একই ঈশ্বরের বহু নাম ব্যবহারের প্রথা বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসছে।

আমরা যখন একজন যীশুখ্রীস্ট, একজন চৈতন্য বা একজন রামকৃষ্ণের জীবন পর্যালোচনা করি, আমরা দেখি যে তাঁদের সকলের কাছেই ঈশ্বরই ছিলেন চরম সত্য। তাঁদের জীবনে ঈশ্বরই ছিলেন কেন্দ্রীয় বস্তু; আর অন্য সব বস্তুই তাঁর অধীন। তুমি ঈশ্বরের যে কোন প্রতীক গ্রহণ করতে পার, ঈশ্বরের সঙ্গে যে কোন সম্পর্ক পাতাতে পার—তুমি তাঁকে তোমার পিতা, মাতা, সন্তান, বন্ধু বা প্রেমাস্পদ রূপে দেখতে পার—কিন্তু সব সময়ে তাঁকেই তোমার নিকটতম ও প্রিয়তম করে নেবে। প্রেমের গভীরতার ওপরই সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যেমন প্রকাশ পেয়েছে এই সুপরিচিত শ্লোকে :

> **ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।**
> **ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥**[১২]

—হে পরম প্রভু, তুমি আমার পিতা, মাতা; তুমি আমার আত্মীয়, আমার বন্ধু; তুমি আমার বিদ্যা ও সম্পদ; হে দেবদেব, তুমিই আমার সব কিছু।

## পূজার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি

অনেক লোক আছে, যারা অধ্যাত্মভাবে যথেষ্ট উন্নত হবার আগেই পূজানুষ্ঠানাদি ত্যাগ করে। এটা অত্যন্ত ভুল, ঠিক যেমন মূর্তিপূজার প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে ওঠার

১০ মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ  ১১ শিক্ষাষ্টকম্, ২  ১২ প্রপন্নগীতা, ২৮

আগেই তা বর্জন করা একটা ভুল। যারা মূর্তিপূজা করে তাদের কখনই খাট করবে না। মূর্তিপূজায় এক মহান সত্য নিহিত আছে, আর প্রোটেস্টান্টরা সেটিকে অস্বীকার করে খুব ভুল করে। তারা আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক জীবনের কিছু জানে না। পবিত্র মূর্তিতে বিষয়-প্রকাশক ও আত্ম-প্রকাশক দুটি ভাব-ই আছে। রোমান ক্যাথলিকদের বিভিন্ন মূর্তি পূজার পেছনে এই ভাবই রয়েছে, যদিও সেগুলি শত শত বছর ধরে ধর্মতত্ত্ববিদদের হাতে থেকে বিকৃত হয়ে গেছে। যদি আমরা কেবল তত্ত্ব আলোচনাতে আবদ্ধ না থেকে সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে চাই, তবে আমাদের প্রায় সকলের পক্ষেই স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন রকম মূর্তি পূজার একান্ত প্রয়োজন।

যদি দেখি যে মূর্তিপূজাতেই আমাদের জীবনের সবটাই কেটে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে যে কোথাও কোন গুরুতর ত্রুটি আছে। আমাদের সব সময়ে দেখা উচিত, *সাধনার* ফলে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে কি না। গোড়ায় গোড়ায় বাহ্য পূজাতে আমাদের সকলেরই উপকার হতে পারে। কোন কোন লোক পূজানুষ্ঠানে খুবই দক্ষ এবং এতে খুব আনন্দ পায়। কিন্তু সারা জীবনই কেবল বাহ্যপূজাতেই কাটিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আগে অথবা পরে, বাহ্য পূজা যেন আমাদের অন্তঃপূজার দিকে নিয়ে যায়। আমরা যেন কস্তুরী মৃগের মতো না হই। তার নাভিতেই কস্তুরী রয়েছে, কিন্তু সে কেবল ছুটে বেড়ায় ঐ মিষ্ট গন্ধের উৎস সন্ধানে, শেষে মৃত্যু বরণ করে। তেমনি যে ঈশ্বরকে আমরা খুঁজে বেড়াই তিনি চিরকালই আমাদের হৃদয়েই রয়েছেন, কিন্তু আমরা তাঁকে খুঁজে বেড়াই বাইরে।

আমরা নিজেরাই নিজেদের ঈশ্বর বা দেবতাদের সর্বদা সৃষ্টি করে চলেছি। আমরা ভগবান মহাদেবের মূর্তি গড়তে চেষ্টা করি এবং দেখি সেটি যেন হয়ে গেছে এক বিশ্রী বানরের মূর্তি। আমরা প্রকৃত ভাবটি যদি না জানি, আর কি করে তাকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে তাও যদি না জানি, তবে আমাদের সব কিছুই বিশ্রী বানরের মতো হয়ে দাঁড়াবে। এটিই বিপদ।

> **যে সিদ্ধিলাভ করেছে, তার পক্ষে মূর্তিপূজা বাধাস্বরূপ এবং পুনর্জন্মের কারণ স্বরূপ। তাই ত্যাগী মানুষের পক্ষে নিজ হৃদয়স্থ ঈশ্বরের উপাসনাই শ্রেয়ঃ। তার পক্ষে সব রকম বাহ্য পূজা ত্যাগ করাই কর্তব্য।**[১৩]

এ কথাগুলি উন্নত সাধকের উদ্দেশে বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে সকলকেই মূর্তি পূজা ছেড়ে দিতে হবে, আর সাধনার শুরুতে একেবারে নিরাকারের ধ্যান করতে থাকবে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, নিজ সত্তার মধ্যেই ঈশ্বরের

---

১৩ *মৈত্রেয়ী উপনিষদ্* - ২.২৬

খোঁজ করা, নিজ হৃদয়ের অন্তস্তলে। অধ্যাত্ম জীবন ঠিক সিঁড়ির মতো। আমাদের অবশ্যই ধাপে ধাপে এগুতে হবে। আমরা কোথায় আছি, প্রথমে আমাদের তাই জানতে হবে, তা না হলে পথে এগুনো সম্ভব নয়। গোড়ায় আমরা বাহ্যপূজা করতে পারি, যেমন মন্দিরে যাওয়া ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের ক্রমে বেশি বেশি অন্তর্মুখী হতে হবে ও ঈশ্বরকে তাঁর প্রকৃত আবাসে, নিজ সত্তার মাঝে খুঁজতে হবে।

## এই শরীর দেব-মন্দির স্বরূপ

একটি ছোট উপনিষদে বলা হয়েছে, 'আমাদের শরীরই একটি দেব-মন্দির'— 'দেহো দেবালয়ঃ'।[১৪] 'কঠ উপনিষদ্' এই ভাবটিকে একটি মনোমুগ্ধকর উপমা দিয়ে প্রকাশ করেছে ঃ

**আত্মানং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেব তু ...।**

—তোমার মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন তাঁকেই রথস্বামী, আর শরীরকে রথ বলে জানবে।[১৫]

ঈশ্বরকে অগ্নি ও জলের মতো উপাদানে, উদ্ভিদ ও পশুর মধ্যে অথবা মাটি, পাথর ও ধাতুর তৈরি মূর্তিতে পূজা করার পরিবর্তে আমরা তাঁকে মানব-দেহরূপী মূর্তিতে পূজা করতে পারি, শরীরকে ঈশ্বরের মন্দির বা রথ বা আবাস মনে করে, যেখানে তিনি থাকেন ও আমাদের সকলের হৃদয় আলোকিত করেন। অণু-বিশ্বে সর্বব্যাপ্ত ঈশ্বরের উপাসনা করে, তিনি যে ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত আছেন আমরা তাও উপলব্ধি করতে পারি—কারণ অণু-বিশ্ব তো ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ।

কিন্তু যদি ঈশ্বর তত্ত্বের পরিবর্তে, ঐ প্রতীক বা মূর্তি বা ব্যক্তিত্বই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে তবে ঐ পূজা আধ্যাত্মিক মূল্য হারিয়ে ফেলে। অতএব পূজা ও প্রার্থনা থেকে সুফল পেতে হলে, আমাদের ঠিক ঠিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা প্রয়োজন, তা ছাড়া আধ্যাত্মিক অগ্রগতি একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু ঠিক ঠিক মনোভাব কিভাবে গড়ে তুলতে হবে? তন্ত্রশাস্ত্রে বলা আছে যে, নিম্নস্তরের চিন্তার নিয়ন্ত্রণে এটি সম্ভব, আর তা করা যায় নিজ আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাগুলির ক্রম উপলব্ধির মাধ্যমে। মেরুদণ্ডের ছটি যোগ-কেন্দ্রের ও মস্তিষ্কস্থ সপ্তম কেন্দ্রের— সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাস্তরকে একটি বাড়ির ভিন্ন ভিন্ন তলার সঙ্গে তুলনা করা যায়—যারা সিঁড়ি দিয়ে যুক্ত। কেন্দ্রগুলি যেন আমাদের আর নানা চেতনাস্তরের মধ্যে এক একটি সংযোগ বিন্দু।

অধ্যাত্ম সাধনার পথ, যা ধরে চেতনাকে একটি কেন্দ্র থেকে পরের কেন্দ্রে তুলতে

১৪ স্কন্দ ২.১

১৫ কঠোপনিষদ্ ১.৩.৩

তুলতে উচ্চতম স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়, তা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু যে সব সাধক ধ্যানের পথ অনুসরণ করতে চায়, তাদের প্রত্যেককেই 'ইচ্ছা-কেন্দ্র' বা 'চেতনা-কেন্দ্রকে' অন্তত হৃদয়দেশস্থ কেন্দ্র পর্যন্ত তুলতে চেষ্টা করতে হবে। এই কেন্দ্রটিকে 'অন্তরাকাশে'র তুল্যও বলা হয়ে থাকে। কেউ হৃদয়কে তাদের চেতনার কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা সহজ মনে করে, কেউ বা ললাটদেশকে। (ভ্রূমধ্যগত দেশ)

যারা কোন বিশেষ প্রতীক বা মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট নয়, তারা চেতনার কোন উচ্চতর কেন্দ্রে বা স্তরে দিব্য জ্যোতির ধ্যান করতে পারে—যে জ্যোতি কেবল নিজ সত্তায় নয়, মনুষ্য ও পদার্থ সমন্বিত সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যাই হোক, যে সাধকের কোন সাকার প্রতীক ছাড়া উপায় নেই, সে কোন জ্যোতির্ময় মূর্তির ধ্যান করতে পারে—যা তাকে সেই নিরাকার জ্যোতি—সেই সর্ববস্তু বিভাসক চৈতন্য জ্যোতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আত্মা কারণ শরীর দিয়ে ঢাকা, তা আবার মনোময় শরীর দিয়ে ঢাকা এবং তাও ঢাকা জড় শরীর দিয়ে। কারণ, মনোময় ও জড় এই তিনটি শরীরই কলঙ্কিত। কারণ শরীর আদি অজ্ঞানের দ্বারা দূষিত। মনোময় শরীর আমাদের প্রবৃত্তি ও আবেগে দূষিত। জড় শরীর এবং তার সাথে মনোময় শরীরও, স্বার্থপর বাসনাযুক্ত অসঙ্গত অহংবোধের দ্বারা দূষিত। অসঙ্গত অহংই মনকে ব্যাধিগ্রস্ত করে; ব্যাধিগ্রস্ত মন ভোগেন্দ্রিয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, আর তারা দুজনেই দেহের ক্রিয়ায় গোলযোগ সৃষ্টি করে—একথা যে সত্য তা সর্বাধুনিক মনোবিজ্ঞান প্রতিদিন প্রমাণ করছেন। যাই হোক এই অসঙ্গতির প্রতিকার আছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম সব রকম শরীরকে একসঙ্গে তাদের উৎপত্তি স্থলে নিয়ে চল। আমরা এই চরম সত্যকে ভুলে যাই যে, ঈশ্বরের অন্তরেই আমাদের জীবন, আর আমাদের অন্তরই ঈশ্বরের আবাসস্থল। আমাদের নিজ নিজ সত্তা সমেত সকল পদার্থকে ঈশ্বর তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

নিজের সম্বন্ধে বা আমাদের ইন্দ্রিয়াদি কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। যেমন, জীবনের নিম্নতম স্তরে, আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি, কিন্তু অধ্যাত্ম চেতনা যতই পরিস্ফুট হয়, ততই চেতনার উচ্চতর কেন্দ্রগুলি বলীয়ান হয়ে নিম্নতর চেতনা কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। অনেকগুলি চেতনা কেন্দ্র রয়েছে, আর ধ্যানের মাধ্যমে সাধক নিম্নতর থেকে উচ্চতর কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয় যতক্ষণ না জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর জন্য যথেষ্ট সাধনা চাই, কিন্তু ধীরে ধীরে চেতনার ঊর্ধ্বগতি হতে থাকে। এর গতিপথকে বাধামুক্ত রেখে এবং কৃতসঙ্কল্প হয়ে, চেতনাস্তরকে তুলে আনতে হয় যতক্ষণ না আমরা সেই উচ্চতর সত্যের একটু আভাস পাই, তখন ক্ষণকালের

জন্য আমরা সেই পরম চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হই। তখন আমরা জানতে পারি যে ঐ দিব্য চৈতন্যের কিছু আভাস আমাদের অন্তরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। যদি আমরা অনুভব করতে পারি যে আমাদের অন্তরে ও বাইরে সেই চৈতন্য সর্বদা অবস্থান করছেন, তাহলে আমরা এক নতুন শক্তির অধিকারী হব। তখন আমাদের জীবন যাত্রায় ও কাজে গুণমানের পরিবর্তন আসবে। অন্যের ও নিজেদের প্রতি আমাদের আচরণই তখন অন্য রকম হয়ে যাবে।

খুব কম লোকই এই ভাবে কেবলই ইচ্ছাশক্তির সহায়তায় এই চেতনাতীত অবস্থা লাভ করতে পারে, ও এই ভাবে অহংবোধের প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারে, বা ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় উপনীত হতে পারে। কিন্তু, জপ ও ধ্যানের মাধ্যমে এই পরিব্যাপ্ত সত্তার উপলব্ধি আমাদের হতে পারে।

## জপ—মরমী সাধনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি

পূজা তিনভাবে করা যায় কায়িক, বাচিক ও মানসিক অর্থাৎ, বাহ্য পূজা, স্তুতি ও প্রার্থনা এবং ধ্যান। এদের প্রথমটি, যার মধ্যে রয়েছে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী আচার-অনুষ্ঠানাদি, এখন সাধারণ লোকের জীবনে প্রায়ই পালিত হয় না—প্রধানত সামাজিক জীবনের চাপে, অবসর সময়ের অভাবে, আর আধুনিক জীবন যাত্রায় নানা অসুবিধার জন্য। এ যুগের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করেই পুরাণ রচয়িতারা বাচিক ও মানসিক পূজার ওপরই খুব জোর দিয়েছিলেন—এগুলির মধ্যে আবার বিশেষ করে বাচিক পূজার ওপর।

বাচিক পূজা বলতে একটি নাম বা বহু নাম এবং ঈশ্বরের গুণাবলীর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বোঝা যেতে পারে। আগেরটিকে বলা হয় *জপ* এবং পরেরটিকে বলা হয় *স্তোত্র* বা *কীর্তন*, কিন্তু সাধারণত দুটি একই সঙ্গে করা হয়।

মনু বলেন, 'সত্যান্বেষু কেবল *জপের* মাধ্যমেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।'[১৬] মহাভারতে ঘোষিত হয়েছে '*জপই* সব অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' 'ভাগবতম্' এই মতকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে বলেছেন ঃ

> **কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।**
> **দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্তনাৎ ॥** [১৭]

—*সত্যযুগে* যা ধ্যানে পাওয়া যায়, *ত্রেতাযুগে* যজ্ঞ-কার্যে, *দ্বাপরে* পূজানুষ্ঠানে, *কলিতে* তা লাভ করা যায় প্রভুর নাম কীর্তন করে।

---

১৬ *মনুস্মৃতি*, ২/৮৭ ১৭ *শ্রীমদ্ভাগবতম্*, ১২.৩.৫২

আর এই কীর্তন বা জপ বলতে ঈশ্বরের গুণচিন্তনও ইঙ্গিত করে। এর অর্থ নাম জপের সঙ্গে সাধক মনশ্চক্ষে ভাববেন কোন একটি পবিত্র মূর্তিকে—সাধারণত তার প্রিয় দেবতা বা *ইষ্ট দেবতার* মূর্তিকে অথবা চিন্তা করবেন ঈশ্বরের প্রেম, করুণা, শক্তি, পবিত্রতা প্রভৃতি দৈব গুণাবলীর কথা। অধিকাংশ সাধকের পক্ষে মনশ্চক্ষে ইষ্টমূর্তির অনুচিন্তনই সহজ।

প্রেম ও শ্রদ্ধার সহযোগে দেবতার মূর্তিকে মনে নিয়ে আসা বা মনশ্চক্ষে *ভাবনাই* তো এক উচ্চতর *মানস-পূজা*। *জপের* সঙ্গে এইটিই হলো বর্তমানে প্রচলিত মরমী বা গুহ্য পূজা পদ্ধতিগুলির মধ্যে সব থেকে লোকপ্রিয়। প্রবর্তক সাধকের অধ্যাত্ম জীবনে মনশ্চক্ষে অনুচিন্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। *জপ* ও এই অনুচিন্তনকে অবশ্য একই সঙ্গে চালাতে হবে। মনশ্চক্ষে ঐ পবিত্র মূর্তিকে জ্যোতির্ময়, আনন্দময় এবং চিন্ময় সত্যরূপে কল্পনা করতে হবে। নিজের শরীরকেই জ্যোতির্ময় ভাব, তারপর হৃদয়দেশে জ্যোতির্ময় কেন্দ্রে তোমার ইষ্ট আদর্শ পুরুষের জ্যোতির্ময় মূর্তিকে স্থাপন কর।

এই রকম ভাবনার উপযুক্ত কয়েকটি ধাপ এখানে দেওয়া হলো। সঠিক ভঙ্গিতে আসনে বসার পরেই, ভক্ত যেন কর জোড়ে বলে ঃ

> **অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।**
> **যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥** [১৮]

—পবিত্র অপবিত্র সব অবস্থায় প্রভুকে যে স্মরণ করে, তার বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধ হয়ে যায়। আর ভক্ত যেন দেহের ও মনের পবিত্রতা অনুভব করতে থাকে। এর পর সে কল্পনা করতে পারে যে জীবাত্মা শরীরের নিম্নতর কেন্দ্র থেকে শির কেন্দ্রে উঠছে ও সেখানে বিশ্বাত্মার জ্যোতির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। সে যেন আরো কল্পনা করে যে সমস্ত বস্তু ও প্রতিবিম্ব সমেত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুটি সেই পরম জ্যোতিতে লয় পাচ্ছে, যা এখন একক ভাবেই অন্তর বাহিরে সর্বত্র বিভাসিত হয়ে আছে। বেশির ভাগ লোক এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। এরপর, ভক্ত যেন তার হৃদয় দেশের চেতনাকেন্দ্রটিকে অনুভব করতে থাকে, আর যেন মানস পটে কল্পনা করতে থাকে যে সেই কেন্দ্রেই অবস্থান করছে জ্যোতিঃ সমুদ্র থেকে উত্থিত তার ইষ্ট আদর্শ পুরুষের জ্যোতির্ময় মূর্তিটি, আর সাধকের দোষমুক্ত অধ্যাত্মরূপটি। সাধক যেন নিজে ঐ নতুন সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে একাত্মবোধ করে ঐ ইষ্টপুরুষের পূজায় ও ধ্যানে মগ্ন হয় ও সেই সঙ্গে কিছুক্ষণ ঈশ্বরের নাম জপ করতে থাকে। সে যেন অরূপের ভাবনা ছেড়ে না দেয়, কারণ ধ্যেয় শুদ্ধ মূর্তিটি ও সাধকের

---

১৮ *শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি*, পৃষ্ঠা ১

নিজের নতুন অধ্যাত্ম শরীরটি অরূপেই প্রতিষ্ঠিত ও অরূপের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। শেষে, সাধক যেন তার সর্বস্ব ঈশ্বরে সমর্পণ করে—এই প্রার্থনা মন্ত্রটি বলতে বলতেঃ

> **ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো**
> **জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-অবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা**
> **হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না**
> **যৎ কৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা।** [১৯]

—প্রাণশক্তি, বুদ্ধি ও শরীরের প্রেরণায়, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায়, চিন্তায়, কথায় ও কাজে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে যে যে পাপ আমি করেছি—সে সব ব্রহ্মে অর্পিত হোক। (ভাবানুবাদ)

উপরোক্ত ভাবে *জপ* ও ধ্যান শেষ করেও, ভক্ত যেন ঐ চেতনাকেন্দ্রকে ধরে থাকে, আর সব সময়ে ঐ উন্নত ভাব নিয়ে থাকতে চেষ্টা করে। প্রত্যেকটি সাধকেরই এই তিনটি জিনিস থাকা চাই ঃ একটি নির্দিষ্ট চেতনাকেন্দ্র, একটি নির্দিষ্ট *মন্ত্র* ও একটি পবিত্র মূর্তি। ফলপ্রসূ হতে হলে ভাবনা ও *জপ* অবশ্যই খুব প্রগাঢ় হওয়া চাই।

যেমন জড় ব্যাপারে তেমনি আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও আমাদের চিন্তায় ও কাজে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হতে হবে। কোন কোন লোক ধ্যান সম্বন্ধে এত সব ধরা-বাঁধা নিয়ম-পদ্ধতি পছন্দ করে না বলে মনে হয়। সাধারণত এ রকম অপছন্দ করাটা তাদের আন্তরিক অস্থিরতা ও বিরুদ্ধভাবের চিহ্ন। প্রথমে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি মেনে না চললে কেউ অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রসর হতে পারে না। আমি দেখেছি লোকে অবলম্বন ছাড়া বরফে স্কেটিং করার মতো বেশি বিপজ্জনক খেলা খেলবার আগে, স্কেটিং করার মতো অঙ্গসঞ্চালন অভ্যাস করে। সেই রকমই, অধ্যাত্ম জীবনে সাধকের প্রথমে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ধ্যানাভ্যাস আরম্ভ করা উচিত; পরে সে ঐ সব নিয়মের বাইরে যেতে পারে।

## শুদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন

আধুনিক মানব অতি সহজেই বলে ফেলে ঃ 'ওহো, ঈশ্বর সর্বত্র আছেন!' কিন্তু যখন সে ভাবতে চেষ্টা করে—ঈশ্বর ঠিক কি রকম—সে দেখে যে তার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। অধিকাংশ লোকেরই ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ভাসা-ভাসা ও আবছা। তথাকথিত নিরাকার ঈশ্বরের উপাসকগণ, যখন গির্জা থেকে বাড়ি ফেরে, নিজ শরীর আর তার সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে সেই চৈতন্যের স্তরে

১৯ জন্মে, পৃঃ ৪০

উঠতে পারে না ও অনির্দেশ্য বিমূর্ত সত্তার সঙ্গে কোন আদানপ্রদানই করতে পারে না—যাঁর সম্বন্ধে সে কত কথাই না বলে থাকে। যখন আমাদের প্রগাঢ় দেহ-চেতনা রয়েছে, যখন আমরা নিজ ব্যক্তিত্বকেই একমাত্র সত্য বস্তু মনে করে থাকি, তখন আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও উন্নতির জন্য এক শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন।

নিম্নস্তরে নিরপেক্ষ সত্তাটি (পরব্রহ্ম) কেবল ভাবমূলক, যদিও উচ্চতর স্তরে এটি বাস্তব সত্য। আমরা সেই মূর্তি ও ব্যক্তিত্বের নিম্নতর স্তরে থাকায় আমাদের যে সব মন্দ ও অকল্যাণকর ছবি ও চিন্তা মনে ওঠে, তাদের আমরা বিমূর্ত ভাবের সাহায্যে প্রতিরোধ করতে পারি না। তাদের প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের অবশ্যই তুলে ধরতে হবে তার বিপরীত কল্যাণকর ও শুদ্ধ ছবি ও চিন্তাকে, এইজন্যই প্রয়োজন এমন একটি শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে উচ্চতম ভাবগুলি উপলব্ধ হয়েছে বলে দেখা যায়। যতক্ষণ আমরা নিজ নিজ মূর্তিগুলিকে সত্য বলে ভাবব, ততক্ষণই আমাদের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট শুদ্ধ মূর্তির প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অবশ্যই মূর্ত ও অমূর্তের (সাকার ও নিরাকারের) মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজে বার করতে হবে। যা মূর্ত তা অমূর্তেরই একটি প্রকাশ। শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্ব সব কিছুর পেছনে অবস্থিত অমূর্ত তত্ত্বেরই একটি প্রকাশ।

ঐ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্ব সান্ত ও অনন্তের মধ্যে একটা যোগ সূত্রের কাজ করে এবং এভাবে বুঝলে মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুই-ই তৃপ্ত হয়। বুদ্ধি চায় অনন্তকে, হৃদয় চায় সান্তকে, আর পূত ব্যক্তিত্বে আমরা দুই-ই পাই, যদি তাকে সঙ্গত দৃষ্টিতে, অর্থাৎ তত্ত্বের প্রকাশরূপে দেখি—যে বিষয়ে ওই ব্যক্তিত্ব সদা সচেতন।

এই পূত মূর্তিকে (অন্তরে) জাগিয়ে তুলতে, সাধক ওঁ-প্রতীকের সাহায্য নিতে পারে। একে প্রথমে মূর্তির উদ্দেশ্যে ও পরে অমূর্ত অবস্থারও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত, অবশ্য সদ্‌গুরু-প্রদত্ত জপযোগ্য মন্ত্রটিকে ব্যবহার করা হয়। সাধকের *গুরুর* প্রতি ও *মন্ত্র*-শক্তির ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। বার বার পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে করতে, *জপ* করার সময় সাধককে *ইষ্ট*-মূর্তির, অথবা ঐ শব্দ প্রতীকের সঙ্গে সম্পর্কিত অমূর্ত অবস্থারও চিন্তা করতে হবে। চেতনাকেন্দ্রটি সেই অনন্ত চেতনারই অংশ, যা আমাদের সম্পূর্ণ সত্তাকে তথা সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে, আবার তার পারেও অন্তহীন ভাবে রয়েছে। প্রথমে শব্দ ও চিন্তা একই সঙ্গে চলবে, পরে শব্দ ঐ ঈশ্বরীয় (অমূর্ত) ভাবে ও চেতনার মধ্যে লীন হয়ে যায়। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তুমি এ সবের অর্থ কি তা আরো বেশি উপলব্ধি করতে থাকবে।

ঈশ্বরের দিকে যাবার অনেক পথ। আমরাও যীশুকে মানি, কিন্তু তোমরা যেমন

জান, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী বলে যীশুকে ঈশ্বরের বহু অবতারের মধ্যে একটি রূপে শ্রদ্ধা করি—খ্রীস্টানদের মতো অদ্বিতীয় ও একমাত্র অবতার রূপে নয়। আমরা সমেত সমগ্র বিশ্বই তাঁর প্রকাশ—এক সাদাসিধে অপূর্ণ প্রকাশ। কিন্তু যীশুখ্রীস্ট, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ—এঁদের সকলকে শাশ্বত বিশ্বাত্মার, বেদের ও বাইবেলের শাশ্বত শব্দব্রহ্মের পূর্ণ বা বিশেষ প্রকাশরূপে শ্রদ্ধা করি। এই ভাব প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সমভাবেই বর্তমান। এই পূর্ণ প্রকাশগুলির কাজ হলো অপূর্ণ প্রকাশগুলিকে আলো ও সত্যের পথ দেখানো।

বিশ্বাত্মা বা শব্দব্রহ্ম এক নৈর্ব্যক্তিক (অমূর্ত) ব্যাপার। স্থূলতর প্রকাশেই এটি ব্যক্তিক বা মানবিক রূপ নেয়। এই প্রকাশগুলি বহুরূপ হতে পারে; কিন্তু যা নিজেকে প্রকাশ করে তা একটিই। আমরা সকল মহত্তম প্রকাশকে বা তার একটি বা অনেকগুলিকে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আমরা যেন অবশ্যই সেই শাশ্বত অনন্য সত্তার প্রতি আস্থায় অটল থাকি, যিনি নিজেকে যুগে যুগে অবতাররূপে প্রকট করেন জগৎ-কল্যাণের জন্য।

যদি পরোক্ষ নিগূঢ় তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপে প্রত্যক্ষ একটি শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্বের প্রতি তোমার অনুরাগ হয়, তুমি তাঁর পূজা ও তাঁকে ধ্যান করতে পার—কিন্তু তা হবে ঐ তত্ত্বোপলব্ধির পথে একটি ধাপস্বরূপ। সাধন পথে অগ্রসর হতে হতে যে নিরপেক্ষ সত্তার—অমূর্ত সত্তার ধ্যান করতে তুমি চেষ্টা করছ—তিনিই তোমাকে জানিয়ে দেবেন যে ব্যক্তিরূপটিও তাঁরই প্রকাশ, তিনি জ্ঞানাতীত, আবার পরিব্যাপ্তও। তাঁর পূর্ণ প্রকাশে তাঁকে যেমন চিনতে হবে, তেমন চিনতে হবে তাঁর ত্রুটিপূর্ণ প্রকাশেও—মহান অবতারদের মধ্যে আবার সাধারণ নর-নারীর মধ্যে। এ বিষয়ে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য বলে কোন প্রশ্ন নেই, কারণ ঈশ্বর সব রকম সীমার অতীত।

শব্দ ঈশ্বরের একটি প্রতীক, মূর্তিও ঈশ্বরের একটি প্রতীক। ঈশ্বর-চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে আমরা দুরকম প্রতীকেরই সাহায্য গ্রহণ করি। শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্বের সহায়তায় আমরা তত্ত্বকেই উপলব্ধি করতে চাই—যে তত্ত্ব নিজেকে নাম ও রূপে প্রকটিত করছে, এবং আমরা অনুভব করতে আরম্ভ করি যে আমরাও ঐ তত্ত্বেরই প্রকাশ।

শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেই সর্বব্যাপ্ত সত্তার আভাস পেয়ে আমরা আমাদের মধ্যেও তাঁর আভাস পাই এবং অন্য সব মানুষের মধ্যেও। ভাল মন্দ সব রূপের মধ্যেই ঈশ্বর-দর্শন করতে শিখতে হবে—অবশ্য ভাল-মন্দের পার্থক্য হারিয়ে না ফেলে। তখন মন্দ বিষয়গুলি আমাদের একেবারেই প্রভাবিত করতে পারবে না।

জড় জগতে যা কিছু মূর্ত হয়ে রয়েছে কেবল তার মধ্যেই নয়, মনোজগতে যা যা জেগে উঠছে তার মধ্যেও ঈশ্বর-দর্শনের চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

যারা মূর্তির চিন্তা করতে চায় না, তাদের জন্য একমাত্র উপায় হলো নিজের মধ্যেই ঈশ্বর-দর্শন করা—অন্যের মধ্যেও। শরীর তো একটি মন্দির যেখানে জীবাত্মা বাস করেন—আর ঈশ্বর হলেন জীবাত্মার আত্মা। এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য, অতি অল্প লোকই দীর্ঘকাল এই উচ্চ আদর্শ ধরে থাকতে পারে।

## উপসংহার

এইভাবে 'পূজা' বলতে হিন্দু ধর্মে যা বোঝায়, তা অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন শোনা যায় তার থেকে কিছুটা তফাত। এর অর্থ *উপাসনা*, আর উপাসনা হলো— যেমন আগেই বোঝানো হয়েছে—ধাপে ধাপে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া, যতদিন না নিজের আর ঈশ্বরের একত্ব অনুভূত হচ্ছে। এরই অর্থ মরমী সাধনা বা গুহ্যপূজা। সাধক প্রথমে জড় মূর্তি নিয়ে আরম্ভ করে, পরে সরে আসে মনোগত মূর্তি আর ঈশ্বরের নাম জপে ও শেষে জীবাত্মা আর পরমচৈতন্যের মিলনে। সংযমের বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার ফলে দেহাত্মবোধ ও অহংবোধ ক্রমে যতই কমে আসে, জীবাত্মার সুপ্ত ঈশ্বরত্ব ততই বেশি বেশি প্রকাশ পেতে থাকে। জীবাত্মার এই অগ্রগতিতে তাকে নানা স্তরের ভেতর দিয়ে যেতে ও বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়—যতদিন না পূর্ণত্ব লাভ হয়।

বর্তমান যুগের পক্ষে *জপই* হলো সব থেকে সুবিধাজনক উপাসনা পদ্ধতি। গুহ্য পূজার ভাবেই *জপ* করা উচিত। এইভাব যখন মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যায়, কেবল তখনই *জপ* গতানুগতিক হয়ে পড়ে। প্রায়ই লোকে এই মূল তত্ত্বটি ভুলে যায়। এক উচ্চতর ধরনের উপাসনা রূপেই *জপ* অভ্যাস চালিয়ে যেতে হয়। *জপকে* একটি ফলপ্রদ আধ্যাত্মিক পদ্ধতি হতে হলে, এতে প্রেম ও স্তুতির মনোভাব অবশ্যই থাকতে হবে। গতানুগতিক মন্ত্র *জপেরও* কিছু মূল্য আছে, কারণ ঈশ্বরের নামেরই যে একটি নিগূঢ় শক্তি রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু *জপ* যখন ভক্তির সঙ্গে উপাসনা রূপে করা হয়, আমাদের সমগ্র দেহ-মন-আত্মা তাতে সাড়া দেয়। এই হলো *জপের* মাধ্যমে অধ্যাত্ম-জীবনে সিদ্ধিলাভের রহস্য।

একটি কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে। দেহের থেকে স্বীয় আত্মার ওপরই আমাদের বেশি জোর দিতে হবে, আর এই আত্মার থেকে ঈশ্বরের ওপরেই বেশি মনঃসংযোগ চাই। দেহকে কেবল জীবাত্মার আবাসভূমি রূপেই দেখতে হবে, আর

জীবাত্মাকে ঈশ্বরের আসন বলে ভাবতে হবে। নিজ নিজ আত্মার সঙ্গে আমাদের একত্ব বোধ করতে হবে, পরে ঈশ্বরের সঙ্গে, যিনি আত্মার আত্মা তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হতে হবে। এ বিষয়ে যদি আমরা বিশেষ মনোযোগ না দিই, তবে আমাদের সমগ্র জীবন এক রকম দেহপূজা হয়ে দাঁড়াবে। যারা শুদ্ধ ব্যক্তিত্বের উপাসনাকে খাট করে দেখে এবং মনে করে এও এক রকম পুতুল পূজা, তাদের জানা উচিত যে তাদের নিজেদের দেহ পূজার চেয়ে এ পূজা অনেক ভাল। এদিকে প্রকৃত ভক্তেরা দেখে যে, ঈশ্বর তাদের মধ্যে ও অন্য সব জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তাদের সমগ্র জীবনই পরমচৈতন্যের উপাসনাস্বরূপ হয়ে যায়, আর তারা পরম শান্তি ও সাফল্যের আনন্দ উপভোগ করে।

# চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বরের নামের শক্তি

## কথার শক্তি

তুমি কি কথার শক্তিতে বিশ্বাস কর? একটা গল্প বলি শোন। এক অশ্বেতকায় লোক অন্য এক লোকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিল। আদালতে জজ তাকে জিজ্ঞেস করে, অপর লোকটি কি করেছিল?

'সে আমাকে গণ্ডার বলেছিল', উত্তর দেয় লোকটি।

'কতদিন আগে?' জিজ্ঞাসা করেন জজ সাহেব।

'দু বছর আগে।'

'তবে তুমি এখন নালিশ করছ কেন?'

'কারণ ঐ জানোয়ারটিকে আমি আজ সকালেই মাত্র দেখেছি।'

নামের অনেক শক্তি, যদি আমরা জানি তার অর্থ কি। যখন কেউ ঘৃণাভরে আমাদের গাল দেয়—গণ্ডার, নির্বোধ, হাঁস বা নিরীহ গাধা বলে, তখন আমরা পাগল হয়ে যাই, মেজাজ খারাপ করে ফেলি।

আবার, আমরা এও জানি যে নাম ধরে কেউ ডাকলে আমরা কেমন সাড়া দিয়ে থাকি। ভিড়ের মধ্যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ঐ লোকের নিজ নাম ধরে ডাকা। একজনকে ঘুম থেকে তুলতে হলেও আমরা এই উপায়ই অবলম্বন করি। বিখ্যাত ইংরেজ কবি টেনিসন (Tennyson)-এর এক বিশেষ অনুভূতি হতো, তা তিনি তাঁর প্রাচীন ঋষি (Ancient Sage) কবিতায় বর্ণনা করেছেন ঃ

> **... একাধিকবার যখন আমি**
> **একেবারে একা বসে থাকতাম, মনের মধ্যে**
> **সেই কথাই আলোড়ন করত যা আমার প্রতীক,**
> **মরণের বাঁধ আলগা হয়ে যেত, আমার সত্তার**
> **তা চলে যেত নাম হীনের রাজ্যে, মেঘের মতো**
> **গলে পড়ত স্বর্গরাজ্যের ভেতর। আমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করতাম**

—সে অঙ্গ অদ্ভুত ঠেকত, যেন আমার নয়—তবু নিঃসন্দেহে,
তা পূর্ণ স্বচ্ছতা, ও আত্ম-বিলুপ্তির মাধ্যমে।
আমাদের জীবনের তুলনায় এ বিশাল জীবন লাভ
স্ফুলিঙ্গের তুলনায় যেন সূর্য তেজ—কথায় যা ছায়াচ্ছন্ন হয় না
নিজেরা তো কেবল ছায়া-জগতের ছায়া মাত্র।[১]

তোমার নিজের নাম যে আত্মার প্রতীক, এ তথ্য কি তুমি স্বীকার কর? টেনিসন (Tennyson) তা করতে পারতেন, কারণ তাঁর মানসিক সংবেদনশীলতা ছিল বলে তিনি নিজ নাম ব্যবহার করেই নিজের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের কোন রকম আভাস জাগিয়ে তুলতে পারতেন। যদি সাধারণ নামেরই এত শক্তি, তবে ঈশ্বরের নামের কত শক্তিই না হতে পারে! কিন্তু ঈশ্বরের নামের শক্তি কেবল সে-ই উপলব্ধি করতে পারে, যে বুঝেছে—নামের অর্থ কি, নাম কিসেরই বা প্রতীক।

## পবিত্র শব্দ ওঁ

সারা ভারত পরিক্রমা করার সময় স্বামী বিবেকানন্দ হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে একদিন এক প্রাচীন বৃক্ষের নিচে বসার কিছুক্ষণ পরেই গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। ধ্যান ভাঙ্গলে স্বামীজী তাঁর সঙ্গী গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলেন, 'স্পষ্টই, এই বটবৃক্ষের নিচে বসে আমার জীবনের সব থেকে বড় সমস্যাগুলির একটির সমাধান পেলাম।' তাঁর ডায়েরীতে এই অনুভূতির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল তাই নিচে দেওয়া হলো ঃ

'সৃষ্টির আদিতে ছিল শব্দব্রহ্ম' ইত্যাদি। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে সংগঠিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন একটি চেতন দেহের দ্বারা আবৃত, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতনাময়ী প্রকৃতির মধ্যে বা দৃশ্য জগতের মধ্যে অবস্থিত। ...এই একের দ্বারা অপরের আলিঙ্গন যেন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের সদৃশ—তারা উভয়ে অভিন্ন এবং শুধু মানসিক বিশ্লেষণের সাহায্যেই 'উহাদেরকে পৃথক' করা চলে। শব্দ ভিন্ন চিন্তা অসম্ভব। অতএব 'সৃষ্টির আদিতে ছিল শব্দব্রহ্ম' ইত্যাদি। বিশ্বাত্মার এই বিবিধ প্রকাশ অনাদি। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি সবই সাকার ও নিরাকারের মিলনে সংগঠিত।[২]

কয়েক বছর পরে স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবটির বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন তার 'ভক্তিযোগ' বক্তৃতায়।

"ভারতীয় দর্শনের মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ

১ F. Max Muller, *The Six Systems of Indian Philosophy* [N.Y. Longman, Green & Co. 1928] p.194 থেকে উদ্ধৃত।

২ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, প্রথম খণ্ড, (উদ্বোধন, ১৪০৬) পৃষ্ঠা ২৩১

মনুষ্যচিত্তে এমন একটি তরঙ্গ থাকতে পারে না, যা নামরূপাত্মক নয়। যদি এটি সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে গঠিত, তা হলে এই নামরূপাত্মকতা বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেরও নিয়ম বলতে হবে। 'যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানলে আর সমস্ত মৃত্তিকাকেই জানতে পারা যায়,' ... তেমনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা দেহপিণ্ডকে জানতে পারলে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকেও জানতে পারা যায়। রূপ বস্তুর বাইরের আবরণ বা খোসা, আর নাম বা ভাব যেন তার অন্তর্নিহিত শস্য। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে শরীরই রূপ আর মন বা অন্তঃকরণই নাম এবং বাক্‌শক্তিযুক্ত প্রাণিসমূহে এই নামের সঙ্গে ওদের বাচকশব্দগুলি নিত্যযুক্তভাবে বর্তমান। অন্য ভাষায় বলতে গেলে ব্যক্তি-মানুষের ভিতরেই *ব্যষ্টিমহৎ* বা চিত্তে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি উত্থিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শব্দ বা ভাবরূপ—পরে তদপেক্ষা স্থূলতর আকার ধারণ করে।

"বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা *সমষ্টিমহৎ* প্রথমে নিজেকে নামে, পরে রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করে। এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই *রূপ*; এর পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত *স্ফোট* রয়েছে। *স্ফোট* বলতে সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ *শব্দব্রহ্ম* বুঝায়। সমুদয় নাম বা ভাবের উপাদানস্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যা দ্বারা ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করে; শুধু তাই নয়, ভগবান প্রথমে নিজেকে স্ফোটরূপে পরিণত করে, পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে বিকশিত করে। এই স্ফোটের একটিমাত্র বাচক শব্দ আছে- ওঁ। আর কোনরূপ বিশ্লেষণ-বলেই যখন আমরা ভাব হতে শব্দকে পৃথক করতে পারি না, তখন এই ওঙ্কার ও নিত্য-স্ফোট অবিভাজ্যরূপে বর্তমান। এজন্য শ্রুতি বলে, সমুদয় নামরূপের উৎস—ওঙ্কার-রূপ এই পবিত্রতম শব্দ হতে এই স্থূল জগৎ সৃষ্ট হয়েছে।"[৩]

অন্যভাবে বলা যায়, ঈশ্বর সত্তা নিজেকে দিব্যভাবের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন, আর দিব্যভাব দিব্য শব্দের বা বাক্যের মাধ্যমে। এই ধারণা, যাকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের নামের শক্তি সঠিক বোধগম্য হয়ে থাকে, তা অসংখ্য সাধু সন্ত কর্তৃক সাধিত ও অনুমোদিত হয়েছে এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অংশ হয়ে আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিজ অভিজ্ঞতার বিষয়ে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন ঃ

'একদিন, উপদেশ দেবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মের শব্দ, তথা শব্দ-প্রতীক রূপে প্রকাশ সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ আমি এটিকে আমার মধ্যাহ্ন ধ্যানের বিষয় করে নিয়েছিলাম। আমি ধ্যানে বসলেই শব্দ-ব্রহ্ম আমার কাছে অভিব্যক্ত হয়ে পড়ত।'[৪]

---

৩ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ১ম সং, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৩৭

8 Swami Prabhavananda, *The Eternal Companion* [Madras : Sri Ramakrishna Math, 1971] p. 249

*কঠ উপনিষদ্* ওঁ-কারকে আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্যস্বরূপ বলেছেন, আবার চরম সত্যস্বরূপও বলেছেন :

**সর্বে বেদা যৎ পদম্ আমনন্তি**
**তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।**
**যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি**
**তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ ॥**

**এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।**
**এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥** [৫]

—সকল বেদ যে লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে থাকে, সব রকম তপস্যাদিতে যা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যার সন্ধানে লোকে ব্রহ্মচারী ছাত্রের মতো জীবন যাপন করে, তাই আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলব; তা হলো ওঁ। ইনিই পরম পরিবর্তনহীন ব্রহ্ম। যার এই জ্ঞান হয়েছে, সে জীবনে চরম সাফল্য লাভ করে।

মুণ্ডক-উপনিষদে ওঁ-কে ধনুকের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন :

**প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যম্ উচ্যতে।**
**অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥** [৬]

—ওঁ ধনুকের তুল্য, শুদ্ধ একাগ্র মন যেন তীরের মতো। আর এই তীরকে তীব্র একাগ্রতার সঙ্গে ছুঁড়তে হবে যাতে তা লক্ষ্যবস্তু, ব্রহ্মে গিয়ে লাগতে পারে এবং তার সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হয়ে যায়।

এখানে ওঁ বলতে উপনিষদ্ সমূহের সামগ্রিক অর্থ বা অভিব্যক্ত জ্ঞানকেই বোঝাচ্ছে। এরই সহায়ে, আমাদের উচিত হবে নিজ শুদ্ধ মনকে একাগ্রভাবে ব্রহ্মলীন করা। হিন্দুধর্মে ওঁ পবিত্রতম শব্দ ও প্রতীক এবং বহু প্রাচীন কাল থেকে যুগপরম্পরা ক্রমে এর ব্যবহার চলে আসছে। অল্প কথায় বেদান্তের সার যাতে ব্যক্ত হয়েছে, সেই *মাণ্ডুক্য উপনিষদের* প্রথম মন্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে :

**ওমিত্যেতদ্ অক্ষরমিদং সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং—**
**ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বম্ ওঙ্কার এব।** [৭]

—এই ওঁ-শব্দটি অক্ষর ব্রহ্ম তাই আবার বিশ্বও। যা কিছু অতীতে ছিল, যা কিছু বর্তমানে আছে, যা কিছু ভবিষ্যতে থাকবে সে সবই ওঁ।

ঐ উপনিষদ্, ওঁ-শব্দটিকে আরো বিশ্লেষণ করেছে এবং এর প্রত্যেকটি অংশকে চেতনার এক একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছে। উপনিষদের মতে

---

৫ *কঠোপনিষদ্*, ১/২/১৫-১৬ ৬ *মুণ্ডকোপনিষদ্*, ২/২/৪
৭ *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্*, ১

মানবের সাধারণ অভিজ্ঞতাকে তিনটি অবস্থায় ভাগ করা যায় ঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সেই ভাবে, ওঁ-শব্দকে অ, উ এবং ম এই তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, আর এগুলি পর পর উপরোল্লিখিত তিনটি অবস্থার নির্দেশক। যেহেতু অণু-বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ড একই ছাঁচে গড়া, অ, উ এবং ম শব্দাংশগুলি যথাক্রমে বিরাট জড় বিশ্ব, বিরাট মানস বিশ্ব এবং ঐ দুই বিশ্বের কারণের ভিত্তি ভূমির নির্দেশক। এ অবস্থাগুলি যার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, সেই ব্রহ্ম বা চরম সত্য অবশ্য এ সবের অতীত এবং এর প্রতীক হলো 'অমাত্র' বা শব্দহীন বা প্রকাশহীন ওঁ।

## ঈশ্বরীয় বাণী এবং নাদ ব্রহ্ম

পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে *ওঁ*-কে ঈশ্বরের প্রতীক বলে উল্লেখ করেছেন, যথা—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।'[৮] তিনি আরো বলেছেন যে নিরবচ্ছিন্নভাবে *ওঁ* জপ করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথের সব বাধা দূর হয়ে যায় ও আত্ম-চেতনা জাগরণের পথে অগ্রগতি হয়, যথা—'ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।'[৯] এইভাবে ওঁ হিন্দু-ধর্মের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকগুলির অন্যতম। যেমনই হোক, এটি সন্ত জোহন লিখিত সুসমাচারে উল্লিখিত 'শব্দ' কথাটির থেকে বেশি বিস্ময়কর নয়, যার আরম্ভে বলা হয়েছে ঃ

*প্রথমে বাণীই ছিল,*
*এবং বাণী ঈশ্বরের কাছেই ছিল,*
*এবং বাণীই ছিল ঈশ্বর।*
*ঈশ্বরের ব্যাপারও প্রথমে ঐ রকমই ছিল,*
*তিনিই সব জিনিস তৈরি করেছিলেন ঃ ...*
*জীবন তাঁতেই ছিল; আর জীবনই ছিল মানবের আলোক।*
*এবং সেই বাণী ছিল মাংসের তৈরি এবং তা*
*আমাদের মধ্যেই বাস করত।*[১০]

চতুর্থ সমাচারের প্রণেতা এখানে চেষ্টা করেছেন যীশুখ্রীস্টকে গ্রীক্‌দের দৈব বাণীর সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখতে। অবশ্য এ ভাব সে সময় নতুন ছিল না। ওসাইরিস (Osiris), মিথরা (Mithra) প্রভৃতির মতো প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসেও কোন কোন দেবতা একসময়ে সনাতন ভগবদ্‌বাণীর প্রকাশ রূপে মর্যাদা পেয়েছিলেন।

প্রাচীন কালে ভগবদ্‌বাণীর ধারণাটির বহুল প্রচলন ছিল। আদি গ্রীক্ দার্শনিক হেরাক্লিটাস (Heraclitus)-এর মতে এমন কিছু তত্ত্বের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, যা সৃষ্টি প্রবাহ ও তার পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর তাকেই তিনি ভগবদ্‌বাণী নামে

৮ পতঞ্জলি, *যোগসূত্র*, ১/২৭ ৯ *তদেব*, ১/২৯ ১০ *Bible*, St. John 1:1-14

অভিহিত করেছেন। পরবর্তী কালে এটিকেই বিশ্ব-প্রজ্ঞারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, মানবীয় প্রজ্ঞা যার একাংশ মাত্র। গ্রীক্ দার্শনিকদের মধ্যে যারা সুখ-দুঃখে নির্বিকার তারা একে আস্তিক ভাবের পর্যায়ভুক্ত করে ভগবদ্‌বাণীকে বহু দেবতার ধারণার সঙ্গে অভিন্ন বলে গণ্য করতে লাগলেন। আদিতে ইহুদীরা ভাবত জগৎ 'প্রভুর বাণী' থেকে সৃষ্ট হয়েছে। পরে আলেকজেন্দ্রিয়ার ইহুদী দার্শনিক ফিলো (Philo) 'বাণী' বা 'ঈশ্বরের শ্বাস-প্রশ্বাস'কে একটি স্বতন্ত্র রূপ দিয়ে নাম দিলেন 'লোগোস' (Logos)। তাঁর মতে ঈশ্বর, এই ত্রুটিপূর্ণ জগৎ নিয়ে কাজ করেন 'লোগোস' (Logos) বা ঈশ্বরীয় বাণীর মাধ্যমে। চতুর্থ সুসমাচারের প্রচারক, সন্ত জোহন, ঈশ্বরের বাণীকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলে গণ্য করতেন—এদুটি যেন এক ঈশ্বরীয় সত্তার ও তৎপ্রতিনিধিত্বের উপাধি। ঈশ্বরীয় বাণী যীশুখ্রীস্টে মূর্তিমান হয়ে উঠল।

ভারতে ঈশ্বরীয় বাণীর ধারণাটি প্রথম ব্যাকরণ-বিদ্‌দের কাছ থেকে এল, তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন *স্ফোট*। পরে, তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষয়টি আরো বিকাশ লাভ করে। *মন্ত্র-শাস্ত্র* বা *মন্ত্র*-বিজ্ঞান, যা তন্ত্রের একটি বিভাগ, তা গড়ে উঠেছে 'সমগ্র বিশ্ব স্পন্দন থেকেই সৃষ্ট হয়েছে' এই মতবাদকে ভিত্তি করে। আমরা যাকে শব্দ বলি তা কেবল বাহ্য জড় স্পন্দন। শ্রবণযোগ্য তরঙ্গের থেকে সূক্ষ্মতর হলো বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, যেমন বেতার-তরঙ্গ। তারা হলো ইথার-তরঙ্গ। বেতার তরঙ্গ শ্রবণযোগ্য তরঙ্গে রূপায়িত হতে পারে বেতার-গ্রাহকের মতো বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে। আরো সূক্ষ্মতর তরঙ্গ হলো চিন্তা-তরঙ্গ। আর চিন্তা স্বয়ং হলো নাদ-ব্রহ্ম (বা শব্দ-ব্রহ্ম) বা বিরাট মনের চিরন্তন অতীন্দ্রিয় সৃষ্টি-স্পন্দনের প্রকাশ।

এই নাদ-ব্রহ্ম কেবল তাত্ত্বিক ধারণা নয়। একে অভিজ্ঞতায় আনা যায়। সূক্ষ্ম মনের মাধ্যমে এ নাদ শোনা যায়। ঠিক যেমন রেডিও তরঙ্গকে শ্রবণযোগ্য করতে হলে বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। তেমনি নাদ-ব্রহ্মের স্পন্দন শুনতে হলে অতি শুদ্ধ মনের প্রয়োজন। যখন মন শুদ্ধ ও একাগ্র হয়, অতি সূক্ষ্ম সৃষ্টি-তরঙ্গ তখন সাধকের শ্রুতিগোচর হয়—প্রলম্বিত, নিরবচ্ছিন্ন শব্দ বা *অনাহত ধ্বনি*রূপে। এ কেবল মনের খেয়াল নয়। কান রোগগ্রস্ত হওয়াতেই যে এরূপ শোনা যায় তাও নয়। বেশি পরিমাণে কুইনাইন সেবনের বা মাথায় ধাক্কা লাগার দরুন অসুস্থতাজনিত যে শব্দ মানুষ শুনে থাকে—তার সঙ্গেও এর কোন সম্পর্ক নেই। আঙ্গুল দিয়ে কান বন্ধ করলে যে গুঞ্জন শোনা যায়, এ তাও নয়। এ হলো, একেবারে অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা, যা বহুদিনের একনিষ্ঠ অধ্যাত্মসাধনার ফলস্বরূপ লাভ হয়ে থাকে। *অনাহত ধ্বনি* হলো সূক্ষ্ম শব্দ-তরঙ্গ যা নাদ-ব্রহ্ম বা বিরাট মন থেকে উদ্ভূত হয়ে সেখানেই ফিরে যায়—ফোয়ারার জল প্রবাহের মতো।

এই সব সূক্ষ্ম সৃষ্টি-স্পন্দন কেবল তখনই শোনা যায়, যখন মন শান্ত হয় ও অধ্যাত্ম প্রবাহ উচ্চতর চেতনা স্তরে পৌঁছয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে যারা চলেছে তারা সবাই যে এ শব্দ শুনতে পাবে তা নয়। কেবল যারা মনের সুরকে এর ছন্দের সঙ্গে মেলাতে পারে তারাই শুনতে পায়। অন্য সব উন্নত আত্মার হয় তো অন্য অভিজ্ঞতা হতে পারে। এই *অনাহত ধ্বনি,* মেরুদণ্ড বরাবর অবস্থিত কেন্দ্রীয় অধ্যাত্ম-নাড়ী *সুষুম্নার* কার্যপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত। অধিকাংশ লোকেরই এই নাড়ী বন্ধ থাকে। অন্তঃশুদ্ধি, তীব্র এষণা ও একাগ্রতার ফলে এই নাড়ী উন্মোচিত করা যেতে পারে। অধ্যাত্ম প্রবাহ তখন ওপরে উঠতে থাকে, ফলে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম সুর উঠতে থাকে। প্রাচীন গ্রীসের পিথাগোরাস্ সম্প্রদায়ের মরমী সাধকরা একে 'মণ্ডলের সুর' বলত। হিন্দু ভক্ত কখনো কখনো একে 'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী' বলে থাকে। এ হলো চিরন্তন শ্রীকৃষ্ণের সত্যকার বাঁশী। বিশ্বাত্মা থেকে ঐ ঈশ্বরীয় সুর বেরিয়ে এসে জীবাত্মায় শিহরণ জাগায় ও তাকে অধ্যাত্ম চেতনার উচ্চতর স্তরের দিকে নিয়ে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন ঃ

'আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দই মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বামূল হতে আরম্ভ করে ওষ্ঠ পর্যন্ত স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। *অ* কণ্ঠ হতে উচ্চারিত, *ম* শেষ ওষ্ঠ্য বর্ণ। আর *উ* জিহ্বামূল হতে যে শক্তি আরম্ভ হয়ে ওষ্ঠে শেষ হয়, সেই শক্তিটি যেন গড়িয়ে যাচ্ছে—এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হলে এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটির সূচক; অন্য কোন শব্দেরই সেই শক্তি নাই; সুতরাং এই শব্দটিই স্ফোটের যোগ্যতম বাচক, আর এই স্ফোটই ওঙ্কারের প্রকৃত বাচ্য। এবং বাচ্য হতে বাচক পৃথক করা যেতে পারে না, সুতরাং এই *ওঁ* এবং *স্ফোট* এক ও অভিন্ন। এই জন্য স্ফোটকে বলা হয় *নাদব্রহ্ম,* আর যেহেতু এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মতর দিক বলে ঈশ্বরের নিকটতর এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, সেই হেতু ওঙ্কারই ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক।' [১১]

## মন্ত্র কি?

এই ভাবে আমরা দেখছি *ওঁ* শব্দের তাৎপর্য কত গভীর ও ব্যাপক। আমাদের অধ্যাত্ম জীবনে, আত্মানুভূতি লাভের সহায়ক রূপে 'জপ' ও ধ্যানে যে *ওঁ* শব্দের ব্যবহার হয় তার প্রবোধন-শক্তি সম্বন্ধে আমাদের বোঝা দরকার। সাধারণত *ওঁ*-শব্দ অদৃশ্য ও অনন্ত নিরাকার নিরপেক্ষ তত্ত্বের প্রতীক, কিন্তু সাকার দেবতার

---

১১ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা,* ১ম সং., ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৭-৩৮।

ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার চলতে পারে। বস্তুত *ওঁ*-শব্দটিকে এত পবিত্র মনে করা হয় যে, সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য সাধারণত ঈশ্বরের প্রত্যেকটি সাকার রূপের নিজস্ব নির্দিষ্ট শব্দ-প্রতীক, দেবতার নাম, ও কখনো কখনো *বীজ* নামে একটি বিশেষ রহস্য মন্ত্র থাকে। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

'আর সেই একমাত্র *অখণ্ড সচ্চিদানন্দ* ব্রহ্মকে যেমন অপূর্ণ জীবাত্মাগণ বিশেষ বিশেষ ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা করতে পারে, তেমনি তাঁর দেহরূপ এই জগৎকেও সাধকের মনোভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নরূপে চিন্তা করতে হবে।

'উপাসকের মনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের যখন যেটি প্রবল থাকে, তখন তার মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে তদনুযায়ী ভাবই উদয় হয়। ইহার ফল এই—একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রাধান্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হবেন, আর সেই এক জগৎই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হবে। সর্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন সার্বভৌম বাচক ওঙ্কারে যে বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তেমনি এই বাচ্য-বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব সম্বন্ধেও খাটবে। আর ইহার সবগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্দ থাকা আবশ্যক। মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতে উত্থিত এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান ও জগতের এই বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব প্রকাশ করে। ওঙ্কার যেমন অখণ্ডব্রহ্মের বাচক, অন্যান্য মন্ত্রগুলিও সেইরূপ সেই পরমপুরুষের খণ্ড-ভাবগুলির বাচক। ঐ সবগুলিই ঈশ্বরধ্যানের ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়ক।'[১২]

সংস্কৃত সংজ্ঞায়, 'শব্দ'-এর অর্থ ধ্বনি ও শব্দ দুই-ই হতে পারে। যখন আমরা কথা বলি আমরা তখন ধ্বনির স্থূল রূপটি শুনে থাকি, যাকে *বৈখরী* বলা হয়। এটি কণ্ঠনালী, জিহ্বা প্রভৃতির আলোড়নের ফলে উদ্ভূত হয়। এর পেছনে রয়েছে শব্দ, যা চিন্তা প্রণালীর কার্য; এটি *মধ্যমা* ধ্বনি। চিন্তা নিজে আরো সূক্ষ্মতর আবেগের ফল। যার নাম *পশ্যন্তি* ধ্বনি, যার উৎপত্তি আবার অব্যক্ত শব্দ-ব্রহ্ম থেকে—এই স্তরে ধ্বনির নাম হলো *পরা*। সুতরাং *পরা* থেকে *পশ্যন্তি* ও *মধ্যমার* মাধ্যমে *বৈখরী* পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে মানুষের চিন্তা-জীবন। আমাদের অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা চিন্তা করে থাকি! আমরা কত অসাবধানে চিন্তা করি ও কত অসাবধানেই বা কথা বলি! চিন্তা এক গতিশীল কার্যপদ্ধতি আর তার উৎপত্তি হলো এক অপ্রকাশিত সূক্ষ্ম উৎস থেকে। অশুভ চিন্তা গভীরতর প্রদেশে

১২ তদেব, পৃঃ ৩৮

কাজ করে আমাদের সমস্ত দেহ-মনের সংঘাতকে প্রভাবিত করে। একই ভাবে শুভ চিন্তাগুলি আমাদের ব্যক্তিত্বের আরও গভীরতর স্তরগুলিরও উন্নতি বিধান করে।

সাধারণ চিন্তায় আমরা আমাদের মনের আধ্যাত্মিক অধঃস্তরগুলির বিষয়ে অচেতন থাকি। কিন্তু *মন্ত্র* নামে চিন্তন-ক্রিয়ার যে বিশেষ পদ্ধতিগুলি রয়েছে সেগুলি আমাদের এই উৎসে পৌঁছবার পথ দেখিয়ে দেয়। ঈশ্বরের নাম (*মন্ত্র*) জপ ও তার অর্থ অনুধ্যান করে আমরা চেতনার সূক্ষ্মতর স্তর থেকে আরো সূক্ষ্মতর স্তরে পৌঁছে উচ্চতর থেকে আরো উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করে মহিমান্বিত হতে পারি। ঠিক ঠিক *জপের* মাধ্যমে আপাত স্তব্ধ ধ্বনি জীবন্ত হয়ে প্রচুর শক্তির অধিকারী হতে পারে। প্রত্যেকটি মন্ত্রের মধ্যেই অন্তর্নিহিত শক্তি (*মন্ত্র-চৈতন্য*) রয়েছে। যখন কোন উন্নত অধ্যাত্ম সাধক *মন্ত্র* জপ করেন, মন্ত্র নিজ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে *জীবন্ত* হয়ে ওঠে। তিনি যখন শিষ্যকে *মন্ত্র-দীক্ষা* দেন, তখন এই শক্তিও তার মধ্যে সঞ্চালিত হয়। যারা আধ্যাত্মিক সংযমাদি নিয়ম মতো পালন করে ও পবিত্র জীবনযাপন করে কেবল তারাই *মন্ত্রের* শক্তি উপলব্ধি করতে পারে।

*মন্ত্র* কথাটির ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি হলো 'যা চিন্তার মাধ্যমে জীবাত্মাকে মুক্ত করে' (*মননাৎ ত্রায়তে ইতি*)। মূঢ় ব্যক্তিদের কাছে *মন্ত্র* একটি শব্দ বা বাক্যাংশ কিংবা একটি সূত্র মাত্র। কিন্তু উন্নত আধ্যাত্মিক ব্যক্তির পক্ষে এ হলো প্রভূত শক্তিধর এক কেন্দ্রীভূত চিন্তা, যা নিয়ে যায় নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকে। ঠিক ঠিক *মন্ত্র* জপের মাধ্যমে, সাধকের মধ্যে উচ্চতম জ্ঞানোন্মেষ হয়ে থাকে ও সে মুক্তি লাভ করে। যোগী, শব্দের রেশ ধরে, সাকার দেবতার আধ্যাত্মিক দর্শনাদি লাভ করে এবং পরে সকল শব্দ স্পন্দন পার হয়ে, পরমাত্মায় পৌঁছয়।

*মন্ত্র* বহু রকমের হতে পারে। একটি অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত *মন্ত্র* হলো *গায়ত্রী মন্ত্র*। *নমঃ শিবায়* সর্বজনবিদিত শৈব *মন্ত্র*। *নমো নারায়ণায়* হলো সুবিদিত বিষ্ণু *মন্ত্র*। *হরে রাম হরে রাম* ইত্যাদি ও *শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম* মন্ত্র লক্ষ লক্ষ হিন্দু কীর্তন করে। এ সবই অগণিত সাধু সন্তের জীবন ও অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। ঠিক ঠিক জপ করলে প্রত্যেকটি মন্ত্রই সাধকের অন্তরে এক বিশেষ স্পন্দনগুচ্ছ জাগিয়ে তোলে, যা শেষ পর্যন্ত ধ্যেয় *দেবতাকে* প্রকাশিত করে। তন্ত্র বিধিতে 'মন্ত্র' বহুজনের সামনে উচ্চারিত হয় না। শিষ্য গুরুর কাছে যে *মন্ত্র* লাভ করে, সেটি সে গোপনে রাখে, এমনকি নিকটতম আত্মীয়গণের কাছেও তা প্রকাশ করে না। এই সব *মন্ত্রের* প্রত্যেকটিতে একটি *বীজ* বা বিশেষ অংশ থাকে যা ঐ দেবতার বিশেষ শক্তির প্রতীক। বলা হয় যে ঐ *বীজ* আমাদের মধ্যে *দেবতার* সৃজন শক্তির স্ফুরণ ঘটায়।

## জপের শক্তি

কেবল গুণসম্পন্ন সাধকের মধ্যেই *মন্ত্র*-শক্তি প্রকাশ পায়। কাশীপুর উদ্যান বাটীতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁর শিষ্য নরেন্দ্রকে রাম-*মন্ত্রে* দীক্ষা দিলেন। এর ফলে, আত্মসংযমের মহাশক্তিতে স্বভাবসিদ্ধ নরেনের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন এল। এবারে তিনি এক ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে উচ্চ ও উদীপ্ত স্বরে প্রভুর 'রাম! রাম!' নাম জপ করতে করতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরতে লাগলেন। সে সময়ে কার্যত তাঁর বাহ্য চেতনা ছিল না, এবং সারারাত তিনি এই ভাবে কাটিয়েছিলেন। প্রভুকে এ বিষয়ে জানানো হলে, তিনি কেবল বলেছিলেন : 'তাকে ঐ রকম হতে দাও, সময় হলেই পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।' কয়েক ঘণ্টা পরে নরেনের পূর্বাবস্থা ফিরে এল।[১৫]

প্রত্যেকটি কথাই হলো আমাদের অন্তরে যেসব ভাব বা বাসনা ওঠে তার প্রকাশ। *মন্ত্র* মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রতীক। ঠিক যেমন, সাধারণ কথা শুনলে বা বললে আমাদের মনে কোন বিষয়ের ধারণা বা কামনার উদ্রেক হয়, তেমনি *মন্ত্রগুলিও* আমাদের মনের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক প্রবণতাগুলিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। এই অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক প্রবণতার প্রকাশ একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর লোকজনের কাছে একই রকম হয় এবং তাই প্রত্যেক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নিজ পবিত্র *শব্দ প্রতীক* বা *মন্ত্রসমূহ* রয়েছে। বিধি অনুযায়ী জপ করলে এই মন্ত্রগুলি অধিকাংশ মানুষের অন্তরে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা সাধারণত সুপ্ত থাকে, তাকে জাগিয়ে তোলে। *জপের* উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত আধ্যাত্মিক অনুরাগকে জাগিয়ে তোলা। প্রত্যেক সাধকেরই একটি *ইষ্ট দেবতা*, একটি বিশেষ *মন্ত্র* ও একটি নির্দিষ্ট চেতনাকেন্দ্র থাকা চাই। সে যেন অবশ্যই তার চেতনাকেন্দ্রকে সব সময়ে ধরে থাকে।

*জপ* অথবা, বার বার ঈশ্বরের নাম কীর্তন, অনেক রকমে হতে পারে। সাধক, অন্তত নিজে শুনতে পায় এমন জোরে নামোচ্চারণ করতে পারে; এর নাম *বাচিক*। কিংবা শোনা যাবে না এমন ভাবে ঠোঁট নেড়ে মন্ত্র জপ করা যেতে পারে। একে বলে *উপাংশু জপ*। তৃতীয় প্রণালী হলো, জিহ্বা ও ওষ্ঠ না নেড়ে মনে মনে *মন্ত্র জপ*। এই নীরব জপ হলো *মানসিক জপ*। মানসিক জপ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যারা তা কঠিন মনে করবে তারা অন্য দুটি প্রণালীতে জপ অভ্যাস করতে পারে। যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সাধক *জপের* সময় যেন মনটিকে তার চেতনাকেন্দ্রে ধরে রাখে।

---

১৫ Eastern & Western Disciples, *The Life of Swami Vivekananda*, (Kolkata : Advaita Ashrama, 1974) p. 130

## পৃথিবীর নানা ধর্মে জপ-প্রণালী

বাইবেলের নির্দিষ্ট আদেশ অনুসারে 'তোমার প্রভু ঈশ্বরের নাম কখনো বৃথা উচ্চারণ করবে না' এবং যীশুখ্রীস্ট যে 'বৃথা জপে'র নিন্দা করেছিলেন, তার নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। সাধারণত খ্রীস্ট ধর্মে নাম জপের থেকে আবেদনাত্মক প্রার্থনার ওপর জোর দেওয়া হয়, যদিও ক্যাথলিকরা Ave Maria (মেরীর জয় হোক) মন্ত্র জপের জন্য মালা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু প্রাচীন পন্থী গ্রীক্ চার্চ হিন্দুদের *জপের* মতো বার বার প্রার্থনা করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। মধ্যযুগীয় গ্রীক সন্তগণ 'যীশুর উদ্দেশে প্রার্থনা'[১৪] নামে এক সহজ মন্ত্র জপের বিধির নিখুঁত রূপ গড়ে তুলেছিলেন। The Way of Pilgrim নামে জনপ্রিয় পুস্তকটিতে এই বিধির বর্ণনা এই ভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ

' "নিরবচ্ছিন্ন আন্তরিকভাবে যীশুর উদ্দেশে প্রার্থনা" হলো, নিত্য নিরন্তর যীশুর পুণ্য নাম বার বার ওষ্ঠে, চেতনায়, অন্তরে করে যাওয়া; সঙ্গে সঙ্গে সব কাজে, সব সময়ে, সব জায়গায়, এমনকি ঘুমিয়েও তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অবস্থানের মানস চিত্র অঙ্কন ও তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে যাওয়া। এই আবেদনের ধরন হবে ঃ "প্রভু যীশুখ্রীস্ট আমার ওপর অনুগ্রহ করুন।" '[১৫]

ইসলামে, মরমী সাধক সুফিরা শত শত বছর ধরে আল্লাহ্ বা আলি মন্ত্র জপকেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের উপায়রূপে কাজে লাগিয়েছে। মহান মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিৎ আল্‌ঘজালী সম্প্রদায়ের শিষ্যদের এইভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় ঃ

'সাধক যেন ... একলা এক কোণে বসে, তার মনে যেন সুমহান ঈশ্বর ছাড়া আর কোন চিন্তা না আসে। পরে, সে যখন একলা নির্জনে বসে থাকবে তাঁর কথা মনে রেখে, সে যেন মুখে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ জপ করা থামিয়ে না দেয়। পরিশেষে, সে এমন অবস্থায় পৌঁছবে যেখানে জিহ্বা থেমে যাবে, আর মনে হবে সেখান থেকেই যেন কথা বেরুচ্ছে। সে যেন এই চেষ্টা চালাতে থাকে, যতক্ষণ না তার জিহ্বা একেবারে থেমে যায়, আর সে অনুভব করে যে তার হৃদয় এই চিন্তায় মগ্ন থাকতে চেষ্টা করছে। সে যেন চেষ্টা আরো চালাতে থাকে, যতক্ষণ না মন্ত্রের রূপ—তার অক্ষর ও আকার হৃদয় থেকে মুছে যায়, আর তার জায়গায় ভাবই মাত্র যেন হৃদয়কে আঁকড়ে ধরে তার সঙ্গে, অভিন্ন হয়ে থাকে। এখন আর কিছু থাকবে না, কেবল প্রতীক্ষা করে ঈশ্বর কিভাবে তার কাছে প্রকাশিত হবেন—তার

---

১৪ দ্রঃ E. Kadloubovsky and G. E. H. Palmer, *Writings from the Philokalia on Prayer of the Heart*, [London : Faber and Faber, 1951]

১৫ The Way of Pilgrim (London : S.P.C.K., 1941), pp. 19-20

জন্য। যদি সে এই পথে চলে, তবে সে নিশ্চিত থাকতে পারে যে সত্যের আলোক তার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করবে।'

বৌদ্ধ ধর্মে নৈতিক জীবন ও ধ্যানের ওপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কিন্তু কোন কোন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বুদ্ধত্ব লাভের উপায় স্বরূপ ঈশ্বরের নাম জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। জাপানে সিন্ নামে সব থেকে জনপ্রিয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে সাধক অনুক্ষণ—*নমো অমিতাভ বুদ্ধায়* (জাপানী ভাষায় *নমু-অমিদা-বুৎসু* )-*মন্ত্র* জপ করে। *সুখাবতি ব্যূহ সূত্রের* ভাষ্যে এই অংশটি আছে ঃ

'সমস্ত হৃদয় দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল অমিদা-নাম জপ কর—চলা বা দাঁড়িয়ে থাকা, বসা বা শোয়া যে কোন অবস্থায়। এই সাধনার নিশ্চিত ফল হলো—মুক্তি, কারণ অমিদা বুদ্ধের আদি অঙ্গীকার এই রকমই ছিল।'

'সূরঙ্গম সূত্র' নামে একটি শাস্ত্রে আছে ঃ

'এই (অমিতাভ বুদ্ধ নাম জপের) অভ্যাসের মূল্য হলো, ...যে কেউ অমিতাভ বুদ্ধের নাম আবৃত্তি করবে, এখন অথবা ভবিষ্যতে, সে অবশ্যই অমিতাভ বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাবে ও কখনো তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে না। এই সঙ্গলাভের দরুন, সুগন্ধি প্রস্তুতকারকের সঙ্গে থাকলে যেমন শরীর সুগন্ধে ভরে যায়, তেমনি সেও অমিতাভের করুণা সুগন্ধে ভরে যাবে এবং জ্ঞানলাভ করবে—অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করেই।'

## হিন্দুধর্মে জপ পদ্ধতি

হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই, কোন না কোন রকম জপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষ্ণব সন্তগণ ও উত্তর ভারতের মহান সন্তগণ নিরন্তর ঈশ্বরের নাম জপের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সন্ত তুকারাম গেয়েছিলেন ঃ

**প্রভু আমার, এমনই যেন হয়, তোমার নামে**
**মন আমার হয় পূরিত**
**অগ্নি শিখা সম জ্বলে ওঠে তোমারই প্রেমে,**
**ওষ্ঠ হয় আনন্দে স্তিমিত।**
**চক্ষু হয় পূর্ণ আনন্দের অশ্রুতে,**
**সর্বাঙ্গপুলক সহিত,**
**হ্যাঁ, আমার শরীর তোমারি প্রেমেতে**
**হয় কাণায় কাণায় পূরিত।**

**এমনিই, ঢালিব দেহের সব শকতি**
**প্রার্থনায় আনন্দাপ্লুত স্তুতিতে;**
**অবিরাম গেয়ে যাব তোমার নাম গীতি**
**সব দিনে সব রাতে।**
**তুকা বলে, হ্যাঁ, চিরকাল এমনিভাবে**
**করে যাব আমি, এই সেরা কাম,**
**জেনেছি যে আমি, বসে সন্ত-পদে,**
**এতেই পাব চির বিশ্রাম।**[১৬]

গুরু নানক ও তাঁর অনুগামীরা ঈশ্বরের নাম কীর্তনের ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন। নানক প্রচার করতেন, নিরন্তর ঈশ্বরের নাম জপই হলো সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলার সকল শ্রেণীর অধিবাসীর কাছে *নাম জপকে* লোক-প্রিয় করে তুলেছিলেন। *নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবা* (ভগবানের নামে আনন্দ, সকল প্রাণীর প্রতি করুণা ও ভক্ত সেবা) এই ত্রি-সূত্র হলো তাঁর অনুগামীদের—ধর্ম বিশ্বাস। যুবা বয়সে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রখর বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি সব ত্যাগ করে ঈশ্বর-প্রেমে মেতে উঠেছিলেন। তিনি গেয়েছিলেন ঃ

**চেতো দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং**
**শ্রেয়ঃ কৈরবচান্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।**
**আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং**
**সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥**[১৭]

—প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেই নাম সংকীর্তনের বিশেষ জয় হোক, যা চিত্ত দর্পণকে কলুষমুক্ত করে ও সংসাররূপ মহাদাবাগ্নি নিভিয়ে ফেলে, যা শ্বেত পদ্মের পরম সৌন্দর্য-বর্ধনে তার ওপর বর্ষিত চন্দ্রকিরণস্বরূপ; যা বিদ্যা (আত্মজ্ঞান)-রূপ বধূর জীবন ও আত্মাস্বরূপ; যা আনন্দ-সাগরকে স্ফীত করে; যা প্রতি পদে মধুরতম অমৃত আস্বাদন করায়; এ যেন সকল আত্মার আরামপ্রদ অবগাহন স্নান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

'জপ করা কি না নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর রূপদর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে—শিকলের আর-একদিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক-একটি পাব (Link) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল

১৬ From Nicol Macnicol, *Psalms of Maratha Saints* [Kolkata : Association Press] pp 71-72
১৭ শ্রীচৈতন্য *শিক্ষাষ্টকম্,* ১

ধরে যেতে যেতে ওই কড়ি-কাঠ স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।'[১৮]

শ্রীশ্রীমা *সাধন* কালে দৈনিক লক্ষ *জপ* করতেন। ঈশ্বরের নামের কি শক্তি, তিনি তা তাঁর জীবনে রূপায়িত করেছিলেন। *জপ* ও *ধ্যান*-এর মাধ্যমে তিনি দেহ-চেতনা হারিয়ে ফেলতেন ও চেতনাতীত অনুভূতি স্তরে উঠতেন। তাঁর উপদেশাবলীতে তিনি বার বার জপের গুরুত্বের ওপর জোর দিতেন, যেমন পাওয়া যাবে শ্রীশ্রীমা ও তাঁর শিষ্যবর্গের সঙ্গে নিম্নলিখিত কথোপকথনে ঃ

শিষ্য ঃ মা, *কুণ্ডলিনী* জাগ্রতা না হলে কিছুই লাভ হয় না।

মা ঃ ঠিক বলেছ বাবা। *কুণ্ডলিনী* ধীরে ধীরে জাগবে। ঈশ্বরের নাম *জপ* করতে করতে তুমি সবই উপলব্ধি করতে পারবে। তোমার মন স্থির না হলেও তুমি আসনে বসে ঈশ্বরের নাম লক্ষ বার জপ করতে পার। *কুণ্ডলিনী* জাগ্রতা হবার আগে *অনাহত* ধ্বনি শোনা যায়; কিন্তু মহামায়ার কৃপা ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয়।[১৯]

কোয়ালপাড়ার এক শিষ্য শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করে ঃ 'মা, মন বড় চঞ্চল; আমি কিছুতেই একে স্থির করতে পারি না।' উত্তরে শ্রীশ্রীমা বললেন ঃ 'বাতাস যেমন মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি ঈশ্বরের নাম সংসাররূপ মেঘকে নষ্ট করে দেয়।'[২০]

"রোজ পনের বিশ হাজার জপ করলে মন স্থির হয়ে যায়। ও কেষ্টলাল! সত্যই এ রকম হয় এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রথমে তারা এ অভ্যাসটি করুক, ফল না পেলে, তারা অনুযোগ করতে পারে। সাধকের উচিত কিছুটা ভক্তির সঙ্গে জপ অভ্যাস করা, কিন্তু তা করা হয় না। তারা কিছু করবে না, কেবল অনুযোগ করবে, আর বলবে, 'কেন আমি ফল পাই না।' "[২১]

"*প্রারব্ধ কর্মের* ফল ভোগ করতেই হবে। কেউ এর থেকে রেহাই পাবে না; কিন্তু *জপ* বা ঈশ্বরের পুণ্যনাম বার বার উচ্চারণে ফলের প্রকোপ কিছু হ্রাস পেতে পারে। এ যেন, এক জনের নিয়তিতে যেখানে পা-টি কাটা যাবার কথা, সেখানে তাকে পায়ে একটি কাঁটা ফোটার কষ্ট মাত্র পেতে হলো।"[২২]

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম স্বামী ব্রহ্মানন্দ *জপের* ওপর খুব জোর

---

১৮ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৯৪৯

১৯ Swami Tapasyananda and Swami Nikhilananda, *Sri Sarada Devi—The Holy Mother* [Madras, Sri Ramakrishna Math, 1969] p. 401

২০ ibid, p. 405 ২১ ibid, p. 398 ২২ ibid, p. 423

দিতেন। তাঁর এক শিষ্য প্রশ্ন করেছিল, 'মহারাজ, কিভাবে *কুণ্ডলিনী* কে জাগানো যায়?' মহারাজ উত্তরে বলেন ঃ 'কোন কোন মতে এর জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস *জপ* ও ধ্যানের মাধ্যমেই এ কাজ সুষ্ঠু ভাবে করা যায়। এ যুগে *জপ* অভ্যাসই বিশেষ ভাবে উপযুক্ত।'[২৩]

অন্য সময়ে তিনি বলেছেন ঃ ' *জপম্-জপম্-জপম্* এমন কি যখন কাজ করছ তখনো *জপ* করবে। তোমার সব কাজ-কর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের নামকে জড়িয়ে রাখ। এটি করতে পারলে, সবরকম অন্তর্দাহ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঈশ্বরের নাম জপের শরণ নিয়ে বহু পাপী শুদ্ধ, মুক্ত ও দেবভাবাপন্ন হয়েছে। ঈশ্বরে ও তাঁর নামে গভীর বিশ্বাস স্থাপন কর; জানবে যে এ দুটি ভিন্ন নয়।'[২৪]

আমরা এ সব উদ্ধৃতি কেন দিলাম? এ সবে কি বোঝা যায়? প্রবুদ্ধ সাধকদের এই সব কথা থেকে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরের নামের প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। এই শক্তিতে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে। 'জপে'র মাধ্যমে শত সহস্র লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কার্যপ্রণালী, শীঘ্রই হোক আর দেরিতেই হোক সাধক এই নাম জপের শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হবেই। ঈশ্বরের নাম মনে মন্দ চিন্তা উঠতে দেয় না। নিরন্তর ঈশ্বরের নাম জপ ছাড়া সম্পূর্ণ শুদ্ধ জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। আমি আমার নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। অতএব, আমরা যেন নিরন্তর ঈশ্বরের নাম জপ করি। আমাদের দেহ-মন যেন শুদ্ধ হয়ে আধ্যাত্মিক স্পন্দনে স্পন্দিত হয়। এই নাম যেন আমাদের বাধা দূর করে দিয়ে আমাদের আত্মাকে বিরাট আত্মার, জীবাত্মাকে পরমাত্মার, সংস্পর্শে নিয়ে আসে। আমরা যেন আত্মার সঙ্গীত গাইতে শিখি, যে সঙ্গীত জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন ঘটায়।

## কয়েকটি কার্যকরী ইঙ্গিত

প্রথমে স্থূল-স্তর থেকে চিন্তা-স্তরে ওঠ, তারপর আধ্যাত্মিক স্তরে উঠতে চেষ্টা কর। উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রবাহের সংস্পর্শে আসার আগে, আমাদের অন্তরের নিম্নতর প্রবাহগুলিকে অকেজো করে দিতে হবে। নিম্নতর স্পন্দনগুলি অতি প্রবল হলে, প্রচণ্ড উদ্যম ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঈশ্বরের নাম কীর্তন করবে। আমাদের অন্তরীক্ষ মণ্ডল নানা জায়গার শব্দ স্পন্দনে ভরে আছে। এগুলি অজান্তে আমাদের প্রভাবিত করে। তুমি যদি রেডিওর গান শোন, তবে তোমার ওপর বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের যে প্রভাব সেগুলিকে পৃথকভাবে বুঝতে শিখবে। কোন কোন সঙ্গীত তোমার মনকে

---

২৩ পূর্বোল্লিখিত *Eternal Companion*, p. 275

২৪ তদেব, পৃঃ ২৯৭

ওপরে তুলে দেয়, কোনটি তোমাকে চঞ্চল করে দেয়, কোনটি বা তোমাকে পাগল করে দেয়। মন্দ সঙ্গীতের প্রভাবকে *ভজন* ও পবিত্র শাস্ত্রাদির আবৃত্তির মাধ্যমে দাবিয়ে দিতে শেখ।

তোমার নিজ অন্তরের সঙ্গীত সৃষ্টি কর। বস্তুত এ সঙ্গীত নিরন্তর চলেছে। যখন মনের সুরকে অন্তর্মুখীন করে বাঁধতে পারবে তখন ঐ সঙ্গীত শুনতে পাবে। 'শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর' আত্ম-মোহনকারী সুর অন্তরেই শোনা যায়। তাতেই আত্মা আনন্দে পূর্ণ হয়, আর দেহ-মন শান্তিতে নিম্নাত হয়।

জপ আরম্ভ করার আগে বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন। প্রথম প্রথম *জপ* কিছুটা গতানুগতিক হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সাধককে *মন্ত্র*-শক্তির ওপর অবশ্যই আস্থাবান হতে হবে। প্রবর্তক দেখে তার চেতনা-কেন্দ্র অনবরত সরে যাচ্ছে—কখনো ওপরে, কখনো নিচে, কখনো অন্য কোথাও। প্রত্যেক সাধকের পক্ষেই এটি শক্ত কাজ। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাকে নিয়মিত সময়ে *জপ* চালিয়ে যেতে হবে, প্রথম প্রথম যে রকম ফলই হোক না কেন। একমাত্র এই উপায়েই যথা সময়ে সাফল্য লাভ হবে।

যখন ধ্যানের বা *জপের* চেষ্টা করবে, সে সময়ে কখনই নিজেকে তন্দ্রালু হতে দেবে না। এ অভ্যাস খুবই বিপজ্জনক। নিদ্রা, তন্দ্রা এবং ধ্যানকে কোনভাবেই জড়িয়ে ফেলবে না। যদি তুমি খুব তন্দ্রালু বোধ কর, উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে *জপ* কর, যতক্ষণ না তন্দ্রাভাব কেটে যায়। মন যখন ভীষণ চঞ্চল ও বহির্মুখী, তখনও আমাদের দৃঢ়ভাবে *জপে* লেগে থাকা উচিত—যন্ত্র-চালিতের মতো হলেও—তবু চঞ্চলতার কাছে নতি স্বীকার করবে না। এভাবে, মনের খানিকটা অন্তত *জপে* লেগে থাকবে। এইরূপে সমস্ত মন চঞ্চল হতে বা হয়ে থাকতে পারবে না।

*ইষ্ট*-নাম (নির্বাচিত দেবতার নাম) অথবা *মন্ত্র* (ঈশ্বরের রহস্যময় শব্দ-প্রতীক) প্রত্যেকবার জপ করার সময় মনে করবে তোমার শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ শোধিত হয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্বাসকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে হবে, কারণ এক দিক থেকে এই হলো *জপের* অন্তর্নিহিত ভাব। *ইষ্ট-নাম* আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর শান্তি বিধান করে, মনকে স্থির করে ও শরীরে কল্যাণকর পরিবর্তন আনে। যখন মন অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনার বা অবসাদের অবস্থায় পড়ে, তখনি নাম-জপের গুঞ্জন ও ইষ্ট-চিন্তা আরম্ভ করে দাও। মনে কর এতেই সাম্য অবস্থা ফিরে আসছে—সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ও মনে এক নতুন ছন্দের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বাস্তবিকই তুমি অনুভব করবে এতে তোমার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী কিভাবে স্নিগ্ধ হয়ে আসছে, আর কিভাবে মনের ক্রমবর্ধমান বহির্মুখী প্রবণতা থেমে যাচ্ছে।

তুমি, *জপের* আগে বা সঙ্গে সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস অভ্যাস করতে পার। ছন্দোবদ্ধ, নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসে স্নায়ুমণ্ডলীতে স্থিরতা, কতকটা সমতা ফিরে আসে, যে অবস্থা অধ্যাত্ম-সাধনার পক্ষে সহায়ক হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করার সময় মনে কিছু দৃঢ় ভাব সঞ্চার করাতে থাক ঃ যেমন আমি প্রশ্বাসের সঙ্গে শুদ্ধভাব গ্রহণ করছি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সব অশুদ্ধভাব ত্যাগ করছি। আমি প্রশ্বাসের সঙ্গে শক্তিকেই গ্রহণ করছি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে দুর্বলতা ত্যাগ করছি। আমি প্রশ্বাসের সঙ্গে শান্তভাব গ্রহণ করছি, আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সব রকম চঞ্চলতা দূর করছি। আমি প্রশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিকেই গ্রহণ করছি, আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সকল বন্ধন ত্যাগ করছি। এমনকি জপ করার সময়েই এ রকম ইঙ্গিত দিতে পার। প্রকৃত সাধনার ভিত্তি প্রস্তুত করার পক্ষে এগুলি খুবই সহায়ক।

পুণ্য চিন্তা দেহ-মনে এক ধরনের সাম্যভাব নিয়ে আসে। মনে কর এক এক বার *মন্ত্র* জপে তুমি শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হচ্ছ। *জপের* ফল তুমি সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারবে না, কিন্তু যদি তুমি কিছুদিন ধীর ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে *জপ* চালিয়ে যাও, তবে ফল অনুভব করবে এবং কয়েক বছর পরে আশ্চর্য হয়ে দেখতে পাবে যে তোমাতে কি এক মহৎ পরিবর্তন এসেছে। পরীক্ষা করার প্রচুর সুযোগ আছে। শরীরকে, অন্তত কিছুটা একমুখী ও ছন্দোবদ্ধ করতে হবে, আর স্নায়ুগুলিকেও একমুখী ও ছন্দোবদ্ধ করতে হবে। অভ্যাস করতে করতে তোমাকে অবশ্যই শরীর, মন, শ্বাস সকলকেই ছন্দোবদ্ধ করতে হবে। তখনই কেবল আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধ্যান করার মতো আমাদের যথাযথ মনোভাব আসবে, আর আমরা তা পূর্ণ উদ্যমে ও যথাযথভাবে করতে পারব। অন্য সবই প্রারম্ভিক ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে।

এ পথে সবই কঠিন। মানস-চক্ষে কল্পনা করা কঠিন, মনঃসংযম কঠিন এবং ধ্যানও কঠিন। এর থেকে একটু কম কঠিন হলেও, ঠিকমতো *জপ* করাও কঠিন কাজ। অতএব নতুন শক্তি সঞ্চয় করা দরকার। এর জন্য উল্লিখিত পরামর্শগুলি খুবই সহায়ক। শব্দ ও শব্দ-প্রতীকের যে প্রচণ্ড তেজ রয়েছে তাকে ব্যবহার কর। তোমাকে অবশ্যই অনুভব করতে সচেষ্ট হতে হবে যে, পবিত্র নাম, পবিত্র মন্ত্র তোমাকে পবিত্র ও উন্নত করে তুলছে। সময় হলে তুমি নিজেও বুঝবে যে ছন্দোবদ্ধভাবে নাম জপ, প্রবর্তক সাধকের জীবনে, অধ্যাত্ম সাধনার সব থেকে বেশি অপরিহার্য অংশ।

সব সময়ে শব্দ-প্রতীকের সাহায্য নেবে, কারণ শব্দ ও চিন্তার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে। চিন্তা নানা রকম শব্দের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। এখন আমরা দেখতে পাই যে দিব্য ভাব বিভিন্ন পবিত্র নামের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, আর

পবিত্রভাব ও শব্দের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। তাই আমরা অধ্যাত্ম সাধনায় শব্দকে ব্যবহার করি। শব্দের সাহায্যে পবিত্র চিন্তা জাগিয়ে তোলা আমাদের পক্ষে সহজ হয়। আমাদের দেখতে হবে যেন শব্দ-প্রতীক থেকে তার পেছনে যে ভাব রয়েছে সেই দিকে আমাদের মন এগিয়ে যায়, অন্যথায় শব্দ আমাদের কোন সাহায্য করে না। প্রথমে আসে বাহ্য পূজা, অধ্যাত্ম সাধনে প্রত্যেক সাধকের পক্ষে পরবর্তী কাজ হবে *জপ* ও ধ্যান; এবং শেষে আসবে সর্বত্র দিব্য সত্তার অনুভূতি, চোখ বন্ধ করেই হোক আর না করেই হোক। এই হলো উচ্চতম স্তর, ধাপে ধাপে পূর্বতন সব স্তর পার হয়েই এ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়।

শব্দ-প্রতীক আর পবিত্রভাবের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা কর, যাতে করে শব্দ-প্রতীক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবটি মনে এসে যায়। টাইপ করা যন্ত্রে যেমন কোন বোতামে হাত দিলেই তার অনুযায়ী অক্ষরটি কাগজে ছাপা হয়ে যায়, তেমনি যে মুহূর্তে শব্দ-প্রতীকটি উচ্চারিত হবে অমনি সেই অনুযায়ী ভাবটি তোমার মনে উঠবে ও তোমাকে সাহায্য করবে উদ্দেশ্য লাভে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি গড়ে তুলতে হলে প্রতীক ও ভাবের মধ্যে একটি খুবই নির্দিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, দৈনন্দিন নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে।

মনের মধ্যে কোন বড় রকমের ঝড় ওঠার সম্ভাবনা হলেও, সেটি তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করলেও, *জপ* চালিয়ে যাও। প্রয়োজন বোধে, পবিত্র নাম উচ্চ কণ্ঠে বা নিজে শুনতে পাও অন্তত এমন জোরে জোরে *জপ* কর। প্রায়ই দেখা যায়, মন খুব বিক্ষিপ্ত হলে, নিঃশব্দ মানসিক জপ যথেষ্ট নয়। জপ শোনা গেলে মনের চঞ্চলতা স্তব্ধ হয়ে যায়। শব্দ-স্পন্দনের প্রভাবকে আমরা যেন কখনো খাটো করে না দেখি। ছন্দোবদ্ধ নাম কীর্তনে আমাদের মন, এমনকি আমাদের শরীর, ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। *জপের* ফলে মন উচ্চতর বিশ্ব-স্পন্দনের সঙ্গে ঐকতানবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে মন শান্ত, উন্নত ও একাগ্র হয়। কোন কোন লোক উচ্চকণ্ঠে *জপ* ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যায় ও প্রভূত আধ্যাত্মিক উপকারও পায়। মুখে প্রকাশ না করে, মনে মনে জপ করলেও একই ফল পাওয়া যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ *জপকে* তুলনা করতেন, নদীতে ডোবানো একটা ভারী কাঠের তক্তার সঙ্গে বাঁধা লোহার শেকলের সঙ্গে। ঐ শেকলটি ধরে, এক পা এক পা করে এগিয়ে গেলে শেষে তুমি ঐ কাঠের তক্তাকে ছুঁতে পারবে। সেই রকম, এক একবার নাম করার ফলে আমরা ঈশ্বরের কাছে একটু একটু এগিয়ে যাই। শব্দ বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলে, আর বুদ্ধি আমাদের ঈশ্বরের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। তোমাকে দেখতে হবে যে, তোমার *জপের* গুণগত মান যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। *জপ* করবে

সচেতনভাবে, বুদ্ধিযুক্ত হয়ে, আর দিন দিন বেশি বেশি মাত্রায়। সব সময় শেকলের কথা মনে রেখে, পরের পাবটি ধরার চেষ্টা করবে। এই ভাবে তুমি ক্রমান্বয়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবে ও নিজেকে ধ্যানের জন্য প্রস্তুত করবে।

ঝড়ের মধ্যে পড়েছি মনে হলেও, আমরা যেন সর্ব শক্তি দিয়ে এই শেকলটি ধরে থাকার চেষ্টা করি। প্রায়ই আমরা বিপদের সম্ভাবনাকে অনেক বড় করে দেখে থাকি। পরে আমরা বুঝি যে আমাদের ঐ সুস্পষ্ট কল্পনাটিকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল। পরিস্থিতি খারাপ হলেও সাধারণত আমরা যতটা ভয়াবহ মনে করি ততটা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা যেমন কল্পনা করে থাকি পরিস্থিতি তেমন ভয়াবহরূপ নেয় না। যদি পরিস্থিতি সত্যই ভয়াবহ হয়, তবু বাঁচার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, বিনা বাধায় পরাজয় স্বীকার কেন করবে? এই সব ক্ষেত্রে সর্বদা *জপ* ও প্রার্থনা চালিয়ে যাও, আর তুমি যতটা পার পরিস্থিতির মোকাবিলা কর। তুমি পরাজিত হলেও, তা তোমাকে পরবর্তী জয়ের দিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

নিয়ম অনুযায়ী, কোন পবিত্র শব্দ-প্রতীক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ চিন্তাও অবশ্যকর্তব্য, কিন্তু যখন কারও মন ধ্যানে বসে না, তখনো সে *জপ*-টুকু চালিয়ে যেতে পারে বিনা ছেদে, এক বা দু-হাজারবার পবিত্র *মন্ত্র* উচ্চারণ করতে করতে। একটু যন্ত্রের মতো হলেও কোন ক্ষতি নেই। এই অভ্যাস চালিয়ে গেলে, পরে দেখা যাবে যে ধ্যানাভ্যাস আরো সহজ হয়ে এসেছে। ধ্যান হলো *জপেরই* বিস্তার। *জপ* হলো বিরাম-সহ ধ্যান। একদিক থেকে ধ্যান হলো বিরামহীন *জপ* এবং অবশ্যই এক কঠোরতর কর্ম পদ্ধতি। *জপে* আমরা পাই শব্দ ও বিরাম-সহ চিন্তা, ধ্যানে কেবল বিরামহীন চিন্তা। ধ্যান করতে হলে আগে আমাদের অবশ্যই *জপ* অভ্যাস করতে হবে। তুমি কিছুতেই এক লাফে ধ্যানে মগ্ন হতে পার না।

যতবারই তুমি মানসিক সমতা হারাচ্ছ বলে ভয় পাবে, নাম জপ কর, ও তোমার চেতনা-কেন্দ্রের সেই পবিত্র রূপটির চিন্তা কর। শব্দটিকে ধরে থাক ও তার অর্থবোধ কর। এটি কিছুক্ষণ করতে পারলে, প্রচুর স্থৈর্যের অধিকারী হওয়া যাবে। তখন আমাদের তালগোল পাকানো মস্তিষ্ক আরো পরিষ্কার হবে; আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি আরো স্পষ্ট হবে। *জপ* বহু বাধা দূর করে সাধককে ধ্যানের উপযুক্ত করে তোলে। তোমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, *জপ* চালিয়ে যাও। কেন থামবে, কেবল মনের ভাল লাগছে না বলে? কেন পরাজয় স্বীকার করবে? কেন মনের দ্বারা প্রতারিত হবে? নাম-জপ চালিয়ে যাও আর ঐ নাম যে আদর্শের প্রতীক তার চিন্তা কর এবং কখনই নিজেকে পরাজিত হতে দেবে না। নাম-জপ এমন ভাবে কর, যেন তোমার কানে তা প্রবেশ করে, আর তোমার মন তার অর্থ-চিন্তায় মগ্ন থাকে।

## ঈশ্বরীয় নামের শক্তি

আধ্যাত্মিক জীবনের শুরুতে প্রকৃত ধ্যান নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। *জপ* করে যাও আর *ইষ্ট দেবতার* চিন্তা কর। সময় হলেই *জপ* পরিণত হবে *ধ্যানে,* যার অর্থ হলো ধ্যেয় বিষয়ের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা—এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালার সময় তৈলধারা যেমন নিরবচ্ছিন্ন থাকে সেইরূপ।

*জপ* করতে করতে পার্থিব সংসারের থেকে দিব্য চৈতন্যকে আরো বেশি বাস্তব বলে মনে হবে। কেবল তখনই প্রকৃত *ধ্যান* সম্ভব। প্রথম কাজ প্রথমে কর, পরে পরবর্তী ধাপ আপনিই আসবে।

তোমার নিজের ভাবে *জপ* করতে আরম্ভ কর। শোনা যায় এমন ভাবে ওঁ-কার জপের সঙ্গে আপন সুর মিলিয়ে, ধীরে ধীরে ঐ শব্দকে আরো কমিয়ে এনে—সাধক সেই বস্তুটির এলাকায় এসে পড়ে, ভারতীয় ঋষিরা যার নাম দিয়েছেন শব্দ-ব্রহ্ম, আর গ্রীসের পিথাগোরাস মতাবলম্বী দার্শনিকরা নাম দিয়েছেন 'মণ্ডল সমূহের সঙ্গীত'। সেই ঐকতান বিশিষ্ট শব্দ জপ করতে থাক, আর জেনে রাখ যে ওটি অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরম চৈতন্যেরই বিকাশ—তাঁরই প্রতীক। তোমার 'বেতার যন্ত্রটি'কে ঠিক মতো মিলিয়ে নিয়ে তুমি বিশ্ব-স্পন্দনগুলির আওতায় এসে পড়, তাই তোমাকে বিশ্ব মনের সংস্পর্শে নিয়ে আসবে, আর তারই মাধ্যমে—যিনি সর্বানুস্যূত, তোমার আত্মার আত্মা, সর্বাত্মা—সেই বিশ্ব-চৈতন্যের সংস্পর্শেও।

যেমন করেই হোক তোমার *জপ* চালিয়ে যাও। যে পবিত্র *শক্তি-মন্ত্রটি* সাধক পায়, তার প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে—বাধা অতিক্রমণের ও অধ্যাত্ম চেতনা জাগরণের। প্রকৃতপক্ষে এ শক্তি হলো ভাগবতী বিশ্বমাতার, তাঁকে দেবীই বল আর কালীই বল, সেই শক্তিই এ যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছেন।

*জপের* সময় সাধক যদি মালা বা করতল দিয়ে তার চেতনার কোন একটি উচ্চতর কেন্দ্র (হৃদয়, মস্তক ইত্যাদি) স্পর্শ করে থাকে, তবে কখনো কখনো তা সহায়ক হয়। স্থূলভাবে ঐ কেন্দ্রের অনুভূতি হলে, সাধকের পক্ষে নিজ চেতনাকে ঐখানে স্থির করা আরো সহজ হয়।

ঐ পবিত্র শব্দ মনের পক্ষে অবলম্বনস্বরূপ। যখন কোন বড় রকমের বিপদ উপস্থিত হয়, তখন একটু শান্ত ও অন্তর্মুখী হতে চেষ্টা করা উচিত, আর হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত। বিপদ এলে তাকে তোমার ভিতর থেকে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে দেবে কেন? যে মুহূর্তে তুমি 'শিকলটি' ছেড়ে দেবে, তুমি হারিয়ে যাবে। যখন কোন সাহায্যই নেই, ঈশ্বরই একমাত্র সহায়, আর

ঈশ্বর বলতে সেই পরমাত্মাই, যিনি আমাদের আত্মার আত্মারূপে, আমাদেরই অন্তরে বিরাজ করছেন। *জপ* হলো নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বাবলম্বনের মধ্যে অন্যতম। জপ আমাদের ক্রমে ক্রমে সেই আত্মার আত্মা যিনি, তাঁর কাছে নিয়ে যায়।

আমাদের পক্ষে *জপই* হলো একমাত্র করণীয় কার্য, আর আমরা যেন সৌজন্যমূলক ভাবেই কখনো কখনো এর নাম দিয়ে থাকি 'ধ্যান'। যতদিন না আমরা নৈতিক সংস্কৃতি, কর্তব্য পালন, *জপ,* প্রার্থনা, নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ ও যথাসম্ভব তাদের অর্থবোধের জন্য চেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করছি, ততদিন প্রকৃত ধ্যানের মতো উচ্চতর সাধনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই সব প্রাথমিক অভ্যাসগুলির সাহায্যে আমরা মনকে নানারকম বিক্ষেপ থেকে সরিয়ে আনতে পারি, এবং প্রথম প্রথম ছেদ পড়লেও নিরন্তর পবিত্র চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারি। পরে, ক্রমাগত অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা-প্রবাহ চালিয়ে যেতে পারব।

আমরা দেহ-মনে, চিন্তায়, কথায় ও কাজে যত শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হব, ততই বেশি বেশি একাগ্রতা অর্জন ও আরো ভাল ধ্যানাভ্যাস করতে পারব। আর তারপর, সময় হলে ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার দুই ভাবেরই সান্নিধ্যে আসতে পারব। তখন নিজ নিজ অন্তঃকরণে, সসীম ও অসীমের মধ্যে, জীবাত্মা ও আত্মার আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ অনুভব করব। এইভাবে ধ্যান তার লক্ষ্যে, শ্রেষ্ঠ চেতনাতীত অবস্থায় পৌঁছয়, যেখানে জীবাত্মা দিব্য সত্তার—নিজের প্রকৃত আত্মার—সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে এবং তার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণতা ও মুক্তি, শান্তি ও আনন্দ লাভ করে।

ঈশ্বরের নামে যেন সকলের ওপর শান্তি ও আনন্দ বর্ষিত হয়।

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

# নিরাকারের ধ্যান

## অদ্বৈতবাদ হলো সুদূর লক্ষ্য

কোন একটি সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোকে হিন্দু উপাসনার প্রকৃত মর্মটি সঙ্গতভাবেই প্রকাশ পেয়েছে ঃ

> রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
> স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
> ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
> ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥ [১]

'—হে প্রভু, তুমি নিরাকার, তবু আমার ধ্যানে আমি তোমায় নানা রূপে ভূষিত করছি। হে প্রভু, তুমি জগতের শিক্ষাদাতা, তোমার মহিমা কীর্তন করে, তুমি যে সকল বাক্যের অতীত এই সত্যের বিপরীত আচরণ করেছি। তীর্থে ও তুল্য স্থানে তুমি বিশেষভাবে প্রকটিত আছ বলে, আমি তোমার সর্বব্যাপিতাকে অস্বীকার করেছি। হে জগৎ প্রভু, প্রার্থনা করি—তোমাকে এই তিনভাবে বিকৃত করায় আমার যে অপরাধ হয়েছে, তা ক্ষমা কর।'

সব রূপের পেছনে, সব নাম ও প্রতীকের পারে, সেই অরূপ নির্গুণ পরম জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে আছেন, এই ধারণাকে ভিত্তি করেই—সব রকম উপাসনা করা হয়ে থাকে। অধ্যাত্ম জীবন যেন সোপান শ্রেণী, যা দিয়ে পৌঁছনো যায় অদ্বৈত অনুভূতির শেষ ধাপে, যাকে ছাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেহেতু, আমরা প্রায় সকলেই এখনো সোপানের ওপরেই আছি—ছাদে নয়, সোপানগুলির ওপর আমাদের খুবই জোর দেওয়া দরকার, কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে সব সোপানের পারে ছাদই আমাদের লক্ষ্য। উপরন্তু, আমাদের আগে জানতে হবে সোপান শ্রেণীর ঠিক কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

অনেকেই, অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে অল্প কিছু বই পড়েই, অদ্বৈত ভাবে ধ্যান অভ্যাস করতে চায়। কত লোকেই না নিরপেক্ষ সত্য (পরব্রহ্ম) নিয়ে কথা বলে। কিন্তু

---

১ অনামী

তারা সাধনার পথে কি লাভ করে? কিছু দিন বাদে প্রায় সকলেই এ পথ ছেড়ে দেয়। তারা দিশেহারা হয়ে যায়। অল্প কিছু লোক কয়েকমাস, এমনকি বছর, বৃথা চেষ্টার পর বোঝে যে অদ্বৈত ভাব তাদের ধারণার অতীত। লোকে ভুলে যায় যে—অদ্বৈত ভাব অনুভূতি-সাপেক্ষ একটি অবস্থা। বুদ্ধির স্তরে ভাল লাগাই আসল কথা নয়, যতটুকু সাধন করে পাওয়া যায়, সেটাই আসল কথা। কেবল বই পড়েই কোন কিছু চেষ্টা করা উচিত নয়।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন দ্বৈতবাদী অনুভূতি-শূন্য অদ্বৈতবাদী (একেশ্বরবাদী) অপেক্ষা অনন্তগুণে ভাল।

যতদিন আমরা ধ্যান করতে থাকব, যতদিন ধ্যান ও সূক্ষ্মতমরূপে হলেও ধ্যেয় বিষয়টি থাকবে, ততদিন তা দ্বৈতবাদ। অতএব অদ্বৈততত্ত্ব নিয়ে আমাদের এখন উদ্বিগ্ন হতে হবে না। এখনই একত্বে মগ্ন থাকার বিষয়েও উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ লোকেরই ঐ অবস্থায় পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বছরও লাগতে পারে।

## বহুর পেছনে এক

কিন্তু বহুর মধ্যে এককে নিয়ে আসাই হলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সব বহুত্বের মধ্যে থেকে আমাদের চরম লক্ষ্য সেই এককে আমরা যেন না ভুলি। আমরা ঈশ্বরের যে সব সাকাররূপের ধ্যান করি, অনন্ত নিরপেক্ষ সত্তা যেন অবশ্যই তার পটভূমি হয়। ভক্তি পথে সাধক *ইষ্ট-দেবতার* বা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্বের ওপর মন ও হৃদয়কে একাগ্রভাবে সন্নিবেশিত করে। বেশির ভাগ লোকেরই ধ্যানের জন্য এই রকম পবিত্র রূপের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু তারা যেন ভুলে না যায় যে এই সব দিব্য রূপ সেই পরম সত্তারই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। তোমার আত্মা আর ঐ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্ব এক পরম তত্ত্বে বা বেদান্তের ব্রহ্মে সত্তাবান, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্বটি ব্রহ্মেরই একটি বিশেষ প্রকাশ।

মহান অবতার ও মহাপুরুষগণের মধ্যে তুমি পবিত্রতা, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতির স্বতন্ত্র ধরনের প্রকাশ দেখতে পাবে। আমাদের নিজ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রেও ঐ একই পবিত্রতা, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি রয়েছে, কিন্তু এ সবই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকৃত সত্তা ও মিথ্যা সত্তার এক মিশ্রণ। আলোক স্ফুলিঙ্গ নিজ আলোক স্বভাব ভুলে গিয়ে নিজের ওপর মেঘের (অন্ধকারের) স্বভাব আরোপ করে, আর তখনই জীবনে যত কষ্ট ও দুঃখ এসে হাজির হয়, যদি তুমি কল্পনা কর যে অনন্ত চৈতন্য-সাগরে ডুবে গেছ, তোমার বোধ হবে যে তোমার ব্যক্তিত্বটি কোন রকম সূক্ষ্ম বস্তু, যা স্থূল হয়ে গেছে।

## নানা রকমের নিরাকার ধ্যান

অবশ্য কোন শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্ব অবলম্বনে ধ্যানের পরিবর্তে, তোমার ইচ্ছা হলে, ঈশ্বরের কোন অ-মানবরূপী প্রতীক, যেমন সমুদ্র বা আকাশ বা বিস্তৃত আলোকিত অঞ্চল বা শূন্যস্থান, অবলম্বনে ধ্যান করতে পার। এই হলো নিরাকারের ধ্যান, কিন্তু মনে রেখো—এ অদ্বৈতবাদ নয়, তার দিকে একটি ধাপ মাত্র। আলোক-সমুদ্রের ধ্যান আর শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্বের ধ্যান দুই-ই দ্বৈত ধ্যান, কিন্তু আগেরটি পরেরটি থেকে অদ্বৈতবাদের বেশি কাছাকাছি। আমি আবার বলছি অনুভূতিশীল দ্বৈতবাদী অনুভূতিহীন অদ্বৈতবাদী অপেক্ষা বহুগুণে ভাল।

নিরাকার ধ্যানে, মনে কর যে তুমি বিশাল আলোকপুঞ্জরূপ যাঁর পূজা করছ আর ক্ষুদ্র আলোক কণিকারূপ তুমি—দুজনেই বিশাল অনন্ত আলোক সমুদ্রে ডুবে গেছ। প্রথমে আমরা কম-বেশি কেবল এই শরীরটার কথাই চিন্তা করি, আর আমাদের ও সব জিনিসের পেছনে যে চৈতন্য-তত্ত্ব রয়েছে, তার সম্বন্ধে কেবল অস্পষ্ট ধারণাই থাকে। পরে আমরা শরীরের থেকে চৈতন্য-তত্ত্বের ওপরই বেশি মনঃসংযোগ করতে আরম্ভ করি, ও দেখতে চেষ্টা করি সেই ঈশ্বর-স্ফুলিঙ্গকে, যিনি সকল শরীরের মধ্যে বাস করে তাদের জীবন দান করছেন।

ভক্তের পক্ষে নিরাকারকে ততটাই ভালবাসা সম্ভব, যতটা ভালবাসা সে সাকার ঈশ্বরের ওপর দিতে পারে। এ কেবল মানসিক প্রকৃতির প্রশ্ন। এতে তিনটি ধাপ রয়েছে : ১. সগুণ সাকার। ২. সগুণ নিরাকার। ৩. নির্গুণ নিরাকার।

অধ্যাত্ম সাধনার সময়ে, আমাদের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট মনোভাব নিতে হবে—যেখান থেকে অগ্রসর হতে হবে। কোন কোন ভক্ত, এক রকম মনোভাব নিয়ে সগুণ সাকারের দিকে ঝোঁকে, আবার অন্য মনোভাব নিয়ে সগুণ নিরাকারের দিকে ঝোঁকে। আমাদের মনোভাব যাই হোক, প্রত্যেক ধাপেই আমাদের অবশ্যই ঈশ্বর-সংস্পর্শে থাকতে হবে। এই আন্তরিক সংযোগই বেশি গুরুত্বপূর্ণ—ধ্যানের বিষয়ের থেকে, তা সে সাকারই হোক আর নিরাকারই হোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সংস্কৃত রচনা খুব পছন্দ করতেন, যার অনুবাদ হলো—

> "রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ? হনুমান বললে, রাম! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস। আর রাম যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।"[২]

---

২ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৫২

যে দৃষ্টিভঙ্গিটি আমরা অবলম্বন করব, তা যেন অবশ্যই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি-ভিত্তিক হয়। বই পড়ে পড়ে দৃষ্টিভঙ্গি বার বার পরিবর্তন করা উচিত নয়। কোন উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি মর্মস্পর্শী হতে পারে, কিন্তু আমরা কি তা ব্যবহারিক জীবনে সত্য সত্যই প্রয়োগ করতে পারব? এই হলো প্রশ্ন।

কোন কোন সাধক আছে, যারা কেবল এক রকম ধ্যান অভ্যাসে তৃপ্ত নয়। তারা অনন্ত সমুদ্রের কথা ভাবে—যাতে পূজক ও পূজ্য, বুদ্বুদ ও ঢেউ-এর মতো অবস্থান করে। ভক্ত নিজের থেকে ঈশ্বরের বিষয়েই বেশি চিন্তা করে। পরে সে পূজ্য বিষয়ে ও নিজ সত্তায় যে তত্ত্ব নিহিত আছে তার মননে চেষ্টিত হয়। তারও পরবর্তী ধাপে, বুদ্বুদ ও ঢেউ দুইই অনন্ত সমুদ্রে লীন হয়ে যায়।

যতদিন নিজ ব্যক্তিত্বের ওপর সামান্যতম আসক্তি থাকবে, ততদিন বার বার জন্ম-মৃত্যুর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। যখন এই আসক্তি দূর হবে, জলবিন্দু সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক এখনই সমুদ্রে লীন হওয়ার ব্যাপারে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। এরূপ হওয়া বহু সময়-সাপেক্ষ। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের কাছে এক মহিলা এসে ব্রহ্মে লীন হওয়ার কল্পনায় তার ভীতির কথা প্রকাশ করে। স্বামীজী হেসে তাকে বললেন, এ রকম ভয়ের কোন কারণ নেই। জল বিন্দু যখন সমুদ্রের কাছাকাছি হবে, সূর্যতেজ তখন তাকে আবার ওপরে তুলে দিয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবে। জীবাত্মার ব্রহ্মে লীন হওয়ার মতো কোন আসন্ন বিপদ নেই। বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটতে লক্ষ লক্ষ বছরও লাগতে পারে। ততদিন পর্যন্ত তারা বার বার জন্মাবে দেশবাসীর মধ্যে কাজ করতে, তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হতে।[৩]

মৃত্যুর পূর্বে, আমরা অবশ্যই অন্তত কিছু আভাস পাব, তারপর এগিয়ে যাব। যদি এই জীবনেই তুমি সাধনায় সফল না হও, বার বার সাধনা আরম্ভ কর, জীবনের পর জীবন এগিয়ে চল, যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছ।

## প্রথমে নিজেকে নিয়ে আরম্ভ কর

আমরা কোন শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিত্বের অথবা নিরাকারের, যে ভাবেই ধ্যান অভ্যাস করি না কেন, সব থেকে গুরত্বপূর্ণ কাজ হলো, আমাদের নিজ নিজ শরীরের সঙ্গে একাত্মভাব কমিয়ে আনতে হবে। কিছু কিছু লোক সাকার উপাসনার 'মাটির মূর্তি' পূজার নিন্দা করে, এদিকে তারা নিজ শরীরের প্রতি আসক্ত। অনেকের কাছে নিজের দেহই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূজ্য। এই রকম দেহ পূজা, যতরকম মূর্তি পূজা

৩ Eastern and Western Disciples, *The Life of Sw. Vivekananda* (Kolkata : Advaita Ashrama, 1974), p. 351.

আছে তার মধ্যে নিকৃষ্টতম। অথচ কত লোকেই না নিজেদের উন্নততর মানুষ ভাবে—যেহেতু তারা 'মাটির মূর্তি' পূজা করে না! কিছু লোক ঈশ্বরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী, কিন্তু আত্ম-বিশ্লেষণে রাজি নয়! নিরাকার বা নৈর্ব্যক্তিক ভাবের ধারণাটি ঈশ্বরের দিকে প্রয়োগ করার আগে নিজের দিকে প্রয়োগ কর। নিজেদের সম্বন্ধে ধারণার ওপরেই সত্য সম্বন্ধে ধারণা নির্ভর করে থাকে—এ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। কাজেই নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান করতে হলে আমাদের অবশ্যই প্রথমে নিজেদের নিরাকার বলে ভাবতে হবে। ঈশ্বরের সাকার রূপটি সরিয়ে দেবার আগে, অবশ্যই নিজেদের ব্যক্তিরূপটিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা দরকার। বেশির ভাগ লোক এ কাজ করবে না। তাই তারা—তাদের নিরাকার ধ্যান থেকে প্রায়ই কোন ফল পায় না। অনেকেই নিরাকার ধ্যানের নাম করে মনকে এক বিবশ অবস্থায় এনে ফেলে। অসংস্কৃত মন থেকে সব সাকার ভাব সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সাধারণত নিদ্রা এসে হাজির হয় অথবা শুভ চিন্তার বদলে মনে অশুভ চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটার সুযোগ করে দেওয়া হয়। তাই নিরাকার ধ্যান অভ্যাস করতে হলে নিজেকে দিয়েই আরম্ভ কর। নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ, অন্তর্জ্যোতিস্বরূপ ভাবতে শেখ।

শরীরকে ভেতর থেকে দেখতে চেষ্টা করে ও একে যে প্রাণবন্ত করছে সেই চৈতন্যের চিন্তা করে, আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি একেবারে লোপ না পেলেও, ব্যক্তিত্ব বোধ স্পষ্টভাবে কমে যায়। আবার, এই ভেতর থেকে দেখার পদ্ধতি—মনে যে সব সাকার রূপ আসছে ও কষ্ট দিচ্ছে—তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেষ্টা কর। নিজেদের ও অন্যদের বাহ্যরূপগুলি বাসনা ও কামনার সঙ্গে জড়িত থাকে। সেগুলি যেন তখনই পালিয়ে যায়—যে মুহূর্তে আমরা অন্তর্দৃষ্টি পাই। আমাদের শরীর চেতনার ব্যাপারে মুখমণ্ডলের অবদান অনেকটা। আমরা অন্তর থেকেও মুখমণ্ডলের দিকে তাকাতে পারি। শ্রদ্ধার সঙ্গে এর দিকে তাকালে আমাদের পক্ষে প্রত্যেকরূপের মধ্যেই ঈশ্বর-দর্শন সহজতর হয়ে পড়ে।

প্রথমে, ঐ ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে হবে, তারপর আমরা অবশ্যই একে লীন করে ফেলব, তথাকথিত নিরাকারে (নৈর্ব্যক্তিত্বে)। এই নিরাকার থেকেই তখন উঠবে এক শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব, যা সর্বদা নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন ও তাতেই প্রতিষ্ঠিত। ইনিই আমাদের উচ্চতর সত্তা, ইনিই ঈশ্বরের প্রকৃত যন্ত্র হয়ে ওঠেন।

আত্মাকে অবলম্বন বলে ভাবতে আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে। কখনই শরীর-ভাবনার ওপর জোর দেবে না। নিজেকে কখনই নর বা নারী বলে ভাববে না। এই পচা ব্যক্তিত্ব বোধকে, আমাদের এই অর্থহীন অহংবোধকে, অবহেলায় ভেঙেচুরে উড়িয়ে দাও—তার জন্য সাহায্য নাও শঙ্কর-রচিত কিছু কিছু স্তোত্রের, যেমন ঃ

**মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।**
**ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥**[৪]

—আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহংকার নই, চিত্তবৃত্তিও নই, কর্ণও নই, জিহ্বা, নাসিকা, স্পর্শেন্দ্রিয় বা চক্ষুও নই, আমি আকাশ, ভূমি, অগ্নি বা বায়ুর মতো উপাদানও নই। আমি শুদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। আমি পরমাত্মা, আমি পরমাত্মা।

**... পুমান্ নৈব ন স্ত্রী তথা নৈব ষণ্ডঃ প্রকৃষ্টঃ প্রকাশস্বরূপঃ শিবোঽহম্।**[৫]

—আমি পুরুষ বা স্ত্রী নই ক্লীবও নই। আমি শ্রেষ্ঠ কল্যাণময় সত্তা পরম জ্যোতিঃ।

**নাহং মনুষ্যো ন চ দেব-যক্ষৌ ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ ।**
**ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ ॥**[৬]

—আমি মনুষ্য নই, দেবতা নই, দেব-কল্প যক্ষও নই, আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য অথবা শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী ছাত্র নই, সংসারী বা বানপ্রস্থী অরণ্যবাসী নই, সন্ন্যাসীও নই, আমি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা।

আন্তরিকভাবে বার বার জপ করতে থাক—'আমি ব্রহ্ম', 'আমি ব্রহ্ম'।

## চেতনান্তর সমূহ

আমাদের চেতনা দেহকেন্দ্রিক হতে পারে। মন আমাদের চেতনার কেন্দ্র হতে পারে। ক্ষুদ্র আত্মা আমাদের চেতনার কেন্দ্র হতে পারে। অনন্ত আমাদের চেতনার কেন্দ্র হতে পারে। আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের সমস্ত কর্ম ও চিন্তা আমাদের নির্বাচিত চেতনা-কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করে থাকে, আর সেখানেই আমাদের ভর-কেন্দ্র।

আমাদের দু-রকমের চেতনা রয়েছে। আমরা আমাদের জীবাত্মাকে আমাদের চেতনা-কেন্দ্র করে তার মধ্যেই অনন্তকে অনুভব করি; অথবা অনন্তকে আমাদের চেতনা-কেন্দ্র করে জীবাত্মাকে এই অনন্তের প্রকাশরূপে অনুভব করি। জীবাত্মাকে চেতনা-কেন্দ্র করে, আমরা অনুভব করি অনন্ত যেন তাকে চারদিকে ঘিরে একটি বৃত্তরূপে রয়েছে; অথবা অনন্তকে চেতনা-কেন্দ্র করে, আমরা অনুভব করি জীবাত্মা যেন তারই মধ্যে একটি বিন্দুর মতো রয়েছে। প্রত্যেকটি জীবাত্মা যেন এক একটি বিন্দু, আর ঈশ্বর যেন এক অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্ররূপ হয়ে বৃত্তের সব বিন্দুকে এক সঙ্গে যুক্ত করছে। প্রথম প্রথম এ সবকে কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হবে, কিন্তু শেষে এইটিই অনুভূতি হয়ে দাঁড়াবে।

---

৪ শঙ্করাচার্য, *নির্বাণষট্‌কম্*, ১ ৫ ঐ, *নির্বাণ মঞ্জরী*-১ ৬ ঐ, *হস্তামলক স্তোত্রম্*-২

আমরা এই তিনরকম আধ্যাত্মিক মানসিকতায় থাকবার চেষ্টা করতে পারি :

১। এককরূপের ধ্যান করে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে তাতেই লয় করা।

২। আপন সত্তায় অনন্ত-বুদ্ধি আরোপ করে, আপন ব্যক্তিত্বকে ঐ অনন্তের বিকাশ মাত্র বলে অনুভব করা।

৩। নিজেকে ব্যক্তিরূপে চিন্তা করে, অন্তর্নিহিত সর্বব্যাপ্ত তত্ত্বের, জীবাত্মা যার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেই বিরাট আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করা।

যতদিন অহংবোধ থাকবে, আমরা যেন ২ বা ৩ নং মানসিকতার মতো অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখি। অহং যেন অনন্ত সত্তা থেকে বেশি সত্য এইরূপ বোধ কখনো হতে দিও না।

এককরূপের ভাবটিকে দৃঢ় করার জন্য, আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কোন রকম অদ্বৈতভাবের ধ্যান বার বার অভ্যাস করা উচিত। ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা কর। উদারতম গুণসম্পন্ন কোন পবিত্র মূর্তি থেকে সগুণ নিরাকারের উপাসনায় পৌছনো যেতে পারে। সেখান থেকে এগিয়ে যাও নির্গুণ নিরাকার শুদ্ধ সত্তার দিকে।

ফেরার পথে বিপরীতক্রম ধরে ফের। এভাবে চললে দেখবে জীবাত্মা সব সময়ে ঈশ্বরের সহায়তা ও সান্নিধ্য পাচ্ছে—দৃঢ়বদ্ধ দেহাত্ম-বোধ থাকলেও।

## নৈর্ব্যক্তিক বা নিরাকার ধ্যান

নিচের তালিকাভুক্ত যে কোন এক রকম নিরাকার ধ্যানের অভ্যাস করতে পার :

১। সাধক কল্পনা করে, সে যেন মাছ হয়ে, অখণ্ড ও চির অখণ্ডনীয় সৎ-চিৎ-আনন্দ সাগরে সাঁতার দিচ্ছে, কোথাও কোন বাধা তাকে পেতে হচ্ছে না।

২। সাধক কল্পনা করে, সে যেন পাখি হয়ে অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—কোথাও কোন বাধা তাকে পেতে হচ্ছে না।

৩। সাধক যেন জলে পূর্ণ-নিমজ্জিত একটি পাত্র—যার ভেতরে ও বাইরে জল।

৪। সাধক কল্পনা করে, সে যেন এক আত্ম-সচেতন আলোক বিন্দু—এক অবিভাজ্য আলোক সাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

তুমি আলোক বিন্দুর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বোধ কর; পরে অনুভব করতে থাক যে তোমার আলোকবিন্দুটি এক অনন্ত আলোক মণ্ডলের অংশ। শেষে তোমার আলোকবিন্দুকে স্ফীত কর, বা অসীম আলোকে নিমগ্ন কর বা তাকে যত্রতত্র সরে

যেতে দাও। কিন্তু সর্বত্রই আলোক ছাড়া অন্য কিছুই পড়ে থাকে না। এ এক বিস্ময়কর ধ্যানবিধি।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্বন্ধে সামান্য বিদ্যা থাকলেই আমরা অসীম ব্যাপ্তির ভাবটি ধরতে পারি। আমরা অনন্তের চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু অসীম ব্যাপ্তির কথা চিন্তা করতে পারি; এবং ধীরে ধীরে তাকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ভাবে চিন্তা করতে পারি। আকাশের বিস্তারের কথা এবং নক্ষত্রসমূহের ও ছায়াপথগুলির কল্পনাতীত আয়তনের কথা ভাব। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

**যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদান্তরঃ যং চন্দ্রতারকং**
**ন বেদ, যস্য চন্দ্রতারকং শরীরম্, যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো**
**যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥** [৭]

—গ্রহ-নক্ষত্রের সংহতিতেই অনন্তের বাস। একই অনন্ত তাদের ভেতরে ও বাহিরে রয়েছে—আবার রয়েছে মানব সত্তার অন্তরেও।

সীমিত, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সামান্য বস্তুর চিন্তা ছেড়ে অসীম ব্যাপ্তির, অনন্তের, নক্ষত্রসমূহের, সৌরমণ্ডলের, ছায়াপথের এবং নীহারিকাগুলির চিন্তা করা প্রশস্ত—যে নীহারিকায় নতুন নক্ষত্রগোষ্ঠীর সৃজনপর্ব চলেছে। পরে পৃথিবী, আকাশ, সৌর-জগৎ প্রভৃতি সব কিছুকেই সেই অনন্ত, অখণ্ড আলোক সমুদ্রে দ্রবীভূত করে দাও।

হিন্দুদের প্রাচীনতম ও পবিত্রতম স্তুতিগুলির অন্যতম সুপরিচিত 'পুরুষ-সূক্ত'টিতে বৈদিক ঋষি বলেছেন ঃ

**এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।**
**পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ... ...।**[৮]

—এই সব প্রকটিত মহাবিশ্ব ঈশ্বরের মহিমার অতি সামান্য অংশমাত্র। যেমনই হোক, এই রকম একটি অণুপ্রমাণ খণ্ডাংশই বটে।

যখনই তুচ্ছ, হীন, সামান্য বস্তু নিয়ে থাকার ফলে আমাদের মন সঙ্কুচিত হয়, তখনই আমাদের উচিত এই সব চিত্তোদ্দীপক চিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখা। চিন্তা কর আকাশের বিস্তারের কথা, অসংখ্য সৌরজগতের বিশালতার কথা। কিন্তু দেখ. এই সব বিকাশের মধ্যে—প্রকৃতির মধ্যে, আকাশের মধ্যে—তুমি যেন ঈশ্বরেরই চিন্তা করতে থাক—প্রকৃতিকে ঈশ্বররূপে নয়।

কখনো কখনো মনের একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের বিশেষ মানবীয় বা মানবেতর রূপ আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অন্যথা অধিকাংশ লোকের পক্ষে মনের একাগ্রতা আনা সম্ভব নয়। কোন বিষয়ের নির্দিষ্ট রূপ ছাড়া, আমরা মনকে

---

৭ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, ৩/৭/১১, ৮ *ঋগ্বেদ*, ১০/৯০/৩

স্থির করতে পারি না, একাগ্রও করতে পারি না। অধিকাংশ লোক কোন রকমেই তা পারে না।

অতএব, একাগ্রতার জন্য কিছু নির্দিষ্ট, কিছু সাকার বস্তু প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, সাকার রূপটির পছন্দে, মনোভাবের প্রশ্ন এসে পড়ে। যখন আমরা একাগ্রতায় পটু হয়ে যাব, তখন যেন আমরা সীমার মধ্যে যে অসীম রয়েছেন তারই ধ্যান করি। যদি তুমি অসীমের সঙ্গে সীমিত বস্তু যোগ সাধন করতে পার, আর সীমিত বস্তুকে অসীমেরই বিকাশরূপে ভাবতে পার, তবে সেই ধ্যানই হবে সুমহান, কিন্তু ঐ সীমিত বস্তুকে কখনই ঈশ্বররূপে দেখবে না। সাধককে দেখতে হবে ঈশ্বর যেন সব সীমিত রূপের পেছনে অবস্থিত রয়েছেন, কিন্তু সে যেন এই সীমিত রূপকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ না করে। প্রথম ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের ওপরেই তার গুরুত্ব দেওয়া হলো; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সীমিত রূপটির ওপর—যা অত্যন্ত বিপজ্জনক ও মনকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যাবে। যখন আমরা অসীমের বিকাশরূপে সীমিত বস্তুর ওপর ধ্যান করি, তখন তীব্রতা ও ব্যাপকতা দুই-ই পেয়ে থাকি। যদি ঠিক ঠিকভাবে করা হয়, তবে এই ধ্যান খুবই মহিমা-মণ্ডিত হবে।

এই সব ধ্যানের মধ্যে, আমরা যে এক একটি জীবাত্মা, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি যেন আমরা না ভুলি। আমরা সীমিত সাকার রূপেরই ধ্যান করি বা নিরাকারের ধ্যান করি, আমাদের নিজেদের এক একটি জীবাত্মা ভাবা উচিত। আর আমাদের সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে ঈশ্বর জীবাত্মা অপেক্ষা আরো বেশি সত্য ও আরো বিশাল। যেমন শঙ্করাচার্য বলেছেন,

> **সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।**
> **সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥**[৯]

—হে প্রভো ! তরঙ্গই সমুদ্রে লীন হয়ে যায়, সমুদ্র কখনো তরঙ্গে লীন হয় না। ঠিক তেমনি, যখন সমস্ত ভেদ (দ্বৈতবুদ্ধি) দূরীভূত হয়, তখন আমিই তোমাতে হারিয়ে যাই, তুমি আমাতে হারাও না।

## আত্মায় মগ্ন থাক

অধ্যাত্ম চেতনার উচ্চতর স্তরে সাধক জগৎ-প্রপঞ্চকে একেবারে ভুলে যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে এই ভাবটি ব্যাধের পাখিকে লক্ষ্য করার উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ব্যাধ তার কাজে এত বেশি মগ্ন ছিল যে তার পাশ দিয়ে একটি বরযাত্রীর দল গোলমাল করতে করতে চলে গেলেও, সে বিষয়ে তার চেতনা হয়নি।[১০]

---

৯ শঙ্করাচার্য, বিষ্ণুষট্‌পদী-৩

১০ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৭৯৪

অধ্যাত্ম জীবনে মৌলিক নিয়ম হলো, যাকেই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি—তাই আমাদের সমস্ত শক্তি, আমাদের বুদ্ধি, চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস টেনে নেয়। যদি এই জগৎই আমাদের কাছে সত্য হয়, তবে আমরা একে নিয়েই সর্বথা ব্যস্ত থাকি। বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-সংক্রান্ত সূক্ষ্ম ভাবগুলি নিয়ে গভীরভাবে ব্যস্ত থাকে। যদি তুমি আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে যেতে চাও, তবে তোমার কাছে আত্মচৈতন্য থেকে এই জগৎ বেশি সত্য, এরূপ বোধ আর তোমার থাকা উচিত হবে না। কোন সাধক দ্বৈতভাবও পোষণ করতে পারবে না, যদি না সে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরই হলেন সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চের থেকে আরো বেশি সত্য। দ্বৈতবাদী এমনও ধরে নেয় যে ঈশ্বরের তুলনায় এই জগৎ এক নিম্নতর স্তরের সত্য। একমাত্র ঈশ্বরেই আনন্ত্য ও অমরত্ব গুণ বর্তমান। কোন ধর্মেই জগৎ-সংসারকে ঈশ্বরের তুল্য মর্যাদা দেয় না।

অদ্বৈতবাদ প্রথম থেকেই দাবি করে যে জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা ও একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। দ্বৈতবাদ প্রথমে জগতের সত্যতা স্বীকার করে অগ্রসর হয় এবং পরে এই সত্যের উৎসকে—ঈশ্বরকে—অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করে। যেমনই হোক, সাধক যখন চেতনাতীত ভাবে অধিষ্ঠিত হয়, সে প্রথমে দ্বৈতবাদী থাকুক আর অদ্বৈতবাদীই থাকুক, তার চেতনায় জগৎ-সংসার লোপ পায়। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সংজ্ঞাদুটি জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ককেই উল্লেখ করে। এটি লক্ষণীয় বিষয়। জগৎ-সংসার সত্য কি মিথ্যা, সেটি আলোচ্য বিষয় নয়। যা আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ঈশ্বরের অধিকতর সত্যতার ওপর জোর দেওয়া ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করা যায়? অংশকে পূর্ণের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত করা যায়? অধ্যাত্ম-জীবনে এই হলো আমাদের কাজ। আর এই কাজে যতটা সাফল্য লাভ করি, আমরা ততটা বেশি আধ্যাত্মিক, উদ্বুদ্ধ ও মুক্ত হই।

এর রহস্য রয়েছে সাধকের আপন সত্তা সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তনের ওপর। যদি আমরা নিজ দেহের সঙ্গে একাত্ম-বোধ করি, তবে এই জগৎ-সংসার ও এর সঙ্গে যুক্ত সব কিছুই আপনা থেকে আমাদের কাছে আসবে। যখন আমরা নিজেদের জীবাত্মারূপে ভাবব, কেবল তখনই ঈশ্বর আমাদের কাছে সত্যবস্তু রূপে অনুভূত হবেন। আমাদের দেহাত্ম-বোধকে, আমাদের নরত্ব-নারীত্ব বোধকে, আমাদের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বোধকে কিভাবে প্রতিহত করা যায়? এক বেগবান বিপরীত চিন্তাস্রোত সৃষ্টি কর, এই স্রোতকে এত তীব্র ও স্পষ্ট করে তোল যাতে অন্য সব ভুল চিন্তা ক্ষীণ হয়ে যায়। অদ্বৈতবাদী হোক আর দ্বৈতবাদী হোক, প্রত্যেকটি অধ্যাত্ম সাধককে এ কাজটি করতেই হবে। তাকে ভাবতেই হবে যে, সে নিজে দেহ-মনের সঙ্গে

সংযোগহীন স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মা। এই সত্য নিয়ে তাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, যতদিন না সেটি তার ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করে জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এনে দেয়।

পবিত্রতা অর্জনের রহস্য এইখানেই রয়েছে। আত্মা চিরকালই পবিত্র, আর আত্মাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপও বটে। নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি না করে, আমরা প্রকৃত পবিত্রতা লাভ করতে পারি না—যতই চেষ্টা করা যাক না কেন। বস্তুত দেহেন্দ্রিয়-মনের সঙ্গে আত্মার একাত্মবোধই সব অপবিত্রতার মূলে।

## আত্মার কথা ভাবতে ভাবতে আমরা আত্মাই হয়ে পড়ি

মন এমন বস্তু নয় যার অবস্থা জন্মগতভাবে একবার নির্দিষ্ট হয়ে বরাবরের মতো থেকে যায়। গতিময়তাই হলো এর স্বভাব, তাই উপযুক্ত নিয়মানুবর্তিতায় এতে পরিবর্তন আনা যায়। এর প্রবণতা হলো—যে সব অভিজ্ঞতা এর ওপর এসে পড়ছে তাদের প্রত্যেকটির ছবি ধরে রাখা—যতদিন না সেগুলি, বলতে গেলে আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়। একটি মন্দ লোকের বিষয় চিন্তা করতে করতে তার গুণগুলি আমরা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে ফেলে নিজেরা মন্দ হয়ে যাই। কোন পবিত্র ব্যক্তিত্বের ধ্যান করতে করতে তার পবিত্রতা ও তার গুণাবলী আমরা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করে নিজেরা পবিত্র হয়ে যাই। এই মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম সকল মানব সত্তার মধ্যে কাজ করে চলেছে। এই নিয়ম বহু পূর্বে ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছিল ও তাই সবরকম আধ্যাত্মিক ধ্যানের ভিত্তি হয়ে রয়েছে। অদ্বৈতবাদীও, এইরূপে উচ্চতর আত্মার স্বরূপ চিন্তা করে, মনের পরিবর্তন ঘটানোর মূল্য স্বীকার করে। তাই তুমি দেখবে *জ্ঞান* পথের সাধক—উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—রূপ মহামন্ত্রের ওপর বা শঙ্কর ও অন্যান্য আচার্যদের প্রণীত অদ্বৈত-অনুভূতির বর্ণনা সম্বলিত শ্লোকগুলির ওপর ধ্যানে মগ্ন থাকে।

আত্মার সত্য স্বরূপের ওপর একান্তভাবে মনঃসংযোগের ফলে, সাধক হারিয়ে যাওয়া আত্ম-স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু এতে তীব্র মনঃসংযোগ চাই। সমগ্র মনের স্রোত যেন একই লক্ষ্যাভিমুখী হয়। অবশ্য এ কাজ সম্ভব হবে না, যদি না আমরা আগে থেকে মনের পবিত্রতা অর্জন ও জগৎ-প্রপঞ্চ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে থাকি। জগৎ-সংসারের ও সেখানকার সুখভোগের প্রতি তীব্র অনাসক্তি ছাড়া, কোন সাধকই মনকে সামগ্রিকভাবে আত্মার দিকে ফেরাতে পারে না।

সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে, মন চঞ্চল। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলি নানা দিক থেকে

মনকে সর্বদা আকর্ষণ করছে, আবার মন নিজ আবেগ ও বাসনার তাড়নায় অনবরত এদিক ওদিক ছুটছে। আমাদের এই কাজের জন্য যে ওজরই আমরা দেখাই না কেন আমাদের স্বীকার করতেই হবে—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তির প্রচণ্ড শক্তির কথা। সংসারের প্রতি যে লোক সম্পূর্ণ অনাসক্ত, সে ক্ষণিকের চেষ্টাতেই সমগ্র মনকে আত্মাভিমুখী করতে পারে। সর্বদা ধ্যানে রত থাকার ফলে সে আত্মার সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি করে—মনের বা দেহের সঙ্গে নয়।

*ভাগবতম্*-এ ঐ ভাবটি পরিবেশিত হয়েছে এক অবধূত (পরিব্রাজক সন্ন্যাসী) আরশুলা ও বোলতার আচরণ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছিল তার মাধ্যমে।[১১] সকলেরই জানা আছে যে বোলতা তার হুলের সাহায্যে আরশুলা, পতঙ্গ, মাকড়সা প্রভৃতিকে অসাড় করে দিয়ে নিজ বাসায় বয়ে নিয়ে আসে। পরে এই অসহায় শিকারগুলির কাছে ডিম পেড়ে বাসাটিকে বন্ধ করে দেয়। ডিম ফুটলে যে শূককীটগুলি বেরোয় তারা ঐ পোকাগুলিকে খেয়ে বড় হয়ে বোলতার রূপ ধারণ করে। বোলতার পূর্ণ জীবনচক্র সম্ভবত ভারতে আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু তার বাসায় যে আরশুলা প্রভৃতি পাওয়া যায় তা সকলে জানে, তাই সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে আরশুলাটিই গভীরভাবে বোলতারূপ ধ্যান করতে করতে বোলতা হয়ে গেছে। এই হলো 'বোলতা ও আরশুলা' সম্বন্ধে রূপক কাহিনীর ভিত্তি—যা হিন্দু সাহিত্যে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

এর অর্থ এই নয় যে, আত্মার ওপর এ রকম ধ্যান এক রকমের স্বাভিভাবন। যদিও সৎ-বস্তু সাধারণ মানুষের মানসিক অভিজ্ঞতার অতীত, তবু শুদ্ধ মনে তাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ধ্যান অসতের ওপর নয়, সতের ওপর। যে সত্য আপন জ্যোতিতে উজ্জ্বল, ধ্যান কেবল তার বিপরীত চিন্তারাশির উদয়কে বাধা দান করে। আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং আমাদের সব চিন্তার পেছনে সদা অবস্থিত। যখন একাগ্রতার ফলে সমস্ত চিন্তা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং যে অজ্ঞান আত্মাকে আবরণ করে রাখে তার বিনাশ ঘটে, তখনই আত্মা বিভাসিত হয়ে ওঠেন।

## উপাসনা ও বিশ্লেষণ—দ্বিমুখী প্রণালী

সাধারণত আমাদের মনোজীবন ও ভৌতজীবন বলতে আমাদের স্থূল শরীরের সঙ্গে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের সম্পূর্ণ একাত্মবোধ বোঝায়, আর যেহেতু এই মিথ্যা একাত্মভাব থেকে সহসা রেহাই পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আমাদের অন্তত দেখা উচিত যাতে এই একাত্মভাবকে আমরা যথা সম্ভব খর্ব করতে পারি, আর লক্ষ্যের দিকে এগুতে এগুতে এই মিথ্যা একাত্মবোধ ক্রমাগতভাবে কমিয়ে ফেলার জন্য আমরা যেন সচেষ্ট থাকি।

১১ শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/৯/২৩

দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের সব আবেগের পেছনে—আমরা নর ও নারী, আমরা এক একটি ব্যক্তিত্ব ও এক একটি স্বতন্ত্র জীব—এই ধারণাটি বজায় থাকে। একই সঙ্গে আমরা এও বোধ করে থাকি যে আমরা আধ্যাত্মিক সাধক বা ঈশ্বরের ভক্ত। কিন্তু এই বোধকেই ব্যক্তিত্বভাব অতিক্রমণের একটি উপায় করে নেওয়া যায়। আমরা যে সাধক বা ভক্ত এই ভাবটি বজায় রেখে কোন পুরুষ বা স্ত্রী-দেবতার উপাসনা করতে পারি। কিন্তু এই ভাবের সঙ্গে কিছুটা আত্ম-বিশ্লেষণ করা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন, কারণ আমি যে সাধক ও ভক্ত, এ ভাবও শেষ পর্যন্ত মিথ্যা কল্পনায় পর্যবসিত হয়।

যেহেতু আমরা পুরাপুরি আত্ম-বিশ্লেষণের পথে চলতে পারি না, আমাদের মিশ্রপথ ধরতে হবে। নিজেদের ভক্ত ভেবে আমাদের ঈশ্বরোপাসনা করা উচিত, আর সেই সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চালাতে হবে আত্মারূপে এবং স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর সম্বলিত অনাত্মারূপে; এর পর আত্মার সঙ্গে একাত্মবোধ করার চেষ্টা চালাতে হবে—অনাত্ম বস্তু থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে এনে। উপাসনার ও বিশ্লেষণের এই দ্বিমুখী প্রণালী আমাদের সকলকে অনুসরণ করতে হবে।

একাগ্রতা আনার জন্য, আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই প্রয়োজন ঈশ্বরের একটি সাকারভাব, অথবা পবিত্র *ইষ্ট দেবতা*, কিন্তু ইষ্টদেবতার ধ্যানের পাশাপাশি এই পবিত্র ইষ্টদেবতা যে তত্ত্বের প্রকাশ তার বিষয় চিন্তা ও তার ওপর ধ্যান করার চেষ্টা চালাতে হবে। এইভাবে আমরা ঈশ্বরের সাকার ভাবের ধ্যান ও নিরাকার ভাবের ধ্যানের মিলন ঘটাতে শিখি। এর ওপর আমাদের চাই অদ্বৈতভাবের ধ্যান—যাতে আমরা আমাদের আত্মাকে আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররূপ অনাত্মা থেকে পৃথক করার চেষ্টা চালাতে পারি। এই ধারায় সকলকে চলতে হবে, আর এ কাজ বার বার করাও অত্যন্ত অপরিহার্য।

এও খুবই অপরিহার্য যে, আমাদের যেন প্রতিদিনের কাজে একেশ্বরবোধে ও অদ্বৈতভাবে (সাকার ও নিরাকার ভাবে) এক প্রস্থ ধ্যান-ক্রম থাকে, আর কোন ছেদ বা পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রতিদিন এই ধ্যানগুলির পাঠ ও পুনরাবৃত্তি যেন আমরা চালিয়ে যাই। এটা করা হচ্ছে কি না আমি জানি না, কিন্তু আমাদের ধ্যানাভ্যাসের অঙ্গ হিসাবে এ কাজ নিখুঁতভাবে করতে আমাদের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। এটি আমাদের *সাধনার* (আধ্যাত্মিক অভ্যাস) অপরিহার্য অঙ্গ। যদি কোনদিন কেউ দেখে যে তার দেহ-বোধ, তার স্বাতন্ত্র্য-বোধ, সাধারণ দিনের থেকে বেশি শক্তিশালী হয়ে পড়ছে, তবে সে যেন অবশ্যই অন্য সময়ের তুলনায় বেশিক্ষণ

ধরে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক—বিশেষত অদ্বৈতভাবের স্তোত্রাদির ওপর ধ্যান করে। মন বিদ্রোহ করলেও এ অবস্থায় সাধককে অবশ্যই বেশিক্ষণ ধ্যান করতে হবে। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব, কতকগুলি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ বার বার আবৃত্তি ও স্মরণ করা আমাদের উচিত। এ ব্যবস্থা প্রতিবার নতুন পাঠক্রম লওয়া থেকে অনেক ভাল। বার বার অভ্যাস করে এই সব ভাবের কিছু কিছু আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করাতে হবে।

তাই, সংসারের দুঃখ কষ্টে অভিভূত হয়ে পড়লে, আমাদের উচিত হবে তা থেকে সচেতনভাবে নিজেদের গুটিয়ে আনা এবং নিজ অন্তরে যে ঈশ্বর রয়েছেন সেদিকে এগিয়ে চলা। প্রকৃত অধ্যাত্ম সাধকদের প্রত্যেকের পক্ষেই বাহ্যজগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, সে সেই অনুপাতে ঈশ্বরের দিকে আরো বেশি এগিয়ে যাক আর নাই যাক। সংসারী লোক ঠিক তার বিপরীত কাজ করে। বিচার করে সংসার-জগৎ থেকে নিজেদের সরিয়ে না নিয়েই তারা ঈশ্বরের দিকে এগোতে চেষ্টা করে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে নিজ দেহ-মন থেকে আমাদের সরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট হলো না, আমাদের কর্তব্য হবে সীমিত আত্মাকে অনন্তের সঙ্গে, স্বতন্ত্রকে বিরাটের সঙ্গে যুক্ত করতে সচেষ্ট হওয়া। এখনকার মতো আমরা এই পর্যন্তই করতে পারি, কারণ সেই জ্ঞানাতীত, নিরপেক্ষ সত্য (পরব্রহ্ম), একমেবাদ্বিতীয়ম্, বহু দূর এবং বহু কাল পর্যন্ত আমাদের নাগালের বাইরেই থাকবে।

আমাদের দেহের সঙ্গে একাত্মবোধ যতই কমতে থাকে আমরা সেই অনুপাতে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হই; আমরা যে পরিমাণে শুদ্ধ হই, সেই অনুপাতে আমাদের দেহাত্মবোধ কমতে থাকে। এই দুটি—শুদ্ধি আর অনাসক্তি—পাশাপাশি চলে; এটি সমান্তরাল-ভাবে উন্নয়নের দৃষ্টান্তস্থল, কোন আবর্তনক্রমিক কোন কার্য-কারণের নিদর্শন নয়। আমাদের দেহাত্মবোধ যত কমে, আর আন্তর-শুদ্ধির ক্রিয়া জোরদার হয়, সেই অনুপাতে আত্মোপলব্ধির দিকে আমাদের অগ্রগতি হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই মন্ত্রটি আছে ঃ

**স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।**
**ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ ॥** [১২]

—নিজ দেহকে নিম্নমন্থন দণ্ড, আর ওঁকারকে ঊর্ধ্বমন্থন দণ্ড করে, ধ্যানাভ্যাসের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে প্রভুকে তাঁর নিগূঢ় সত্যরূপে আমাদের দর্শন করা উচিত।

অর্থাৎ, সাধককে অবশ্যই অবিচলিত ভাবে অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিজ *জপ* চালিয়ে

১২ *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্*, ১/১৪

যেতে হবে, আর সেই সঙ্গে আত্মায় মনঃ-সন্নিবেশ করতে হবে। এই হলো উপাসনা ও আত্ম-বিশ্লেষণরূপ দ্বিমুখী প্রণালী।

চিন্তার মতো, জ্ঞান অজ্ঞানকে দূর করে, তারপর সেই জ্ঞান বিলীন হয়ে যায়। জ্ঞানের সাহায্যে সাধক ব্যক্তি-সত্তার প্রকৃত ধারণা, আবার বিশ্ব-সত্তারও প্রকৃত ধারণা লাভ করে ও তাদের সম্পূর্ণ মিলন ঘটায়। তারপর জ্ঞান বিলীন হয়ে যায়, তখনই পরম নিরপেক্ষ সত্তায় পৌছনো যায়, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয় কিছুই থাকে না। শুদ্ধ, অনন্ত চৈতন্যই কেবল থেকে যায়।

যে ভক্ত দ্বৈত উপাসনার পথে চলে, সে নিজ সত্তাকে ঈশ্বর সত্তার সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করে; অদ্বৈত পথের সাধক চেষ্টা করে চরম বিশ্লেষণে পৌছতে—যেখানে যা কিছু অনীশ্বর সবই বিদূরিত হয়, তখন ঈশ্বরোপলব্ধি হয়। দু-রকম উপাসনাতেই অহং অস্বীকৃত ও বিদূরিত হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায়। ভক্ত বলে, 'আমি কিছু নই, প্রভু তুমিই সব।' অদ্বৈত উপাসক বলে, 'আমার ব্যক্তি-সত্তা কিছু নয়, অনন্তই সব।' একটি সংস্কৃত শ্লোকে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে ঃ

**তবাস্মীতি ভজত্যেকঃ ত্বমেবাস্মীতি চাপরঃ।**
**ইতি কিঞ্চিৎ বিশেষোঽপি পরিণামঃ সমোদ্বয়োঃ।।** [১৩]

—কাহারো উপাসনা মন্ত্র হলো, 'আমি তোমার', অন্য কাহারো 'আমি একমাত্র তুমিই'। দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সামান্য ভিন্নতা সত্ত্বেও উভয়ের ক্ষেত্রে পরিণাম একই।

অতএব, প্রকৃতপক্ষে, সেই অনন্ত 'তুমি' আর এই অনন্ত 'আমি' একই বস্তু। দুটি ভাবই একই চরম উপলব্ধিতে পৌছে দেয়, কেবল প্রকাশ ভঙ্গিতেই তফাত: পথ সম্বন্ধেও একই কথা ।

---

১৩ নরহরি, 'বোধসার'

# ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বর সান্নিধ্যের সাধনা

## মনকে উচ্চতর স্তরে রক্ষা করা

অধ্যাত্ম-জীবনে সকালে বিকালে দু-এক ঘণ্টা ধ্যানে বসাই যথেষ্ট নয়। সারাদিন ঐ ধ্যানের মনোভাব কিছুটা রক্ষা করে যেতে হয়। দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্য কর্মে ব্যস্ত থাকার সময়েও ঈশ্বর-চিন্তার ফল্গুপ্রবাহ অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। এতে মনে মন্দ চিন্তার উদয় বাধা পাবে, আর ধ্যানে বসলে মনকে একাগ্র করতে সুবিধে হবে। আমাদের দৈনন্দিন ধ্যানের পরিপূরক হিসাবে এই রকম ঈশ্বর-সান্নিধ্যে থাকার অভ্যাস আমরা যেন অবশ্যই করি; যদি ঠিক মতো করা যায়, এই কাজই গভীর অধ্যাত্ম-সাধন হয়ে দাঁড়াবে। এই অভ্যাস কয়েক ঘণ্টা একাগ্রতাহীন ধ্যানের সমান।

'ভগবদ্‌গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেন, স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি?[১] ঠিক ঠিক ভক্তের এই সব লক্ষণের তালিকা এই গ্রন্থে ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে, এই তালিকাবদ্ধ করার কি উদ্দেশ্য? শঙ্কর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ওপর তাঁর ভাষ্যে এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুক্ত পুরুষের লক্ষণগুলিকে বদ্ধ মানবের পক্ষে সাধ্য সদ্‌গুণাবলী বা নিয়মশৃঙ্খলাদি রূপে দেখা উচিত। সংগ্রামী পুরুষের পক্ষে যা কঠোর নিয়ম পালন—তাই মুক্ত পুরুষের ভূষণস্বরূপ। তাই উন্নত সাধকের স্বভাব ও লক্ষণাদি জেনে রাখার ওপর এত গুরুত্ব।

এই সব উপদেশাবলী থেকে যে মূল তত্ত্বটি আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হলো মনকে সর্বদা উচ্চতর স্তরে তুলে রাখার গুরুত্ব। মনকে কখনই নিচে নামতে দেওয়া উচিত নয়, চরম আদর্শকে ভুলে জাগতিক ব্যাপারে মজে গেলেই এটি ঘটে থাকে। যেহেতু কাজকর্ম ও কর্তব্যপালনাদিকে এড়িয়ে চলা যায় না, এগুলিকে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রাখার উপায়ে পরিণত করতে হয়। এটি না করলে, সকালে বিকেলে একটু 'জপ' আর ধ্যান করে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকে সর্বক্ষণ মনে রাখতে হলে, সেটি করার একমাত্র উপায় হলো প্রত্যেকটি কর্ম ও চিন্তাকে

---

১ *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ২/৫৪

ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে রাখা। মনকে শূন্য রাখা বা অতীত চিন্তা নিয়ে রোমন্থন করা খুব বিপজ্জনক। মনকে চিন্তাশূন্য হতে দিলেই, তা বাজে চিন্তায় মগ্ন হবে, অতীত ক্রিয়াকলাপ নিয়ে জীবন কাটাতে থাকবে। এতে কারও উপকার হয় না।

এ রকম মানসিক অবস্থা হলে, তখনি কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ বা কোন মানুষের নিঃস্বার্থ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে। দেখবে, মনের সে অবস্থা কেটে যাবে। অন্যথায়, তুমি যদি বসে বসে কেবল পূর্বকর্মের চিন্তা করতে থাক, তুমি যে শুধু সময়ই নষ্ট করবে তা নয়, স্ব-কৃত বহু বাধারও সৃষ্টি করবে। ধর্ম জীবনে মননশীল অধ্যয়নের গুরুত্বের শেষ নেই। বেশির ভাগ সাধকের পক্ষেই ওগুলি অত্যন্ত জরুরী। তোমার কাছে অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে, তোমার ধ্যানের মাধ্যমেই তুমি সব কিছুই লাভ করতে পার—এ রকম চিন্তা করাই বাতুলতা। এতে সন্দেহ নেই যে, ধ্যান উচ্চতর কেন্দ্রগুলিকে খুলে দিতে সাহায্য করে। কিন্তু সমস্ত মনন ও প্রাণশক্তিকে এই সব উচ্চতর কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রবাহিত করানো যায় না। অনেকটা উদ্বৃত্ত শক্তি নিম্নকেন্দ্রে পড়ে থাকে, আর তাদের যদি কোন সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে চালিত করা না হয়, তবে তা থেকে অযথা মানসিক অস্থিরতা সৃষ্ট হতে পারে। অধ্যয়ন ও নিষ্কাম কর্মকে এক রকম অধ্যাত্ম সাধনরূপেই দেখা উচিত। এগুলিকে আধ্যাত্মিক জীবনের সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বা অকেজো বলে বাতিল করা উচিত নয়। অন্য সময়ে কিছু সৃজনশীল কাজ করতে পারলে তোমার জীবনে একঘেয়েমি স্থান পাবে না। অন্যথায়, বিশেষত প্রবর্তকদের ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-জীবনই অসহ্য একঘেয়ে হয়ে উঠবে।

আমাদের অধ্যাত্ম জীবনকে বিচার করতে হবে—সারা দিনে আমাদের মনে কি ধরনের ঈশ্বর-চিন্তা কতবার উদয় হচ্ছে তা দিয়ে। দিনের মধ্যে দু-একবার এক ঘণ্টা ধ্যানে বসাই যথেষ্ট নয়। আমাদের দৈনন্দিন কর্ম ও কর্তব্যের মধ্যে ঈশ্বর-চিন্তা যেন সর্বক্ষণই বুদ্বুদের মতো মনে উঠতে থাকে। এই হলো প্রকৃত অধ্যাত্ম-জীবন। অন্যথায় তুমি দিনে মাত্র দু-এক ঘণ্টাই অধ্যাত্ম-জীবন যাপন করে থাক। অন্য সময়ে তুমি সাধারণ সংসারী লোকের থেকে কোন ভাবেই ভিন্ন নও।

কিন্তু, এর জন্য অবশ্যই দীর্ঘ সচেতন সংগ্রাম প্রয়োজন। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ও পরিজনকে এড়িয়ে চলা যায় না, আর এগুলি মনকে অস্থির করে তোলে। এদেরও কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তা তোমাকে শিখতে হবে। ঈশ্বরাস্তিত্বের বৃহত্তর পরিকল্পনায় এই সব তথাকথিত দুষ্ট লোক আর অস্বস্তিকর পরিবেশেরও কিছু স্থান করে নাও। তখন তুমি সাধারণ ভাবে আবিষ্কার করবে যে, যেমনই হোক, লোকগুলি তেমন দুষ্ট নয়, পরিস্থিতিও তত দুর্ভাগ্যজনক নয়। ধীর

ভাবে অভ্যাসের ফলে তুমি তোমার অহংবোধকে পেছনে ফেলে দিয়ে ঈশ্বরকে সামনে আনতে পারবে—আর তাঁর ওপরেই তোমার চিন্তা-জীবনের আধিপত্য ছেড়ে দেবে। তোমার ক্ষুদ্র সত্তা বা অহংবোধের ওপর আসক্তিই অধ্যাত্ম জীবনের বড় সমস্যা। একে কমিয়ে আনতে হবে। নিজের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গিই সম্ভবত তোমার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পথে বৃহত্তম বাধা—অন্য লোক ও পরিবেশ ততটা নয়।

## সাধনায় নিরবচ্ছিন্নতা

অভ্যাসের ফলেই, হাতে কাজ করতে করতে, তুমি ঈশ্বরের নাম জপ বা স্তুতি, গান বা প্রার্থনা করতে পারবে ও তাঁর চিন্তা করতে পারবে। এই ভাবেই তুমি কাজকে উপাসনায় রূপায়িত করতে এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে পারবে। অধ্যাত্ম-জীবনে উন্নতি করতে হলে, নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা ও ধ্যান করা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। কাজ করার সময়ও এই প্রার্থনা ও ধ্যানের ভাব কিছু কিছু চালিয়ে যেতে হবে। তখনই, ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ করার প্রয়াসটি এক রকম আধ্যাত্মিক সাধনার রূপ নেয়, যা প্রার্থনা ও ধ্যানের মতোই ফলদায়ক। এক হিন্দুভজনে যেমন আছে—'আমি যা কিছু করি, হে প্রভু, সব তোমারই পূজা'।[১ক]

তোমার নিয়মিত প্রার্থনা ও ধ্যান সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেবে, কিন্তু এই পবিত্র চিন্তার কিছু সারাদিন সঙ্গে নিয়ে চলবে। তোমার কর্মহীন সময়টুকু তুমি যে পরিমাণে ঈশ্বরের নামে ও চিন্তায় ভরিয়ে ফেলতে পারবে, ততটাই আধ্যাত্মিক রূপান্তর হবে তোমার মধ্যে, আর তুমি তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরীয় উপস্থিতি, প্রেম ও আনন্দ তত বেশি বেশি উপলব্ধি করতে থাকবে।

অধ্যাত্ম পথের অনিবার্য ওঠা নামা নিয়ে উতলা হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সমুদ্রের কাছাকাছি হলেই নদীতে জোয়ার ভাটা দেখা যায়। তোমার মনোভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হবে না। মনের ওঠা নামা আছে। কিন্তু তুমি ধীর স্থির ভাবে তোমার *জপ* ধ্যান নিয়ে যত এগুতে থাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অবিকারী সত্তাটির উপস্থিতি অনুভব করতে থাকবে, তোমার সুস্থিতি তত বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া তোমার চিন্তাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি বাড়বে।

অল্প *জপ* ও ধ্যানের পর, তোমার কর্তব্য কর্মে মন দাও, কিন্তু সঙ্গে রেখে দাও সেই অনুভূতির কিছুটা যাতে বোধ হয় অনন্ত চৈতন্য তোমার আত্মার আত্মারূপে তোমার অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত রয়েছেন—ঠিক যেমন তিনি অন্য সব জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত আছেন।

---

১ক 'যদ্‌যৎকর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।' —শিবমানসপূজা-৪

এইভাবে এগিয়ে চল, তাহলে তুমি তোমার হৃদয়কেন্দ্রকে—তোমার আত্মা ও অনন্ত চৈতন্যের সংযোগ বিন্দুকে—আরো বেশি বেশি অনুভব করতে পারবে। কালে এই থেকে তোমার মনে ও শরীরে প্রভূত সুস্থিতি আসবে।

## ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরের যোগ

প্রত্যেকটি অধ্যাত্ম সাধকের নিয়ত ব্যবহারের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন—একটি নির্দিষ্ট চেতনা কেন্দ্র, একটি পবিত্র রূপ, (*ইষ্ট দেবতা*) এবং একটি পবিত্র *মন্ত্র*। উপরন্তু, নাবিকের দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রটি যেমন সব সময় উত্তর দিকটির নির্দেশ দেয়, তেমনি আমাদের মনকে অবশ্যই সর্বক্ষণ স্থির করে রাখতে হবে আমাদের চেতনা কেন্দ্রে অবস্থিত এই পবিত্র রূপ ও পবিত্র নামেতে। প্রত্যেকটি *সাধকের* চেতনার অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট উচ্চতর আধাত্মিক কেন্দ্র থাকা দরকার। কিভাবে নিজ চেতনা কেন্দ্রে সর্বদা অবস্থান করা যায় সে কৌশল তাকে আয়ত্ত করতে হবে। অতি সহজেই সে একাজ করতে পারবে, যদি সে প্রাতর্ধ্যানের সময় মনকে সেখানে স্থির করতে পারে। যদি তার প্রকৃত 'আমি'কে সে সেখানে খুঁজে পায়, তবে তার পক্ষে বিষয় চেতনাকে এই কেন্দ্রীয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত করা সহজসাধ্য হবে। সাধককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সে নিজে সর্বদা তার চেতনা কেন্দ্রের গভীরে দৃঢ় অধিষ্ঠিত থাকে। আমাদের মন যদি অধ্যাত্ম-কেন্দ্র থেকে উৎপাটিত হয়, তবে তার মূল অন্য কোন জায়গায় প্রবেশ করবে, তা হলে অত্যন্ত অস্থিরতা সৃষ্ট হবে। যারা *জ্ঞান* পথে অগ্রসর হয়, তারা সব সময়ে নিরন্তর আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় অহং-চেতনাকে ধরে থাকতে চেষ্টা করে। তারা অধিকতর সাম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর তাদের আধ্যাত্মিক বোধে 'নীরস-ভাবে'র ছেদগুলি তেমন দীর্ঘ হয় না।

*ভক্তের* ব্যাপার অন্যরকম। সে *ইষ্ট দেবতার* রূপের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়, আর যখন সে রূপ তার স্মরণে আসে না, তখন সে কষ্টবোধ করে। ভক্তিপথের সাধককে জানতে হবে কিভাবে ব্যষ্টি চেতনাকে *ইষ্ট* চেতনার সঙ্গে যুক্ত করা যায়। যখন তুমি তোমার *ইষ্টের* জীবন্ত অবস্থান অনুভব করতে পার না, তখন তোমার নিজ চেতনা তার ভিত্তি হারিয়ে ফেলে, আর তুমি অনুভব করতে থাক যেন আলম্বনহীন হয়ে তুমি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছ। কখনো কখনো ধ্যানের সময় সাধক অতি স্পষ্ট *ইষ্ট*-দর্শনে সফল হয়, কিন্তু দেখে যে ঠিকভাবে তার সংস্পর্শে আসতে পারছে না, নিজ চেতনাকে ইষ্ট চেতনার সঙ্গে যুক্ত করতে পারছে না। এতে গভীর উদ্বেগ সৃষ্ট হয়, ও এই অস্থিরতা বহুদিন চলতে থাকে। বহুদিন ধরে সাধক একরকম আবেগ-শূন্যতায় জীবন কাটাতে থাকে।

*ইষ্ট দেবতার* সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়েছি—এ রকম বোধ সাময়িকভাবে এলেও নিরাশ হবে না। প্রার্থনা ও তোমার আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদি ও সদ্‌গ্রন্থপাঠও চালিয়ে যাবে। আন্তরিক তীব্রতা নিয়ে অপেক্ষা কর; আন্তর সংস্পর্শ ফিরে আসবে—আগের তুলনায় আরো গভীরভাবে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবাত্মাগুলি সব সময়েই ঈশ্বরের সংস্পর্শে রয়েছে, কিন্তু যেহেতু আমরা অচেতনের রাজ্যে রয়েছি, আমরা ঐ স্পর্শ অনুভব করতে পারি না। আমাদের মনের মালিন্য, আমাদের অন্তরের উত্তেজনা ও উদ্ভট কল্পনাগুলি উচ্চতর স্তরে আমাদের উঠতে দেয় না—যেখানে ঈশ্বর-সংস্পর্শ আমরা সহজে বোধ করতে পারি। তাই, অধ্যাত্ম জীবনে চিত্তশুদ্ধির ওপর প্রভূত গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আজকালকার লোকেদের আসল সমস্যা হলো যে, তারা ইষ্টের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম অনুভব করে না এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক ঠিক গড়ে তুলতে পারে না। যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রেম হয়, তবে ঐ প্রেম কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে চাইবে। সাধকের প্রতিটি কাজই তার ভগবৎস্তুতির এক একটি অভিব্যক্তি হয়ে উঠবে।

## অতিরিক্ত কাজ বাধাস্বরূপ

একদল লোক আছে যারা জগৎকে উদ্ধার করতে চায়, অথচ নিজের উদ্ধারের উপায়টা কি তা জানে না। নিজের সমস্যার সমাধান না করে তুমি জগতের সমস্যার সমাধান করতে পার না। অধিকাংশ অতি-আগ্রহী সংস্কারকদের ক্ষেত্রেই এই যন্ত্রণা; প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের সম্বন্ধেই কিছু জানে না, অথচ অন্যদের সংস্কার করতে চায়। এমনিই আমাদের বেয়াড়া স্বভাব যে আমরা কাজ বাড়াতেই থাকি, যতদিন না ঐ কাজই আমাদের সব মনোযোগ ও শক্তি শুষে নেয়। অযথা কর্তব্যবৃদ্ধি করা আমাদের উচিত নয়। কাজের পেছনে ছোটা আমাদের উচিত নয়। কিছুটা অবসর আমাদের প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও ভক্তি নিবেদনের জন্য কিছু সময় আমাদের সর্বদাই খুঁজে বার করতে হবে।

অতিরিক্ত কাজ অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে বাধাস্বরূপ। মানুষের কর্মবৃদ্ধি প্রবণতা বারবার আমাদের নজরে পড়ে, বিশেষত অস্থিরতা ও উদ্দেশ্যবিহীন আবেগ-প্রবণতায় পূর্ণ পাশ্চাত্য দেশে। কিছু লোকের কর্মবৃদ্ধি ও কর্তব্যবৃদ্ধির প্রবণতা থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেটিকে কখনই উৎসাহ দিতেন না।[২] এটি মানসিক সাম্যের অভাবেরই

---

২ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৯২, ৪৫৪-৫৫ ইত্যাদি

পরিচায়ক। এতে কেবল অস্থিরতা ও এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই প্রকাশ পায়। এতে প্রশংসা পাবার কিছু নেই। অবসর সময় সৎভাবে যাপন না করলে কোন মানুষই কোন কাজে সুফল পেতে পারে না। অতিরিক্ত কাজে ব্যাপৃত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই সাম্যের অভাব ও অস্বাভাবিক মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। মদ্যপানে মত্ত ও বৃশ্চিক দংশনে ক্ষিপ্ত বানরের কর্মোন্মত্ততা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়, আর এই সব লোকের কাজ ঠিক সেই রকম অর্ধোন্মত্তের এলোপাতাড়ি কাজ—যেন কাজের জন্যই কাজ। পরে তারা এসে অনুযোগ করে—'আমার আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সময় কোথায়? হায়, যদি একটু সময় পেতাম!' ইত্যাদি। অস্থিরতা কুঁড়েমির মতোই খারাপ। আবেগ নির্বুদ্ধিতারই মতো খারাপ। এই সব কর্মতৎপরতা বলবার মতো কিছু নয়। প্রায়ই দেখা যায় কর্তব্য কর্ম নিজেরই সৃষ্ট—নিজের অস্থিরতা ও সাম্যাভাবের ওজর মাত্র। আমরা নিজের কাছ থেকেই পালাতে চাই, আর কর্তব্যকর্ম বাড়াই নিজের ও অপরের কাছে একটা সন্তোষজনক ওজর খাড়া করার জন্য। প্রকৃত কর্তব্য এর থেকে ভিন্ন বস্তু। সর্বত্রই অপ্রয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে সংসার-মনস্ক লোকেদের জন্য। এগুলির মধ্যে প্রচুর গ্লানি থাকে। তোমার নিজের বা অন্যের ভাল করে না, এমন সব অপ্রয়োজনীয় কাজের প্রবর্তন কখনো করবে না।

বেঁচে থাকার জন্য যাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়, তারা দেখে ঈশ্বরের দিকে মন ফেরানো কঠিন ব্যাপার। এই সংগ্রাম করেও যারা তা পারে—তাদের সংখ্যা খুবই কম। প্রত্যেকেরই সৎভাবে যাপিত অবসর প্রয়োজন। সব সময়ে ঈশ্বরের কাজ করতে চেষ্টা কর—প্রার্থনা, *জপ*, ধ্যান ও গভীর অধ্যয়ন এবং অন্যরকম অধ্যাত্ম অনুশীলনাদির মাধ্যমে। এর জন্য যথাসম্ভব সময় দিতে চেষ্টা কর। সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে কাজ করবে, আর কাজকে উদ্দেশ্য নয়, উপায় হিসাবে দেখবে।

যন্ত্রও কাজ করে, আমরা যখন কাজ করি তখন যেন আমরা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র—এই ভাব নিয়ে কাজ করি। তাহলে আমাদের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিই পালটে যাবে, ও আমাদের কাজও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের, ঈশ্বরের সেবার অংশ হয়ে যাবে। কাজ সব সময়েই ঈশ্বরের উদ্দেশে করা উচিত। যে কাজই আমরা করি, তা যেন সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ভাব নিয়েই করি। এর ফলে কয়েক রকমের কাজ বাদ যাবে। ভাগবতে বলা হয়েছে ঃ

**নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।**
**ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥** [৩]

---

৩ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌, ৩।২৩।৫৬

—ইহজগতে যে ধর্মের উদ্দেশ্যে, তথা ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ও ঈশ্বরের (হরির) পবিত্র পাদপদ্মে উৎসর্গ না করে কাজ করে, সে মানুষ বেঁচে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মৃত।

## কর্ম ও উপাসনা

প্রথম প্রথম সাধকের কর্ম ও উপাসনার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে বলে বোধ হতে পারে, যদিও সে দু-কাজই ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করে থাকে। পরে সে দেখে যে তার সমস্ত কর্তব্য কর্মের মাঝখানেও তার অন্তরের উপাসনা সে চালিয়ে যেতে পারছে। শেষে তার সব কাজই উপাসনা হয়ে যায়। প্রথমে, আমরা যেন অবশ্যই আমাদের সমস্ত কাজের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করে যথাসম্ভব নিষ্কাম ভাবে করি। পরে আমরা ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে শিখব। তখন আমাদের সমস্ত জীবন হয়ে উঠবে ঈশ্বরোদ্দেশে এক নিরবচ্ছিন্ন উৎসর্গীকরণ।

কর্ম ও উপাসনা যেন অবশ্যই হাতে হাত মিলিয়ে চলে। দুই-ই আমাদের মনকে পবিত্র করে ও মনে উচ্চতর সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তাদের দ্বিমুখী অধ্যাত্ম সাধনারূপে দেখতে হবে, যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

ধ্যান করার নামে কোন নর বা নারীর কর্তব্য কর্মে অবহেলা করা উচিত নয়। সর্বদা ঈশ্বর-স্মরণ করে যদি আমরা কাজ করি, আমাদের একান্তে ধ্যানের তত প্রয়োজন নাও হতে পারে। যা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, সাধক যেন সর্বদা কোন না কোনভাবে ঈশ্বরের সংস্পর্শে থাকে। এ কাজের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো, দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত থেকেও সর্বদা মনে মনে *মন্ত্র* জপ করে যাওয়া। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যেমন আমাদের উপদেশ দিতেন, 'আমাদের অন্তরে যেন *জপ*-চক্র নিরন্তর ঘুরতে থাকে।'[8] সব সময়ে শব্দ প্রতীকের সাহায্য নাও। কর্মহীন মুহূর্তগুলিকে ঈশ্বরের নামে ভরিয়ে দাও।

যখনই কোন সেবা করার সুযোগ আসবে, তা আমাদের বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা উচিত, অন্যথায় আত্মা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। বেশি কাজ খুঁজবে না, কিন্তু সুযোগ হলেই সেবা করবে। দানের মাধ্যমেই আমাদের উন্নতি, গ্রহণের মাধ্যমে নয়। গ্রহীতাকে দাতা হতেই হবে, তাকে কোন কিছু দিতে হবে। নিজেকে কখনো ভিখারিভাবগ্রস্ত হতে দেবে না। অনাসক্ত হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল হবে। যখনই পারবে সাহায্য করবে, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে, কর্তৃত্ববুদ্ধি বর্জন করে।

কখনো কখনো আমরা ভাবি যে অন্যকে আধ্যাত্মিক সাহায্য দেওয়া গুরু-গিরি করার সামিল। এ কথা ঠিক নয়, অবশ্য যদি আমাদের কোন অহমিকা বা

8 Swami Prabhavananda, *The Eternal Companion* (Madras : Sri R.K. Math, 1965) p. 181.

শ্রেষ্ঠমন্যতা ভাব না থাকে। এ হলো সেবা, আর যখনই কোন সুযোগ আসবে বা প্রয়োজন হবে, এ রকম সেবা কাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেবার মনোভাব যেন আমাদের না হয়।

কাজকে উপাসনায় পরিণত করতে হলে, প্রথমে *জপ* ও ধ্যানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মানসিকতাকে বাড়াতে চেষ্টা করতে হবে। কাজে লেগে পড়লে কোন লোক সর্বক্ষণ ঈশ্বর-চিন্তা করতে পারে না; তাই সে যেন ঈশ্বরের প্রীতির জন্য তাঁরই সেবা করছি মনে করে কাজটি করতে থাকে, আর কাজের আগে, মাঝে ও শেষে তাঁকে স্মরণ করে। এই প্রথম ধাপটিতে সফল হলে, মানুষ ঈশ্বরকে বার বার স্মরণ করতে পারবে, এমনকি কাজের মধ্যেও।

মনের দুটি প্রবাহ আছে, একটি উর্ধ্ব ও একটি অধঃ। সাধারণত নিম্ন প্রবাহটি বাজে চিন্তায় ভর্তি থাকে। মনের এই অধঃপ্রবাহকে ঈশ্বর-চিন্তনে অভ্যস্ত করে তোলা যায়, যদি নিজের নির্দিষ্ট কাজটি করার সময় স্মরণ রাখা যায় যে, ঈশ্বরের জন্যই কাজ করা হচ্ছে। এতে কর্ম-প্রচেষ্টা যন্ত্রচালিতবৎ হয় না, আর মন জাগতিক চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে।

কখনো কখনো অবস্থার চাপে মানুষকে বাড়তি কাজ করতে হয়, কিন্তু মানব-মন যদি ঠিক শিক্ষা পায় প্রচণ্ড কাজের মধ্যেও তার পক্ষে ঈশ্বর-চিন্তা করা সম্ভব হয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক স্তর থেকে নিয়মিত সংযম।

এখন, ঈশ্বরই যে একমাত্র কর্তা—এ বিষয়ে মনে পূর্ণ আস্থা সম্পাদন কিভাবে করা যায়? কর্ম ও উপাসনার মাধ্যমে তোমাকে অবশ্যই প্রথমে তোমার প্রভুর, তোমার আত্মার আত্মা যিনি, তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে হবে, তাহলে সহজেই তোমার বোধ হবে যে তাঁরই ইচ্ছা ও তাঁরই শক্তি তোমার দেহ-মনের মাধ্যমে ও বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের মাধ্যমে কাজ করছে।

এই ভাবই আমাদের শরণাগতির আদর্শের দিকে নিয়ে যায়। এই কথাটির অর্থ হলো, নিজ আত্মা, মন ও শরীরকে পরম চৈতন্যে সমর্পণ করা, তাঁরই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাঁরই হাতের যন্ত্র-স্বরূপ হবার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা এবং নিজ মুক্তি-প্রয়াস সহ সর্বজন কল্যাণব্রতে ব্রতী হতে চেষ্টিত হওয়া। মূল ভাবটি হওয়া চাই মানবরূপী ঈশ্বরকে ভালবাসা ও তাঁর সেবা করা এবং এইভাবে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে উপলব্ধি করা। এই সেবা দৈহিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক হতে পারে যাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমরা আসছি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী।

আগেই যেমন বলেছি, কর্মের সঙ্গে সাধককে ঈশ্বর চিন্তাও করতে হবে ও সমস্ত কর্মই তাঁকে উৎসর্গ করতে হবে। তাদের জীবনই যন্ত্রবৎ গতানুগতিক হয়ে

পড়ে, যারা ঈশ্বরকে ও তাঁকে লাভ করার লক্ষ্যকে ভুলে যায়, আর যন্ত্রের মতো শুধু কাজই করে চলে। দুঃখ কাজের পরিমাণ নিয়ে তত নয়, যত সেই কাজ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করতে না পারাতে। কোন সমর্পণ বুদ্ধিই আসতে পারে না, যদি না আত্মোপলব্ধির লক্ষ্যটি সর্বক্ষণ জাগিয়ে রাখা যায়, আর ক্ষুদ্র অহংবোধকে বলি দিয়ে ঈশ্বর-চেতনায় লীন করা যায়। যে লোক মনে করে যে সমর্পণ করতে হলে নিজের সব কিছু ত্যাগ করে, অন্যের ন্যায়-অন্যায় সব আজ্ঞাই পালন করা, সে সমর্পণবুদ্ধির অর্থই বোঝে না অথবা বুঝে থাকলেও ঐ আদর্শকে ঠিক ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। প্রকৃত সমর্পণ যে অভ্যাস করতে পেরেছে তার অহংবোধ যত না ধ্বংস হয়েছে, তার থেকে বেশি হয়েছে সংস্কৃত। ব্যষ্টি-চেতনা ঈশ্বর-চেতনায় লীন হয়, আর ব্যষ্টি-ইচ্ছা ও ঈশ্বর-ইচ্ছা একীভূত হয়ে যায়; সাধকের এমনও অনুভূতি হয় যে তার দেহ বিশ্ব-দেহেরই অংশ; এ রকম সাধক কখনো কখনো স্বাধীন ইচ্ছাশূন্য যন্ত্রচালিতবৎ হতে পারে না। পক্ষান্তরে সে অহং-কেন্দ্রিক জীবনের পরিবর্তে বিশ্ব-কেন্দ্রিক জীবনযাপন করে।

যে কোন ধরনের কাজই তুমি কর না কেন, মনে কর যে তোমার সব কাজই ঈশ্বরের সেবারূপে করা হচ্ছে—যে ঈশ্বর তোমার অন্তরে ও আর সকলের অন্তরে বিরাজমান। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

**স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥** [৫]

—নিজ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরমেশ্বরের উপাসনা করলে অধ্যাত্ম জ্ঞান (সিদ্ধি) লাভ হতে পারে। যে কোন সৎ-কর্মকে, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, ঈশ্বরের এক রকম সেবা বলে ভাবা যেতে পারে, অতএব অনাসক্ত হয়ে করা যেতে পারে।

## তীব্রতা প্রয়োজন

তিনরকম কাজ আছে ঃ অচেতন কর্ম—যার কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই; চেতন কর্ম—যার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে; আর যে কর্ম—সাধারণ চেতনা সহ উচ্চতর চেতনা সহায়ে নিষ্পন্ন হয়। তৃতীয় পর্যায়ের কর্মের পূর্বে আমরা যেন থেমে না যাই। উচ্চতর চেতনার সঙ্গে যোগ ছিন্ন না করে কিভাবে কাজ করা যায় তা শিক্ষা করতে হবে। এখানে কোন নতুন কর্ম-সামর্থ্য সৃষ্ট হচ্ছে না, কেবল পুরাতন সামর্থ্যের নতুন ও উন্নততর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বাইরে থেকে নতুন কিছুই আনা হচ্ছে না, কিন্তু সেখানে এক নতুন আন্তর-চেতনা রয়েছে, যা আমাদের নিজ সহজাত প্রকৃতি।

---

৫ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ১৮/৪৬

তীব্র অধ্যাত্ম চেষ্টার মাধ্যমে, আমরা মনে এক অন্তঃস্রোতের সৃষ্টি করতে পারি, যা ঈশ্বরের দিকে প্রবাহিত হবে—বাকি মন কাজে লেগে থাকলেও। এই ভাবে মনের মধ্যে দুটি প্রবাহ চলে। মনের এই রকম এক সচেতন বিভাজন সম্ভব এবং আধ্যাত্মিক জীবন চালিয়ে যেতে হলে এটি অবশ্য করণীয়। ধীরভাবে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চালিয়ে গেলে আমরা আমাদের মনের বেশি অংশকেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব; আর এ কাজ আমরা যত বেশি করতে পারব, তত নিপুণভাবে মনের দ্বি-ভাজন সম্ভব হবে; আর তত নিপুণভাবে আমাদের সমস্ত কর্তব্য কর্মের মাঝখানে ঈশ্বরের অনুভূতি পেতে পারব। সাধারণত এই অন্তঃপ্রবাহ হলো নানা বাজে জিনিসে ভরা অচেতন স্রোত। আমাদের করণীয় হলো, ধ্যানের সময় উচ্চতর প্রবাহ ও নিম্ন প্রবাহকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করা। তারপর কাজের সময়, এই অন্তঃপ্রবাহকে যথা সম্ভব উচ্চতর কার্যকর প্রচেষ্টাসহ উচ্চতর খাতে চালনা করা চাই। অন্তঃ-প্রবাহের অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলির পবিবর্তন অবশ্য করণীয়। তাদের চেতন স্তরে আনতে হবে। এ কাজ যখনই করা হবে তখনই আমাদের মনের বেশ কিছু অংশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসবে, আর সেই সঙ্গে এমন এক মন পাব, যা আরো বেশি ব্যগ্র ও সজাগ। অধ্যাত্ম সাধকের জীবনে এ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মনিষ্ঠা। অধ্যাত্ম-জীবনের অর্থ হলো, মনকে আরো বেশি করে সজাগ করা, অর্থাৎ উচ্চতর মনকে জাগ্রত করা, শেষে অতি-চেতনা লাভের দিকে নিয়ে যাওয়া।

যখন কাজ করছ, সেই সময় মনকে ও তার গতিবিধিকে আবেগশূন্য হয়ে একটু পর্যালোচনা কর। একটু নজর রাখলেই দেখতে পাবে মন কিভাবে নানা বাজে জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছে—যা কখনো কখনো ক্ষতিকরও হয়। তখন তুমি মনকে অনেকটা সচেতন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারবে, আর ধীরভাবে ও বহুক্ষণ ধরে এই অভ্যাস চালাতে পারলে তুমি দেখতে পাবে যে মস্তিষ্ক তন্ত্রীগুলি যেন আরো ক্ষীণ হয়ে গেছে, আর তাদের বাধা সৃষ্টি করার ক্ষমতা অনেকটা হারিয়ে গেছে। দৈহিক ও মানসিক দু-রকম বাধাকেই যথাসম্ভব প্রতিরোধ করতে হবে—অতি-চেতনারূপ লক্ষ্যে পৌছবার পথ বাধামুক্ত রাখার জন্য।

## অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া

আমরা নিজেদের জন্য কিছু লাভ করার চেষ্টা করি ও পরে তা ভাগ করে নেবার চেষ্টা করি। প্রাথমিক অবস্থায় আপন আপন আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনের ওপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যের কল্যাণ চিন্তা যেন মন থেকে বেরিয়ে না যায়। সর্বপ্রথম আমাদের কিছুটা প্রস্তুতি অবশ্যই দরকার, তা না হলে আমরা পরহিত সাধনও দক্ষতার সঙ্গে করতে পারব না। আমরা যেন

প্রথমে নিজেদের ঈশ্বরভাবে ভাবিত হতে চেষ্টা করি, পরে অন্যদের ঐভাবে আনতে সাহায্য করি। কিন্তু এ দুটি কাজকে অবশ্যই একসঙ্গে চলতে হবে। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুটা অগ্রসর হলে, তবেই অন্যের জন্য কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারা যায়। যখন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমি আমার নিজের মুক্তির কথা ভাবি না',[৬] তার আগেই তিনি মুক্তি লাভ করেছিলেন। উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থায় ওঠার পরেই তিনি অন্যের জন্য কাজ করেছিলেন।

যদি ঈশ্বর আমাদের উচ্চতর ভাবে রেখে দেন আর তাঁর সেবা করার মতো আমাদের শক্তি দেন, তখন আমরা যেন সে কাজে এগিয়ে যাই। এই রকম সেবা কাজ আমাদের লক্ষ্যের আরো কাছে এগিয়ে দেয়। কখনো কখনো উচ্চতর ভাবে থাকতে হয়, কেবল নিজের প্রয়োজনে নয়, অন্যের প্রয়োজনেও। এতে অধ্যাত্ম-সাধনে এক অতিরিক্ত প্রেরণা পাওয়া যায়। তোমার যদি কিছু জমা না হয়, তবে তুমি কি দিতে যাবে? তাই কখনো কখনো আমাদের নিজেদের আগ্রহাতিশয্যে নয়, পরন্তু প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের কিছু বেশি সঞ্চয় করতে হবে, যাতে বেশি করে বিতরণ করা যায়।

এই হলো আমাদের সকলেরই আদর্শ ঃ আমাদের নিজ কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করা, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কল্যাণ সাধনেও ব্রতী হওয়া। বস্তুত এ দুটিকে তফাত করা যায় না। সেবার মাধ্যমেই একত্বের ভাব বেশি বেশি আসতে থাকে। অহংবোধকে যতটা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়, একত্ববোধ তত বেশি বেশি প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে এবং শেষে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি—সকল নর-নারীর মধ্যে, সমগ্র বাহ্য ও আন্তর জগতের মধ্যে।

## জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

এই একত্বভাব যথাযথ লাভ করার পূর্বেই সাধকের এ বিষয়ে অনুভূতি হওয়া দরকার, *সাধনার* সময়েই এ বিষয়ে ধারণা হওয়া চাই। সত্যবস্তু সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার সাহায্য ছাড়া কাজ করা বিপজ্জনক হতে পারে। যখন তুমি সংসারে কাজ করবে, জনগণের সঙ্গে চলাফেরা ও বসবাস করতে হবে। অতএব, প্রথমেই তোমার পক্ষে একটি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা অপরিহার্য। তাই সাধক যেন অবশ্যই কল্পনার সাহায্য নেয়। পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে বলেছেন ঃ

**বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥** [৭]

—যোগের ক্ষতিকারক চিন্তাকে বাধা দেবার জন্য বিপরীত চিন্তা আনতে হবে।

---

৬ Eastern and Western Disciples. *Life of Swami Vivekananda*. Kolkata : Advaita Ashrama, 1974, p.487

৭ পতঞ্জলি, *যোগসূত্র*, ২.৩৩

তাই যখনই মন্দ ধারণা ও মন্দ চিন্তা মনে উঠবে তার বিপরীত শুভচিন্তা জাগিয়ে তুলতে হবে। ঠিক ঠিক শুভ ধারণা মন্দ ধারণার স্থান নেবে। এইটাই চরম সমাধান নয়, কিন্তু বেশির ভাগ লোক প্রথমে এই পর্যন্তই করতে পারে। এ যেন পুলিসের সাহায্যে ডাকাত তাড়ানোর মতো। কিন্তু নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেলে, আমাদের আর পুলিসের সাহায্যের প্রয়োজন থাকে না। তাই যতদিন না আমাদের ঈশ্বরোপলব্ধি হচ্ছে, ততদিন অবশ্যই আমাদের শুভ কল্পনার সাহায্য নিতে হবে। এ ছাড়া আমরা এ সংসারে বাঁচতে পারব না, আধ্যাত্মিক উন্নতিও করতে পারব না।

কিন্তু আমাদের দেখতে হবে এই কল্পনা যেন ভুল পথ না ধরে। বিচার-বৈরাগ্যের ওপর ও আত্মস্বরূপের ওপর এর ভিত্তি হওয়া উচিত। তোমার নিজের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই অন্যের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে। তুমি যদি দেহকেই তোমার স্বরূপ ভাবতে থাক, তবে তুমি দেখবে তোমার চারিদিকে কেবল কতকগুলি মানব দেহই রয়েছে। তুমি যদি দেহস্থিত জ্যোতির্ময় আত্মাকে তোমার স্বরূপ বলে ভাবতে থাক, তবে তুমি দেখবে যে সেই একই জ্যোতি তোমার চতুর্দিকস্থ সব জীবের মধ্যেই দীপ্ত হয়ে রয়েছে।

আমরা যদি কোন দিন অশুভের সামনা-সামনি হয়ে তার মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখার জন্য প্রস্তুত না থাকি, তবে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। কিভাবে রূপের থেকে বস্তুর ওপর, ভাল-মন্দ বিবেচনার থেকে তত্ত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হয় তা আমাদের শিক্ষা করা উচিত। ভাল-মন্দেরই পারে যে তত্ত্ব রয়েছে তার প্রতি যত্ন না নিয়ে আমরা ভাল-মন্দ গুণগুলি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকি। আমাদের বলা উচিত : 'আমার কাছে রূপের কোন গুরুত্ব নেই, আমি বস্তুটির সারসত্তার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি।'

কোন কোন শিব-উপাসক সব নারীকে ভগবতী পার্বতীর সঙ্গে আর সব নরকে ভগবান শিবের সঙ্গে যুক্ত দেখে থাকে। এবং শেষে ভগবতী ও ভগবানকে লীন করে দেয় সেই তত্ত্বে—যেখান থেকে তাঁদের উৎপত্তি। এই উপাসকগণ এইভাবে বহু সমস্যার সমাধান করে থাকে। যদি কোন লোক সব নারীকে ভগবতীরূপে আর সব নরকে ভগবানরূপে দেখে, তবে এতে কী পার্থক্যটাই না হবে!

আবার কোন কোন ভক্ত আছে যারা সব নরকে শ্রীরামকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে যুক্ত করে, আর সব নারীকে শ্রীশ্রীমার রূপের সঙ্গে যুক্ত করে, এবং শেষে তাঁদের অতিক্রম করে দুজনেরই পেছনে যে তত্ত্ব রয়েছে সেখানে পৌঁছে যায়। একমাত্র এইভাবেই আমাদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব। এখন, আমাদের বর্তমান স্তরে,

বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলি ও অশুভ রূপগুলিকে মন থেকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এইটাই কখনো সমাধান হতে পারে না। এমন সময় আসবেই যখন আমরা শুভ ও অশুভ দুই-এর পেছনেই সেই অদ্বিতীয় সত্তার দর্শন পাব। আর তখনই শুভ অশুভ কোনটাই আর আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

আর যদি সত্য সত্যই আমরা এই ভৌতরূপগুলিকে মূলসত্তারূপে না দেখে নিরাকারের বিভিন্ন প্রকাশ রূপে দেখতে সক্ষম হই; যদি আমরা জড় বস্তুকে চিন্তারই একটি অভিব্যক্তিরূপে, আর চিন্তাকে অনন্ত চৈতন্যের একটি প্রকাশ রূপে দেখতে সক্ষম হই, তবেই আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকে নিজ নিজ সঠিক স্থানে, তার প্রকৃত সংস্থানে দেখতে পারব। তখন আমরা বিভিন্ন ভৌতরূপ বা মানসিক রূপ যেমনটি দর্শন করে থাকি, তা দিয়ে আর ভ্রান্ত হব না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে যে সাধনা তাতে এই রকম দৃষ্টিভঙ্গিই একান্ত প্রয়োজন।

ভৌতিক রূপের দিক থেকে আমাদের অবশ্যই অনন্ত ভৌত বিশ্বের সঙ্গে এক সুরে গ্রথিত হতে হবে, মনের দিক থেকে অনন্ত বিশ্বমনের সঙ্গে, আর আধ্যাত্মিক দিক থেকে অনন্ত পরম চৈতন্যের সঙ্গে। আর তখনই আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকে তার যথাযথ স্থানে, যথাযথ আলোকে দেখব, আর সেই অনুযায়ী কাজ করব। সান্তকে সব সময়ে অনন্তের সঙ্গে সমসুরে বাঁধতে হবে, আর তা ভিন্ন ভিন্ন সব স্তরে, চেতনার ভিন্ন ভিন্ন রূপে। সাধককে সর্ব স্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে হবে।

## মহাজাগতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ

ব্যষ্টিমন মহাজাগতিক মনের সংস্পর্শে রয়েছে, আর আমাদের মানসিক শক্তি আসে এক মহাজাগতিক শক্তির উৎস থেকে। এই মনঃশক্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চালিত করতে হবে তা আমাদের জানতে হবে। নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে, পাছে এই শক্তি নিম্ন কেন্দ্রে প্রবাহিত হয়, পাছে তা আমাদের ইন্দ্রিয়স্থানগুলির মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়—নিষ্ফল চিন্তা এবং উদ্বেগ ও অযথা বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে। প্রথম প্রথম এতে কিছু চাপ সৃষ্ট হবে, কিন্তু তা এড়ানো যাবে না। পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানবের ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। তার সব মনঃশক্তি ঊর্ধ্বমুখী প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত হয়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সচেতন নিয়ন্ত্রণের বিশেষ গুরুত্ব আছে। অচেতন নিয়ন্ত্রণ হলো, মনস্তাত্ত্বিকদের ভাষায় অবদমন; আর কোন কোন ধরনের অবদমন কিছু লোকের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়। কিন্তু সচেতন, বুদ্ধিযুক্ত নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন, কেবল আধ্যাত্মিক জীবনের

ক্ষেত্রেই নয়, স্বাভাবিক সুস্থ সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও। এইখানেই ভারতীয় মনোবিদ্যা থেকে পাশ্চাত্য মনোবিদ্যার পার্থক্য।

মহাজাগতিক শক্তি আমাদের সকলের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। কম বেশি আমরা সকলেই যন্ত্রস্বরূপ। কিন্তু যখন আমরা সচেতনভাবে নিম্নকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে এই শক্তির প্রকাশ বন্ধ করে থাকি ও ঐ শক্তিকে উচ্চতর কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ দিয়ে থাকি, সারাক্ষণ তাজা বোধ করি, তখন আমাদের চিন্তা-জীবনে কোন জরা আসে না। কখনো কখনো উচ্চতর কেন্দ্রে আমরা কাজ চালিয়ে যেতে অপারগ হয়ে পড়ি, আমাদের পুরাতন স্মৃতি ও প্রেরণার জন্য, আর তখনই নিচের দিকে জোর টান পড়ে, প্রকৃত টানা-টানি চলতে থাকে, আমরা যদি একান্তই উন্নতি করতে চাই, তবে একে এড়িয়ে যেতে পারি না। আমরা শক্তি প্রবাহকে কখনই বন্ধ করতে পারি না, তবে তাকে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারি—সচেতনভাবে, বুদ্ধির সাহায্যে ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে।

সচেতন ও বুদ্ধিযুক্ত চিন্তা প্রয়োজন। সচেতন চিন্তা বাধা সরিয়ে দেয়, আর যখন বাধা সরে যায়, আরো বেশি মনঃশক্তি আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

প্রথমেই, ইচ্ছা প্রয়োগসহ এর সচেতন সূচনার ব্যবস্থা কর, তবেই প্রবাহ চলতে থাকবে। সচেতনভাবে নতুন ভাব পেতে চেষ্টা কর, তার প্রকাশ ও চিন্তার নতুন পথও সচেতনভাবে পেতে চেষ্টা কর, সেগুলি পাওয়া গেলে মনঃশক্তি পরিচালনার সমগ্র পদ্ধতিটিই বিনা চেষ্টায় স্বাভাবিক ভাবেই চলতে থাকবে।

সচেতনভাবে উচ্চতর চিন্তার মাধ্যমে আমরা ঊর্ধ্বমুখী প্রণালীগুলি খুলে দিয়ে থাকি। আর তখনই পথ খুলে যায়, উচ্চতর চিন্তা সহজ হয়ে যায়। উচ্চতর চিন্তা ভেতরে আসতে থাকে; বস্তুত তারা হুড় হুড় করে আসতে থাকে। কিন্তু, সব সময়ে আরম্ভটি ইচ্ছা প্রয়োগ সহ সচেতনভাবে হওয়া চাই। যদি অচেতনভাবে উচ্চতর চিন্তা আমাদের মধ্যে আসে, তবে পরে একদিন নিম্নতর চিন্তাও আসতে পারে। কাজেই অচেতনভাবে আসার পদ্ধতিটি যেমন করেই হোক পরিহার করতে হবে।

উচ্চতর চিন্তাকে অবশ্যই চেতনভাবে আমাদের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে দিতে হবে। এটি যেন কখনো একটি অচেতন পদ্ধতি হয়ে না দাঁড়ায়। সচেতন সংগ্রামের মাধ্যমে যখন উচ্চতর প্রণালীগুলি খুলে যায়, উচ্চতর চিন্তা সচেতনভাবেই আমাদের কাছে আসতে থাকে, আর তখনই উচ্চতর জীবন খুব সহজ হয়ে পড়ে। একটি নতুন পথ খুলে যায়, শারীরতত্ত্বের দিক থেকে আবার মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও, আর এর মাধ্যমে এই উচ্চতর চিন্তাগুলি বিনা বাধায় আসতে থাকে। 'উচ্চতর'

কথার প্রকৃত অর্থ গভীরতর। বহির্দেশের সংজ্ঞায় একে আমরা 'উচ্চতর' বলি বটে, কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনে আন্তর-চেতনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং এরপর থেকে আমরা বরং মনঃশক্তির কেন্দ্রগুলির ও শক্তি প্রবাহের প্রণালীগুলির ব্যাপারে 'গভীরতর' কথাটাই ব্যবহার করব। যাই হোক, আমার কাছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো—সচেতনভাবে সূচনা করা। এইটুকু হলো প্রাথমিক কাজ, আর অন্য কাজ পরপর চলবে।

## উচ্চতর কেন্দ্রের উন্মোচন

সান্ত সব সময়েই অনন্তের সংস্পর্শে রয়েছে। নিম্নস্তরে এটি চেতনা-অপগত, উচ্চস্তরে তাই চেতনা-সঞ্জাত হয়ে যায়; তা তুমি অনুভব করতে পার। তোমাকে যা করতে হবে, তা হলো উচ্চতর স্তরে উঠে, শক্তির উচ্চতর অভিব্যক্তিগুলিকে আত্মস্থ করা।

অধ্যাত্ম সাধকের করণীয় হলো, উচ্চতর কেন্দ্রগুলিকে দিয়ে কাজ করানো, তাদের উদ্দীপিত করা। সাধককে সচেতনভাবে নিম্নকেন্দ্রগুলির কাজ বন্ধ করতে হবে, আর উচ্চতর কেন্দ্রের কাজে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে কিন্তু তা সচেতনভাবে করতে হবে। এটি যেন এক সচেতন ও বুদ্ধিযুক্ত পদ্ধতি হয়। জপ, প্রার্থনা, ধ্যান প্রভৃতি—এ সবই হলো উচ্চতর কেন্দ্রগুলির কাজের সূচনার উপায় স্বরূপ।

কখনো কখনো তুমি উচ্চতর কেন্দ্র ও নিম্নতর কেন্দ্র দুটিকেই একসঙ্গে অনুভব করতে পার, অর্থাৎ দুটি কেন্দ্রই একই সময়ে কাজ করতে চায়। তখনই ভয়ানক টানা-টানি আরম্ভ হয়ে যায়। একে এড়ানো যায় না এবং সকলকেই এই অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এ অবস্থায় তোমার কাজ হবে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে নিম্নতর কেন্দ্রের কাজ বন্ধ করে দেওয়া।

দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে, তীব্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে উচ্চতর কেন্দ্রের কাজ ক্রমেই বেশি বেশি স্বাভাবিক ও কম কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। কিন্তু, এই যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে না গিয়ে, ঐ অবস্থায় কখনই পৌঁছনো যায় না। উচ্চতর প্রবাহ-প্রণালীর মাধ্যমে মনঃশক্তির প্রকাশ ঘটবে ও তা উচ্চতর স্তরে সৃজনশীল হয়ে উঠবে বলে যদি বাধা অপসারণ চাও তবে দেহ-মনের সাধারণ শুদ্ধি প্রয়োজন। এই শক্তিকে অবশ্যই সৃজনশীল হতে হবে, হয় নিম্নতর দেহস্তরে অথবা কোন উচ্চতর স্তরে। এর প্রকাশ কখনই বন্ধ করা যাবে না, কিন্তু এর দিক পরিবর্তন করা যেতে পারে। আর এই কাজই অধ্যাত্ম সাধককে করতে হবে।

সাধকের পক্ষে কেবল এই শক্তির নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট নয়, পরন্তু তাকে জানতে হবে কিভাবে একে উচ্চতর পথে যাবার নির্দেশ দিতে হয়। অন্যথায় এই শক্তি চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে এক আবর্তের সৃষ্টি করবে অথবা সহজেই নিম্নতর পথ ধরে নিজেকে কোন নিম্নতর কেন্দ্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করবে। কোন রকম প্রকাশের অভাবে আমাদের মধ্যে কত শক্তিই না জমা হয়ে আছে। শক্তিপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে অনেকে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, অর্থাৎ তারা আর নিম্নতর কেন্দ্রের মাধ্যমে এই শক্তিকে প্রকাশ করে না, আবার একই সময়ে একে ঊর্ধ্বমুখীও করে না, ফলে এই শক্তি গতিরুদ্ধ হয়ে ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করে। অনেকে একে উচ্চতর স্তরে ব্যবহার করতে পারে না, কেবল নিম্ন কেন্দ্রের মাধ্যমেই এর ব্যবহার করতে পারে। নিম্নতর কেন্দ্রের মাধ্যমে শক্তি প্রবাহ বন্ধ করে দিলে, তারা হতবুদ্ধি বা এক একটি আবর্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাই, অন্যকে নির্দেশ দেবার সময় আমাদের অবশ্যই খুব সাবধান হতে হবে, বিশেষত যদি তারা এই নিম্নধরনের লোক হয়।

কখনো কখনো কোন সাধক অনুভব করে যে—মহাজাগতিক শক্তি যেন উত্তাল তরঙ্গ হয়ে তার ওপর অবাধ গতিতে আছড়ে পড়ছে। মনের পূর্ব শিক্ষণ ও শুদ্ধির মাধ্যমে এরকম পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকা আমাদের উচিত। বহু রকমের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থা ও উদ্দীপনা আমাদের হয়ে থাকে—আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে উচ্চতর মানসিক অবস্থাগুলির অনুশীলন ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে, আর নিম্নতরগুলির বিনাশ সাধন করতে।

## আন্তর নিয়ন্ত্রণ

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞাতসারেই কোন অবচেতন ক্রিয়া আমাদের মধ্যে চলে, আমরা কেবল তার ফলশ্রুতিই অনুভব করি। অতএব আমাদের অবশ্য কর্তব্য হলো আমাদের মনের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। মহাজাগতিক শক্তির প্রবাহ যে আমাদের ভেতর দিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা উচিত, আর আমাদের অন্তরেই তাকে দিয়ে যেন আমরা আমাদের কার্য সাধন করতে পারি। বাইরের ঘটনাগুলির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ—অন্তত পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ—থাকতে পারে না, কিন্তু আমাদের নিজেদের ওপর সম্ভাব্য সব নিয়ন্ত্রণ আমরা বজায় রাখতে পারি।

গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব থাকতে পারে, পরিবেশের এবং সমগ্র বহিস্থ আবহাওয়া মণ্ডলের প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু এইগুলি এমন কারণ নয় যার জন্য আমরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি বলে আমাদের অনুভব করতে হবে। যদি তাদের বিপরীতে কাজ করতে না পার, তবে তোমাকে অন্তরিত অবস্থায় থাকতে হবে।

তাহলে, তুমি প্রভাবিত হয়েছ বলে তোমার মনে হবে না, আর কোন অবাঞ্ছিত উত্তেজনা বা শক্তি প্রবাহের তোড় তোমাকে তোমার পায়ের তলার মাটি থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেও পারবে না। অনুশীলনের ফলে এই অন্তরিত অবস্থা আপনিই আমাদের মধ্যে আসে।

তুমি যদি খোলামন হও আর মন্দ লোকের সংস্পর্শে আস, তবে তুমি তাদের দ্বারা ভয়ানক ভাবে প্রভাবিত হয়েছ বলে বোধ করবে। আর এই রকম ক্ষেত্রে যদি তুমি সর্তক না হও, বদ লোক তোমার কাছে ঘেঁষতে ও তোমাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আর এই নিম্নমুখী যাত্রা কেবল বহিঃপ্রভাবেই হতে পারে, অথবা আমাদের নিজেদের অমনোযোগ ও বিচারের অভাবের জন্যও হতে পারে। অন্তরের ভাব বিন্যাসই অধ্যাত্ম জীবনে সব থেকে কষ্টকর ব্যাপার, আর এ না হলে কোন ভারসাম্য বা শান্তি নেই।

## আহত হলেই সে আঘাত ঈশ্বরে সমর্পণ কর

এই সব কঠোর নৈতিক সংস্কৃতি আমাদের প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করে। কখনো কখনো প্রভূত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে অন্তরের সাম্য রক্ষা করতে হবে। অভ্যাসের মাধ্যমে এও ক্রমে আরও বেশি স্বাভাবিক হয়ে আসে। আর আধ্যাত্মিক জীবনে এই সাম্য আরো সহজে লাভ করা যায়, যদি তুমি উচ্চতর ধ্যানভাবে থাকতে চেষ্টা কর ও কোন ব্যাপকতর চৈতন্যের সংস্পর্শে আসতে সফল হও। কারণ তখন তুমি তোমার অন্তরের প্রতিক্রিয়াগুলিকে ব্যাপকতর কোন বস্তুতে চালিত করতে পারবে। তুমি আঘাতটি পেলে, কিন্তু সঞ্চালিত করে দিলে অন্য কোন বস্তুতে। অতএব, একভাবে অনন্তই আমাদের আঘাতের বেগ-ধারক স্বরূপ হন।

ভক্তগণ এইটিই করতে চেষ্টা করে—আঘাতটি অনন্তের ওপর চালিত করে—তাদের নিজ নিজ ভক্তি-পথে, বলে ঃ 'প্রভু, এ তোমারই ইচ্ছা। বলে দাও কি করব?' আঘাতের প্রতিক্রিয়া কমাবার জন্য, এই হলো ভক্তদের মনস্তাত্ত্বিক পথ।

*জ্ঞানী* সেই অনন্তের চিন্তা করতে চেষ্টা করে, সে যার অংশ। আর অংশ কখনোই লাফিয়ে পূর্ণের বাইরে যেতে পারে না। অনন্ত সব সময়ে সান্তের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত, কারণ এ দুটিকে তো কখনো পৃথক করা যায় না। বুদ্বুদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, সমুদ্র যদি প্রত্যেকটি ধাপে বুদ্বুদের অস্তিত্ব রক্ষা করে না চলে, তবে বুদ্বুদ ক্ষণে ক্ষণে ফেটে যায়। কখনো কখনো বুদ্বুদটিকে নিজ কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে, কিন্তু পরে সমুদ্রতেই তার যে *কেন্দ্র* সেইখানেই চলে আসে। আমাদেরও তাই করতে হবে।

যদি একদিন, তোমার মধ্যে প্রচণ্ড ভাবের উদ্রেক হয়, আর তুমি বুঝতে পারছ না কিভাবে এর থেকে মুক্তি পাবে, অনন্তের কাছে ছুটে চলে যাও, এই ভাবের আবেগ তোমাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে আসুক; আর যদি তুমি ক্রন্দন করতে চাও, অপেক্ষা কর যতক্ষণ না তুমি ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ করছ। সেখানে পৌঁছবার আগেই যেন আমরা থেমে না যাই। এইটিই একমাত্র উপায় ঃ প্রত্যেকটি জিনিসকে অনন্তে পৌঁছে দেবার।

সান্ত অনন্তের সংস্পর্শে আসতে চেষ্টা না করলে পূর্ণ শুদ্ধি সম্ভব নয়। আমরা সব নোংরা ও ময়লা ঢাকা দিয়ে রাখি, কখনো কখনো ফুলের নিচে লুকিয়ে রাখি, কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের সমগ্র মনের প্রকৃত শুদ্ধি হচ্ছে, অধ্যাত্ম জীবনে কিছুই করা সম্ভব নয়। ওপর ওপর যে শোধন তাতে কাজ হবে না।

যা সান্ত তা সব সময়ে অশুদ্ধ, আর তা শুদ্ধ হয় একমাত্র অনন্তের সংস্পর্শে এসে, এইভাবে তার অনন্তসত্তাকে উপলব্ধি করে। প্রকৃত আদি পাপ হলো এই সান্তভাব, আমাদের সত্তার সান্ত ভাবটি আর এই আদি পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে একমাত্র এই সান্তভাবকে ত্যাগ করে, অনন্তের সংস্পর্শে এসে—যে অনন্ত আমাদের প্রকৃত মৌলিক সত্তা।

আমরা যখন এই একীভূত-ভাবের অনুভূতি লাভ করি, সমগ্র জগৎ আমাদের চোখের সামনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সব কিছুই আমাদের কাছে শুভ ও মঙ্গলময় বোধ হয়। হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন ও কুটিলতা বিনষ্ট হয়ে যায় ও অনন্তের আনন্দ আমাদের মধ্যে সর্বানুস্যূত হয়ে আমাদের ভরে ফেলে। আমাদের তখন বোধ হয়, বৈদিক ঋষি যেমন গেয়েছিলেন ঃ

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধুনক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমানস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ [৮]

আনন্দময় বায়ু আমাদের কাছে মধুর।
সাগর আমাদের ওপর আনন্দ বর্ষণ করছে।
আমাদের খেতের শস্য যেন আমাদের কাছে আনন্দ নিয়ে আসে।
লতা-গুল্ম যেন আমাদের কাছে আনন্দ নিয়ে আসে।

---

৮ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ৩৯

গো-সম্পদ যেন আমাদের আনন্দ বিধান করে।
হে স্বর্গস্থ পিতা, তুমি আমাদের কাছে আনন্দময় হও।
পৃথিবীর ধূলিটুকুও আনন্দে পূর্ণ।
এ সবই আনন্দ—সবই আনন্দ—সবই আনন্দ।

*(স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ)*

রাত্রি দিবস আমাদের আনন্দ বিধান করেন।
সূর্য যেন আমাদের আনন্দদায়ক হন।
*(স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদের পূরক—মূল সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে : অনুবাদক)*

## তৃতীয় পর্ব

# আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা

# সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

# অসৎ থেকে সৎ

## মানব ও সৎস্বরূপ

আমরা সকলে ত্রিবিধ দুঃখে (*তাপত্রয়ে*) পীড়িত হই—স্বকৃত দুঃখ, অন্য প্রাণীর নিমিত্ত দুঃখ ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণে জাত দুঃখ। সাধারণত তিনটির সব কটিই মিলিতভাবে কাজ করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বকৃত দুঃখই আমাদের কষ্টভোগের প্রধান কারণ।

জীবনের উদ্দেশ্য কি? এই তাপত্রয় থেকে মুক্তি। প্রত্যেকেই সর্বক্ষণ দুঃখ ও বন্ধন বর্জন করে চলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু আনন্দ ও মুক্তিলাভের কিছুটা সম্ভাবনা না থাকলে কেউই দুঃখ দূর করার চেষ্টায় প্রেরণা বোধ করত না। এই সম্ভাব্যতা, এই সম্ভাবনাই জীবনের প্রধান সত্য। লোকে যদি পুরাপুরি বিশ্বাস করত যে পালাবার কোন পথ নেই, তবে কেউ নড়েও বসত না।

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের প্রতি, জ্ঞান লাভের প্রতি, সুখ ভোগের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আমরা সকলেই বেঁচে থাকতে চাই, আর তা সচেতনভাবে ও সুখে সমৃদ্ধ হয়ে। তাই অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দই হলো আমাদের আত্মার, আমাদের প্রকৃত স্বরূপের, সার সত্তা।

আর বাহ্য জগৎকে আমরা যখন বিশ্লেষণ করি, আমরা দেখি যে, ঐ একই বস্তু সব ঘটনাবলীর পেছনে রয়েছে। সজীব হোক আর নির্জীব হোক—প্রত্যেকটি বিষয়ই আমাদের সামনে বিরাজ করে, অস্তিত্বশীল বিষয়রূপে, অর্থাৎ যা রয়েছে এমন কিছু রূপে। আর প্রত্যেকটি বিষয়ই নিজেকে আমাদের চেতনায় অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ, চেতন ও অচেতন দুরকম বস্তুকেই আলোকিত করে এমন জ্যোতি বিশিষ্ট। এতে ভেদ কেবল মাত্রার, গুণের নয়। যেমন অন্তর্জগতে, তেমনি বহির্জগতেও আমরা এই স্থায়ী অস্তিত্ব ও সচেতনতা বোধ করে থাকি। এইভাবে কেবল নিজ নিজ অন্তরে নয়, সব বাহ্য বিষয়ের অন্তরেও আমরা—সৎস্বরূপের আভাস পেয়ে থাকি। আবার চারিদিকে যে সব ভৌত বস্তু আমরা দেখে থাকি, তারাও প্রত্যেক ব্যক্তির কোন না কোন অভাব পূরণ করে।

আমরা সকলেই ভোগ্য বস্তুর গুণাগুণ বিচার না করেই, সেই বস্তুটি পেলে কোন বিশেষ ভোগসুখের সন্ধান পাব মনে করে, তার পেছনে ছুটে থাকি। সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা সব সময়েই আমাদের মধ্যে রয়েছে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলিই কেবল আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, কারণ আমরা ভাবি যে ওগুলি থেকে আমরা কিছু সুখ ভোগ করতে পারব। এই জন্যই আমরা লোভে পড়ি, ঐ বস্তুটির প্রকৃত মূল্যের জন্য নয়। অতএব দেখা যায় প্রত্যেকটি বাহ্য বস্তুরই সামর্থ্য রয়েছে, নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার, আমাদের সচেতনতা জাগিয়ে তোলার ও আমাদের মনকে আকর্ষণ করার। যেমন বলা হয়েছে—

**অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।**
**আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্ ॥** [১]

অবশ্য যদি আমরা বাহ্য বস্তুগুলিকে বিশ্লেষণ করি, তবে আমরা দেখতে পাব যে তাদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে ধরা পড়েনি, কেবল তাদের নাম-রূপই জেনেছি। তারা যে সৎস্বরূপের প্রতিরূপ তা এখনো আমাদের কাছে অজানা। নাম ও রূপ, আমাদের নিজেদের মধ্যে ও বাহ্য বস্তুর মধ্যে যা সত্য তাকে ঢেকে রাখে, কিন্তু সব নাম ও রূপই, তাদের পেছনে যে সৎ-স্বরূপ রয়েছে তার মহিমাকে ক্ষীণভাবে প্রতিফলন করে। এই চরম সৎ-স্বরূপ, যা সকলের মধ্যে সাধারণ ভাবে বিদ্যমান, তাই আমাদের অন্তর্জীবনের ও বাহ্যজগতের ভিত্তি—তাকেই উপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মা, তথা পরমাত্মা বলা হয়।

আমাদের মধ্যে সব সময়ে এই সৎ-স্বরূপ বা ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগের, তথা একাত্মতার, এক অবচেতন অনুভূতি বর্তমান রয়েছে। সেটি হয়তো খুবই অস্ফুট, খুবই অস্পষ্ট, তবু তা আছে। সব আধ্যাত্মিক জীবনের কাজই হলো এই অস্পষ্ট আত্ম-সচেতনতাকে স্পষ্টতর করে তোলা। আমরা যদি সত্যের সামনা-সামনি হতে চাই, তবে তা নিজেদের নিয়েই আরম্ভ করা উচিত, আমাদের অহংচেতনার পেছনে যা রয়েছে তার সন্ধান করা উচিত।

## অহং-ভাবের প্রাথমিক সচেতনতা

যতদিন একটা ভ্রান্ত আত্ম-পরিচয়বোধ থাকবে, একটা ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব-বোধ থাকবে, ততদিন চরম সত্যের উপলব্ধি সম্ভব নয়। দেহ, মন ও অহং-এর সঙ্গে ভ্রান্ত একাত্মতা আমাদের মধ্যে রয়েছে, আর এই একাত্মবোধের সময় দেখা যায় যে আমরা আমাদের চেতনা-কেন্দ্রটির ক্রমান্বয়ে স্থানচ্যুতি ঘটাচ্ছি । এমনও আছে

---

১ দৃক্-দৃশ্য-বিবেক, ২০

যে, জাগতিক স্তরে কাজ করার সময় অথবা জীবনযাপন করার সময়ও কোন লোকের চেতনার মূলটি অতীন্দ্রিয় রাজ্যে রয়েছে; কিন্তু যতক্ষণ দেহ-মনের সঙ্গে ভ্রান্ত একাত্মবোধ আছে ততক্ষণ এটি কখনও সম্ভব হতে পারে না। কখনো কখনো আমরা দেহের সঙ্গে একাত্মবোধ করে বলে থাকি ঃ 'ও! আমি আঘাত পেয়েছি, আমি এমন কষ্ট পাচ্ছি।' কখনো কখনো আবার মনের সঙ্গে একাত্মবোধ করে বলি ঃ 'ও! ওমুক ওমুক লোক আমার সঙ্গে ভয়ানক অশালীন ব্যবহার করেছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।' এই সবই মিথ্যা একাত্মবোধ, এই একাত্মবোধের সাধারণ হেতুটি হলো—'আমি', 'আমি', 'আমি'—সব সময়েই এই 'আমি', যা বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়। আর যতক্ষণ এই 'আমি' রয়েছে, ততক্ষণ আমরা ব্রহ্মের সামান্য আভাসও পেতে পারি না। তবে এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো ঃ এই ভ্রান্ত একাত্মতার সময়েও আমাদের অবিকারী 'কোন বস্তু'র ('প্রতিবোধবিদিতম্')[২] চেতনা আমাদের থাকে। অধ্যাত্ম সাধকের কাজই হলো এই চিরন্তন অবিকারী 'বস্তু'টি কি তার সন্ধান করা।

এই 'আমি'টি কি বস্তু? এই জ্ঞাতাকে কিভাবে জানা যায়? 'বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ।'[৩] অনন্তের চিন্তাকে বাদ দিয়ে কোন সান্ত বস্তুর চিন্তা করা কখনই সম্ভব নয়, চিন্তাটি যতই অস্পষ্ট হোক না কেন। একটিকে মেনে নিলে, অপরটিকেও মেনে নেওয়া হয়। আমরা অনন্তকে সূত্রাকারে প্রকাশ করতে পারি না, আমরা শুদ্ধ চৈতন্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারি না। যদিও এঁকে কখনই সূত্রাকারে প্রকাশ করা যায় না, তবু এঁকে সজ্ঞাতে বোধ করা যায়। প্রত্যক্ষ অতি-চেতন অনুভূতি বলে একটি বিশেষ অবস্থা আছে।

'সত্য যাকে বরণ অর্থাৎ মনোনয়ন বা কৃপা করেন, তারই কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন, তারই সত্যানুভূতি হয়'—

> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
> স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।[৪]

অদ্বৈতবাদের দিক থেকে, তুমিই তোমার বরণকারী বা মনোনয়নকারী, কারণ এই আত্মা, এই সত্য তোমার থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়, আর তুমি যদি নিজেকে এই সত্যবস্তুর জ্ঞাতারূপে নিজেকে বরণ করে থাক, আর ঐ বস্তু লাভের জন্য সত্যই সচেষ্ট হও, তবে তুমি তাই হয়ে যাও। অদ্বৈতবাদের দিক থেকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হলো আত্মানুভূতি।

---

২ *কেনোপনিষদ্*, ২/৪ ৩ *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ২/৪/১৪ এবং ৪/৫/১৫

৪ *কঠ উপনিষদ্*, ১/২/২৩ এবং *মুণ্ডক উপঃ*, ৩/২/৩

দ্বৈতবাদের দিক থেকে, ঈশ্বরই বরণকারী, তিনি যাকে মনোনয়ন করেন তার ওপরই ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হয়। কিন্তু এখানেও আত্ম-সত্তার সমস্যাটি থেকে যাচ্ছে। ঈশ্বরের কৃপা কেবল তাদের ওপরই বর্ষিত হয় যারা এর জন্য প্রস্তুত হয়েছে, যারা পবিত্রতা অর্জনের জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছে। এমনকি তথাকথিত পাপী যারা সহসা পবিত্র জীবনযাপনের পথে এসেছে—তাদের ক্ষেত্রেও তাদের 'পাপকার্যই' তাদের জানিয়ে দেয় তাদের মনের নিম্নস্তরের কার্যপ্রণালী। তাদের মধ্যে অচেতনভাবে পবিত্র হবার জন্য তীব্র সংগ্রাম চলতে থাকে। দ্বৈতবাদের দিক থেকে, আধ্যাত্মিক অনুভূতিই হলো ঈশ্বরানুভূতি।

অদ্বৈতবাদের দিক থেকে, আত্মানুভূতি ও ঈশ্বরানুভূতি এক ও সমার্থক। দ্বৈতবাদে এ দুটিকে পৃথকভাবে দেখা হয়, প্রথমে আত্মানুভূতি আসে, পরে ঈশ্বরানুভূতি লাভ হয়। কিন্তু দুটি পথেই অহংচেতনাকে অতিক্রম করা ও জীবাত্মার সন্ধান পাওয়া অবশ্য কর্তব্য। জীবাত্মার সন্ধান লাভের পরই, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়। 'অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে সত্যের মুখোমুখি হয়ে,'[৫] নির্মম আত্ম-বিশ্লেষণ চাই। প্রথমে, আপন আত্মার সন্ধানে যত্নবান হও ও নতুন করে আত্মানুভূতি লাভ কর। কার্যত তুমি তোমার আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছ, তাকে আবার খুঁজে পাবার পরেই কেবল উচ্চতর অনুভূতির প্রশ্ন উঠতে পারে। মানুষ যখন আপন আত্মার অনুসন্ধান আরম্ভ করে তখনই তার অধ্যাত্ম জীবনের শুরু। আধ্যাত্মিক জীবন তখনই শুরু হয়, যখন আমাদের বোধ হয় যে আমরা কতকগুলি দেহ বা আবেগ গুচ্ছ নই, নরও নই নারীও নই, পরন্তু কতকগুলি অধ্যাত্ম-সত্তা, যা অসীম অধ্যাত্ম-তত্ত্বের কতকগুলি অংশ, যা ভৌত জগতের তুলনায় অনেক বেশি সত্য ও অনন্তগুণ মূল্যবান। আর তাই সমস্ত প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি রূপে এই সচেতনতা লাভ আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়।

## অধ্যাত্ম জীবনের মৌলিক নিয়মাবলী

জীবাত্মা আর বিশ্বাত্মার সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম : প্রথম নিয়মটি হলো : *যা কিছুকেই মানুষ সত্য বলে গ্রহণ করে, তাই তার সমগ্র সত্তাকে, তার সমস্ত চিন্তারাশিকে, তার সমগ্র অনুভূতিকে, তার আকাঙ্ক্ষাকে আকর্ষণ করে।*

---

৫ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪১১। স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'To The Awakened India' কবিতার স্বামী প্রজ্ঞানন্দ-কৃত অনুবাদে সংশ্লিষ্ট পঙ্‌ক্তিটি হলো : 'অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে সত্যগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে।'

যদি এই মিথ্যা জগৎকে আমরা সত্য বলে মনে করি, তবে তাই আমাদের সমগ্র সত্তাকে আকর্ষণ করবে। আর যদি ঈশ্বর আমাদের কাছে সত্যরূপে প্রতিভাত হন, তবে আমরা সংসার-জগতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের সমস্ত হৃদয় ঈশ্বরে আরোপ করব। যখন আমরা জগৎকে সত্য বলে গ্রহণ করি, আমরা তাতেই পরিপূর্ণ হয়ে থাকি। যখন ঈশ্বরকে সত্য বলে গ্রহণ করি, তখন আমরা একমাত্র ঈশ্বরেই পূর্ণ হয়ে থাকি। সুতরাং যা কিছু আমাদের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়, আমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকেই অনুসরণ করি।

অতএব, সৎবস্তুর স্বরূপ কি সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা আমাদের প্রয়োজন। আর যখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করি, আমরা আর একটি তথ্য আবিষ্কার করে থাকি, সেটি হলো অধ্যাত্ম জীবনের দ্বিতীয় মৌলিক নিয়ম ঃ *আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ধারণার ওপরই নির্ভর করে সৎ-বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা।* শিশুর কাছে তার পুতুলগুলিই সত্য সজীব সত্তা। সে যখন বড় হয়, নিজের সম্বন্ধে তার ধারণার পরিবর্তন হয়, তখন তার কাছে পুতুলের সত্তা আর সত্য থাকে না। তেমনি কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন হয়ে থাকে। নিজের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আর জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি—এ দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সব সময়েই দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ বস্তু জগতের জ্ঞানের পূর্বেই দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে।

এ বিষয়ে, রোগ ভোগের ফলে রাজার চক্ষুপীড়া হওয়ার গল্পটি উদাহরণস্বরূপ। চিকিৎসক রাজাকে পরামর্শ দেন, সব সময়ে সবুজ জিনিসের দিকে তাকাতে। তাই রাজা হুকুম দিলেন সমস্ত প্রাসাদ, ফলের বাগান প্রভৃতি সব কিছু যেন সবুজ রঙে রঞ্জিত করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞ মন্ত্রী প্রস্তাব দিলেন—এর পরিবর্তে রাজা মহাশয় সবুজ চশমা পরুন। তাতে রাজা দেখেন সমস্ত জগৎটাই সবুজ হয়ে গেছে। যখন নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তন হয়, আর আমরা নিজেদের এক একটি আত্মারূপে দেখতে আরম্ভ করি, কেবল তখনই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়। যখন আমরা নিজেদের চৈতন্যরূপে দেখতে থাকি, তখন আমরা অনন্ত চৈতন্যের সন্ধানে ফিরি।

যখনই ভৌত জগৎকে আধ্যাত্মিক জগতের থেকে বেশি সত্য বলে বোধ হয়, তার আগেই আমাদের চেতনায় শরীরকে আমাদের আত্মার থেকে, বেশি সত্য বলে মনে হতে থাকে। বস্তুত সর্বাগ্রে চেতনাস্তরে আমাদের অবনতি ঘটে, তারপরই আমাদের দেহ চেতনার, তারও পরে বাহ্য জগতের চেতনার মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

## যুক্তির ভিত্তি

বেদান্তে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়াই হলো যুক্তির ভিত্তি। এ কেবল বৌদ্ধিক কচকচানি বা তার্কিকের সব যুক্তি কেটে উড়িয়ে দেওয়া নয়। যুক্তি সব সময় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যুক্তি শুরু হয় আমাদের আত্মার অস্তিত্বরূপ তর্কাতীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। ডেকার্টেজ (Decartes) বলেছিলেন, Cogito ergo sum, 'আমি চিন্তা করি, তাই আমার অস্তিত্ব আছে।' হিন্দুরা এই বাক্যটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'আমার অস্তিত্ব আছে, তাই আমি চিন্তা করি।' এই যুক্তিকে আমাদের বাইরের ভৌত জগতে ও অন্তরে মনোজগতে বিস্তার করা হয়েছে। তার ফলেই আমরা দেখি যে একমাত্র আত্মাই হলো অপরিবর্তনীয় সত্য, আর অন্য সব জিনিসই অনিত্য। যা পরিবর্তনশীল তা নিশ্চয়ই অস্তিত্বহীন, অসৎ অথবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় যা সদা বিদ্যমান অন্তত তার থেকে কম সত্য। বৈদান্তিক সাধক সৎ ও অসতের বিচার এই ভাবেই করে থাকে।

বিষয়টির সুস্পষ্ট বিশ্লেষণের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। এমনকি আমরা আমাদের চিন্তাগুলি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আমরা আমাদের মনেরও পর্যবেক্ষণ করতে পারি। অতএব মন হলো একটি বিষয় যাকে অন্য কোন বিষয়ী পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

> রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দৃক্তু মানসম্।
> দৃশ্যা ধীবৃত্তয়স্সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে ॥ [৬]

—রূপ হলো দৃশ্য, আর চক্ষু দ্রষ্টা। চক্ষু হলো দৃশ্য আর মন দ্রষ্টা। নানাবৃত্তি সমেত মন হলো দৃশ্য, আর সাক্ষী দ্রষ্টা। কিন্তু সাক্ষী অন্য কারও দ্বারা দৃষ্ট হন না।

এই ভাবেই আত্ম-বিশ্লেষণ, আমাদের সত্য প্রকৃতির অনুসন্ধান চালানো হয়। এ থেকেই আমরা আত্মার, বিষয়ীর, যিনি বিষয়ের সাক্ষী তাঁর আভাস পেয়ে থাকি। কিন্তু চরম সত্য বিষয়ী ও বিষয় উভয়ের পারে।

যখন তুমি গভীর চিন্তামগ্ন, তুমি নিজে থেকেই বল : 'ও! এই চিন্তাটি মনে ওঠে' ইত্যাদি। তাই তুমি তোমার চিন্তারও সাক্ষী হলে। উদীয়মান ও বিলীয়মান নানা চিন্তা নিয়েই মন গঠিত। অতএব মন সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু সাক্ষী, আত্মা, পরিবর্তনহীন। সত্যবস্তু সম্বন্ধে সব রকম মানবীয় অনুসন্ধান অবশ্যই সর্বদা এই পরিবর্তনহীন আত্মা থেকেই শুরু করতে হবে। আত্ম-চেতনার তত্ত্বটিই আমাদের ব্যক্তিত্বের মূলভিত্তি। সব রকম ভৌতিক ও মানসিক পরিবর্তনের মাঝে, আমাদের

---

৬ দৃক্-দৃশ্য-বিবেক—১

মধ্যে কিছু অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব রয়েছে। এই থেকেই আমাদের চরম সত্যের স্বরূপ উপলব্ধির সূত্র পাওয়া যায়।

আমাদের চেতনায় যা সত্য, তা চিরকালই তাই থাকে। জল, বুদ্বুদ বিলীন হলেও জল কণাগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় না। দেহ যেন বুদ্বুদ, আর আত্মা জলকণা। যা আমাদের মধ্যে প্রকৃত সারবস্তু তা চিরকাল থাকে; যা চরম পূর্ণতার দিক থেকে সত্য নয়, তা ঝরে পড়ে যায়। দেহ ঝরে পড়ে; আত্মা থাকে বিকারহীন, অন্তহীন ও মৃত্যুহীন হয়ে।

আপন সত্তা সম্বন্ধে আমাদের নিজ নিজ ধারণা আমাদের ক্রিয়াকলাপকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ধরা যাক দেহই আমাদের সত্তা, তবে দেহগত ভোগই হবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য। যদি ধরা যায় মরণের পর জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে, আর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন পুরাপুরি নির্ভর করছে আমাদের বর্তমান—দৈহিক ও মানসিক—ক্রিয়াকলাপের ওপর, তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে? তখন আমরা ভিন্ন ভাবে কাজ করব, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে না। তখন আমরা তাঁরই অনুসন্ধানে সচেষ্ট হব যিনি আমাদের নিজ নিজ আত্মার জন্য নিয়ে আসেন সফলতা, শান্তি ও পরমানন্দ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দৈনন্দিন প্রকৃতি ও ভাবনার মধ্যে বহু পার্থক্য ঘটিয়ে থাকে। বিচারের সাহায্যে সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।

## দ্রষ্টার প্রকৃতি

অহংতত্ত্বকেই জীব আখ্যা দেওয়া হয়। জীবত্ব গঠনে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন ঃ অন্তরিন্দ্রিয় বা মন (*অন্তঃকরণ*), অহং-চেতনা এবং মনে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, যার নাম চিদাভাস। তিনটি একত্রিত হয়েই জীবসত্তা গঠিত হয়। এর মধ্যে, অন্তরিন্দ্রিয়ের অস্তিত্বই হলো মূল উপাদান। সেটি আবার—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের মিলনে জাত এক বিশেষ বস্তু, যার নাম মায়া। এই অন্তঃকরণই 'অহং'-চেতনা জাগিয়ে তোলে ও ব্রহ্ম-দীপ্তি প্রতিফলিত করে। 'অহং'-চেতনা সম্বলিত প্রতিফলিত দীপ্তিই জীব। যখন উচ্চতর জ্ঞানের সাহায্যে ঐ প্রতিফলনকারী দর্পণটি বা অন্তরিন্দ্রিয়টির বিনাশ হয়ে যায় তখন প্রতিফলনের কি হয়? আদিতে ব্রহ্মই প্রতিফলিত হয়েছিল, আর প্রতিফলক দর্পণের অভাবে তা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়েই থাকবে। অন্য কথায় গুণাতীত অবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বস্তু। যতদিন দর্পণটি রয়েছে জীবের অস্তিত্বও রয়েছে; তবে তা সীমিত ও বদ্ধ। কিন্তু যখন দর্পণ লুপ্ত হয়, তখন সেখানে কেবল ব্রহ্মই থাকেন, যার কোন সীমাও নেই, বন্ধনও নেই; তা তো অসীম, চরম নিরপেক্ষ, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

অবশ্য, এ অতি উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি—পৃথিবীর কোথাও কোন মানুষ যতদূর পৌঁছতে পেরেছে, তার মধ্যে উচ্চতম। বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দৃষ্টিভঙ্গি নাগালের বাইরে, আর তা লাভ করতে আমাদের বহু বছর বা বহু জীবন লাগতে পারে। অতএব এ বিষয়ে আমাদের এখনই কি কর্তব্য? আমাদের এখনকার সমস্যা হলো—প্রতিফলনকে দর্পণ থেকে পৃথকভাবে দেখা। ব্রহ্ম মনের মাধ্যমে বিভাসিত হন, কিন্তু আমরা মনের (অর্থাৎ চিন্তার) নানা বিকার নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকি যে তার মাধ্যমে যে দীপ্তি বিভাসিত হচ্ছে তাকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না। এই প্রতিফলিত দীপ্তিকে আমরা কেবল তখনই দেখতে পাই যখন মন শুদ্ধ ও বিকারমুক্ত হয়। তখনই আমরা ঐ দীপ্তিকে চিন্তা থেকে পৃথকভাবে দেখতে পাই। কেবল তাই নয়, তখন আমাদের উপলব্ধিও হয় যে, এই প্রতিফলিত দীপ্তি সত্যসত্যই অসীম দিব্য দীপ্তিরই একটি অংশ। প্রথমেই, নিজ উচ্চতর সত্তার কোন রকম আভাস আমাদের অবশ্যই পেতে হবে। অসীমের প্রশ্ন আসবে পরে।

## অন্তরের দীপ্তি

স্বজ্ঞা, প্রত্যক্ষ দর্শনের ক্ষমতা, আমাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, একে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। একমাত্র তারই মাধ্যমে উচ্চতর সত্তাগুলির আভাস এসে থাকে। স্বজ্ঞার উচ্চতর ক্ষমতা কিভাবে গড়ে তোলা যায়? কিভাবে তুমি ঘুমিয়ে পড় আর কিভাবেই বা ঘুম ভাঙ্গে, এইটুকুই লক্ষ্য করতে থাক। তুমি দেখবে যে প্রথমে তোমার ইন্দ্রিয়গুলি মনে প্রত্যাহৃত হয়, পরে চিন্তারাশি লুপ্ত হয়, আর তোমার একটু মাত্র অস্পষ্ট 'অহং'-চেতনা থাকে। শেষে এই 'অহং'-চেতনাও গভীর নিদ্রায় লীন হয়ে যায়। যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন বিপরীত পদ্ধতি ঘটতে থাকে। প্রথমে 'অহং'-চেতনার প্রকাশ ঘটে এবং পরে তা যুক্ত হয় মনে যেসব চিন্তার উদয় হয় তার সঙ্গে আর পারিপার্শ্বিক বস্তুনিচয়ের সঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গার ঠিক পরেই একটি আবছা অন্তর্বর্তী কাল থাকে যখন মুহূর্তের জন্য তুমি শুদ্ধ 'অহং'-চেতনাকে ধরে রাখ। ঠিক সেই মুহূর্তে জগৎকে ছায়ার মতো দেখায়; তখনো আমাদের কাছে জাগতিক বস্তু বাস্তব সত্তা লাভ করেনি। এই শুদ্ধ সচেতনতার কিছুটা জাগ্রৎ অবস্থায় সচেতনভাবে আমাদের লাভ করা উচিত। সাধকের সামনে এইটিই হলো আসল কাজ। সেই স্তরে আমাদের উঠতে হবে, যেখানে আলো ও অন্ধকারের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত পাতলা।

*বৃহদারণ্যক উপনিষদে* রাজা জনক প্রবীণ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মানবের পক্ষে কোন্‌টি আলোকের কাজ করে?' ঋষির উত্তর হলো : 'সূর্যের আলোক। সূর্যের আলোতেই সে বসে, বাইরে যায়, কাজ করে ও ফিরে আসে।'

'যখন সূর্য অস্ত যায় তখন কোন্ বস্তু আলোকের কাজ করে?' 'চন্দ্র।' 'যখন চন্দ্র থাকে না?' 'অগ্নি'। 'যখন অগ্নি থাকে না?' 'শব্দ'। 'যখন শব্দ থেমে যায়?' এই রকম প্রশ্ন করতে করতে তিনি পৌঁছে যান তাঁর পেছনে অবস্থিত নিজ আত্মার কাছে।[৭] মনই বাহ্যবস্তু সকলকে চিনতে পারে। কিন্তু মনের পেছনে রয়েছে—দীপ্তিমান আত্মা, যার আলোকে আমরা স্বপ্নে অন্তরস্থ বস্তুগুলিকে দেখতে পাই। যে আলোকে আমরা অন্তরের বস্তুনিচয়কে নিয়ে স্বপ্ন দেখি, তার সম্বন্ধে চিন্তা কর। যে আলোক স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলির বিকাশ ঘটায়, তার চিন্তা কর। সে আলোকের স্বরূপ কি? এইটিই আত্মা, সত্তা স্বয়ং—আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ। তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন। অন্য কিছু তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। ইনিই অন্য বিষয়কে প্রকাশ করেন—বাহ্য বস্তুকে আবার অন্তরস্থ মনোগত প্রতিবিম্বকেও। যখন কোন বিষয় থাকে না, স্বয়ং জ্যোতিঃ আত্মা একাই বিভাসিত হয়ে থাকেন। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি এই দুই অবস্থার মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা এই শুদ্ধ আত্মারূপে অবস্থান করি। সাধকের করণীয় হলো জাগ্রৎ অবস্থায় ঐ অবস্থানকে স্থায়িভাবে আয়ত্ত করা। তাহলে আর সেটা কখনও হারিয়ে যায় না।

## ঐ স্বজ্ঞাকে কিভাবে জাগিয়ে তোলা যায়?

বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তি আমাদের এই ত্রিবিধ মানস-শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলেই আমরা আমাদের অন্তরস্থ বিস্মৃত স্বজ্ঞাবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারি। প্রথমে এই বৃত্তিগুলির শুদ্ধি প্রয়োজন। পবিত্রীকরণ এক দুরূহ কর্ম। এতে প্রচুর সময় দরকার। পূর্ব অভিজ্ঞতার *সংস্কারগুলি* সুপ্ত রয়েছে। সেগুলিকে দূর করতেই বেশ সময় লাগে। এদের কতকগুলিকে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেই মুছে ফেলা যায়। অন্য কতকগুলিকে অন্য অভিজ্ঞতার সহায়ে সংযত করা দরকার। অন্য কতকগুলিকে অন্য রূপ দিতে হবে। মনের অভিজ্ঞতারূপে যে তেজ সঞ্চিত রয়েছে তাকে উচ্চ খাতে প্রবাহিত করতে হবে। এর নাম উদ্গতি। এখানেই কর্মযোগের প্রয়োজন। ঘৃণাকে জয় করেছি ভাবলেই তা করা যায় না, নিজ জীবনেই ঐ ভাবটিকে কাজে করে দেখাতে হবে। আদর্শগুলিকে কাজে পরিণত করতে হবে। সৎ-কর্মের ফলগুলি আবার সৎ-*সংস্কার* হয়ে জমা থাকে। এইগুলি মনকে পবিত্র করে ও সঙ্কল্প দৃঢ় করে তোলে। কতকগুলি *সংস্কারকে* নিয়মিত *জপ* ও ধ্যানের মাধ্যমে পরিবর্তিত বা জয় করা যায়। ধ্যানের সাহায্যে নানা প্রতিভার মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও তাদের একীকরণ সম্ভব হয়। যখন অনুভূতি, ইচ্ছা ও চিন্তা এই তিন বৃত্তির পবিত্রীকরণ, একীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় সফল হওয়া যায়, তখনই স্বজ্ঞা-

৭ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, ৪/৩/২-৭

বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আত্মজ্যোতি বিভাসিত হতে থাকে প্রথমে ঝলকে ঝলকে, কিন্তু পরে স্থির আলোকচ্ছটার মতো।

তখন আমাদের বোধ হতে থাকে জীবরূপী আত্মা কাজ করে চলেছে মনের মাধ্যমে, ইন্দ্রিয়বর্গের মাধ্যমে, ভৌত শরীরের মাধ্যমে। প্রসিদ্ধ *গুরুরূপী* দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে শ্রীশঙ্কর এই ভাবটিকে পরিষ্কার করে বলেছেন ঃ

> নানাচ্ছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং
> জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
> জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ
> তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ [৮]

—যেমন বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ঘটের মধ্যে উজ্জ্বল দীপ রাখলে তার আলোকচ্ছটা ছিদ্রগুলির ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি আত্মসত্তা চক্ষু ও অন্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে 'আমি জানি' এই বোধ সৃষ্টি করে। আত্মসত্তা প্রকাশ করলেই প্রত্যেকটি বস্তু বিভাসিত হয় (অর্থাৎ জানা যায়)। আমি সেই আচার্যের কাছে প্রণতি জানাই, যিনি দক্ষিণামূর্তিরূপে অনন্যভাবে পরমাত্মারূপে প্রসিদ্ধ।

এই অভিজ্ঞতা লাভ করলে আমরা শুদ্ধ আত্মা থেকে করণবর্গকে পৃথক করতে পারব। তখন, আগে যাকে আমরা আত্মা বলছিলাম, সেটিকে ভ্রান্ত আত্মা বলে মনে হবে। এই অজ্ঞানাত্মা শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের সমষ্টি। শুদ্ধ আত্মা এ সবের পেছনে থেকে তাদের আলোক দিচ্ছেন, প্রাণবন্ত করে তুলছেন। আমাদের বর্তমান কর্তব্য হলো আমাদের মাধ্যমে প্রকাশমান প্রোজ্জ্বল আত্মার সন্ধান করা। এই হলো আমাদের আশু উদ্দেশ্য। অবশ্য চরম উদ্দেশ্য হলো এই ক্ষুদ্র সত্তাকে অনন্ত পরমাত্মায় বা পরব্রহ্মে লীন করে দেওয়া। কিন্তু সে সমস্যা এখনই উঠছে না। আমরা যেখানে আছি, সেখান থেকেই আরম্ভ করে এগিয়ে চলি নিজেদের ক্রমান্বয়ে শুদ্ধ করতে করতে—দৈনন্দিন *জপ,* ধ্যান, অধ্যয়ন ও নিষ্কামভাবে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে।

## তিন রকম শরীর

স্থূল-শরীর গঠিত হয় স্থূল ভৌত বস্তু দিয়ে। এরই জন্ম-মৃত্যু হয়। স্থূল-শরীর থেকে পৃথকভাবে আমাদের রয়েছে একটি সূক্ষ্ম-শরীর ও একটি কারণ-শরীর। যখন স্থূল-শরীরের পতন হয়, আমাদের অন্য দুটি শরীর তখনও এক মিলিত-রূপেই থাকে। ইন্দ্রিয়বর্গ কোন্ শরীরের অন্তর্গত? যদি ইন্দ্রিয় বলতে আমরা বাহ্য চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির মতো প্রত্যক্ষ অনুভূতির সহায়ক দেহযন্ত্র বুঝে থাকি তবে তা স্থূল

---

৮ শঙ্করাচার্য, দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রম্, ৪

শরীরের অঙ্গ। কিন্তু যদি ইন্দ্রিয় বলতে সেই সূক্ষ্ম তেজের কথা ভাবি, চক্ষু ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি যার যন্ত্রমাত্র, তবে তা সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গ। কারণ শরীর আবার সূক্ষ্মশরীরেরও আশ্রয়স্থল।

যখন স্থূল শরীর পড়ে যায়, কিছুরই অন্ত হয় না। আত্মা তার সব কামনা-বাসনা নিয়ে তেমনই বদ্ধ থাকে, স্থূল-শরীরের অস্তিত্ব থাকলে যেমন থাকত। তাই মৃত্যুর পূর্বেই, সাধকের উচিত ওগুলি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। মৃত্যুই সমাধান নয়, কারণ এর সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায় না, যেমন আগেই উল্লেখ করেছি। মৃত্যু আমাদের একটুও উন্নত করে না, আমাদের অজ্ঞানতারও একটু হ্রাস করে না। জন্ম-মৃত্যুর পারে যে তত্ত্ব রয়েছে সেইটিকে আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের মধ্যে এমন কিছু শক্তি আছে, যা চক্ষু থেকে পৃথক কিন্তু চক্ষুর মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যা কর্ণ থেকে পৃথক কিন্তু কর্ণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, মন থেকে পৃথক কিন্তু মনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ঐ একই শক্তি আবার একই রকমভাবে প্রকাশ পায় শারীর যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়স্থানগুলি দিয়ে।

সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনকে কারণ-শরীরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু যখন জীব আবার চেতন অবস্থায় ফিরে আসে, তখন সে তার বাসনা, কামনা ও আবেগ, তার সব লালসা, ক্রোধ ও ঘৃণা নিয়েই ফেরে—বেশি কিছুই তার লাভ হয় না। এইখানেই সমাধি বা অধ্যাত্ম চেতনা ও সুষুপ্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সত্য দর্শন হলে বা সত্যের আভাস পেলে, আমাদের সমস্ত বাসনা ও আবেগ দগ্ধ হয়ে যায়। মূর্খ যদি *সমাধি* লাভ করে সেও এক প্রবুদ্ধ পুরুষ হয়ে ফিরবে, কিন্তু এও জেনে রেখো যে মূর্খ কখনোই *সমাধি* মগ্ন হতে পারে না!

এক রকম শ্রেণী বিভাগে বলা হয় আমাদের তিনটি শরীর আছে, অন্য রকম বিভাগে বলা হয় আমাদের পাঁচটি কোষ আছে। সাধারণত স্থূল শরীরের অনুভূতি আমাদের এত বেশি যে সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের সব বোধ আমরা হারিয়ে ফেলি। প্রতিটি মানবের যে বিভিন্ন শরীর আছে সে সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করা কি সম্ভব? হ্যাঁ। এ সম্ভব হতে পারে যদি আমরা সত্য সত্যই অন্তর্মুখী হয়ে মনের বহির্মুখিনতাকে বন্ধ করে তাকে ঘুরিয়ে অন্তর্মুখিন করে তুলতে পারি। যতক্ষণ জীব-তত্ত্ব শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, এর দ্বারা প্রতিটি অণু প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। শরীরে আমরা এই শক্তির সংস্পর্শে এসে থাকি, আর শক্তি মানেই তেজ এবং তার অর্থ কম্পন। আর একটু অগ্রসর হলে, আমরা আর একরকম শক্তি বা কম্পনের সংস্পর্শে আসি, যথা আমাদের চিন্তারাশি ও আবেগ সমষ্টি। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ব্যক্তিত্ব যেন কতকগুলি কম্পনের সমষ্টি। কখনো কখনো

মনে অত্যন্ত অশান্ত চিন্তারাশির উদয় হয়, আর তখন আমরা যেন এক উত্তেজিত কম্পনরাশির স্তূপের মতো একটা কিছু হয়ে পড়ি, যার মধ্যে আমাদের এই শরীরকে স্থাপন করা হয়েছে। আরো অগ্রসর হয়ে আমরা যদি মনকে শান্ত করতে পারি, তখন আমাদের চেতনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ হবে, যা অবশ্যই শুদ্ধ চেতনা নয় কিন্তু এক রকম মিশ্র-চেতনা যার মধ্যে এই অস্পষ্ট অনুভূতি ও আবেগসমূহ লয় পায়—যা অহং-প্রধান এক স্পষ্ট চেতনা। একে আমরা মন ও ইন্দ্রিয়রূপ যন্ত্র (বা করণত্ব) সচেতনতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—কর্তৃ-(বা নিমিত্ত) সচেতনতা আখ্যা দিতে পারি। এই (অভিজ্ঞতাভিত্তিক) বা পরীক্ষামূলক সত্তার নাম দেওয়া হয় *তৈজস*। এই কর্তৃ-সত্তা থেকেও স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে শুদ্ধ চৈতন্য, অর্থাৎ শুদ্ধ ব্যষ্টি চেতনা, যা নিজেকে বিকশিত করে সব রকম বস্তুজ্ঞান ও সব রকম ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে। মাণ্ডূক্য উপনিষদে এর নাম দেওয়া হয়েছে *প্রাজ্ঞ*।[১]

## ব্যষ্টি ও বিশ্ব

ব্যষ্টি-চৈতন্যের প্রসঙ্গে এসে সাধক জানতে পারে এই ব্যষ্টি-চৈতন্য অনন্ত কূটস্থ-চৈতন্য বা ব্রহ্মের একটি অংশ। কিন্তু জানতে হলে আমাদের অবশ্যই অন্তর্মুখিন হয়ে নিদিধ্যাসন ও অনুচিন্তনের জীবন যাপন করতে হবে। কোন কোন সাধক ব্যষ্টি চৈতন্য স্তরে পৌঁছনো মাত্র বিশ্ব-চৈতন্যের সংস্পর্শে আসতে চেষ্টা করে, কিন্তু অনেকে সর্বদা সব অবস্থায় এই বিশ্ব-চৈতন্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে চেষ্টা করে—কারণ সর্বস্তরেই ব্যক্তিত্ব বিশ্ব-চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত।

যদি আমি আমার শরীরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করি, দেখব যে এটি অনন্ত জড়-সমুদ্রের অংশ মাত্র, অন্য সকলের শরীরের মতো। যখন স্থূল শরীর থেকে প্রাণময় শরীরে আসি, তখন অনুভব করি যে আমার মধ্যে যে প্রাণশক্তি রয়েছে তা বিশ্ব-প্রাণশক্তির (সৃজনশক্তির) অংশ। নিজ আবেগ ও অনুভূতির রাজ্যে এসে দেখি যে আমার আবেগ ও অনুভূতিগুলি বিরাট (বিশ্ব) আবেগ ও অনুভূতির অংশ মাত্র। সেই ভাবেই আমার চৈতন্য বিশ্ব-চৈতন্যেরই অংশ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ যার যন্ত্রমাত্র এবং সর্বশেষে আমি উপলব্ধি করি যে আমার শুদ্ধ ব্যষ্টি-চৈতন্য শুদ্ধ অনন্ত চৈতন্য বা ব্রহ্মের অংশ। এই পরম চৈতন্যই পেছনে থেকে আমাদের সমস্ত ক্রিয়ায় ও চিন্তায় সত্তা প্রদান করছে। সুতরাং আমাদের ব্যক্তিত্ব একটি জটিল সত্তা, সেটির বিশ্লেষণ করতে হবে একের পর এক স্থূল থেকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর দৃষ্টিকোণের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে। যদি কেউ যথার্থই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তবে

---

১ *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্*, ৪, ৫

কখনো কখনো অনুভব করবে সে যেন এক চিন্তাঘনরূপ নিয়েছে, তার শরীর যেন এক চিন্তা সরোবরে ভাসমান।

সাধারণত আমরা শরীরে আত্মবুদ্ধি এত দৃঢ়ভাবে করে থাকি এবং এর বাহ্য-রূপটিকে এমন দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করি যে আমাদের পক্ষে একে অস্থি-মাংস ছাড়া অন্য কিছুরূপে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এ কেবল আরো বেশি অনুভূতিশীল হওয়ার ও আত্ম-বিশ্লেষণে অত্যন্ত অনীহাভাব বর্জনের প্রশ্ন। সমস্ত সূক্ষ্মতর দৃষ্টিকোণগুলি সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য মনে উচ্চতর সংবেদনশীলতা জাগিয়ে তোলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

আমরা যদি উচ্চতর সংবেদনশীলতা জাগিয়ে তুলতে পারি, তবে আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বগুলিকে একটি চিন্তা মিশ্রণে, একটি *বৃত্তি* গুচ্ছে, পরিণত করতে পারি। আর চিন্তা তো সূক্ষ্ম বিষয় বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং ব্যক্ত জগতেরই অন্তর্ভুক্ত, কখনই সেই অব্যক্ত তত্ত্বের বা চরম সত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমে আমাদের ব্যষ্টিভাব যেন লাল তপ্ত লৌহ বর্তুলের মতো, যে ক্ষেত্রে লৌহ বর্তুল ও লাল আলো অবিচ্ছেদ্য মনে হবে, কিন্তু তাদের ছিন্ন করা যায়। বস্তুত তারা এক নয়। সময়ে সময়ে শুদ্ধ চৈতন্যের শরীর ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তাটি সাধকের অনুভূতি গোচরও হয়। সময়ে সময়ে যখন কেউ অত্যন্ত উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়, সে নিজেকে শরীর ও মন থেকে স্বতন্ত্র বলে অনুভব করতে পারে।

আমাদের সব আবেগ ও অনুভূতি শরীরের বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরেও আমাদের সম্পর্ক ও আবেগ ও অনুভূতি চলতে থাকে, কিন্তু তারা তখন আর শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। শরীর চেতনার ওপরে উঠলেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকি পূর্ণের অংশরূপে, আর এই সম্পর্ক—স্বামী-স্ত্রী, জন্মদাতা-সন্তান ও ভ্রাতা-ভগিনী ও বন্ধুর সম্পর্ক থেকে আরো বেশি ঘনিষ্ঠতর।

আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাধক এক ধরনের মানসিক সূক্ষ্ম-প্রভার ক্রমাগত বর্ধিত হারে বিকাশ ঘটাতে থাকে, যা সুস্পষ্ট বিশ্লেষণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। তখন আমরা বিষয় ও সম্পর্ক সকলের অভ্যন্তর ভাগ পর্যবেক্ষণ করতে শিখি ও আমাদের নিজেদের আর অসংযত মনের দ্বারা প্রতারিত হতে দিই না। সাধকের উচিত এই মানসিক সূক্ষ্ম-প্রভা স্বীয় অন্তরের দিকে আপতিত করে আপন সত্তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা।

প্রকৃত বিশ্ববোধ সব সময়েই আমাদের অন্যের ওপর আধিপত্য বোধ শিথিল করে দেয়, কিন্তু আমরা সাধারণত যা করি তা হলো অন্য সকলকে আমাদের জন্য

স্থূল অথবা সূক্ষ্ম ভোগ্যবস্তু আহরণে নিয়োগ। আমাদের সব দুঃখ, হতাশা, বিফলতা এই থেকেই এসে থাকে। আধ্যাত্মিক সাধনার সঠিক পথ অনুসরণ করে, যে কোন অবস্থাতেই ঐ পথ ধরে থাকলে, জীবাত্মার পক্ষে বন্ধন মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা এবং জীবাত্মা-বিশ্বাত্মার চিরন্তন সম্পর্ক উপলব্ধি করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন :

"বিচার করতে করতে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না। পেঁয়াজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভেতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।"[১০]

সাধক ব্যষ্টি-চৈতন্য বজায় রেখে বিশ্ব-চৈতন্যের সংস্পর্শে আসতে পারে। আর তা না করলে জ্ঞানাতীত (কূটস্থ) চৈতন্য অবস্থায় পৌছনোর কোন প্রশ্নই কখনো উঠতে পারে না। সাধককে ধাপে ধাপে চরম উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হতে হবে। কেবল নিরপেক্ষ চরম সত্যের কথা মুখে বললেই হবে না; কেবল আশ্চর্যজনক দূরকল্পনা ও অনুমানাদির সাহায্যে বহু ঊর্ধ্বে উঠলেই হবে না।

বর্তমান অবস্থার ওপরে ওঠার জন্য সচেতন প্রয়াস থাকা চাই। তাহলে, আমাদের যেমন যেমন অগ্রগতি হবে, নিম্নস্তরের দ্বন্দ্বগুলিও সেই অনুপাতে স্তিমিত হয়ে আসবে, কিন্তু উচ্চস্তরের দ্বন্দ্ব তখনো চলতে থাকবে। উচ্চতম স্তরে না ওঠা পর্যন্ত সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। আমরা যখন সমস্ত দৃষ্টজগৎকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের বাস্তবতার অন্তর্ভুক্ত করতে পারব, তখন সমগ্র দৃষ্ট জগৎ থেকে আমরা প্রভাবমুক্ত হতে পারব।

## ভৌত জগতের স্বরূপ

যা কিছু তোমার চেতনার বিষয় হবে তাই মায়া (প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়), আর তোমাকে অবশ্যই জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় বস্তু থেকে, দ্রষ্টাকে দৃশ্য থেকে, সাক্ষীকে সমস্ত দৃষ্ট বস্তু থেকে, অনুভব কর্তাকে (অনুমন্তাকে) অনুভূত (অনুমেয়) বিষয় থেকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রতি স্তরে নিষ্করুণ সুস্পষ্ট বিচার ও স্বচ্ছ চিন্তা অবশ্যই থাকতে হবে।

জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant)-এর মতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব আছে বটে কিন্তু আমরা তার প্রকৃত স্বরূপ জানি না। আমরা যখন বস্তুটিকে দেখি, তখন ঐ অনুভূতিতে স্থান ও কালের কিছুটা অবদান থাকে। বৈদান্তিকের মতে, কাণ্ট যাকে

---

১০ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১১

স্থান, কাল ও নিমিত্ত বলেন তা হলো মায়া, আমাদের এর পারে যেতে হবে। কাণ্ট এই অতিক্রমণের কোন উপায় খুঁজে পাননি; তাই তিনি বলেছেন, 'বস্তুকে বস্তু হিসাবে' কখনই জানা যাবে না। বেদান্ত জানবার উপায় নির্ণয় করেছে, ও বলে দেয় কি উপায়ে তা করতে হবে। মন ও জগৎপ্রপঞ্চকে অতিক্রম করার, দৃষ্টজগৎকে দ্রষ্টা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করার, সম্ভাবনার কথা কাণ্টের জানা ছিল না। তিনি যেখানে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেইখান থেকেই বেদান্ত শুরু করে।

ভৌত বিষয় সব সময়ে প্রত্যক্ষ বস্তু হয়, এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হওয়ায়। ইন্দ্রিয় স্থানগুলি আবার মনের কাছে প্রত্যক্ষ মনোগ্রাহ্য হয়। মন আবার আত্মার কাছে প্রত্যক্ষ হয়, কারণ আত্মা সর্বদাই সাক্ষিস্বরূপ গ্রহীতা এবং কখনই অন্যের দ্বারা গৃহীত বা প্রত্যক্ষ হন না। হলে তা হবে 'Regressus ad infinitum' অনন্ত প্রত্যাবর্তনের মতো। আমাদের কোন এক জায়গায় থামতেই হবে।

বেদান্তে সব সময়ে চৈতন্যের ওপর জোর দেওয়া হয়। বিষয়ী ও বিষয়, মন ও জড়বস্তু—সবই চৈতন্যে অবস্থান করে। এই বাস্তব তথ্য যেন আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত কখনো না হয়; অন্যথায় আমাদের পক্ষে সব কিছুকে গুলিয়ে ফেলে, আসল ব্যাপারটির ওপর থেকে দৃষ্টি হারিয়ে যাওয়ার মতো বিপদের আশঙ্কা আছে। গভীর নিদ্রায়, চৈতন্য বর্তমান থাকে। নিদ্রা ভঙ্গে আমরা বলে থাকি, 'আমার কিছুই জানা নেই,' কিন্তু 'আমার কিছুই জানা নেই', এ কথা বলার শক্তি পেতে হলে গভীর নিদ্রাকালে চৈতন্যের অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অতএব চৈতন্য নেই এমন কোন সময় নির্দিষ্ট করা যায় না।

কেবল যখন মানুষ আপন সত্তা থেকে স্বতন্ত্র কোন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তখনই সে সেটিকে পাবার বাসনা করে থাকে, সেটি যাই হোক না কেন। তার কোন বাসনা রয়েছে, এই তথ্যই প্রমাণ করে যে তার মধ্যে বিষয়ীত্ব বা কর্তৃত্বভাব আগেই গড়ে উঠেছে, আর আপন সত্তার অতিরিক্ত সব কিছুই যেন তার গ্রহণযোগ্য বিষয়। সেই কারণেই, বোধিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত হওয়া এক সিদ্ধ সত্য, যেহেতু তিনি পূর্ণ আত্ম-সংযমী। এরূপ পুরুষ অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তার পক্ষে অন্য কোন বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় তিনি কিছুই বাসনা করেন না।

## যথার্থ স্বরূপ ও আপাত প্রতীয়মান বস্তু

একটি স্ক্রুকে প্যাঁচ দিয়ে ভেতরে ঢোকানো হয়েছিল, তাকে এখন ঠিক উল্টো দিকে প্যাঁচ দিয়ে খুলতে হবে। ক্রমবিকাশ ও আরোপণ পদ্ধতির পর, আসে কারণে ফিরে যাওয়ার, জটিলতা থেকে সরল হওয়ার বা আরোপণ মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি।

স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে, তারপর এক বিরাট উল্লম্ফনে তুমি পৌঁছে যাবে সকলের পেছনে যে অনন্ত আত্মা রয়েছেন সেখানে। কিন্তু প্রথমে চাই এক প্রস্তুতি, ঘষা-মাজার ও শুদ্ধির জীবন, কারণ যতদিন মনে কালিমা থাকবে ততদিন মন-দর্পণে চৈতন্যের আলোক যথাযথ ও নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হবে না। সেই জন্য আগেই মন থেকে ঐ সব ময়লা ও ধূলার আস্তরণ অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে, তবেই তাতে আবার আলোকের প্রতিফলন ঠিক মতো শুরু হবে। আলোকের অস্পষ্ট প্রতিফলনের দরুনই আমাদের এখনকার এই সমূহ দুর্দশা। এর ফলে, সত্যস্বরূপ আমাদের কাছে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং ভ্রান্তি ও মায়া মোহের সৃষ্টি হচ্ছে।

বৈদান্তিক বিশ্বাস করে যে ক্রম-বিকাশ জীবনের একটি স্তর, কিন্তু কখনই চরম লক্ষ্য নয় এবং তার কাছে এই ক্রম-বিকাশও আপেক্ষিক ছায়া বা *মায়া* মাত্র, কখনই নিরপেক্ষ বা চরম সত্য নয়। সুতরাং আমরা যদি একান্তই ক্রম-বিকাশের কথা বলি, তা কেবল নিতান্তই আপেক্ষিক, একথা মনে রেখেই বলা হয়, নিরপেক্ষ বা চরম সত্য হিসাবে নয়। পরমাত্মার পক্ষে ক্রম-বিকাশের মতো কোন কিছু একেবারেই নেই। আত্মা সব রকম পরিবর্তনের নির্বিকার (অপরিবর্তনীয়) সাক্ষী।

মূল সমস্যাটা হলো এই যে, আমরা যা আপাত প্রতীয়মান তাকেই যথার্থ সত্য বলে মনে করি, আর সত্যস্বরূপকে অসৎ মনে করি! প্রকৃতপক্ষে, এটি অতীব হাস্যাস্পদ পরিস্থিতি। কিন্তু আমরা যেমন নির্বোধ, আমাদের তার মাসুল দিতে হবে, দুঃখ, দুর্দশা আর অশেষ মোহমুক্তির মাধ্যমে। সব ভ্রান্ত একাত্মবোধকে ছিন্ন করতে হবে। এর জন্য শুরুতে বেদনা বোধ করতে হবে। কিন্তু এ বেদনা তো আশীর্বাদ-স্বরূপ, কারণ এ বেদনাই তো মুক্তি ও আনন্দের অগ্রদূত। জগতের অন্ধকারকে আলোকিত করে এই আত্মা, কিন্তু আমরা এঁর প্রকৃত স্বরূপ জানি না, এঁর আলোকও দেখি না, যদিও আমাদের বাঁচা ও চলাফেরা সবই এঁর অস্পষ্ট প্রতিফলিত আলোকেই হয়ে থাকে।

অদ্বৈত বেদান্তে ক্রম-বিকাশ বলতে এক বস্তুর অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রশ্ন নয়। এ দুধ থেকে দই হয়ে যাওয়া নয়, তাহলে তো তার প্রকৃত স্বরূপের হানি হলো। কিন্তু এ যেন রজ্জুটির একটি সর্প 'হয়ে' যাওয়া, এ ক্ষেত্রে রজ্জুটির কোন প্রকৃত পরিবর্তন হচ্ছে না। কিন্তু যখন রজ্জুটিতে সর্পভ্রম হয় তখন তা থেকে, ভয় প্রভৃতি যত রকম দুর্ভোগ, যথার্থ সর্প থেকে আমাদের যেমন হয়ে থাকে, সে সবই এসে হাজির হয়। সেই ভাবেই, অসৎ বস্তুকে সৎবস্তু (অস্তিত্বহীনকে সত্তাবান) বলে মনে করে আমরা অশেষ দুর্ভোগ টেনে আনি।

একমাত্র সংসার-স্বপ্নই সত্য, এ বোধ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না আমরা জাগ্রত হই, যতক্ষণ না আমাদের আত্ম-দর্শন হয়। আর আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা স্বপ্নাবস্থা থেকে বেশি সত্য নয়। দুটি অবস্থাই সমানভাবে অসত্য।

'অসত্য' কথাটির বিকৃত অর্থ করা উচিত নয়। রজ্জুর স্থলে সর্পবোধ সেই অর্থে মিথ্যা নয়, যাতে বলা যেতে পারে সর্প দর্শনের একেবারেই কোন ভিত্তি নেই। রজ্জুটি যেন নিম্নস্তর, বা ভিত্তি, যার ওপর সর্পবোধটি আরোপ করা হয়েছে। *মায়া* বলতে, কেবল শূন্য-বোধ, এমন ভ্রান্তি বোঝায় না। এক কূটস্থ (অপরিবর্তনীয়) ব্রহ্মকে কিভাবে বহুসমন্বিত বিশ্বরূপে দেখা যায় তারই ব্যাখার জন্য *মায়া* শব্দটির প্রবর্তন হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের *নির্বাণ* কথাটিও শূন্যতা বোঝায় না। নাশ বলতে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার নাশ ও দুঃখ-নিবৃত্তিরই ইঙ্গিত করছে। এমনকি কোন কিছু নাশের জ্ঞান হতে গেলে একজন সচেতন সাক্ষীর প্রয়োজন, আর আত্মাই সেই সাক্ষী। কোনরূপ চৈতন্যের উপস্থিতি ছাড়া কোন বিনাশ-জ্ঞান সম্ভব নয়। নির্বাণ অবস্থায় 'বিনাশ প্রাপ্ত' হলে বুদ্ধ কিভাবে এত বছর ধরে উপদেশ দিয়ে গেলেন? বেদান্ত হলো এক রকম অতীন্দ্রিয় অস্তিত্ববাদ তবে এতে সাধারণের বোধগম্য ভাববাদ ও অস্তিত্ববাদ সংজ্ঞা দুটির স্থান রয়েছে।

## সৎ (সত্য) ও চিৎ (চৈতন্য)

'সৎ' বা সত্যরূপে তাকেই উল্লেখ করা হয়েছে যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে, কখনো প্রকৃতিগত বা আকারগত কোনরূপ পরিবর্তনের অধীন না হয়ে। যা কিছু এই শর্তের ব্যতিক্রম, তাকেই 'অসৎ' বা অসত্য পর্যায়ে পড়তে হবে। অসত্য বা অসৎ একেবারেই অস্তিত্বহীন নাও হতে পারে, কিন্তু কোন বস্তুর অস্তিত্ব যদি কিছু কালের জন্য থাকে ও পরে নাশ পায় অথবা পরিবর্তিত হয়, তবে তা 'অসৎ' বা অসত্য পর্যায়ে পড়বে। সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চ এই পর্যায়ে পড়ে, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। কোন কোন বস্তু একেবারেই অসত্য, তাদের অস্তিত্ব কোন অবস্থাতে কোন সময়ে থাকতে পারে না; যথা, শূন্যে সৌধ, খরগোসের শিং, বন্ধ্যার পুত্র ইত্যাদি। এই কথাগুলির কোন অর্থ হয় না ও এদের অনুরূপ বিষয়ও কখনো হয় না। শূন্যে সৌধের কথা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু কখনই তাতে বাস করতে পারি না। এগুলি থেকে স্বতন্ত্র কোন কোন বস্তু আছে, তাদের পরীক্ষামূলক (প্রায়োগিক) সত্য এই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে; চরম সত্য উপলব্ধির পরেই কেবল তারা অসত্যরূপে প্রমাণিত হয়। এই জগৎ-প্রপঞ্চ, যা আমরা অনুভব করে থাকি, তা পরীক্ষামূলক সত্য পর্যায়ে পড়ে ও সেই পর্যায়েই থাকে, যতদিন না চরম জ্ঞানের

উন্মেষ হয় আর তার আলোকে এই জগৎ-প্রপঞ্চের, এমনকি আমাদের আপন আপন প্রপঞ্চেরও, ছায়া পর্যন্ত অপসারিত হয়ে যায়। চরম বোধোদয়ের পর, যখন ঐ বোধিসম্পন্ন ব্যক্তি জগৎ -প্রপঞ্চের স্তরে নেমে আসে, সে দেখে যে সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু সেটিকে সে ছায়ারূপে গ্রহণ করে, আর জানে যে এটি অসৎ, এর কোন যথার্থ চরম অস্তিত্ব নেই।

আমাদের ব্যক্তিত্বে সেই চরম সত্য-চেতনা রয়েছে, তবে তা ঐ পরিদৃশ্যমান সত্তার চেতনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে। অতএব আমাদের সাধারণ চেতনা হলো শুদ্ধ চৈতন্য ও আপেক্ষিক বিষয়ী-বিষয় চেতনার মিশ্রণ। আমরা জগৎ-প্রপঞ্চকে যতটা সরিয়ে দিতে পারি, ততটাই আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হয়ে থাকি। আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতা ও আত্মা বা ব্রহ্ম বিষয়ে অভিজ্ঞতার যোগসূত্রটি, প্রপঞ্চের দিকে পড়ে না, পড়ে সেই দিকে, যা আপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ দুই অবস্থার মধ্যে সর্বদাই নিজেকে বজায় রাখে। আমাদের আত্ম-সচেতনতা পুরাপুরি মিথ্যা নয়, এতে একটি সত্য উপাদান আর একটি মিথ্যা উপাদান থাকে, আর মিথ্যা অংশটিকে অপসারণ করতে হবে বহুরূপে প্রতিভাত একের উপলব্ধির মাধ্যমে।

প্রথমে সাধকের বহু দর্শন হয় এবং পরে সে বহুর মধ্যে একের দর্শনে প্রয়াসী হয়—যেহেতু এক এবং বহু দুই-ই তার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়। সাধনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার উপলব্ধি হয় সত্য-সংজ্ঞাটির প্রকৃত ভাব অনুসারে একমাত্র একই সত্য, আর প্রপঞ্চের কেবল একটি দ্বিতীয় স্তরের সত্তা রয়েছে যা পুরাপুরি একের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল।

বেদান্ত আত্মার বা 'অহং'-চেতনার স্বরূপ জিজ্ঞাসা দিয়ে শুরু করে। এর শেষ হলো অদ্বৈত উপলব্ধিতে। এই অবস্থা দুটির মাঝখানে অনেকগুলি চেতনাবস্থা আছে। সাধকের 'অহং'-চেতনা ক্রমেই প্রসারিত হতে হতে সমগ্র অস্তিত্বকে পরিব্যাপ্ত করে। তদনুযায়ী তার জগৎ-ভাবনার পরিবর্তন হতে থাকে। আত্মা, জগৎ আর ঈশ্বরের মাঝে মাঝে বিভেদ রেখাগুলি ক্রমেই ঝাপসা হয়ে পড়ে, আর শেষে পরম চৈতন্যের প্রভায় সমস্ত অস্তিত্ব আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

# অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

# আধ্যাত্মিক রূপান্তর

## আকস্মিক পরিবর্তন

পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে আমরা নানা আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পাই, যেখানে পশুভাব সমন্বিত পশু-মানব দেব-মানবে রূপান্তরিত হয়ে দৈব-চেতনার ও দৈব-করুণার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।

যারা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী অনুধাবন করেছে তারা গিরিশ নামে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের নাম স্মরণ করতে পারে, যিনি বাংলার প্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার ছিলেন। আমাদের যৌবনকালে তাঁকে দেখার ও তাঁর কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। এক সময়ে তিনি অমিতাচারী উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। কিন্তু তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শ তাঁর ভেতর এক অদ্ভুত রূপান্তর এনে দিল এবং তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করে দিল। পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন অবস্থা থেকে দেবভাবের শুদ্ধতায় পরিবর্তিত হয়ে তিনি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে দৈব-চেতনার অনুভূতিতে ভরপুর হয়ে থাকতেন।

পুরাকালে ভারতবর্ষে এক যুবা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অন্য কোন উপায় না দেখে রাস্তায় ডাকাতি করে বেড়াত। একদিন তৎকালীন মহান ঋষি ও জ্ঞানী আচার্য নারদ যখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঐ ডাকাত তাঁকে আক্রমণ করল। নারদ তাকে তিরস্কার করে বললেন, 'তুমি বলছ যে, তোমার পরিবারের জন্য এই সব অপরাধ করছ, কিন্তু তুমি কি মনে কর যে তোমার এই সব দস্যুবৃত্তির দরুন তুমি যে ভয়ানক পাপ করছ তারা তার অংশীদার হবে? যাও তাদের জিজ্ঞাসা করে এস।' দস্যু কখনই এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেনি, তাই এ বিষয়ে সত্য নির্ণয় করতে মনস্থ করল। নারদ যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন সেজন্য তাঁকে গাছে বেঁধে রেখে, দস্যুটি বাড়ি গেল। সে পিতা, মাতা ও স্ত্রী প্রত্যেককে বলল, কিভাবে দস্যুবৃত্তি খুন জখম করে সে জীবিকা অর্জন করে থাকে, আর জিজ্ঞাসা করল : 'তোমরা কি আমার পাপের অংশ ভোগ করতে রাজি?' কিন্তু তাদের কেউই তার পাপের ভাগ নেবার জন্য একটুও আগ্রহ দেখাল না—বরং বলল, 'আমাদের ভরণ

পোষণ করা তো তোমার কর্তব্য। তুমি কিভাবে জীবিকা অর্জন কর তা আমাদের মাথাব্যথা নয়, তোমার পাপের অংশীদারও আমরা নই।' তাদের উত্তর দস্যুকে স্তম্ভিত করে জাগিয়ে তুলল। সে উপলব্ধি করল যে তার জীবনধারার রীতি সার্থকতাহীন ও হানিকর এবং সে এক প্রবল বাসনা অনুভব করল সত্যের পথ অনুসরণের জন্য। দ্রুত ফিরে এসে সে নারদের বন্ধন মুক্ত করে তাঁকেই গুরু পদে বৃত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাল ও তাঁর আধ্যাত্মিক উপদেশ ভিক্ষা করল। কাহিনী থেকে জানা যায় সে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা করেছিল ও প্রায়ই সে এত দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় মগ্ন থাকত, যে তার চারিদিকে এক উইঢিপি গজিয়ে উঠেছিল। নারদ কয়েক বছর বাদে যখন আবার তাকে দেখতে ফিরে এলেন—তিনি দেখেন, যে এককালে দস্যুবৃত্তি ও লুট করা যার পেশা ছিল সে এক প্রবুদ্ধ আত্মায় রূপান্তরিত হয়েছে। তিনিই *রামায়ণ* মহাকাব্যের রচয়িতা বাল্মীকি, ঐ কাব্যেই ঈশ্বরাবতার রামের জীবন-কাহিনী ও কীর্তি-কলাপ বর্ণিত হয়েছে।

এর বহু শতাব্দী পরে এসিসির সন্ত ফ্রান্সিসের জন্ম। সে ছিল ঐ শহরের লঘু প্রকৃতির যুবকদের সর্দার, তার বন্ধুরা তার নাম দিয়েছিল 'হুল্লোড়বাজদের রাজা'। এক দিন সে যখন একটা ছোট গির্জায় প্রার্থনা করছিল, তখন শুনতে পেল এক দৈববাণী তাকে ঐ গির্জাটির সংস্কার করে দিতে বলছেন, এতে তার ভেতর অকস্মাৎ এক বিরাট পরিবর্তন এল। সে পবিত্রতা, প্রার্থনা ও পরের সেবায় জীবন কাটাবে স্থির করল। কিন্তু এ রকম জীবন সহজসাধ্য নয়। তার পরিবর্তনের অল্প কিছুদিন পরেই, সন্ত ফ্রান্সিস্ যখন ঈশ্বরের স্তুতি গান করতে করতে এক পাহাড়ে পথ ধরে যাচ্ছিলেন তিনি এক দল দস্যুর সামনে পড়েন। তারা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?' সন্ত ফ্রান্সিস্ বললেন যে তিনি রাজাধিরাজের একজন বার্তাবহ। দস্যুরা বিরক্ত হয়ে তাঁকে এক তুষার ভর্তি গর্তে ফেলে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু ফ্রান্সিস্ অবিচলিত ভাবে উঠে পড়ে স্বাভাবিকভাবে ঈশ্বর-স্তুতি কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চললেন। তাঁর আধ্যাত্মিক রূপান্তর যথেষ্ট গভীর হয়েছিল, তার ফলে সব রকম ঝঞ্ঝাটের সামনা-সামনি হবার শক্তি তিনি পেতেন। পরে তিনি এক মহান ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চতুর্থ শতাব্দীর মহান ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও মরমী সাধক সন্ত অগস্টিনের কথা চিন্তা কর। যৌবনে তিনি অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক ছিলেন। কিন্তু শীঘ্র নিজের ওপর বীতশ্রদ্ধ হলেন এবং পরে তাঁকে ইন্দ্রিয় লালসা কাটিয়ে অধ্যাত্মজীবন যাপনের কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। শেষে তিনি আর পেরে উঠছিলেন না। একদিন চোখের জলে ভাসিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে প্রভু, আর কতদিন? আর কতদিন? আগামী কাল, আর আগামীকাল! আজই নয় কেন? এখনই নয় কেন?' জ্ঞানালোকের

জন্য কাঁদতে কাঁদতে তিনি এক বাণী শুনলেন, 'সদ্‌গ্রন্থ নিয়ে পাঠ কর। গ্রন্থ নিয়ে পাঠ কর।' অগস্টিন তাঁর ও প্রতিবেশী বন্ধুর কাছে গিয়ে বাইবেল গ্রন্থটি খুললেন। যেখানে Act of the Apostles বা শিষ্যদের ক্রিয়া কলাপের কথা আছে সেখানটি পড়লেন ঃ 'মারামারি আর মাতলামিতে নয়, খামখেয়ালীপনা আর উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়, বিবাদে ও বিদ্বেষপরায়ণতায় নয়, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশুখ্রীস্টের শরণাগত হও, দেহের ভোগ-বাসনা তৃপ্তির জন্য কোন উপকরণ সংগ্রহ করো না।' তখনই তাঁর এক বিশাল পরিবর্তন এল। তাঁর দেহের সম্ভোগবাসনা দূর হয়ে গেল। খানা-পিনা-হুল্লোড়ের পাণ্ডা অগস্টিনের রূপান্তর হতে লাগল। সৃষ্টির পেছনে যে দিব্য জ্ঞান রয়েছে তার আভাস তিনি পেলেন। তিনি 'যা ছিলেন' তা আর সত্য রইল না, রইল কেবল 'যা হবেন' তাই, এক সত্তা—যা চিরন্তন। অনন্ত বর্তমানের কাছে অতীত মুছে গেল। অগস্টিন অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা জানালেন ঃ 'হে প্রভু তোমার সহায়ে তোমার অনুভূতি যেন আমার হয়, তোমার সহায়ে আমি যেন নিজেকে উপলব্ধি করতে পারি। কারণ তোমাকে জানলে আমি নিজেকে জানতে পারব।' পরবর্তী কালে, তাঁর ধারণাতীত এক অধ্যাত্ম-শক্তির সহায়তায় ঐ সংগ্রামী মানুষটি 'তাঁর অহংবোধের আবর্তের' বাইরে দৃষ্টিপাত করতে পেরেছিল। এই সত্য দিব্য অনুভূতিই অগস্টিনকে এক মরমী সাধকে, আধ্যাত্মিক চেতনা সম্ভূত আন্তর-সাম্য বিশিষ্ট সন্তে পরিণত করেছিল। আন্তর-সাম্যের রহস্য হলো—অন্তর্জীবনের ঈশ্বর-চেতনায় রূপান্তর, নিজ চেতনা-কেন্দ্রকে অহংবোধ থেকে ঈশ্বর-বোধে স্থানান্তর করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্য বিবেকানন্দের জীবনে চেতনা-কেন্দ্রের এরূপ স্থানান্তর কিছুটা দেখা যায়। তার অকস্মাৎ পিতৃ বিয়োগে যুবক নরেন্দ্রকে অত্যন্ত কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে কাটাতে হয়েছিল। কারণ তাদের পরিবারটি সত্যিই দুর্দশায় পড়েছিল ও চাকুরির সন্ধানে ফেরা তার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অফিসে অফিসে ঘুরেও সে বিফল হয়েছিল। যারা এক সময়ে তার বন্ধু বলে পরিচয় দিত, তারা এখন উদাসীনভাব দেখাল। অকস্মাৎ বোধ হতে লাগল জগৎ মন্দে ভরা। কোন কোন দিন এমন হয়েছে যে বাড়িতে অন্ন নেই, নরেন্দ্রের হাতেও পয়সা নেই, সে তখন মাকে বলত তার নিমন্ত্রণ আছে, অথচ সে প্রায় অনাহারে কাটাত। এই সব পরীক্ষার সময়ে তার মনে সংশয় এল। বিস্মিত হয়ে সে ভাবতে লাগল 'ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন? আর যদি তিনি থাকেন, তবে সত্যই কি তিনি আর্ত মানুষের কাতর প্রার্থনা শোনেন?'

একদিন সন্ধ্যায় শ্রান্ত অঙ্গ ও অবসন্ন মন নিয়ে যখন নরেন্দ্র কলকাতায় বাড়ি ফিরছিল, তখন সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হওয়ায় রাস্তার ধারে এক বাড়ির রোয়াকের

ওপর শুয়ে পড়ল। হঠাৎ যেন কোন দৈব শক্তিতে তার আত্মার ওপর থেকে আবরণগুলি একের পর এক সরে গেল। ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার, আর দুঃখের উপস্থিতি—এ দুই-এর সহাবস্থান সম্বন্ধে তার সমস্ত সংশয়ের মীমাংসা হয়ে গেল। গভীর অন্তঃসমীক্ষায় সে এ সবের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পেল। তার শরীরের ক্লান্তি দূর হলো, মনও অপূর্ব শক্তি ও শান্তিতে সতেজ হয়ে উঠল।[১] পরে বিবেকানন্দ বহু আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছিলেন ও মহান প্রবুদ্ধ পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

## অন্তঃপরিবর্তনের কারণ

এই সব উদাহরণগুলি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে আমাদের কল্পনাকে নাড়া দেয়, কিন্তু এই সব রূপান্তর থেকে বেশ স্বতন্ত্র, আরো সরল বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেসব ক্ষেত্রে মানুষের পশুত্ব থেকে দেবত্বে পরিণতি হয়েছে। কিভাবে হয়? পুরাতন ব্যক্তিত্ব থেকে যে নতুন ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে, মনে হয় সেটি যেন *একেবারেই* এক নতুন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত—যার সঙ্গে পূর্বতন প্রজাতির সাদৃশ্য অতি অল্পই। অবশ্য দেহগত ভাবে তাদের ভিত্তি সমান, কিন্তু অন্তরের বস্তু—চেতনা একেবারেই বদলে গেছে। এই পরিবর্তন কিভাবে হয়ে থাকে?

যোগশাস্ত্রের প্রাচীন আচার্য, পতঞ্জলির একটি সূত্রে বলা হয়েছে ঃ 'প্রাকৃতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে ক্রিয়াগুলিই প্রত্যক্ষ কারণ নয়। সেগুলি কেবল প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের বাধাগুলি ভেঙে দেয়; চাষী যখন জলনালীর বাধাগুলি সরিয়ে দেয়, তখনই তা আপন স্বাভাবিক নিম্নগতিতে নিচে নামতে থাকে। *নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।*[২] এই ভাবেই একটি প্রজাতি থেকে অপর প্রজাতির বিকাশ ঘটে থাকে। এই সূত্রের ওপর টিপ্পনী দিতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন ঃ

'যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করার ইচ্ছা করে, তখন তার আর অন্য কোন স্থান হতে জল আনবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে জল জমা রয়েছে, শুধু মধ্যে কপাটের দ্বারা ঐ জল বাধা আছে। কৃষক সেই কপাট খুলে দেয় এবং জল স্বতই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব হতে প্রত্যেকের ভিতর রয়েছে। পূর্ণতা মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ভাব; কেবল তার দ্বার রুদ্ধ আছে, প্রবাহিত হবার প্রকৃত পথ পাচ্ছে না। যদি কেউ ঐ বাধা সরিয়ে দিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শক্তি সবেগে প্রবাহিত

---

১ Eastern and Western Disciples, *The Life of Swami Vivekananda*, Kolkata, Advaita Ashrama 1974, pp. 90-94

২ পতঞ্জলি, *যোগসূত্র*, ৪.৩

হবে; তখন মানুষ তার নিজস্ব শক্তিগুলি লাভ করে থাকে। এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হলে এবং প্রকৃতির শক্তি অপ্রতিহত ভাবে ভিতরে প্রবেশ করলে আমরা যাদের দুষ্ট বলি, তারা সাধু হয়ে যায়। স্বভাব বা প্রকৃতিই আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কালে এই প্রকৃতি সকলকেই সেই অবস্থায় নিয়ে যাবে। ধার্মিক হবার জন্য যা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তা কেবল নিষেধমুখ কার্যমাত্র—কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করে দেওয়া, জন্মগত অধিকারস্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলে দেওয়া—পূর্ণতাই আমাদের প্রকৃত স্বভাব।

'প্রাচীন যোগীদের পরিণামবাদ আধুনিক গবেষণার আলোকে আরও সহজে ও ভালভাবে বুঝতে পারা যাবে এবং যোগীদের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা থেকে অনেক ভাল। আধুনিকেরা বলে, পরিণামের দুইটি কারণ—যৌন-নির্বাচন (Sexual selection) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন (Survival of the fittest)। ... কিন্তু এই দুইটি কারণ পর্যাপ্ত বলে বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এতদূর উন্নত হলো যে, শরীর ধারণ ও সঙ্গী নির্বাচন করার প্রতিযোগিতা উঠে গেল। তা হলে আধুনিকদের মতে মানুষের উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হবে এবং জাতির মৃত্যু হবে। আর এই মতবাদের ফলে প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের বিবেকের ভর্ৎসনা হতে অব্যাহতি পাবার একটি যুক্তি লাভ করে। আর এমন লোকেরও অভাব নাই, যাঁরা নিজেদের দার্শনিক বলে পরিচয় দেন এবং যত দুষ্ট ও অনুপযুক্ত লোকদের মেরে ফেলতে চান (তাঁরাই যেন মানুষের যোগ্যতা-অযোগ্যতার একমাত্র বিচারক)—এইভাবে তাঁরা মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করবেন! কিন্তু সেই মহান প্রাচীন পরিণামবাদী পতঞ্জলি ঘোষণা করেছেন ঃ ক্রমবিকাশ বা পরিণামের প্রকৃত রহস্য—প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে পূর্ণতা অন্তর্নিহিত রয়েছে তারই বিকাশ মাত্র; ঐ পূর্ণতা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং বাধার ওপারে অনন্ত তরঙ্গস্রোত নিজেকে প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করছে। এই সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের অজ্ঞানের ফলমাত্র। এই দ্বার কি করে খুলে দিতে হয় ও জলকে কি করে ভিতরে আনতে হয়, তা জানি না বলেই এরূপ হয়ে থাকে। বাঁধের বাইরে যে অনন্ত তরঙ্গ-স্রোত রয়েছে, তা নিজেকে প্রকাশ করবেই করবে; এটাই সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ; কেবল জীবনধারণের অথবা ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্য প্রতিযোগিতা অজ্ঞানজাত ক্ষণিক অনাবশ্যক বাহ্য ব্যাপার মাত্র। সকল প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে গেলেও যতদিন পর্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন আমাদের এই অন্তর্নিহিত পূর্ণস্বভাব আমাদেরকে ক্রমশ অগ্রসর করে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। অতএব প্রতিযোগিতা যে উন্নতির জন্য আবশ্যক, এটা বিশ্বাস করার কোন যুক্তি নেই। পশুর ভিতর *মানুষ* চাপা রয়েছে। যেমন দ্বার উন্মুক্ত হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়, অমনি সবেগে *মানুষ* বহির্গত হয়;

এইরূপে মানুষের ভিতরও দেবতা অন্তর্নিহিত রয়েছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গলে ও শৃঙ্খলে তিনি বন্দী হয়ে আছেন। যখন জ্ঞান এই অর্গলগুলি ভেঙে ফেলে, তখনই সেই দেবতা প্রকাশিত হন।"[৩]

এখানে 'ঈশ্বর' হলেন আমাদের আধ্যাত্মিক অন্তরাত্মা, যিনি অজ্ঞানের শেষ বাধাগুলিকে ভাঙতে আমাদের সহায়তা করেন, যাতে চৈতন্য-সত্তা তাঁর পূর্ণ মহিমায় বিভাসিত হয়ে উঠতে পারেন।

## অজ্ঞান, পরিবর্তনের প্রধান বাধা

অজ্ঞানের বাধাটি কি? মনস্তত্ত্ব আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমাদের অচেতন অবস্থার গভীরে যেসব সূক্ষ্ম প্রভাব, প্রবণতা, বাসনা ও ভোগেচ্ছাগুলি সুপ্ত থাকে, তারা আমাদের চেতন জীবনে—ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করে। তারা সূক্ষ্ম শরীরে—মননশীল আবেগপ্রবণ শরীরে অবস্থান করে স্থূল ভৌতিক শরীরের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করে থাকে। অবচেতন অবস্থার নিয়ন্ত্রণের অর্থ হলো সূক্ষ্ম আবেগপ্রবণ শক্তি, বাসনা ও ভোগেচ্ছাগুলিকে নিম্নস্তরে প্রকাশ পেতে না দেওয়া। সেগুলিকে উচ্চস্তরে প্রকাশ পেতে হবে—পবিত্র হতে হবে, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে সমর্পিত হতে হবে, আর ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত হতে হবে।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে, সমস্ত সূক্ষ্ম প্রবণতা ও প্রভাবকে আধ্যাত্মিকতার দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। অভ্যাস ও প্রবণতাগুলিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে একেবারে তাদের মূল থেকে, তাদের বিশ্লেষণ করে কারণ অবস্থায় পৌঁছে সেখান থেকে আবার জ্ঞানাতীত অবস্থায় উত্তরণ করতে হবে।

আসক্তি ও বিরাগ আসে অহংবোধ থেকে, অহংবোধ অজ্ঞানের অবদান। একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভে বা আমাদের অন্তর্নিহিত পরম-চৈতন্যের উপলব্ধি হলেই সমস্ত বাসনাবীজ দগ্ধ হতে পারে, তখনই আত্মা তার মৌলিক শুদ্ধ, মুক্ত ও শান্ত স্বভাবে ফিরে আসতে পারে। একটি অপ্রচলিত উপনিষদে বলা হয়েছে : 'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ'—একমাত্র মনই মানুষের বন্ধনের ও মোক্ষের কারণ।[৪] মনের স্থূল বস্তুতে আসক্তির ফলই বন্ধন। মন যখন এসব আসক্তি থেকে মুক্ত হয়, তখনই আত্মা ফিরে পায় মুক্তি—যা আমাদের সকলের জন্মগত অধিকার।

আমাদের সমস্ত প্রেরণা, বাসনা ও ভোগেচ্ছার পেছনে রয়েছে আত্মার চিরন্তন অস্তিত্ব, পূর্ণজ্ঞান ও অমৃতোপম আনন্দ লাভের বাসনা। এ বাসনা পূর্ণ হবে শ্রেষ্ঠ

---

৩ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ১ম সং, ১খণ্ড, পৃঃ ৩১৬-১৭

৪ *অমৃতবিন্দু উপনিষদ্*, ২

আধ্যাত্মিক অনুভূতি *সৎ-চিদ্-আনন্দ* বা অস্তিত্ব-চৈতন্য-চরম আনন্দের অনুভূতি-লাভের পর, যে অনুভূতি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে রয়েছে আমাদের ব্যষ্টি চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করে ও তার অন্তরে নিহিত হয়ে। আমাদের অজ্ঞতা ও অহংতা-ই ভুলিয়ে দেয় আমাদের স্বাভাবিক অধ্যাত্ম-প্রকৃতিকে। আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের মুক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব। এই হলো অধ্যাত্ম জীবনের উন্মুক্ত রহস্য।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, অসঙ্গত চিন্তা ও আবেগ আমাদের দেহ-মনকে প্রভাবিত করে। বহু সত্যানুসন্ধিৎসু চিকিৎসক ও মনস্তাত্ত্বিক এই তথ্যই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে, অজ্ঞতার দরুন আমরা যেসব অসঙ্গত ধারণা ও আবেগ পোষণ করে থাকি—সেগুলি বহু শারীরিক ও মানসিক রোগের কারণ, যারা বহুলাংশেই প্রতিষেধযোগ্য। স্যার উইলিয়াম অস্টার (Sir William Oster)-এর মতো বিজ্ঞ চিকিৎসক মন্তব্য করেছিলেন—যক্ষ্মা রোগীর ভাগ্য তার বক্ষগত লক্ষণের চেয়ে মনোগত লক্ষণের ওপরেই বেশি নির্ভর করে। আমাদের বাহ্য ক্রিয়ার চেয়ে আমাদের চিন্তা ও আবেগের প্রকৃতির ওপরেই আমাদের অবস্থা বেশি নির্ভর করে।

## প্রত্যেক মানুষেই পরিবর্তন আসতে পারে

সংসারী লোকও পরিবর্তিত হতে পারে যদি সে সংসারিত্ব ও মনের সব জটিলতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে; অন্যথায় কখনই নয়। সামান্য একটু ধর্মভাব থাকলেই হলো না। নোঙর ফেলা নৌকা নড়ে না। আমাদের জটিল স্বভাবগুলিই আমাদের সংসার জীবনে বেঁধে রাখে। আমাদের প্রথম কাজ হবে ঐ নোঙর (বন্ধন)-গুলিকে তুলে ফেলা। আমাদের জটিলতাগুলিকে আমরা যেন অবশ্যই ভেঙ্গে ফেলি, সে ব্যবস্থা যত কষ্টদায়ক হোক। তারপর আমাদের জীবন-নৌকাটিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যে সময় নষ্ট হয়ে গেছে তা পূরণের জন্য। আমাদের সংস্কারগুলির মূল গভীরে চলে গেছে, তাকে উপড়ে ফেলতে না পারলে, আমরা অধ্যাত্ম জীবন আশা করতে পারি না। আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধির পূর্বেই নৈতিক শুদ্ধির প্রয়োজন।

বহু অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে, অন্তর্দ্বন্দ্ব, চাপা ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা, ভয় ও অন্যান্য বিপরীত আবেগ থেকে আমাদের ঘাড়ে ব্যথা, পাকস্থলীতে ক্ষত, রক্তে-শর্করা, হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ ও স্নায়বিক রোগ নামে অন্যান্য নানা ধরনের পীড়া দেখা দেয়। তাঁরা আরো বলেন কিভাবে আবেগের উদ্গতি ঘটিয়ে স্নায়বিক রোগ প্রবণতায় পরিবর্তন এনে রোগীর বাহ্যিক জীবনকে বদলে ফেলা যায়। এমন সব অদ্ভুত রোগও আছে, যে ক্ষেত্রে রোগী বহু বছর ধরে পঙ্গু হয়ে থাকার পরও স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে—নিজের সম্বন্ধে ভাবতে, জীবন-সমস্যার সামনা-সামনি হয়ে

নিজেকে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বিন্যাস করে নিতে শেখার ফলে। আমরা খুবই উৎসাহ পাই যখন একজন আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদকে স্পষ্ট বলতে শুনি ঃ 'মানব-ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। কেবল শিশুরাই যে নমনীয় তা নয়। আমাদের যাবজ্জীবন সকলেরই পরিবর্তনের সামর্থ্য থাকে, এমনকি মৌলিক চালচলনের ক্ষেত্রেও।'

ভারতে বলা হয়ে থাকে ঃ 'মানুষের যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।' যারা আন্তরিকভাবে নিজ উন্নতি চায় তাদের প্রত্যেকেরই আশা আছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেককেই আশার বাণী শোনাচ্ছেন ঃ

**অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।**
**সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥**[৫]

—যদি তুমি সকল পাপীর থেকেও বেশি পাপী হও, তথাপি এই আত্ম-জ্ঞানের পোত আশ্রয় করে সমস্ত পাপ ও সমস্ত অশুভের সাগর পার হতে পার।

আত্মজ্ঞান জ্বলন্ত আগুনের মতো সমস্ত অশুভকে দগ্ধ করে আর চৈতন্যের মহিমা প্রকাশ করে, এই চৈতন্য আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃহৃদয়েই বাস করেন, সে কথা আমরা জানি বা না জানি।

বহু বিস্তৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা থেকে হিন্দু ঋষিরা যুগ যুগ ধরে বলে আসছেন যে, অধ্যাত্ম চেতনার পরিবর্তন করে আমরা আমাদের চিন্তায় ও আবেগে প্রভূত পরিবর্তন আনতে পারি এবং শরীরেও। কেবল অশুদ্ধ মন ও অশুদ্ধ সূক্ষ্ম শরীর নয়, পশু-মানবের অশুদ্ধ স্থূল শরীরও দেব-মানবের শুদ্ধ সূক্ষ্ম শরীর ও শুদ্ধ স্থূল শরীরে রূপান্তরিত হতে পারে। দেব-মানবের শরীর শুদ্ধ উপাদানে গঠিত, ভিন্ন ভাবে সংগঠিত ও অধ্যাত্মমুখী পথে চালিত—ফলে ঐ শরীরে সে কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এক ইস্পাতের তৈরি তরবারির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন; ঐ তরবারি পরশ-পাথরের স্পর্শে সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিল।[৬] ঐ তরবারির আকার পরিবর্তিত হয়নি, কিন্তু সোনার তরবারি দিয়ে তো ক্ষতি সাধন সম্ভব নয়। তরবারির গুণ যেমন পরিবর্তিত হয়, ঠিক তেমনি আমাদের শরীর ও মনের গুণও পরিবর্তিত হয়। যোগ-সাধনায় আমরা ঐ রকমটাই লক্ষ্য করি।

## মানবিক অভ্যাস ও প্রবণতা

আমাদের সূক্ষ্ম অভ্যাস ও সূক্ষ্ম প্রবণতা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব আছে, অধ্যাত্ম

---

৫ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ৪/৩৬

৬ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১২২, ৪১৫, ৪৫৫

জীবনে এ দুটিকে জয় করতে, রূপান্তরিত করতে, অতিক্রম করতে হবে। ভগবদ্-গীতায় তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণানুযায়ী তিন ধরনের মানুষের কথা বলা হয়েছে। পশু-মানবে তমোগুণের প্রাধান্য, তার লক্ষণ হলো অন্ধকার ও অজ্ঞান, অসাবধানতা ও ভ্রান্তি। রজোগুণীর লক্ষণ হলো কামনা ও চঞ্চলতা, সাধারণ মানুষে যা প্রাধান্য পায়, সঙ্গে থাকে আনুষঙ্গিক দ্বেষ ও দুঃখ। আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মানুষে সত্ত্বগুণই প্রাধান্য পায় ও তার লক্ষণ হলো—জ্ঞান ও সাম্য।[৭]

তমোগুণী মানুষের খাদ্য অশুদ্ধ।[৮] কর্মী হিসাবে সে অস্থির, দাম্ভিক, প্রতারণাপরায়ণ, হতাশাপ্রবণ ও দীর্ঘসূত্রী।[৯] সে সমস্ত কাজের ভার নেয় ভ্রান্তিবশত, পরিণামের কথা চিন্তা না করে।[১০] যদি সে দান করে তবে তা করে অযোগ্য পাত্রে, অশুচি স্থানে বা অশুভ সময়ে।[১১] যদি সে পূজানুষ্ঠান করে, তবে তা করে থাকে শ্রদ্ধাহীন ভাবে ও বিনা অন্নদানে।[১২] সে অযৌক্তিক ধর্ম বিশ্বাসে ভ্রান্ত হয়ে পড়ে ও অপরের অনিষ্ট সাধনের জন্য আপনি বহু কষ্ট স্বীকার করে কৃচ্ছ্রসাধন করে।[১৩]

রজোগুণ বা আবেগপূর্ণ কর্মচাঞ্চল্য যে লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে উত্তেজনাদায়ক—তেতো, টক্, ঝাল ও ঝাঁঝাল খাবার পছন্দ করে।[১৪] সে নিজ কাজে ও স্বার্থজড়িত কাজে অথবা হয়তো অন্য লোকের প্রতি ও তাদের স্বার্থে অতি আসক্ত হয়। সে কর্মফলের বিষয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়, আর তার সব কাজ বাসনা ও দম্ভ চরিতার্থ করার জন্যই হয়ে থাকে। সে লোভী, হিংসাশ্রয়ী, সহজেই হর্ষিত বা বিমর্ষ হয়, ভয় আর উদ্বেগে পীড়িত হয়।[১৫] সে দান করে অসন্তুষ্ট চিত্তে তাও প্রত্যুপকারের আশায়, ফললাভের উদ্দেশ্যে।[১৬] পূজাদির অনুষ্ঠানও সে করে থাকে ফল লাভ ও লোককে দেখানোর উদ্দেশ্যে।[১৭] যদি সে কঠোর তপস্যা করে, তাও সম্ভবত মান ও ক্ষমতা লাভের জন্য, আর একাজও সে করে থাকে লোকদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।[১৮]

সত্ত্বগুণ ও সাম্যভাব যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার আহার হবে শক্তি, স্বাস্থ্য, আয়ুবর্ধনকারী, শুদ্ধ ও পুষ্টিকর।[১৯] সে কাজ করে আসক্তি ও অহং শূন্য হয়ে, ধৈর্য ও উদ্যমের সঙ্গে, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে প্রভাবিত না হয়ে।[২০] সে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে কাজ করে চলে, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে, পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা বা ফল সম্বন্ধে উদ্বেগবর্জিত হয়ে।[২১] সে দান করে সমবেদনা সহ, প্রতিদানে অসমর্থ লোকেদের

---

৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪/১১-১৩ ৮ তদেব, ১৭/১০ ৯ তদেব, ১৮/২৮
১০ তদেব, ১৮/২৫ ১১ তদেব, ১৭/২২ ১২ তদেব, ১৭/১৩
১৩ তদেব, ১৭/১৯ ১৪ তদেব, ১৭/৯ ১৫ তদেব, ১৮/২৭
১৬ তদেব, ১৭/২১ ১৭ তদেব, ১৭/১২ ১৮ তদেব, ১৭/১৮
১৯ তদেব, ১৭/৮ ২০ তদেব, ১৮/২৬ ২১ তদেব, ১৮/২৩

ঠিক জায়গায়—ঠিক সময়ে।[২২] সে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ও কেবল আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিবিধ তপশ্চর্যা করে থাকে। শুচিতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা শারীর তপস্যার অঙ্গ। উদ্বেগের কারণ হয় না অথচ সত্য ও হিত সাধন হয় এমন বাক্য ব্যবহার এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন হলো বাঙ্ময় তপস্যা। সে প্রায়শ মৌন থাকে, কারণ তার মন অধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন; শান্তভাবের সঙ্গে এই রকম বাক্-সংযম অভ্যাস, আত্ম-সংযম ও অন্তরের পবিত্রতাকে মানস তপস্যা বলা হয়।[২৩]

আমাদের প্রবণতা ও সহজ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা ধরনের চিন্তা রয়েছে। আচরণ-বিধি-বিদরা মনে করেন এ বিষয়ে পরিবেশের অবদানই সব থেকে বেশি। এ দিকে অন্তর-দর্শন-বিদদের বিশ্বাস সহজ-প্রবৃত্তি হলো জীবের জন্মগত স্বাভাবিক উত্তেজনা বা প্রেরণা, আমরা কেবল পরিবেশজাত বস্তু বা বহিরুত্তেজনার প্রতিক্রিয়াজাত প্রাণী নয়। জীবের নিজস্ব এক ক্রমোন্নতিসূচক প্রেরণা রয়েছে জৈব শক্তিতে পরিবর্তন ঘটাবার। কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ ও মনস্তত্ত্ববিদ শৈশব অবস্থা থেকেই মানুষের মধ্যে এই প্রেরণার অস্তিত্বের চিহ্ন লক্ষ্য করেছেন, এমনকি তাঁরা বলে থাকেন এগুলির উৎপত্তি আমাদের পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষ থেকে।

পাশ্চাত্যের কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে সূক্ষ্ম সত্তা সকল নিজ নিজ প্রবণতা, বাসনা ও কামনা নিয়ে মনুষ্য শরীরে জন্মগ্রহণ করে। মহান ক্রমবিকাশবাদী ও ডারউইনের সমর্থক টমাস হ্যাক্সলি মনে করেন প্রতিটি সংবেদনশীল জীবই তার কৃত কর্মের ফল ভোগ করে, তা যদি এ জীবনে কৃত না হয় তবে বর্তমান পর্যায়ের পূর্ববর্তী পরপর অসংখ্য জন্মের কোন না কোনটিতে করা হয়ে থাকতে পারে। তাঁর মত ছিল ক্রমবিকাশবাদের মতোই, বাস্তব জগতেই পুনর্জন্মবাদের মূল রয়েছে। আমরা কতকগুলি জৈবিক প্রবণতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করি, জীব সেইজন্যই বাহ্য উত্তেজনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে বলেছেন, ঠিক যেমন দেহধারী আত্মা কৌমার, যৌবন ও বার্ধক্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেন, তেমনিই পরবর্তী অন্য দেহের ভেতর দিয়েও যান।[২৪] ঠিক যেমন লোকে জীর্ণ কাপড়-জামা ফেলে দিয়ে নতুন কাপড়-জামা পরে থাকে, তেমনিই অন্তর্যামী আত্মা জীর্ণ দেহ ফেলে দিয়ে নতুন দেহে প্রবেশ করেন।[২৫] কিন্তু আমরা অভ্যাস ও প্রবণতাগুলি সঙ্গে নিয়ে যাই। আমাদের অভ্যাস ও প্রবণতার মূল খুঁজতে খুঁজতে আমরা যে পূর্বপুরুষদের কাছে এসে পড়ি, তাঁরা আমাদেরই সত্তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের

---

২২ তদেব, ১৭/২০ ২৩ তদেব, ১৭/১৪-১৭
২৪ তদেব, ২/১৩ ২৫ তদেব, ২/২২

সব অমঙ্গলের জন্য পূর্বপুরুষদের ওপর দোষ না চাপিয়ে, আমরা যেন আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য নিজেদেরই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করে নিজেদের মধ্যে সুষ্ঠু পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হই। এই দৃষ্টিভঙ্গিটিই সব থেকে বেশি কার্যকর।

## আমাদের অন্তরস্থ দেবতা ও অসুর

আমাদের নিজ নিজ অন্তঃপ্রকৃতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী উপাদান রয়েছে। দেবতা বা অসুর দেখতে আমাদের বাইরে যেতে হবে না। তারা সব আমাদের ভেতরেই বাস করে। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা যেমন অধ্যাত্ম তত্ত্ববিদ ছিলেন, তেমনি মনস্তত্ত্ববিদও ছিলেন এবং তাঁরা এ তত্ত্ব উপনিষদের বহু আখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। যেমন *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* আমরা পাই দেবতা, মানুষ ও অসুর—সকলেই আদি স্রষ্টা প্রজাপতির সন্তান হয়ে—তাঁর কাছেই উপদেশ প্রার্থনা করল। তাদের প্রত্যেকের কাছেই তাঁর উপদেশ হলো একটি মাত্র পদ—*দ।* দেবতারা বুঝল এর অর্থ *দাম্যত* বা 'তোমার ইন্দ্রিয়-মন সংযত কর।' মানুষরা বুঝল এর অর্থ, *দত্ত* বা 'তোমার লোভ সংবরণ কর ও দান কর', আর অসুররা বুঝল এর অর্থ 'দয়ধ্বম্' বা 'তোমার নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে সংযত কর, আর দয়া ও করুণাপরায়ণ হও।'

মহান মরমী সাধক ও অদ্বৈতবাদী দার্শনিক শঙ্কর এই আখ্যানের ভাষ্যে বলেছেন ঃ মানুষ ছাড়া কোন দেবতা বা অসুর নেই। একই মানব জাতি তার আত্ম-সংযম, দয়া-পরায়ণতা ও করুণা-পরায়ণতার তারতম্য অনুযায়ী এবং তার প্রকৃতিতে *সত্ত্ব* (সাম্য), *রজঃ* (ক্রিয়াশীলতা) বা *তমঃ* (জড়ত্ব) গুণের প্রবণতার প্রাবল্য অনুযায়ী দেবতা, মানুষ ও অসুর নামে চিহ্নিত হয়, তাই উপদেশ একই হলেও নিজ নিজ স্বভাবের আধিপত্য অনুযায়ী শ্রোতাদের অর্থবোধ হয়েছিল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। মানুষের মধ্যে যাদের আত্ম-সংযমের অভাব, অথচ সদগুণ রয়েছে তারাই দেবতা; যাদের অত্যন্ত লোভ তারা সাধারণ মানুষ; আর যারা নিষ্ঠুর অন্যদের আঘাত করে আনন্দ পায় তারাই অসুর। যে তিনটি শিক্ষার কথা বলা হয়েছে মানুষকে তার সবকটিই অভ্যাস করতে হবে, কারণ দেবতা, মানুষ ও অসুর সব-কটিই আমাদের মানব প্রবৃত্তির মধ্যে বাস করে, আর সাম্যভাবের, সৎ-কর্ম সম্পাদনের ও লোভ-নিষ্ঠুরতা দমনের মাত্রা অনুযায়ী আমাদের দেবতা, মানুষ বা অসুর আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।[২৬]

উপনিষদের এক সুপরিচিত অংশে সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট দুটি পাখির কথা আছে,

---

২৬ বৃহঃ উপ ঃ ৫.২.১-৩ এবং সংশ্লিষ্ট শাঙ্কর-ভাষ্য

তারা সখারূপে নিবিড়ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও একই গাছে বাস করে। একটি পাখি অজ্ঞতার জন্য ভ্রান্ত হয়ে গাছের ফল আস্বাদ করছে, অন্যটি স্থির ও শান্ত হয়ে গাছের আগডালে বসে থাকে। ফলভোজী নিচের পাখিটি *রজোগুণের* প্রেরণায় মানবিক বাসনা তৃপ্তির প্রতীক। ওপরের পাখিটি *সত্ত্বগুণে* প্রভাবিত হয়ে নিচের ডালে যেসব ফল হয়েছে তা আস্বাদ করার জন্য কোন আগ্রহ দেখায় না। যে পাখিটি চট্‌পট্‌ ফল খেয়ে চলেছে, আর তাতেও কোন সময়ে সন্তোষ পাচ্ছে না—সে মাঝে মাঝে ওপরের পাখিটির দিকে তাকিয়ে দেখে, সেটি শান্ত আর যে কোন মুহূর্তে উড়ে যাবার জন্য তৈরি। ওপরের বন্ধুটির জন্য তার গভীর ভালবাসায় সে তার কাছে যেতে চায় ও ধাপে ধাপে ওপরে ওঠে, আর একটি ফল দেখে থেমে যায়। অবশ্য শেষকালে ওপরে ওঠার বাধাস্বরূপ তার সব বাসনা যখন ছুটে গেল, আর সে ওপরের পাখিটির কাছে পৌছল, তখন সে দেখল যে তারা দুটি বাস্তবে একই পাখি।[২৭] সে তখন বোঝে যে অজ্ঞানের প্রভাবেই সে জাগতিক বাসনার ভোগেচ্ছা জাগানো শক্তি-বিশিষ্ট রজোগুণের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভেবেছে। এই অভিন্ন ভাবনায় ছেদ পড়ে যখন তার নিজ সত্য অপরিবর্তনীয় আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে সে উপলব্ধি করে, তখনই তার পশু প্রকৃতি রূপান্তরিত ও অতিক্রান্ত হয়।

## জীবাত্মার মুখোশ

অজ্ঞান বিপজ্জনক কারণ তা চৈতন্যকে ভুলিয়ে দেয়। আর এই অজ্ঞানের জন্যই চৈতন্য একটি মুখোশ পরে থাকে, তার নাম 'ব্যক্তিত্ব'। ('ব্যক্তি' মানেই মুখোশ) আমরা একের পর এক এত মুখোশ পরি, যে আমরা বলতে পারি না আমাদের প্রকৃত সত্তা কি! বাংলার মহান নট-নাট্যকার গিরিশ বলতেন, 'কখনো কখনো নটীদের সাজিয়ে দেওয়ার পর তারা যে কে কি, তা আর চিনতে পারতাম না।' সেই রকম চৈতন্য একটি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে, তার ওপর একটি স্থূল শরীর, তারও ওপর নানা রকমের জামা পরে, শেষে তার প্রকৃত সত্তাটিকে আর চেনা যায় না। আর ঠিক যেমন কখনো কখনো আমরা নিজ প্রকৃত সত্তাকে চিনতে পারি না, তেমনি অপরকেও চিনতে পারি না। অজ্ঞানের মুখোশটিকে ধ্বংস করে না ফেললে, মুখোশের ভেতর দিয়ে দেখতে না শিখলে, আমরা কখনই অন্তরস্থ চৈতন্যকে খুঁজে পাব না। মুখোশের সঙ্গে আমাদের এই মিথ্যা আত্মাভিমানই আমাদের যত দুঃখের, যত বন্ধনের কারণ। এ দুঃখ ভোগের তখনই অবসান হবে, যখন জীবাত্মা উপলব্ধি করবে তার আধ্যাত্মিক স্বরূপকে, পরমাত্মার সঙ্গে তার একাত্মকে, প্রিয় সখার জন্য সদা অপেক্ষমাণ গাছের মগডালে বসা পাখিটির সঙ্গে নিচের পাখির একাত্মকে।

---

২৭ মুণ্ডক উপ: ৩/১/১-৩; শ্বেতাশ্বতর উপ: ৪/৬/৭

বেদান্ত মতে, জীবাত্মার সূক্ষ্ম আবরণ গঠিত হয় মন ও ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়ে, আর আমাদের ভৌত শরীর হলো স্থূল আবরণ। দুটি আবরণকেই এমন শুদ্ধ হতে হবে যাতে সেগুলি পূর্বাধিষ্ঠিত চৈতন্যের আলোক প্রতিফলিত করতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই সমস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম নিষ্ঠা পালন।

মন, শরীর ও আত্মা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। দেহ-মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে। মনস্তাত্ত্বিকরা ব্যষ্টিমানবকে মনযুক্ত দেহ বা দেহযুক্ত মন বলে মনে করে না, বরং দেহ-মনের সংহতি বলে মনে করেন।[২৮] তাদের মধ্যে একজন বলেছেন ঃ 'মন ও দেহ এক এবং অবিভাজ্য। তোমার মনই তোমার দেহ, আবার তোমার দেহই তোমার মন।' অনেকে মনকে দেহের অনেক ওপরে স্থান দেয় ঃ 'মন জড় বস্তু নয়, একে দেখা যায় না, স্পর্শ করা বা মাপ-জোখ করা বা ওজন করা যায় না, তুমি যদি ইচ্ছা কর, একে কোন আধ্যাত্মিক বস্তু বলতে পার।'[২৯] এটি দেহ-মন সংহতি তত্ত্বের এক ধাপ ওপরে। ডঃ জঙ্ (Dr. Jung) আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, 'পূর্ণত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং মানবজাতি ও চৈতন্যের সহিত সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে বলেই অহংত্ব রোগগ্রস্ত।'[৩০] তাঁর 'The Modern Man in Search of a soul' বই থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি সম্ভবত ধরতে পারেননি যে, শুদ্ধ চৈতন্য নিজের সূক্ষ্ম আবরণ ও যন্ত্রস্বরূপ মন থেকে পৃথক। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব এখনো তার শৈশবাবস্থায়, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তা প্রকৃত মানবাত্মার সন্ধান করে উঠতে পারবে, এমন আশা করা যায় না।

হিন্দু ঋষিরা মানবের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান পাবার জন্য মানব চৈতন্যের বিভিন্ন অবস্থাগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন। বেদান্তে শুদ্ধ চৈতন্যই যার যথার্থস্বরূপ সেই মানবের তিনটি শরীরের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি হলো কারণ শরীর অচেতন অহংত্ব, যার মধ্যে সব রকম বৈচিত্র্য সুপ্ত থাকে, যেমন সুযুপ্তি কালে হয়ে থাকে। তারপর আসে সূক্ষ্ম শরীর, যা হলো আত্ম-সচেতন অহংত্ব, মন, সূক্ষ্ম সংস্কার, সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম বীজের একটি সংহতি—যেগুলি, গভীর নিদ্রাকালে প্রকাশ পায়। কিন্তু আমাদের তথাকথিত জাগ্রত অবস্থাটি—ভৌত ক্রিয়াশীলতার তৃতীয় অবস্থাটি—প্রায়শ স্বপ্ন অবস্থার থেকে সামান্য উন্নত। ভৌত চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি—দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি দৈনন্দিন ভৌত জীবনের ক্রিয়া শক্তিরূপে প্রকাশশীল সূক্ষ্ম তেজের যন্ত্রমাত্র। ভৌত ইন্দ্রিয় যন্ত্রসমন্বিত স্থূল শরীরটি—সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠান এবং তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

---

২৮ E.A. Strecker and K.E. Appel. *Discovering Ourselves*'. N.Y : Mac Millan & Co. 1954. p. 19

২৯ Ibid., p.9

৩০ Dr. Carl. G. Jung. *Modern Man in Search of a soul* [London, Routledge and Kegan Paul. 1953. p. 141]

## চারিত্রিক রূপান্তর—আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা

তুমি কি এমন সব লোক দেখেছ যারা বলে বেড়ায় যে তারা মুক্তি পেয়েছে, আর তারা তাদের মুক্তি লাভের পথে অন্যদেরও জোর করে নিয়ে আসতে উদগ্রীব? তারা নিজেরা মুক্তিলাভের উপায় শেখার আগেই, অন্যদের মুক্ত করতে চায়। মিথ্যা ধর্মান্তকরণের একটি গল্প আছে। একটি ছোট মেয়ে রবিবার সকালে মুদির দোকানের সামনের দরজায় টোকা দিচ্ছিল। মুদির মেয়ে, তার বান্ধবী, তেতলার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বলল, 'বন্ধু, আমরা সবাই তাঁবুর মধ্যে অনুষ্ঠিত ধর্ম সভায় গিয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছি। তুমি যদি রবিবার (সাবাথের দিন) দুধ নিতে চাও তবে তোমাকে ঘুরে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আসতে হবে।' আগে দোকান রবিবারেও খোলা থাকত, কিন্তু এখন থেকে, সামনের দরজা বন্ধ থাকবে, ব্যবসা যথারীতি চলবে পেছনের দরজা দিয়ে। আমরা অনেকেই এই রকম করে থাকি। এই রকম 'ধর্মান্তরিত' হওয়া পূর্ব জীবন থেকে নিকৃষ্টতর। প্রকৃত পরিবর্তন চাই। উৎকৃষ্টতর কোন জীবনের জন্যই আমাদের পরিবর্তন হওয়া উচিত। কপট জীবন পরিত্যাগ করে, আমাদের উচিত নিষ্ঠার সঙ্গে নীতির পথে চলে আমাদের *তমঃ* ও *রজঃ* প্রকৃতিকে, অজ্ঞান ও বিক্ষেপ শক্তিকে, জয় করতে হবে—*সত্ত্ব* ও সাম্য ভাবের সাহায্যে, যা জীবাত্মাকে আধ্যাত্মিক পথে ধরে রাখে।

এ শিক্ষা আমরা পেয়েছিলাম মহান শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের পদতলে বসে। তাঁরা জানিয়েছিলেন প্রভুর নরদেহে অবস্থান কালে কোন কোন ভক্তের কি ঘটেছিল। বহু অধ্যাত্মসাধক তাঁর কাছে জড় হতো, বিশেষভাবে তাঁর জীবনের শেষের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের শীর্ষস্থানীয় স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর গুরুভাইদের কেউ কেউ প্রভুর দৈব শক্তির অলৌকিক প্রকাশ কখন হবে সে জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে ; ঐ প্রকাশের ফলে তাদের মধ্যে সব সময়ে উচ্চ আধ্যাত্মিক মনোভাব সঞ্চারিত হতো। তাদের কারও কারও মধ্যে অশ্রু ও গভীর ভাবাবেগসহ আংশিক সমাধিগোছের অবস্থা দেখা যেতে লাগল। স্বামীজী এক সময়ে ঠাকুরের কাছে অনুযোগ করেন, যে তাঁর কখনো ঐ অবস্থার অভিজ্ঞতা হয় না। ঠাকুর তাঁকে বলেন, ভাসা ভাসা আবেগ ও দর্শন তো সামান্য জিনিস, এর তুলনায় অনেক বড় জিনিস হলো, মনের ও হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করা—যা উচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, শেষে মানব প্রকৃতির আমূল রূপান্তর ঘটে। 'বৎস, ব্যস্ত হয়ো না। যখন একটি প্রকাণ্ড হাতি ডোবায় নামে, জল তোলপাড় হয়ে যায়, কিন্তু যখন সেটি গঙ্গার জলে নামে, তোলপাড় টেরই পাওয়া যায় না। এই সব ভক্ত ছোট ডোবার মতো, কিন্তু তুই তো গঙ্গা নদীর মতো।'[৩১]

---

৩১ স্বামী সারদানন্দ *Sri Ramakrishna the Great Master*, Madras, R.K. Math, 1970 pp 864-72

প্রভুর উপদেশ অনুযায়ী স্বামী বিবেকানন্দ যুব ভক্তদের বললেন ভাবের নির্ঝর যদি অনুরূপ চারিত্রিক রূপান্তর ও পবিত্রতাকে যথেষ্ট দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে সাংসারিক ভোগলিপ্সার নাশ ঘটিয়ে অধ্যাত্ম চেতনা জাগিয়ে তুলতে না পারে, তবে অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে ঐ ভাবাবেগের কোন প্রকৃত মূল্য নেই। অনেক লোক আছে, যারা অধ্যাত্ম জীবনের কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা পালনে অনীহা হেতু কেবল লোক দেখানো সাধক হয় ও ভণ্ডামি করে। কেউ কেউ তাদের নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা বজায় রাখতে ও পবিত্রতা লাভে যত্ন করে না, ফলে তারা নিজেদের গভীর আবেগের স্রোত বহনের খাত হয়ে পড়তে পারে অথচ সেই স্রোতের বেগ সহ্য করতে পারে না এবং এইভাবে মানসিক সাম্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যারা আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ পথ অনুসরণ করে—জীবনের কর্তব্যকর্মগুলিকে উপাসনা জ্ঞানে করে চলে ও আন্তরশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক নিয়মনিষ্ঠাগুলি পালন করে থাকে—তাদের অধ্যাত্ম জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

অধ্যাত্ম জীবনে স্খলনের সম্ভাবনার বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা ও চরিত্রে রূপান্তর আনবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হওয়া উচিত, তার ফলে আমরা নৈতিক পবিত্রতা ও শক্তির অধিকারী হব, আর এই ভাবে উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারব। একমাত্র এই উপায়েই আমাদের মধ্যে যে তমোগুণী পশু বা অসুর ও রজোগুণী মানব রয়েছে তা রূপান্তরিত হতে পারে সত্ত্বগুণী দেবতায় যে দেবতা আমাদের অন্তরে সুপ্ত রয়েছেন; এই পথে আমরা শেষ পর্যন্ত জীবনের চরম লক্ষ্য—পরমাত্মার—উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হব।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা আগেই আমাদের স্বভাব-শুদ্ধির জন্য যেসব নিয়ম নিষ্ঠার প্রয়োজন তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখন একটু দেখা যাক, উত্তরোত্তর বেশি সত্ত্বগুণের অধিকারী হলে, আমাদের কি পরিণাম হবে। যে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠার ফলস্বরূপ পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত, তার লক্ষণ হলো ঃ শরীরের লঘুতা, অত্যধিক দেহ-চেতনায় তার আর তত ভারাক্রান্ত বোধ না হওয়া। ইন্দ্রিয়গুলি যেমন উজ্জ্বল ও শক্তিশালী হতে থাকে, সাধক আরো বেশি সাম্যের অধিকারী হয়, তার মন পূর্ণ-সতর্ক হয় ও শোধিত বুদ্ধির মাধ্যমে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এক নতুন আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। রূপক-কাহিনীর নিচের পাখিটি ওপরের পাখিটি, চিরন্তন সাক্ষীটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। অহংজ্ঞান, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সঙ্গে ভ্রান্ত একাত্মবোধ ছিন্ন করে জীবাত্মা উচ্চতর চেতনার স্তরে উঠতে থাকে, যতক্ষণ না তার পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হয়। এই হলো অধ্যাত্ম সাধনার পরাকাষ্ঠা।

উপনিষদে ঘোষিত হয়েছে ঃ

**যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।**
**তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥**[৫২]

—দ্রষ্টা যখন দীপ্তিমান পরম সত্তাকে, স্রষ্টাকে, প্রভুকে ও সৃষ্ট সত্তার উৎসকে উপলব্ধি করে, তখন সেই বিদ্বান পুরুষ সমস্ত পাপ-পুণ্যকে ধুয়ে ফেলে পরম নিষ্কলঙ্ক একত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন ঃ

**লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।**
**ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥**[৫৩]

—সব দোষ ও সংশয়হীন, সংযত দেহ-মন, সকল জীবের কল্যাণে নিরত হয়ে ঋষি ইহ ও পর জীবনে পরম মুক্তি লাভ করেন।

এই হলো দেব-মানবের আদর্শ। এই মহান আদর্শের স্তরে পৌঁছতে গেলে আমাদের জীবনে রূপান্তর ঘটাতে হবে। আধ্যাত্মিক আদর্শকে সব সময়ে 'আদর্শ' হিসাবে রেখে দিলেই হবে না। অধ্যাত্ম সাধনা ঔদাসীন্য সহকারে অনুষ্ঠিত 'অনুশীলন' রূপেই চিরকাল চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এর দ্বারা আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসা উচিত। আমাদের জীবনে রূপান্তর আনতে হবে। একদিন না একদিন আমাদেরও দেব-মানবোচিত পবিত্রতা, ঈশ্বর-চেতনা ও প্রেম লাভে সমর্থ হওয়া উচিত।

---

৫২ মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩.১.৩
৫৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫.২৫

## উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## সাধনার প্রতিক্রিয়া

### অধ্যাত্মজীবন যেন এক বেড়া-ডিঙ্গানো দৌড়

'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' (উন্নতির পথে বহু বাধা)—ভারতে এই রকম একটা প্রবাদ আছে। অধ্যাত্ম জীবনে এ কথা আরো সত্য। আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে ফেরার পরই অধ্যাত্ম সাধক দেখে যে তার পথটি বাধা-বিপত্তিতে ভরা, আর সে পথে চলতে যাওয়া বহু আয়াস সাধ্য। সে সংসার জীবন থেকে সরে এসেছে, প্রার্থনা ও ধ্যানের পথ বেছে নিয়েছে, পরম শান্তি ও সার্থকতা লাভের আশায়। সে পড়েছে বিভিন্ন ধর্মের মহান সন্তরা ধ্যানের মাধ্যমে কত শান্তি পেয়েছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগে কত আনন্দ পেয়েছেন, কিন্তু যখন সে সেগুলির অনুকরণে বহুক্ষণ ধ্যানাভ্যাস করতে চেষ্টা করে, সে দেখে তার পক্ষে ঐ সাধনপ্রয়াস বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রথমে সব কিছুই তার কাছে ভাল লাগে। সাধক তার *জপ*, ধ্যান, কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতিতে আনন্দ পায়। কিন্তু তার পর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে।

যারা প্রতিদিন মাত্র কয়েক মিনিট ধ্যান করে তারা এই সব প্রতিক্রিয়ার বিন্দুবিসর্গও না জানতে পারে। কিন্তু যেসব খাঁটি সাধক কয়েক ঘণ্টা ধরে *জপ*, প্রার্থনা ও ধ্যান করে থাকেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অন্তরের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হন, ঐ প্রতিক্রিয়া বাইরে থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। ধ্যান যেন মনকে মন্থন করা। আমরা যখন মনকে অন্তরে কেন্দ্রীভূত করতে চেষ্টা করি তখন মনের অচেতন অংশে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ধ্যান অভ্যাস না করা পর্যন্ত ঐ 'অচেতন অংশের' অস্তিত্ব আমাদের নজরেও পড়ে না। একে সংযত করতে গেলে, এ বিদ্রোহ করে, আমাদের মনে বিক্ষেপের স্রোত বইয়ে দেয়। অন্তরের এই বিক্ষেপ আমাদের অন্যের প্রতি আচরণ ও মনোভাবকে প্রভাবিত করে, ফলে যে সমাজে আমরা বাস করি সেখানকার প্রতিক্রিয়াকে আমন্ত্রণ করি। এই সব আন্তর ও বাহ্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে অধ্যাত্ম সাধক শীঘ্রই দেখে যে ধ্যান-জীবন পুষ্পবিতান নয়। প্রায়ই সে লক্ষ্য করে যে অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশ করার আগে সে আরো বেশি সুখী ছিল। অনেকে এতই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে যে তারা ধ্যানাদির অভ্যাস বন্ধ করে দেয়। অনেকে

কর্তব্যবোধে কেবল যন্ত্রের মতো অভ্যাস করে চলে। মাত্র কয়েকজন প্রচণ্ড সাহস ও উৎসাহ নিয়ে বাধা ভেদ করতে করতে এগিয়ে চলে।

সচেতনভাবে অধ্যাত্মজীবন গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ঝড় বইছেই, ভেতরে আবার বাইরেও, আর তোমাকে দুই-এর সামনে স্থির হয়ে থাকতে হবে। কেবল তখনই এ জীবন গড়ে ওঠা সম্ভব। সাধনকালে তোমাকে এক এক সময় কঠিন অবস্থার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কেউ কেউ পথিপার্শ্বে পড়ে যাবে ও পেছনে পড়ে থাকবে। কিছুকালের জন্য তোমার কষ্ট বাড়তেও পারে। তোমার বন্ধু ও স্বজনবর্গের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়ার রূপ ধরে বাইরের বাধাও বাড়বে।

কখনো কখনো শরীরও সব সম্ভাব্য উপায়ে বিদ্রোহ করতে থাকে। মন চাপা উত্তেজনা ও বিদ্রোহে ভরে ওঠে। স্নায়ুগুলির ওপর অত্যন্ত টান পড়তে থাকে। পূর্ব প্রবণতা, পূর্ব স্মৃতি, পূর্ব বাসনা বলবত্তর হয়ে দেহস্তরে প্রকাশ পেতে চায়। আমরা যদি অধ্যাত্ম জীবন যাপন করতে চাই তবে এই সব পরীক্ষার ভেতর দিয়ে, বহুকাল স্থায়ী গুরুতর অনিশ্চিত অবস্থার ভেতর দিয়ে, আমাদের বাসনা-কামনাগুলি স্তিমিত হবার আগে তাদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হবে। তখন মনে হবে জীবন যেন বেড়া ডিঙ্গানোর দৌড়ের মতো। বাধা অতিক্রমণের শেষ নেই, আর বহুকাল ধরে আমাদের কোন নিষ্কৃতিও থাকবে না। যারা কঠোরভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে অধ্যাত্ম পথ অনুসরণ করে তাদের প্রত্যেকেরই এই অভিজ্ঞতা হয়।

## প্রতিক্রিয়াগুলির প্রকৃতি

সম্ভবত শঙ্করাচার্যের রচিত 'অপরোক্ষানুভূতি' নামে একটি ছোট প্রকরণ গ্রন্থে— সাধনকালে যেসব বাধা উপস্থিত হয়ে থাকে তার একটি তালিকায় এইরকম আছে : 'সমাধি সাধন কালে, এড়ানো যায় না এমন বহু বাধা উপস্থিত হয়, যেমন অনুসন্ধিৎসার অভাব, আলস্য, ভোগস্পৃহা, নিদ্রা, নির্বুদ্ধিতা, বিক্ষেপ, সুখাস্বাদন ও বিহ্বল ভাব। যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিলাষী হবে তাকে ধীরে ধীরে এ রকম অসংখ্য বাধা পার হয়ে যেতে হবে।'[১]

পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে এই রকমই একটি তালিকা দিয়েছেন :

> রোগ, মনের জড়তা, সংশয়, আগ্রহের অভাব, আলস্য, ভোগাসক্তি, ভ্রান্ত অনুভূতি, একাগ্রতার অভাব, অবস্থা প্রাপ্তির পর পতন, এগুলিই চিত্ত-বিক্ষেপকর অন্তরায়।[২]

বাধাসূচক এই তালিকাগুলি পরীক্ষা করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের

১ শঙ্করাচার্য, *অপরোক্ষানুভূতি*, শ্লোক—১২৮

২ পতঞ্জলি, *যোগসূত্র*, ১/৩০; দ্রঃ *বাণী ও রচনা*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২০

নজরে পড়ে—তা হলো, বাধাগুলি সবই আমরা নিজেরা সৃষ্টি করে থাকি। তারা আমাদের নিজেদের ভেতর থেকেই ফুটে ওঠে, এর জন্য অন্যদের দোষ দিয়ে কোন লাভ হবে না। আমাদের 'সাধনা'র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এগুলি উদ্ভূত হয়।

এমন হয়ে থাকে যে অধ্যাত্ম সংগ্রাম কয়েক বছর চালানোর পর আমরা হয়তো কিছু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। সাধারণত তা সাময়িক—অন্তর্জ্যোতির 'আভাস' মাত্র। অনেকেই এই অবস্থাকেই জ্ঞান লাভ মনে করে, আর ভাবে যে আর বেশি চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন নেই। তারা শীঘ্র বোঝে যে, এ ভাবে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা হঠকারিতা হয়েছে।

আমাদের মনের আনাচে-কানাচে সঞ্চিত সমস্ত ময়লা ও মন্দবুদ্ধিগুলিকে একেবারে দূর করতে না পারলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। যদি সামান্য একটু আলো চকিতের জন্য দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢোকে, আর বাকি ঘরটি অন্ধকারে ডুবে থাকে ও সেখানকার ময়লাও থেকে যায়, তবে বুঝতে হবে যে সত্যিকারের সাফল্য কিছুই হয়নি। মনে সামান্য একটু আলো প্রবেশ করলেই বা সেখানকার ধুলা-ময়লাকে তখনকার মতো দূরে অন্ধকার কোণে সরিয়ে দিলেই, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না। এসব ক্ষেত্রে সাধক ঐ 'আভাস'-টুকু পাবার আগে যে অবস্থায় ছিল তেমনিই থাকে। তত্ত্ব ও দর্শন যতই আশ্চর্যজনক হোক না কেন, কেবল সেগুলি থেকেই আমাদের কোনরূপ সহায়তা হবে না। যা আমাদের আবশ্যিক প্রয়োজন, তা হলো কর্মজীবনে সেগুলির প্রয়োগ, মনের উদ্গতি, আর মনের অন্ধকার কোণে যেসব ময়লা লুকিয়ে আছে, সেগুলিকে দূর করা। মনের সমস্ত বৃত্তিগুলির তথাকথিত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে কোন কোন সাধক সক্ষম হলেও, ঐটিই আমাদের আশু সমস্যা নয়। সমস্ত বৃত্তির দমন ও মনকে বৃত্তি-শূন্য করতে চেষ্টার ফলে, প্রবর্তক সাধক আপনিই নিদ্রার দিকে আবিষ্ট হয়ে পড়বে, প্রকৃত জ্ঞানদীপ্তির উদ্ভাসের দিকে নয়। যারা অধ্যাত্ম জীবনের গোড়ায় সমস্ত মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ দমনের কথা বলেন, তারা জানে না এর অর্থ কি।

## প্রতিক্রিয়ার কারণ

আমাদের অধ্যাত্ম পথের বহু বাধাই আমাদের অসতর্ক জীবনযাপন থেকেই সৃষ্ট হয়। অনেক লোক আছে যারা একই সঙ্গে এক দিকে ধ্যান অভ্যাস করে, আর অন্য দিকে অতি ভোজন, অতি নিদ্রা, অতিশ্রম বা অনর্থক ও অগোছালো পরিশ্রম, অত্যধিক বাজে কথা বলা ও এই রকম কাজকে প্রশ্রয় দেয়। অনিয়মিত ও দায়িত্বহীন জীবনযাত্রা আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। যারা নিয়মবদ্ধ

জীবনের ও নিয়মিত সদভ্যাস পালনের পথ অনুসরণ করতে পারে না, তাদের পক্ষে অধ্যাত্ম জীবন সম্ভব নয়।

এ ছাড়া *সাধনার* সময় যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তার অতি সাধারণ কারণ হলো যথেষ্ট মানসিক পবিত্রতার অভাব। যেসব লোক ধ্যানময় জীবনে প্রবেশ করে তাদের অনেকেই জীবনের নৈতিক দিকটার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয় না। ধ্যানাভ্যাসে তাদের এত আগ্রহ যে, তারা নৈতিক সংযমের ক্লান্তিকর ও নীরস খুঁটিনাটির দিকটাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে চায়। একথা বর্তমান কালে বিশেষভাবে সত্য, যখন অধ্যাত্মজীবনের উচ্চতর বিষয়গুলির ওপর লেখা সব গ্রন্থ লোকের পক্ষে সহজলভ্য হয়েছে। ধ্যান, আধ্যাত্মিক জাগরণ, কুলকুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতি প্রভৃতি সব খুবই মনোমুগ্ধকর এবং মনে হয় এগুলি সহজ ব্যাপার। কিন্তু কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে নৈতিক জীবনযাপন ছাড়া ঐগুলি লাভ করা যায় না। যদি কেউ উদ্যোগ মাত্র সহায়ে কোন উচ্চতর অভিজ্ঞতা লাভ করে, তবে সব পুরাতন অপবিত্র প্রবণতাগুলি এক যোগে প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে টেনে নামিয়ে দেবে, আর প্রায়ই সে পতন হয়ে থাকে জঘন্য।

মন ভরে থাকে বাসনায়—যা তাকে চারিদিকে দূরে দূরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। অচেতনতার গভীর দেশ থেকে সর্বদা নানা উত্তেজনা উঠে মনকে অস্থির করে রাখে। অধিকাংশ সাধকই চাপা ও খোলা এই সব ঝঞ্ঝাটের মাঝেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। অধ্যাত্ম জীবনের গোড়ায় যখন সাধকের উৎসাহ তাজা থাকে, তখন সে মানসিক অস্থিরতাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু আগে হোক পরে হোক তারা নিজেরা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর যেহেতু এই সময়ের মধ্যে প্রাথমিক উৎসাহ কিছুটা কমে আসে, এই বাধাগুলিকে আরো প্রবল ও উগ্র বলে মনে হয়।

কোন কোন সাধক তাদের আধ্যাত্মিক উৎসাহের বশে, প্রায়ই প্রয়োজনীয় ও মহৎ আকাঙ্ক্ষাগুলিকেও দমন করে বসে। তারা এতদূর বিপরীতমুখে এগিয়ে যায় যে, এমনকি ভালবাসা, করুণা ও উচ্চতর বৌদ্ধিক আনন্দের মতো মানবাত্মার ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক চাহিদাকে পর্যন্ত দমন করতে চায়। আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ায় বেশির ভাগ সাধকেরই সুষ্ঠু আবেগের সহায়তা প্রয়োজন হয়, মন্দ আবেগগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য। অধ্যয়ন, ভক্তি সঙ্গীত, সমাজসেবা প্রভৃতির সহায়তাও তাদের প্রয়োজন নিম্নস্তরের কামনাগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য। আগেরগুলির চর্চা বন্ধ করে তারা সহজেই পরেরগুলির শিকার হয়ে পড়ে। এ কথা সত্য যে, শ্রেষ্ঠ স্তরের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে এমনকি মহৎ ও উত্তম আবেগগুলিও বাধাস্বরূপ। কিন্তু সে তো কেবল উন্নতস্তরের সাধকদেরই

সমস্যা। প্রবর্তক সাধকের পক্ষে, যে এমনকি নিম্নস্তরের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা কাকে বলে তাও জানে না, যার এই রকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত মনের জোরও নেই, অধ্যয়ন, জীবনের কর্তব্যাদি সম্পাদন, মহাপুরুষদের সেবা প্রভৃতি কাজ কিছুদিন করা প্রয়োজন। সমস্ত ধর্মগুরু বিচার করেই প্রবর্তক সাধককে এইগুলি করার জন্য বার বার উপদেশ দিয়ে থাকেন। মিথ্যা অন্তঃশক্তির ওপর নির্ভর করে অহংকারের বশে এই সব প্রাথমিক সহায়তাগুলিকে ছেঁটে বাদ দেওয়া বিপজ্জনক। যতদিন না তুমি প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আনন্দ আস্বাদন করছ, নিম্নস্তরের সুখাস্বাদনের উগ্র কামনাকে যে কোন উপায়ে প্রতিহত করতে হবে। প্রবর্তকের পক্ষে কেবল ধ্যানের সাহায্যে তা করা সব সময়ে সম্ভব নয়। অবশ্য, যেসব প্রবর্তক অসাধারণ মানসিক পবিত্রতা ও তীব্র ঈশ্বরানুরাগের অধিকারী, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু এ রকম লোক বিরল।

*সাধনায়* বিপরীত প্রতিক্রিয়ার তৃতীয় কারণ হলো, সাধকের সাধন প্রচেষ্টা মাত্রাতিরিক্ত হওয়া। বহু সাধক প্রাথমিক স্তরে বহুক্ষণ ধরে মনের একাগ্রতা অভ্যাস করতে পারে না। বহুক্ষণ ধ্যানে যে শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্ট হয় তা সহ্য করার মতো স্নায়বিক শক্তি তাদের নেই। বহু লোক সঠিক নির্দেশের অভাবে একই সঙ্গে অনেকগুলি ক্রিয়া অভ্যাসের চেষ্টা করে বিশৃঙ্খল অবস্থাকে আরো বিভ্রান্তিকর করে তোলে। ধ্যানের অতিরিক্ত (সঠিক নির্দেশ ছাড়াই) তারা *প্রাণায়াম* অভ্যাসে ও নানা কৃচ্ছ্রসাধনে আপন দক্ষতা পরীক্ষা করে। শরীরকে তার স্বাভাবিক খাদ্য, বিশ্রাম ও নিদ্রা থেকে বঞ্চিত করে মনকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য একাসনে বহুক্ষণ বসে থাকার যে কষ্ট তাকে কেবল আরও বাড়িয়েই তোলা হবে। ফলে মানসিক তেজ নিঃশেষিত হবে অথবা স্নায়ুগুলি ভেঙ্গে পড়বে, যা থেকে প্রায়ই গুরুতর ক্লেশের সূচনা হবে। সাধকের আপন শারীরিক ও মানসিক শক্তি সম্বন্ধে বাস্তব সচেতন হওয়া অবশ্যই দরকার। যেসব লোক স্নায়ুরোগে ও উচ্চচাপে ভুগছে, তাদের পক্ষে হঠাৎ খুব বেশি ধ্যান অভ্যাসের চেষ্টা করা উচিত নয়। তাদের উচিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া। এ কথা সত্য যে, অল্প সংখ্যক সাধক আছে যারা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও প্রচণ্ড মানসিক শক্তি দুই-এরই অধিকারী। কিন্তু অন্ধের মতো তাদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করা উচিত হবে না। নিজ স্বভাব পর্যালোচনা করে বুঝতে চেষ্টা কর, তুমি কতটা ভার সহ্য করতে পারবে। যেসব লোক একটুতেই উত্তেজিত হয়, যাদের মাথায় অনেকগুলি মতলব ঘুরছে, তাদের উচিত একাসনে এক ঘণ্টার বেশি ধ্যান করার বিষয়ে প্রলুব্ধ না হওয়া। বহুক্ষণ ধ্যান করতে হলে মেজাজ ঠাণ্ডা হওয়া চাই। অধিকন্তু, কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে মস্তিষ্কের পুষ্টি সাধন চাই। ব্রহ্মচর্যহীন লোক দেখবে—এ কাজে তাদের মাথা একটুতেই গরম হয়ে যাচ্ছে।

যেসব সাধক কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অন্য রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটা শুষ্কভাব বা শূন্যবোধ এসে থাকে। কয়েকদিন, হয়তো কয়েক সপ্তাহ, ভাল ধ্যানের আনন্দ উপভোগ করার পর সাধকের অনুভূতি হতে থাকে হঠাৎ যেন ধ্যানের প্রতি তার সব আগ্রহ চলে গেছে। সে লক্ষ্য করে, মনকে একাগ্র করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তার অনুভূতি হয়, সে যেন শূন্যে ভাসছে। সুস্পষ্ট মানসদর্শনের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এরূপ ঘটে থাকে। *ইষ্ট দেবতার* খুব স্পষ্ট দর্শন ও কিছুক্ষণ উপভোগে সাফল্য লাভ করার পর তা দৃষ্টি থেকে সরে গেলেই তোমার অনুভূতি হবে, তুমি যেন একেবারে হারিয়ে গেছ। তুমি অনুভব করবে, ইষ্ট-সত্তার সঙ্গে তোমার যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে ও তোমার অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা বোধ হবে। এরূপ অবস্থায় সব সময় মনে রাখা ভাল যে, অন্তর্যামী আত্মা সব সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে তথা পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েই আছেন। এমনকি যখন তোমার কল্পনাশক্তি কাজ করছে না, তখনো তুমি কিছুই হারাও নি। এই রকম নীরস সময়গুলিতে, সেগুলি যতই বিরক্তিকর হোক, সাধকের উচিত নিজ চেতনা-কেন্দ্রে মনকে স্থির রেখে *জপ* চালিয়ে যাওয়া।

*সাধনায়* প্রতিক্রিয়ার আর একটি কারণ হলো, নিজ চেতনা-কেন্দ্রের স্থানান্তরণ। অধ্যাত্ম জীবনে আসার আগে, সাধারণ লোকের চেতনা নিম্ন কেন্দ্রগুলিতেই ঘোরাফেরা করে। তার স্বাভাবিক জীবন আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়ভোগ নিয়েই চলতে থাকে। অধ্যাত্ম জীবন পথে এসে সে দেখে যে, সে আর নিজেকে নিম্নস্তরের চিন্তায় ও কাজে চালিত হতে দিতে পারে না। সে উচ্চস্তরের চিন্তার প্রয়োজন অনুভব করে, আর এরই অর্থ হলো চেতনা-কেন্দ্রের স্থানান্তরীকরণ। যখন তুমি তোমার চেতনা-কেন্দ্রকে হৃদয় বা মস্তিষ্ক স্তরে সরাতে চাও, তুমি লক্ষ্য করবে যে, এই কেন্দ্রগুলিতে বেশিক্ষণ থাকতে পারা যাচ্ছে না। তখন তুমি দেখবে যে, তোমার কোন নির্দিষ্ট চেতনা-কেন্দ্র নেই। এর ফলে মনে প্রচণ্ড অস্থিরতা সৃষ্ট হয়।

অন্তরস্থ কোন বিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে জগতে বাস ও জাগতিক বস্তু ব্যবহার করা এক অত্যন্ত অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। সাধক দেখে যে, সে উচ্চতর চেতনা-কেন্দ্রে ইষ্টের ধ্যানও করতে পারে না, আবার নিম্নতর কেন্দ্রে থেকে আগের মতো জাগতিক ভোগেও ডুবে থাকতে পারে না। যখন নির্দিষ্ট বিন্দু ছাড়া অহংচেতনা নড়ে বেড়ায়, সাধকের আপন নিশ্চয়তায় শৈথিল্য দেখা যায়, তখন তার চরিত্র ও আচরণে কিছুকালের জন্য অস্থিরতা এসে পড়ে। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পথে—এ এক অপরিহার্য স্তর। সমস্যা হলো কত শীঘ্র এ অবস্থা পার হওয়া যায়। কোন কোন সাধকের ক্ষেত্রে এ অবস্থা বেশিদিন চলতে থাকে, কখনো উন্নত ও কখনো হাস্যকর দুই অবস্থার মধ্যে দোলায়মান হয়ে চলে। কেউ কেউ বরাবরের জন্য পুরান

জীবনধারায় ফিরে যায়, আর তাদের চেতনাকে আগের মতো নিম্নতর কেন্দ্রেই রেখে দেয়।

## তোমার চেতনাকে দিব্য-চেতনার সঙ্গে যুক্ত কর

আধ্যাত্মিক চেতনা যেন ব্যষ্টি চেতনারই সম্প্রসারণ। আমাদের অবশ্যই আপন চেতনার ভিত্তির ওপরেই শক্তভাবে দাঁড়াতে হবে, তারপর আধ্যাত্মিক চেতনার অধিকারী হতে হবে। বিন্দুটিকে প্রথমে অতি নির্দিষ্টভাবে স্থির করে নিতে হবে, তারপরে তাকে সম্পূর্ণ বৃত্তের সঙ্গে ঐকতানে মেলাতে হবে। বিন্দুভাবটিকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট না করে বৃত্ত সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। আমার অস্তিত্ব থাকলেই তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব। আমার সত্তা সর্ব দুঃখ মুক্ত চৈতন্য স্বরূপ; এই 'আমিত্ব'কে দৃঢ় করতে হবে। অপর 'আমিত্ব', যা সীমিত, যা সর্বদা দুঃখদায়ক, তাকে বিলোপ করতে হবে। আমাদের আপন চেতনাকে অবশ্য রক্ষা করতে হবে, কিন্তু তার কেন্দ্রকে সরিয়ে আনতে হবে ভ্রান্ত অহংভাব থেকে প্রকৃত আত্মভাবে। সব সময়েই আমাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকতে হবে আমাদের উচ্চতর চেতনায়। কখনো কখনো আপন চেতনায় প্রতিষ্ঠিত না থেকে, আমরা চাই অনন্ত সত্তায় ভেসে বেড়াতে। কোন সময়েই আমরা যেন মূলোৎপাটিত হয়ে না যাই। কোন না কোন জায়গায় আমাদের শিকড় যেন বাধা থাকে। যখনই আমরা আমাদের মূলকে অসৎ ভিত্তি থেকে তুলে নেব, তখনই যেন তাকে সদাত্মায় পুনঃস্থাপন করি; নিজেরা উৎপাটিত-মূল হয়ে যেন থেকে না যাই।

ভক্ত যখন ধ্যেয়-বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তার সাকার রূপটি স্পষ্ট দেখতে পায়, তখন তাকে অবশ্যই তার সঙ্গে একটা সম্পর্কও গড়ে তুলতে হবে; তা না হলে, তাদের কল্পনা জগতে ভেসে বেড়াতে হবে। সাধককে অবশ্যই আপন চেতনাকে ইষ্ট চেতনার ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে নিতে হবে। সাধক যদি তা না করে, তবে তাঁকে মহাদুঃখ ও অস্থিরতার মধ্যে পড়তে হবে, আর ধ্যেয় বস্তু লাভ তার হবে না। তুমি যদি *ইষ্টের* স্পষ্ট চিন্ময় উপস্থিতি অনুভব করতে না পার, তোমার বোধ হবে তুমি আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছ, তুমি নির্মূল হয়ে পড়বে। তোমার চেতনা ভিত্তি হারিয়ে ফেলবে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অসৎ ভিত্তি থেকে তোমার মূলোৎপাটন নিশ্চিতভাবে যত শীঘ্র সম্ভব হওয়া উচিত। *ইষ্টের* স্পষ্ট উপস্থিতির ওপর সমূহ গুরুত্ব দেওয়া চাই। তখন তুমি অন্তরের শান্তিও অনুভব করবে। ইষ্ট কল্পনামাত্র নয়। *ইষ্টমূর্তির* স্পষ্ট ধারণা হলে ইষ্টের উপস্থিতি যথার্থ বলে অনুভূত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধনা ঠিক মতো করা হলে, তুমি অসীম শক্তি, সাম্য ও স্থৈর্য এবং গভীর আন্তরিক প্রশান্তি অনুভব করবে, মনে হবে যেন আনন্দের

একটি আধার হৃদয়ে বসানো হয়েছে। তখন কোন কিছুই কোনভাবে তোমার শান্তি ভঙ্গ করতে পারবে না।

তোমার সাধনায় বর্তমানে যেসব কুফল দেখা যায়, তার অধিকাংশই আসে তোমার ইষ্টমূর্তিকে উদ্ভাসিত করার পরেও তোমার *ইষ্টের* সঙ্গে প্রয়োজন মতো সম্পর্ক গড়ে না তোলার ফলে, তোমার নিজ চেতনাকে তোমার *ইষ্ট* চেতনার সঙ্গে যুক্ত না করে। অধ্যাত্মজীবনে এ রকম বিপর্যয় সব সময়ে ঘটে থাকে। যারা কঠোরভাবে, নিয়মিত ও সচেতনভাবে সাধনা করে—তাদের সকলেরই এ বিপর্যয় আসতে পারে। যারা সাধনায় সত্যসত্যই উন্নতি লাভ করছে ও সত্যসত্যই পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে ধ্যান ধারণা করে থাকে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই তা আসতে পারে। এই অস্থিরতা ও এই বিপর্যয় থেকে কারও রেহাই নেই; কিন্তু এ অবস্থায় তাদের উচিত স্ব স্ব আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে গিয়ে নির্দেশ প্রার্থনা করা ও তাদের সাধন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা। যদি একেবারেই কোন অসুবিধাবোধ না হয়, যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে কোথাও কিছু ভুল হয়েছে; তাদের সাধনা ফলবতী হয় না।

*জ্ঞানীদের* এই বিপর্যয়গুলি খুব কম ক্ষতিকারক। এক্ষেত্রে সমতা ও বিচারের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়, যদিও এখানেও কিছু বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সব সময়ে মনে রাখবে যে, ভক্ত ও *জ্ঞানী* উভয়ের পক্ষেই সব অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক সচেতনতাকে অবশ্যই ব্যক্তি সচেতনতার এক সম্প্রসারণ স্বরূপ হতে হবে।

## তোমার চেষ্টা ছাড়বে না

এই সব শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া আমাদের সকলেরই মধ্যে এসে থাকে, তাই আমাদের অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রতিক্রিয়া সহ্য করার সামর্থ্য অবশ্যই বাড়াতে হবে। বহু লোক এই প্রতিক্রিয়ার দরুন ভেঙ্গে পড়ে। অনেকেই কিছুদিনের মতো অব্যবস্থিত চিত্ত হয়ে পড়ে। অধ্যাত্ম সাধনার পূর্বে তাদের অবস্থা যেমন ছিল তার থেকেও খারাপ হয়ে পড়ে। তোমার চেতনা-কেন্দ্রকে নিম্নতর থেকে উচ্চতর কেন্দ্রে তুলতে চেষ্টা করলে তোমাকে মাঝে মাঝে অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। লোকেরা যখন সংসার-জীবন যাপন করে তখন তারা এই সব অবস্থা সম্বন্ধে সত্য সত্যই সচেতন হয় না, কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনা যদি ঠিক মতো করা যায় তবে তাতে বিভিন্ন অবচেতন স্রোত আলোড়িত হয় ও তার ফলে অস্থিরতা দেখা যায়। প্রায়ই এই সব ক্ষেত্রে কোন শক্তিই অবশিষ্ট থাকে না; কখনো কখনো, অশান্তভাব ও অব্যবস্থিত চিত্ত বেশি দিন ধরে চলে থাকে, এমনকি নৈতিক সাম্যেরও বিঘ্ন ঘটে।

এই সব উৎসাহহীন অবস্থায় পড়লে লোকেদের সব রকম অধ্যাত্ম সাধনা ছেড়ে দেবার ঝোঁক আসে, অথচ তখনই সাধনায় বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি ছেড়ে দেয় তবে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন শেষ হয়ে গেল। কোন বিশ্রী রকমের অধঃপতনও তারা এড়াতে পারবে না, তারা হয়তো বহুকালের জন্য এই পতিত অবস্থা থেকে উঠতেও পারবে না। তাই, এ রকম সময়ে আপন অধ্যাত্ম সাধনা ছেড়ে দেওয়া খুবই খারাপ ও অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই সাধনায় আরো বেশি করে লেগে থাক। এই সাধনাকে আরো জোরদার আরো কার্যকর করে তোলার চেষ্টা কর। শান্ত স্থির একাগ্র ও নাছোড়বান্দাভাবে ধ্যান-জপের অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে হবে, আর তার সঙ্গে চাই নৈতিক সংস্কৃতির যথাযথ পরিপূরণ। যেসব লোক এগুলি না করবে, তারা আজ হোক কাল হোক এ পথ থেকে নির্বাসিত হবে, লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছিও কোন জায়গায় তাদের স্থান হবে না।

যে *যম* ও *নিয়মের* শর্তগুলি[৩] পূরণ করে না, সে কিছুই লাভ করতে পারে না। চারিদিক থেকে যে সব পীড়ন ও চাপ তার ওপর আসবে, তা সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি তার থাকবে না। তাই কোন সাধকের পক্ষেই দৈহিক ও মানসিক পথে অযথা শক্তিক্ষয় হতে দেওয়া চলতে পারে না। প্রাচীন আচার্যেরা ভালভাবেই জানতেন, কেন তাঁদের *যম* ও *নিয়ম* সাধনের অনুশীলনাদির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, কেন তাঁদের নৈতিকতার বিষয়ে এত কঠোর হতে হয়েছিল। এই সব বিধি পালন না করার ফল হবে—স্নায়বিক বিপর্যয়, সমস্ত শক্তির আরো বেশি ক্ষয় এবং আরো বেশি করে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব। এ কথাগুলি কেবল তত্ত্ব বলে ভেবো না। আমাদেরও অধ্যাত্ম জীবনের এই সব প্রাথমিক পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল, আর আমরা আমাদের মহান আচার্যদের কাছে থেকে কত দেখেছি, কত শুনেছি। এগুলি কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়—যা প্রাচীন রীতিনীতি সম্বন্ধে কোন কোন ছাতাধরা পুরান পুঁথিতে পাওয়া যায়।

*সাধনার* প্রথম পর্যায়ে, সাধককে এই সব ভীষণ প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে হয়, সেটি একটি ভীষণ পরীক্ষার সময়। সাধককে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে, অটল অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে, তারপরেই ভাল সময় আসবে। বিপুল মনঃশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, তা না হলে আমরা নড়াচড়া করার মতো শক্তি পাব না। সবল দেহ ও প্রবল শক্তিসম্পন্ন মন থেকেও এমন সময় আসতে পারে যখন আমরা অত্যধিক অস্থিরতা ও স্নায়বিক দুর্বলতার শিকার হতে পারি। প্রথমে একটা সময় আসে যখন আমাদের অসংযত উত্তেজনা ও কল্পনার সঙ্গে যুদ্ধ করে

---

৩ নবম, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

কাটে, তারপর যুদ্ধ চলে মনের স্বয়ংক্রিয় শক্তির ও বুদ্ধিগত অভ্যাসের সঙ্গে, কিন্তু তারপর একটা সময় আসে যখন আমাদের মন সাম্যের, শান্তির ও আন্তর-সমন্বয়ের ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

এই সব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিছু কিছুকে অবশ্যই এড়ানো যেতে পারে, যদি সাধক যত্নের সঙ্গে আচার্যের নির্দেশ অনুসরণ করে আর সাধুসঙ্গ করে। কিন্তু যদি তুমি কোন রকম প্রতিক্রিয়ার প্রভাব বোধ না কর, যদি তুমি দেখ যে তোমার অধ্যাত্ম জীবন প্রথম থেকেই স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে, তবে খুব সম্ভব তোমার সাধনায় কিছু ত্রুটি রয়েছে। খুব সম্ভব তোমার সাধনা গভীর বা তীব্র নয়, গতানুগতিকভাবে চলেছে।

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে—সংগ্রাম ও বিশৃঙ্খলাই আধ্যাত্মিক তীব্রতার সুনিশ্চিত লক্ষণ। প্রায়ই অনাধ্যাত্মিক বিষয়গুলি আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু দানা আর খোসা শীঘ্রই তফাৎ হয়ে যায়। যাদের যথার্থ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তারা সংগ্রাম চালিয়ে যায়, যতদিন না সফল হয়, জয় লাভ করে। যাদের অধ্যাত্ম ক্ষুধা কৃত্রিম ভাবে উদ্রিক্ত তারা দু-চার দিন লড়াই দেখিয়েই থেমে যায়, অথবা এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের মনোরোগের হাসপাতালেও যেতে হতে পারে।

## সাধক সহানুভূতিশীল ব্যবহার চায়

*সাধনার* সময় সাধকের সঙ্গে সহৃদয় ও খুবই বোঝাপড়ার মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করা প্রয়োজন, কারণ বলা যেতে পারে যে, এই অস্থিরতা তার দোষ নয়, পরন্তু অধ্যাত্ম সাধনারই ফল। এর জন্য সাধকের সমালোচনা করে কোন ফল হবে না। তার সম্বন্ধে আমরা যেন বিচার করতে না বসি। সাধনার এই কাল পার হলে, সে একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে। এই সব কাল আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আসে, বিভিন্ন সময়ে। এটা সৌভাগ্যের বিষয়, কারণ আমাদের মধ্যে কোন কোন লোক এই সব অভিজ্ঞতা লাভ করে অপরকে সাহায্য করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি আমার প্রভুর সঙ্গে ছ-বছর ধরে লড়াই করেছি, তার ফলে সাধন পথের প্রতিটি ইঞ্চি আমার জানা'।[৪] সাধককে যত রকমের বাধা অতিক্রম করতে হয়, সে সবই তিনি শিখেছিলেন তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমে। তাঁর এই জ্ঞানের সাহায্যেই তিনি সহস্র সহস্র লোককে পথ দেখাতে পেরেছিলেন।

অধ্যাত্মজীবন যদি এই রকম গুরুতর অস্থিরতা সৃষ্টি করে, তবে তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক, এই কথা ভেবে বহু সাধক ভীত হয়ে পড়ে। যারা অসাবধান, তাদের পক্ষে এ রকম হতে পারে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা

৪ Sister Nivedita, *The Master as I saw him*, Kolkata : Udbodhan Office, 1972, p. 12

উচ্চ মূল্য দিতে ইচ্ছুক নয়, তাদের পক্ষে অধ্যাত্ম পথে আসার প্রয়োজন নেই। সহজাত প্রবৃত্তি ও অশুদ্ধ স্মৃতিচারণের কারাপ্রাচীর ভেদ করে অধ্যাত্ম চেতনার প্রকাশ্য দিবালোকে প্রবেশ হলো এক দুঃসাহসিক অভিযান, যা কেবল সবল ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। এই সময়ে সাধককে তার ইচ্ছামতো সঙ্গ, বিশুদ্ধজীবন যাপন করে না, এমন লোকের সংসর্গ থেকে বিরত রাখতে হবে। সে এখনো অধ্যাত্মজীবনের শৈশবে ও কৈশোরে বিচরণ করছে, তাই একজন বয়স্ক লোক বাস্তব বিপদ এড়িয়ে চলার যে ঝুঁকি নিতে পারে, সে তা পারে না। মনে করো না যে, তুমি এখনই আধ্যাত্মিক বয়ঃবৃদ্ধদের দলভুক্ত হয়েছ। তোমাদের মতো বেশির ভাগ লোকই তা হও নি। নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি নিশ্চয়তা বোধ করো না।

কৃত্রিম ভিত্তির ওপর অধ্যাত্মজীবন গড়ে তোলা যায় না। ঠিক শারীরিক ব্যায়ামের মতো অধ্যাত্ম সাধনা করা যায় না। আমাদের জীবন সব সময়েই স্বাভাবিক জীবন হওয়া উচিত, কিন্তু স্বাভাবিক জীবন বলতে বোঝায়, আমাদের উচ্চতর প্রকৃতির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা জীবন, আমাদের নিম্নতর পশু প্রকৃতির সঙ্গে নয়। এ হলো সংসারী লোকেদের 'অধ্যাত্ম জীবন' সম্বন্ধে যা ধারণা তার বিপরীত। প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন হলো আত্ম-জিজ্ঞাসার ফল। এ হলো উচ্চতর স্তরে ওঠার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফল।

কোন না কোন সময়ে তোমাদের সবাইকে এই সব প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। এগুলি সামনে এলে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ো না, সম্পূর্ণ সজাগ থেকো। তুমি যদি তীব্র *সাধনা* করতে থাক, প্রতিক্রিয়াকে এড়াতে পারবে না, তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাবে। একই পথের সাধক যদি এই অস্থির অবস্থায় পড়ে, তাকে সব সময়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করবে। তার প্রতি সর্বদা সহৃদয় ও সুবিবেচক হবে।

ঈশ্বর নিজে যখন ভক্তের ভার লন, তিনিই তাকে এই সব পরীক্ষার ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যান। তিনি তোমার ওপর এই সব ভীষণ সংগ্রাম চাপিয়ে দেন—তোমার পছন্দ হোক, আর না হোক। তাই তুমি অবশ্যই ওগুলিকে স্বাগত জানাবে, আর তা থেকে শিক্ষা নেবে। এই সব সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়া ও তাদের অতিক্রম করা মানসিক শান্তিলাভের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যে শান্তি কোন না কোন ভাবে তোমার সঙ্গে কেবলই লুকোচুরি খেলে।

আধ্যাত্মিক জীবনকে কঠোর করা যায়, সাধন প্রচেষ্টাকে বেগবতী করা যায়, অধ্যাত্ম ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা যায়, আর সেই পথে অধ্যাত্ম সংগ্রামের কালকে কমিয়েও আনা যায়। কিন্তু তোমাকে *সমস্ত* প্রতিক্রিয়া ও যন্ত্রণাদায়ক মানসিক রূপান্তরের ভেতর দিয়ে যেতেই হবে, যদিও তুমি এ কাজ করতে খুব বেশি সময়

না লাগিয়ে অতি শীঘ্র সেরে ফেলতে পার। তোমার *সাধনা* যত কঠোর হবে, প্রতিক্রিয়া তত বেশি, কিন্তু ততই স্বল্প স্থায়ী হবে। স্বামী অভেদানন্দ বলতেন যে, তিনি তার একটি জীবনে দশটি জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছেন।

সব *যোগীই* নিজ নিজ অধ্যাত্ম সংগ্রামের কালকে সংক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করে থাকেন—*সাধনার* কঠোরতা বৃদ্ধি করে। তাদের ভীষণ প্রতিক্রিয়া, বাধা ও প্রলোভনের মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু তাঁরা এমনই অসাধারণ গুণে ও শক্তিতে সমৃদ্ধ যে, তাঁরা এই সব অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে হাসিমুখে পার হয়ে যান; এদিকে সংসারী লোক অধ্যাত্ম জীবনে শম্বুক গতিতে অগ্রসর হবার মতো এক দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে; তাদের অধ্যয়ন ও আলাপন মাত্র নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

## তোমার উচ্চতর চেতনা-কেন্দ্রটিকে ধরে থাক

তুমি আপন চেতনা কেন্দ্রটির সন্ধান যতদিন না পাবে, এই সব অধ্যাত্ম সংগ্রাম তোমাকে যন্ত্রণা দিতে থাকবে। যখনই তুমি এর সন্ধান পাবে, যুদ্ধে অর্ধেক জেতা হয়ে গেল। তুমি তখন পথ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবে, আর অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা অনেকটাই হ্রাস পাবে। পরবর্তী সংগ্রাম হবে সূক্ষ্মতর, কিন্তু তার তীব্রতা ও বাহ্য প্রকাশ স্বল্পতর হবে। তুমি তখন এই আন্তর-সংগ্রাম আরো বেশি *স্থৈর্য* ও শক্তি নিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। প্রত্যেকটি যথার্থ সংগ্রামেরই পুরস্কার আছে।

দোষপ্রশমনকারী যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন, নিজ চেতনা-কেন্দ্রকে সর্বদা ধরে থাকা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যখন যন্ত্রণা দেখা দেবে, তোমার চেতনা-কেন্দ্রে যাও এবং যতদিন না যন্ত্রণার উপশম হয় ততদিন সেখানেই থাক। যখনই যে কোন রকম প্রলোভন আসবে, সেখানে যাও। যখনই কোন অশুভ আবেগ রূপ নিতে চাইবে, তখনই সেখানে যাও। যখনই তুমি বহির্জগতের কাছ থেকে লাথি ও ধাক্কা খাবে, তখনই সেখানে যাও। কেন্দ্রটিকে সব সময়ের জন্য নির্দিষ্ট রাখ, ওটিকেই তোমার নিজ অবস্থান-কেন্দ্র কর। চেতনা-কেন্দ্রকে না সরিয়ে মনকে সংযত করা প্রায় অসম্ভব কাজ। তুমি দক্ষতার সঙ্গে চেতনা-কেন্দ্রকে সরিয়ে তাকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির করে রাখতে, চিন্তা-প্রবাহকে পরিবর্তন করে তাকে উচ্চতর খাতে চালু করতে, পারবে না—যদি না তুমি তোমার *সাধনা*, তোমার *জপ-ধ্যান* বহুদিন ধরে স্থৈর্য ও প্রগাঢ়তার সঙ্গে অভ্যাস করতে পার।

কখনো কখনো আমাদের চেতনা-কেন্দ্রটি কিছু সময়ের জন্যে উচ্চস্তরে থেকে পূর্বাভ্যাসবশত নিম্নস্তরে নেমে যায় আর ঐ কেন্দ্র অনুযায়ী সর্বরকমের চিন্তা ফুটে

উঠতে থাকে। অতএব তোমাদের এই অবস্থার মুখোমুখি হবার জন্য নিজেদের তৈরি থাকতে হবে। সব সময়ে ভাববে তুমি যেন একটি জীবাত্মা, দেহ-মন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বয়ংপ্রভ সত্তা। তোমার নিয়মিত ধ্যানাভ্যাসের পর উপনিষদ্ বা শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতভাব প্রকাশক কিছু নির্দিষ্ট শ্লোক [৫] পড়বে। তোমার আত্মার প্রকৃত স্বরূপ-বিষয়ক ঐ অংশগুলি বার বার পড়তে পড়তে, এই সব ভাবগুলিকে মনের গভীরে আত্মস্থ করতে চেষ্টা কর।

অধ্যাত্ম সাধনার নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুই-এর মিশ্রনীতি অবলম্বন কর। শরীর ও তৎ-সংশ্লিষ্ট সব কিছুকে অস্বীকার কর, কিন্তু তোমার সমগ্র সত্তা দিয়ে আত্মার অস্তিত্বকেই তীব্রভাবে, প্রচণ্ড উদ্যমে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা কর। অনেক প্রবর্তকেরই এ কাজে মাথা ধরে যায়। কিন্তু, আরো কত বিষয় নিয়েই তো আমাদের মাথা ধরে থাকে। এটিকে তাদেরই একটার বদলে গ্রহণ করা যেতে পারবে না কেন?

## তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি

আমাদের জীবনের সমগ্র গতি পথের পরিবর্তন দরকার। আমরা যা করেছি সে সব কিছু সংশোধন করে ফেলতে হবে। আমরা যেন আমাদের মিত্র স্থানীয় লোকেদের সরিয়ে দিয়েছি, আর শত্রুদের ভেতরে আসতে দিয়ে তাদের আমাদের সঙ্গে বাস করতে দিয়েছি। অতএব অতীতের অশুভ ক্রিয়া ও অশুভ চিন্তাগুলিকে নষ্ট করতে তার বিপরীতধর্মী ক্রিয়ার ও প্রতি-চিন্তার ব্যবস্থা করতে হবে, কেবল অধ্যাত্ম-সাধনার সময়ে নয়, অন্য সময়েও। এই দুরূহ কর্মভার দীর্ঘকাল ধরে বহন করতে হয়; এর জন্য চাই প্রচণ্ড বীরত্ব ও অধ্যবসায়। অধ্যাত্মজীবন ফুলশয্যা নয়, এ এক বাস্তব আয়াসসাধ্য কর্মপ্রয়াস।

আমাদের মানব-ব্যক্তিত্ব শুভ-অশুভ দুই নিয়ে গড়া। অশুভকে ধাপে ধাপে নাশ করতে হবে, আর শুভকে লালন করতে হবে। জীবাত্মার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুভ অশুভ দুই-ই এসে হাজির হয়। সাধককে বাস্তবের সামনা-সামনি হতে হবে, আর জীবনের উচ্চভাবগুলিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের ভুল ভ্রান্তি থেকেও আমরা যেন শিক্ষা লাভ করি এবং সেগুলি নিয়ে অত্যধিক চিন্তা না করে, আমরা যেন আপন শক্তি বৃদ্ধি করে সাধ্যমত সব রকম উপায় অবলম্বন করে ঐ ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটতে না দেই। যদি স্খলিত হই, তবে তা যেন আমাদের নম্র ও আরো ঈশ্বর নির্ভরশীল করে তোলে; ঈশ্বরই আমাদের প্রকৃত আশ্রয় ও আমাদের শক্তির প্রকৃত উৎস।

---

৫ Swami Yatiswarananda, *'The Divine Life'*, Sri Ramakrishna Math, Madras, 1973, pp. 276-97

প্রাচ্যে অথবা পাশ্চাত্যে প্রত্যেককেই সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। প্রাচ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংস্কৃতি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় রক্ষিত হয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে কিছু সাধক এতে উপকৃত হয়, কিন্তু বহু লোকেরই এ থেকে কোন লাভ হয় না। তাই পশ্চিমে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন, এরকম অনুযোগ করে কোন লাভ নেই। যাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন তা হলো তোমার স্বভাব, আর যেমন করেই হোক এর পরিবর্তন তোমাকে ঘটাতেই হবে।

জীবাত্মার অগ্রগতির পথে প্রবৃত্তিজাত সততাকে সংগ্রাম করতে করতে চেতনাজাত সততার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, এবং পরে তা বিনা বাধায় স্বাভাবিক সততায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং আমাদের ক্রমবিকাশের পথে সচেতন সংগ্রাম একটি স্তর মাত্র, কাজেই একে পিছিয়ে পড়া বলে মনে করা যায় না। এ কথা অবশ্য আধ্যাত্মিক মার্গে সব রকম পদস্খলনকে সমর্থন করে না।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে আংশিক সফলতাও আমাদের অধিক থেকে অধিকতর সফলতার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রেরণা যোগায়, কিন্তু আমরা যেন কখনো মনে না করি যে, পূর্ণ সফলতা লাভ করেছি। এর অর্থ হলো, যদিও আমরা নিম্নতর স্বভাব ও প্রবণতাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মশুদ্ধিকরণের পথে কিছুটা অগ্রসর হয়েছি, অশুদ্ধবৃত্তি ও অশুভপ্রবণতার অনেকটাই এখনো থেকে গেছে, তাদের এখনো সংযত ও শেষে বিতাড়িত করতে হবে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার সময়ে বরাবর আমাদের অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে নিজ সম্ভাবনার ওপর, আমাদের লক্ষ্যের আরো আরো কাছে যাবার স্বীয় সামর্থ্যের ওপর। কিন্তু আমাদের এই সম্ভাবনাকেই যেন প্রকৃত শক্তি বলে কখনই মনে না করি, যদি না তাকে জীবনে সম্পূর্ণ বাস্তবে পরিণত করতে পারি, যদি না তার দ্বারা আমাদের চিন্তায় ও কাজে সম্পূর্ণ রূপান্তর এসে থাকে।

কেবল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার স্বপ্ন দেখাই যথেষ্ট নয়, আমরা প্রচুর অর্থলাভের স্বপ্ন দেখতে পারি। কিন্তু আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, স্বপ্নে দেখা এই অর্থ দিয়ে বাস্তব জগতে খাবার কিনে তা দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা সম্ভব নয়।

আমরা বাতাস সৃষ্টি করি আর তার ফলস্বরূপ ঘূর্ণী ঝড়ের বেগ আমাদের সহ্য করতেই হবে। সব চাপা ঘূর্ণী ঝড় উঠে পড়বে। মনের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সব মন্দ ছবিগুলি আজ অথবা কাল ফুটে উঠবে। আমাদের 'বিপদের সামনা-সামনি'[৬]

৬ এই কথাটির সঙ্গে একটি গল্প জড়িত আছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিব্রাজন কালে, একদিন যখন স্বামীজী বারাণসীর মা দুর্গার মন্দির থেকে ফিরছেন একদল বাঁদর তাঁর পিছু নেয়। বাঁদরগুলি তাঁর (ক্ষ)তি করতে পারে এই ভয়ে তিনি প্রথমে ছুটে পালাচ্ছিলেন। কিন্তু বাঁদরগুলি তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়ল।

হতে হবে, বিপদের স্বরূপ কি তা দেখতে হবে, আর তারপর সর্ববস্তুতে ঈশ্বর দর্শন করতে হবে। তাঁর মধ্যেই এই সব মায়ার খেলা চলেছে, তাঁকেই দৃষ্টির অগোচর রেখে। মায়ার ভেতর দিয়েই আমাদের দৃষ্টির প্রসার ঘটাতে হবে। আমাদের অধ্যাত্ম সাধন, জীবনের কর্তব্য পালন যার অঙ্গ, তাই দিয়ে আমরা এক্স-রের মতো সূক্ষ্ম এক রকম মানসিক দৃষ্টির অধিকারী হতে পারি, তার সাহায্যে জগতের বৈচিত্র্য যেমন দেখতে পাই, তেমনি যে সত্য এই বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে তাকেও দেখতে পাই।

এ এক কঠিন দীর্ঘ সংগ্রাম, যা অন্তহীন বলে মনে হয়। আমরা যতই অগ্রসর হই, সংগ্রাম ততই সূক্ষ্মতর ও তীব্রতর রূপ ধারণ করে। আর যে নির্মম আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হয়, তাতে অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়গুলি প্রকাশ পায়—যাদের আমরা সাধারণত বড় বড় আড়ম্বরপূর্ণ নাম দিয়ে থাকি। আমাদের তথাকথিত নিঃস্বার্থ সম্পর্ক ও মানবীয় অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতাসমূহ মোটামুটি জীবাত্মার নিম্নস্তরে প্রতিষ্ঠিত। এমনকি আমাদের যে ঈশ্বর প্রীতি, দেবমানবদের প্রতি ভক্তি ও ভক্তভ্রাতাদের প্রতি ভালবাসা, তাও অনেকাংশে স্বার্থ-ভিত্তিক হয়ে থাকে। কিন্তু এ সবের মূলে, সব সময়েই একটি ঐশ্বরিক উপাদান বর্তমান থাকে, যা বহু ঈশ্বরেতর বস্তুর সঙ্গে মিশে থাকে। সোনাকে খাদ থেকে তফাত করতে হবে। এই হলো আধ্যাত্মিক জীবনের কাজ।

আমাদের নানারকম ভাবপ্রবণতার মধ্যে বিভিন্ন উপাদানগুলির এবং মন ও চেতনা-কেন্দ্রগুলির ওপর ভাবপ্রবণতার প্রতিক্রিয়াগুলিকেও লক্ষ্য করে আমরা প্রায়ই তাদের যথাযথ গুণাগুণ ও মূল্য নির্ধারণ করতে পারি। উচ্চতর চেতনা-কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত অনুভূতিসকলও নিম্নতর চিন্তাস্তরের সংযোগে আসতে পারে, এমনকি নিকৃষ্ট ধরনের আসক্তিতে পর্যবসিত হতে পারে। অতএব লোকের সঙ্গে মেলামেশার সময়ে আমাদের অবশ্যই সদা সতর্ক থাকতে হবে। তোমরা জান, কোন পুরুষ বা নারীকে দেখে যেমন মনে হয়, সব সময়ে তারা তেমন হয় না। আমরা নিজেদের ও অন্যের সম্বন্ধে যত বেশি খুঁটিয়ে দেখব, ততই বিষয়টি উপলব্ধি করব, এতে কখনো কখনো কষ্টও পাব।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমরা যখন নিজেদের বিচার

---

হঠাৎ তিনি এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর ডাক শুনতে পেলেন, তিনি বললেন, 'থাম, সব সময়ে বিপদের সামনা-সামনি হও।' স্বামীজী যেই ফিরে দাঁড়ালেন অমনি ভয় চলে গেল( আর তাঁকে (খে দাঁড়াতে দেখে বাঁদরগুলি পালাল। বহু বছর পরে, নিউ ইয়র্ক শহরে একটি বক্তৃ(তা দেবার সময় এই ঘটনাটি উল্লেখ করে গল্পের নীতিটুকুর দিকে নির্দেশ করে বলেন, 'সমস্ত জীবনের (( ত্রেই শি(। হলো ভীষণের সামনাসামনি হও, খুব সাহসের সঙ্গে। বিপদ দেখে পালানো বন্ধ করলে, বাঁদরদের মতো বিপদও পিছু হটে যাবে। (C.W., Kolkata : Advaita Ashrama. 1970. Vol. I. pp. 338-339)

করি তখন আমাদের দুর্বলতম বৈশিষ্ট্যকেই ভিত্তি করেই তা করা উচিৎ, সবলতমটিকে নয়। ঠিক যেমন একটি শৃঙ্খলের শক্তি নির্ভর করে তার দুর্বলতম আংটাটির ওপর, তেমনি আমাদের দুর্বলতাই নির্দেশ করে দেয় আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি, আমাদের সুখ ও দুঃখ। আমরা যেন আমাদের বিশিষ্ট গুণগুলির ওপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন না করি, অথবা গর্ব অনুভব না করি। এই কারণেই আমাদের নানা অসুবিধায় পড়তে হয়।

অনিশ্চিয়তার মধ্যে পড়লেও, আমরা যেন সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি। যখন মন্দের প্রতিপত্তি অতি প্রবল হয়, তখন তার কিছুটা শক্তিক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের সুদিন শীঘ্রই আসছে জেনে আমরা যেন আমাদের সংসার জীবনের নিত্য কর্তব্য পালন, আর অধ্যাত্ম জীবনের সাধন করে চলি। ঈশ্বরের যে করুণা আমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমরা যেন করি, আর আমাদের জীবনে কিছু সুস্থিত ও স্থায়ী বস্তু যেন লাভ করতে চেষ্টা করি, যাকে যখন আমরা ঈশ্বরের করুণা থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হয়েছি বলে মনে করব, তখনও ধরে থাকতে পারি । এই সাংসারিক জগতে নিরাপত্তা ও শান্তি খুঁজতে যেও না। এ সংসার সদা পরিবর্তনশীল। এখানে সুখ খুঁজলে, দুঃখও তোমাকে পেতে হবে, তাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

সত্য কথা বলতে গেলে, ভাবপ্রবণতা আমাদের আত্ম-বিকাশের পক্ষে যতই অপরিহার্য হোক না কেন, জীবনে ভাবপ্রবণতার স্তরে কিন্তু কোন নিরাপত্তা নেই। আমাদের অনুভূতি যেন অবশ্যই ঈশ্বর-চেতনা ভিত্তিক হয় এবং তার সঙ্গে যুক্তও থাকে। একমাত্র তবেই আমরা প্রকৃত স্থৈর্য লাভ করতে ও ভয়শূন্য হতে পারি। অবশ্য এই আদর্শে পৌঁছবার একমাত্র উপায় হলো, বহু ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভেতর দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া।

## আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়া যায় কিভাবে?

আমাদের প্রত্যেককেই উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে যেতেই হবে। এই সব পরিবর্তনে আমাদের যেন এই বোধ আসে যে, আমরা যতক্ষণ না গুণাতীত স্তরে পৌঁছচ্ছি ও জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করছি, ততক্ষণ উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে ওঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তোমার অধ্যাত্ম সাধনা নিরবচ্ছিন্নভাবে, নিয়মিতভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে চালিয়ে যাও, এমনকি তুমি এর জন্য কোন উৎসাহ বোধ না করলেও। মধ্যপথে সাধনা বন্ধ করলে তোমার সমস্যার সমাধান হবে না। মাঝে মাঝে বন্ধ রাখলে সাধনার

অগ্রগতি ব্যাহত হয় মাত্র। তুমি ভাল মেজাজে থাক আর না থাক, সকালে ও সন্ধ্যায় অন্তত এক ঘণ্টা করে সময় ধ্যানে ও প্রার্থনায় কাটাও। তোমার আধ্যাত্মিক প্রবাহকে অবশ্যই চালিত রাখতে হবে। ইচ্ছা প্রয়োগের সাহায্যেই এটি পারা যায়, কিন্তু তাই নয়, এটা 'অবশ্যই' পারতে হবে। সাধককে প্রতিহত করতে হবে, আবার জিদও ধরতে হবে ঃ কিছুদিনের জন্য সাধনা বন্ধ করার আন্তরিক আবেগকে প্রতিহত করতে হবে, আর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা অব্যাহত রাখার জিদও ধরতে হবে। প্রতিক্রিয়া ও বাধাগুলি আমাদের ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা হিসাবে এসে থাকে। সেগুলিকে অতিক্রম করেই আমরা প্রভূত মনোবল লাভ করে থাকি।

আমাদের উপলব্ধি না হলেও প্রভুর কৃপা আমাদের ওপর রয়েছে। প্রভুর কাছে আমাদের প্রার্থনা জানানো উচিত, তিনি যেন আমাদের সব রকম চেষ্টায় ও সংগ্রামে আমাদের রক্ষা করেন ও পথের নির্দেশ দেন ও তাঁর কাছে, আরো কাছে নিয়ে যান। প্রার্থনা এক গুরুত্বপূর্ণ সহায়। যখন তুমি নিয়মমতো ধ্যান করতে পার না, তখন প্রার্থনা করতে পার। এতে অন্তরে প্রভূত সান্ত্বনা পাওয়া যায় ও আমাদের বিপদের আশু উপশম দেখা যায়। ছোট খাট ভ্রান্তিতে ও পতনে উদ্বিগ্ন না হয়ে সাধকের উচিত ঈশ্বরকেই আপন সত্তার কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়া। এই রকম ভক্ত মানবাত্মার কাছে ব্যর্থতা হয়ে ওঠে সাফল্যের সোপান। তারা বহু পরীক্ষার ভেতর দিয়ে গিয়ে শেষে জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসে।

আমরা যেন ঈশ্বরের ওপর আমাদের আস্থাকে গভীরতর করার চেষ্টাও চালিয়ে যাই, শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সঙ্গতভাবেই বলতেন, "আমরা ঈশ্বরের দিকে এক পা এগিয়ে গেলে তিনি আমাদের দিকে দশ পা এগিয়ে আসেন। যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ির কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না, চুষি ফেলে চিৎকার করে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে সুড়সুড় করে এসে ছেলেকে কোলে নেয়।"[৭] ঠিক এই রকমই হয়ে থাকে ঈশ্বর-ভক্তের ক্ষেত্রে, যখন তারা দুর্বল ও মানবীয় উপায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে চায়।

কখনো কখনো তুমি অবসাদগ্রস্ত বোধ করতে পার। এমন অবস্থাকে এড়ানো যায় না। এমন অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে আন্তরিক যোগ সাধনের চেষ্টা করলে অবসাদগ্রস্ত মেজাজের পরিবর্তে এক ঊর্ধ্বমুখী মনোভাব দেখা দেবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আন্তরিক যোগসূত্রটি রক্ষা করার জন্য সর্বদা তোমার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা উচিত। মেজাজের স্বাভাবিক ওঠা নামা হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা যদি অনন্তের সঙ্গে সুর বেঁধে রাখতে চেষ্টা করি, ঊর্ধ্বমুখী মনোভাব কিছুটা সব সময়ে আমাদের থাকবে।

---

৭ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১০০, ২১১

কখনো কখনো এ মনোভাব লুপ্ত হয়েছে বলে মনে হলেও, হতাশ হয়ো না। শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে নিজেকে উচ্চতর চেতনা-কেন্দ্রে তুলে আবার যোগসূত্র স্থাপন কর, তখন সব কিছুই ঠিক মতো চলবে।

কখনো কখনো অবচেতন বা অচেতন স্তরের গুপ্ত অতীত স্মৃতি চেতন মনে উঠে এসে মানসিক, এমনকি শারীরিক বিপর্যয় ঘটায়। এ খুবই পীড়াদায়ক ও বিরক্তিকর। তবু আমাদের বেসামাল হয়ে পড়লে চলবে না। আমরা সাক্ষীর মনোভাব নিয়ে, যেমন আসে তেমনভাবেই এগুলিকে অবশ্য গ্রহণ করতে হবে। আমাদের উচিত এগুলির মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করার জন্য প্রয়াসী হওয়া, সেই শাশ্বত মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে সব সংবেদন, সব কম্পন, সব চিন্তন অভিব্যক্ত হয়, তাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা। আর তখনই ঈশ্বর সত্তা প্রাথমিক ভাবে সত্য বলে প্রতিভাত হন এবং সমস্ত রূপের জগৎ ছায়া বলে মনে হয় ও তাদের আকর্ষণ ও মনোহারিত্ব হারায়। এরূপ হলে মানসিক ও শারীর-বৃত্তীয় সমন্বয় ফিরে আসবে। যদি তুমি দেখ যে, তোমার মস্তিষ্ক ঘুলিয়ে যাচ্ছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর ও তাঁর ধ্যান কর, অনুভব করতে চেষ্টা কর যে তোমার অন্তরস্থ সদাত্মা যেন ঈশ্বরের একটি স্ফুলিঙ্গ বিশেষ, অনন্ত জ্যোতিঃ-সমুদ্রের অংশবিশেষ; তখনই ঊর্ধ্বমুখী মন আবার ফিরে আসবে।

সব অবস্থাতেই আমাদের উচিত ঈশ্বরকে ধরে থাকতে চেষ্টা করা। মেজাজ হতাশাগ্রস্ত হলে *জপ* প্রভূত সাহায্য করে। নিজের শ্রুতিগোচর হয় এমনভাবে পবিত্র নাম জপ করতে করতে সাধক প্রভূত তৃপ্তি লাভ করে। তুমি যখন অন্তরে শূন্যতা ও অস্থিরতা বোধ করবে, তখন তুমি আপন মনে গুন্‌গুন্ করে জপ করতে পার, আর সেই সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা করতে চেষ্টা কর। ঈশ্বর-উপলব্ধির আনন্দ না পাওয়া গেলেও তাঁর প্রেমাস্পদের—আত্মার যিনি আত্মা তাঁর—চিন্তা করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট হতে হবে।

স্থূল ও সূক্ষ্ম স্তরে এই সব সংগ্রামের সময় আমাদের উচিত যথাসম্ভব পবিত্র চিন্তা নিয়ে থাকা, আর এইভাবে অপবিত্র চিন্তাকে দূর করে দেওয়া। কিন্তু কখনো কখনো আমাদের কল্পনা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর প্রতিরোধের চেষ্টা সত্ত্বেও, অপবিত্র ছবিগুলি খুবই স্পষ্ট আকার নিতে থাকে। এই রকম ক্ষেত্রে, পবিত্র মন্ত্র জপের ও পবিত্র রূপ-দর্শন-প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উচিত অশুভ চিন্তাগুলির প্রতি সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা হয়ে থাকা এবং সেগুলি থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে রাখা। বিস্মৃতির মুহূর্তে আমরা হয়তো ঐ অশুভ চিন্তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তে পারি এবং বাস্তবিকভাবে কোন মন্দ কাজ না করেও শরীরে ও মনে সেগুলির প্রভাব

বোধ করতে পারি। কিন্তু আমরা যত বেশি সতর্ক হয়ে ঐগুলি থেকে নিজেদের বিবিক্তবোধ জাগ্রত করতে থাকব, সেগুলি আমাদের সামনে হাজির হলেও তাদের আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারব।

যখন আমরা 'ব্যক্তি'ভাবে থাকি ও বিভিন্ন মানবিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসতে আগ্রহী হই, তখন ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে বিরাট অবলম্বনস্বরূপ হন। সমুদ্র (তরঙ্গ ও বুদ্বুদের তুলনায় বেশি বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও) যখন বিমূর্ত ভাবের বিষয় হয়ে পড়ে, বুদ্বুদ তখন তরঙ্গের কাছ থেকে প্রভূত সহায়তা পায়। তরঙ্গের সংস্পর্শে এসে বুদ্বুদ সমুদ্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে আবার সচেতন হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমরা যখন 'নৈর্ব্যক্তিক'ভাবে থাকি, বা আমাদের ইষ্ট দেবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারি না, আমরা এই সাক্ষীর মনোভাব অভ্যাস করতে পারি।

যেসব লোক জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়, তারা নিজেদের দুর্বল ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অযোগ্য করে ফেলে। যারা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে দুঃখ কষ্টের সামনা-সামনি হবার পথ বেছে নেয়, তারা অন্তরে প্রভূত শক্তি অনুভব করে। যদি তুমি সরাসরি দিব্যপ্রবাহের সংস্পর্শে এসে থাক, আর ভক্তির পাল উঠিয়ে থাক, তবে ঈশ্বরের কৃপা-বাতাস নিশ্চয়ই তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সংসারে যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী সেই সব ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও। এ সংসার আসলে এক শিক্ষণ ক্ষেত্র, আমরা যা প্রায়ই ভুল করে ভেবে থাকি সেই প্রমোদ-উদ্যান নয়।

## সংগ্রামে নানা হাতিয়ার

আমাদের অন্তরে যা সব ঘটছে, যথার্থ অন্তর্মুখী মনে সব সময়ে সেগুলি উদ্ভাসিত হয়। আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে, আর যেসব চিন্তা আমাদের মনে উঠছে বা উঠতে চাইছে তার প্রত্যেকটির সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত থাকতে হবে। নিজ মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ না লাভ করে আমরা এগুতে পারি না, আর আপন মনে কি ঘটছে তা না জেনে, আমরা কখনোই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। অতএব অধ্যাত্ম জীবনে এইটিই হলো একেবারে প্রথম ধাপগুলির একটি।

বর্তমানে আমাদের মনের একাংশ চায়, ইন্দ্রিয় ভোগ ও বাসনা চরিতার্থ করতে, এদিকে অন্য অংশ আর এগুলির প্রতি লালায়িত নয়। যেসব বিষয় তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রলুব্ধ করে অথবা তোমার পূর্ব সম্পর্কাদি জাগিয়ে তোলে, তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে তোল। যে মুহূর্তে সমস্ত জাগতিক বিষয়ভোগের প্রতি তোমার প্রকৃত বৈরাগ্য আসবে, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তখন তুমি এমন

কিছু আস্বাদন করবে, যা এই সব তথাকথিত ভোগ সুখের থেকে বেশি মধুর, যার কাছে এগুলি একেবারেই আলুনী। যদি তুমি মনে কর যে কোন না কোন রকমের প্রলোভন তোমার পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা করছে, ঐ সব কুচিন্তার অশুভ প্রভাবের কথা চিন্তা কর, অথবা যিনি সমগ্র পবিত্রতা ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি এমন কোন মহান আত্মার জীবন বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা কর। 'আমি প্রভুর ভক্ত, আমি অধ্যাত্ম জীবন যাপন করতে চাই, অতএব আমার হৃদয়-দৌর্বল্য মোটেই শোভা পায় না,' এইরকম সুস্থ অহমিকা আমাদের সহায়ক হয়ে থাকে। বাসনা-কামনার উত্তেজনার কাছে নতি স্বীকার করা সব সময়েই দুর্বলতা ও কাপুরুষতার চিহ্ন। যদি তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পার, তবে তোমারই কোন সঙ্গী-সাধকের কাছে যাও, মনটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দাও, তাদের সঙ্গে কোন না কোন পবিত্র প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা কর। একলা থেকে বাসনার উপকরণটি নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করার সুযোগ নেবে না। এতে ব্যাপারটি আরো খারাপ হয়ে পড়ে, আর তখন তোমার পদস্খলন ও দুর্দশা প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ভাল লাগুক আর না লাগুক, যদি পার তো জোর করে মনের উন্নতি-সাধক বিষয়ে পাঠ ও আলোচনায় নিজেকে লাগিয়ে রাখ।

প্রথম প্রথম ধ্যান ঠিকমতো হলে সমস্ত অবচেতন মন আলোড়িত হয়, আর আপনা থেকেই ভীতিপ্রদ জিনিসগুলি সুপ্ত অবস্থা থেকে জেগে ওঠে। অতএব সাধকের অবশ্যই এতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। অন্তঃপ্রবিষ্ট মন ভয়ানকভাবে সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, আর দেখা যায় যেসব অভিজ্ঞতা মনে কোন রেখাপাত করেনি বলে মনে হয়েছিল, সেগুলিও গভীর ক্ষত ও রেখা রেখে গেছে। মনের ওপর এ রকম সমস্ত ছাপগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে হবে। আর সেজন্য সাহসের সঙ্গে সেগুলির মুখোমুখি হতেই হবে।

একই সঙ্গে তোমার নৈতিক সংগঠনকে অবশ্যই শক্তিশালী করে তুলতে হবে। সাক্ষীর মনোভাব গড়ে তুলতে চেষ্টা কর। তোমার বাসনা-কামনার সঙ্গে ও বহির্জগতের ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেকে আর জড়িও না। তোমার মন পাগলের মতো ঐ দিকে ছুটলেও, তুমি তার দর্শকমাত্র হও, আর নিজেকে তা থেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা কর। তুমি চিরকালই তোমার সব মানসিক অবস্থার সাক্ষী। তোমার চিন্তারাশির সঙ্গে নিজেকে কখনই অভিন্ন জ্ঞান করবে না। প্রথম প্রথম এ কাজ খুবই কঠিন বলে মনে হবে, কিন্তু একবার ধরলে ক্রমশ সবই স্বাভাবিক ও কম আয়াসসাধ্য বোধ হবে।

জপ খুবই সহায়ক, তেমনি কোন পবিত্র ব্যক্তিত্বের ধ্যানও। রূপ হলো অরূপের,

সর্বব্যাপী চৈতন্যের দ্বারস্বরূপ। দিব্যরূপের কাছে প্রার্থনা কর, আর চেষ্টা কর ঐ রূপ দর্শনের। পরে যদি কোন অবাঞ্ছিত রূপ মনে আসে, তুমি তাকে তোমার ইষ্টমূর্তির সাহায্যে অপসারিত করে দিতে পার বা ইষ্টমূর্তিতে নিমজ্জিত করতে পার।

নিজে বেদান্তের অনুপ্রেরণাদায়ী শিক্ষা ভালভাবে গ্রহণ করতে কখনো ভুলো না। এ শিক্ষা খুবই সহায়ক। প্রথমেই নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা চিন্তা কর, আর তারপর চিন্তা কর অন্য সব রূপের, এমনকি যেগুলি তোমার অসুবিধার সৃষ্টি করে। আমরা যদি স্বভাবত শুদ্ধ ও পবিত্র হই, তবে এই জীবনেই, এভাব আমাদের কেবল মনে নয়, দেহেও অবশ্য প্রকট করতে হবে। এতেই আমাদের সকল অধ্যাত্ম সংগ্রামের পরীক্ষা নিহিত রয়েছে। আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি চাই শারীরিক ও মানসিক উভয় জীবনেই। আমাদের অধ্যাত্ম সাধনা যেন বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধনে অবশ্যই সাহায্য করে। অধ্যাত্মজীবনের অর্থ হলো বিপুল স্থৈর্য ও লক্ষ্যে একনিষ্ঠা। একমাত্র এইগুলির সাহায্যেই সাফল্য অর্জন করা যায়।

কোন অবস্থাতেই তোমার মেজাজের পরিবর্তনে বা তোমার মনে অন্যায় চিন্তার উদ্রেকে, তোমার দুঃখিত বা বিষাদগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। এগুলি স্বাভাবিক। এখন, একনিষ্ঠ সাধনার মাধ্যমে তোমাকে উচ্চতর অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতাগুলি আপন করে নিতে হবে। আমাদের অতি-চেতনাকে আনতেই হবে চেতন স্তরে, উপলব্ধি করতে হবে বহুত্বের মধ্যে একত্বকে, বিমূর্ত করতে হবে দিব্যজ্ঞান, পবিত্রতা ও একত্বকে—মানসিক ও শারীরিক স্তরে। আমরা যদি আধ্যাত্মিক পথে স্থির ভাবে, ঈশ্বর নির্ভরশীল হয়ে, এগিয়ে চলি, তবে ঐ অবস্থায় পৌঁছনো কাল-সাপেক্ষ মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট্ট শক্তিশালী কবিতাটি স্মরণ কর ঃ

**সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ**
**যদি বা আকাশ হের বিষণ্ণ গম্ভীর,**
**ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়,**
**জয় তব জেনো সুনিশ্চয়।**
**শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে তার পাছে পাছে,**
**ঢেউ পড়ে, ওঠে পুন তারি সাথে সাথে;**
**আলো ছায়া আগাইয়া দেয় পরস্পরে;**
**হও তবে ধীর, স্থির, বীর।**[৮]

---

৮ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৯ (কবিতাটির নাম ঃ *ধৈর্য ধর কিছুকাল, হে বীর হৃদয়—Hold on yet awhile. Brave Heart* : খেতড়ি-মহারাজকে লিখিত), অনুবাদক ঃ ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য।

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

# আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতা

## এ কালের সংশয়

যখন আমরা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা চিন্তা করি, প্রশ্ন জাগে ঃ এই সব অভিজ্ঞতা কি সত্য? নিউ ইয়র্ক শহরে আমি এক ধর্ম যাজককে জানতাম। এক দিন তিনি যখন তাঁর কন্যাকে কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ে বললেন, সে আশ্চর্য হয়ে পিতাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'বাবা, ওটি কি বাস্তব, অথবা আপনি কেবল ওটা প্রচারই করে থাকেন?' আমরা এত রকমের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা শুনি আর সব সময়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবি ঃ ওগুলি কি সত্য?

অনেক সংশয়বাদী আছে যারা সব সময়ে প্রত্যেকটি বিষয়কে তর্ক করে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। বাস্তববাদীও আছে যারা বিশ্বাস করে এই সব অভিজ্ঞতার উৎপত্তি অতি উত্তেজিত স্নায়ুগুলি থেকে। উইলিয়াম জেম্‌স (William James) এই সব লোকেদের নামকরণ করেছিলেন ঃ 'চিকিৎসাযোগ্য জড়বাদী'। এদের মধ্যে একজন এক মহান মরমিয়া সাধক সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, 'তাঁর দর্শনাদি হয়ে থাকে কারণ তিনি যৌন তৎপরতাহীন', অন্য একজনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়েছে, কারণ 'তিনি মৃগী রোগাক্রান্ত'। তাঁর মতে স্নায়বিক রোগাক্রান্তরাই নিজেকে জাগতিক জীবনধারা থেকে সরিয়ে নিয়ে চেতনার এক ভিন্ন স্তরে পৌঁছতে চায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নানা কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা করে চলেছেন, অনেকের ধারণা হয়েছিল যে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে। তাঁর অন্যতম গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয়, লোকমতের কথা তিনি তাঁকে জানান। নিজে একজন উন্নত আধ্যাত্মিক সাধিকা হওয়ায়, ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন ঃ 'দেখ, এ জগতে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ের জন্য পাগল। এদের সঙ্গে তোমার একমাত্র পার্থক্য এই যে তুমি ঈশ্বরের জন্য পাগল, অন্যেরা জাগতিক বস্তুর জন্য।'[১]

একজন মৃগী রোগী আর প্রকৃত মরমী সাধক যে নতুন কিছুর দর্শনজনিত শক্তি. দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছে—এদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক উইলিয়াম

১ Swami Saradananda, *Sri Ramakrishna the Great Master*, Madras : Sri Ramakrishna Math, 1970, p. 186

জেম্‌স (William James) তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, সাধারণত আমরা যে স্তরে থাকতে অভ্যস্ত, তার থেকে গভীরতর চেতনা-স্তর থেকে। তিনি বলেন যে, যোগাভ্যাসের দ্বারা মরমী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব।[২] যোগের সাহায্যে আমাদের চেতন-মনকে অতিচেতন মনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। *যোগী* স্থূল জীবনের বাধাসমূহকে অতিক্রম করতে শেখে ও এমন অবস্থায় প্রবেশ করে যেখানে সে পরম চৈতন্যের সামনা-সামনি হয়।

ধর্মীয় আদর্শগুলির প্রতি বৈজ্ঞানিক বিরোধিতা কমে আসছে। বর্তমানের বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার একটি স্তর রয়েছে যার পরিমাপ সাধারণ পরীক্ষাগারের পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করছে ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার পারে যে সত্য রয়েছে, তাকে জানার উপায় অনুসন্ধান করছে। জগতের মহান মরমী সাধকদের ক্রিয়া-কর্ম জানার জন্য নতুন করে আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। পৃথিবীর নানা ধর্মের মরমী সাধকদের অভিজ্ঞতাগুলির সত্যতা এত সুন্দরভাবে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে যে সেগুলিকে ভ্রান্ত কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যুগ যুগ ধরে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বহু মহান মরমী সাধকের আবির্ভাব হয়ে আসছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী। ঐতিহ্যবাহী ধর্মগুলি কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালনেই সন্তুষ্ট। খ্রীস্টান ধর্মের প্রাথমিক অনুষ্ঠান হলো পবিত্র জল দিয়ে অভিসিঞ্চন করা। এখন, অভিসিঞ্চন সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব রয়েছে—একটি সম্প্রদায় মনে করে যে, জলে সম্পূর্ণ ডুব না দিলে মানবের মুক্তি নেই। এক সম্প্রদায় মনে করে ঠিক ততটাই আন্তরিক পবিত্রতার ভাব পাওয়া যেতে পারে যদি ঐ পবিত্র জল দিয়ে কপালে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দেওয়া যায়। আরো অন্য সম্প্রদায় আছে যারা অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের ওপর জোর দেয়, আর বলে যে বাহ্য জল সিঞ্চনের কোন প্রয়োজন নেই। চীন দেশে একবার এক ধর্মপ্রচার অনুষ্ঠান চলছিল, সেখানে এক ব্যাপটিষ্ট ভাষণ দিয়েছিলেন, তারপর একজন মেথডিস্ট এবং শেষে একজন ইংরেজ কোয়েকার। এক চৈনিক অন্য একজনকে বললেন ঃ 'এই খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একটি ধর্ম শেখাচ্ছেন। তুমি কি বলতে পার এদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়?' বন্ধুটি উত্তরে বলল ঃ 'এক সম্প্রদায় চাইছেন অবগাহন স্নান, আর এক সম্প্রদায় চাইছেন অল্পজলে স্নান, আরো অন্য এক সম্প্রদায় কোন রকম স্নানের প্রয়োজন বোধ করছেন না—এছাড়া আমি এদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখছি না।'

---

২ William James, Varieties of Religious Experience, New York : The Modern Library, Random House, pp. 72, 391, 418, 475

ধর্মের বাহ্য চিহ্নগুলির মধ্যে যে সামান্য ফারাক, তার ওপর এত গুরুত্ব দেওয়াতেই গোঁড়ামির সৃষ্টি হয় এবং তা থেকেই কেবল পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। সম্প্রদায়গুলির দিকে না তাকিয়ে আসুন আমরা প্রকৃত মরমী (অতীন্দ্রিয়) সাধকদের দিকে তাকাই—যাঁরা অধ্যাত্ম সাধনা করে পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, আর জীবনে তা কাজে লাগিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ

> যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান; যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে। যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।[৩]

## মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন কলেজের ছাত্র তখন ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তিনি কয়েকজন ধর্মনেতার কাছে গিয়েছিলেন ও প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন—তিনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্য সত্যই লাভ করেছেন কি না। শেষে নিয়তির নির্দেশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মতো বর্তমান যুগের মহান মরমী সাধক ও দিব্যগুরুর কাছে এসে পড়লেন। ঐ কলেজে পড়া যুবকটি ঐ ঋষিকে স্পষ্টা-স্পষ্টি যে প্রথম প্রশ্নটি করল, সেটি হলো, 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত না করে ও প্রতিটি কথায় সত্যের তেজ ঝঙ্কৃত করে ঋষি ঐ যুবককে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে যেমন দেখছি ঠিক তেমনিই তাঁকে দেখে থাকি, কেবল আরো স্পষ্টতর ভাবে।' নরেন্দ্রের দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় প্রভু মনস্থ করলেন যে প্রচণ্ড অধ্যাত্ম ক্ষুধায় দগ্ধ এই অসহিষ্ণু যুবকটিকে সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কিঞ্চিৎ আস্বাদ পেতে সাহায্য করবেন। প্রভুর একটি অতীন্দ্রিয় স্পর্শে, ঐ শিষ্যটি তখনই এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়ল ঃ সে দেখল যে, সব আসবাব সমেত ঘরটি তার চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে—সে নিজেও তাতে লীন হতে চলেছে। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত না থাকায় সে চিৎকার করে বলে উঠল ঃ 'ও! আমাকে আপনি এ কী করছেন, বাড়িতে যে আমার বাপ মা আছেন!' একটু হেসে প্রভু তখনই তাকে স্বাভাবিক চেতনায় ফিরিয়ে আনলেন।[৪] নরেন্দ্র শীঘ্রই শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে অধ্যাত্ম সাধনা অভ্যাস করতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে অসংখ্য দর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভে তৃপ্ত হলেন; সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, 'নির্বিকল্প সমাধি'র অভিজ্ঞতাও তাঁর হলো। অনেক বছর পরে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে তাঁর অনুগামীদের তিনি বলেছিলেন ঃ

---

৩ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৪০২

৪ দ্রঃ Eastern and Western Disciples, *The Life of Sw. Vivekananda*, pp. 47-48

'আত্মার অনুভূতি না করে, আত্মা অথবা ঈশ্বর দর্শন না করে *ঈশ্বর আছেন* বলার কি অধিকার মানুষের আছে? যদি ঈশ্বর থাকেন, তাঁকে দর্শন করতে হবে; যদি আত্মা বলে কিছু থাকে, তা উপলব্ধি করতে হবে। নতুবা বিশ্বাস না করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক ভাল। এক দিকে আজকালকার *বিদ্বান* বলে পরিচিত ব্যক্তিদের মনোভাব এই যে, ধর্ম, দর্শন ও পরমপুরুষের অনুসন্ধান—সবই নিষ্ফল। অপর দিকে যাঁরা অর্ধশিক্ষিত, তাঁদের মনের ভাব এইরূপ বোধ হয় যে, ধর্ম-দর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নেই, তবে ঐগুলির এই মাত্র উপযোগিতা যে, এগুলি জগতের মঙ্গল-সাধনের বলিষ্ঠ প্রেরণাশক্তি—যদি মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে সৎ ও নীতিপরায়ণ হতে পারে এবং কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক হয়। যাদের এইরূপ ভাব, তাদেরকে দোষ দিতে পারি না; কারণ তারা ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু শিক্ষা পায়, তা অসংলগ্ন অন্তঃসারশূন্য প্রলাপ-বাক্যের মতো অনন্ত শব্দসমষ্টিতে বিশ্বাস মাত্র। তাদেরকে শব্দের উপরে বিশ্বাস করে থাকতে বলা হয়। তারা কি এরূপ বিশ্বাস করতে পারে? যদি পারত, তা হলে মানব-প্রকৃতির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকত না। মানুষ সত্য চায়, স্বয়ং সত্য অনুভব করতে চায়; সত্যকে ধারণা করতে, সত্যকে সাক্ষাৎ করতে, অন্তরের অন্তরে অনুভব করতে চায়। 'কেবল তখনই সকল সন্দেহ চলে যায়, সব তমোজাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, সকল বক্রতা সরল হয়ে যায়'। বেদ এইরূপ ঘোষণা করে—

'হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধাম-নিবাসিগণ, শ্রবণ কর—আমি এই অজ্ঞানান্ধকার হতে আলোকে যাবার পথ পেয়েছি, যিনি সকল তমসার পারে, তাঁকে জানতে পারলেই সেখানে যাওয়া যায়—মুক্তির আর কোন উপায় নেই।'[৫]

## পরোক্ষ জ্ঞান যথেষ্ট নয়

আমরা স্পষ্টভাবে সত্যের দর্শন পাই না, কারণ আমাদের মন অত্যন্ত অশুদ্ধ। আমাদের অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে মনের ময়লা দূর করতে। অন্যে কেবল সেই মতো প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দিতে পারে। কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে।

আমাদের একটি মনো-দূরবীক্ষণ যন্ত্র অবশ্যই প্রয়োজন। এ সামর্থ্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। এ সামর্থ্য বাইরে থেকে আসে না, আমাদের স্বভাবের ওপর চাপিয়েও দেওয়া যায় না। কিন্তু এটি এমন একটা বস্তু যাকে আমরা বহুবছর ধরে উপেক্ষা করেছি। আমাদের সাধারণ মন যেমন শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হতে থাকে,

---

৫ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা* ১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩-২১৪

তখনই আমরা আবিষ্কার করতে থাকি তার অন্তরালে স্থিত সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম মনকে, যার নাম *বুদ্ধি* বা হৃদয়। এর উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন দৃষ্টি খুলে যায়। এই হলো *দিব্য দৃষ্টি*—যার কথা গীতার একাদশ অধ্যায়ে[৬] আছে। আধ্যাত্মিক জীবনের অর্থ এই দিব্যদৃষ্টির বিকাশসাধন।

আমাদের কখনও ভাবা উচিত নয় যে, আমরা সকলে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী, আর এই ইন্দ্রিয় দিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয় সে সবই সত্য ও চিরস্থায়ী। বিচার শক্তির প্রথম কাজ, জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ আমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয় যে, এ জগৎ সদা পরিবর্তনশীল, আর এখানে কোন স্থায়ী শান্তি নেই। বেতার যন্ত্রে অসংখ্য বৈদ্যুতিক তরঙ্গ এসে পড়ছে, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় সেগুলিকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। ঠিক তেমনি যে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তরঙ্গরাজি আত্মা বা ঈশ্বরের কাছ থেকে বেরিয়ে আসছে, আমাদের স্থূল-মন তাদের জানতে পারে না। কিন্তু এই মনই যত শুদ্ধ হয়, অন্তর্মুখী হয় ও একাগ্র হয়, তত আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত আরো আরো সূক্ষ্ম জগৎকে আবিষ্কার করতে থাকি।

কেবল পড়া, আলোচনা করা আর ভাল লাগাই যথেষ্ট নয়; যারা প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধনা অভ্যাস করতে পূর্ণ আগ্রহের সঙ্গে প্রস্তুত নয়, তারা বরং অন্য কোন বিষয়ের দিকে মনকে ফিরিয়ে নিক। তারা অধ্যাত্ম জীবনে কখনই অগ্রসর হতে পারবে না। মানুষের মন এতই ছোট যে একটি সুন্দর উচ্চভাব বা চিন্তা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তারা মনে করে তাদের বুঝি কোন মহান বা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু লাভ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন কি, আর কোথায় তার উৎস, সে বিষয়ে তাদের কোন ধারণাই নেই।

এক ধর্ম প্রচারকের এক ভাই ছিল চিকিৎসক। তারা দেখতে একেবারেই এক রকমের। একদিন এক বন্ধু তাদের একজনকে রাস্তায় থামিয়ে অভিনন্দন জানাল তার সুন্দর উপদেশবাণীগুলির সাফল্যের জন্য। সে উত্তরে বলল, 'যে প্রচার করে থাকে আমি সে নই, আমার কাজ সাধন করা!' ধর্ম প্রচার করা যথেষ্ট নয়। অধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া যথেষ্ট নয়। আমাদের অবশ্যই কিছু প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হবে। অনেকেই আধ্যাত্মিক সাধনার কথায় ভয় পায়, তবে অধ্যাত্ম জীবনের অর্থ কি, যদি না তা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অধ্যাত্ম সত্য অনুভূতির, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির যোগ্য করে তোলে? খ্রীস্টের বাণী, বুদ্ধের বাণী, কৃষ্ণের বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর অর্থ কি? সেগুলি আমাদের আপন উপলব্ধির পথ দেখিয়ে দেয়; কিন্তু আমরা যদি সত্য উপলব্ধি না করি তবে সেগুলি

---

৬ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* ১১/৮

আমাদের কাছে মূল্যহীন। আধ্যাত্মিক সাধনার ধারা বজায় না থাকায়, খ্রীস্টের বাণী পাশ্চাত্য দেশে এখন আর উপলব্ধি করা যায় না, কেবল শূন্য খোলটি পড়ে রয়েছে। একজন খ্রীস্টানকে অবশ্যই খ্রীস্ট-চেতনা লাভ করতে হবে, তবে সে খ্রীস্টকে বুঝতে পারবে। একজন বৌদ্ধকে বুদ্ধ-চেতনা লাভ করতে হবে, তবেই সে বুদ্ধকে বুঝবে।

## ধর্মের পরশপাথর

অধ্যাত্ম সাধনার গোড়ার দিকে আমরা আধ্যাত্মিক অনুভূতির কিছুই পাই না, কারণ এই সময়ে কেবল 'সাফাই'-এর কাজ চলতে থাকে, গাড়ি গাড়ি ময়লা ও আবর্জনা সরিয়ে সরিয়ে। মন খানিকটা শক্তিশালী হলেও অশুভ চিন্তা মনে আসে, কিন্তু তারা আমাদের ক্ষতি করতে পারে না ও সহজেই পরাজিত হয়। যদি একটা নৌকাতে অভিজ্ঞ কাণ্ডারী থাকে, তবে তা ডুবে যাবার ভয় না করে ঝড়ের মুখে এগিয়ে যেতে পারে। এই দৃশ্যমান জগৎ আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে না গেলে, বাসনা-কামনা, আসক্তি-বিদ্বেষের সূক্ষ্মরূপ কখনই নির্মূল হয় না।

ততদিন পর্যন্ত, মনে কামনার উদ্রেক হতে পারে, তবে সাধনার মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র সুদৃঢ় হলে, আমরা সেগুলিকে প্রতিরোধ করে দূর করে দিতে পারব। নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা অর্জন করাই আধ্যাত্মিক উন্নতির চিহ্ন। যতদিন না আমরা ঈশ্বর কৃপা অনুভব করতে পারছি, ততদিন আমাদের অবশ্যই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অধ্যাত্ম জীবনে পুরুষকার অপরিহার্য। প্রকৃত প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠায় আমরা যতদিন না পৌঁছব, ততদিন আমরা প্রকৃত আত্ম-সমর্পণের ভাব কখনই অর্জন করতে পারব না।

ঠিক ঠিক দর্শন লাভ কেবল তখনই হয়, যখন আমরা খুব শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান, বীর্যবান, পবিত্র শরীরের অধিকারী হই—যা এ রকম দর্শনের পরবর্তী প্রতিক্রিয়াগুলিকে যথার্থই সহ্য করতে পারবে; আর যখন আমরা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও অকামবিদ্ধ মন ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হই, তখনই অনুভব করি যে, আমরা শরীর নয়, মন নয়, নর-নারীও নয়, আমরা এসব থেকে স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সত্তাসমূহ।

প্রকৃত দর্শন, তা সাকার হলেও, সব সময়ে তা আধ্যাত্মিক উপাদান বিশিষ্ট হয়, আর তাতে ব্রহ্মের বা চরম সত্যের মহিমা প্রতিভাত হয়। আর মনে রেখো, উপলব্ধিহীন অদ্বৈতবাদী হওয়ার থেকে উপলব্ধিবান দ্বৈতবাদী হওয়া সব সময়ে ভাল। প্রকৃত সাকার রূপ দর্শন হলো আধ্যাত্মিকতার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে যাবার পথে একটি ধাপ, কিন্তু উপলব্ধিহীন অদ্বৈত তত্ত্ব তোমাকে কোন পথের নির্দেশ দেয় না। অদ্বৈতবাদীর নিরপেক্ষ সত্য বহু দূর, আর আমাদের আশু লক্ষ্য হতে পারে বড় জোর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পর্যন্ত, যে তত্ত্বে বলে আমরা সকলে এক

অনন্ত পূর্ণের বিভিন্ন অংশ। যদি আমাদের সকল ইন্দ্রিয় অবিকম্প স্থির হয়ে যায় ও সম্পূর্ণ সংযত হয়, আর মনও ঐ অবস্থায় পৌঁছয়, একমাত্র তখনই প্রকৃত দর্শন সম্ভব, নচেৎ নয়।

অতি উত্তপ্ত মস্তিষ্কের চিত্ত বিভ্রম আর প্রকৃত দর্শন লাভের মধ্যে অতি লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। এর একটি পরীক্ষা হলো, প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফলে আমরা আরো শুদ্ধ হই ও অধিকতর অনাসক্তি, পবিত্রতা ও একাগ্রতা লাভ করি; আমাদের শরণাগতির ভাব বৃদ্ধি পায় আর জীব-সত্তা ঈশ্বর-সত্তার সুরে অনুরণিত হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ 'ঈশ্বরের কৃপা বাতাস তো সব সময়ে বইছে। আমাদের কেবল পাল তুলে দিতে হবে।'[৭] ভক্ত যখন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর আভাস পায়, তখন সে বাতাস তপ্ত কি শীতল, আছে কি নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। সে বোঝে যে ঈশ্বরীয় শক্তির প্রবাহই তাকে নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

দর্শন সম্বন্ধে আর দুটি পরীক্ষা হলো ঃ আনন্দ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহাতীত হওয়া। প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে এক অনির্বচনীয় শান্তি, উল্লাস ও সাফল্যবোধ উদ্ভূত হয়। আমাদের অন্তরস্থ সত্তাটি তখন বোঝে যে সেটি সত্য, কারণ তা সঙ্গে নিয়ে চলে নিজের সম্বন্ধে সন্দেহাতীত জ্ঞান ও দৃঢ় প্রত্যয়। যারা সম্পূর্ণ শুদ্ধ, চরিত্রবান, সংযত জীবন যাপন করছে, তারা সহজে মিথ্যা দর্শনে দিগ্‌ভ্রষ্ট হয় না। প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নিজেই নিজের প্রমাণ।

যেমনই হোক, বহু অত্যুৎসাহী অধ্যাত্ম সাধক গোড়ায় গোড়ায় মিথ্যা আলোকে পথভ্রষ্ট হয়। তারা ঠিক পথ ধরে চলেছে কি না, কিভাবে তারা তা বুঝবে? বেদান্ত মতে আধ্যাত্মিকতার তিনটি পরশপাথর আছে। সেগুলি হলো, শ্রুতি, অনুভূতি আর যুক্তি। এই ভাবটি বোঝানো হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ অংশে ঃ *আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি ...*।[৮] —এই আত্মার বিষয় প্রথমে শুনতে হবে, পরে ধ্যান, মনন ও শেষে অনুভব করতে হবে। প্রথম মহান সহায় হলো শাস্ত্রাদির ও জ্ঞানী আচার্যের নির্দেশনা। কর্তব্য পালনের মতো শাস্ত্রাদি পাঠই যথেষ্ট নয়। সাধকের উচিত তাদের অন্তর্নিহিত অর্থবোধের জন্য গভীর চিন্তা করা ও সত্য উপলব্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় লাভের চেষ্টা করা। এ কথা সত্য যে, যে মুহূর্তে একজন ঠিক ঠিক উপযুক্ত শিষ্য যোগ্য আচার্যের কাছ থেকে উপদেশ পায়, সত্য তার কাছে চকিতে প্রতিভাত হয়। কিন্তু সাধককে অবশ্যই প্রথমে সুনিয়ন্ত্রিত নৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে সঠিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

---

৭ *Sayings of Sri Ramakrishna*, Madras, Sri Ramakrishna Math, 1975, p. 205

৮ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, ২/৪/৫ ও ৪/৫/৬

আধ্যাত্মিক জীবনে যে বিষয়ের ওপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা হলো—সাধকের সাক্ষাৎ সত্যানুভূতি। তথাকথিত অন্ধবিশ্বাস ধর্মজীবনের মাপকাঠি হতে পারে না। কোন মতে মত দেওয়াকেই ধর্ম বলা যায় না (যেমন পাশ্চাত্যবাসী বুঝে থাকে)। ধর্ম হলো অনুভূতি। সাধককে নিজ জীবনে ধর্মীয় সত্যকে যাচাই করে নিতে হবে, একবার নয় বার বার। সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতির স্বাদ একটু পেলেই শেষ হলো না; যদিও তা কিছু না পাওয়ার থেকে ভাল। আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি যেন শাস্ত্রসম্মত হয়।

অবশেষে শাস্ত্র ও অনুভূতি দুই-ই যুক্তিবিচারগ্রাহ্য হওয়া চাই। এতে শাস্ত্রসম্মত ধারণাগুলি যেমন আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে, তেমনি নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধিও বিস্তার লাভ করবে। আত্ম-সমীক্ষাই সব যুক্তি-বিচারের সেরা। এ সংসারে কি চিরস্থায়ী আর কি ক্ষণস্থায়ী সে বিষয়েও যুক্তি-বিচার চলতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অথবা সহজাত জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া শুষ্ক বুদ্ধিবাদ শেষ পর্যন্ত নাস্তিকতার পথে নিয়ে গিয়ে মানবের আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে পারে। যে লোক আত্মগর্বে নিজেকে জ্ঞানবান মনে করে তার ব্যক্তিগত জীবন অবশ্যই বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হয়।

এই ভাবে অধ্যাত্মজীবনে শাস্ত্র, অনুভূতি ও যুক্তি—এই ত্রিমুখী পরীক্ষা রয়েছে; এই পরীক্ষা সকল সাধকের সর্বস্তরে প্রয়োগ করতে হবে। যথার্থ উৎসাহী ও সতর্ক সাধক চতুর্দিকস্থ প্রত্যেকটি বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তাকে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে হয়। প্রত্যেকটি অধ্যাত্ম সাধককে অবশ্যই সদা পূর্ণজাগ্রত থাকতে হবে, আর হৃদয়ে বিচার-বহ্নি প্রজ্বলিত রাখতে হবে। কোন ঘটনা, কোন চিন্তা যেন তার নজর এড়িয়ে যেতে না পারে। এই রকম সাধকের কাছে সমগ্র বিশ্বই জ্ঞান আহরণের এক বিশাল গ্রন্থ।

## স্বপ্ন ও বাস্তবতা

স্বপ্ন কাকে বলে? একটি ছোট ছেলে যা স্বপ্ন দেখেছিল সে বিষয়ে মাকে বলে, মা তখন তাকে প্রশ্ন করল ঃ 'জনি, স্বপ্ন কি জিনিস?' ছেলেটি উত্তর দিল ঃ 'ঘুমন্ত অবস্থায় যে সব চলচ্চিত্র দেখা যায় তাই।' স্বপ্ন নানা রকমের ঃ কোন স্বপ্ন অর্থহীন, কোনটি আমাদের বাসনার প্রতিফলন, আবার কতকগুলি উচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্য-সম্পন্ন। কোন কোন স্বপ্ন অতীতের, এমনকি পূর্ব পূর্ব জীবনের ইঙ্গিত করে। স্বপ্নগুলিকে বিশ্লেষণ করলে, আমরা পাই স্বপ্নে দেখা কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কিছু ঘটনা আমাদের বর্তমান জীবনে ঘটে নাই। কোন কোন স্বপ্ন ভবিষ্যতের

ইঙ্গিত করে। ১৯৪০ খ্রীঃ আমি যখন সুইডেনে ছিলাম, একদিন এই বাহ্যজ্ঞান নিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গল, আমি যেন ঐ দেশ থেকে ২০০০ ফ্রাঙ্ক অন্যত্র সরিয়ে ফেলি। আমি সেই মতো কাজ করলাম। কয়েকদিন পরে এক আইন প্রণয়ন করা হলো—যে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার নিয়ম হিসাবে ঐ দেশ থেকে এককালীন সামান্য অর্থই বাইরে পাঠানো যেতে পারে। আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) স্পষ্ট স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, ঘাতকের হাতেই তাঁর মৃত্যু হবে, আর সে কথা অন্যের কাছে বলেওছিলেন।

কোন কোন স্বপ্ন আমাদের সংগুপ্ত বাসনা ও জটিল অবস্থাগুলি প্রকাশ করে দেয়। বহু স্বপ্ন প্রতীকস্বরূপ হয়ে থাকে। তাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হয়। ফ্রয়েড (Freud) এবং জঙ্ (Jung), বর্তমান যুগের দুই মহান মনোবিজ্ঞানী, স্বপ্নের ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করতেন, কারণ সেগুলি রোগীর মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। অবশ্য তাদের তাৎপর্য-বিশ্লেষণ সব সময়ে নির্ভুল হয় নি। বিশেষত ফ্রয়েড এইরূপ সংস্কারবদ্ধ ধারণা নিয়ে থাকতেন যে—সব স্বপ্নই অবদমিত যৌন-স্পৃহার অভিব্যক্তি। সে ধারণা একেবারেই সত্য নয়, তবে নিজেই নিজের মানসিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারলে আমাদের উপকার হবে। আমাদের স্বপ্নগুলি পরীক্ষা করলে, আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের একটা নতুন দিক সম্বন্ধে জানতে পারব। আমরা আমাদের যত ভাল ভেবেছি আমরা তত ভাল নয়। আমাদের ব্যক্তিত্বের ভয়াবহ দিকগুলি কোন কোন স্বপ্নে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তোমার নিজের সম্বন্ধে যা সত্য, তা জানতে পারলে, তুমি আরো শক্তিমান হবে ও তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অতিক্রম করতে আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে।

প্রায়ই স্বপ্নগুলি চেতনার গভীরতর স্তর থেকে আসে। বলা হয়ে থাকে যে রবার্ট লুই স্টিভেনসন (Robert Louis Stevenson) আগে 'Dr. Jekyl and Mr. Hyde' সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখেছিলেন, পরে তাঁর বিখ্যাত বইখানি লিখেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহান জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী কেকুলে (Kekule) বেনজিন অণুর পারমাণবিক গঠন আবিষ্কার করেছিলেন স্বপ্নে। এক রাত্রে তিনি যখন আগুনের চুল্লীর কাছে বসে ঝিমিয়ে ছিলেন, তিনি দেখেন কতকগুলি পরমাণুর গঠন-সূত্রগুলি তাঁর চোখের সামনে মোচড়ানো অবস্থায় রয়েছে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল যে তাদের কতকগুলি আংটির আকারে গ্রথিত রয়েছে, ঠিক যেন দুটি সাপ পরস্পরের লেজটি গিলে ফেলছে। তিনি জেগে উঠলেন ও বাকি রাতটুকু বেনজিনের আংটির মতো পারমাণবিক গঠন ও তার অনুরণন তত্ত্বটি উদ্ভাবন করে ফেললেন।

কোন কোন স্বপ্ন আত্মার গভীর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। এক রাত্রে

আমি স্বপ্নে আমার আচার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখি যে, 'আমি সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শনের প্রয়াস করছি।' স্বপ্নেই তিনি উত্তর দেন ঃ 'প্রতিটি অংশেই পূর্ণের অভিব্যক্তি-বোধ আনতে চেষ্টা কর। প্রতিটি সসীম বস্তুতে অসীমকে দেখার চেষ্টা কর।' কয়েকদিন ধরে এই ছিল আমার ধ্যানের মূল বিষয়।

তারপর, আধ্যাত্মিক স্বপ্ন আছে, সে সময় মহান আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ অভিব্যক্ত হয়। কেউ স্বপ্নে *মন্ত্র* অথবা ভাবোদ্দীপক দর্শন পেতে পারে। স্বপ্নলব্ধ *মন্ত্র* প্রায়ই গুরু প্রদত্ত *মন্ত্রের* সঙ্গে মিলে যায়। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের জীবনে এরূপ কয়েকটি ঘটনা আমরা জেনেছি। স্বপ্নে কোন ঈশ্বরীয় মূর্তিদর্শন অধ্যাত্ম জীবনে কঠোর পরিশ্রমী সাধকের পক্ষে খুবই আশাপ্রদ হতে পারে। যাই হোক, যদিও এই অভিজ্ঞতার আনন্দ অনেকদিন থাকতে পারে, তবে তা জাগ্রৎ অবস্থায় যথার্থ ধ্যান ও নৈতিক শুদ্ধির প্রেরণা যদি না দেয়, এতে সাধকের কোনই লাভ হবে না। কোন অভিজ্ঞতা যদি সচেতনভাবে না হয়, তবে তার আধ্যাত্মিক মূল্য অতি সামান্যই।

যে আলোকের সাহায্যে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নদর্শন করে তার দিকে সাধকের অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* এই অন্তরালোকের বিষয়ে একটি অপূর্ব আলোচনা আছে। একদা মহান ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজার সভায় উপস্থিত হলে মানুষ যে আলোকের সাহায্যে কর্ম করে ও বিষয় দর্শন করে থাকে তার সম্বন্ধে রাজা তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যোগ্য উত্তরও দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মানুষের সাহায্যার্থে প্রথমে সূর্যই আলোকের কাজ করে; সূর্য অস্ত গেলে—চন্দ্র; চন্দ্রও যখন অস্ত যায়—অগ্নি সাহায্য করে; আগুন নিভে গেলে—শব্দ; এগুলি পরপর মানবের সাহায্যকল্পে আলোকরূপে কাজ করে। শেষে রাজা প্রশ্ন করলেন ঃ 'সূর্য, চন্দ্র অস্ত গেলে, আগুন নিভে গেলে, শব্দ থেমে গেলে—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আলোকরূপে মানুষের সাহায্যার্থে কে কাজ করে?' ঋষি উত্তর দিলেন ঃ 'আত্মাই তার আলোকের কাজ করে'।[৯] অন্য আলোকগুলি বহির্জগতের, তারা কাজ করে—মানুষের জাগ্রৎ অবস্থায়। কিন্তু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মজ্যোতিই মানবের সহায়ক, তাই দিয়েই তার জ্ঞান, ক্রিয়া ও আনন্দাস্বাদন চলতে থাকে। এঁকে কেউ আলোকিত করে না, কিন্তু ইনিই অন্য সব কিছুকেই আলোকিত করেন। আত্মজ্ঞানের অবস্থায় এক মাত্র এই আলোকই প্রজ্বলিত থাকে এবং তা আপন জ্যোতিতেই।

আধুনিক মানুষ নিদ্রাকে কেবল বিশ্রামের কাল বলে মনে করে। পাশ্চাত্যে সুষুপ্তি অবস্থা কখনই দার্শনিক জিজ্ঞাসার বা অন্তর্দর্শনের বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়নি।

---

৯ তদেব, *৪/৩/২-৬*

কিন্তু উপনিষদে আমরা দেখি যে, সুষুপ্তি অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

> **তদ্ যথা অস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়ায়ৈব ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি।**[১০]

—কোন শ্যেন অথবা ঈগল, যেমন আকাশে উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে ডানা দুটিকে বিস্তার করে নীড়ের দিকে এগিয়ে চলে, ঠিক তেমনি এই পুরুষ এমন অবস্থার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেন, যেখানে সুপ্ত হয়ে তিনি কোন কাম্য বস্তু খোঁজেন না এবং কোন স্বপ্নও দেখেন না।

ঐ উপনিষদে আরো বলা হয়েছে ঃ

> **অত্র পিতা অপিতা ভবতি মাতা অমাতা ...**
> **ভ্রূণহা অভ্রূণহা ... তাপসোঽতাপসঃ ... ভবতি।**[১১]

—এই (সুষুপ্ত) অবস্থায় পিতা অপিতা, মাতা অমাতা, হন্তা অহন্তা, তপস্বী অতপস্বী হয়। ঐ অবস্থায় মানুষ দেখে না, শোনে না, আস্বাদ করে না, কথা বলে না বা শোনে না, কারণ এসব কাজে দ্বিতীয় আর একটি বিষয়ের প্রয়োজন। কিন্তু সুষুপ্তিতে ব্যষ্টি জীবাত্মা অসীম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে শুদ্ধ আনন্দ উপলব্ধি করতে থাকে। তখন এক (অভিন্ন) অভেদ চৈতন্যের অবস্থিতি ঘটে—যেন বিস্তীর্ণ (স্বচ্ছ) জলরাশি। (**'সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈত ভবতি ... এষা অস্য পরমা গতিঃ ... এষঃ অস্য পরম আনন্দ'**)[১২] এই অবস্থা মুক্তির অবস্থার খুবই কাছাকাছি; কিন্তু এ দুই-এর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়ে গেছে। ব্যষ্টি আত্মা বা জীবাত্মা সুষুপ্তি অবস্থায় অবিমিশ্র সুখ ভোগ করে, কিন্তু তবু সে বদ্ধ ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন। নিদ্রাভঙ্গ হলে, সে আবার পূর্বতন জীবাত্মার অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পূর্বতন দুঃখাদি ও সীমাবদ্ধ ভাব উপলব্ধি করতে থাকে। সুষুপ্তি অবস্থার অনুভূতি আমাদের সচেতনভাবে পেতে হবে।

সানফ্রানসিস্কো শহরে একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছোট শিশুদের ক্লাসে বলেছিলেন—সব শিশুই ঈশ্বরের সন্তান। একটি ছোট ছেলে বলে উঠল ঃ 'তা হলে এলকাট্রাজ কারাগারের দুষ্টু লোকেরা কি? তারাও কি ঈশ্বরের সন্তান?' শিক্ষক হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তখন একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে বলল ঃ 'হ্যাঁ, তারাও ঈশ্বরের সন্তান; তফাৎ এই যে তারা তা জানে না।' সুষুপ্তিতে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাই, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা থাকে না। আমাদের প্রকৃত দেব-স্বভাবের কথা ভুলে গিয়ে আমরা সম্ভাব্য

---

১০ তদেব, ৪।৩।১৯ ১১ তদেব, ৪।৩।২২ ১২ তদেব, ৪।৩।৩২

সর্বভাবে নির্বোধের মতো আচরণ করে থাকি। এই জগৎটা যেন কারাগার; আমরা আমাদের প্রকৃত স্বভাব ভুলে গেছি বলেই এখানে রয়েছি। আমাদের ধ্যানের সময় সচেতনভাবে ঐ সুষুপ্তি অবস্থার কিছুটা অবশ্যই চিন্তা করা উচিত। আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে আমাদের মধ্যে সুষুপ্তি আবস্থার পূর্ণ বিরাম, শান্তি ও সুখ উদ্ভূত হয়, তার সঙ্গে পরম জ্ঞান, পবিত্রতা ও সাফল্য যুক্ত হয়।

এক সময়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম মহান শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ বেলুড় মঠের মন্দিরে ধ্যান করছিলেন। অল্প সময়েই তিনি সমাধিমগ্ন হলেন। একটি নবীন সাধক তাঁকে ব্যুত্থিত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অনেকক্ষণ পরে ঐ স্বামী সাধারণ চেতনায় ফিরে এলে নবীন যুবকটি তাঁকে প্রশ্ন করে ঃ 'মহারাজ, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?' উত্তরে স্বামী গান গেয়ে বলেন ঃ 'আমি ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছিলাম'।[১৩] তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির পারে অতিচেতন অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতেন, কিভাবে নিদ্রাকে তিনি জয় করতেন। তিনি নিদ্রা অবস্থাকে 'পর্যবেক্ষণ' করতে চাইতেন। সেজন্য সমস্ত চিন্তাস্রোতকে স্তব্ধ করে দিয়ে যখন প্রায় ঘুমে আচ্ছন্ন হতেন তখন তিনি ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে জেগে থাকতেন। এই ভাবে অভ্যাস করতে করতে তিনি দেখতেন যে ঘুমের ভাব প্রায় কেটে গেছে, আর কেবল একটি খুব পাতলা পর্দা ব্রহ্ম থেকে তাঁকে তফাত করে রেখেছে।[১৪] তিনি অতিচেতনার দোরগোড়ায় পৌঁছেছিলেন।

## মনোজগতের রহস্য

চেতনার অনেকগুলি স্তর আছে। একটি স্তরে আমরা জড় বস্তুর দর্শন ও তার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে থাকি। যখন আমরা চিন্তা করি বা দিবাস্বপ্ন দেখে থাকি, তখন সাময়িকভাবে আমাদের জীবন মনোজগতে স্থিতিলাভ করে। কিন্তু এ স্তরের বিষয় সাধারণত আমরা সামান্যমাত্রই জানতে পারি। আমরা আপন মন সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানতে পারি, আর যে বিরাট বিশ্বমন (মহৎ অর্থাৎ বিরাট) আমাদের ব্যষ্টি মনের সমষ্টি, তার সম্বন্ধে কার্যত কিছুই জানি না। এর অন্তরে কি শক্তি নিহিত আছে, সেখানে কি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে, সে সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের অত্যন্ত অল্প ধারণাই থাকে। ঠিক যেমন জড় জগতের শক্তিকে আমরা নানাভাবে প্রয়োগ করতে পারি, তেমনি যোগ শক্তিকে বা প্রাণকেও আমরা নানাভাবে প্রয়োগ করতে পারি। কোন কোন লোক স্বাভাবিক ভাবেই এ সামর্থ্যের অধিকারী হয়। ওয়ারশ শহরে এক মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, যিনি বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বরূপ

১৩ Swami Gambhirananda. *The Apostles of Ramakrishna*. Advaita Ashrama, 1972. pp. 139-140

১৪ দ্র ঃ Swami Ritajananda. *Swami Turiyananda*. (Madras : Sri R.K. Math. 1973). p. 4

প্রত্যক্ষ করতেন। কোন যন্ত্র অচল হয়ে আছে; তিনি তার ত্রুটি ধরে দিতে পারতেন। হায়দ্রাবাদে স্বামী বিবেকানন্দ একজন লোকের কথা বলেছিলেন, যিনি শূন্য থেকে টাটকা গোলাপ, আঙ্গুর, আরো অন্য জিনিস তৈরি করতে পারতেন।[১৫]

প্রত্যেকেরই মনঃশক্তি আছে। প্রাণশক্তি সব লোকের মধ্যেই কাজ করে। কেবল বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই এ শক্তি বহির্মুখী, ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থের ও জাগতিক সাফল্য লাভের দিকে চালিত হয়। এই অপচয় আয়ত্তে আনার চেষ্টা করলে, আমরা দেখি যে, আমাদের প্রাণশক্তি সঞ্চিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে—কিভাবে ঐ শক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে চালিত করা যায়। এই অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন আধ্যাত্মিক গুরুর নির্দেশ। অন্যথা হলে সঞ্চিত যোগশক্তি অন্য পথে চালিত হয়ে আমাদের কিছু সুলভ সিদ্ধাই-এর অধিকারী করতে পারে। আমরা দূরে সংঘটিত ঘটনা দেখার বা দূরের শব্দ শোনার বা অন্যের চিন্তা অনুধাবন করার শক্তি অর্জন করি। এগুলি কিছুদিনের জন্য আমাদের আনন্দে মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোন উচ্চতর মূল্য নেই; এরা সত্যলাভের পথে আমাদের বাধাস্বরূপ। যোগশক্তিগুলি আমাদের পূর্ণতা ও আনন্দ ও শোকমুক্তি এনে দেয় না। তারা কেবল আমাদের আরো বেশি অহং-সচেতন করে তোলে।

জ্ঞানিগণ এই শক্তির দিকে খুব কমই লক্ষ্য রাখেন। যদি তাঁরা এ শক্তি লাভ করেও থাকেন, তবে তা অতি সাবধানে পরহিতার্থে ব্যবহার করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আধ্যাত্মিক শক্তির এক বিরাট আধার ছিলেন, সে শক্তি তিনি অতি সাবধানে অন্যের কল্যাণে ব্যবহার করতেন। তিনি গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি কোন যুবককে সাবধান করে বলেছিলেন ঃ 'সাবধান! একটা কালো মেঘ তোমাকে ঘিরে রয়েছে, তোমার চল্লিশ বৎসর বয়সে তা প্রকট হবে।' ঐ ছেলেটি পরে স্বামীর কথামতো প্রায় ঐ সময়ে উন্মাদ হয় ও প্রাণত্যাগ করে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ শিষ্যদের অতীত ও ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। আমি যখন যুবক, কলেজের ছাত্র, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বলরাম বাবুর বাড়ি যাই। তিনি আমার বন্ধুকে হাতটি দেখাতে বললেন। তা দেখে তিনি বললেন ঃ 'কাম-লালসা তোমার পক্ষে কিছু বাধা সৃষ্টি করবে, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের যদি ইচ্ছা হয়, ঐ বাধা কেটে যাবে।' কিন্তু স্বামী ব্রহ্মানন্দ বন্ধুটির হাত দেখতে চাইলেও আমার হাত দেখেননি, স্বামী প্রেমানন্দের অনুরোধ সত্ত্বেও। আমি হতাশ হলাম; কিন্তু পরে যখন জানলাম, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর সেবককে বলেছেন যে আমি সন্ন্যাসী হব, তখন আমি খুব খুশি

---

১৫ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১-০২

হলাম ও নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করলাম। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। আমি সন্ন্যাসী হলাম আর বন্ধু হলো গৃহী, কিন্তু সে মহান ঈশ্বরভক্তরূপে জীবন কাটিয়েছিল।

১৯১৭ খ্রীঃ আমি যখন ব্যাঙ্গালোরে আন্ত্রিক জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ি, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একদিন সকালে আমার শয্যার পাশে একটি বৃদ্ধ রোগীকে আনা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় সে মারা যায়। আমার মৃত্যুভয় ছিল না, কিন্তু শরীরে ভীষণ অসহ্য ব্যথা বোধ করতে লাগলাম। তখন মনে হলো, এর থেকে মরণ ভাল। এই চিন্তা যখন বলবতী হলো, আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দের দর্শন পেলাম, তিনি বললেন ঃ 'তুমি কেমন করে মরবে? তোমাকে যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ করতে হবে', বলেই তিনি অন্তর্ধান হলেন। সেই অভিজ্ঞতা আমার সমগ্র সত্তায় এক পরিবর্তন নিয়ে এল। আমি মহান শান্তিতে ও এক গভীর শরণাগতির ভাবে ভরে গেলাম। ব্রহ্মানন্দের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। তিনি মহতী শক্তির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বিচার করে ও কেবল লোক কল্যাণেই তা ব্যবহার করতেন।

প্রাণশক্তি সমূহ নানা রকমের হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আমরা দুজন যুবার কথা জানতে পারি, একজন চন্দ্র, অন্যজন গিরিজা—এদের দুজনকেই তাঁর গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। চন্দ্র এক রহস্য গোলক নিয়ে বেড়াত, যার সাহায্যে সে সহসা মানব চক্ষুর অন্তরালে চলে যাবার শক্তি লাভ করেছিল। কিন্তু সে উচ্চ মানসিক শুদ্ধতা অর্জন করতে পারেনি, ফলে সে শক্তির অপব্যবহার করে অন্যলোকের বাড়িতে অজান্তে প্রবেশ করতে লাগল। সে শীঘ্রই কাম-লালসার বশীভূত হয়ে তার শক্তি হারিয়েছিল। গিরিজা নামে অন্য যুবকটির আর একরকম শক্তি ছিল। একদিন সে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঐ শক্তির প্রয়োগ দেখিয়েছিল। ঘোর অন্ধকার, প্রভু শম্ভু মল্লিকের বাগান বাড়ি থেকে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে ফিরে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। গিরিজা তাঁর সঙ্গে ছিল, সে থামল আর ঘুরে দাঁড়িয়ে তার পেছন থেকে এক উজ্জ্বল আলোর রশ্মি বার করল, তাতে কালীমন্দিরের ফটক পর্যন্ত রাস্তা আলোকিত হয়ে গেল। যোগীবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ এ রকম সুলভ যোগ-শক্তির খেলা কখনো দেখাতেন না। এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রভু চন্দ্র ও গিরিজার যোগশক্তি তাঁর আপন শরীরে টেনে নিলেন, ফলে তাদের ঈশ্বরানুভূতির দিকে মন ফেরাবার সুযোগ করে দিলেন।[১৬]

---

১৬ পূর্বোল্লিখিত *Sri Ramakrishna The Great Master*, pp. 467-469; *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* উদ্বোধন, ২০০০, ১ম খণ্ড, গুরুভাব-পূর্বার্ধ পৃঃ ১২৯।

সকল মহান অধ্যাত্ম-পুরুষগণ যোগশক্তির (সিদ্ধাই-এর) প্রতি আসক্তির নিন্দা করেছেন, কারণ ওগুলি সাধককে মূল অধ্যাত্ম পথ থেকে বিক্ষিপ্ত করে ও শেষে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যেসব খাঁটি সাধক শাস্ত্রানুযায়ী *সাধনা* করে থাকে, তাদের কাছে এসব যোগশক্তির অভিজ্ঞতা সাধারণ ব্যাপার। তখন কেউ ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পায়, অথবা শুনতে পায় সেই সৃষ্টি-বহির্ভূত শব্দ, *অনাহত ধ্বনি*, যা বিশ্ব মাঝে সর্বকালে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। অথবা কারও সেই রহস্যময় অন্তর আলোক দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি যে ঠিক পথে এগিয়ে চলেছ, এসব তারই ইঙ্গিত, এইটুকুই তাদের উপযোগিতা। আমরা যেন রাস্তার নামাঙ্কিত ফলকটিকেই রাস্তা বলে ভুল না করি। যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দ বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক অনুভূতিসকল লাভ করেন। এক সময়ে তিনি অপ্রত্যক্ষ বিষয় শ্রবণ-ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁর যুক্তিবাদী মন ঐ অভিজ্ঞতাগুলিকে যাচাই করে দেখেন যে, সেগুলি সত্য। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এ কথা বলায়, প্রভু তাঁকে কিছুদিনের জন্য ধ্যান করা স্থগিত রাখতে বলেন, যাতে ঐ শক্তি তাঁকে ছেড়ে চলে যায়।

বহুলোকে ভূত ও অশরীরী আত্মার বিষয়ে উৎসাহী। প্রকৃত অধ্যাত্ম সাধকের কাছে ওগুলির কোন প্রয়োজন নেই, সে ওসব ভূতুড়ে কাণ্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু মানব প্রকৃতির এক অদম্য উৎসাহ রয়েছে, আর বহুলোকে প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনের পথে না গিয়ে তাদের অমূল্য সময় প্রেতাত্মার ব্যাপারে নষ্ট করে। আপনারা হয়ত স্বামী অভেদানন্দের '*Life Beyond Death*' (*মরণের পারে*) বইটি পড়েছেন। তিনি কয়েকটি প্রেত নামানোর বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন, বইটিতে তার বিবরণ দিয়েছেন। ভারতে যদি কোন লোক ভূতাবিষ্ট হয়, তবে তাকে তখনই কোন মন্দিরে বা ভূতের রোজার কাছে নিয়ে গিয়ে ভূত ছাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আমেরিকায় সে লোকটি একটি 'মাধ্যম' হয়, আর তা থেকে অর্থ রোজগার করে। এই মাধ্যমের ব্যাপারটি সত্য হতে পারে, কিন্তু এই সব বিষয় নিয়ে খেলা করা নিছক সময় নষ্ট করা। নিরঞ্জন নামে শ্রীরামকৃষ্ণের এক শিষ্য ছিলেন। প্রভুর কাছে আসার আগে তিনি এক দল প্রেত-গবেষকদের বৈঠকে 'মাধ্যমে'র কাজ করতেন। প্রভু এই কথা শুনে ঐ ছেলেটিকে বলেন—সে যেন ঐ কাজ তখনই ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, 'বাছা, তুমি যদি ভূত আর অপদেবতার কথা চিন্তা কর, তবে তুমি নিজেই ভূত ও অপদেবতা হবে, আর যদি তুমি ঈশ্বরের কথা চিন্তা কর, তবে তোমার জীবন হয়ে উঠবে ঈশ্বরীয় ভাবে পূর্ণ।'[১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আমরা দেখি যে তিনি একদা নানা রকম ভূত প্রেতের

১৭ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা*, প্রথম ভাগ, (উদ্বোধন, ১৯৯৭), পৃঃ ২২৭

সামনাসামনি হয়েছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ভৈরব (উপদেবতা, শিবের অনুচর) ছিলেন। তিনি অন্যের অগোচরে থাকতেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী যখন পঞ্চবটীর নিচে ধ্যানে বসে ছিলেন, তিনি দেখেন এক দীর্ঘ ধূসর মূর্তি ঐ গাছের ডাল থেকে নেমে আসছেন। তোতাপুরী একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি রহস্যময় অতিথিকে বললেন ঃ 'অতি উত্তম, তোমার আর আমার একই সত্তা; তুমি ব্রহ্মের একটি অভিব্যক্তি (প্রকাশ), আর আমি, আর একটি। এস, বস এবং ধ্যান কর।' ঐ ভৈরব উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।[১৮]

ভূত-প্রেত নিয়ে সময় নষ্ট না করে আমাদের উচিত পরমাত্মা, সর্বভূতাত্মা, যিনি শান্তি ও আনন্দের চরম উৎস তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে, কিভাবে মনের বিভিন্ন স্তরকে পাশ কাটিয়ে বা সেগুলি উত্তীর্ণ হয়ে ওপরে ওঠা যায় প্রকৃত আত্মিক স্তরে, যেখানে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হন। যতদিন না এই যোগ সিদ্ধ হয়, ততদিন জীবাত্মার এই বুভুক্ষা অতৃপ্ত থেকে যাবে, আর যতদিন তা অতৃপ্ত থাকবে, ততদিন তুমি প্রকৃত শান্তি বা সিদ্ধি পেতে পার না। বিরাট চৈতন্যের স্পর্শ জীব-চৈতন্যকে অবশ্যই অনুভব করতে হবে। প্রকৃত অন্তর্জ্যোতিকে অবশ্যই অন্তঃকরণের অন্ধকার গুহাকে আলোকিত করতে হবে। একমাত্র তখনই মানবের পক্ষে জীবনের শোক-দুঃখের পারে যাওয়া সম্ভব। প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয় পরম চৈতন্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে। এ ব্যাপার সাধারণ মন ও বুদ্ধির নাগালের বাইরে। যেমন মহান সুফি মরমিয়া সাধক, অল্-ঘজালি বলেছেন ঃ

> **নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমার যা অনুভূতি হয়েছিল, তার বর্ণনা বা আভাস দেওয়া অসম্ভব। দৃষ্টিশক্তির উন্মেষ ঘটাল এক জ্যোতিঃ, যা বুদ্ধির নাগালের বাইরে অবস্থিত সব বস্তু ও বিষয়ের আবরণ খুলে দিল। সুফিদের সাধন পদ্ধতিতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তা যেন প্রত্যক্ষ অনুভূতি, ঠিক যেন স্বহস্তে বস্তুকে স্পর্শ করা হচ্ছে।**

মহান নব্য-প্লেটনিক মরমী সাধক প্লটিনাস বলেছেন ঃ

> **তোমরা প্রশ্ন কর যে, কিভাবে অনন্তকে আমরা জানতে পারি? উত্তরে আমি বলি ঃ বিচার বুদ্ধি দিয়ে নয়। বুদ্ধির কাজ হলো ভেদ-নিরূপণ এবং সংজ্ঞা-নির্দেশন। অনন্তকে তারই বিষয়বস্তুর স্তরে ফেলা যায় না। অনন্তের ধারণা করা যায় বুদ্ধির থেকে উচ্চতর শক্তির সাহায্যে, এমন এক অবস্থা লাভ করে, যেখানে তোমার সীমিত সত্তার অস্তিত্ব আর থাকে না, যে অবস্থায় দিব্যভাব তোমার ভেতর সঞ্চারিত হয়।**

---

১৮ পূর্বোল্লিখিত *Sri Ramakrishna The Great Master*, p. 478; *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, পৃঃ ৪৯১

## প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় তোমার কি লাভ হয়

প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে বিচার করতে হয় তার ফল দিয়ে। দর্শন ও অন্য সব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অবশ্যই অধ্যাত্ম সাধকের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন আনে ও তাকে আরো বেশি শক্তিসম্পন্ন, আরো বেশি পবিত্র, অন্যের প্রতি আরো বেশি উদার করে তোলে। ঐগুলি তাকে নতুন আশায় অবশ্যই পূর্ণ করে তোলে—যা তার কাজে প্রতিফলিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মহান কার্মেলাইট (Carmelite) মরমী সাধক, সেণ্ট জন অফ দি ক্রুশ (St. John of the Cross) প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ

> **ঐ অভিজ্ঞতাগুলি জীবাত্মার প্রভূত উন্নতিসাধন করে। ...ঐগুলির মধ্যে মাত্র একটিই এক ধাক্কায় জীবাত্মা যেসব ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বৃথাই চেষ্টা করে চলেছে, সেগুলির বিনাশ সাধন করে দেয় আর সেই সঙ্গে তাকে নানা গুণে বিভূষিত করে ও নানা অতিপ্রাকৃত সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলে।**

পাশ্চাত্য দেশে দৃঢ় কল্পনা-শক্তিসম্পন্ন এক মহিলা আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছেন। আর একটি যুবক ধ্যানে তার প্রেমিকা যুবতীর 'দর্শন' পেয়ে দৈবী মাতৃমূর্তির প্রকাশ বলে ভুল করেছিল। এ সব ক্ষেত্রে যা সরল সত্য তাই আমাকে বলতে হয়েছিল—ঐ লোকগুলি আপন আপন অতি স্পষ্ট কল্পনার শিকার হয়েছিল। নানা ধরনের দর্শন আছে। কোন কোনটি আবার স্পষ্ট কল্পনার ফলস্বরূপ এবং নিছক ব্যক্তিসাপেক্ষ। অন্যগুলি গ্রহণশীল মনে অনুভূত সূক্ষ্ম সত্তার বাস্তব প্রকাশ। তাদের ফল দিয়েই তাদের গুণ বিচার করতে হবে। বাস্তব-ভিত্তিশূন্য বস্তুর অনুভূতিই হলো ভ্রান্তি, সেগুলি রোগগ্রস্ত স্নায়ু বা বিকৃত মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত হয়। মানসিক অভিজ্ঞতা, যত সত্যই হোক, তা সদা পরিবর্তনশীল সূক্ষ্ম জগতের অন্তর্গত এবং তার কোনরূপ আধ্যাত্মিক মূল্য নেই। এদিকে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আমাদের অপরিবর্তনীয় সত্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে নিয়ে আসে, যার ফলে আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসে। এর ফলে আমাদের চরিত্রে, আমাদের সচেতনতায় জগৎ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ এক স্পষ্ট অথচ সার্থক উক্তি করেছিলেন ঃ 'যারা বলে যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছি, কিন্তু তাঁর পবিত্রতা, ত্যাগ ও ভক্তির এতটুকুও অধিকারী হতে পারেনি, তারা হয়তো একটা বানরও দেখে থাকতে পারে।'

অধ্যাত্ম সাধক যেন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অধৈর্য না হয়ে পড়ে। তা ঠিক সময়ে আসবে, জীব প্রস্তুত হলে। ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে জীবনে

পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হওয়া উচিত। আশ্চর্যজনক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এ রকম বৃথা কল্পনায় জীবনকে নষ্ট না করে শুদ্ধ, শান্ত ও শান্তিময় চরিত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করা আরো অনেক ভাল। পাশ্চাত্য দেশে দেখেছি সুবুদ্ধিসম্পন্ন নর-নারী নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন ব্যবস্থার সুযোগ নিতে আগ্রহী। একটি সুইস মহিলা চমৎকার স্পন্দন, পবিত্রতা ও ধৈর্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বপ্নের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। তাঁর শক্তি এক ঘূর্ণিপাকে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। তাকে এক মনস্তত্ত্ববিদের কাছে আনা হলো, কিন্তু তিনি কিছু করতে পারলেন না। মহিলাটি তার অন্তরের অভিজ্ঞতার কথা আমাকে লেখেন। আমি তাকে কিছু আধ্যাত্মিক নির্দেশ দিলাম, সেগুলি চমৎকার কাজ করল। হেগ শহরে এক ডাচ যুবকের সঙ্গে দেখা হয়, তার এক শান্তভাবের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হতো, কিন্তু তা সে হারিয়ে ফেলে। সে নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে ঐ শান্তভাব ফিরে পেতে আগ্রহী হয়। আমি তাকে ও তার স্ত্রীকে নিয়ম অনুযায়ী ধ্যান করতে বলি। তারা এ থেকে প্রভূত উপকার পেয়েছিল।

সুইজারল্যাণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের স্ত্রী, '*Spiritual Teachings of Swami Brahmananda*' বইখানি পড়েছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। আমি দেখলাম যে তিনি আধ্যাত্মিকভাবের বিশেষ অনুরাগী, কিন্তু তিনি জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন না। আমি তাঁকে উপদেশ দিলাম অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য করে চলতে, আর 'ইহলোক ও পরলোকের সমজাতীয় বিষয়গুলির প্রতি সত্যনিষ্ঠ হতে। আমি তাকে নির্দেশ দিলাম পূজা ও কাজের মধ্যে মিলন ঘটাতে ও তাঁর অন্তরাত্মাকে ঈশ্বরীয় নামের সুরে ভরিয়ে ফেলতে। তিনি আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে উল্লেখযোগ্য-ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিলেন।

রোমাঁ রোলাঁর (Roman Rolland)-এর '*Life of Ramakrishna*' বইখানি পড়ে এক প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজক আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি অধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধে কিছু আচরণ বিধি জানতে চান, এ বিষয়ে তিনি খুবই ঐকান্তিক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার কয়েকবার আলাপ হয়। আমি তাঁকে বললাম—প্রথমে তিনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন সে সম্বন্ধে অবহিত হোন, তারপর আমার সরল নির্দেশগুলি অনুসরণ করুন। তিনি এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন, ফলে শীঘ্রই এক নতুন আন্তরিক সাম্য অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর বন্ধুরা বলতে লাগল যে, তাঁর দেওয়া উপদেশগুলি উন্নতমানের হচ্ছে। কেউ কেউ বলে যে, পাশ্চাত্যদেশে যোগ অভ্যাস করা যায় না। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ওকথা

সম্পূর্ণ সত্য নয়। পাশ্চাত্যে একাধিক যুবকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল, যাদের মন (যোগ অভ্যাসের ফলে) উন্নত স্তরে উঠেছিল। ঠিক ঠিক লোকের কাছে আসতে পারলে তোমার বিশ্বাস দৃঢ় না হয়ে পারে না। আমি কয়েকটি যুবককে দেখেছি, যারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে সুখ ও শান্তির অধিকারী হয়েছিল। প্রাচ্যদেশীয়ই হোক আর পাশ্চাত্যদেশীয়ই হোক যে কোন লোক নিয়মিত অধ্যাত্ম সাধনার ফল অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারে। ঈশ্বর কেবল মানবের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটুকুই দেখেন, তার বাহ্য বেশ বা ব্যবহার নয়।

## আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কোন সীমা নেই; এ অভিজ্ঞতা অসংখ্য রকমের হতে পারে। এর কতকগুলি নিচুমানের, সেগুলি প্রকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নয়, তাদের অভিজ্ঞতার ফলকচিহ্ন বা সঙ্কেত বললেই ভাল। মন যখন সঠিক সুরে বাঁধা যায়, তখন তুমি অতিচেতন স্তরের ঝঙ্কার শুনতে পার। তোমার দেহের কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে তা শুনতে পাবে না। সে সব ঝঙ্কার মনের কানে শোনা যায়। কখনো কখনো দূরস্থ ঘণ্টাধ্বনির সুর কানে আসবে। সেগুলি সহজে শোনা যায় নির্জন স্থানে, বিশেষত গভীর নিশীথে। আমি যখন মায়াবতীতে* ছিলাম তখন ঐ সুর শুনতে পেতাম। এমনকি এখানেও, ভাইসব্যাডেনে (Wiesbaden) তা শুনতে পাই। কখনো কখনো অনুভব করতে পার যে তোমার অন্তরাকাশের গভীর দেশ থেকে এক ধরনের সুর উঠছে—ঠিক যেমন পুকুরে ঢিল ফেললে ছোট ছোট তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। একাগ্রতার বিশেষ স্তরে উঠলে, তুমিও শুনতে পাবে ঐ *অনাহত ধ্বনি*, বিরাট মনের অনন্ত অসম্ভূত শব্দ তরঙ্গ।

তারপর রয়েছে অতীন্দ্রিয় রহস্যালোকের অভিজ্ঞতা। এই অন্তরালোকই হলো চৈতন্যালোক। এই সব অভিজ্ঞতার কোন কোনটি কল্যাণকর যেহেতু সেগুলি তোমার একাগ্রতার গভীরতার পরিচায়ক। কিন্তু এগুলির দিকে বেশি মনোযোগ দিও না; দিলে আটকে যাবে—মূল উদ্দেশ্য ভুলে আনুষঙ্গিক বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়বে। যেমন বার বার বলেছি, কেবল একাগ্রতার গভীরতাতেই কাজ হয় না। শুধু একাগ্রতাতেই অধ্যাত্মবস্তু নাও থাকতে পারে। আমাদের মূল লক্ষ্য যেন অবশ্যই আধ্যাত্মিক হয়। কোন রহস্যধ্বনি শুনলে, তার উৎসে যেতে হবে; কোন আলোক দর্শন হলে, সেই আলোকের উৎসে যেতে হবে। পরমাত্মাই এই সব প্রপঞ্চের উৎস এবং তাই হলো আমাদের লক্ষ্য। খাঁটি সাধকের উচিত এই সব নিচুস্তরের

* হিমালয়ে অবস্থিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে রামকৃষ্ণ মঠের ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর। লেখক সেখানে ১৯২২ ও ১৯২৬-২৭ খ্রীঃ সম্পাদকের পর্যায়ে ছিলেন।

অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলে, সেগুলিকে অগ্রাহ্য করা। সেগুলির সম্বন্ধে অন্যের সঙ্গে আলোচনাও করবে না, তাতে তারা আবার বিভ্রান্ত হবে। যখন তুমি জপ-ধ্যান করবে, কেবল *ইষ্ট দেবতার* চিন্তা করবে—তিনিই চৈতন্য ও আনন্দের প্রতিমূর্তি। মানসিক অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করবে না।

কোন পবিত্র সাকার ব্যক্তিসত্তার ওপর নিজ ভাবকে কেন্দ্রীভূত না করতে পারলে অধিকাংশ সাধক ধ্যান করতে পারে না। তাঁর মূর্তিকে নিয়েই তাকে শুরু করতে হবে, সেটিকেই আরো স্পষ্ট, আরো চেতন করে তুলতে হবে। মূর্তি আমাদের মধ্যে দিব্যগুণের উন্মেষ ঘটায়, আর আমাদের একাগ্রতা যত গভীর হয়, আমরা তত *ইষ্ট দেবতার* চেতনার সংস্পর্শে আসি। ঐ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি সত্তার মধ্যেই আমরা ব্যষ্টি-চেতনা ও সমষ্টি-চেতনার যোগসূত্রকে দেখতে পাই। তখন আমরা নিজেদের মধ্যেও সেই যোগসূত্রকে উপলব্ধি করি। পরে আমাদের চেতনা বিস্তার লাভ করে, আর আমরা তখনই ব্যষ্টিকে সমষ্টির বিকাশ বলে বুঝতে শিখি। শেষে সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়ই লীন হয়ে যায় তুরীয়ে, যে অবস্থার নাম 'অদ্বৈত'।

পরে, আরো অগ্রসর হয়ে, যে নিরাকারভাব সাকারভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের অভিজ্ঞতার কেন্দ্রস্বরূপ। আমরা অনুভব করি, আমাদের নিজ নিজ আত্মা এবং অন্য সকলের আত্মা এক অখণ্ড চৈতন্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। আমরা সকল জীবের মধ্যে পরমাত্মাকেই দেখি এবং সকল জীবের সেবা করবার জন্য একটা গভীর প্রেরণা অনুভব করি। নিজের মধ্যে কোন নৈতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে, আমরা সকলের জন্য গভীর প্রেম ও করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠি।

প্রথমে আমরা বিরাট মহাজাগতিক স্পন্দনের সংস্পর্শে আসি, পরে বিরাট মনের সংস্পর্শে আসি এবং তারপর আমরা আমাদের সীমিত চেতনার ও অনন্ত চৈতন্যের সংযোগ অনুভব করি। এক দিক থেকে, এগুলি সব সম-কেন্দ্রিক বৃত্ত, একটি বৃত্তের ভেতরে আর একটি। আমরা চিন্তার স্তরে জীবন ধারণ করতে পারি, আমরা আমাদের ও অন্যের দেহকে চিন্তামাত্রে পরিণত করতে পারি, তারপরে এই সব চিন্তা-রূপকে স্তব্ধ করে, পৌঁছতে পারি নিরকারের স্তরে, আর চরম শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে তিন রকম ভাবে যাচাই করা যেতে পারে : (১) নিজ অভিজ্ঞতার বারবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে, (২) নিজ অভিজ্ঞতাকে শ্রুত আচার্যোপদেশের সঙ্গে তুলনা করে, (৩) নিজ অভিজ্ঞতাকে প্রকৃত শাস্ত্রোপদেশের সঙ্গে তুলনা করে। তুমি যদি এইভাবে যাচাই না কর তবে আত্ম-প্রবঞ্চনার প্রচুর সম্ভাবনা থাকবে, এমনকি আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি অসংযত মনের বিপজ্জনক খেয়াল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যতক্ষণ আমাদের দেহ বোধ রয়েছে, আমাদের অবশ্যই জড়জগতের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে; যখন আমরা মন-জগতে বিচরণ করব, আমাদের অবশ্যই বিরাট মনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলতে হবে, আর যখন আমরা আধ্যাত্মিক স্তরে উঠব, আমাদের উচিত হবে পরম চৈতন্যের সঙ্গে সুর মেলানো। উচ্চতর স্তরে আমরা যে আলোকের, যে আনন্দের, যে সাম্যের ভাব উপলব্ধি করব সেগুলিকে অবশ্যই বার করে এনে নিম্ন স্তরে প্রকাশ করতে হবে। তখনই আমরা লোক-কল্যাণের জন্য দিব্য শক্তির, দিব্য চেতনার, দিব্য আনন্দ প্রবাহের এক একটি ধারাপথ হয়ে উঠব।

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

# আধ্যাত্মিক উন্মেষ

## দেহ, মন ও আত্মা

আধ্যাত্মিক উন্মেষের রহস্য বুঝতে হলে, আমাদের প্রয়োজন আমাদের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে ও জীবনযাত্রার পথে অতিক্রান্ত বিভিন্ন চেতনা স্তরগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ঈশ্বরীয়, অর্থাৎ ব্রহ্মই আমাদের প্রকৃত সত্তা। এই প্রকৃত সত্তাই *আত্মা* নামে অভিহিত, কিন্তু বাস্তবে এটি ব্রহ্ম, বা অনন্ত চৈতন্য থেকে অভিন্নও—আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রবুদ্ধ সাধকদের এই রকমই অভিজ্ঞতা। অজ্ঞানই এই প্রকৃত স্বরূপকে ঢেকে রাখে। অজ্ঞানের আবরণে ঢাকা বলেই আমাদের অনুভূতি হয় যে, আমরা ঈশ্বরের থেকে পৃথক—সীমিত, মরণশীল জীব মাত্র। অজ্ঞান তীব্র সুরাপানের মতো। এর ফলে মানুষ আপন সত্তাকে ভুলে নানা ধরনের উদ্ভট কল্পনা সৃষ্টি করতে থাকে। অজ্ঞান প্রথমে আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে ঢেকে ফেলে, পরে আমরা যা নয়, তার সঙ্গে একাত্মতার ভাব আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। অজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃত সত্তা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনেব সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হয় আর অহং-কল্পনার সৃষ্টি হয়। ফলে আমরা অনুভব করতে থাকি যে, আমাদের ভৌত বা জড় ও মানস বা সূক্ষ্ম—দু-রকম শরীর আছে। অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে আমাদের অনুভূতি হতে পারে যে, কারণ শরীর নামে আরো একটি সূক্ষ্মতর শরীর আমাদের আছে। এই তিন শরীরের পারে হলেন *আত্মা*, যা আমাদের প্রকৃত সত্তা।

আবার, আমরা তিনটি চেতনা-স্তরে আবদ্ধ থাকি ঃ জাগ্রৎ স্তর—যে সময়ে চেতনা ভৌত (স্থূল) শরীরের সঙ্গে একাত্মবোধ করে আর আমরা ভৌত জগৎ সম্বন্ধে সচেতন থাকি; স্বপ্ন স্তর—যে সময়ে চেতনা সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে একাত্মবোধ করে আর আমরা মানসিক সংস্কার-সৃষ্ট স্বপ্ন জগতে বাস করতে থাকি; সুষুপ্তি স্তর—যে সময়ে চেতনা আমাদের কারণ শরীরের সঙ্গে একাত্মবোধ করে, আর কারণ-জগতের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা থাকে আর মনের কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, এই তিন স্তরের পারে আছে এক জ্ঞানাতীত চেতনার

স্তর, যার নাম *তুরীয়*। এ অবস্থায় মানুষ তার শুদ্ধ আধ্যাত্মিক স্বরূপটি ফিরে পায়। এই উচ্চতম শুদ্ধ-চৈতন্য স্তর, জীবাত্মার উপলব্ধিতে যা অনন্ত চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছু নয়, এর প্রাপ্তি অবশ্য সহসা ঘটে না। অধিকাংশ অধ্যাত্ম সাধকের ক্ষেত্রেই এই প্রাপ্তি ক্রমে ক্রমে ঘটে থাকে। অধ্যাত্ম চেতনা প্রাপ্তি ক্রমোন্মেষের পথে চলে। সাধককে নানা অবস্থার ভেতর দিয়ে গিয়ে তবে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হয়। আমরা এখন এই আধ্যাত্মিক উন্মেষের কথাই আলোচনা করব।

চেতন স্তরে স্থূল দেহের সঙ্গেই আমাদের একাত্ম বোধ হয়ে থাকে। তখন আমরা ভাবি যে আমরা খর্বাকৃতি বা দীর্ঘাকৃতি, যুবা বা বৃদ্ধ, ফর্সা বা কাল। যখন আমরা মনের সঙ্গে একাত্মবোধ করে থাকি, তখন আমাদের বেদনা ও তৃপ্তি, দুঃখ ও সুখ বোধের অভিজ্ঞতা হয়। যখন অহংত্বের সঙ্গে একাত্মবোধ করি, তখন আমরা ভাবি 'আমি কর্তা ; আমি বদ্ধ বা মুক্ত'।

আমাদের অবশ্যই অজ্ঞান-মুক্ত হতে হবে আর আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বরূপকে উপলব্ধি করতে হবে। ইচ্ছামাত্রেই তা সম্ভব নয়। যদি ইচ্ছাতে ঘোড়া পাওয়া যেত, তবে প্রত্যেকেই ঘোড়া চড়ত। আমরা নিজেদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছি; আমাদের অবশ্যই মোহমুক্ত হতে হবে। তার উপায় কি? আমাদের পূর্বতন সত্তাকে অবশ্যই পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার সব পূর্বতনে বদ অভ্যাসগুলিকে আমাদের অবশ্যই ভেঙ্গে দিতে হবে, গড়ে তুলতে হবে সৎ নৈতিক অভ্যাস, আর আমাদের চিন্তা, আবেগ ও কাজকে আধ্যাত্মিক আদর্শের পথে পরিচালিত করতে হবে। তাতে আমরা আরো পবিত্র হব।

নৈতিক অনুশীলন, প্রার্থনা, নাম জপ ও ধ্যানের ফলে যেমন মন শুদ্ধ হতে থাকে, আমরা অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করি। তখন আমরা নিজেদের মধ্যেই আবিষ্কার করতে থাকি, নানা চেতনা কেন্দ্র, মরমী সাধকদের 'গুপ্ত সোপান', গুপ্ত স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি যার চাতালগুলি বিভিন্ন চেতনার স্তরের সঙ্গে যুক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রে এক একটি কেন্দ্রকে *চক্র* বলে। আমরা সকলে জানি আমাদের মানসিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মপ্রচেষ্টা কিভাবে পাল্টে যায়। এই সব মানসিক অবস্থার কিছু না কিছু প্রভাব এসে পড়ে সেই সব চেতনা কেন্দ্রগুলির ওপর, যাদের সঙ্গে আমাদের ঐ বিশেষ বিশেষ সময়ে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা।

শোপেনহাউয়ার (Schopenhauer) বলেন শিশু যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন যৌনবোধই তার বাসনার কেন্দ্র হয়। সে তখন এক নতুন জগতে বাস করে, যেখানে চিন্তা, আবেগ ও ক্রিয়া—সবই যৌনবোধের দ্বারা প্রভাবিত। ক্ষুধায় পীড়িত

হলেই আমরা পাকস্থলীর কথা অনুভব করি। গভীর আবেগে আলোড়িত হলেই আমাদের হৃদয়কে অনুভব হয়। আমাদের চিন্তা যখন স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়, আমাদের অনুভূতি তখন ভ্রূমধ্যগত বিন্দুতে স্থির হয়। এর থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায় ঃ প্রথম, আমাদের নানা চেতনা কেন্দ্র আছে, দ্বিতীয়, আমরা ক্রমান্বয়ে এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে কেবল শারীর সম্পর্কীয় কেন্দ্রগুলিই উল্লেখ করা হয়েছে। দেহের সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্রগুলি ছাড়াও আধ্যাত্মিক সচেতনতা-বিশিষ্ট উচ্চতর কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলি দৃষ্টির অগোচর, সাধারণ মনেরও বোধগম্য নয়। সেগুলি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক কেন্দ্র—কেবল উন্নত যোগিগণেরই জ্ঞানগম্য। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী এ রকম সাতটি কেন্দ্র আছে—তাদের নাম *চক্র*।

বিভিন্ন চেতনা কেন্দ্র ও তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের বর্ণনা করতে, আমাদের কখনো কখনো বাধ্য হয়ে ইন্দ্রিয় জগতের ভাষা ব্যবহার করতে হয়। সেই রকমই করা হয়েছে মানবের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম শক্তির বা *কুলকুণ্ডলিনীর* (আক্ষরিক অর্থে 'কুণ্ডলী পাকানো') ক্ষেত্রে, যাকে কখনো কখনো সর্প-শক্তি বা মানবের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি বলা হয়ে থাকে। এটিকে মেরুদণ্ডের তলদেশে অবস্থিত একটি সুপ্ত কুণ্ডলী পাকানো সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

## সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলা

*কুণ্ডলিনী* বা কুণ্ডলী পাকানো শক্তি হলো শক্তিরূপে অভিব্যক্ত সৃষ্টি-বিষয়ক চেতনা। যোগীদের ভাষায় এটি সুপ্ত কুণ্ডলী-আকারে মেরুদণ্ডের তলদেশের অনুরূপ অঞ্চলে অবস্থান করে। যারা আধ্যাত্মিক ভাবে জাগ্রত তাদের ক্ষেত্রে এ শক্তি *সুষুম্না* নামে আধ্যাত্মিক প্রণালীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই আধ্যাত্মিক প্রণালীর দুপাশে *ইড়া* ও *পিঙ্গলা* নামে দুটি প্রণালী আছে। এ দুটি মেরুদণ্ডের বাঁদিকে ও ডানদিকে থাকে আর *সুষুম্না* হলো মধ্যস্থলে। কল্পনা কর এই তিনটি প্রণালী বুনিয়াদী বা নিম্নতম কেন্দ্রে এসে মিলেছে। মাঝেরটিই আধ্যাত্মিক প্রণালী, আর অন্য দুটি মানবের সাধারণ দৈহিক ও মানসিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ঐ প্রণালীগুলির সংযোগস্থলে যে শক্তি সঞ্চিত হয়, তা কেবল পাশের দুটি প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত হয় মাঝেরটি দিয়ে নয়। তাই সব শক্তি পাশ দিয়ে চলে গিয়ে সাধারণ সাংসারিক চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

প্রত্যেকটি কেন্দ্র এক একটি নির্দিষ্ট চেতনা স্তরে ব্যষ্টি ও বিরাটের সংস্পর্শ-বিন্দু। নিম্ন দেশ থেকে উর্ধ্বে প্রথম তিনটি কেন্দ্র ভোজন, পান, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ও

যৌন সুখের মতো মানুষের পাশববৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। মানুষের প্রথম অধ্যাত্ম জাগরণ ঘটে, যখন তার চেতনা হৃদয়ের বিপরীত যে কেন্দ্র সেখানে ওঠে। এইখানেই সে তার আত্মার (জীবাত্মার) সন্ধান পায়।

চেতনা কেন্দ্রগুলি শরীরের স্নায়ুগ্রন্থি ও গ্রন্থিল স্নায়ুর সঙ্গে যুক্ত বলে কখনো কখনো তাদের সেই সেই নাম দেওয়া হয়। কিন্তু চেতনা কেন্দ্রগুলিকে ওদের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা কখনই উচিত নয়। স্যার জন উড্রফ (Sir John Woodroffe) তাঁর বিখ্যাত *The Serpent Power* নামক গ্রন্থে যেমন মন্তব্য করেছেন, এই সব 'পদ্মগুলি' বা চেতনাকেন্দ্রগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম কেন্দ্র—যা মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের দ্বারা সূচিত স্থূল শরীরের গঠনতন্ত্রগুলিকে এবং গ্রন্থিল স্নায়ু, স্নায়ুগ্রন্থি, স্নায়ু, ধমনী (নাড়ী) ও সেই সেই অঞ্চলের ইন্দ্রিয়স্থান সমূহকে প্রাণবন্ত করে তুলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

## চক্র বা চেতনা কেন্দ্র

যে সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরের সর্বাঙ্গে অনুস্যূত হয়ে আছে তার ওপর আমরা যদি একাগ্রভাবে চিন্তা করি, তবে নিজ মানসিক বৈশিষ্ট্য ও ভাবাবেগ-সংক্রান্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্টতর ধারণা হবে এবং আমরা আমাদের ভাবাবেগ সংক্রান্ত প্রকৃতিকে ও সেই সঙ্গে আমাদের অনুভূতি ও স্থূল ইন্দ্রিয়স্থান সমূহকেও নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে পারি। আমাদের আচার্যেরা বলেন, ঠিক যেমন স্থূল শরীরের কিছু আবৃত অঙ্গ ও তাদের ক্রিয়া পদ্ধতি আছে, যা আমরা দেখতে পাই না, যাদের ক্রিয়াও আমাদের অজ্ঞাত, তেমনি আমাদের মনেরও অচেতন ও অতিচেতন স্তর রয়েছে। আমাদের বদ্ধমূল বাসনা ও কামনাগুলির অধিকাংশই অচেতন মনেই থাকে। আমাদের অবশ্যই সেগুলিকে খুঁজে বার করে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে, তা না হলে অধ্যাত্ম জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। অতিচেতন স্তরেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও আনন্দ লাভ হয়।

কারণ শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরের কয়েকটি সংযোগ বিন্দু আছে। এগুলির নামই *চক্র*—যাদের কথা আগে বলা হয়েছে; এদের অবস্থান হলো মেরুদণ্ডের শীর্ষ থেকে তার মূলদেশ পর্যন্ত অঞ্চল বরাবর। চৈতন্য, মন ও শরীর এই সব সংযোগ-বিন্দুতে মিলিত হয়ে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, এই সব *চক্রের* মাধ্যমেই ঐ তিন শরীরের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান সদাই চলে থাকে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে নিম্নতম তিন *চক্রই* সক্রিয়, উর্ধ্বতন চক্রগুলি সুপ্ত থাকে। এই উর্ধ্বতন কেন্দ্রগুলিকে বিশেষ বিশেষ যৌগিক অনুশীলনের সাহায্যে জাগরিত

করা সম্ভব, আর তখনই প্রতিটি কেন্দ্রে এক একটি বিশেষ চেতনা প্রকাশ পেতে থাকে। শরীর ও মনের এই সংযোগের জন্যই তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। আমরা জানি যে, চিন্তা ও আবেগসমূহ শরীরকে কেবল প্রভাবিত করে না, তার মধ্যে পরিবর্তনও এনে থাকে।

স্বার্থপর পাশবিক চিন্তা ও আবেগ মানুষের পাশববৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত নিম্নতর চেতনাকেন্দ্রগুলিকে প্রভাবিত করে। উচ্চতর চিন্তা ও আবেগসমূহ ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রগুলিকে প্রভাবিত করে। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, আমাদের প্রত্যেকের *তমঃ, রজঃ* ও *সত্ত্ব,* তিনটি পৃথক পৃথক অবস্থা রয়েছে। *তমঃ* হলো উচ্চজীবনের জন্য চেষ্টাশূন্য অলস ইন্দ্রিয় ভোগের অবস্থা। *রজঃ* হলো উচ্চতর ও নিম্নতর প্রকৃতির মধ্যে লড়াইয়ের অবস্থা। *তমঃ* ও *রজঃ* নিম্নতর চক্র বা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রগুলি *সত্ত্বের* সঙ্গে যুক্ত। *সত্ত্ব* অবস্থায়, উচ্চতর প্রকৃতি বা চেতনা প্রাধান্য পেয়ে থাকে, কিন্তু মন্দভাবের তখনও পরিবর্তন হয় না। মন্দভাব বৃদ্ধির বীজ অচেতন অবস্থার মধ্যেই থাকে, তাদের তুলে ফেলে দেওয়া যায় না। কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করা যায়।

সুষুম্না কেবল তখনই সক্রিয় হয়ে ওঠে, যখন আমরা *সাত্ত্বিক* ভাবে জীবন যাপন করি। ব্যক্তিত্ব স্ফুরণে যেসব মনঃশক্তি কাজ করে তাদের মধ্যে অবশ্যই সমতা রক্ষা করতে হবে। যখন মন অত্যন্ত সক্রিয় বা অতি চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন নিশ্চয়ই বুঝবে যে আমাদের মনঃশক্তি অনেকটাই বিপথে চালিত হচ্ছে। যখন আমরা নিজেদের অতিক্রিয়াশীল, অস্থির, ক্রোধান্বিত, বিষাদগ্রস্ত অথবা মাত্রাতিরিক্ত আমুদে ও অসাবধান হবার দিকে ছেড়ে দি—তখন আমরা মনঃশক্তির অনেকটাই হারাই। কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে তোলা লোকে যতটা সহজ মনে করে, ততটা সহজ নয়। এর জন্য চাই প্রভূত ইচ্ছাশক্তি ও সংযম। প্রথম প্রথম মনঃশক্তিকে একমাত্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগেই জোর করে *সুষুম্না* পথে চালিত করা কঠিন।

তাই, প্রথম দিকে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয় মনকে হৃদয়কেন্দ্রস্থিত প্রভুর মানস চিত্রে একাগ্র করতে। প্রভুর প্রতি ভক্তিভাব নিয়ে আমরা মনকে হৃদয়ে একাগ্র করতে চেষ্টা করি। সব রকমে শক্তির অপচয় বন্ধ হলে, হৃদয় হয়ে ওঠে আমাদের চেতনা কেন্দ্র। এই সব কাজে সফল হলে, ঈশ্বরের কৃপায় কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন। প্রথমে আমাদের আরম্ভ করতে হবে পদ্ম, জ্যোতিঃ, দেবমূর্তি প্রভৃতির কল্পনা দিয়ে। কিন্তু যখন আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়, তখন আমরা কল্পনার পেছনে যে সত্য নিহিত আছে তাকে উপলব্ধি করি। তখন আমরা দেখি, এতদিন আমরা যেসব বিষয়ে কল্পনা করে এসেছি তার প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে।

যতদিন বাসনার বীজ, অতীত অভিজ্ঞতার অন্তর্লীন ছাপ (স্মৃতি), মনে থাকবে ততদিন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ধারা কখনই নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে না। প্রথম প্রথম আমরা কেবল কিছু অস্পষ্ট ঝলকই পেতে পারি। কিন্তু জ্ঞানালোকের প্রতিটি সামান্য রশ্মি সেই অন্তর্লীন ছাপের (স্মৃতির) কিছু কিছুকে দগ্ধ কর ফেলে। অধ্যাত্ম চেতনার যা পরাকাষ্ঠা, যা নির্বিকল্প সমাধি নামে পরিচিত, সেই স্তরে কেবল তখনই ওঠা যায় যখন বাসনা-বীজের প্রায় সমস্তটাই ওভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আংশিক অভিজ্ঞতা, ক্ষণস্থায়ী আধ্যাত্মিক দর্শন, সাময়িক ভাবাবেশ—স্ব স্ব ক্ষেত্রে এগুলি যতই কল্যাণকর হোক না কেন, এরা আমাদের শ্রেষ্ঠ পরমানন্দের অধিকারী করতে পারে না। যতদিন আমরা নিম্ন স্তরগুলিতে নড়াচড়া করব, আমাদের অবস্থা নিরাপদ হবে না।

একমাত্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সহায়েই আমাদের কাছে ঈশ্বর ও আপন সত্তা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে। ধর্মের চরম লক্ষ্যই হলো জগৎ প্রপঞ্চের পেছনে যে সত্য নিহিত রয়েছে তার অনুসন্ধান করা। সাধারণত যিনি একমাত্র সত্য, সেই ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে, আমরা নানা বাহ্য বস্তুর ওপর নির্ভর করে থাকি। ফলে অবাস্তব বস্তুকে আমরা বাস্তব মনে করি, আর একমাত্র যিনি বাস্তব তাঁকে অবাস্তব বলে মনে করি। সত্যকে জানার শক্তি আমাদের মধ্যে সুপ্ত থাকে। সেই শক্তিকে আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। প্রত্যেকটি চক্রে আমরা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করি আর সত্যের এক একটি নতুন রূপ উপলব্ধি করি। হৃদয়-চক্রটি যখন জাগে, তখন মানুষ নিজেকে শরীর ও চিন্তারাশি থেকে পৃথক, জীব সত্তা, জীবাত্মা, জ্যোতির্ময় চৈতন্য-বিন্দুরূপে উপলব্ধি করে। *কুণ্ডলিনী* যখন ভ্রূযুগল মধ্যে স্থিত কেন্দ্রে এসে পৌঁছয়, সাধকের তখন অনুভূতি হয় যে জীবাত্মা পরমাত্মারই একটি অংশ, জীব সত্তা সেই বিরাট সত্তার একটি অংশ। অধিকাংশ লোকই এই স্তরের পরে আর অগ্রসর হতে পারে না।

## ঐ সর্প-শক্তির সঙ্গে ছেলেখেলা করো না

এখানে সকল অধ্যাত্মানুসন্ধিৎসুরই একটা কথা জেনে রাখা উচিত। যারা দেহ-মনের পবিত্রতা রক্ষা না করেই আধ্যাত্মিক অনুশীলনে তৎপর হয়, তারা আধ্যাত্মিক দিক থেকে শুধু শক্তির অপচয়ই করে না, পরন্তু অত্যধিক শক্তি একত্রিত করায় বিপদ ডেকে আনে, কারণ ঐ শক্তি জাগতিক পথে প্রবাহিত হয়ে তাদের যৌন-জীবন সহ ভোগের জীবনকে প্রবল করে তুলে নিজেদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই গল্পটির কথা স্মরণ রাখবে, যেখানে এক চাষী তার জমি চাষ করে ক্ষেতে জল আনার চেষ্টা করে দেখল যে ইঁদুরের গর্ত দিয়ে সব জল

বেরিয়ে যাচ্ছে।[১] সংসারী লোকের ক্ষেত্রে সাংসারিক বাসনাগুলিই সেই গর্ত যার ভেতর দিয়ে শক্তি বেরিয়ে যায় সাংসারিক পথে।

আমি যখন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলাম, তখন একবার এক মনস্তাত্ত্বিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে যোগ শেখাতেন। তাঁর স্ত্রী 'সর্পশক্তি'র একটি ছবি আঁকছেন দেখে প্রশ্ন করি ঃ 'সাপের সঙ্গে খেলা করা বিপজ্জনক নয় কি?' তিনি হেসে জবাব দেন, 'না স্বামীজী, লোকে এসবের ওপর গুরুত্ব দেয় না।' কিন্তু কখনো কখনো কিছু লোক ব্যাপারটির ওপর গুরুত্ব দেয় ও মানসিক পবিত্রতা অর্জন না করেই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করে। যথেষ্ট পবিত্রতা ছাড়াই একাগ্রতা অভ্যাস করা বিপজ্জনক। একাগ্রতার ফলে যে অতিরিক্ত শক্তি উদ্ভূত হয়, তা অধ্যাত্ম পথে যেতে না পেরে, বহির্মুখী ব্যক্তির ক্ষেত্রে অদম্য কামেচ্ছারূপে প্রকাশ পেতে পারে, ফলে তার নিজের ও অপরের ক্ষতি হতে পারে। অন্তর্মুখী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐ সংগৃহীত শক্তি বাহ্য প্রকাশের সুযোগ পায় না। ফলে ঐ ব্যক্তির মনে এক ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি করে তার স্নায়ু ও মনকে চূর্ণবিচূর্ণ করে তাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলে।

কোন কোন ক্ষেত্রে, ধ্যানের মাধ্যমে মনকে একটু নাড়া দিলে মনের গভীরে আবৃত সব ভাল মন্দ বিষয়গুলি প্রবল শক্তিতে ওপর তলায় ভেসে উঠে দেহ-মনের ক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে। ঐ সব অশুদ্ধ সত্তারা 'সাপে'র সঙ্গে খেলতে গিয়ে সব সময়ে দুঃখকেই ডেকে আনে। অন্য অন্য ক্ষেত্রে আবার ঐ সঞ্চিত শক্তি প্রকাশ পেতে পারে সামান্য সিদ্ধাইরূপে, যেমন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু শ্রবণ বা দর্শন, অন্যের মনের কথা অনুধাবন, আর এই সব ক্ষমতা ঐ লোককে অহঙ্কারী ও অধ্যাত্ম জীবনে অন্তঃসারশূন্য করে তোলে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, সুপ্ত শক্তির আংশিক জাগরণও ঘটতে পারে। ফলে অধ্যাত্ম শক্তি উচ্চতর কেন্দ্রে উঠতে পারে, কিন্তু সাংসারিক বাসনা কামনাকে উত্তেজিত করায় তার বিধ্বংসী ফলসহ পতনও হতে পারে। কিন্তু যে অকপট জীবসত্তা প্রার্থনা, জপ ও ধ্যানাভ্যাসে নিরত থেকে নৈতিক অনুশীলন পালন করে, তার ক্ষেত্রে একেবারেই কোন ভয় নেই। তার পক্ষে অধ্যাত্মজীবন সুরক্ষিতই থাকে।

## আধ্যাত্মিক বিকাশ কদাচিৎ সমভাবে হয়ে থাকে

প্রতিটি সাধককে যেসব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে একটি হলো ঃ আধ্যাত্মিক অগ্রগতি কদাচিৎ সমভাবে হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক বিকাশের

---

১ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৬৪৪

গতি সরল রেখা ধরে হয় না। এক উচ্চ কেন্দ্রে উঠে সাধক হয়তো দেখবে সামনের পথ বন্ধ। সেইখানেই তাকে থেমে যেতে হয়, আর তার শক্তি বেপথ ধরে চলতে থাকে। আবার আপন পথে ফিরে আসতে বহু সময় লাগতে পারে। কখনো কখনো সাধক দেখে সে একই বৃত্তাকার পথে বার বার ঘুরছে, কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। মহান খ্রীস্টান মরমী সাধক, সেন্ট জন অব দি ক্রশ, এই অবকাশ বা 'অফলপ্রসূ' কালগুলিকে 'জীবসত্তার অন্ধকার রাত্রিস্বরূপ' বলে বর্ণনা করেছেন, আর বলেছেন যে প্রত্যেক সাধকের জীবনে এগুলি অপরিহার্য। কিন্তু তাদের তীব্রতা ও স্থিতিকাল কমে আসতে পারে যদি সাধক অবিচলিত ভাবে নৈতিক পথ অনুসরণ করে। মনের পবিত্রতা, কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ও ভক্তি অনায়াস আধ্যাত্মিক অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতির বর্ণনা যথেষ্ট সরল ও সহজ বলে মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সর্বৈব ভাবে অত্যন্ত কঠিন। গীতায় যেমন বলা হয়েছে ঃ

**মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।**
**যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।**[২]

—সহস্র যত্নশীল সাধকের মধ্যে হয়তো একজনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হতে পারে।

কিন্তু এর জন্য নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। অধিকাংশ লোক যেভাবে জীবন যাপন করে তাতে আমাদের মনে হয় যে তাদের ক্ষেত্রে *কুণ্ডলিনী* যত ধীরে জাগ্রত হয় বা জাগ্রত না হয় ততই মঙ্গল। অধিকাংশ লোকই *কুণ্ডলিনী* জাগরণের জন্য একটুও তৈরি নয়। এর যে প্রবল প্রতিক্রিয়া তার মুখোমুখি হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাস্তবিক, অধ্যাত্মজীবনের শুরুতে *কুণ্ডলিনীর* কথা মনে না আনাই ভাল, কেবল ঈশ্বর-চিন্তাই মঙ্গল; *ইষ্ট দেবতার* প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতিতেই যেন তোমার মন ও শক্তি সর্বতোভাবে নিয়োজিত থাকে। *কুণ্ডলিনীকে* তাঁর কাছেই সমর্পণ করে রাখ। তিনিই তোমার আধ্যাত্মিক কল্যাণের ব্যবস্থা করবেন। ঈশ্বরের কৃপায় যথা সময়ে তোমার আত্মজ্ঞান হবে।

আমি যেমন বার বার বলেছি, সমন্বয়ের পথ—*কর্ম, জ্ঞান* ও *ভক্তির* একত্র সমাবেশের পথ অনুসরণ করাই শ্রেয়। নিষ্কাম কর্ম যেন তোমার ধ্যান চিন্তার সঙ্গে সহযোগিতা করে চলে। এতে মন শুদ্ধ ও সবল হবে। আত্ম-বিশ্লেষণ অভ্যাস কর, আর মনকে অনাসক্ত ও শান্ত রাখ। তারপর *জপের* দ্বারাই বাকি কাজ হবে। *জপ* ঠিকমতো করলে, তাতেই অন্তরে সাম্যভাব আসে আর সেই ভাব ধীরে ধীরে *সুষুম্নার* মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে তাকে সক্রিয় করে তোলে।

---

২ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* ৭/৩

## কুণ্ডলিনী জাগ্রত করবার শ্রেষ্ঠ উপায়

আমাদের আধ্যাত্মিক পথ—হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান বা সুফি, যারই হোক না কেন—আমাদের সকলকেই শুদ্ধি, ধ্যান ও ঈশ্বরীয় সত্য বা ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, এই তিন স্তরের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাতে হলে আমরা কিভাবে ধ্যানাভ্যাস আরম্ভ করব? আমাদেরই একজন সহযোগী আমাদের আধ্যাত্মিক আচার্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রশ্ন করেন, 'মহাশয়, *কুণ্ডলিনী* বা সুপ্ত আধ্যাত্মিক চেতনা কিভাবে জাগিয়ে তোলা যায়?' ঐ স্বামীর জবাব এই রকম ছিল ঃ "কারো কারো মতে *কুণ্ডলিনী* জাগ্রত করতে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী পালনীয়, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এর জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় হলো *জপ* ও *ধ্যান*। এযুগে *জপই* বিশেষভাবে উপযোগী, আর এর থেকে আরো বেশি সহজ আধ্যাত্মিক অনুশীলন আর নেই, আর মন্ত্রজপের সঙ্গে সঙ্গে *ধ্যান জপ* অবশ্যই চলবে।"[৩]

নানাভাবে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব—পিতা বা মাতা রূপে, জ্যোতির্ময় আলোক রূপে এবং অন্যান্য আরো অনেক ভাবে। হৃদয়কে তোমার চেতনা কেন্দ্র করে, ঈশ্বর চৈতন্যকে তোমার ইচ্ছামতো যে কোন রূপে ঐখানে চিন্তা কর। ঈশ্বরীয় নাম জপ বা ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ বার বার করতে থাক, তা দিয়ে যে দিব্য ভাবটি সূচিত হচ্ছে তারই অনুচিন্তন মনে মনে করতে থাক। এটি হলো সহজ ধ্যান, কিন্তু পরে এই ধ্যানই প্রকৃত ধ্যানের দিকে নিয়ে যায়, যা জীবাত্মা ও পরমাত্মায় মিলন ঘটাতে সহায়তা করে।

সৎ-কথা ও সৎ-চিন্তা মহতী শক্তি। সাধক যেমন যেমন ঈশ্বরের নাম জপ ও পরম চৈতন্যের ধ্যান করতে থাকবে, তখন তখনই সে অনুভব করবে যে পবিত্র স্পন্দন ও চিন্তাসমূহ তার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও অহংভাবকে পবিত্র থেকে পবিত্রতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে। এ কাজের একাগ্রতা যখন বৃদ্ধি পাবে, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস ছন্দোবদ্ধ হবে, প্রাণশক্তিতে সাম্যভাব আসবে, মন পবিত্র ও শান্তভাব ধারণ করবে, আর অহংভাব বিশ্ব-কেন্দ্রিক হবে। এই পথেই ধাপে ধাপে অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ ঘটবে। ধ্যানসহ ঈশ্বরের নামজপ সৃষ্টি করে এক দিব্য সঙ্গীতলহরী, যা অধ্যাত্ম প্রণালীটিকে বাধা মুক্ত করে, সুপ্ত সর্পশক্তিকে জাগরিত করে এবং সেই শক্তিকে ঐ বাধামুক্ত পথে প্রাণবন্ত উচ্চতর কেন্দ্রে সঞ্চারিত হতে সহায়তা করে।

## কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতি

চেতনা যত উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর স্তরে উঠতে থাকে, তার গতি অনুভূমিক ও

---

৩ Swami Prabhavananda. *The Eternal Companion*. [Madras : Sri Ramakrishna Math, 1971] p. 275

উত্তরণ দু-দিকেই হতে থাকে। জীবসত্তা ও বিরাটসত্তা নিকটতর হতে থাকে। এই ব্যাপারটিকে উপনিষদে প্রতীক স্বরূপে প্রকাশ করা হয়েছে একটি উপমার মাধ্যমে, যাতে সুন্দর ডানাযুক্ত দুটি পাখি একই গছে বাস করে, একটি ওপরের ডালে অপরটি নিচের ডালে।[৪] নিচের পাখিটি ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকে ও শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে যে তারা দুটি একই পাখি। যোগীর ভাষায় নিচের পাখিই হলো মেরুদণ্ডের তলদেশে (মূলাধারে) অবস্থিত জীবাত্মা। ওপরের পাখিটি হলো সহস্রারে (মস্তিষ্কে) সহস্রদল পদ্মের ওপর অবস্থিত পরমাত্মা। ব্যক্তি-চেতনা *সুষুম্নারূপ* আধ্যাত্মিক প্রণালীর পথে প্রবাহিত হয়ে শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছে পরমাত্মার সঙ্গে তার মিলন উপলব্ধি করে। এই হলো জীবাত্মার উচ্চতম অধ্যাত্ম স্তরের দিকে ঊর্ধ্বগতি ও সেই পথের অভিজ্ঞতা। অধিকাংশ জীবই এই স্তর থেকে দৃশ্য জগতে আর ফিরে আসে না। কিন্তু, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, কোন কোন সত্যদ্রষ্টা ঋষি লোক-কল্যাণের জন্য আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা থেকে স্বেচ্ছায় নেমে আসেন।[৫]

প্রত্যেকটি কেন্দ্র বা *চক্রের* সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞতা বিষয়ে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা হলো ঃ

> **"(বহু) সাধ্য-সাধনার পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন। ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না নাড়ী—সুষুম্নার মধ্যে ছটি পদ্ম আছে। সর্ব নিচে মূলাধার। তারপর, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে ষট্‌চক্র বলে।**
>
> **"কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর—এইসব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পদ্ম—সেইখানে এসে অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্য হয় আর জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধক অবাক হয়ে জ্যোতিঃ দেখে আর বলে, 'এ কি! এ কি!' ষটচক্র ভেদ হলে কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মে গিয়ে মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়।**
>
> **"বেদমতে এ-সব চক্রকে—'ভূমি' বলে। সপ্তভূমি। হৃদয়—চতুর্থভূমি। অনাহত পদ্ম, দ্বাদশ দল।**
>
> **"বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চমভূমি। এখানে মন উঠলে কেবল ঈশ্বর-কথা বলতে আর শুনতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের স্থান কণ্ঠ। ষোড়শ দল পদ্ম। যার এই চক্রে মন এসেছে তার সমানে বিষয় কথা—কামিনী কাঞ্চনের কথা—হলে ভারী কষ্ট হয়। ওরূপ কথা শুনলে সে সেখান থেকে উঠে যায়।**
>
> **"তারপর ষষ্ঠভূমি। আজ্ঞা চক্র—দ্বিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী এলে**

---

৪ *মুণ্ডকোপনিষদ্*, ৩/১/১-৩; *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্*, ৪/৬-৭

৫ *পূর্বোল্লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১৩৩, ১৪৪, ৩৪৬

ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছুঁলাম। কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে বলে ছোঁয়া যায় না।

"তারপর সপ্তমভূমি। সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুলকুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন—তিনি শক্তির সঙ্গে মিলিত হন। শিব-শক্তির মিলন।

"সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হয়। আর বাহ্য থাকে না। সে আর দেহরক্ষা করতে পারে না। মুখে দুধ দিলে দুধ গড়িয়ে যায়। এ অবস্থায় থাকলে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

"ঈশ্বরকোটি—অবতারাদি এই সমাধি অবস্থা থেকে নামতে পারে। তারা ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নামতে পারে। তিনি তাদের ভিতর 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি'—লোকশিক্ষার জন্য রেখে দেন। তাদের অবস্থা যেন ষষ্ঠভূমি আর সপ্তমভূমির মাঝখানে বাচখেলা।"[৬]

এই সব পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তিরা দেখেন যে এক চৈতন্য সর্বজীবের অন্তরে থেকে আলোক বর্ষণ করছেন, আর সব লোকের প্রতি প্রেমে ও করুণায় ভরে রয়েছেন। তাঁরাই আমাদের কাছে অতিচেতন পুরুষের সংবাদ বহন করে আনেন। তাঁদের সমস্ত জীবনই কেটে যায় মানবকে অধ্যাত্ম পথ প্রদর্শনের কাজে। সব রকম মলিনতা ও স্বার্থপরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে, পরমাত্মার চেতনায় সর্বদা মগ্ন থেকে এই সব ব্যক্তিরা জগৎ-কল্যাণের জন্য জীবন ধারণ করে অনুপম আদর্শ হয়ে থাকেন। তাঁরাই মানুষের আধ্যাত্মিক ভবিতব্যতা, মানবাত্মার দেবত্বের সাক্ষিস্বরূপ। আসুন, আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় আধ্যাত্মিক উন্মেষের বিভিন্ন স্তরের একটি বর্ণনাচিত্র দেওয়া হলো)

Anthropomorphic = ঈশ্বরে নরত্ব আরোপিত করে

Non-Anthropomorphic = ঈশ্বরে নরত্ব আরোপিত না করে

I এক সাধারণ লোক (A) একটি সৎ বা সাধু ব্যক্তিত্বের (B-এর) সান্নিধ্যে এসে তাঁকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে।

II A,B-এর মধ্যে আরো বেশি বেশি ঈশ্বরীয় মহিমা দেখে।

III A অনুভব করে যে B যেন একটি মহিমোজ্জ্বল প্রকাশ, আর A হলো একটি হীন প্রকাশ, কিন্তু যেমনই হোক তা সেই একই অনন্ত সত্যের (O-এর ) প্রকাশ।

---

৬ তদেব, পৃঃ ৫০৪-০৫

IV A অনুভব করে যে, সে একটি জীবাত্মা—যেন শুদ্ধ-চৈতন্যের একটি বিন্দু-স্বরূপ আর সত্য যেন শুদ্ধ-চৈতন্যের একটি বৃত্ত। কিন্তু বিন্দুটি যেন বৃত্ত থেকে বেশি সত্য বলে মনে হয়।
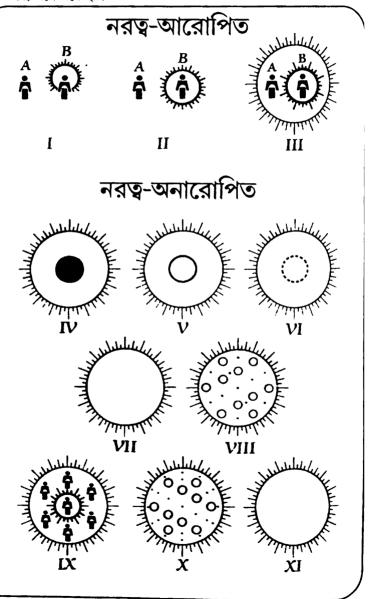
V A দেখে বিন্দু ও বৃত্ত উভয়েই সমভাবে সত্য।

VI A দেখে বৃত্ত বিন্দুর থেকে বেশি সত্য।

VII বিন্দু-চেতনা বৃত্ত-চেতনায় বা অনন্ত সত্যে লয় হয়েছে।

VIII দেখা যাচ্ছে বৃত্তটি, যা স্বরূপত চরম সত্য, নিজেকে বেশি বা কম ঈশ্বরীয় মহিমা-বিশিষ্ট বহু জীবাত্মায় নিজেকে অভিব্যক্ত করেছে।

IX চরম সত্যটি, যিনি প্রথমে নিজেকে বহু জীবাত্মায় অভিব্যক্ত করেছেন, তিনি নিজের আরো অভিব্যক্তি ঘটাচ্ছেন মানবরূপে, বস্তুত সকল জীবরূপে। ঐ দেবমানবটি, B-সজ্ঞক সাধু ব্যক্তিত্বটি—যাঁর উপাসনা করে A তার অধ্যাত্ম জীবন শুরু করেছিল আবার এক নতুন সন্নিবেশে আবির্ভূত হচ্ছেন। অবশ্য, ভিন্ন ভিন্ন দেবমানব বা সাধু ব্যক্তিত্ব আছেন, কিন্তু ভক্ত তার নিজ 'ইষ্টম্' বা নির্বাচিত আদর্শটির ওপরই বিশেষ মনোযোগ দেয়।

X এক চৈতন্যই নিজে বহু জীবাত্মারূপে অভিব্যক্ত হচ্ছেন।

XI অদ্বৈতভাব, গুণাতীত সত্য।

পূর্ণ জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোন অধ্যাত্ম চেতনায় থাকতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে অন্য আধ্যাত্মিক চেতনাতেও থাকতে পারেন।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কোন সীমা নেই।

## সম্পাদকের মন্তব্য

[পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত চিত্রগুলি স্বামী যতীশ্বরানন্দ স্বয়ং তৈরি করেছিলেন তাঁর ইউরোপে অবস্থান কালের প্রথম দিকে, সম্ভবত ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে। এগুলির মধ্যে স্বামী ছকের সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, একজন সাধক আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সময় যখন বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে যায়, তখন তার কত রকমের অভিজ্ঞতা হয়—একটি দেবতার প্রতি সরল ভক্তি থেকে চরম অদ্বৈত অনুভূতি, তারপর সেই সর্বমহিমান্বিত সত্যের সর্বগ্রাহী পূর্ণাঙ্গ স্বরূপের দর্শন পর্যন্ত। অগ্রগতির সমগ্র পথটিকে একটি ঘণ্টাকৃতি বক্ররেখার অনুরূপ ভাবা যেতে পারে ঃ প্রথমে চেতনার নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে আরোহণ এবং উচ্চতম স্তরে ওঠার পর সত্যের বিভিন্ন ও বিস্তৃততর রূপের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নিম্নস্তরে অবতরণ, সেখানে চিত্রিত করা হয়েছে। এই 'আরোহণ' ও 'অবতরণ'কে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম দিয়েছেন 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান'। বস্তুত ঐ ছকটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মূল দার্শনিক ভাবসমূহকে চিত্রাকারে বোঝানো হয়েছে।]

[ঐ ছকের অনুলিপি স্বামী যতীশ্বরানন্দ ভারতে ও পাশ্চাত্যদেশে তাঁর শিষ্যদের

মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। অবশ্য, অনেকের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশ ছাড়া ছকটি বুঝতে পারা কঠিন বোধ হয়েছিল এবং তারা এই ছকের একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এই প্রয়োজন মেটাতে আমরা পরবর্তী তিনটি অনুচ্ছেদে ছকটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলাম।]

## আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রাথমিক স্তর

বেদান্তে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের দুটি মূল রাজপথ রয়েছে : জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গ। কর্ম ও যোগের মতো অন্য পথগুলিকে সাধারণত ঐ মূল পথ দুটির আনুষঙ্গিক পথ বলে ধরা হয়। জ্ঞানমার্গে সাধক অদ্বৈত অনুভূতিকে লক্ষ্য ধরে ব্যক্তিগত সাধনার ওপর বেশি জোর দেয়। ভক্তিমার্গে সাকার ঈশ্বরের দর্শনলাভকে লক্ষ্য রেখে ঈশ্বরকৃপা লাভের ওপর জোর দেয়। অবশ্য, এই পথ দুটি একেবারে ভিন্ন নয়; এরা কেবল সমান্তরালই নয়, বহু স্থানে পরস্পর মিলেছে ও আড়াআড়িভাবে ছেদও করেছে। সাধনার উচ্চস্তরে দুই পথের মধ্যে তফাত বোঝা কঠিন। একটি পথকে বর্জন করে কেবল অপরটি ধরে চলা বরং কিছুটা কষ্টকর, এমনকি ক্ষতিকরও হতে পারে। অধিকাংশ সাধকের পক্ষে, জ্ঞান ও ভক্তি দুই ভাবের মিলিত পথ অনুসরণ করাই মঙ্গলকর। বাস্তবিকপক্ষে বেশির ভাগ লোক তাই করে থাকে।

যে সাধক এই সমন্বয়ী পথ ধরে চলে, সাধারণত সে একটি শুদ্ধসত্ত্ব আদর্শপুরুষকে পূজা করেই তার অধ্যাত্ম জীবন শুরু করে। সে বিষ্ণু, শিব, দেবী বা গণেশের মতো একটি বিশেষ দেবতার আকর্ষণ অনুভব করে। অথবা সে আকৃষ্ট হয় শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ বা যীশু খ্রীস্টের মতো কোন ঈশ্বরাবতারের প্রতি। এঁদের একটিকে সে *ইষ্ট দেবতা* বা ঈপ্সিত আদর্শ-রূপে গ্রহণ করে। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ঈশ্বরের কোন একটি বিশেষ ভাবের প্রতি এই আকর্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হয়ে থাকে; সাধক নিজেই বুঝতে পারে না—কেন তার এই আকর্ষণ। সম্ভবতঃ এটি শিশুকালে পারিবারিক সংস্কারের প্রভাব থেকেই হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পরিবারে জাত শিশু বয়স্কদের কাছ থেকেই নারায়ণ বা বিষ্ণুকে ভক্তি ও পূজা করতে শেখে। ক্রমশ তার সমগ্র মন এই ভাবে ভাবিত হয় এবং পরে সে বুঝতে পারে যে, সে বিষ্ণু বা তাঁর কোন অবতারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছে। একই ভাবে, যেসব শিশু অন্য অন্য ধর্মীয় সংস্কারসম্পন্ন পরিবারে জন্মেছে, তারা সেই সব সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করতে শেখে।

এইটিই সাধারণ নিয়ম হলেও এর ব্যতিক্রম আছে। বর্তমান যুগে ভারতে ও

পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনে ভক্তির কেন্দ্রে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সবই আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের কোন বিশেষ রূপের প্রতি ব্যষ্টি মানবের আকর্ষণ নির্ভর করে তার মানসিক গঠনের ওপর, যা আবার নির্ধারিত হয় তার সংস্কার বা অন্তর্নিহিত পূর্ব প্রভাবের ওপর। খুব কম সাধকই নিজে এসব বিষয়ে সচেতন থাকে। সাধক সাধারণত, যেটুকু জানে তা হলো একটি পবিত্র মূর্ত আদর্শের প্রতি তার অদম্য আকর্ষণ বোধ এবং তাঁকে পূজার্ঘ্য নিবেদনের জন্য এক তীব্র আবেগের অনুভূতি। (চিত্র—I)

প্রথমে সাধারণত তার ঈপ্সিত আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণার অভাব দেখা যায়; আর সে তাঁর ওপর সব রকম মানবীয় গুণ আরোপ না করে পারে না। মহান সুফি সন্ত ইবন্ আরবী এক সময়ে বলেছিলেন যে, বহু মানব যাঁকে ঈশ্বর বলেন, তিনি প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ অহংবোধের প্রক্ষেপ মাত্র। এই উক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো—প্রত্যেকটি মানুষের সত্য সম্বন্ধে ধারণা নির্ভর করে নিজের সম্বন্ধে তার ধারণার ওপর। মানুষ যেমন বড় হতে থাকে, নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে, সেই অনুসারে ঈশ্বর সম্বন্ধে তার ধারণাও পরিবর্তিত হয়। যেসব লোক লোভ, ঘৃণা ও ভয়ের উচ্ছ্বাসে প্রভাবিত হয়, তাদের ধারণায় ঈশ্বর হবেন ঐ সব গুণের কোন কোনটি সমন্বিত এক বিরাট সত্তা। সেমেটিক ধর্মগুলিতে ঈর্ষাকাতর ঈশ্বরের ধারণা হয়েছে এই ভাবেই। অবশ্য কালী বা দুর্গা সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা অন্য থাকের। বিশ্ব-প্রপঞ্চের একটি বাস্তবভাবসম্মত বোধের ওপর এর ভিত্তি। যে ভাবেই দেখি, ঈপ্সিত আদর্শের আদি ধারণা যেমনই হোক অধ্যাত্ম জীবনে সাধক যতই অগ্রসর হয়, সে দেখে যে ধীরে ধীরে এ আদর্শের পরিবর্তন হচ্ছে। সাধকের মন যতই শুদ্ধ হতে থাকবে, সে ততই দেখবে যে, তার পূজিত দেবতা অগাধ ভালবাসা, সীমাহীন করুণা আর দৈব ঐশ্বর্যের মতো মহৎ গুণাবলীতে সমৃদ্ধ। (চিত্র—II) এখন সে অন্তরে অনুভব করতে থাকে যে, সে এই সব ঈশ্বরীয় গুণাবলীর চিন্তায় আরো বেশি সময় কাটাতে চায়; আর এ থেকেই তার নিজ মনে সূক্ষ্ম পরিবর্তন আসতে থাকে। এর পর থেকে রূপ-ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে গুণ-ধ্যান চলতে থাকে; সে আগেরটি ত্যাগও করতে পারে।

এই স্তরে এসে সাধক সাংসারিক ভোগসুখের আকর্ষণ হারাতে থাকে। তার ঈপ্সিত আদর্শ ও তার চারপাশের নর-নারীর মধ্যে সাগর-প্রমাণ ব্যবধান দেখে আঘাত পায়। তার নজরে পড়ে সাধারণ লোকের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা, আর যেমন তাদের জন্য তার করুণার উদ্রেক হয়, তেমনিই দেবতার প্রতি তার ভালবাসা ও আকর্ষণ

বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে তখন তার ইষ্টদেবতার প্রতি আরো নিবিড় অনুরাগে উদ্বুদ্ধ হতে থাকে, আর তার মন, বাসনা, বিচার ও আবেগ সবই তাঁকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে। সে গভীর অনুরক্তির সঙ্গে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে ও তাঁর ধ্যান করে, তখন সেই দেবতা আর বেশিদিন বিচলিত না হয়ে থাকতে পারেন না।

দেবতার সাড়া প্রথমে অনুভব করা যায় হৃদয়-কেন্দ্রের জাগরণে। দিব্য জ্যোতির একটি কণা ভক্তের হৃদয় স্পর্শ করে আর 'হৃৎপদ্ম' যেন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। হৃদয়-কেন্দ্রের উন্মেষই হলো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত ও সন্দেহহীন প্রমাণ, এতেই জীবাত্মার বহুকাল-ব্যাপী নিদ্রা থেকে জাগরণ সূচিত হয়। সাধক তার ইষ্ট দেবতার জীবন্ত ও জ্যোতির্ময় মূর্তিকে তার হৃদয়-কেন্দ্রে দেখতে পায়, আর দেখে সেই দিব্যজ্যোতি নিজ সত্তায় অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। তখন সে নিজেকে দেবতার ক্ষুদ্র অংশ রূপে অনুভব করতে থাকে। এই স্তরে এসে সাধক তার জীবাত্মাকে আবিষ্কার করে। সে দেখে ঈশ্বরই জ্যোতির উৎস, আর 'ইষ্ট দেবতা' ও তার নিজ আত্মা তারই অংশ। এই 'জ্যোতিঃ' বাহ্য আলোকের মতো কিছু নয়, এটি হলো চৈতন্য জ্যোতিঃ, খ্রীস্টান মরমী সাধকেরা যাকে 'অনভিব্যক্ত আলোক' বলে থাকে। (চিত্র—III)

## অদ্বৈত ভাবের অনুভূতি

পরবর্তী স্তরে সাধক দেখে *ইষ্ট দেবতার* রূপ অরূপে লয় হয়ে গেছে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ হলো এক প্রত্যক্ষ উচ্চতর মাত্রার অনুভূতি—কল্পনামাত্র নয়। এখন তার চারিধারে ও অন্তরে রয়েছে কেবল বিস্তৃত জ্যোতিঃসমুদ্র। সেই দিব্য জ্যোতির বন্যায়, দেহ-চেতনা লোপ পায়, কিন্তু 'অহংচেতনা' থেকে যায়। সাধক দেখে যে ঈশ্বর যেন শুদ্ধ চৈতন্যের এক অসীম সমুদ্র, যার কেন্দ্রে সে নিজে রয়েছে। এখন যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো জীব সত্তা ও দেবতা, বিন্দু ও বৃত্তের মতো। ঐ বিন্দু বা অহংচেতনা হলো কেন্দ্র, যাকে চারিদিক থেকে ঘিরে আছে—অনন্ত জ্যোতিতে অবস্থিত দেবতা। অবশ্য বিন্দুকেই, বৃত্তের চেয়ে বেশি বাস্তব মনে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ঈশ্বর ও মানবের সংজ্ঞা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে : "মানুষ যেন এক অসীমবৃত্ত, যার পরিধির কোন সীমা নেই, কিন্তু যার কেন্দ্র এক বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ। আর ঈশ্বর যেন একটি অসীম বৃত্ত, যার পরিধিরও কোন সীমা নেই; কিন্তু যার কেন্দ্র সর্বত্রই রয়েছে।"[৭] (চিত্র IV)

---

৭ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫

আর একটু অগ্রসর হয়ে, সাধক দেখে যে তার সত্য সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। তার মনে হয় নিজ সত্তার বাস্তবতা যেন ক্রমে কমছে, আর ঈশ্বরের বাস্তবতা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অহংচেতনা ক্রমেই কমে যায়। (চিত্র—V) শীঘ্রই দিব্যজ্যোতির দীপ্তিতে অহংকে ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর বলে বোধ হয়। কেবল ঈশ্বরই একমাত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। (চিত্র—VI) শেষে নক্ষত্র যেমন প্রভাতের আলোকে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, অহংচেতনাও তেমনি দিব্যচেতনায় সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। একটি অভিন্ন, অনন্ত চৈতন্যই কেবল থাকে; এই হলো অদ্বৈত অবস্থা। (চিত্র—VII) অদ্বৈত মতে এই হলো অধ্যাত্ম অনুভূতির উচ্চতম অবস্থা। *মাণ্ডুক্য কারিকায়* এর বর্ণনা এইভাবে করেছে ঃ

'ঘট প্রভৃতির নাশ হলে ঘটাকাশ যেমন বিরাট আকাশে লীন হয়, তেমনি জীব আত্মায় লীন হয়।

'(এই আত্মা) সব রকম বাক্ প্রচেষ্টার অতীত, সব রকম চিন্তা প্রচেষ্টার অতীত। (এ অবস্থা হলো) পূর্ণ শান্তি, চিরন্তন জ্যোতিঃস্বরূপ, ক্রিয়াবসান ও অভয়স্বরূপ, (জীব সম্বন্ধে) ধারণা কেন্দ্রীভূত হলেই তা লাভ করা সম্ভব।

'পরমাত্মার উপলব্ধিই এই উচ্চতম আনন্দের ভিত্তি, এ হলো শান্তি, মুক্তির সমতুল্য, অবর্ণনীয় ও জন্মহীন। একে আবার সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম বলেও উল্লেখ করা হয়, কারণ ইনি জ্ঞানের যা লক্ষ্য, সেই জন্মহীন পরমাত্মার সহিত একীভূত।'[৮]

স্বামী বিবেকানন্দ এই অনুভূতির ব্যাপারটি 'গভীর সমাধি' নামে তাঁর কবিতাটিতে বর্ণনা করেছেন ঃ

**নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,**
**ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥**
**অস্ফুট মন-আকাশে, জগত-সংসার ভাসে,**
**ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥**
**ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,**
**বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥**
**সে ধারাও বন্ধ হলো, শূন্যে শূন্য মিলাইল,**
**'অবাঙ্মনসগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥**[৯]

---

৮ *মাণ্ডুক্য কারিকা*, ৩/৪, ৩৭, ৪৭। স্বামী নিখিলানন্দ-কৃত ইংরাজী অনুবাদ, (মহীশূর ঃ রামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৯৭৪) পৃঃ ১৩৮, ১৯৪, ২০৬ থেকে উদ্ধৃত।

৯ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭

## বিজ্ঞান—অখণ্ড অনুভূতি

অদ্বৈত-ই কি উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি? হিন্দু ঐতিহ্য এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ

"আপনারা দেখবেন জগতের সকল ধর্মাবলম্বীই বলে থাকেন, আমাদের ধর্মে একটা একত্ব আছে। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব-জ্ঞান অপেক্ষা আর অধিক উন্নতি হতে পারে না। জ্ঞান অর্থে এই একত্ব-আবিষ্কার। আমি আপনাদের নরনারীরূপে পৃথক দেখছি—এটাই বহুত্ব। যখন আমি ঐ দুই ভাবকে একত্র করে দেখি এবং আপনাদের কেবল 'মানবজাতি' বলে অভিহিত করি, তখন সেটা হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ, রসায়নশাস্ত্রের কথা ধরুন। রাসায়নিকেরা সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে ঐ গুলির মূল উপাদানে পরিণত করার চেষ্টা করছেন, আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে এক ধাতু (মৌলিক পদার্থ) থেকে ঐগুলি সব উৎপন্ন হয়েছে, সেটাও বার করার চেষ্টা করছেন। এমন সময় আসতে পারে, যখন তাঁরা সকল ধাতুর (মৌলিক পদার্থের) মূল এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করবেন। যদি ঐ অবস্থায় তাঁরা কখনো উপস্থিত হন, তখন তাঁরা আর অগ্রসর হতে পারবেন না; তখন রসায়ন বিদ্যা সম্পূর্ণ হবে। ধর্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। যদি আমরা পূর্ণ একত্বকে আবিষ্কার করতে পারি, তবে তার ওপর আর কোন উন্নতি হতে পারে না।"[১০]

এই ভাবে দেখা যায়, অদ্বৈত অনুভূতিই অনুভূতির *উচ্চতম* অবস্থা। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো ঃ এই কি *শেষ* অনুভূতি? অদ্বৈত অনুভূতিতেই কি সব রকম অধ্যাত্ম চেতনা নিঃশেষিত হয়ে গেল? শ্রীরামকৃষ্ণের মতে যারা প্রকৃত অদ্বৈত অনুভূতি (আংশিক দর্শন অথবা ঝিলিক দর্শন নয়) লাভ করে, তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে এইটিই শেষ অনুভূতি। তারা আর পরিদৃশ্যমান জগতে ফিরে আসে না।[১১] তবু অতি অল্প সংখ্যক সাধক ঋষি ফিরে আসেন। তাদের ক্ষেত্রে অদ্বৈতানুভূতি উচ্চতম হলেও সর্ব শেষ নয়।[১২] উচ্চতর উন্নতির দিক থেকে অদ্বৈত অনুভূতি নিঃসন্দেহে উচ্চতম কিন্তু অনুভূতির সমস্তরে সত্যের আরো অন্য মাত্রা এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। উপলব্ধিবান পুরুষদের মধ্যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অল্প কয়েকজন, যাঁদের *ঈশ্বরকোটি* বলা হয়ে থাকে, তাঁরা সত্যের সমস্তরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার দায়িত্ব নেন। উচ্চতম একত্বানুভূতির পর, এই সব ঋষিগণ যখন আপেক্ষিক জগত-প্রপঞ্চে ফিরে আসেন তখন তাঁরা এই জগতকে একেবারে নতুন আলোকে দেখেন।

---

১০ তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১-১২

১১ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১০২-০৩

১২ তদেব, ২০৪, ৪৮১-৮২

অগ্রগতির পথে, তাঁদের কাছে এই জগৎ ও তার অন্তর্গত অসংখ্য জীব ক্রমান্বয়ে তাদের সত্তা হারাতে হারাতে শেষে লুপ্ত হয়েছিল, কিন্তু নিম্নগতির পথে এই ঋষিরাই দেখেন পরম চৈতন্য সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চেই অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। ব্রহ্মচেতনা সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চের পটভূমি বা ভিত্তি হওয়ায়, তা হারায় না বরং পরমাত্মার জগতে পরিব্যাপ্তিতে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। জগৎ-প্রপঞ্চের এই অদ্বৈতভাবে রূপান্তরকে শ্রীরামকৃষ্ণ এক নতুন শাস্ত্রীয় নাম দিয়েছিলেন, *বিজ্ঞান*।

বিজ্ঞানীর (যার বিজ্ঞান আছে) অনুভূতি বর্ণনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

"জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' করে বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈরি—সেই ইঁট, চুন, সুরকিতেই সিঁড়িও তৈরি। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে, তিনি জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

"ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীবজগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে, তিনিই আমি, তিনিই জীবজগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।...

"বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎ-সংসার তাঁর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত।

"বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম, তিনি ভগবান, যিনিই গুণাতীত, তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীবজগৎ, মন-বুদ্ধি, ভক্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞান—এসব তাঁর ঐশ্বর্য।"[১৩]

বিজ্ঞানীকে, তথা পূর্ণাববোধসম্পন্ন মানবকে, কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করতে হয়? তাঁর চেতনা যখন অদ্বৈত পর্যায় থেকে নেমে আসে, তিনি প্রথমে দেখেন যে ব্রহ্ম নিজেকে এতগুলি জীবাত্মারূপে অভিব্যক্ত করেছেন। (চিত্র—VIII) আরো নেমে স্থূল স্তরে এসে তিনি দেখেন এক ব্রহ্মই সমগ্র বিশ্ব হয়েছেন। তিনি দেখেন এক পরমাত্মাই সমস্ত জীবরূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন এবং মানুষে মানুষে যে ভেদ দেখা যায়, তা কেবল এই অভিব্যক্তির মাত্রায় ও প্রকৃতিতে তারতম্যের জন্য। এই স্তরে ঋষির কাছে ঈশ্বরাবতারের রহস্য উদঘাটিত হতে থাকে। (চিত্র—IX)

আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে সাধককে বিভিন্ন দেবতা-রূপকেও অতিক্রম করে যেতে হয়েছিল, তখন তার বোধ হয়েছিল শুদ্ধ সাকাররূপ একজন

১৩ তদেব, পৃঃ ৫০-৫১

অবতার অথবা দেবতা, কেবল নিরাকার নিরপেক্ষ তত্ত্বের ছায়ামাত্র। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীর পরিণত আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করে ঋষি ঐ শুদ্ধ সাকাররূপকে নতুন আলোকে দেখতে থাকেন। তিনি তখন শ্রীরামকৃষ্ণের—'ঈশ্বর নিরাকাররূপে যেমন সত্য, সাকাররূপেও তেমনি সত্য'—কথাটির অর্থ বুঝতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন :

"তাঁর নানা রূপ, নানা লীলা—ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা; তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন, প্রেমভক্তি শেখাবার জন্য। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের ভেতরেই তাঁর প্রেম-ভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা—কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট।"[১৪]

অন্যভাবে, যদিও সব জীব—উদ্ভিদ, জন্তু, মানুষ, দেব, দেবী ও অবতারগণ—সকলেই মূলত ব্রহ্মরূপে এক, তবু মানুষে ও সাকার ঈশ্বরে এক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'যুক্তি ও ধর্ম' ('Reason and Religion') বক্তৃতায় এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়েছেন :

"বেদান্ত যখন বলেন, 'তুমি আমি ব্রহ্ম', তখন সেই ব্রহ্ম বলতে সাকার ঈশ্বর বোঝায় না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একতাল কাদা নিয়ে একটা প্রকাণ্ড মাটির হাতি গড়া হলো, আবার সেই কাদার সামান্য অংশ নিয়ে ছোট একটি মাটির ইঁদুরও গড়া হলো। ঐ মাটির ইঁদুরটি কি কখনো মাটির হাতি হতে পারবে? কিন্তু দুটিকে জলের মধ্যে রেখে দিলে দুটি কাদা হয়ে যায়। কাদা ও মাটি হিসেবে দুইটিই এক; কিন্তু ইঁদুর ও হাতি হিসেবে তাদের মধ্যে চিরদিন পার্থক্য থাকবে। অসীম নিরাকার ব্রহ্ম যেন পূর্বোক্ত উদাহরণের মাটির মতো।"[১৫]

একটু আগে যেসব উচ্চতর স্তরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, বিজ্ঞানী, বা পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তি, সে সব স্তরের যে কোনটিতে থাকতে পারেন। কখনো তিনি তাঁর অহংচেতনাকে পুরাপুরি নিরপেক্ষ সত্যে (শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে *নিত্য*, শাশ্বত, অব্যয় বলে উল্লেখ করতেন) লীন করতে পারেন, কখনো বা তিনি জগৎ-প্রপঞ্চের (*লীলার*) স্তরে নেমে আসতে পারেন, রহস্যময় বিশ্বের ক্রিয়াকলাপে আনন্দ উপভোগ করতে ও কঠোর সাধনায় রত অধ্যাত্ম সাধককে পথ দেখাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন :

'লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়; যেমন সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে ওঠা।

---

১৪ তদেব, পৃঃ ২২৮

১৫ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫

নিত্যদর্শনের পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়। ভক্তি-ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত।'[১৬]

নিত্য ও লীলার মাঝখানে অসংখ্য আধ্যাত্মিক স্তর রয়েছে, পূর্ণজ্ঞানী ইচ্ছামতো এর যে কোন স্তরে নানাভাবে উপলব্ধির আনন্দ লাভ করে অবস্থান করতে পারেন। (চিত্র—IX, X, XI)

এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, অদ্বৈতানুভূতির পরবর্তী স্তরগুলির সম্বন্ধে ধারণা নতুন নয়। বিদ্যারণ্যের মতে অদ্বৈতানুভূতির পর পূর্ণ মুক্তি পেতে হলে পূর্ব সংস্কারের হ্রাস প্রাপ্তি (*বাসনাক্ষয়*) ও মনের লয় প্রাপ্তি (*মনোনাশ*) অবশ্যই হওয়া চাই।[১৭] পতঞ্জলির মতও তাই, উচ্চতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাতটি স্তরের কথা তিনি স্বীকার করেন; প্রথম চারটি নিয়ে *কার্য-বিমুক্তি* পর্যায়, শেষের তিনটি নিয়ে *চিত্ত-বিমুক্তি* পর্যায় গঠিত।[১৮] বিদ্যারণ্য ব্রহ্মজ্ঞানের গভীরতা অনুযায়ী ব্রহ্মজ্ঞানীদের চারটি আদর্শে ভাগ করেছেন ঃ ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্-বরিষ্ঠ।[১৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ *বিজ্ঞানীর* যে বর্ণনা দিয়েছেন, পরম্পরাগত *জীবন্মুক্তের* বর্ণনা থেকে তার পার্থক্য হলো—বিজ্ঞানী পূর্ণজ্ঞানীদেরই একটি শ্রেণী যাঁরা লোকশিক্ষার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে জগতে আসেন ও *ঈশ্বরকোটি* নামে চিহ্নিত হন; আর *জীবন্মুক্ত* ব্যক্তি হলেন এক সাধারণ মরণশীল মানুষ যিনি অতীত কর্ম ফলের (প্রারব্ধের) অমোঘ নিয়মে সাধন-পূর্ব শরীরেই জীবন ধারণ করে চলেন। *বিজ্ঞানী* আর জীবন্মুক্তের পার্থক্য কতকটা বৌদ্ধধর্মে *বোধিসত্ত্ব* আর *অর্হৎ*-এর মধ্যে পার্থক্যের মতো; বৌদ্ধ ধর্মেও উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তরের কথা স্বীকার করে। *অর্হৎ* হলেন এক উদ্বুদ্ধ আত্মা, যিনি নির্বাণ লাভের পর নিজ মুক্তি অর্জন করেছেন। বোধিসত্ত্ব হলেন এক উদ্বুদ্ধ আত্মা, যিনি (নিজ নাগালের মধ্যে পেয়েও) নির্বাণ উপেক্ষা করেন আর্তজনের সেবার উদ্দেশ্যে। তাঁর লক্ষ্য হলো সর্বজনের মুক্তি।

এসব থেকে স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর কথামতো আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তির কার্যত কোন সীমা নেই। সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'।

---

১৬ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ২২৮

১৭ বিদ্যারণ্য, *জীবন মুক্তি-বিবেক*, অধ্যায়—১

১৮ পতঞ্জলি, *যোগসূত্র* ২.২৭, বিদ্যারণ্য ঐ সূত্রের ওপর ব্যাসের ও সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৯ *জীবন মুক্তি-বিবেক*, অধ্যায়-৪

# দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

# এই জীবনেই প্রকৃত মুক্তি লাভ

## আধ্যাত্মিক মুক্তির আদর্শ

এক ব্যক্তি ধর্মযাজকের বাড়ি এসে তাঁর খোঁজ করেন। দরজার কাছে যাজকের ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়। সে বলে, 'বাবা বাড়ি নেই।' তারপর দৃঢ়বিশ্বাসের হাসি হেসে আরো বলে : 'তুমি যদি পরিত্রাণ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করতে চাও, আমি সে সম্বন্ধে সব বলে দিতে পারি। আমি পরিত্রাণের পরিকল্পনাটি সব জানি।'

পরিত্রাণ এমন কোন বস্তু নয়; যা মুখের কথাতেই পাওয়া যায়। বেশির ভাগ লোক যা ভাবে, এ বিষয়টি তার থেকে আরো গভীরতর। এর বিষয়-বস্তু হলো জীবসত্তার প্রকৃত স্বরূপ ও তার চরম নিয়তি সম্বন্ধে ধারণা। প্রত্যেক ধর্মই পরিত্রাণ সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা পোষণ করে, কিন্তু সকলেই এক মত যে এটি পূর্ণ আনন্দের অবস্থা যা জীবসত্তা মৃত্যুর পরেই উপলব্ধি করতে পারে।[১]

প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই আনন্দময় অবস্থা লাভ করা যায়। ইহুদি ধর্মে বলে সম্পূর্ণ নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমেই এ অবস্থা লাভ করা যায়। খ্রীস্টীয় ধর্মে এর সঙ্গে আর একটি কথা জুড়ে দেয় : যদি সে খ্রীস্টকে একমাত্র পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস করে। খ্রীস্টীয় ধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে—তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে খ্রীস্ট মানবজাতিকে তার আদি পাপের দায় থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন। ইসলাম এ মত মানতে অস্বীকার করে। তাদের মতে পরিত্রাণ সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, আর তা লাভ করতে হলে মহম্মদকে শেষ পয়গম্বর বলে বিশ্বাস করা একান্ত প্রয়োজন। হিন্দু ধর্মের মতে পরিত্রাণের অর্থ *মুক্তি*। মুক্তির সন্ধান করাই মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

মুক্তির অর্থ কি? আমরা চার রকমের মুক্তির কথা শুনে থাকি : অভাব থেকে মুক্তি, ভয় থেকে মুক্তি, বাক্ স্বাধীনতা ও উপাসনা করার স্বাধীনতা। কিন্তু এগুলি যতই প্রয়োজনীয় হোক, সীমিত মুক্তি মাত্র। এগুলি কেবল মানবের সামাজিক জীবন সংক্রান্ত। সব আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকগণকে এ স্বাধীনতা দিতে দায়বদ্ধ।

---

১ c.f. Sw. Yatiswarananda. *Adventures in Religious Life*. Sri Ramakrishna Math, Madras. 1976. ch. 4

কিন্তু রাষ্ট্র আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে আবশ্যিকভাবে কোন দায় নিতে পারে না। মানবাত্মা তার সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ ও বিশ্বাসের বন্ধনে বদ্ধ। সমাজে তার সব রকম স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও, সে যদি আপন অন্তরের অধীনতা থেকে মুক্ত না হয়, তাকে মুক্ত পুরুষ বলা যায় কি করে? আমরা আরো কিছু চাই। যখন আমাদের বোধ হবে যে আমরা আত্মা, কেবল তখনই আমাদের ভেতর প্রকৃত মুক্তি লাভের জন্য সত্যকারের ব্যাকুলতা জেগে উঠবে। একমাত্র তখনই আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু। অধ্যাত্ম জাগরণের প্রথম লক্ষণ হলো নিজের নিজের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। তখন আমরা আবিষ্কার করি যে, আমরা শরীর নই, মনও নই—আমরা জীবসত্তা বা জীবাত্মাসমূহ—চেতনা-কেন্দ্রসমূহ।

কিসের থেকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক মুক্তির ধারণার উন্মেষ হয়ে থাকে? জীবাত্মার ঈশ্বর-সংযোগ চেতনা থেকে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন স্পষ্টভাবে বলেছেন—প্রত্যেক মানুষেরই মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।[২] কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এ আকাঙ্ক্ষা বিষয়মুখী হয়—যেমন ভোগের স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা। প্রকৃত মুক্তি হলো—ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবাত্মার সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ। ঈশ্বরের জন্য জীবাত্মার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে বিরল কয়েকজনের ক্ষেত্রেই মাত্র।

আদি অজ্ঞানের জন্য ব্যক্তি সত্তাই (জীবাত্মা) ব্রহ্ম বা বিশ্বচৈতন্য বা ঈশ্বরের থেকে পৃথক অস্তিত্বভাব। জীবত্ব বা ঈশ্বরাতিরিক্ত পৃথক সত্তার চেতনা বলতে সর্বদা ব্যথা, বন্ধন ও সীমাবদ্ধতাই বোঝায়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা ঈশ্বরোপলব্ধি করে জীবত্বের সমাপ্তি না ঘটাতে পারলে, কেউই মুক্তি লাভ করতে পারে না। জীবত্বের সঙ্গেই আসে আসক্তি ও সমস্ত রকমের তথাকথিত মানবীয় প্রেম ও ঘৃণা—যার অর্থ কেবল যন্ত্রণা ও দুর্গতি। যতদিন না নিজ প্রকৃত অনন্ত-স্বরূপ সম্বন্ধে জীবের উপলব্ধি হচ্ছে, ততদিন তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। আমরা চাই মুক্তি, চাই ভয়হীনতা। আমরা শরীর-মনের গণ্ডি ভেঙ্গে মুক্ত হতে চাই। যতদিন আমরা আমাদের বাসনা, কামনা ও পশুসুলভ ভোগাসক্তিতে লিপ্ত থাকব, ততদিন এই মুক্তিলাভ কখনই সম্ভব নয়। নিজের—তথা অন্যেরও—শরীর ও মনের প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ না হলে আত্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়।

## যথার্থ মুক্তি

মুক্তি সম্বন্ধে আমাদের একটি যথাযথ ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা

---

২ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৩য় খণ্ড, ১০৬-৭

কি ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা চাই, আমরা কি যথেচ্ছাচারী হতে চাই, না ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থেকে মুক্তি চাই? মুক্তির সঠিক ধারণা কোন্‌টি? এর অর্থ কি মনকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে, ভোগের পথে ছুটতে দেওয়ার স্বাধীনতা? এইভাবে নিজ নিজ কবর খোঁড়বার স্বাধীনতাই কি আমাদের কাম্য? না, বাসনারাজির ওপর প্রভুত্ব করার জন্য সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার স্বাধীনতা এবং ইন্দ্রিয়গুলি ও তাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হওয়াই আমাদের কাম্য? ইন্দ্রিয়াদির স্বাধীনতা, নিম্ন স্তরের বাসনা চরিতার্থ করার স্বাধীনতা আমাদের দুঃখকষ্টের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃত মুক্তি হলো সব রকম দুঃখ থেকে সার্বিক মুক্তি, আর তা লাভ করার একমাত্র পথ হলো আত্মাকে বা জীবসত্তাকে বাসনা ও ইন্দ্রিয়াদির প্রতি আসক্তি থেকে সরিয়ে রাখা। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেন :

'বেদান্তে ঈশ্বর-বিষয়ক যে-সকল তত্ত্ব আছে, সেগুলির মূলে পূর্ণ মুক্তি। এই মুক্তি হতে প্রাপ্ত আনন্দ ও নিত্য শান্তি ধর্মের উচ্চতর ধারণা। এটি সম্পূর্ণ মুক্তি অবস্থা—যেখানে কোন কিছুর বন্ধন থাকতে পারে না, যেখানে প্রকৃতি নেই, পরিবর্তন নেই, এমন কিছু নেই, যা তাতে কোন পরিণাম উৎপন্ন করতে পারে। এই একই মুক্তি, আপনার ভেতর, আমার ভেতর রয়েছে এবং এই একমাত্র যথার্থ মুক্তি।'[৩]

আধ্যাত্মিক দিক থেকে মুক্তি বলতে এমন এক অবস্থা যা কেবল বাধা-বোধের অভাবই নয়, পরন্তু উচ্চতর চেতনা জাগরণের অবস্থাও বোঝায়, যে অবস্থায় জীব-সত্তা—পরমাত্মারূপে, বিশ্বের চরম সত্য রূপে—তার সত্য প্রকৃতিকে উপলব্ধি করে। জগতের সব ধর্মেই এই আধ্যাত্মিক মুক্তি সম্বন্ধে কোন না কোন ধারণা আছে, তাকেই তারা জীবনের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করে থাকে। আমরা যে ধরনের মুক্তির কথা চিন্তা করছি, ধর্মীয় সাহিত্যে তাকে বিভিন্ন কথায় বোঝানো হয়ে থাকে। খ্রীস্ট ধর্মে একে বলে salvation and redemption (মুক্তি ও পাপ থেকে নিষ্কৃতি); বৌদ্ধ ধর্মে বলে নির্বাণ বা সমস্ত বাসনা ও সকাম কর্মের অবসান। হিন্দু ধর্মে বলে সব রকম দুঃখ ও বন্ধন থেকে জীবসত্তার পূর্ণ ও শেষ মুক্তি, অধ্যাত্ম জীবনের এই উচ্চতম লক্ষ্যকে বোঝাতে মুক্তি, মোক্ষ, অপবর্গ, বা নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করা হয়। এদিকে সাংখ্য দর্শনে আমরা পাই যে 'মুক্তি'র অর্থ হলো ত্রিবিধ দুঃখ থেকে জীবসত্তার মুক্তি। বেদান্ত বলেন, এর অর্থ পরমানন্দের উপলব্ধিও বটে।

ত্রিবিধ দুঃখ বলতে : শারীরিক অসুস্থতা, কামনা, ভ্রান্তি ও লোভজনিত দুঃখ ও বন্যপশু বা দুষ্ট লোকের মতো অন্য জীবের কারণে যে দুঃখ; আর আমাদের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত যেসব শক্তি, যেমন তাপ ও শীত, ঝড়, বৃষ্টি ও ভূকম্প—তা থেকে

৩ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০

আমাদের যে দুঃখ। সংস্কৃত ভাষায় দুঃখ বলতে সাধারণ শারীরিক ও মানসিক কষ্টের অতিরিক্ত আরো কিছু বোঝায়। সীমাবদ্ধতা বা বন্ধনও এর মধ্যে পড়ে। বেদান্ত মতে, জীবসত্তার সত্য প্রকৃতি হলো অসীম চেতনা ও আনন্দ। কিন্তু প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় একে সসীম, শরীরেন্দ্রিয়-মন দ্বারা বদ্ধ, মনে হয়। উদ্দেশ্য হলো জীবাত্মাকে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করা, যার অর্থ—সমস্ত গুণের বা বিশ্বশক্তির খেলার বা এলাকার পারে যাওয়া।

যতদিন মানবাত্মা বদ্ধ থাকে, সে প্রকৃত সুখ পেতে পারে না। সুখ বাহ্যবস্তুতে থাকে না। এ হলো প্রকৃত মানবসত্তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি। অজ্ঞান মানবসত্তার সত্য প্রকৃতিকে ঢেকে রাখে। এই ভাবে অজ্ঞানই বৃহত্তম বন্ধন। অজ্ঞান থেকেই অহংভাবের উৎপত্তি। অহংভাব থেকেই আসক্তি, ঘৃণা ও ভয় আসে। এসবগুলি তাকে বদ্ধ করে, নিজ অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-স্বরূপ অনন্ত সুখের অনুভূতি লাভে বাধা সৃষ্টি করছে। যেমনই হোক মানুষের ক্রমোন্নতিতে একটা স্তর আসে, যখন তার জীবাত্মা বহু যুগের নিদ্রা থেকে জেগে উঠে এই বন্ধন সম্বন্ধে সচেতন হয়। এরূপ হলে সে স্বীয় প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করে পূর্ণ মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করে।

অবশ্য, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের এই প্রকৃত মুক্তি লাভে যথার্থ আকাঙ্ক্ষা নেই। আমরা আমাদের বর্তমান সীমিত অস্তিত্ব ও তার অবস্থাদিতেই সন্তুষ্ট। এক অল্প বয়স্ক কারখানা শ্রমিককে নিয়ে একটি গল্প আছে, তাকে সরকারি উন্মাদ হাসপাতালে পাঠাতে হয়। কয়েক সপ্তাহ পরে তার এক সহকর্মী তাকে হাসপাতালে দেখতে যায়।

'ওহে, তোমার কেমন লাগছে?'

'আমি ভালই আছি।'

'শুনে খুশি হলাম। আমি মনে করি তুমি শীঘ্রই কাজে ফিরে আসবে।'

'তুমি কি মনে করছ? এই চমৎকার বড় বাড়ি আর এই সুন্দর বাগান ছেড়ে যাওয়া, আবার ফিরে গিয়ে কারখানায় কাজ করা! তুমি নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ মনে করছ।'

অধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধে অনেকেরই এই একই রকম অনুভূতি। তারা তাদের ছোট্ট আত্ম-কেন্দ্রিক অশুদ্ধ জীবন নিয়ে এতদূর সন্তুষ্ট যে, তারা মনে করে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা চালানো নিতান্তই মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ!

**গুণগত বন্ধন**

আমাদের ভেতরে ও বাইরে তিনটি বিশ্বশক্তি কাজ করছে ঃ *তমঃ* বা অন্ধকার-

আলস্য ভ্রান্তির জরা শক্তি; রজঃ বা কাম-লোভ-বিষয় কর্মের তীব্র আবেগপূর্ণ শক্তি; আর সত্ত্ব বা প্রেম ও জ্ঞানের সমন্বয়ী শক্তি, যা নিয়ে যায় সুখের দিকে। সত্ত্ব কল্যাণকর, কারণ এতে মন শুদ্ধ ও জ্যোতির্ময় হয়। যারা তমোগুণের অজ্ঞান-প্রবণতার ভারে নিচে নামতে থাকে, ক্রমোন্নতির মাপকাঠিতে তাদের গতি নিম্নমুখী; যারা রজোগুণের প্রভাবে চলে, তারা অধিকাংশ মানুষের মতো সারা জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যায় কিন্তু উর্ধ্বে বা নিম্নে কোন দিকেই তাদের গতি হয় না। কিন্তু যারা সত্ত্বের সাম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত তারা উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকে, যতদিন না দিব্য সত্যকে উপলব্ধি করছে।

কিন্তু সত্ত্বও উদ্দেশ্যবিহীন জ্ঞানাহরণ ও সূক্ষ্ম সুখবোধের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে জীবাত্মার বন্ধন ঘটায়। শুচিতা, ভক্তি, করুণা ও আত্ম-সংযমের মতো সাত্ত্বিক সমতার প্রকাশ মানুষকে সত্যোপলব্ধি করতে সহায়তা করে, কিন্তু সত্ত্ব নিজেই চরম সত্য নয়। লক্ষ্য হলো আত্মোপলব্ধি, সব রকম বন্ধন ও অজ্ঞান থেকে আত্মার চরম মুক্তির অবস্থা। উচ্চতম আধ্যাত্মিক চেতনার দিক থেকে, কেবল ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মসংযমই মানুষের মুক্তি লাভের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন ঃ "একজন ধনী বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তাকে ঘিরে ফেলল ও তার সর্বস্ব হরণ করলে। সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে একজন ডাকাত বললে, 'আর একে রেখে কি হবে? একে মেরে ফেল'—এই বলে তাকে কাটতে এল। দ্বিতীয় ডাকাত বললে, 'মেরে ফেলে কাজ নেই, একে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে এইখানেই ফেলে রেখে যাওয়া যাক। তাহলে পুলিশকে খবর দিতে পারবে না।' এই বলে ওকে বেঁধে রেখে ডাকাতরা চলে গেল। খানিকক্ষণ পর তৃতীয় ডাকাতটি ফিরে এল। ...বন্ধন খুলবার পর লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাকাত পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলতে লাগল। সরকারী রাস্তার কাছে এসে বললে, 'এই পথ ধরে যাও, এখন তুমি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে পারবে।' লোকটি বললে, 'সে কি মশায়, আপনিও চলুন; আপনি আমার কত উপকার করলেন। ...' ডাকাতটি বললে, 'না, আমার ওখানে যাবার জো নাই, পুলিশে ধরবে।' "[৪]

এই ভাবে তমোগুণ আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, রজোগুণ জাগতিক আসক্তিতে আবদ্ধ করে, আর সত্ত্বগুণ আমাদের মধ্যে *মুক্তির* প্রেরণা নিয়ে আসে। সত্ত্বগুণ থেকেই পবিত্রতা ও করুণার মতো পুণ্য সংস্কার জেগে ওঠে, যা পরমাত্মার দিকে পথ দেখিয়ে দেয়, কিন্তু জীবাত্মাকে অবশ্য স্থির-মনস্ক হয়ে ওপর দিকে এগুতে হবে। তিনগুণকে আবার ব্রহ্মরূপ বাড়ির ছাদে ওঠার সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করা

---

৪ পূর্বোল্লিখিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১৮৩ ও ২৪৩

যায়। সত্ত্ব যেন ছাদে যাবার শেষ সিঁড়িটি মাত্র। বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে এমন স্বজ্ঞামূলক শক্তির প্রয়োগে গুণাবলীর পারে যেতে না পারলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। আধ্যাত্মিক জীবন নৈতিক জীবনের কিছুটা ওপরে। নৈতিক সংস্কার যে অপরিহার্য তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আধ্যাত্মিক জাগরণও অবশ্যই চাই। আর তা এসে থাকে নিরন্তর জপ এবং রূপ ও দিব্য সত্যের ধ্যান অভ্যাসের মাধ্যমে এবং এই অভ্যাসই শেষে সাধককে তার নিজের ও অন্য সকলের মধ্যে পরমাত্মার অস্তিত্বের অনুভূতি লাভে সহায়তা করে। জীবাত্মা কখনই আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভে সক্ষম হয় না, যতদিন সে বিশ্ব শক্তির জালে আবদ্ধ থাকে, আর সে শক্তি আমাদের সকলকেই অভিভূত করে রেখেছে। কিন্তু পরিশেষে, যখন ঐ বদ্ধজীব গুণাবলীর ওপরে ওঠে, তখন সে জন্ম-মৃত্যু, জরা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করে ও অমর হয়।

আমাদের মানবীয় ব্যক্তিত্ব এক অদ্ভুত জটিল ব্যাপার। বিশ্বশক্তিসমূহ ত্রিগুণ নামে খ্যাত, আর তাদের সম্মিলিত ভাবই হলো মায়া বা বিরাট অজ্ঞান, তাই থেকে উদ্ভূত হয় অহংভাব, কামনা-বাসনাসহ মন, আর শরীর ও বাহ্য জগতে আসক্তি-প্রবণ ইন্দ্রিয়সমূহ। এই জটিল প্রকৃতি আমাদের উচ্চতর সত্তা বা আমাদের সত্য প্রকৃতিকে আবৃত করে রেখেছে। আমাদের অবশ্য শিখতে হবে, কিভাবে বাহ্য ব্যক্তিত্বের বন্ধন থেকে ও পরিবেশের গণ্ডি থেকে নিজেদের মুক্ত করা যায়। নেতিবাচক কথায় শ্রেষ্ঠ মুক্তি হলো, সমস্ত অশুভের মূল কারণ অজ্ঞান থেকে মুক্তি পাওয়া। ইতিবাচক কথায়, এ হলো—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আল্লা বা তাও নামে খ্যাত—চরম সত্যের উপলব্ধি। এই হলো প্রবুদ্ধ আত্মার প্রকৃত মুক্তি। যে জ্ঞান লাভে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটে—তারই মাধ্যমে মুক্তি বা পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

## নৈতিক মুক্তি—আধ্যাত্মিক মুক্তির দিকে এক ধাপ

ভগবদ্ গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দুরকম মানুষের কথা আলোচনা করা হয়েছে ঃ যারা দৈবী সম্পদে সমৃদ্ধ আর যারা আসুরী সম্পদে সমৃদ্ধ। দৈবী সম্পদ হলো ভয়হীনতা, মনের শুদ্ধি, জ্ঞান, আত্মসংযম, দান, যজ্ঞ, সরলতা, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, শান্ত মেজাজ, আর্তপ্রাণীদের প্রতি দয়া ও কোমলতা, নম্রতা, ধৈর্য প্রভৃতি। আসুরী সম্পদের বর্ণনায় আরো বেশি খুঁটিনাটি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে তার মধ্যে আছে আত্মাভিমান, গর্ব, দাম্ভিকতা, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞতা। এই দুই সম্পদের পার্থক্য উদ্ভূত হয়ে থাকে গুণগুলির ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভর করে। যাদের মধ্যে তমোগুণ ও রজোগুণের আধিক্য, তাদের আসুরী ভাবের প্রবণতা হয়ে থাকে। যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, তাদের দৈবীভাবের প্রবণতা দেখা যায়।

আমরা যদি নিজ নিজ জীবন পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব আমাদের মধ্যে দুই ভাবই বর্তমান। আমাদের ব্যবহার কখনো দৈবীভাবাপন্ন, কখনো আসুরী-ভাবাপন্ন হয়ে থাকে। এই অস্থিরতার কারণ আমরা সত্ত্বে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হতে পারি না। কেবল নৈতিক জীবন যাপনই যথেষ্ট নয়। সাধারণ নৈতিকতা রজোগুণ-মিশ্রিত, তা-ই মানুষকে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে বাধা দেয়। মন যখন রজঃ মুক্ত হয়ে সত্ত্বাধিক্য অর্জন করে, তখন সেই মনে ঈশ্বরীয় আলোক প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তমঃকে অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে। ইন্দ্রিয়ভোগ, আলস্য ও অহঙ্কারের প্রতি অত্যধিক আসক্তি অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। এটি কেবল তখনই সম্ভব, যখন মানুষ প্রকৃত আন্তর শক্তির অধিকারী হয়। বহু লোক যে শক্তির বাহ্য প্রকাশ দেখায়, তা সাধারণত ভীরুতার ওপর মুখোশ মাত্র। যে লোক সত্যসত্যই নৈতিক ভাবাপন্ন হয় সে প্রচণ্ড আন্তর তেজ ও শক্তির অধিকারী হয়। সে লোক তমোগুণকে দমন করে এক শান্ত ও প্রীতিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ অবস্থারও কোন মূল্য নেই যদি তা মানুষকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির পথে নিয়ে না যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রকৃত নৈতিকতা মানুষকে আধ্যাত্মিকতা ও মুক্তির পথের দিকে নিয়ে যায়, তাই গীতায়[৫] বলা হয়েছে ঃ দৈবী সম্পদ মানব-মনে মোক্ষপ্রবণতা নিয়ে আসে, আর আসুরী সম্পদ তাকে বন্ধনের পথে নিয়ে যায়। আধ্যাত্মিক অনুভূতির পথে নৈতিকতা একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বটে, তবে একমাত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতিতেই মানবের পূর্ণমুক্তি হতে পারে।

আমরা সৎজীবন যাপনে যতটাই সফল হব, ততটাই হবে আমাদের নৈতিক মুক্তি লাভে সফলতা। কিন্তু নিখুঁত সার্বিক মুক্তি লাভ সম্ভব একমাত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে—যা প্রবুদ্ধ আত্মাকে সব রকম বন্ধন ও দুঃখের মূল কারণ অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত করে।

বুদ্ধ বলেছিলেন ঃ 'নির্বাণ লাভের পর প্রবুদ্ধ আত্মা পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হন ও মুক্তি লাভ করেন।' যখন যীশুখ্রীস্ট বলেছিলেন ঃ 'তোমরা সত্যকে জান, আর সত্যই তোমাদের মুক্ত করবে।'[৬] তখন তিনি আধ্যাত্মিক মুক্তির কথাই বলেছিলেন, যা লাভ করা সম্ভব হয় কেবল জ্ঞান লাভের পরেই। প্রাচীনকালে চৈনিক সাধক তাও যেমন বলেছিলেন, 'যখন সৃষ্টি শুরু হয়, সেই পরমতত্ত্বই জগন্মাতার রূপ ধারণ করেন। যখন মানুষ তার মাকে চিনতে পারে, সে যে তাঁর ছেলে তাও সে জানতে পারে। যখন সে তার সন্তানভাব বুঝতে শেখে, সে মায়ের দিকেই ফিরে থাকে, আর জীবনের শেষ পর্যন্ত বিপদমুক্ত থাকে।'

---

৫ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬/৫ ৬ বাইবেল, সেন্ট জন, ৮/৩২

## স্বর্গসুখ লাভই জীবনের উদ্দেশ্য নয়

অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুধর্মে ভোগস্থান হিসাবে স্বর্গ ও পরলোকের ধারণা চলে আসছে। কিন্তু তারা সেগুলিকে কখনই জীবনের *চরম লক্ষ্য* বলে গ্রহণ করে না—অবশ্য মীমাংসক নামে অল্প সংখ্যক দার্শনিক এর ব্যতিক্রম। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে। তাই তাঁরা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু উপনিষদে, ভগবদ্‌গীতায়, শঙ্করাচার্যের রচনায়, ভাগবতে ও অন্যান্য শাস্ত্রে স্বর্গসুখের প্রতি এই রকম লালায়িত হওয়াকে কঠোর ভাবে নিন্দা করা হয়েছে। বৈষ্ণব আচার্যদের শিক্ষাতেও অধ্যাত্ম সাধককে স্বর্গকে জীবনের লক্ষ্য বলে ভাবতে নিষেধ করা আছে; তার পরিবর্তে অধ্যাত্ম সাধককে সর্বব্যাপী ঈশ্বর, বিষ্ণুর পরম পদকেই (তদ্ বিষ্ণো পরমং পদম্) লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মীমাংসকদের মতে জীবাত্মাগুলি সত্য ও সংখ্যায় বহু, ভোগ-লোকগুলিও সেইরূপ। মৃত্যুর পরে, জীবাত্মা মর্তলোকে যেমন কাজ করেছে তার ফল-স্বরূপ ঐ সব ভোগ-লোকে যায়। মীমাংসকগণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাদের লক্ষ্য—মোক্ষ বা মুক্তি নয়—স্বর্গ, যা তারা যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা অর্জন করবে বলে আশা করে। তারা অবশ্যই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ নিরপেক্ষ সত্তায়, সমস্ত অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ যার আপেক্ষিক (বা মায়িক) বিকাশ, সেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় বিশ্বাসী নয়।

যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানাদির পথে কিছু ফল অর্জন করা যায় তাতে সন্দেহ নেই। কেউ উচ্চতর লোকে যেতে পারে বটে, কিন্তু তারপর তাদের আবার অধোগতি হবে, কারণ এই সব স্থানগুলিও অস্থায়ী। অনন্তকাল স্বর্গবাস বা অনন্তকাল নরকবাস কখনই হতে পারে না। পরিদৃশ্যমান সব কিছুই কালের কবলে, কালে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়, আবার কালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

'মর্তধামে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতার উপাসনা করে মানব স্বর্গে যায়। দেবতাদের মতোই স্বোপার্জিত স্বর্গসুখ সে ভোগ করে। ... পুণ্যকর্মের ফল নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত সে স্বর্গে সুখ ভোগ করে। পরে পুণ্য কর্মফল নিঃশেষিত হলে, তার ইচ্ছা না থাকলেও, কালের নিয়মে তাকে নিচে নেমে আসতে হয়।'[৭]

এই জগতে বা পরলোকে সুখ ভোগের পেছনে ছুটে শক্তিক্ষয় করা উচিত নয়। বৈদান্তিক সাধকের পক্ষে প্রকৃত অনাসক্তি অপরিহার্য গুণের মধ্যে একটি। যখন

---

৭ *শ্রীমদ্ভাগবতম্,* ১১/১০/২৩,২৬; ভগবদ্ গীতা, ৮/১৬ দ্রষ্টব্য

সর্ব আনন্দের উৎসস্বরূপ ঈশ্বরোপলব্ধির অক্ষয় পরমানন্দ লাভ তোমার পক্ষে সম্ভব, তখন ইহজগতের সুখ থেকে যা বিশেষ তফাত নয়, এমন ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গসুখের পেছনে কেন ছুটছ? নানা ধরনের সুখ রয়েছে। প্রশ্ন হলো তোমার কোন্ ধরনের সুখ পছন্দ? এ বিষয়ে মানুষের পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। উচ্ছৃঙ্খলতায় উল্লাস হতে পারে, স্বর্গীয় সুখেও উল্লাস হতে পারে, কিন্তু তার থেকে বেশি উল্লাস হয় এ দুই-এর পারে জীবাত্মার মুক্তিলাভের উল্লাসে। বরাবরের জন্য নিশ্চিত হয়ে নাও—কোন্‌টি তুমি চাও। যদি আধ্যাত্মিক পথ চাও, যদি তুমি ঈশ্বর-লাভকেই জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করে থাক, তবে তোমাকে অবশ্যই ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগের সমস্ত বাসনা ত্যাগ করতে হবে। আর এ রকম দিব্য-ত্যাগের পথে যত রকম দুর্দশা ও দুর্ভোগ রয়েছে, তা সহ্য করার জন্য তোমাকে অবশ্যই তৈরি হতে হবে।

এর অর্থ এই নয় যে, সাধককে সব রকম কর্ম প্রচেষ্টা থেকে দূরে থাকতে হবে। যা বিশেষ দরকার তা হলো, কাজের প্রেরণাদায়ক ভোগলিপ্সাকে ত্যাগ করা। কোন রকম কামনাশূন্য হয়েই সব কাজ করে যেতে হবে। এই হলো নিষ্কাম কর্ম। যখন এই ভাবে কাজ করা যায়, মন শুদ্ধ হয় আর সেই শুদ্ধ মনেই ঈশ্বরানুভূতি হয়। তুমি যদি নিষ্কামভাবে কাজ করতে না পার, তবে তোমার কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ কর। গীতায় বলা হয়েছে —

> যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
> স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥[৮]

—যাঁর থেকে সর্ব জীবের সৃষ্টি, যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত রয়েছেন, নিজ নিজ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানব তাঁর অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ করে।'

তোমার কর্মের অর্ঘ্য দিয়ে প্রভুর পূজা কর। তাঁর পূজার নানা উৎকৃষ্ট পথের মধ্যে এটি একটি। কেবল ঈশ্বরের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যেই যদি করা হয়, তবে আচার অনুষ্ঠানেরও উপযোগিতা আছে। যারা সাধনের প্রারম্ভিক স্তরে রয়েছে, এমন বহু মানবের ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু উন্নততর পূজাপদ্ধতি আছে। অধ্যাত্ম সাধকের উচিত এই উন্নততর পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করে ঈশ্বর সান্নিধ্যে আরো বেশি বেশি অগ্রসর হওয়া। তুমি যদি উন্নততর পূজাপদ্ধতি গ্রহণে সমর্থ হও, তবে কেন নিম্নতর পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট থাকবে?

অবশ্য, এখানে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। মীমাংসকগণ যে সূক্ষ্ম স্বর্গীয় ভোগের কথা বলেন তা নিশ্চয়ই—স্থূল, অমার্জিত, পশুসুলভ সুখভোগ, যাতে এ

৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮/৪৬

জগতের সাধারণ লোক নিমজ্জিত হয়ে আছে—তার থেকে উৎকৃষ্টতর। সূক্ষ্ম স্বর্গীয় ভোগ ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ থেকে নিঃসন্দেহে নিম্নস্তরের ও শাস্ত্রে নিন্দিতও হতে পারে। কিন্তু ওগুলি দুর্নীতি ও দূষিত আচরণে নিজেকে অবলুণ্ঠিত করে দেওয়ার থেকে অনেক ভাল। মীমাংসকদের দৃঢ় ধর্মবোধ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে কেবল তাঁরাই নীতি শাস্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, বৈদিক নির্দেশগুলি অনুসরণ করা ও নিষেধগুলি পরিহার করাই মানবের কর্তব্য কর্ম। মীমাংসক দর্শনের একজন মহান প্রবক্তা—কর্মের জন্যই কর্ম—এই মত পোষণ করতেন, আর তাঁর এই বৈদিক নির্দেশনার ওপর আনুগত্যের ধারণা—ইম্যানুয়েল কাণ্ট (Immanuel Kant)-এর অবশ্য-পালনীয় অনুজ্ঞা থেকে বেশি তফাত নয়। ধর্ম (নীতিগতভাবে জীবনযাপন) চিরকালই হিন্দুদের সকল মতাবলম্বীর মধ্যে প্রশান্তির ভাব রক্ষা করে এসেছে। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর-ভীতির ওপর ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যতটা হয় ধর্মানুশাসন লঙ্ঘনের ওপর। মানুষ যে কোন ধর্মানুশাসন লঙ্ঘনকে ভয় করে। প্রত্যেককেই ধর্মের শাসন অনুযায়ী চলতে হবে। হিন্দুধর্মে নীতিহীন লোকের কোন স্থান নেই। আধ্যাত্মিক পথে যারা উন্নত হয়েছেন, তারা ধর্মের কয়েকটি স্থূল পর্যায়ের ঊর্ধ্বে যেতে পারে, কিন্তু কেউই এর মূল নীতিগুলিকে না মেনে চলতে পারে না।

## বেদান্তের আদর্শই হলো পরম মুক্তি

যে আদর্শ বেদান্তের লক্ষ্য, তা হলো সব রকম আবির্ভাব ও তিরোভাবের পারে একটি অবস্থা লাভ করা, যা থেকে আর পতন নেই, তাই হলো মুক্তি। মুক্তি বা বন্ধনমোচন কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা দেহ-মনের সঙ্ঘাত অর্থাৎ ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব থেকে আমাদের সরিয়ে নিতে পারব। প্রকৃত মুক্তি হলো পার্থিব বিষয়-বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তি। নিজের প্রকৃত সত্তা ছাড়া অন্য যে কোন বস্তুর ওপর নির্ভর করাই বন্ধন ও দুঃখ। শুদ্ধ আত্মা একমাত্র নিজ সত্তার ওপরই নির্ভর করে থাকে, অন্যের ওপর নয়, আর তাতেই সে আত্মানন্দ লাভ করে। তার নাম দেওয়া হয় *আত্মারাম*—যে আত্মাতেই আনন্দোৎসব করে। সে সবরকম মানসিক ও ইন্দ্রিয়জ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভোগের ঊর্ধ্বে চলে যায়। প্রবুদ্ধ আত্মার কাছে স্বর্গসুখও দুঃখদায়ী, কারণ সে যে বহু উচ্চস্তরের সুখ ও স্বাধীনতা ভোগ করছে। স্বর্গসুখ, মর্তসুখের থেকে উৎকৃষ্ট হলেও, তা চিরস্থায়ী নয়, আর তা মানবকে নিজ নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করতে সাহায্য করে না। তাই সব ঐকান্তিক অধ্যাত্ম সাধকের কাছে উপদেশ হলো—স্বর্গসুখের জন্য যে কোন বাসনাকে তারা যেন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ বলে মনে করে। আচার-অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির পথে যখন কতকগুলি

বিনাশশীল ফলই লাভ হয়, তখন সে পথ ত্যাগ করে মানবের উচিত অধিকতর অনাসক্তি, জ্ঞান ও ভক্তি অর্জনে চেষ্টিত হওয়া।

মৃত্যু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, আর তুমি ভোগসুখের কথা ভাবছ? মায়ার এমনই শক্তি যে আমরা মুক্তি-রূপ চরম আদর্শের কথা ভুলে, এই সব নানা হাস্যাস্পদ কাজে আমাদের অমূল্য সময় নষ্ট করি, আর নতুন নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হই। এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের জালে বদ্ধ মাছের রূপক-গল্পটির তাৎপর্য পরিষ্কার। জাল থেকে বেরুবার পথ খোলা রয়েছে, তবু খুব কম মাছই সে পথ দিয়ে বেরোয়। বাকি মাছগুলি আরামপ্রদ ও নিরাপদ হবে মনে করে গভীর পাঁকে ঢুকে পড়ে।[১] আমাদের অবস্থাও সেইরকম। যে জগৎকে আমরা সব থেকে নিরাপদ বলে মনে করি, মৃত্যু কবলিত হলে তা আমাদের চোখের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। মৃত্যুভয়ে আমাদের মন-মরা হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা যেন এতটা নির্বোধ না হই যে, এর বাস্তবতাকে উপেক্ষা করি। জীবন যদি সত্য হয়, তবে মৃত্যুও সত্য।

হিন্দুধর্মে মুক্তির অর্থ হলো সব রকম দুঃখ থেকে জীবাত্মার মুক্তি পাওয়া। এ হলো এক অবিমিশ্র শান্তির অবস্থা। 'অধ্যাত্ম জীবন' বলতে আমরা বুঝি, সম্পূর্ণ মুক্ত ও আনন্দময় জীবন যাপন করার অবস্থা বা ঐ অবস্থা লাভের জন্য প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এ অবস্থা যে কেবল মৃত্যুর পরেই লাভ করা যায় তা নয়। এখানেই, এ জগতেই ঐ অবস্থা লাভ করা সম্ভব। যে মানুষ এই চিরস্থায়ী মুক্তি লাভ করেছে, সে-ই *জীবন্মুক্ত* বলে খ্যাত হয়।

## বিশুদ্ধ জ্ঞান—চরম মুক্তির পথ

পরবর্তী প্রশ্ন হলো : জীবাত্মার এই শান্তিপূর্ণ মুক্ত অবস্থা এখনই লাভ করার পক্ষে বাধা কি? ভারতীয় দর্শনের সব মতেই স্বীকার করা হয় যে, অজ্ঞানই মানবের বন্ধনের কারণ, যদিও অজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মত থাকতে পারে। অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয়—*মায়া* নামে এক আদি বিশ্ব-অজ্ঞান রয়েছে, যা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে ঢেকে রেখেছে—ঠিক যেমন সূর্যকে মেঘ ঢেকে রাখে। আবার, এই মায়াই অনন্তপ্রকার জীবসহ এই বিরাট বিশ্বপ্রপঞ্চের পরিকল্পনা করেছে। ফলে মানুষ জানে না যে তার প্রকৃত স্বরূপ হলো ব্রহ্ম। যত রকম দুঃখ, অশুভ পরিস্থিতি, দ্বৈতবোধ দেখা যায়, তার কারণ হলো আমরা আমাদের অস্তিত্বের এই মূল তথ্যটি সম্বন্ধে অজ্ঞ। আবার বেদান্তেও বলা হয় যে আদি অজ্ঞানের নাশ একমাত্র জ্ঞান লাভ হলেই সম্ভব। বেদান্তে অধ্যাত্ম জীবন বলতে বোঝায় বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের [illegible]

১ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ২৫, ১১৫

আমাদের একত্ববোধ। বেদান্তের দ্বৈত মতেও বলা হয়, জীবাত্মা স্বরূপত ঈশ্বর বা পরমাত্মা। দ্বৈত বেদান্তী বিশ্বাস করে দেহধারী জীব প্রকৃত জ্ঞানের এক ক্ষীণ আভাস মাত্রেরই অধিকারী। এই থেকেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ ও ঈশ্বর স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানের উৎপত্তি। আধ্যাত্মিক সাধন ও ঈশ্বর কৃপায়, জীবাত্মা বিস্তার লাভ করে ও প্রকৃত জ্ঞানের উত্তরোত্তর অধিকতর অধিকারী হতে থাকে।

এই ভাবে বেদান্তের সব মতই বিশ্বাস করে যে, প্রকৃত জ্ঞানই জীবের অন্তর্নিহিত স্বরূপ। অদ্বৈত মতে এই স্বরূপ মায়া দ্বারা আবরিত, দ্বৈতমতে এটি সঙ্কুচিত; এইটুকু মাত্র তফাত। অধ্যাত্ম জীবন এই প্রকৃত জ্ঞান লাভের ও তার বিকাশের জন্য সংগ্রাম (বা সাধন) চালিয়ে যাওয়া। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ঃ 'মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ'। তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি সংক্ষেপে বলেছিলেন ঃ 'আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দিয়েই এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। এই-ই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র।'[১০]

মানব জীবনের প্রধান কর্তব্য হলো নিজ অব্যক্ত ব্রহ্মত্বের দাবিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকা।

তাই, প্রকৃত জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ অনুভূতিই হলো হিন্দুর অধ্যাত্ম জীবনকে পরীক্ষা করার আদর্শ উপায় বা বিচারের মানদণ্ড। এই অন্তর্জ্ঞান, আত্ম-প্রচেষ্টা বা ঈশ্বর-কৃপা বা উভয়েরই মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অথবা স্ব-স্বরূপের অনুভূতি ছাড়া, কোন সাধক জীবনের লক্ষ্য—পূর্ণমুক্তি ও পরমানন্দ—লাভ করতে পারে না। (*যোগ* নামে) হিন্দুর সকল আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলি এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের উপায়।

## অহং—কারাগারের স্থপতি

প্রকৃত জ্ঞান হলে আমাদের ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব ও তৎসহ তার সমস্ত ভ্রান্ত সম্বন্ধগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, আমাদের চেতনা-কেন্দ্র দেহ-মন সঙ্ঘাত থেকে আত্মায়, জড়বস্তু থেকে জীবাত্মায়, স্থানান্তরিত হয়। আমাদের বর্তমান ব্যক্তিত্ব, আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও অহংবোধের সঙ্ঘাত। অধ্যাত্ম জীবনের অর্থ হলো এই সঙ্ঘাতকে ভেঙে ফেলে, চেতনা-কেন্দ্রকে সেখান থেকে আত্মায় সরিয়ে আনা—এর বেশি কিছু নয়।

১০ *বাণী ও রচনা*, ১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫

কিন্তু একমাত্র নিরন্তর আধ্যাত্মিক অভ্যাসের মাধ্যমেই ঐ সঙ্ঘাতকে ভাঙ্গা সম্ভব। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছু নেই, রহস্যময়তা কিছু নেই, এটি একটি এমন কিছু যা অতি সুস্পষ্ট, পরিষ্কার, নির্দিষ্ট ও যথার্থ—যা একেবারেই রহস্যজনক নয়। এতে রহস্যের সওদাগরির কোন অবকাশ নেই। যোগে কোন যাদু নেই, রহস্য একেবারেই নেই। এ অতি সরল ব্যাপার। আমরা ভ্রান্তিবশত এই আজব জোটের সঙ্গে নিজেদের সামিল করে ফেলেছি। অধ্যাত্ম জীবনের অর্থ হলো আমাদের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-অহঙ্কারের সমগ্র সঙ্ঘাতটিকে ভেঙ্গে দিয়ে আমরা সত্য সত্যই যেমন, তেমনি সরল হওয়া। বাস্তবে আমরা অতি সরল, কোন কিছুর সঙ্ঘাতও নই, সমষ্টিও নই। কিন্তু বহুদিনের একনিষ্ঠ অভ্যাস ছাড়া এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

অজ্ঞানই এ সবগুলিকে বেঁধে রেখেছে। যখন অজ্ঞান লুপ্ত হবে, এই জোট বাঁধা ভাব অল্প কিছুদিন চলতে থাকে, তারপর থেমে যায়। দাঁড় টানা বন্ধ করলেও, পূর্বার্জিত ভরবেগ নৌকাটিকে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। পরীক্ষা করতে হবে— দেহ-মন প্রভৃতির ভ্রান্ত জোটে আমরা আত্মবোধ করা বন্ধ করছি কি না? যখন বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান উপলব্ধি করলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠেছিলেন ঃ

**জীবনের কুটিরে কুটিরে**
**বাস করেছি—আগ্রহে, তাঁরই খোঁজে খোঁজে**
**ইন্দ্রিয়ের এই দুঃখভরা কারায় কারায়;**
**অন্তহীন কষ্টকর চেষ্টায় চেষ্টায়!**
**কিন্তু এখন,**
**হে কুটির নির্মাতা—তুমি!**
**তোমাকে আমি জেনেছি! করো না নির্মাণ আর,**
**এই সব কষ্টের প্রাকার,**
**তুলো না ছাদ প্রতারণার,**
**ফেলো না নতুন বরগা কাদার ওপর;**
**তোমার কুটির গেছে ভেঙ্গে;**
**এর মূলদণ্ড গেছে ফেটে! ভ্রান্তি যার করেছিল নক্‌সা!**
**নিরাপদে পার হয়ে পাব মুক্তি—এই মোর আশা।**[১১]

প্রথমেই আমাদের আকরিককে ধুলো, ময়লা ও বালির মতো সব রকম অপ্রয়োজনীয় বস্তু থেকে তফাত করার চেষ্টা চালাতে হবে, পরে সেটিকে আগুনের চুলায় দিতে হবে। এটি হলো প্রাথমিক পৃথকীকরণ। তারপর সমস্ত ধাতুমল (গাদ)

---

১১ Sir Edwin Arnold, *The Light of Asia*, London : Kegan Paul, Trench, Trubner, Co, 1943, p. 115

পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কেবল বিশুদ্ধ স্বর্ণই পড়ে থাকবে। এর নাম বিশুদ্ধিকরণ। সেই রকম, অধ্যাত্ম জীবনে বিচারের মাধ্যমে আমাদের আত্মাকে দেহ-মন সঙ্ঘাত থেকে পৃথক বস্তু বলে জানতে হবে, তারপর তাকে মনের ময়লা থেকে মুক্ত করতে হবে তপস্যার মাধ্যমে। আমরা যতটা ইন্দ্রিয়-সংযম, ব্রহ্মচর্য, বিচার অভ্যাস করতে পারব, ততটা প্রকৃত জ্ঞানই আমাদের আয়ত্তে আসবে। এ ছাড়া আমাদের জ্ঞান লাভ হয় না। আমরা যতটা জ্ঞানলাভ করব, ততটাই মুক্ত হব বন্ধন ও দুঃখ থেকে। তারপরে, সর্বশেষে, প্রকৃত আত্মার দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে পরম শান্তি ও আনন্দে আমাদের অন্তর ভরিয়ে দেবে।

আমাদের সকলের মধ্যেই সত্য-মিথ্যার এক গ্রন্থি থাকে। এটিই হলো আমাদের অহংবোধ। প্রকৃত জ্ঞান এই গ্রন্থিকে পুড়িয়ে দেয়, আর যখন অহং বা ভ্রান্ত আত্মার বিনাশ হয়, তখন আমরা প্রকৃত আত্মাকে উপলব্ধি করে থাকি। তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, প্রকৃত স্বরূপে আমরা অখণ্ড, বিকারাতীত পরম চৈতন্যের, সর্বভূতে অনুস্যূত পরমাত্মার এক একটি অংশ বা ভাব।

বহুদিনের সাধনা ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। এখানেই প্রচণ্ড নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও অভ্যাসের প্রয়োজন এসে পড়ে। লক্ষ্যে পৌছতে মানবের বহুকাল কেটে যায়। কেবল সর্বথা স্থির-সঙ্কল্প মানবেরই লক্ষ্যে পৌছনর কিছু সম্ভাবনা রয়েছে।

## নিজে মুক্ত হও, পরে অপরকে (মুক্ত হতে) সাহায্য কর

আমাদের মধ্যে অভিকেন্দ্রিক ও অপকেন্দ্রিক শক্তিদ্বয় রয়েছে। অভিকেন্দ্রিক শক্তির সাহায্যে আমাদের অবশ্যই অন্তরে প্রবেশ করে প্রকৃত চেতনা-কেন্দ্রে পৌছতে হবে। আমাদের দেহ-মনের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা একটি বিশেষ চেতনা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। সেটিকে খুঁজে বার করতেই হবে। সেটিই জীবাত্মা ও ঈশ্বরের মিলন বিন্দু। এই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছতে গেলে আমাদের অভিকেন্দ্রিক তেজ কেন্দ্রীভূত করতেই হবে।

বন্ধনকে কেটে বেরুতে গেলে আমাদের অপকেন্দ্রিক শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। জীবাত্মা স্বরূপত চিরমুক্ত। জীবাত্মা যখনই নিজ অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা দাবি করবে, তখনই সে নিজ বন্ধনের বেড়া কেটে বেরিয়ে পড়বে। আমরা ততক্ষণই বদ্ধ, কেবল যতক্ষণ আমরা দেহ-মন সঙ্ঘাতের সংস্রবে যুক্ত থাকি। সেগুলিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে শিখলেই আমরা মুক্ত হই। আত্ম-সংযম-যুক্ত জীবন মুক্তি ও শক্তি সমন্বিত এক অদ্ভুত জীবন। সেই জীবনেই প্রকৃত ভোগ সম্ভব। অন্য সব রকম ভোগ যেন অনেকগুলি অসার কাঁচের দানা দিয়ে গাঁথা মালা, যা বার বার ভেঙ্গে যায়, কিন্তু আত্ম-সংযমের এই আনন্দ নিত্য ও অপরিবর্তনীয়।

অধ্যাত্ম পথ অনুসরণ করে ও আমাদের মন ও হৃদয়ের পবিত্রতা সাধন করে, আমাদের সকলের এই জীবনেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও মুক্তি লাভের চেষ্টা করা উচিত। কিছু লঘু আদর্শে লক্ষ্য স্থির না করে, বেদান্ত আত্মোপলব্ধি ও মুক্তির উচ্চতম আদর্শকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে উদ্বুদ্ধ করে। যদি আমরা এই জীবনেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে না পারি, আমরা যেন পরবর্তী জীবনগুলিতেও এই চেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য তৈরি থাকি, যতদিন না আমরা চরম জ্ঞানের ও মুক্তির অধিকারী হই। তারপর আমাদের সামান্য সামর্থ্য অনুযায়ী যেন অন্যদেরও ঐ উপলব্ধির পথে যেতে সহায়তা করি।

আমাদের লক্ষ্য হলো, এই জীবনেই শরীর থাকতে থাকতেই মুক্তি লাভ করা। মৃত্যুর পূর্বেই মুক্তিলাভের চেষ্টা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। একমাত্র মানুষই চেষ্টা করতে পারে পূর্ণতা ও মুক্তি লাভের জন্য। যে উচ্চতর লক্ষ্য বর্তমান জৈবিক প্রয়োজনের পারে নিয়ে যায়, তার সম্বন্ধে কেবল মানুষই সচেতন। তাই প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য হলো ঐ লক্ষ্যে পৌছবার জন্য এই জীবনের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার। এখনই ঐ অবস্থায় পৌছনো সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও, প্রত্যেককে তার জন্য অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে। পূর্ণ মুক্তি না হলেও, আমরা যেন এখন অন্তত আংশিক মুক্তি লাভ করি। নিম্নতর সহজ প্রবৃত্তির অন্তত একটির কবল থেকে যদি মানুষ মুক্ত হয়, তবে যারা সমস্ত নিম্নপ্রবৃত্তির দাস তাদের থেকে সে উন্নততর মানুষ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন : 'অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে সত্যাগ্রহী, সত্যের আশ্রয়ে, মিশি সত্যে যাও এক হয়ে, মিথ্যাকর্ম ঘুচে যাক'।[১২] বহুলোক নিজ নিজ জীবনকে গড়ে তোলে ভ্রান্ত ধারণার ওপর। তারা ভ্রান্ত-বিশ্বাসের জগতে বাস করে। তাদের ধারণা যে তারা অত্যন্ত চতুর ও অন্যের তুলনায় বড়, তাদের ধারণা যে তারা আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। কিন্তু একটা সময় আসবে, যখন তাদের জীবনে একটা গভীর সঙ্কট উপস্থিত হবে, আর তারা দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারবে যে সেই সঙ্কটের সম্মুখীন হবার বা তাকে অতিক্রম করার মতো আন্তর-শক্তি তাদের নেই। তখন তাদের জীবন তাসের বাড়ির মতো ধ্বসে পড়ে। একমাত্র সত্যই আমাদের রক্ষা করতে পারে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত জীবনই কেবল দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। অবশ্যই বাস্তব জীবন নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। দুঃখ-কষ্ট সঙ্গে করে আনলেও, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই হবে আমাদের জীবনের ভিত্তি—মিথ্যা আশা, স্বপ্ন ও কল্পনাগুলি নয়। তুমি

---

১২ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯

আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছ, এরূপ কল্পনা করাই যথেষ্ট নয়। তোমাকে অবশ্যই জীবনের কঠোর সত্যের মুখোমুখি হতে হবে, আর তাদের একটি একটি করে অতিক্রম করতে হবে। যদি তুমি বাস্তব জীবন যাপন কর, কৃত্রিম জীবন নয়, আর কষ্ট সহ্য করে তোমার আধ্যাত্মিক পথে চল—তবেই তুমি প্রকৃত উন্নততর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাগুলি ধারণ করার যোগ্য পাত্র হবে। যখন তুমি অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা ধারণের যোগ্য হবে তখনই তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমার কাছে আসবে। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তোমার কল্পনাজাত বস্তু নয়; এ এক চমকপ্রদ সত্য-অভিজ্ঞতা।

সাধারণ লোক বায়ু-শকুনের মতো। তারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির বশে চলে ও সর্বক্ষণ সর্বদিকে ঘোরে। অধ্যাত্ম সাধক ঐ ভাবে বাঁচতে পারে না। তাকে ঐ প্রবৃত্তি-বশীভূত জীবন ত্যাগ করতেই হবে। তাকে অবশ্য এমন এক সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ অবলম্বন করতে হবে, যা তাকে চরম মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। অবশ্যই তাকে ততদিন নিয়মানুবর্তী হয়ে চলতে হবে, যতদিন না নিয়ম স্বতঃই তার জীবনে কাজ করতে থাকবে। তখনই কেবল সে পৌঁছতে পারবে সেই স্তরে, যা নিয়মের ঊর্ধ্বে। নিয়ম শৃঙ্খলা আমাদের এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এনে দেয়, যা আবার নিয়ে আসে উচ্চতর মুক্তি।

প্রকৃত মুক্তি কেবল আমাদের নিজেদের জন্যেই দরকার নয়, পরন্তু অপরকে সাহায্য করতে হলেও দরকার। যে লোক নিজে মুক্ত, কেবল সেই অন্যদের মুক্তি দিতে পারে। তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই গল্পটি তো জান যাতে তিনি এক পণ্ডিতের কথা বলেছেন, যিনি রাজাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। প্রতিদিনের পাঠের পর পণ্ডিত যখন রাজাকে প্রশ্ন করতেন, 'যা বলা হলো তা বুঝলেন তো?' রাজা প্রত্যেকবার উত্তর দিতেন, 'পণ্ডিত মহাশয়, আপনি নিজে আগে বুঝুন।' পণ্ডিত শেষে বুঝলেন, যে তিনি নিজে বিষয়াসক্তিতে আবদ্ধ—তাই রাজাকে বন্ধনমুক্ত করতে পারেন নি। যখন তাঁর এই জ্ঞান হলো, তিনি সংসার ত্যাগ করে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করলেন। চলে যাবার পূর্বে তিনি রাজাকে এই সংবাদটুকু পাঠিয়েছিলেন, 'হে রাজন, অবশেষে আমি বুঝছি'।[১৩] আমরা যদি অপরের দুঃখ মোচন করতে চাই, আগে নিজেদের দুঃখ থেকে মুক্ত হতে হবে। যে নিজে সাংসারিক প্রলোভনে পীড়িত, সে কখনো তার সঙ্গীদের সাহায্যে আসতে পারে না। অতএব অপরের সেবায় অংশ নিতে হলে আমাদের নিজেদের অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। আমরা যতটা মুক্তিলাভ করব, মুক্তি পথের কেবল ততটুকুই আমরা অপরকে দেখাতে পারি।

---

১৩ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৭৫১

অতএব আধ্যাত্মিক মুক্তির ধারণাটি কোন স্বার্থপর আদর্শ নয়, যেমন পাশ্চাত্যের বহু সমালোচক ভুল করে মনে করে থাকেন। ভারতে হাজার হাজার প্রবুদ্ধ আত্মা যুগ যুগ ধরে মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য কাজ করে আসছেন। আধ্যাত্মিক নিরাপদাশ্রয় হিসাবে ভারত যদি যুগ যুগ ধরে, এমনকি বর্তমান যুগেও, শ্রেষ্ঠ স্থান রূপে গণ্য হয়ে থাকে, তা কেবল আধ্যাত্মিকভাবে প্রবুদ্ধ অসংখ্য জ্ঞানিপুরুষের প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে। নিজেরা আধ্যাত্মিক মুক্তির সুফলটুকু লাভ করে তাঁরা অন্যদের ঐ অবস্থা লাভে সহায়তা করতে চেষ্টিত হন। আমরাও যেন কঠোর চেষ্টা চালাই নিজেদের ও সঙ্গীদের মুক্তি লাভের জন্য। এই হলো শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

> দুর্জন লোক সজ্জন হোক, সজ্জন শান্তিলাভ করুক।
> শান্ত পুরুষদের বন্ধন মোচন হোক, মুক্তপুরুষ অন্যকে মুক্ত করুন।[১৪]

---

১৪ দুর্জনঃ সজ্জনো ভূয়াৎ সজ্জনঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ।
শান্তো মুচ্যেত বন্ধেভ্যো মুক্তশ্চান্যান্ বিমোচয়েৎ॥

# ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

# মুক্ত জীবন

## জীবন্মুক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁর প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রের (যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দরূপে বিশ্ব-বিশ্রুত হয়েছিলেন) সঙ্গে কথা বলছিলেন। প্রভু বললেন ঃ 'বাছা শোন, মনে কর একটি পাত্রে রস রয়েছে, আর তুমি হলে একটি মৌমাছি। তুমি কিভাবে রস পান করবে?' নরেন্দ্র উত্তর দিল ঃ 'আমি পাত্রের কিনারায় বসে রস পান করব। যদি আরো কাছে যাই, তবে আমি রসের মধ্যে আটকে যাব।' প্রভু এতে হেসে বললেন ঃ 'কিন্তু, বাছা এ তো সাধারণ রস নয়। এ হলো ভগবদানন্দের অমৃত। এতে ডুবে গেলে কেউ মরে না—অমর হয়ে যায়।'[১] প্রভু ব্রহ্মোপলব্ধির কথাই উল্লেখ করছিলেন। উপনিষদ্ বলে ঃ '*স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি*'[২] —যে ব্রহ্মকে জেনেছে, সে ব্রহ্মই হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। খুব কম লোকই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভরূপ অনুভূতির চরম পর্যায়ে পৌছবার জন্য ঐ সব স্তরের ভেতর দিয়ে গিয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভগবদানন্দের এক চুমুক মাত্র পান করে থাকি, কিন্তু এতে ডুব দিতে ইতস্তত করি। ব্রহ্ম সমুদ্রের গভীরে ডুব দেবার ফল সত্যই সেই 'শান্তি যা সব রকম বুদ্ধির পারে'—স্বল্পস্থায়ী শান্তভাবের সীমিত অবকাশ নয়, গভীর চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দ।

এক বৈদিক ঋষি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন ঃ

> **শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।**
> **বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।**
> **তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥**[৩]

—শোন হে অমৃতের সন্তানগণ, স্বর্গবাসীরাও শোন; অজ্ঞান অন্ধকারের পারে যে মহান জ্যোতির্ময় চৈতন্য রয়েছেন, আমি তাঁকে উপলব্ধি করেছি। একমাত্র তাঁকে জেনেই কেউ কেউ মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

---

১ দ্রঃ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৪৫৭, ৪৭০

২ *মুণ্ডকোপনিষদ্*, ৩/২/৯

৩ *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্*, ২/৫ ও ৩/৮

শত শত বছর ধরে ভারতে অসংখ্য সাধু সন্ত এই সত্যই শিক্ষা দিয়ে আসছেন। এখন, অমৃতত্ব বলতে আমরা কি বুঝি? যদিও প্রত্যেকটি লোকের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, আবার প্রচণ্ড মৃত্যুভয়ও আছে, তবু খুব কম লোকেই নিজ বর্তমান অবস্থা নিয়েই চিরকাল কাটাতে চায়। অমৃতত্বের অর্থ কেবল দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা নয়। এর অর্থ প্রথমত চেতনার রূপান্তর। সাধারণ মানবের সচেতনতা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাতেই সীমাবদ্ধ, তার পারে যায় না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি হলে, প্রথমে চেতনার রূপান্তর হয়। তখন মানুষের উপলব্ধি হয় যে, সে দেহ বা মন নয়, আত্মা। এর পরেই হয় চেতনার প্রসার। আমাদের তখন অভিজ্ঞতা হতে থাকে যে, আমরা সকলে সর্ব জীবের অন্তর্যামিস্বরূপ পরম চৈতন্যের বিভিন্ন অংশ। আরো অগ্রসর হলে আমরা উপলব্ধি করি, কেবল ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু।

সব কয়টি মহান ধর্মেই স্বীকৃত হয় যে, উচ্চ থেকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হওয়া সম্ভব, যদিও ধর্মতত্ত্বজ্ঞেরা এর গুরুত্বকে খাট করে দেখে থাকেন। খ্রীস্টান ধর্মবেত্তাদের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার পূর্ণ মিলন, যা আধ্যাত্মিক মুক্তির পরমানন্দ লাভের অবস্থা, তা কেবল মৃত্যুর পরেই সম্ভব। এ মত মোটামুটিভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও পোষণ করে। তবু এই সব ধর্মে বেশ কিছু মহান মরমিয়া সাধক চেষ্টা করেছেন যাতে এই জীবনেই ঈশ্বর-সান্নিধ্যের নিগূঢ় অভিজ্ঞতা এবং পরম শান্তি ও আনন্দঘন অবস্থা লাভ হয়।

হিন্দু ধর্মে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তথা জীবনের উদ্দেশ্য হলো অজ্ঞান ও অজ্ঞান-প্রসূত অহংবোধ, ঘৃণা, কামনা-বাসনা ও শোকের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ এবং তা এই জীবনেই। এই সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ হয় চেতনার রূপান্তর ও বিস্তারের মাধ্যমে এবং আত্মসত্তার ব্রহ্মের সহিত মিলনের চরম অনুভূতিতে। এই অবস্থা লাভ চাই মৃত্যুর পরে নয়, এইখানেই এই সংসারেই—আমাদের জীবদ্দশায়। যে লোকের এই অবস্থা লাভ হয়, তাকেই *জীবন্মুক্ত* বা 'এই জীবনেই মুক্ত' বলা হয়। শঙ্করাচার্য তাঁর প্রসিদ্ধ *'বিবেকচূড়ামণি'* গ্রন্থে এই রকম আনন্দময় পুরুষের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

"যখন মানুষ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হয়ে, বাহ্য জগৎ প্রায় বিস্মৃত হয়, তখন তাঁকে এই জীবনেই মুক্ত বলা হয়ে থাকে। তাঁর মন ব্রহ্মলীন হলেও তিনি সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকেন, জাগ্রত অবস্থার অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে; তিনি সম্পূর্ণ সচেতন কিন্তু কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত। তিনি সাংসারিক সব দুঃখ-কষ্টের পারে। মনুষ্যদেহ থাকলেও তিনি অনন্তে লীন হয়ে থাকেন। এই রকম মানুষকে এই জীবনেই মুক্ত বা জীবন্মুক্ত বলা হয়। দোষ গুণ আছে মনে হলেও, মানুষে মানুষে বিষয়ে বিষয়ে পার্থক্য আছে মনে হলেও, তাঁর অনুভূতি

হয়েছে যে, মানব জাতি ও পরম সংস্বরূপের মধ্যে কোন ভেদ নেই, কারণ তিনি সব কিছুকে ব্রহ্মরূপে জেনেছেন; তিনি কোন ভেদ দর্শন করেন না। এ লক্ষণ দিয়েই আমরা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকে চিনতে পারি। কোন লোকে তাঁকে সম্মান জানালে বা কেউ অপমান করলেও, তাঁর চিত্ত সমভাবেই থাকে; ঠিক যেমন বহু নদীর জলরাশি সমুদ্রে পড়লেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না, তেমনি নানা ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ করলেও তাঁর চিত্তে কোন চাঞ্চল্য হয় না, কারণ তিনি এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপের চেতনায় জীবন যাপন করেন। বাস্তবিক এই রকম মানুষই জীবন্মুক্ত, এই জীবনেই মুক্ত।" [৪]

যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি মানবজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নৈতিক সংঘাতের পারে গেছেন। কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিগুলির বিলুপ্তি ঘটলে, তাঁর মধ্যে কেবল সুপ্রবৃত্তিগুলিই, যা পরম জ্ঞানোন্মেষের পূর্বে বর্তমান ছিল—সেইগুলিই দৃঢ়ভাবে কাজ করতে থাকে। অথবা তিনি জাগতিক সব ভাল মন্দ-ভাব সম্বন্ধে উদাসীন অতিচেতন অবস্থায় মগ্ন থাকতে পারেন। পরমাত্মার ইচ্ছায় এই সব প্রবুদ্ধ আত্মাদের কেউ কেউ করুণা পরবশ হয়ে মানবকে শিক্ষা দেবার জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

"তাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন পরম অধ্যাত্ম চেতনায়, শান্ত থাকেন তৈলক্ষয়ে প্রজ্বলিত দীপশিখার মতো। তাঁরা যেন অহেতুক প্রেমের সমুদ্র, সকল বিনয়াবনত শরণার্থী সৎ লোকের বন্ধু। তাঁরা সমাগত বসন্তের মতো (না চাইতে) মানুষের কল্যাণ করেন। তাঁরা নিজেরা দুস্তর সংসার-সমুদ্র পার হয়ে, প্রতিদানের আশা না রেখেই, অপর লোকেদের পার হতে সাহায্য করেন। এইসব মহাপুরুষদের স্বভাবই হলো আপনা থেকেই অপরের দুঃখ দূর করতে এগিয়ে আসা; ঠিক যেমন চাঁদ স্ব-ইচ্ছায় সূর্যের তীব্র কিরণে দগ্ধ পৃথিবীকে তার স্নিগ্ধ কিরণে শীতল করে।"[৫]

## মুক্ত পুরুষের লক্ষণ

যখন চৈনিক ঋষি কন্‌ফিউসিয়াস্ (বা কংফুচু) বলেছিলেন, 'পনেরতে আমার মন পড়াশুনার দিকে ঝুঁকল, তিরিশে আমি দৃঢ় সঙ্কল্প হলাম, চল্লিশে আমার মনে কোন সংশয় রইল না, পঞ্চাশে আমি ঈশ্বরের অনুশাসন জানতে পারলাম, ষাটে আমার কর্ণ সত্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়ার এক আজ্ঞাবহ অঙ্গে পরিণত হলো, আর সত্তরে

৪ স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টোফার ইসারউড্ কৃত শঙ্করের '*বিবেকচূড়ামণি* গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের [California : Vedanta Press, Hollywood, 1947, pp. 122-24] সংক্ষিপ্তসার থেকে বাংলায় অনূদিত।

৫ *তদেব*, পৃঃ ৪২-৪৪

আমার অন্তরে যে বাসনার উদয় হতো বিধিলঙ্ঘন না করে তা করতে পারতাম'— তখন তিনি জীবনের লক্ষ্য যথা সম্পূর্ণ নৈতিক মুক্তি লাভ, তারই বর্ণনা দিচ্ছিলেন। কোন মুক্ত পুরুষকে অশুভ প্রবণতাগুলি বা প্রচলিত নৈতিক বিধিসমূহ—বেঁধে রাখতে পারে না। পবিত্রতা এমন ভাবে তার মৌলিক স্বভাবে পরিণত হয় যে, তখন তার পক্ষে আর নিজেকে নানা আচরণবিধির শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার প্রয়োজন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা-রে-গা-মা-ই এসে পড়ে।[৬]

*জীবন্মুক্তের* আর একটি লক্ষণ হলো যে, সে অহঙ্কার থেকে মুক্ত। অহঙ্কারই হৃদয়-গ্রন্থি সৃষ্টি করে; এতে মানুষের মন জটিল, দুর্বোধ্য ও হিংসেবী হয়ে পড়ে। অন্যের প্রতি আমাদের মনোভাব নির্ধারিত হয়, আমাদের অহংভাবের প্রকৃতি অনুযায়ী। উপনিষদে বলা হয়েছে—সর্বোচ্চ অতিচেতন অবস্থা লাভ হলে হৃদয়ের সব গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায় ও সব সংশয় দূর হয়ে যায়।[৭] সব রকম নৈতিক দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়, আর আমরা সর্বত্র ঈশ্বরীয় সাম্য লক্ষ্য করতে থাকি।

যার পূর্ণজ্ঞান হয়েছে, সে সব রকম ঘৃণা থেকে মুক্ত। তার পক্ষে অপরকে ঘৃণা করা অসম্ভব। *ঈশাবাস্য উপনিষদে* বলা হয়েছে, 'জ্ঞানী পুরুষ যখন সকলকে নিজ আত্মা থেকে এতটুকুও ভিন্নরূপে অনুভব করে না, আর নিজ আত্মাকেই প্রত্যেকের আত্মারূপে দেখে, তখন সে সেই অনুভূতির জন্যই কোন লোককে ঘৃণা করে না।'[৮] ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অপরের প্রতি প্রেম ও করুণায় পূর্ণ থাকেন। তাঁর কাছে আশীর্বাদ ছাড়া অপরকে দেবার মতো অন্য কিছুই থাকে না। তাঁর প্রেম জাতি, ধর্ম বা সামাজিক মর্যাদার গণ্ডি মানে না। তিনি কোনরূপ পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে সকলকে ভালবাসেন। আমাদের কারো কারো শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যশ্লোক শিষ্যদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। একমাত্র তাঁদের মধ্যেই অপরের প্রতি পবিত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমরা দেখেছিলাম। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন আমাদের কল্যাণ চিন্তায়।

*জীবন্মুক্ত* ভয় শূন্য হন। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* বলা হয়েছে, '*অভয়ং বৈ ব্রহ্ম*'[৯]—ব্রহ্ম হলেন নির্ভীকতা স্বরূপ। একদিন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহ সম্রাট রাজা জনকের কাছে যান। সম্রাটের অনুরোধে ঋষি তাঁকে সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। শিষ্য নিজে এক উচ্চগুণসম্পন্ন সাধক ছিলেন,

---

৬ দ্রঃ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৩৬০, ৪৮২

৭ *মুণ্ডকোপনিষদ্*, ২/২/৮; আরও দ্রঃ *কঠোপনিষদ্*, ২/৩/১৫

৮ *ঈশোপনিষদ্*, ৬

৯ *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্*, ৪/৪/২৫

তাই খুব শীঘ্রই তাঁর সত্য সম্বন্ধে ধারণা হয়েছিল। এ বিষয়টি লক্ষ্য করে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে বলেন ঃ "ও জনক, তুমি সত্যই ভয়শূন্যতা লাভ করেছ।"[১০]

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, অধিকাংশ লোকই তাড়া-খাওয়া অপরাধীর মতো। তাদের হৃদয় কখনো মুক্ত নয়। তারা জীবনের পথে এমন ভাবে ছুটে চলেছে, যেন কোন শয়তান নিজেই তাদের পেছনে তাড়া করেছে, ফলে তারা জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও মহিমা উপভোগে ব্যর্থ হয়। তারা শান্তিতে বসতে অথবা নির্ভয়ে নড়াচড়া করতে পারে না। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে* এক তাঁতি বৌকে নিয়ে বেশ মজার গল্প আছে। একদিন তার এক বান্ধবী তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। যখন সে বান্ধবীর জন্য খাবার তৈরি করতে ঘর থেকে বেরিয়েছে, সেই অবসরে বান্ধবীটি পড়ে থাকা এক বাণ্ডিল পশমের সুতো তার বগলে লুকিয়ে রাখে। তাঁতি বৌ ফিরে এসেই এই চুরি টের পায়। সে তখন তার বান্ধবীকে কিছুক্ষণ নাচবার আহ্বান জানায়। তাঁতি বৌ দুহাত তুলে নাচছিল, কিন্তু তার বান্ধবী কেবল এক হাতই তুলেছিল, অন্য হাতটি দিয়ে বগল চেপে রেখেছিল।[১১] মুক্ত পুরুষের গোপন করার কিছুই থাকে না, সে ভয়শূন্য।

লোকেদের মনে জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে অযথা চিন্তা করার, আসন্ন বিপদকে বড় করে দেখার ও উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতাকে প্রতিহত করতে হবে সুসংহত চিন্তা ও ভাব নিয়ে চর্চা করে। ভয়ের পরিবর্তে আমাদের চাই সাহস, মনমরা অসহায় অবস্থার পরিবর্তে আমাদের প্রয়োজন সুস্থ আত্ম-সমর্পণভাব, যা আমাদের শান্ত থাকতে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও আপন পথে এগিয়ে চলতে সাহায্য করবে। আমি যখন ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে বার্জেন (নরওয়েতে) থেকে আমেরিকা যাবার জন্য জাহাজে উঠি, তখন প্রথম দিনে প্রচলিত নাচ ও আনন্দোৎসব হলো। দ্বিতীয় দিনে আমরা বেতার সমাচার পেলাম যে জার্মানরা নরওয়ে আক্রমণ করেছে ও বার্জেনের মতো বন্দরগুলি নাৎসী সৈন্যের দখলে চলে গেছে। এতে জাহাজের ওপর এক বিষাদের ছায়া পড়ল আর সব রকম গান বাজনা ও হৈ চৈ বন্ধ হয়ে গেল। জাহাজের নাবিকগণ ও বহু যাত্রী স্নায়বিক ভারসাম্য হারিয়ে ভীত হয়ে পড়ল। নরওয়েতে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাবার কোন আশা রইল না, উপরন্তু যে কোন সময়ে জাহাজটির টরপেডো বিদ্ধ বা বোমা বিধ্বস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিল।

---

১০ তদেব, ৪/২/৪

১১ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৪৮২-৮৩। ঠাকুরের কথায় গল্পটি 'দুই ব্যানের নৃত্য' হিসেবে বর্ণিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাশ্চাত্যদেশে আমাকে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছে : 'স্বামী, আপনি কিভাবে এত শান্ত থাকেন? আপনি কি যুদ্ধের যন্ত্রণা ও নৃশংসতা অনুভব করেন না?' উত্তরে আমি বলতাম, 'এ ব্যাপারে তোমাদের থেকে আমার অনুভূতি বেশি, ঠিক সেই জন্যই আমি চুপ করে আছি'। বাস্তব বা কাল্পনিক বিপর্যয়গুলি সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করে ও সেগুলিকে বড় করে দেখে কোন লাভ নেই। বিপদের সময়, আমাদের উচিত বেশি করে ঈশ্বর চিন্তা করা, শান্ত থাকা আর যতটা সম্ভব কর্তব্য কর্ম করে যাওয়া। এ বিষয়ে মহৎ ব্যক্তিদের জীবন থেকে একটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সক্রেটিসের মৃত্যুর কথা চিন্তা কর। তিনি যা কখনো করেননি এমন সব অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় এবং অন্যায় ও তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তবু তিনি বিচারকদের বিরুদ্ধে কোনরূপ তিক্ত ভাব পোষণ করতেন না। '*কৈফিয়ৎ*' (*Apology*) নামে এক বিখ্যাত কথোপকথনে প্লেটো সক্রেটিসের ঐ বিচারের বর্ণনা দিয়েছেন। অদম্য সাহস ও অন্তরের অবিচলিত সদ্‌ভাব নিয়ে সক্রেটিস্ বিচারকদের বলেছিলেন :

> **এথেন্স নগরীর জনগণ, আমি তোমাদের প্রতি গভীরতম স্নেহ পোষণ করি; কিন্তু তোমাদের অনুরোধ রক্ষা না করে, আমি ঈশ্বরের আজ্ঞাই পালন করব, আর যতক্ষণ আমার জীবন ও শক্তি থাকবে, ততক্ষণ তত্ত্বকথার অনুশীলন ও প্রচার কখনই বন্ধ করব না, যাদের সঙ্গে দেখা হবে তাদের প্রত্যেককেই উৎসাহ দিতে থাকব আর বলতে থাকব, ধর্মানুসন্ধান কর।**

সক্রেটিস্ যে কথাগুলি বলে আদালত ত্যাগ করেন, যা সেই থেকে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তা হলো :

> **বিদায় নেবার সময় এসেছে, আমাদের নিজ নিজ পথে যেতে হবে, আমাকে মৃত্যুর পথে আর তোমাদের বাঁচার পথে, কোন্‌টি শ্রেয়ঃ তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।**

মৃত্যুদণ্ডের জন্য যে দিন ধার্য ছিল তার পূর্বদিন, সক্রেটিসের কিছু বন্ধু তাঁকে কারাগার থেকে পালাবার জন্য প্ররোচিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি রাজি হন নি। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে, তিনি স্বাভাবিক ভাবেই শান্ত ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে তাঁকে দেওয়া বিষপূর্ণ পাত্রটি নিঃশেষ করে একটু পায়চারি করলেন যাতে বিষের ক্রিয়া হতে থাকে—তারপর শান্তিতে মৃত্যুবরণ করার জন্য শুয়ে পড়লেন।

সম্পূর্ণ পবিত্রতা, অহংশূন্যতা, সকলের প্রতি প্রেম ও করুণা, আর ভয়শূন্যতা—এইগুলি জীবন্মুক্ত পুরুষের কয়েকটি লক্ষণ। অধিকন্তু, তিনি অন্তরের অন্তরে জানেন যে, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, অনাসক্ত ও আনন্দে পরিপূর্ণ। যখন জ্ঞানোন্মেষ হয়, তখন তিনি অপরোক্ষভাবে এর অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করেন। ঠিক যেমন সূর্যকে

দেখার জন্য প্রদীপের প্রয়োজন হয় না, তেমনি অতিচেতনার উন্মেষ হলে তাকে বোঝার জন্য কোন রকম বাইরের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। আত্মজ্ঞানী পুরুষ আপন আত্মাতেই পরম আনন্দ ও পূর্ণতা উপলব্ধি করেন ও তাতেই নিত্য মগ্ন থাকেন। তাই তিনি আত্মারাম—যিনি আপন আত্মাতেই আরাম বা আনন্দোৎসব করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাবশেষ যে তাম্রপাত্রে আছে ও বেলুড় মঠে পূজিত হয়, স্বামী বিবেকানন্দ সেটিকে *আত্মারামের কৌটা* নামে উল্লেখ করতেন।

## জগতের আচার্যগণের দৃষ্টান্ত

যে পূর্ণ আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা আমরা আগে বলেছি, জগতের দৈবাদিষ্ট লোকগুরুগণ বড় বড় ধর্ম আন্দোলনের প্রবর্তকগণ, নিজেরাই এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কোটি কোটি অনুগামী এঁদের ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশরূপে পূজা করে। এই সব মহাপুরুষদের জীবনে আর্তমানবের প্রতি তাঁদের যে অপরিসীম প্রেম ও করুণার নিদর্শন দেখা যায়, তা আমাদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান দৃষ্টান্ত। মহান অদ্বৈতবাদী দার্শনিক শঙ্করাচার্য, যিনি কয়েকখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছাড়া উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছিলেন, তিনি নিজেই তাঁর গ্রন্থরাজিতে প্রায়শ আলোচিত জীবন্মুক্ত পুরুষের মূর্ত আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপলব্ধির পর, তিনি ব্যবহারিক জগতের স্তরে নেমে এসেছিলেন ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে, আর জনসাধারণকে পরম শান্তির পথে পরিচালিত করতে। বহু অধ্যাত্ম সাধক তাঁর কাছে সমবেত হয়েছিলেন ও কেউ কেউ তাঁর অন্তরঙ্গভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সাহায্যে তিনি ভারতের চার কোণে সন্ন্যাসীদের চারটি প্রখ্যাত কেন্দ্রীয় মঠ স্থাপন করেন এবং পরে দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তাঁর মত প্রচার করে বেড়ান।

তাঁর নিরন্তর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু তিনি তাঁর জননীর কথা বিস্মৃত হন নি। তিনি এক কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি স্বজ্ঞা-শক্তিসহায়ে জানতে পারেন যে, তাঁর জননী মৃত্যুশয্যায়, তখনই তিনি দ্রুত স্বগ্রামে গিয়ে জননীর পাশে হাজির হন ও মাকে তাঁর ইষ্ট বিষ্ণুরূপ দর্শন করান। অত্যন্ত একনিষ্ঠ দার্শনিক হয়েও, শঙ্করের হৃদয় কোমলতম প্রেমে ও হিন্দুর মহান দেব-দেবীগণের প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ ছিল; দেব-দেবীর উদ্দেশে তিনি অনেকগুলি স্তোত্রও রচনা করেছিলেন। জ্ঞানী পুরুষ কখনও একদেশদর্শী বা সঙ্কীর্ণমনা হন না। তাঁদের উদার দৃষ্টিতে তাঁরা সকলকেই বুকের কাছে টেনে নেন।

হিন্দুরা মনে করে সব অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি যে প্রেমের মূর্ত প্রতীক ছিলেন শৈশব থেকেই তিনি তাঁর মধ্যে সেই সীমাহীন প্রেমের বিকাশ

ঘটিয়েছিলেন। বাল্যাবস্থায় তিনি সাধারণ রাখাল বালকের মতো থেকে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে খেলা করে বেড়াতেন। তিনি বৃন্দাবনের বালক বালিকাদের নয়নের মণিরূপে পূজিত হতেন। তারা তাঁকে এত ভালবাসত যে, এক দণ্ডের জন্যও তাঁকে ভুলে থাকতে পারত না। তবু কর্তব্যের অনুরোধে, তিনি তাদের ছেড়ে যেতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হতেই তিনি মথুরায় গেলেন, যেখানে তাঁর মামা অত্যাচারী কংস রাজত্ব করতেন। কংস তাঁর পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে বন্দী করে সিংহাসন দখল করেছিলেন। কৃষ্ণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে কংসকে নিহত করেন এবং উগ্রসেনকে মুক্ত করে পুনরায় রাজ সিংহাসনে বসান। এর পর কৃষ্ণ বহু অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় গিয়ে নতুন রাজত্ব স্থাপন করলেন, কিন্তু নিজে রাজা হলেন না। উগ্রসেন দ্বারকারও রাজা হলেন। তিনি পছন্দমতো লোককে রাজপদে বসাতেন, কিন্তু যেখানেই *অধর্মের* (অন্যায়ের) উত্থান হতো তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। তিনি পাণ্ডবদের নিজ রাজত্ব পেতে সহায়তা করলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেননি, কেবল অর্জুনের সারথি ও উপদেষ্টারূপে কাজ করেছিলেন। গীতার মাধ্যমে তিনি যে কর্মে অনাসক্তির কথা প্রচার করেছিলেন নিজে তাই আচরণ করতেন।[১২] শ্রীকৃষ্ণ, গৃহস্থের জীবন যাপন করলেও নিজে সংসার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অনাসক্ত ছিলেন। কিন্তু, বৃন্দাবনের গরিব রাখাল বালক ও বালিকা থেকে প্রাসাদের রাজপুত্র রাজপুত্রী পর্যন্ত—সব রকম লোকের প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা বর্ষিত হতো। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি ও প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। ভগবদ্ গীতায় কয়েকটি স্থলে[১৩] শ্রীকৃষ্ণ মুক্তপুরুষের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন, আর সে সমস্তেরই পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছেন নিজ ব্যক্তিত্বে।

বুদ্ধের জীবন যেন মানব ইতিহাসের অন্ধকার গলি পথে এক বিরাট আলোক-বর্তিকার জ্যোতিঃস্বরূপ। রাজকুমার রূপে জন্ম নিয়ে, জীবনের সব রকম সুখ শান্তি ভোগের সুযোগ পেয়ে, তিনি জীবনের দুঃখরাজি ও মানুষের নানা দুর্গতি দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁর ঐতিহাসিক সংসার-ত্যাগ ও বেশ কয়েক বছর যাবৎ কঠোর তপস্যার পর, শেষে যখন তিনি পরম বোধি লাভ করলেন, তখন তিনি শাশ্বত শান্তি ও পরম সিদ্ধিতে পরিপূর্ণ হলেন। কিছুকাল তিনি এই সুখদায়ক অনুভূতিতে অবস্থান করলেন, কিন্তু আর্তমানুষের জন্য তাঁর গভীর সমবেদনা তাঁকে ঐ সুউচ্চ অবস্থা থেকে নেমে এসে লোক-সমাজের মধ্যে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করল।

বুদ্ধ কখনই খোলাখুলিভাবে ঈশ্বরের কথা বলেননি। তাঁর কাছে সত্যই ছিল ঈশ্বর, আর তা শুচিতা ও মানসিক একাগ্রতার দ্বারাই লাভ করা যায়। তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন :

---

১২ দ্রঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, *Sri Krishna Pastoral and Kingmaker*, Madras, Sri Ramakrishna Math, 1973

১৩ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ২য়, ১২শ ও ১৪শ অধ্যায়

**ভাই সব, আমি দিব্য ও মানবীয় সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি। ভাই সব, তোমরাও দিব্য ও মানবীয় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ। ভাই সব, তোমরা জগতের প্রতি করুণায়, বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় এগিয়ে চল।**[১৪]

যীশু খ্রীস্ট, জোসেফ নামে এক দরিদ্র ছুতার ও তাঁর পত্নী মেরীর পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমাদের অতি অল্পই জানা আছে। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি এক অন্তরের আহ্বান অনুভব করলেন—প্যালেস্টাইন দেশে গিয়ে মানব মুক্তির এক নতুন পথের কথা প্রচারের জন্য। তিনি জীবন যাত্রায় সম্পূর্ণ শুচিতা ও প্রগাঢ় ঈশ্বর প্রেমের প্রয়োজনীয়তার কথাই বলতেন। কিন্তু তাঁর বিশেষ বার্তা ছিল মানব প্রেম, স্বীয় সত্তা জ্ঞানে প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম। যে প্রেম তিনি প্রচার করতেন, তা দেহগত প্রেম নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মীয়তা প্রসূত প্রেম। তাঁর হৃদয় দরিদ্র ও আর্তজনের প্রতি করুণায় পূর্ণ থাকত, আর তিনি জনগণকে ডেকে বলতেন ঃ 'তোমরা যারা পরিশ্রম করছ, ভারি বোঝা বইছ, আমার কাছে এস— আমি তোমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করব।'[১৫] তিনি একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী ছিলেন। আত্মীয় কুটুম্বদের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না, সকলের প্রতি ছিল তাঁর সমদৃষ্টি। একদিন যখন তিনি জনতার মধ্যে বসেছিলেন, একজন খবর দিল যে তাঁর মা ও ভাই-এরা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু যীশু ভক্তদের দেখিয়ে বললেন ঃ 'এরাই তো আমার মা ও ভাই'। তারপর তিনি এক অপূর্ব উক্তি করলেন ঃ 'যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবে সেই হবে আমার ভাই, আমার ভগিনী, আমার মা।'[১৬] যীশু যা শিক্ষা দিতেন তার মূল ভাব ছিল ঈশ্বরানুভূতি, আমাদের অন্তরে যে ঈশ্বরের রাজ্য বিরাজ করছে তার অনুভূতি। তাঁর প্রেরণাদায়ী উক্তিটি, 'যাদের চিত্ত শুদ্ধ তারাই সুখী, কারণ তাদেরই ঈশ্বর দর্শন হবে,'[১৭]—বিষয় ও ইন্দ্রিয় ভোগে নিমগ্ন সংসারী লোকেদের সর্বদা মনে করিয়ে দেয়—প্রকৃত ধর্মের স্বরূপটি কিরকম।

চৈতন্য বঙ্গদেশে জন্মেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তরুণ বয়সেই তিনি একজন প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক ও পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পূর্ণ যৌবনে তাঁর এক পরিবর্তন এল ও তিনি প্রগাঢ় ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হয়ে সংসার ত্যাগ করলেন। বাকি জীবন তিনি ঈশ্বরোন্মত্ত অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি প্রভুর নাম প্রচার করে বেড়াতেন। এমনকি অপরাধীরাও তাঁর প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে পরিবর্তিত হয়ে পাপের পথ থেকে উদ্ধার পেয়েছিল।

---

১৪ *Some Sayings of the Buddha*, Translated by F. L. Woodward. [London : Oxford University Press, 1939] p. 30

১৫ *Bible*, St. Matthew, 11:28

১৬ *Bible*, St. Mark, 3:33-35

১৭ *Bible*, St. Matthew, 5:8

শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-১৮৮৬) বঙ্গদেশের এক নিভৃত পল্লীতে দরিদ্র পিতা-মাতার পুত্র রূপে জন্মেছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর ভাবসমাধি হতো। পরে তিনি কলকাতায় দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে পূজকের পদে বৃত হন। তখন থেকে শুরু হয় বার বছর ধরে চলতে থাকা তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে পর পর অনেকগুলি অনুসন্ধান ও পরীক্ষা। প্রবল আকুতির মাধ্যমেই তিনি জগন্মাতা কালীর দর্শন লাভ করেন। তারপর তিনি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পথে সাধন করে ঈশ্বরানুভূতি লাভে তৎপর হন। সব পথে তিনি খুব অল্প সময়েই সাফল্য অর্জন করে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিব্য আনন্দের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শেষে তিনি অদ্বৈত সাধনার পথে দ্বিত্বভাব-বর্জিত ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করলেন। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি ইসলাম ও খ্রীস্টীয় ধর্মের পথে সাধন করে, প্রথমে ভাবদৃষ্টিতে ঐ সব ধর্ম-প্রবর্তকদের দর্শন লাভ করে ধন্য হন ও পরিশেষে ঈশ্বরের সেই এক নিরাকার ভাবের অনুভূতি লাভ করেন, যা তিনি লাভ করেছিলেন বিভিন্ন হিন্দু সাধন পদ্ধতির মাধ্যমে। এরপর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, সকল ধর্ম পথই নিয়ে যায় একই লক্ষ্যের দিকে, যথা ঈশ্বরানুভূতি।

তাঁর বাকি জীবন কেটেছিল ঈশ্বরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করে। সর্ব জীবে তিনি পরমাত্মার প্রকাশ দেখতেন। ভোগজগতের কালিমা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে, ত্যাগ ও জ্ঞানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে, জাতি ধর্ম বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকলকে ভালবেসে—তিনি ঈশ্বরের শিশুর মতো জীবন যাপন করতেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু, বুদ্ধিমান যুবক, ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক তাঁর কাছে জড় হয়েছিলেন, আর তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির সংস্পর্শে এসে উন্নতি লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, তাতেই তাঁরা দিকে দিকে তাঁর বাণী প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অতিচেতন উপলব্ধির আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, জীবনে নৈতিক পবিত্রতা ও সকল ধর্মমতের মধ্যে সমন্বয় বোধের প্রয়োজনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁর প্রভাব এখন সারা পৃথিবীর মানবিক কর্ম-তৎপরতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান পরিধি নিয়ে প্রসারিত হয়ে চলেছে।[১৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী পূতচরিতা শ্রীশ্রীসারদাদেবী (১৮৫৩-১৯২০) জগদ্-গুরুদের অন্যতমরূপে পূজিতা হন। ভারতের ধর্মেতিহাসে তিনি একটি অনুপম

---

১৮ শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি সর্বাধিক প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থ হলো : *Life of Sri Ramakrishna*, মহাত্মা গান্ধী লিখিত মুখবন্ধ সহ [Kolkata : Advaita Asrama, 1977] এবং স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক বাংলায় প্রণীত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত *Sri Ramakrishna The Great Master*. [Madras : Sri Ramakrishna Math, 1970]

ব্যক্তিত্ব। সীতা সাবিত্রীর আদর্শ সুবিদিত। কিন্তু উপনিষদ্-প্রখ্যাত মৈত্রেয়ী গার্গীর মতো *ব্রহ্মবাদিনীদের* (ব্রহ্মবিদ্যার নারী আচার্যা) অনুরূপ আদর্শের আরো বেশি প্রচার চাই। প্রথম জীবনে সারদাদেবীর চরিত্রে একাধারে দুহিতা, ভগিনী, গৃহিণী, অধ্যাত্ম সাধিকা ও সন্ন্যাসিনীর আদর্শগুলি রূপায়িত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি আদর্শেরই প্রকৃষ্টতম প্রকাশ ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে তাঁর অনুপম জীবনযাত্রা ছিল প্রাচীন ঔপনিষদিক আদর্শের এক যথার্থ কার্যকর রূপায়ণ—যে আদর্শে পতিকে পতির জন্য ভালবাসা হয় না, পরন্তু হয় আত্মার জন্য, জায়াকে জায়ার জন্য ভালবাসা হয় না, পরন্তু আত্মার জন্য। তিনি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারিণী হয়ে ঈশ্বরের মাতৃশক্তির সাকার প্রতিমূর্তি ধারণ করে তাঁর কাছে সমবেত শত শত মানুষের মাতারূপে ও গুরুরূপে তাদের প্রয়োজনমতো আশ্রয়, সান্ত্বনা, শান্তি, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করতেন।

তাঁর জীবনের গোড়ার দিক কেটেছে গৃহস্থালির কাজকর্মে, পিতামাতাকে সাহায্য করে ও ভাইভগিনীদের দেখাশুনা করে। দক্ষিণেশ্বরে তিনি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দিব্য স্বামীর সেবা করতেন, আবার তাঁর অল্পবয়স্ক শিষ্যদের কাছে মায়ের ভূমিকা পালন করতেন। প্রভুর তিরোধানের পর তিনি সাধারণ গ্রাম্য নারীর মতো জীবন যাপন করতে থাকেন আর প্রতি নিয়ত তাঁর অসংখ্য শিষ্য ও ভক্তদের কল্যাণে কাজ করে যেতেন, যাদের মধ্যে কিছু বিপথগামী লোক সমেত সমাজের সর্বস্তরের মানুষ থাকত। তবু সেই সময়কার কিছু মহান আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উন্নতি ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার বিষয়ে তাঁর অবদানও প্রচুর। মহান স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ 'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেউই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। ...মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'[১৯]

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী রূপে যে দৈবী মাতৃত্বের সুমহান প্রকাশ ঘটেছিল, এর আগে পৃথিবীতে আর এমনটি কখনো ঘটেনি। তিনি অধিষ্ঠিতা রয়েছেন, জগতের নারীসমাজের কাছে এক মহান আদর্শরূপে, আর সহস্র সহস্র অবসন্ন জীবের কাছে চির-করুণাময়ী, চির-ক্ষমাশীলা, সর্ব-প্রেমময়ী মাতারূপে।[২০]

---

১৯ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫

২০ শ্রীশ্রীমায়ের বিশদ জীবন-কাহিনীর জন্য স্বামী তপস্যানন্দ ও স্বামী নিখিলানন্দ রচিত *Sri Sarada Devi The Holy Mother* (Madras : Sri Ramakrishna Math. 1973); স্বামী গম্ভীরানন্দ-রচিত *শ্রীমা সারদাদেবী* (উদ্বোধন, ১৯৯৯) দ্রষ্টব্য।

## সাধু-সন্তদের দৃষ্টান্ত

এইবার আমরা পৃথিবীর কয়েকজন মহান সন্তের কথায় আসি। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্ম সম্প্রদায়ে বহু সংখ্যক সাধু-সন্তের জন্ম হয়েছে। আদি লোকগুরুগণের কাছে অনুপ্রেরণা পেয়ে এই সব শুদ্ধ চিত্ত মনীষিগণ সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে অধ্যাত্মজীবনের বাণী বহন করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। শত শত বছর ধরে এই সব সন্তদের নিভৃত কর্মপ্রয়াসই মানব জাতিকে পশুস্তরে নেমে যেতে না দিয়ে তার আপন সংস্কৃতি বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। যুদ্ধ ও রক্তপাত, ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংস, উৎকট ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ও লোভ যা ইতিহাসের ঊষর মরুক্ষেত্রকে ভরে রেখেছে, তার মধ্যে জগতের বিভিন্ন ধর্মমতের সন্ত পুরুষগণ যেন মরূদ্যানস্বরূপ।

পাশ্চাত্যের আদি ঋষিগণের একজন ছিলেন প্লটিনাস (Plotinus, A.D. 204-270))। তিনি খ্রীস্টান ছিলেন না কিন্তু নব্য *প্ল্যাটনীয় মত* নামে তাঁর দার্শনিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে, অন্য যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অপেক্ষা খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্বের ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। প্লটিনাস আলেক্‌জান্দ্রিয়া শহরে জন্মেছিলেন; যুবা বয়সে তাঁর প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা হয়, অস্তিত্ব সম্বন্ধে চরম সত্য কি তা জানবার জন্য। বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারে দ্বারে খোঁজ করে, শেষে অ্যাম্মোনিয়াস্ সাক্কাস (Ammonius Saccas) নামে এক মহান দার্শনিকের তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ভারতে এসে হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি। পরিণত জীবনে তিনি রোমে (Rome) থেকে বেশ কিছু সংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্যে প্রধান হলেন পোরফাইরি (Porphyry)। তাঁর গুরুদেবের জীবনীগ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্লটিনাসের জীবনে উচ্চতম অতিচেতন অবস্থার অনুভূতি হয়েছিল চারবার। তাঁর একজন উত্তরসূরী, প্রোক্লুস (Proclus) এইভাবে প্লটিনাসের স্তুতি করেছিলেন :

"সর্বদা শুদ্ধভাবে রক্ষিত, তাঁর আত্মাটি, দৈব তত্ত্বের প্রতি ধাবমান হয়ে তার কাছে প্রার্থনা ও তার স্তুতি করতে থাকেন। তিনি সর্বদাই, রক্তমাংসে পুষ্ট এই পশুজীবনের ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত তরঙ্গের ওপরে নিজেকে ওঠাতে চেষ্টা করেছেন। এইভাবে, সর্বদা পরমেশ্বরের ও দৃষ্টিবহির্ভূত জগতের চিন্তায় মগ্ন এই দিব্যপুরুষটি ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির অবিষয় ঈশ্বর সত্তার সাক্ষাৎ দর্শন লাভের সুযোগ কয়েকবার পেয়েছিলেন, কারণ তিনি যে বুদ্ধি ও সত্তার পারে অবস্থিত।"[২১]

এই সমন্বয়ীভাবের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে প্লটিনাস (Plotinus) নিজেই লিখেছেন : 'সুতরাং এই হলো দেবতার এবং দেবভাবাপন্ন সুখী মানবের জীবন,

---

২১ W.R. Inge রচিত *Mysticism in Religion* [London, Hutchinsons University Library, Prince's Gate] গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৬

সব পার্থিব ব্যাপার থেকে মুক্তি, মানবীয় সুখস্পর্শহীন জীবন, আর ঐখানেই হয় নিঃসঙ্গ থেকে একত্বে উত্তরণ।' মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ কথা ছিল ঃ 'আমার অন্তরের দেবত্বকে সর্ব-স্বরূপ দেবত্বে পুনরুত্থিত করব।'

বুদ্ধের মহান শিষ্যদের অন্যতম উপগুপ্ত, একজন শুদ্ধসত্ত্ব মানব ছিলেন। প্রব্রজ্যাকালে, তিনি তাঁর প্রেমাভিলাষিণী, উচ্ছৃঙ্খলচরিত্রা মনোহারিণী এক যুবতীর সাক্ষাৎ পান। 'দেহ সম্ভোগে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা পেতে হয়' বলে তার কাছ থেকে তিনি সরে আসেন, কিন্তু কথা দিয়ে আসেন যদি তার প্রয়োজন হয় তিনি ফিরে আসবেন। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলে রমণীটি এক রোগের শিকার হয়ে নিজ সৌন্দর্য হারাতে থাকে, শেষে সে একতাল গলিত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তখন রমণী একাগ্রভাবে উপগুপ্তকে স্মরণ করল, আর তখনই উপগুপ্ত তার কাছে এলেন। 'যখন আমার দেহ ছিল সুন্দর—রেশম-চিকন আবরণে ও সোনার অলঙ্কারে আবৃত, তখন তুমি আসতে চাওনি, এখন আমার এই ঘৃণ্য দশায় কেন এসেছ?' এ কথার উত্তরে উপগুপ্ত বললেন, 'ভগিনী, যার দৃষ্টি আছে, বুদ্ধি আছে, তার কাছে তুমি কিছুই হারাওনি। যে ভালবাসা বৃথা বাহ্য অবয়বের ওপর নির্ভর করে, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা তার থেকে গভীরতর।' রমণীর চোখ দুটি উদ্দীপিত হয়ে উঠল আর তার আশা ফিরে এল। শেষ পর্যন্ত সে বুদ্ধের জ্ঞানোদ্দীপক বাণী গ্রহণে সমর্থ হয়েছিল এবং জ্ঞান ও শান্তি লাভ করেছিল।

## খ্রীস্টীয় মরমী সাধকগণ

খ্রীস্টধর্মে কয়েকজন মরমী সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল। খ্রীস্টের শিষ্যগণের বিষয়ে আমরা খুব অল্পই জানি, তাঁদের বাদ দিলে সন্ত পল (St. Paul)-কেই আদি মরমী সাধক বলা যেতে পারে। যুবা বয়সে তিনি খ্রীস্টধর্মের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তারপর একদিন দামাস্কাস যাবার পথে তাঁর অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এক উজ্জ্বল আলোক তাঁকে এমনই অভিভূত করল যে তিনি তিন দিন দৃষ্টি হারিয়ে রইলেন, আর যীশুখ্রীস্টের কণ্ঠস্বর শুনতে থাকেন। ফলে তিনি খ্রীস্টান ধর্মমত গ্রহণ করেন ও বাকি জীবন উৎসর্গ করলেন যীশুর মানব-প্রেমের বাণী প্রচারের কাজে। অন্তর্যামী ঈশ্বরেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর জীবন, 'তাঁতেই নিহিত আছে আমাদের জীবন, কর্মচঞ্চলতা ও আমাদের সত্তা।'[২২] তিনি বলেছিলেন, 'আমি জীবন ধারণ করে আছি, তবু তা আমি নই, আমার অন্তরে খ্রীস্টই জীবন ধারণ করে আছেন।'[২৩] তিনি দূর দূরান্তর পর্যন্ত ভ্রমণ করে জনগণকে পবিত্রতায় ও সেবাভাবে পূর্ণ ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবনযাপনে সহায়তা করতে প্রয়াসী হতেন।

---

২২ *Bible*, Acts, 17:28

২৩ *Bible*, Galatians 2:20

এসিসির সন্ত ফ্রান্সিস্ (St. Francis of Assisi) (১১৮১-১২২৬) খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের একজন মহত্তম সন্ত। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। তিনি এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্ররূপে জন্মেছিলেন ও যৌবনে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে কাটাতেন। কিন্তু একবার দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তাঁর জীবনে রূপান্তর ঘটে, তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত হয়ে সংসার ত্যাগ করেন। একদিন, যখন তিনি এক পোড়ো গির্জায় প্রার্থনারত, তখন শুনতে পেলেন এক দৈববাণী যেন তাঁকে আদেশ করছেন—ঈশ্বরের ঐ গৃহটি সংস্কার করার জন্য। তিনি একাই বাড়ি তৈরির মাল মশলাদি সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। সে সবই তাঁকে মাথায় করে আনতে হতো। কৌতুক করে তিনি নিজ দেহের নাম দিয়েছিলেন 'গাধা-ভাই'। সংসারের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য এতই নিশ্ছিদ্র ছিল যে, তার ফলে তিনি অন্তর্জীবনে প্রভূত মুক্তির স্বাদ লাভ করেন ও সর্বদা মহানন্দে ভরপুর থাকতেন। অন্তরের এই আধ্যাত্মিক আনন্দকে চেপে রাখতে না পেরে তিনি গাইতেন, নাচতেন, এমন সব গানের স্বতঃস্ফূর্ত অবতারণা করতেন, যা পরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

অধ্যাত্ম-দৃষ্টির ফলে তিনি পাখি, জীবজন্তু, গাছপালা এমনকি নিষ্প্রাণ বস্তুর সঙ্গেও আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং তাদের ডাকতেন 'ভ্রাতা সূর্য', 'ভগিনী চন্দ্র', 'ভাই নেকড়ে' ইত্যাদি বলে। একদিন দেখেন যে, এক কাঠুরে একটি গাছ কাটছে। ফ্রান্সিস তাকে বললেন, 'ভাই, পুরো গাছটাকে কেটো না, একে আবার গজিয়ে ওঠার সুযোগ দাও', আর ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিজ ভিক্ষালব্ধ আহার্য থেকে তাকে কিছু দিলেন। লিখিত শব্দের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তিনি যদি পথে কোন কিছু লেখা কাগজ পড়ে থাকতে দেখতেন, তবে তিনি সেটিকে সযত্নে পাশে সরিয়ে দিতেন, পাছে অন্যে সেটিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলে। যে লেখাটিকে তিনি এই ভাবে রক্ষা করলেন, তা কোন অবিশ্বাসী লোকের কাজ হতে পারে, এই ভাবে কোন লোক বলায়, ফ্রান্সিস্ উত্তর দেন, 'সব শব্দই ঈশ্বরের শ্রীমুখ থেকে আসে।'

তিনি মহান ফ্রান্সিস্কান্ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন—যাঁরা অত্যন্ত দারিদ্র্যের জীবন যাপন করতেন, যা ভারতীয় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও তিনি শারীরিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন (তিনি নিজের নাম দিয়েছিলেন, 'কালো মুরগী'), লোক-মনের ওপর তাঁর প্রভূত প্রভাব ছিল, আর অনেকে তাঁর অনুগামী হয়েছিল। জীবনের শেষদিকে তিনি অন্ধ হয়ে যান ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি বরাবরের মতো তাঁর যন্ত্রণা হাসি মুখে সহ্য করতেন। তাঁর মৃত্যুভয় ছিল না, মৃত্যুকে তিনি 'ভগিনী মৃত্যু' বলে স্বাগত জানাতেন। তাঁর জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত ছিল, আর তিনি নিজেকে তাঁর হাতের সামান্য যন্ত্রমাত্র বলে মনে করতেন। তাঁর প্রার্থনাগুলির মধ্যে যেটি সব থেকে

প্রসিদ্ধ, যাতে তাঁর ত্যাগের পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে, সেইটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> **প্রভু, আমাকে তোমার শান্তির যন্ত্রস্বরূপ কর!**
> **যেখানে ঘৃণা, সেখানে যেন আমি প্রেমের বীজ বপন করি,**
> **যেখানে আঘাত হানা হয়েছে, সেখানে যেন আমি ক্ষমার বীজ বপন করি;**
> **যেখানে সন্দেহ, সেখানে যেন আমি বিশ্বাসের বীজ বপন করি;**
> **যেখানে বিষাদ, সেখানে যেন আমি আনন্দের বীজ বপন করি।**
> **হে আমার দিব্য প্রভু, আমাকে তাই দাও, যা আমি চাইতে পারি না,**
> **পাঠাও অত সান্ত্বনা-যোগ্য লোক, যাদের আমি সান্ত্বনা দেব,**
> **এত বোঝবার বিষয় যা আমি বুঝব,**
> **এত ভালবাসার পাত্র, যাদের আমি ভালবাসব,**
> **কারণ, দিলেই তো আমরা পেতে পারি;**
> **ক্ষমা করলেই তো আমরা ক্ষমা পেতে পারি;**
> **জীবনদানেই তো আমরা চিরজীবী হতে পারি।**

সন্ত টমাস্ একুইনাস্ (১২২৭-৭৪) (St. Thomas Aquinas) হলেন আর একজন সন্ত, যিনি ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি পদমর্যাদাসম্পন্ন অভিজাত বংশে জন্মেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাব আত্মীয়দের থেকে বিপরীত হওয়ায়, পবিত্রতা ও অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি জন্মেছিল। সতের বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হতে চেষ্টা করলে, তাঁর ক্রুদ্ধ ভ্রাতাগণ তাঁকে নির্জন ঘরে বন্দী করে রেখে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে। তিনি কেবল সব রকম প্রলোভনকেই জয় করেন নি, পরন্তু প্রার্থনা ও অধ্যয়নেই সময় কাটাতেন। অবশেষে তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হয় ও তিনি ডোমিনিকান (Dominicans) সম্প্রদায়ে যোগ দেন। খুব শীঘ্রই তিনি তৎকালীন ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছিলেন, তাঁর রচিত *সুম্ম থিওলজিকা* (*Summa Theologica*) নামে পুস্তকখানি ক্যাথলিক ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি পায়। বইখানি লেখা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন তাঁর এক বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয় ও তিনি তারপর আর লিখতে চাইলেন না। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটিকে তিনি অসমাপ্তই রেখে দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ 'এমন সব গূঢ় রহস্যসকল আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল যে, আমি এতদিন যা লিখেছি, সে সবই আমার কাছে মূল্যহীন খড়কুটোর মতো মনে হয়।'

তোমরা কেউ কেউ হয়তো *Practice of the Presence of God* (*ঈশ্বর-সান্নিধ্যের উপাসনা*) বইটি পড়েছ। এতে Brother Lawrence (ভাই লরেন্স) (১৬১১-১৬৯১)-এর সঙ্গে কথোপকথন ও তাঁর চিঠিপত্রগুলি আছে। তিনি

গরিবের ঘরে জন্মেছিলেন। আঠার বছর বয়সে ধর্মান্তরিত হন, যখন তিনি শীতঋতুতে পত্রহীন এক বৃক্ষ দেখেন। তিনি এর গূঢ় রহস্য ও যে জীবনীশক্তি কিছুদিন পরে এই বৃক্ষটিকে নতুন পত্র-পুষ্পে সাজিয়ে তুলবে—তার সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকেন। এই চিন্তাতেই সংসার জীবনের প্রতি তাঁর আসক্তি ক্ষীণ হয়ে যায় ও তিনি সমস্ত জীবন ও চেতনার উৎসস্বরূপ ঈশ্বরের সাধনায় ব্যাপৃত হন। বয়স আরো বাড়লে তিনি কিছুদিনের জন্য সৈনিক দলে, এক পদস্থ ব্যক্তির সেবায়, ও শেষে প্যারিসের Carmelite (কারমেলাইট) মঠে পাকশালায় কাজ করেন। ত্রিশ বছর ধরে তিনি এই সব সামান্য পদে কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আত্মা ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকত। পাকশালার সাধারণ কাজে নিযুক্ত থেকেও তিনি যে সদা ঈশ্বর-সান্নিধ্যের উপাসনা করতেন, তাতেই উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করেন। সমাজে তাঁর স্থান নিচে হলেও, তিনি শীঘ্রই তাঁর পবিত্রতার জন্য এতই সুপরিচিত হয়ে ওঠেন যে সম্ভ্রান্ত লোক ও গির্জার উচ্চপদস্থ যাজকরাও তাঁর উপদেশ চাইতে আসতেন। তাঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন ঃ

> **আমার কাছে কাজের সময় আর প্রার্থনার সময় পৃথক নয়; পাকশালার হৈ চৈ আর ঠন্‌ঠন্‌ শব্দের মধ্যে, যখন অনেক লোক একই সময়ে বিভিন্ন জিনিস চাইছে, তখন আমি অন্তরে পরম শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকি—যেন পুণ্য ধর্মানুষ্ঠানে নতজানু হয়ে আছি।** [২৪]

খ্রীস্টান ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আরো বড় বড় সন্ত আছেন, যেমন সেণ্ট ইগনেশিয়াস লোয়োলা (St. Ignatius Loyola) (1491-1556), সেণ্ট টেরিসা অব অ্যাভিলা (St. Teresa of Avila) (1515-1582), সেণ্ট জন অফ দি ক্রুশ (St. John of the Cross) (1542-1591) ইত্যাদি। এই সব শুদ্ধ চরিত্র ব্যক্তিদের বিশেষ লক্ষণ হলো তাঁরা গীর্জা-গত জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থেকেও স্বীয় আত্মাকে তাদের সাম্প্রদায়িক মতের দ্বারা সঙ্কুচিত হতে না দিয়ে অন্তরে মুক্তির স্বাদ উপভোগ করতেন। মরমী সাধকদের জীবন বড় একটা স্বচ্ছন্দে চলত না, বিশেষত মধ্যযুগে, আর তাদের সকলকেই শয়তানের দূত বলে চিহ্নিত ও অগ্নিদগ্ধ হবার ঝুঁকি নিতে হতো। ক্রুশের সন্ত জোহনকে এক সময়ে তাঁর সন্ন্যাসী ভায়েরাই আট মাস এক সঙ্কীর্ণ অন্ধকূপে বন্দী করে রেখেছিল। সেই অবস্থাতেও, নোংরা পরিবেশে থেকেও, তিনি সব সময় দিব্য আনন্দের ভাবে কাটাতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি 'ঈশ্বরের জন্যই মানবের সৃষ্টি; আর সব রকম স্বার্থপরতা ও ঈশ্বর থেকে বিরূপভাব তাকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।' সাধারণত সব খ্রীস্টান মরমিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি এইরূপ।

---

২৪ Brother Lawrence, *The Practice of the Presence of God* [London, the Epworth Press, 1957] p. 23

## সুফি মরমী সাধকগণ

এক মুসলমান সন্ত ব্যাক্ট্রিয়ার রাজা আদমের কাছে এসে বললেন ঃ 'আমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি, আপনার পান্থশালায় থাকতে চাই।' রাজা আপত্তি জানিয়ে বললেন যে, তাঁর প্রাসাদকে পান্থনিবাস বলা চলবে না। 'আপনি এখানে থাকবার পূর্বে এটি কার অধিকারে ছিল?' 'আমার পিতার, আর তার পূর্বে তাঁর পিতার ও তাঁর পিতার পিতার।' 'তা হলে আপনার বাসস্থানটিকে লোকেদের চলার পথে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার মতো বিশ্রামাগারের বেশি আর কি বলা যেতে পারে?' রাজা চিন্তিত হলেন। তারপর যখন তিনি শিকারে বেরিয়ে, গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছেন, তখন শুনলেন ঃ 'ওঠ, ওঠ, মৃত্যু তোমাকে জাগিয়ে তোলার আগে তুমি উঠে পড়।' কালক্রমে রাজা সংসারকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। তিনি কঠোর অধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত হলেন। তিনি দিব্য চৈতন্য লাভ করলেন, আর তাঁর হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে গেল। অধ্যাত্ম জ্ঞানের ফলে তিনি মুক্ত হলেন।

প্রধানত ইসলাম সন্ন্যাস-বিরোধী ও মরমীভাবেরও বিরোধী। তবু মধ্যযুগে, এঁদের ভেতর থেকে অনেকগুলি মহান সন্তের আবির্ভাব হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশই মরমী সাধক। ইসলামের মরমী সাধকদের সুফি বলা হয়। আদি সুফিদের একজন ছিলেন বস্‌রার সন্ত রাবিয়া (৭১৭-৮০১) নামে এক নারী। অল্প বয়সে অনাথ হয়ে পড়ায় এক দুষ্ট লোক তাঁকে অপহরণ করে ক্রীতদাসীরূপে বেচে দেয়। তাঁর নতুন প্রভুও একই রকম নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু এক রাত্রে সে দেখল এক অদ্ভুত আলোকচ্ছটা ঐ দাসীকে ঘিরে রয়েছে, তখন সে ভীত হয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিল। তিনি কিছুদিন নির্জন মরুভূমিতে কাটিয়ে, (ইরাক দেশে) বস্‌রায় গিয়ে সন্তের জীবন যাপন করতে লাগলেন। আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে তিনি সাংসারিক দ্বৈতভূমির পারে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়—তিনি শয়তানকে ঘৃণা করেন কিনা—তিনি উত্তর দেন ঃ 'না, ঈশ্বরপ্রীতিতে আমার হৃদয় ভরে আছে—সেখানে কারও প্রতি ঘৃণার স্থান নেই।' তাঁর প্রসিদ্ধ প্রার্থনা মন্ত্রটি হলো ঃ 'হে প্রভু, আমি যদি নরকের ভয়ে তোমাকে পূজা করি তবে আমাকে নরকেই পোড়াও, যদি আমি স্বর্গের আশায় তোমায় পূজা করি তবে আমায় স্বর্গে ঢুকতে দিও না; কিন্তু আমি যদি কেবল তোমার জন্যেই তোমাকে পূজা করি তবে তোমার শাশ্বত সৌন্দর্য থেকে আমায় বঞ্চিত করো না।'

শ্রেষ্ঠ সুফি মরমী সাধক হলেন মনসুর আল-হাল্লাজ (৮৫৮-৯২২), শুধু হাল্লাজ নামেও তিনি পরিচিত। তাঁর জন্মস্থান হলো দক্ষিণ পারস্যে। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মরমী মেজাজ লক্ষ্য করা যেত, আর তিনি কয়েকজন সুফি সন্তের কাছে উপদেশ

নিতেন। যুবা বয়সে তিনি যান বাগদাদে ও সেকালের সুপরিচিত গুরু, জুনাঈদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মক্কার নির্জন স্থানে কয়েকবছর কাটিয়ে, হাল্লাজ সমুদ্রপথে ভারত ভ্রমণে আসেন। সে সময় ভারতে মুসলিম শাসনের পত্তন হয়নি, আর যেসব সুফি মরমী সাধক ভারতে প্রথম এসেছিলেন হাল্লাজ তাদেরই একজন, এখানে হিন্দু মরমী সাধকদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। বাগদাদে ফিরে তিনি প্রচারের কাজে লেগে যান। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও মৌলিক তত্ত্ব ছিল অন্-অল-হক্ (আমিই সেই সৎ-স্বরূপ)—যা 'আমিই ব্রহ্ম'-রূপ বৈদান্তিক তত্ত্বের প্রায় অনুরূপ। মুসলিম তাত্ত্বিকগণ—রুষ্ট হয়ে তাঁকে বন্দী করান এবং বহু দিন বিচারের পর তাঁকে নির্যাতন করে বর্বরোচিত ভাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু, আত্মার দেবত্ব ও পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার একত্বলাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর ভাবগুলি ইসলাম ধর্মের মরমী সাধকদের কয়েক শতাব্দী ধরে প্রভাবিত করেছিল।

আর একজন মহান ইসলামিক মরমী সাধক ও কবি ছিলেন জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩)। পূর্ব পারস্যে বল্খ নামক শহরে তাঁর জন্ম। যখন তিনি শিশু, তাঁর পিতা রাজরোষে পড়েন, ফলে তাঁকে সপরিবারে স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়। অনেক ঘোরার পর ঐ পরিবার তুর্কিস্তানে কুয়োনিয়ায় স্থায়ী বাসস্থানের পত্তন করেন। জালাল আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মহাপণ্ডিতরূপে খ্যাত হন। কিন্তু এক পরিব্রাজক দরবেশের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনে অকস্মাৎ এক পরিবর্তন ঘটে। তখন থেকে বহুক্ষণ ধরে তিনি ধ্যান-চিন্তায় কাটাতেন। তাঁর প্রিয় আচার্যের স্মরণে তিনি মৌলবীনামে এক নতুন ধর্মীয় গোষ্ঠীর পত্তন করেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবের আবেশ আনবার জন্য একরকম ঘুরে ঘুরে নাচ অভ্যাস করতেন। তিনি কয়েকটি বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটি হলো *মথ্নবী*—যা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মরমী কবিতাগুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়।

জালালুদ্দিন রুমির দর্শনে ঈশ্বরই হলেন এক মাত্র সত্য, আর জগতের সব দৃশ্য বস্তু যেন তাঁর ছায়া। তিনি আত্মার পূর্ব-অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন, আর তাঁর মতে আত্মার ঊর্ধ্বগতি পরপর মাটি, উদ্ভিদ, পশু, মানুষ ও দেবদূতের শরীরের মাধ্যমে চলতে থাকে যতদিন না ঈশ্বরের সঙ্গে তার মিলন হয়। এক ব্যক্তির নিজ প্রিয়তমের দরজায় টোকা মারা নিয়ে তাঁর রূপক গল্পটি সুপরিচিত। ভেতর থেকে আওয়াজ আসে : 'ওখানে কে?' আর প্রেমিক উত্তর দেয়, 'এখানে আমি', দরজা খোলে না। পরে সে যখন আবার এসে দরজায় টোকা মারে আর ভেতর থেকে একই প্রশ্ন আসে, প্রতি-উত্তরে সে বলে, 'এখানে তুমি'—তখন দরজা খোলে। রূপকটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো যত দিন অহং-চেতনা থাকে আত্মা ও ঈশ্বরে পূর্ণ

মিলন সম্ভব নয়। তাঁর বহু শিষ্য ও রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে জালালুদ্দিন রুমি সুফিমত গড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

## শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ

আমরা এবার শ্রীরামকৃষ্ণের মহান শিষ্যগোষ্ঠীর কয়েকজনের কথায় আসি। আমাদের মতো যাঁরা তাঁদের পদতলে বসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা এঁদের মধ্যে এক অনন্যসাধারণ সমন্বয় দেখেছিলেন—প্রাচীন অধ্যাত্মবাদ ও আধুনিক সমাজ সচেতনতার সমন্বয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ অবদানের সমন্বয়, গভীর ভগবৎ-প্রেম ও মানব-প্রেমের সমন্বয়। তাঁদের মানব-প্রেম ছিল তাঁদের ভগবৎ-প্রেমেরই একটি প্রকাশ, কারণ তাঁরা সব নর নারীর মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই (১৮৬৩-১৯০২) ছিলেন মহত্তম। প্রভু তাঁকে ফেলতেন নিত্যসিদ্ধের চিরমুক্ত-আত্মাদের থাকে, যাঁদের পৃথিবীতে জন্ম মানব কল্যাণের জন্য। বাল্যকালেই তাঁর মধ্যে ভাবী মহত্ত্বের লক্ষণ—অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস ও মানসিক একাগ্রতা দেখা যেত। কৈশোর অবস্থায় কলেজে শিক্ষার প্রভাবে তিনি কিছুদিনের জন্য নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আঠার বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর জীবনে প্রভূত পরিবর্তন আসে। প্রভুর নির্দেশে তিনি কঠোর *সাধনা* করতেন, আর তেইশ বছর বয়সে *নির্বিকল্প সমাধি*-রূপ সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভে ধন্য হন।

প্রভুর তিরোধানের পর, তাঁরই আদেশে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের যুবাশিষ্যদের নিয়ে এক সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গঠন করে, নিজে প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে সাগর পারে—আমেরিকা, ইংলণ্ড তথা সারা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি মার্কিন সমাজে বেদান্তের বাণী নিয়ে বোমার মতো ফেটে পড়লেন। চার বছর প্রচার অভিযানের পর মাতৃভূমিতে ফিরলেন, দেশ তাঁকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানাল। তিনি, কলম্বো থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বহুস্থানে বক্তৃতা দিয়ে নিদ্রাভিভূত জাতিকে—জাতির প্রাচীন উত্তরাধিকারের গৌরবের, আর বর্তমান ভারতের দারিদ্র্য ও পিছিয়ে-পড়া মানব গোষ্ঠীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। দরিদ্র ও মূর্খ দেশবাসীর দুঃখ কষ্টে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে রক্ত মোক্ষণ করত। ভারতে তিনি সমাজ সেবার ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন ও এই উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানবজাতির প্রতি মহতী করুণায় তিনি ঘোষণা করেন ঃ

"একমাত্র নিখিল জীবাত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্ম

গ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি—আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর দরিদ্র-নারায়ণ। এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।"[২৫]

আমরা যখন যুবা বয়সে সদ্য কলেজ থেকে এসে রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিয়েছি, তখন আমরা ছিলাম স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান। অবশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য মহান সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা তখন জীবিত ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ আমাদের বলেছিলেন, 'এখন স্বামীজীর প্রতি তোমাদের গভীর শ্রদ্ধা। বেশ, তা খুবই ভাল। কিন্তু তোমরা নিজেরা অধ্যাত্মজীবনে যত উন্নতি করবে তত তাঁকে আরো বেশি বুঝবে ও বেশি শ্রদ্ধা করবে।' আমাদের কাছে সে কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। শীঘ্রই আমরা বুঝতে পারলাম যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমত ও সর্বাগ্রে ছিলেন একজন শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ব্যক্তি এবং মানবজাতির প্রতি তাঁর করুণা ছিল এক উচ্চতর পর্যায়ের ঃ এর ভিত্তি ছিল সকল নর-নারীর সঙ্গে প্রকৃত আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা। তিনি সব জীবের অন্তরে যে আত্মা বিরাজিত আছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করতেন এবং তাঁর কাছে মানুষের সেবাই ছিল ঈশ্বরের পূজা। আর তাই হলো শ্রেষ্ঠ পূজা। ঐ মহান স্বামী তাঁর চল্লিশতম জন্মদিন দেখে যান নি। তাঁর জীবন ও বাণী সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য রূপায়ণের উপযোগী এক বিরাট শক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক মহান শিষ্য হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ (১৮৬৩-১৯২২); প্রভু তাঁকে তাঁর আধ্যাত্মিক মানসপুত্ররূপে দেখতেন। ছয় বছর প্রভুর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে থাকার পর, স্বামী ব্রহ্মানন্দ কয়েক বছর সন্ন্যাসিরূপে অতি কঠোর তপশ্চর্যা ও আধ্যাত্মিক সাধনা করে উত্তর ভারতের নানা স্থানে কাটিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ *জ্ঞান, ভক্তি* ও *কর্মের* মধ্যে সাম্যভাব বজায় রেখে চলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় উচ্চতর অধ্যাত্ম চেতনায় মগ্ন থাকতেন, কিন্তু সহজ অবস্থায় নেমে এলে প্রত্যেকটি কাজই নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন করতেন। তাঁর এক মহৎ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল এবং তিনি অন্যের মনে কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে তা দেখতে পেতেন। তিনি আনন্দের উৎস ছিলেন। তাঁর নির্দেশনায় মিশনের যথেষ্ট বিস্তার হয় ও বহু সংখ্যক শিক্ষিত অধ্যাত্ম-অনুসন্ধিৎসু যুবক মঠে যোগ দেয়। তিনি জনসভায় বক্তৃতা প্রায় দিতেন না এবং অন্যদের আনুষ্ঠানিক আধ্যাত্মিক উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারেও খুব সাবধান ছিলেন। কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির এক বিরাট আধার ছিলেন, যা

২৫ পূর্বোল্লিখিত *বাণী ও রচনা*, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১২

তিনি তাঁর শিষ্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে ও অপরের কল্যাণে ব্যবহার করতেন। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সে-ই নিজেকে আশীর্বাদধন্য বলে মনে করেছে।[২৬]

স্বামী প্রেমানন্দ (১৮৬১-১৯১৮) হলেন আর একজন মহান শিষ্য যাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, তাঁর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। যখন মূল রামকৃষ্ণ মঠ কলকাতার কাছে বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তার ব্যবস্থাপক হন। কিন্তু তিনি সাদাসিধে ও কঠোর জীবন যাপন করতেন। তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও মধুর প্রকৃতি অনেকগুলি যুবককে আকর্ষণ করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই পরে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিল। তাঁর ভালবাসা পেয়ে কয়েকটি বিপথগামী যুবকের জীবনও পরিবর্তিত হয়েছিল। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে তিনি পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশের) নানা স্থানে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বাগ্মিতা-শক্তি ও ব্যক্তিত্বের দিব্য পবিত্রতার গুণে ওদেশের লোকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

স্বামী সারদানন্দ (১৮৬৫-১৯২৭) আর একজন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদকরূপে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রভুর তিরোধানের পর তিনি অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করে বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে তাঁকে প্রচার কার্যের জন্য আমেরিকায় পাঠান, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়ে আনেন মিশন পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য; এ দায়িত্ব তিনি লক্ষণীয় দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যা সহধর্মিণী শ্রীসারদা দেবীর সেবা ও তাঁর গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা উপলক্ষ্যে তাঁর কাজ একই রকম মাহাত্ম্যপূর্ণ ছিল। এই সব কর্তব্য কর্মের মধ্যেও স্বামী সময় করে নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের চির প্রসিদ্ধ বাংলা জীবনীগ্রন্থ '*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*' লেখার—ইংরেজী ভাষান্তরে যার নাম হলো, '*Sri Ramakrishna The Great Master*'।* স্বামীর বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর শান্ত, ধীর, সহনশীল প্রকৃতি ও সকলের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় প্রেম। যখনই কোন ভক্ত বা সাধু অসুস্থ হয়েছে, স্বামী অবশ্যই তাকে দেখতে যেতেন ও তার সেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেন। প্রতিষ্ঠানের আদিকালের কঠিন ও সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে সঠিক পথে পরিচালনা করেছিলেন।

স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য সব মহান শিষ্যবৃন্দও জ্ঞানদীপ্ত ও লোককল্যাণে উৎসর্গীকৃত-

---

২৬ Sw. Yatiswarananda, an article entitled '*Swami Brahmananda*'—Vedanta Kesari Oct., 1941; Sw. Prabhavananda—*Eternal Companion, Madras*; Sri Ramakrishna Math, 1971

* ইংরাজী অনুবাদক ঃ স্বামী জগদানন্দ

প্রাণ ছিলেন।'[১১] সর্বদা পরম চৈতন্যের সঙ্গে সমসুরে থেকে এই সব মহান আত্মাগুলি লোককল্যাণসাধনে নিভৃতে সক্রিয়ভাবে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতেন। তাঁরা পবিত্রতা, করুণা ও ভক্তির প্রতিমূর্তি ছিলেন ও তাঁদের সান্নিধ্যে লোকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎক্রান্তি অনুভব করত। তাঁরা নিজেরা বন্ধন মুক্ত থেকে অপর লোকের মুক্তির জন্য প্রয়াসী হতেন। তাঁদের পবিত্র আধ্যাত্মিক স্পন্দন ও প্রার্থনা চিন্তাজগৎকে উর্বর করেছিল। তাঁদের আধ্যাত্মিক স্রোতের সংস্পর্শে যারাই এসে থাকে তারা অবশ্যই চেতনার উচ্চস্তরে উন্নীত হয় ও পবিত্র জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। যাঁরা এইভাবে মানবজাতির উন্নতি সাধন করেছেন, আসুন আমরা তাঁদের প্রণাম জানাই।

# চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

# কালের বালুকারাশিতে পদচিহ্ন

## ভারত ও হিন্দুধর্ম

একজন চিন্তাশীল ইংরেজ, র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'ভারত ও হিন্দুধর্ম দেহ ও আত্মা রূপে পরস্পর সম্পর্কিত।' ভারত হলো দেহ, আর হিন্দুধর্ম অথবা আরো সঙ্গতভাবে *সনাতন ধর্ম* হলো আত্মা। শত শত বছর ধরে বিদেশী কর্তৃক আক্রান্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনতন্ত্রে বিখণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতে বরাবর হিন্দু সংস্কৃতির অখণ্ডতা বজায় রয়েছে, আর দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে তীর্থযাত্রীর যাতায়াত অবাধে চলেছে। হিন্দুর ধর্মীয় সংস্কৃতি কেবল অবিনাশী নয়, গতিশীলও বটে। দীর্ঘ ইতিহাসে এর মধ্যে কয়েকবারই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ বিষয়েও আবার দেহ-আত্মা উপমাটি বেশ প্রযোজ্য। আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরানুভূতিকে জীবনের লক্ষ্যরূপে স্বীকৃতি, কর্মবাদ, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-লয় চক্রের তত্ত্ব প্রভৃতি হিন্দুধর্মের মূল নীতিগুলিই এর আত্মা, আর জীবনে এই নীতির কার্যকর প্রয়োগই হলো এর দেহ। আত্মা অপরিবর্তিত রয়েছে, কিন্তু বাহ্য দেহ কালে কালে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

হিন্দুধর্মে প্রথম বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন আচার্য শঙ্কর। তিনি হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রে অদ্বৈতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরেই এলেন রামানুজাচার্য ও মধ্বাচার্য। এই তিন মহান আচার্য দক্ষিণভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্ম নিয়েছিলেন। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতরূপ হিন্দুধর্মের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যকে তাঁরা পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁরা হিন্দু ধর্মের প্রাচীন তত্ত্বগুলিকে নতুন করে প্রণালীবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করে তাদের এক দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে দেশের মানুষকে—যারা অধিকাংশ ছিলেন উচ্চ বর্ণের—ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে সঙ্ঘবদ্ধ করেন ও তাদের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের ভেতর নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেন।

এই দার্শনিক প্রণালীগুলির অন্তর্গত ভাবসমূহের শক্তি কিরূপে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছল? সাধু সন্তদের মাধ্যমে। ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল থেকে শত শত

সাধু-সন্ত তৈরি হয়েছে, যেমন এখনো হচ্ছে, যাঁরা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ লোকের মধ্যে ঘুরেছেন ও সর্বত্র ধর্ম প্রচার করেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এঁরা আসতেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলো গৃহস্থ, কিন্তু সংসারের আসক্তি থেকে মুক্ত। তাঁরা আচার্যদের মতো সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন না, শিক্ষাও দিতেন না, স্থানীয় কথ্য ভাষাই তাঁদের মাধ্যম ছিল। এই সন্তদের মধ্যে অনেকেই মহান কবি ছিলেন; তাঁদের মন-মাতনো গান আজও বহু দূরবর্তী গ্রামেও গাওয়া হয়ে থাকে। তাঁরা শেখাতেন ঈশ্বর-প্রীতিই পরিত্রাণের প্রধান উপায়। শ্রেষ্ঠ সন্তদের মধ্যে কিছু নারীও ছিলেন।

## দক্ষিণ ভারতের আলোয়ারগণ

বৌদ্ধোত্তর যুগে প্রথমেই যেসব সন্তগোষ্ঠী উদিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তামিল সন্তগোষ্ঠী একটি; এঁরা আলোয়ার নামে পরিচিত। তাঁরা সকলেই বিষ্ণু-উপাসক। বেদে এই দেবতার উল্লেখ রয়েছে। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ অব্দেও *ভাগবত* নামে এক বিষ্ণু-উপাসক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। তাঁরা কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলে পূজা করতেন। কোন কোন প্রাচীন হিন্দু রাজা, বিশেষত গুপ্তবংশীয়েরা এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের পল্লভ রাজারাও ছিলেন ঐরূপ। আলোয়ারগণের জীবনধারা নানা লোক-কাহিনীতে ঘেরা, এঁদের সঠিক কাল-নিরূপণ সম্ভব নয়। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে তাঁরা খ্রীস্টীয় সপ্তম ও নবম শতকের মধ্যে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কথা হলো, তাঁরা সকলেই মহান মরমী সাধক ছিলেন ও নিজ নিজ অনুভূতি তাঁদের কবিতার ছন্দে গ্রথিত করে গেছেন।

মোট বারজন আলোয়ার ছিলেন। প্রথম চারজন সম্ভবত সমসাময়িক। পৈগৈ, ভূত ও পে নামে প্রথম তিনজন সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। একদিন ঝড়ের সময় এই তিনজন পরিব্রাজক সাধু এক ছোট্ট কুটিরে আশ্রয় নেন, যেখানে কোনমতে তাঁদের দাঁড়াবার মাত্র জায়গা হতে পারে। শীঘ্রই তাঁরা তাঁদের মধ্যে চতুর্থ এক ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলেন—যিনি তাঁদের কাছে অবশ্য অদৃশ্য হয়েই রইলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, এই ব্যক্তি স্বয়ং প্রভু ছাড়া অন্য কেউ নন—আর তাঁরা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে নিজ নিজ উপলব্ধির বর্ণনা দিয়ে এক একটি গান গেয়ে উঠলেন। বলা হয়ে থাকে, পৈগৈ আলোয়ারের অভিজ্ঞতা ছিল উচ্চতর স্বজ্ঞা (*পরাজ্ঞান*), ভূত আলোয়ারের উচ্চতর ভক্তি (*পরাভক্তি*), আর পে আলোয়ারের তুরীয়জ্ঞান (*পরম জ্ঞান*)। সাধু-সন্তেরা যখন মিলিত হন, তখন তাঁরা কেবল ঈশ্বরের কথাই বলেন, আর তাঁরই গৌরবগাথা গেয়ে থাকেন। আর সংসারী লোক যখন

একত্রিত হয়, তারা কেবল বিষয়ের কথাই বলে ও তাই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ করে।

আমরা, আধুনিকরা কাব্য বোধ হারাচ্ছি, যে সব উচ্চতম আবেগে আমাদের সাধু-সন্তদের হৃদয় পূর্ণ থাকত, আর তাঁরা তাঁদের ভগবৎ-প্রেম ও আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে উৎসুক থাকতেন, তা বোঝবার ক্ষমতাও আমরা হারিয়ে ফেলছি। এই সব হৃদয়ানুভূতি বাদ দিলে মানুষ কেবলই এক শূন্যে পরিণত হয়। যখন মস্তিষ্ক ও হৃদয় শূন্য হয়ে যায়, তখন আমাদের কি আর অবশিষ্ট থাকে? হৃদয়কে পূর্ণ রাখতে হবে ভগবৎ প্রেমে, আর মস্তিষ্ককে ভগবৎ-ভাবে; এগুলির বিকাশ হবে আমাদের জীবনের পুণ্য কর্মের মাধ্যমে। এইগুলি হলো আধ্যাত্মিকতার মূল বিষয়-বস্তু, যা আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

আলোয়ারগণ পরম চৈতন্যকে প্রিয়তমের থেকেও প্রিয়তর বলে মনে করতেন। তাই আমরা তাঁদের মধ্যে এই রকম ভাবাবেশে পূর্ণ প্রেম লক্ষ্য করে থাকি। শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সব মহান সন্তগণ প্রভুর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন *ভাব* নিয়ে সাধন করতেন। এঁদের মধ্যে নম্মালোয়ার, যাঁর অন্য নাম শতকোপ বা শতারি, শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন, তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভেল্লাল জাতিভুক্ত ছিলেন। তিনি চারটি কাব্য রচনা করেছিলেন, সেগুলিকে প্রায়ই চারখানি তামিল বেদ নামে উল্লেখ করা হয়, তার মধ্যে *তিরুভাইমোলিই* সব থেকে বেশি গুরুত্ব বিশিষ্ট। এই স্তুতিতে তিনি প্রভুকে সর্বানুস্যূত অধ্যাত্ম তত্ত্বরূপে বর্ণনা করেছেন, এতে এও বলা হয়েছে যে, ভক্তদের জন্য তিনি অতি সুন্দর মনুষ্যরূপও ধারণ করেন।

আর একজন মহান কবি সন্ত ছিলেন থিরুমঙ্গাই আলোয়ার; তিনি চৌর্যবৃত্তি-নির্ভর এক (কল্লের) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; সন্ত হবার পূর্বে কয়েক বছর ডাকাতি করে বেড়াতেন। আর এক জন প্রখ্যাত সন্ত ছিলেন থিরুপ্পান আলোয়ার, তিনি অচ্ছুৎ বলে গণ্য এক বংশে জন্মেছিলেন। তিনি প্রভু বিষ্ণুর স্তুতি গাইতেন, ফলে তাঁর যে ভাব হতো তাতে তিনি শরীরবোধ হারিয়ে ফেলতেন। একদিন যখন তিনি কাবেরীর তীরে প্রসিদ্ধ রঙ্গনাথজীর মন্দিরের সামনে এইভাবে বসেছিলেন, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দেবতার স্নানের জন্য পবিত্র জল নিয়ে ঐ পথ দিয়ে আসছিলেন। নীচ জাতির লোকের পাশ দিয়ে গেলে পাছে ঐ জল অশুদ্ধ হয়ে যায় এই ভয়ে পুরোহিত থিরুপ্পানকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে মারলেন। এতে ক্ষত বিক্ষত হওয়ায়, যন্ত্রণায় থিরুপ্পানের চেতন ফিরল, সে তখন পালিয়ে গেল। কিন্তু পুরোহিত যখন মন্দিরে ঢুকতে গেলেন, তখন দেখেন মন্দির-দ্বার রুদ্ধ। এক দৈববাণী তাঁকে তাঁর নির্মম কাজের জন্য ভর্ৎসনা করে ঐ আহত

অচ্ছুৎ ভক্তটিকে পিঠে করে ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দিল। পুরোহিত ছুটলেন ও ঐ ভীত লোকটিকে নিজ কাঁধে করে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে এলেন। প্রবাদ আছে যে, মন্দির-দ্বার তখন খুলল আর ঐ সন্ত পুরুষ প্রভুর প্রতিমার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

আর একজন উল্লেখযোগ্য আলোয়ার ছিলেন কুলশেখর। তিনি দক্ষিণ কেরলের রাজা ছিলেন। ঈশ্বরভক্তিতে অভিভূত হয়ে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বাকি জীবন কেবল প্রভুর ধ্যানে মগ্ন হয়ে শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথজীর মন্দির চত্বরের প্রান্তে দিন কাটাতেন। এতখানি তাঁর বিনয়নম্র ভাব ছিল যে, তিনি মন্দিরের সোপানরাজিতে শুয়ে পড়তেন যাতে ভক্তপদরজ তাঁর শরীরে এসে পড়ে। তিনি তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় গান রচনা করেছিলেন। একটি তামিল গানে তিনি বলেছেন ঃ 'পরিশুদ্ধ শুভ বস্তু থাকতে যারা অশুভ বস্তু পছন্দ করে তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি সেই প্রভুর জন্য পাগল—যিনি গরু চরিয়ে বেড়ান।' এই হলো পরমাত্মার সঙ্গে মিলনে উৎসুক ভক্ত-হৃদয়টি। কুলশেখর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা বলেছেন তাঁর *মুকুন্দমালা* নামে সংস্কৃত রচনায়, যা ভারতের ভক্তিগীতিসমূহের মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয়। তিনি গেয়েছেন ঃ

**নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়েনৈব কামোপভোগে**
**যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্।**
**এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি**
**ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।[১]**

—হে প্রভু আমার আস্থা নেই লোকপ্রসিদ্ধ পুণ্যকর্মে, সম্পদে বা ভোগসুখে। আমার পূর্বজন্মার্জিত অবশ্যম্ভাবী কর্মফল আমার ওপর বর্ষিত হোক। কিন্তু আমার ব্যাকুল প্রার্থনা এই যে, এ জন্মে ও ভবিষ্যৎ জন্মগুলিতেও তোমার পাদপদ্মে আমার যেন নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয়।

**দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো**
**নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।**
**অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ**
**তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥[২]**

—হে প্রভু আমাকে স্বর্গে, মর্তে বা নরকে, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাখ। মরণকালেও আমি তোমার পবিত্র চরণদুটির ধ্যান করব—যার সৌন্দর্য শরৎকালীন পদ্মকোরককে ছাপিয়ে যায়।

প্রকৃত ভক্ত পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি চায় না। তার কাছে সংসারজাল থেকে

১ *মুকুন্দমালা*, ৭ ২ *তদেব*, ৮

অব্যাহতি প্রার্থনাযোগ্য লক্ষ্য নয়। বহুরূপে প্রকটিত ঈশ্বরের ভালবাসা লাভই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এই হলো মহান সন্তদের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা; সকল অধ্যাত্ম সাধকেরই হৃদয়ে ঐ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত।

জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন এমন দু-তিনজন আলোয়ারের মধ্যে পরিয়ালোয়ার বা বিষ্ণুচিত্তই সুবিখ্যাত। দেবতার জন্য মালা গেঁথেই তাঁর দিন কেটে যেত। তাঁর সুপরিচিত থিরুপ্‌পাল্লান্দু নামে গানটি দক্ষিণ ভারতের বড় বড় বৈষ্ণব মন্দিরে প্রতিদিন গাওয়া হয়ে থাকে। ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা অবস্থায় রচিত ঐ অসামান্য স্তুতিটিতে ভক্ত নিজের জন্য কোন আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে ভুলে গিয়ে ভগবানকে আশীর্বাদ করছেন সহস্র বৎসর জীবন লাভের জন্য।

তাঁর কন্যা, আন্দাল (বা গোডা) ভারতের শ্রেষ্ঠ নারী সন্তদের মধ্যে অন্যতমা হিসাবে পূজিতা হন। শৈশব থেকে তাঁর চিন্তার একমাত্র বিষয় ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। একদিন তাঁর পিতার নজরে পড়ল, যে মালা তিনি প্রভুর জন্য গেঁথেছেন সেটি তাঁর কন্যা নিজের গলায় পরে আছেন, তাতে তিনি কন্যাকে ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু তিনি এক দৈববাণী শুনলেন যে, প্রভুর ইচ্ছাতেই মালাগুলি কন্যার গলায় স্থান পেয়েছে। কন্যা নিজেকে প্রভুর বধূরূপে দেখত। এমন কথা প্রচলিত আছে যে, স্থানীয় বিষ্ণুমন্দিরের পুরোহিত প্রভুর আদেশ পেয়েছিলেন, তিনি যেন আন্দালকে পাল্কি করে মন্দিরে নিয়ে আসেন। পরদিন সকালে বধূবেশে সজ্জিত হয়ে পাল্কি চড়ে আন্দাল মন্দিরে আসে—তার সঙ্গে কন্যাযাত্রীর শোভাযাত্রাও এসেছিল। আন্দাল গর্ভমন্দিরে ঢুকতেই প্রভুর সাদর সম্ভাষণ পান ও তাঁর দিব্যদেহে লীন হয়ে যান। পরে আন্দালের জন্মস্থান শ্রীভিল্লিপ্‌পুত্তুরে এক চমৎকার মন্দির গড়ে ওঠে ও এখনো পর্যন্ত ঐ ঘটনাকে স্মরণ করে মন্দিরে উৎসবাদি হয়।

আন্দাল একজন স্বভাব কবি ছিলেন। *থিরুপ্পাবাঈ* নামে গানটি সারা দক্ষিণ ভারতে মার্গশীর্ষ অগ্রহায়ণ মাসে গাওয়া হয়। এই কবিতাটির একটি স্তবকে তিনি বর্ণনা করেছেন—কিভাবে প্রভুর মহিমা কীর্তনে ও তাঁর ধ্যানে সর্বদোষের নাশ হয় ঃ

**এমনি যখন শুদ্ধ হইয়া মোরা আসি সুন্দর ফুলগুলি ছড়াইয়া,**
**মহিমা তাঁর গাহিয়া, মোদের ওষ্ঠে ওষ্ঠে গানের সুর তুলিয়া,**
**আর তাঁহারই ধ্যানে অন্তরে মগন হইয়া—**
**মায়ন, উত্তর-মথুরার শিশু তুমি;**
**বিশাল যমুনার পুণ্য স্রোতের শাসক যিনি;**
**সুদীপ্ত প্রদীপ রাখালের ঘরে জনম লইয়া,**
**দামোদররূপে মাতৃগর্ভ উজল করিয়া;**

বিগত অনাগত সকল দোষ নাশিয়া;
তুলার মতো অগ্নিশিখায় ভস্ম হইয়া।
আহা, এলোরেম্বাভায়!

আন্দাল হলেন ভারতে ভক্তিরসের মুধুর ভাবের এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভক্ত নিজেকে দয়িতারূপে দেখে আর প্রভুকে দয়িতরূপে। শুদ্ধ আত্মার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা হবে—আত্মার আত্মা, প্রভু যেন অনন্তকাল তাঁর কাছে থাকেন। আন্দাল, সর্বক্ষণ আপন দয়িতের চিন্তায় মগ্ন থেকে তাঁর কল্পনাশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। যে মনঃশক্তি সাধারণত নানা অনিত্য বস্তুর কল্পনায় ব্যয়িত হয়, তার সংস্কারের সম্ভাব্য উপায় সম্বন্ধে এ এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। খুবই মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেছেন :

তোমার জন্ম এক নারীর পুত্ররূপে, আর এক রাতে
তা গোপন রেখে, চলে এলে অন্যের শিশুরূপে পালিত হতে,
তুমি বীর মাল (মল্ল), যেন অগ্নি সম,
কংসে হৃদয়ে জাগালে অসহ্য আলোড়ন;
ব্যর্থ হয় তার দুষ্ট উদ্দেশ্যের সাধন:
তোমার দর্শন কামনায় মোদের আগমন।
যদি দাও ঢাক, গাইব গান তব মহিমার,
যা কেবল লক্ষ্মী দেবীরই তুল্য;
তোমার শক্তি গাথাও গাইব।
ঘুচবে মোদের দুঃখ, করব মোরা উৎসব;
অহো, এলোরেম্বাভায়!

মহান বৈষ্ণবাচার্য নাথমুনি আলোয়ারগণের রচিত কবিতা ও স্তোত্রাদির মধ্যে যেগুলি প্রাপ্তিসাধ্য ছিল তা সংগ্রহ করে *নালায়ির প্রবন্ধম্* নামে একটি কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। দক্ষিণ ভারতের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় এই গ্রন্থটিকে এতই পবিত্র জ্ঞান করেন যে এর নাম দিয়েছেন *অনুভব বেদান্ত* বা প্রত্যক্ষ অনুভূত বেদান্ত, এটি বাস্তবিক তাই। নাথমুনির উত্তরাধিকারী ছিলেন যমুনাচার্য, তারপর রামানুজাচার্য, দক্ষিণ ভারতে যাঁরা ভক্তি সাধনার উদ্যোগ পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন, ইনি তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। ১০১৭ খ্রীস্টাব্দে এক পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে রামানুজ প্রথমে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতদর্শনে পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের কাছে হিন্দুশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেন। তাঁর ভক্তিপ্রবণ মন অবশ্য অদ্বৈততত্ত্ব গ্রহণ করতে পারেনি, তবে নিজ ধারণার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটিয়েছিলেন—যাতে তিনি ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি ব্রহ্ম-সূত্র ও ভগবদ্গীতার ওপর ভাষ্য রচনা করেন। বিশিষ্টাদ্বৈত নামে তাঁর রচিত দর্শন শাস্ত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন—

ঈশ্বর, জীব-নিচয় ও বিশ্ব এই তিনে মিলে এক সত্যবস্তু। ঈশ্বর হলেন পরমাত্মা, যিনি সর্বানুস্যূত আবার সর্বাতীত। কল্পে কল্পে তাঁর থেকেই বিশ্বের উদ্ভব আবার তাঁতেই লয় হচ্ছে, আর এক এক কল্পের স্থিতিকাল হলো কয়েক কোটি বছর। সেইভাবে সব জীবও তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অধ্যাত্ম পথে আগে আত্মোপলব্ধি পরে ঈশ্বরোপলব্ধি, যা রামানুজের মতে কেবল ঈশ্বর কৃপাতেই সম্ভব। এইভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় *ভক্তির* ওপরেই তিনি চরম গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ভক্তির প্রাধান্য ও বিষ্ণুপূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া রামানুজ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তুলে তাদের সংস্কৃত ও তামিল দুটি ভাষায় লিখিত শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করতে অনুপ্রেরণা দিতে লাগলেন এবং অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ধর্মপ্রচার করতে চেষ্টিত হলেন। তাঁর উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়, এক শূদ্রকে গুরুরূপে স্বীকার করায় ও বিরাট জন গোষ্ঠীকে পবিত্র *নারায়ণ মন্ত্রে* দীক্ষিত করায়। তাঁর আচার্য গোষ্ঠী-পূর্ণ তাঁকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করার পূর্বে আদেশ দিয়েছিলেন, সে যেন ঐ মন্ত্রের গোপনীয়তা কারো কাছে ভঙ্গ না করে। গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করার শাস্তি হলো নরক বাস। কিন্তু রামানুজ মন্দিরের গোপুরমে (চূড়ায়) উঠে সেখানে উপস্থিত বহু লোককে খোলাখুলি মন্ত্রটি চিৎকার করে বলে শুনিয়ে দিলেন। তাঁর আচার্য যখন তাঁর এই চারিত্রিক ত্রুটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, রামানুজ বলেন, তাঁর নরক গমনে যদি এত লোক উদ্ধার হয়, তবে তিনি নিজ মুক্তির চেয়ে ঐটিই বেছে নেবেন।

রামানুজ নিজমত প্রচার করতে ভারতের দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম আচার্য যিনি ভক্তিকে দর্শনের মর্যাদায় স্থাপন করেছিলেন। যমুনাচার্য আলোয়ার সন্তদের কার্যাবলীকে বেদান্ত পর্যায়ে স্বীকৃতি দিয়ে ভক্তিধর্মের উদ্দেশ্যের অনুকূলে এক বিরাট অবদান রেখে গেছেন এবং তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু রামানুজই সেই সু-উচ্চ দার্শনিক সৌধটি গড়ে তুলেছিলেন, যা পরবর্তী কালে ভারতের সকল ধর্মীয় আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। উত্তর ভারতের *ভক্তি* আন্দোলনেও তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

## দক্ষিণ ভারতের শৈব (নায়নমার) সন্তগণ

এক পরম্পরাগত মত অনুযায়ী, দক্ষিণভারতে শিবোপাসনার প্রচলন হয়েছিল উত্তরভারত থেকে থিরুমূল্লার নামে এক সন্তের মাধ্যমে। এ কথা সত্য হোক আর না হোক, সারা ভারতে শিবোপাসনা বহুকাল ধরে প্রচলিত। দক্ষিণভারতে, এর সঙ্গে তেষট্টি জন নায়নমার সন্তের নাম জড়িত আছে; তামিলনাড়ুর সব বড় বড়

শিব মন্দিরে এঁদের মূর্তি দেখা যায়। বৈষ্ণব আলোয়ারদের মতো শৈব সন্তগণের মধ্যে সব জাতিরই লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রাহ্মণ, রাজা, মৃৎশিল্পী, বৈশ্য, কৃষক, শিকারী, রাখাল ও জেলে। তাঁদের সকলের কার্যকাল নির্ণয় করা কঠিন। এঁদের চারজন বিশিষ্টতমকে মহান আচার্য নামে উল্লেখ করা হয়, তাঁদের সময়কাল সপ্তম ও নবম খ্রীস্টীয় শতাব্দীর মধ্যে। এঁরা হলেন অপ্পর, জ্ঞানসম্বন্ধর, সুন্দরমূর্তি ও মাণিক্কবাচকর। প্রথম তিন জনের স্তোত্রগুলি একত্রে *দেবারাম* নামে পরিচিত, শেষ সন্তের স্তোত্রগুলিকে *থিরুবাচকম্* নাম দেওয়া হয়। দক্ষিণের সব বড় বড় শিবমন্দিরেই এগুলি গাওয়া হয়। এই চার সন্ত ঈশ্বরের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন চার রকমের ভাবপ্রবণতার প্রতিমূর্তি। অপ্পর দাসের পথ (*দাস মার্গ*), জ্ঞান-সম্বন্ধর সৎ-পুত্রের পথ (*সৎ-পুত্র মার্গ*), সুন্দরমূর্তি সখার পথ (*সহ-মার্গ*) এবং মাণিক্কবাচকর প্রকৃত (*সৎ-মার্গ*) বা জ্ঞান পথ অনুসরণ করতেন।

এই সব মহান সন্তদের জীবনে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। অপ্পরের জন্ম ভেল্লাল নামে কিছুটা নিম্ন শ্রেণীতে। অল্প বয়সে তিনি জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন, পরে তাঁর বড় ভগিনীর অনুপ্রেরণায় আবার শৈবমতে পুনর্দীক্ষিত হন। তার পরে তিনি দেশে দেশে শিব মহিমা কীর্তন করে জীবন কাটিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি শিব মন্দির প্রাঙ্গণে আগাছা সাফ করার মতো নানা ছোট ছোট কাজে লেগে থাকতেন। তাঁর কবিতাগুলি তাঁর উচ্চমনের পরিচয় দেয়। এর একটিতে তিনি গেয়েছেন ঃ

> **কাঠে আগুন, আর দুধে ঘি যেমন,**
> **অন্তরে জ্যোতির্ময় পুরুষ লুকিয়ে আছেন তেমন।**
> **প্রেমের মন্থন দণ্ড খাড়া করে আগে,**
> **বুদ্ধিরূপ দড়ি তাতে জড়িয়ে,**
> **থাক ঘোরাতে—কৃপা করবেন ঈশ্বর দর্শন দিয়ে।**

আর একটি স্তুতিতে তিনি বলেছেন ঃ

> **তিনি আমাদের মা-বাপ, ভগিনী-ভ্রাতা,**
> **তিনিই ত্রিজগতের স্রষ্টা;**
> **আমাদের অন্তরে যদি স্মরণ করি তাঁকে**
> **দেবতার মাঝে প্রিয় যিনি, পুষ্পনগরবাসী,**
> **তিনিই হবেন সকলের অদৃশ্য সহকারী।**

'অপ্পর' কথার অর্থ পিতা। এই নাম তিনি পেয়েছিলেন অপর সন্ত জ্ঞানসম্বন্ধর তাঁকে ঐ নামে সম্বোধন করেছিলেন বলে। এই কনিষ্ঠতর সন্তটির জন্ম ব্রাহ্মণ বংশে। কথিত আছে যে, যখন জ্ঞানসম্বন্ধর ছোট শিশু, দেবী পার্বতী স্বয়ং ধরায় অবতীর্ণ হয়ে মায়ের মতো তাঁকে খাওয়াতেন। তারপর তিনি ফুটে উঠলেন

বিস্ময়কর এক বালক রূপে, মহান সন্তরূপে। মাত্র ষোলবছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তৃতীয় মহান সন্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত সুন্দরমূর্তি। কথিত আছে, যখন তাঁর বিবাহের দিন স্থির হয়েছে, তখন এক বৃদ্ধের বেশে ভগবান শিব নিজে উপস্থিত হয়ে দাবি করেন যে সুন্দরমূর্তি তাঁর ক্রীতদাস। পরবর্তী কালে তিনি সারা দাক্ষিণাত্যে শিবস্তুতি কীর্তন করে বেড়াতেন। তিনিও যৌবনে দেহত্যাগ করেন।

চতুর্থ মহান সন্ত মাণিক্কবাচকরও ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন এবং যৌবনেই পাণ্ড্য রাজার প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এক সময় তাঁকে অশ্বক্রয়ের ভার দেওয়া হয়। পথে তিনি তাঁর গুরুরূপে শিবের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁর আদেশে অশ্বক্রয়ের টাকায় এক শিব মন্দির গড়ে তুললেন। মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব ভুলে তিনি সেখানে শিব-সেবায় দিন কাটাতে লাগলেন। *থিরুবাচকম্* নামে তাঁর স্তুতি গ্রন্থখানি দক্ষিণ ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থগুলির অন্যতম ও উচ্চমানের সাহিত্য বলে বিবেচিত হয়। এক তামিল প্রবাদ বাক্যে বলা হয়—এই সন্তের স্তুতিগুলি শুনে যদি কারো হৃদয় বিগলিত না হয়, তবে আর কোন কিছুতেই সে লোকের হৃদয় বিগলিত হবে না। তিনি এক আপসহীন একেশ্বরবাদ প্রচার করতেন এবং ভক্তিকেই ঈশ্বর প্রাপ্তির একমাত্র উপায়রূপে নির্দেশ করতেন। কিন্তু তাঁর ঈশ্বরভক্তি ছিল জ্ঞানমিশ্রিত। থিরুবাচকমে তিনি বলেছেন ঃ

> **তুমি সৃষ্ট দেশ কালের অতীত, আদি-অন্তহীন।**
> **তবু জগৎরাজি সৃষ্টি করে চল, বিধান কর তাদের স্থিতি, লয় আর পুনরভ্যুদয়।**
> **তোমার করুণায় বহু জন্মের মধ্য দিয়ে,**
> **আমাকে প্রেরিত কর নিবেদিত সেবার প্রতি।**
> **তুমি অতীন্দ্রিয় সুগন্ধির মতো, দূরে অথচ কাছে,**
> **হে, দুর্জ্ঞেয় রহস্য, বাক্য মনের অগোচর।**
> **ননী মেশে না মিষ্ট আখের রসে**
> **কিন্তু তারা মিশে থাকে সদ্য দোয়া খাঁটি দুধে,**
> **তোমার বিশুদ্ধ আনন্দ অনুস্যূত হয় ভক্ত হৃদয়ে।**
> **তুমি আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু।**
> **যিনি একেবারে ভেঙ্গে দেন একটানা পুনর্জন্মের ধারা।**

ঐ বিশাল গ্রন্থটি ভরে আছে সৃষ্টি-রহস্য, ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ও জীবাত্মার ঈশ্বরানুভূতি বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিতে। কিন্তু সব কিছুই তীব্র অনুরাগের সঙ্গে মিশে আছে। সমগ্র গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় এই রকম ছত্র ঃ

মালা নিয়ে এস, ওহো! শীঘ্র এস
বাঁধ তাঁর চরণযুগল;
জড়িয়ে দাও, জড় কর, অনুসরণ কর, ছেড় না।
তাঁকে জোর করে ধর, তিনি এড়িয়ে গেলেও।
ঐ অতুলনীয় সত্ত্ব ভেরীনাদে জানান তাঁর আগমন
তাঁর আপন করেছেন আমাকে—সাধুবেশে এসে দর্শন দিয়েছেন আমায়।

থিরুবাচকম্ গ্রন্থটিতে আরো পাওয়া যায়—পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের পূর্বে জীবাত্মাকে কত বিভিন্ন পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তার বর্ণনা। কথিত আছে, ঐ মহান-সন্ত দেহত্যাগ করেন বত্রিশ বছর বয়সে।

অবশিষ্ট সন্তদের মধ্যে শিকারী কণ্‌ণপ্‌পর ও অচ্ছুৎ নন্দনারের নাম প্রসিদ্ধ। তিন জন নারী সন্তও ছিলেন, তাঁদের মধ্যে খুব বেশি উল্লেখ্য হলেন কারইক্‌কাল আম্‌মইয়ার। যৌবনে তিনি অতি সুন্দরী ছিলেন ও এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন, যুবক স্বামীটি অচিরেই বুঝতে পারেন যে, তাঁর স্ত্রী অসাধারণ পবিত্রতা ও ভক্তিসম্পন্না এক সন্ত। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংসার জীবন যাপন করতে চাইলেন না। তিনি গোপনে ঐ স্থান ত্যাগ করে, দূর দেশে বসবাস করতে থাকেন ও অন্য এক নারীকে বিবাহ করেন। কারইক্‌কাল আম্‌মইয়ার এ কথা জানতে পেরে স্বামীর কাছে যান। কিন্তু স্বামী ও তাঁর নববধূ দুজনেই তাঁর চরণে নিপতিত হন ও তাঁর আত্মীয়গণকে বলেন যে, তাঁরা যেন তাঁকে এক দিব্য দেহী বলে মনে করেন। ঐ সাধ্বী রমণী যখন জানলেন যে, তাঁর বিবাহিত জীবন শেষ হয়েছে, তিনি ভগবান শিবের কাছে তাঁর দিব্য সৌন্দর্য ফিরিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করেন। তখনই তিনি এক অতি কুরূপা বৃদ্ধা নারীতে পরিণত হন। মেয়েরা এই ত্যাগের মহত্ত্ব অন্যদের চেয়ে বেশি উপলব্ধি করবেন। তাঁর পরবর্তী জীবন কেটেছিল থিরুভালঙ্গাদু নামে এক স্থানে, সম্পূর্ণ দেহ-চেতনা মুক্ত অবস্থায়, সর্বদা ভগবান শিবের মহান তাণ্ডব নৃত্য দেখতে দেখতে। কথিত আছে যে, প্রভু নিজে তাঁকে 'মাতৃ' সম্বোধন করেছিলেন। চরম উদ্দেশ্য লাভে তাঁর সফলতা সম্বন্ধে তাঁর কবিতার মাধ্যমে তিনি এরূপ বলেছেন :

আমরা মৃত্যু জয় করেছি, নরক পরিহার করেছি।
আমরা ভাল-মন্দ কর্মের বন্ধন উৎপাটন করেছি,
—এ সবই সম্ভব হয়েছে নিজ নয়নাগ্নিতে
ত্রিপুরাসুর-দুর্গ-ভস্মকারী প্রভুর পবিত্র
শ্রীচরণে নিজেদের সমর্পণ করে দেওয়ার ফলে।

তেষট্টিজন বিধিবদ্ধ প্রাচীন সন্ত ছাড়া পরবর্তী কালে আরো সন্ত এসেছেন।

তাদের মধ্যে একজন হলেন পট্টিনত্তার, তাঁর কাল দশম শতাব্দীর পূর্বে। তিনি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, সমুদ্র পথে নির্বাহ হতো তাঁর বিশাল বাণিজ্য। একদিন তিনি জানলেন, তাঁর মূল্যবান পণ্য ভর্তি জাহাজগুলির একটি ঝড়ের মুখে পড়েও নিরাপদে বন্দরে ফিরে এসেছে। খুব আনন্দিত হয়ে তিনি বন্দরে গেলেন। তিনি বেরিয়ে গেলে এক সন্ন্যাসী সাধু ভিক্ষার জন্য বাড়িতে আসেন। গৃহকর্ত্রী তাঁকে স্বামীর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। তিনি তা করতে চাইলেন না, তার বদলে একটি ছোট মোড়ক রেখে চলে গেলেন। পট্টিনত্তার ফিরলে, তাঁর স্ত্রী সেই মোড়কটি দেন। সেটি খুলে দেখা গেল তার মধ্যে একটি ছিদ্রবিহীন ভাঙ্গা সূচ মাত্র রয়েছে। হঠাৎ তাঁর মনে এর প্রকৃত অর্থটি জেগে উঠল, তা হলো—তাঁর মৃত্যুর পর ছিদ্রবিহীন সূচের মতো এক অকেজো জিনিসও তাঁর সঙ্গে যাবে না। তখনই তিনি তাঁর সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন ও তারপর থেকে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে থাকলেন। অন্য একজন তাঁর শিষ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন, ইনি পূর্বে একজন রাজা ছিলেন; এঁরা দুজনে কয়েক বছর ধরে গান গেয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

শিশুর মতো স্বভাব লাভ করে তিনি রাখাল ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন। একদিন ঐ ছেলেরা এক গর্ত খুঁড়ে, তার মধ্যে তাঁকে দাঁড় করিয়ে তাঁর গলা পর্যন্ত গর্ত-খোঁড়া মাটি দিয়ে চাপা দিল—সবই কৌতুকের বশে। কিন্তু হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল, আর ছেলেরা পালিয়ে গিয়ে বৃদ্ধ লোকটির কথা একেবারে ভুলে গেল। সারা রাত ঠাণ্ডা বাতাস লেগে আর বৃষ্টিতে ভিজে, ঐ সন্তের মৃত্যু ঘটল। পট্টিনত্তার যেসব কবিতা রেখে গেছেন তাতে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের অনিত্যতার, জীবনের বিলুপ্তি ও ঈশ্বরমুখী জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে। তাঁর মর্মস্পর্শী নীতি-কথাগুলি সারা তামিলনাড়ুতে প্রবাদবাক্য হয়ে আছে।

শৈব সন্তদের ধারা আজও পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রয়েছে। আমাদের এই গরিব দেশে এই সুযোগটুকুই আমরা ভোগ করে থাকি, পার্থিব সম্পদে আমরা দরিদ্র হলেও আমরা আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে ধনী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে থায়ুমানওয়ার নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন, তিনি দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ ও অবশ্যই সর্বাধিক জনপ্রিয় শৈব সন্ত ছিলেন। যুবা বয়সে তিনি রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক হন এবং তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় ভক্তি ও দর্শন-বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তিনি এক মৌনী ঋষির সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। কথিত আছে যে, এক বিধবা রানী রাজত্বসমেত নিজেকে ঐ যুবার কাছে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুবকটি রানীর প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে স্থান ত্যাগ

করেন; তিনি অন্য স্থানে এসে এক ভক্তিমতী কন্যাকে বিবাহ করে ধর্মজীবন যাপন করেন। তাঁর একমাত্র সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলো, সেই মৌনী ঋষি অকস্মাৎ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাঁর সংসার ত্যাগ করার সময় হয়েছে। থায়ুমানওয়ার বাকি জীবন চারণ কবির মতো স্বরচিত উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ কবিতাগুলি গান করতে করতে নানা স্থানে ভ্রমণ করতেন; কবিতাগুলিতে তিনি বেদান্ত ও শৈব সিদ্ধান্তের অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতীয় শৈব সন্তদের দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন।

থায়ুমানওয়ারের মতে ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি হলো তিনটি মৌলিক বিভাগ। সূর্য যেমন জীব-জগতে তেজ সঞ্চার করে, তেমনি ঈশ্বর সকল জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে পালন করেন ও তাতে প্রাণ সঞ্চার করেন। 'পরমানন্দের উল্লাস' (আনন্দক্কলিপ্পু) নামে তাঁর একটি গ্রন্থে তিনি শেষ উপলব্ধির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন ও দেখিয়েছেন কিভাবে অনুভূতির শেষ পর্যায়ে ভক্তি ও জ্ঞান একীভূত হয়ে যায়। থায়ুমানওয়ার একজন মহান কবি ও অতি উচ্চ পর্যায়ের মরমী সাধক ছিলেন।

শৈব সন্তদের উপদেশাবলী খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মেকণ্ডার নামে এক ঋষি কর্তৃক বারটি সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। *শিবজ্ঞান বোধম্* নামে তাঁর একটি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছিলেন তাঁরই শিষ্য অরুলনন্দি। এই দর্শনটির সঙ্গে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতের নানা দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে।

এতক্ষণ আমরা তামিলনাড়ুর মহান সন্তদের কথাই বলেছি। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থানেও বহু সন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। আমি কেবল কর্ণাটকের দুজন সন্তের নামই উল্লেখ করব। একজন হলেন বৈষ্ণব সন্ত পুরন্দরদাস যাঁকে সকলে কর্ণাটক তথা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির জনক বলে স্বীকার করে। প্রথমে তিনি ধনী ছিলেন ও কৃপণ স্বভাবের জন্য সুপরিচিতও ছিলেন, পরে সমস্ত ধন সম্পত্তি বিলিয়ে দেন ও মহারাষ্ট্রের পণ্ডারপুরের প্রসিদ্ধ দেবতা বিঠ্‌ঠলজীর এক বিনম্র ভক্তরূপে জীবন কাটান। সারা দাক্ষিণাত্যে শোনা যায় তাঁর আনন্দদায়ী গানগুলি এবং ঐ পর্যায়ে হাজার হাজার সঙ্গীতের কথা জানা যায়।

আর এক সন্ত হলেন, বসবেশ্বর, তিনি ছিলেন মহান শিবভক্ত এবং দ্বাদশ শতাব্দীর এক বিরাট সংস্কারক। কথিত আছে, এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম ও তিনি রাজার মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর *বচনগুলিতে* (ভাবসমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত কবিতাতে) ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল মানবের সাম্যভাবের কথা, পবিত্রতা ও শিবভক্তির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। তাঁকে বীরশৈব দর্শন ও সম্প্রদায়ের স্রষ্টা বলে গণ্য করা হয়, যার সূচনা হয় জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে এক আন্দোলনরূপে। এই মতবাদে

সারা মহাবিশ্বকে শিবের ক্রীড়া (খেলা)রূপে দেখা হয়। এই সম্প্রদায়ে অক্‌ক মহাদেবী নামে এক মহীয়সী নারী সন্ত ছিলেন। রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংসার ত্যাগ করে শ্রীশৈল পর্বত শিখরে বনবাসে জীবন যাপন করেন। তাঁর কবিতাগুলি সারা কর্ণাটক জুড়ে সুপ্রসিদ্ধ ও সেগুলির মাধ্যমে শিব, যাঁকে তিনি চেন্না মল্লিকার্জুন বলতেন, তাঁর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা প্রকাশ পায়। অধ্যাত্ম জীবনে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জীবে তিনি সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অবস্থান অনুভব করতেন। তাঁর একটি কবিতায় তিনি বলেন ঃ

তুমি সারা বনভূমি,  
তুমি বনের গৌরব বিটপি-নিচয়,  
তুমিই বৃক্ষমাঝে সঞ্চরণ-রত পশু পক্ষী সব,  
হে সর্বানুস্যূত চেন্না মল্লিকার্জুন তোমার মুখটি আমায় দেখাও।[৩]

শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে তিনি বলতেন ঃ

আমি বলি না, ইনি লিঙ্গ  
আমি বলি না, ইনি লিঙ্গের সঙ্গে একীভূত  
আমি একে মিলন বলি না  
আমি বলি না, এ হলো সমন্বয়,  
আমি বলি না, এ ঘটে ছিল,  
ঘটেনি তাও বলি না,  
এ যে তুমি, এমন কথা আমি বলি না,  
এ যে আমি, তেমন কথাও বলি না,  
চেন্না মল্লিকার্জুনে লিঙ্গের সঙ্গে একীভূত হয়ে,  
আমি কিছুই বলি না।[৪]

## মহারাষ্ট্রের সন্তগণ

মহারাষ্ট্রের সন্তগণ দুটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত ঃ *বারকরী* বা বিনম্র ভক্তগোষ্ঠী, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ ও তুকারামের মতো মহান সন্তগণ, আর আছেন *ধারকরী* বা বীর ভক্তগোষ্ঠী, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সমর্থ রামদাস ও তাঁর অনুগামীরা। প্রথম গোষ্ঠী মহারাষ্ট্রের পন্ধারপুরের প্রধান দেবতা বিঠ্‌ঠলজীর পূজার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সন্তদের মধ্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ হলেন জ্ঞানেশ্বর (বা জ্ঞানদেব); এঁর সময়কাল হলো খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী। তিনি ও তাঁর ভ্রাতা নিবৃত্তিনাথ নাথ যোগীদের পদ্ধতিতে শিক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনাদিতে

---

৩ *Women Saints of East and West* (Ramakrishna Vedanta Centre of London, 1955), p. 39

৪ *তদেব*, পৃঃ ৪০

জ্ঞানেশ্বর নাথ-ঐতিহ্যের সঙ্গে বেদান্তের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন—সেই ধারাই মহারাষ্ট্রে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

জ্ঞানেশ্বর, তাঁর পিতামাতার, বিঠ্‌ঠলপন্থ ও রখুমাবাঈ-এর দ্বিতীয় পুত্র। বিবাহের পরই তাঁর পিতা সংসার ত্যাগ করে উত্তরভারতের ভক্তি-আন্দোলনের উৎসস্বরূপ মহর্ষি রামানন্দের কাছে সন্ন্যাস প্রার্থী হন। বিঠ্‌ঠলপন্থ যে গৃহী, সে কথা না জেনে রামানন্দ তাঁকে সন্ন্যাস-আশ্রমে গ্রহণ করেছিলেন। সত্যকথা জানতে পেরে, তিনি শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যেতে আদেশ দেন। বিঠ্‌ঠলপন্থ গুরুর আদেশ মান্য করেন ও কালে তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। কিন্তু সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গ করা মহাপাপ বিবেচনা করে, স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ঐ পরিবারটিকে জাতিচ্যুত করে। কথিত আছে যে, বিঠ্‌ঠলপন্থ ও তাঁর স্ত্রী আত্মঘাতী হন, ফলে তাঁদের সন্তানগুলি, নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানদেব, সোপান ও মুক্তাবাঈ অনাথ হয়ে পড়ে। কিন্তু সন্তানগুলির পবিত্র জীবনযাপন ঐ ব্রাহ্মণদের এত প্রভাবিত করে যে, তাঁরা সন্তানদের স্বজাতিতে ফিরিয়ে নেন।

ঐতিহ্য অনুসারে জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিবৃত্তিনাথ গহিণীনাথের (মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিষ্যের) মন্ত্রশিষ্য; তিনি আবার ভ্রাতা জ্ঞানদেবকে দীক্ষা দেন। এইভাবে তাঁদের মাধ্যমে নাথ-সম্প্রদায়ের মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটে মহারাষ্ট্রীয় মরমী সাধনায়। ভ্রাতাগণ ও ভগিনী ঈশ্বরের নামগুণগান করতে করতে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জ্ঞানদেব মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই তিনি মারাঠী ভাষায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মরমী সাহিত্যের অন্যতম *জ্ঞানেশ্বরী* নামে একটি গ্রন্থ, *অমৃতানুভব* ও বহু *অভাঙ্গ* (গীতিকাব্য) রচনা করে গেছেন। যদিও মনে করা হয় যে জ্ঞানেশ্বরী গীতার একটি ভাষ্য, প্রকৃতপক্ষে এতে তাঁর নিজ সমন্বয় দর্শন ও ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অনুভূতিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ যেন কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই চার ধর্মপথের সঙ্গমস্থল। জ্ঞানদেব চরম অদ্বৈত মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে ঈশ্বর সর্বানুস্যূত, আবার সর্বাতীত। তিনি সমুদ্র ও তরঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ঈশ্বর যেন সমুদ্র আর জীবাত্মাসমূহ ও বিশ্বজগৎ যেন তরঙ্গ ও বুদ্বুদ! তাঁর সমস্ত রচনা এই ধরনের দৃষ্টান্তে ও কাব্য মাধুর্যে ও প্রকাশ শৈলীর সৌন্দর্যে পূর্ণ। সমস্ত দ্বৈতাতীত উচ্চতম সত্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'এ যেন সেই সৌন্দর্য, যা এখনো কোন রূপ ধারণ করেনি অথবা, সেই পুণ্য, যা এখনো কোন ধর্মকর্ম সম্পন্ন করেনি। ইনি সকল সামান্য-ভাবের অতীত। এঁর ক্ষেত্রে মৌনভাবই শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা।' জ্ঞানদেবের ভগিনী মুক্তাবাঈও বহু *অভাঙ্গ* রচনা করে গেছেন, আধ্যাত্মিকতা ও কবিত্বের দিক থেকে যা অমূল্য সম্পদ।

একই ঐতিহ্যের ধারায় পরবর্তী সন্ত হলেন নামদেব। তিনি জ্ঞানেশ্বরের সমসাময়িক। বস্তুত সে সময়ে মহারাষ্ট্রে অনেকগুলি মহান সন্ত জন্মেছিলেন, যাঁরা

সকলেই প্রভু বিঠ্ঠলজীর ভক্ত। এঁরা সবাই মিলে এক সুখী দল গড়ে তুলেছিলেন ও প্রায়ই পথে পথে শোভাযাত্রা করে গান গেয়ে বেড়াতেন। নামদেব এক দর্জি পরিবারে জন্মেছিলেন। কথিত আছে, যৌবনের গোড়ায় তিনি ডাকাতি করতেন ও এক সময়ে কিছু সৈন্যকে বধও করেছিলেন। পরে এক মৃত সৈনিকের শোকার্ত স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে দেখে তিনি অন্তরে অনুতপ্ত হয়ে হঠাৎ পরিবর্তিত হলেন। তিনি অধিকাংশ সময় বিঠ্ঠলজীর মন্দিরে প্রভুর স্তুতি-গান করে কাটাতেন। কিন্তু দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতিতে তাঁর একটু গর্ব হয়। তখন একদিন জ্ঞানদেব তাঁর ভাইদের ও ভগিনী মুক্তাবাঈকে নিয়ে মন্দিরে আসেন। ছোট্ট বালিকাটি লক্ষ্য করে যে, নামদেবের মধ্যে অহঙ্কারের বীজ রয়েছে, আর মৃৎশিল্পী গোরা নামে পরিচিত অন্য এক সন্তকে উপস্থিত সকল সাধুকে পরীক্ষা করতে বলে। গোরা একটি লাঠি নিয়ে একে একে প্রত্যেকের মাথায় টোকা মারতে থাকেন। নামদেবের কাছে এসে তিনি বললেন এই 'পাত্রটি'—এই দলের মধ্যে কেবল এই একটিই—এখনো পুরো পোড়েনি। অপদস্থ নামদেবকে জ্ঞানদেব—শিষ্য বিসোবা খেচরের কাছে যেতে বলা হয়। বিসোবার কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভের পর তাঁকে কঠোর আধ্যাত্মিক তপশ্চর্যায় কাটাতে হয়। ঈশ্বরানুভূতি না হওয়ার অনুতাপ তাঁর কয়েকটি *আভাঙ্গে* (গাথায়) ব্যক্ত হয়েছিল। নামদেব এক জায়গায় বলেছেন, 'মৌমাছির হৃদয় ফুলের সুবাসে যেমন আকৃষ্ট হতে পারে, মাছি মধুতে যেমন আশ্রয় নিতে পারে, তেমনি আমার মনও যেন ঈশ্বরে অনুরক্ত থাকে।' আর একটি আভাঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

আমি পরিচিত নিরীশ্বর বলে, নহি নাকি ঈশ্বর-বিশ্বাসী
আর লোকে বলে তুমি হলে স্বয়ং ঈশ্বর।
আমি হনু পতিত, অধঃপতিত—আর
তুমি, তুমি কর সেই পতিতের উদ্ধার।
তাই, বলে নামদেব, শোন যদি নাহি মোর কথা,
হে ঈশ্বর, হবে না কি তা তব লজ্জার বারতা?

অন্য মারাঠী সন্তদের মতো নামদেব ভগবানের নাম জপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন ঃ 'ভগবান লুকিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি তাঁর নামকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না। আমরা যখন একবার তাঁর নাম উচ্চারণ করেছি, তিনি আমাদের ছেড়ে পালাতে পারেন না।' গভীর ভক্তি আর নিরন্তর নাম জপের ফলে নামদেব উচ্চতম আধ্যাত্মিক চেতনা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। যদিও তিনি, তাঁর ইষ্টদেব, বিঠ্ঠলজীর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন, তবু তিনি সকল সৃষ্ট বস্তুতে তাঁর ব্যাপ্তি অনুভব করতেন। একটি প্রচলিত আখ্যানে আছে যে একদিন একটা কুকুর একখণ্ড শুকনো রুটি নিয়ে পালাচ্ছিল, আর নামদেব ঘৃতপাত্র হাতে নিয়ে তার পেছনে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছিলেন, 'হে প্রভু, একটু অপেক্ষা কর, রুটিতে ঘি মাখাতে দাও।'

জনাবাঈ নামে নামদেবের এক পরিচারিকা ছিল। সে তাঁর শিষ্যা ছিল ও খুব ভক্তির সঙ্গে তাঁর সেবা করত। সেও এক কবি ছিল, সামান্য কবি নয়, তাঁর সরল *আভাঙ্গগুলি* মহারাষ্ট্রে এখনো লোকপ্রিয়। জনাবাঈ খুব ভোরে উঠে তার কুঁড়ে ঘরে বসে শস্য পিষত আর সর্বক্ষণ ভগবানের স্তুতি গাইত। একদিন নামদেবের মাতা শুনতে পেলেন, সে যেন অন্য কারো সঙ্গে কথা বলছে, উঁকি দিয়ে আর একটি মেয়েকে দেখেন। জিজ্ঞাসা করায় জনাবাঈ বলে, সে বিঠ্ঠলবাঈ—নারীর ছদ্মবেশে প্রভু বিঠ্ঠল! যদি ঈশ্বর পুরুষের রূপ ধারণ করতে পারেন, তবে তিনি নারীরূপও ধারণ করবেন না কেন? একটি *আভাঙ্গে* জনাবাঈ অনাসক্তির কলে কর্মকে পেষাই করার কথা বলেছেন আর সেই কলের হাতল হলো বিশ্বাস। কেমন সঙ্গতই না হয়েছে কল্পনাটি! মহারাষ্ট্রে নারী সন্তদের মধ্যে তাঁর স্থান মুক্তাবাঈ-এর পরেই।

ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে আর এক শ্রেণীর মহান সন্তদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রসিদ্ধ ছিলেন একনাথ। পৈঠানে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম, একনাথ শৈশব থেকেই গভীরভাবে ঈশ্বরানুরক্ত ছিলেন। বার বছর বয়সে তিনি তাঁর গুরু, সুপ্রসিদ্ধ জনার্দন স্বামীর দেখা পান ও তাঁর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করেন। তিনি গুরুর সেবা ও তাঁর কাছে অধ্যয়ন করতে থাকেন। বয়স বাড়লে এক ধার্মিক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। তিনি আদর্শ গৃহস্থের জীবন যাপন করতে থাকেন। জীবনের কর্তব্যকর্মগুলি কখনই তাঁর ভক্ত জীবনের বাধা-স্বরূপ হয়নি। ধ্যান, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, ভজন এবং ধার্মিক ও অভাবী লোকের সেবায় তাঁর সময় কাটত। তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি আখ্যায়িকা তাঁর অহিংসা ও সহিষ্ণুতার মনোভাব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। একবার যখন তিনি নদীতে স্নান সেরে ফিরছিলেন, এক মুসলমান তাঁর শরীরে থুতু ফেলে। একনাথ শান্তভাবে ফিরে গিয়ে আবার স্নান করেন। ঐ মুসলমানটি আবার তাঁর শরীরে থুতু ফেলে, আর একনাথ একটিও ক্রোধসূচক কথা না বলে আবার গিয়ে স্নান করে আসেন। এইভাবে থুতু ফেলা ও স্নান ১০৮বার চলেছিল, শেষে ঐ ইতর লোকটি অনুতপ্ত হয়ে সন্তের পায়ে পড়ে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করল।

একনাথই *জ্ঞানেশ্বরীর* একটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁর নিজ রচনার মধ্যে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ভাষ্যখানি ও *রুক্মিণীর বিবাহ* নামে কাব্যটি প্রসিদ্ধ কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা প্রধানত আভাঙ্গের (গীতি কাব্যের) জন্য, এতে তাঁর গভীর ঈশ্বরভক্তি ও নীতিজ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে, যথা: 'তীর্থযাত্রী যেমন সন্ধ্যায় পান্থশালায় এসে পরদিন প্রভাতে তা ছেড়ে চলে যায়, সেই ভাবেই যেন আমরা সংসারে থাকি। শিশুরা যেমন খেলাচ্ছলে বাড়ি তৈরি করে, আবার তা ছুড়ে ফেলে দেয়, জীবন নিয়ে আমরা যেন তেমনি ভাবেই খেলি।' অধ্যাত্ম সাধনার কথায় তিনি

বলতেন, 'ভক্তি হলো মূল, অনাসক্তি যেন ফুল, আর জ্ঞান তার ফল।' অন্য আভাঙ্গে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি সকলের কথা বলেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'মরমিয়া অনুভূতির প্রত্যুষে আমি দেখেছিলাম সারা বিশ্ব যেন আলোয় আলোয় সজ্জিত রয়েছে।' আর একটি জনপ্রিয় গানে তিনি বলেছেন যে, অন্তরে বাহিরে, নিদ্রায় জাগরণে, যে দিকেই তাকান তিনি দেখেন কেবল তাঁর রামরূপ। অন্য কিছু কিছু আভাঙ্গে তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে একরূপতা লাভের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একনাথ বেদান্তের মহত্তম উপদেশগুলিকে মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে তুকারাম নামে আর একজন মহান সন্তের আবির্ভাব হয়েছিল; তিনি মহারাষ্ট্রীয় সন্তদের মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয় ছিলেন। *হরিকথা* নামে সুর সংযোগে যে কথকতা পরিবেশন করা হতো, তাতে তাঁর জীবন-কাহিনীটি ছিল একটি প্রিয় বিষয়, হয়তো স্ত্রীর খুঁতখুঁতে স্বভাবের দরুন সংসারে অনেক অপ্রিয় দৃশ্যের অবতারণা হতো, সেই কারণে এই ধার্মিক গৃহস্থের জীবনকে একটি নাটকীয় রূপ দেবার সুযোগ হয়েছিল। পুণে শহর থেকে আঠার মাইল দূরে ডেহু নামে এক গ্রামে এক ধার্মিক কৃষক পরিবারে ১৬০৮ খ্রীঃ তিনি জন্মেছিলেন। যখন তাঁর যুবা বয়স, দেশের ঐ অঞ্চল ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। তুকারাম হারালেন তাঁর গরু-বাছুর, জমি, দুটির মধ্যে এক স্ত্রীকে ও এক পুত্রসন্তানকেও। তাঁর জীবিত স্ত্রীর ঝগড়াটে ও খুঁতখুঁতে মেজাজ তাঁর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই সব অপ্রিয় অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর মন ঈশ্বরমুখী হয়। তিনি জ্ঞানেশ্বর, নামদেব ও একনাথের রচনাবলী অধ্যয়ন করতে ও অবসর সময়ে নির্জনে ধ্যানে কাটাতে থাকেন। তিনি স্বপ্নে বাবাজী নামে এক সন্তের কাছে দীক্ষা লাভ করেন—এঁকে তাঁর একটি *আভাঙ্গে তিনি* সংসার সাগর পারকারী *পাণ্ডুরঙ্গের জাহাজ* বলে উল্লেখ করেছেন।

কিছুদিন নির্জনে *সাধনা* করার পর তুকারাম একজন কবি ও প্রচারক হয়ে উঠলেন। এতে ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা ঈর্যান্বিত হয়ে তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগল। কিন্তু গভীর তাঁর ঈশ্বরানুরাগ ও নির্দোষ জীবন শেষ পর্যন্ত তাদের স্বপক্ষে আনতে পেরেছিল। তাঁর *আভাঙ্গগুলি* থেকে প্রকাশ পায় পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভ করতে তাঁকে কত কঠোর আন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেগুলির মাধ্যমে প্রকাশ পায়, ঈশ্বর লাভের জন্য তাঁর কত তীব্র ব্যাকুলতা ছিল।

এটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, অনুরাগী সাধকের জীবন সব সময়েই আরম্ভ হয় দুঃখ ও অস্বস্তি বোধ দিয়ে, আর এই অবস্থাই তাঁকে ঈশ্বরমুখী করে। কয়েক মাস বা বছর কঠোর সাধনার পর প্রভু তাঁকে নিজ উপস্থিতি ও কিছু আনন্দের অনুভূতি

দিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যান। ঈশ্বরাত্মা থেকে জীবাত্মার এই বিচ্ছেদে তাঁর মধ্যে তীব্র যন্ত্রণার উদ্ভব হয়—যা জাগতিক যন্ত্রণার মতো নয়—উচ্চতর ধরনের। খ্রীস্টান মরমী সাধকেরা একে *আত্মার অন্ধকার রাত্রি* আখ্যা দেয়। হিন্দু-মরমিয়ারা এর নাম দেয় *বিরহ*। এ যেন সাধকের আত্মার ওপর একখণ্ড মেঘ নেমে আসা, আর এতেই সে নানা সূক্ষ্ম প্রলোভনে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই অবস্থার কথা তুকারাম তার একটি *আভাঙ্গে* প্রকাশ করেছেন, এইরূপে :

**আমি সত্য কেমনে জানি—**
**এতই সহায়হীন হয়েছি যে আমি—**
**আমার কাছে মুখ লুকায়েছ যে তুমি,**
**হে প্রভু! তুমি মহত্তম!**
**আমি ডাকি বারে বারে**
**তোমারি সু-উচ্চ দ্বারে**
**কেউ শোনে না সে ডাক; শূন্য সে ঘর**
**সে যে নিঃসীম নির্জন...**[৫]

তিনি চলেন প্রভুর কাছে ভিক্ষার জন্য। কি ভিক্ষা? ভগবৎ-প্রেমের ভিক্ষা।

**ভিখারি এসেছে দ্বারে,**
**ভিখ্ মাগি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে,**
**প্রেম ভিক্ষা দাও, হে ঈশ্বর!**
**তোমার প্রেম-সিক্ত করে।**
**অব্যাহতি দাও মোরে নিষ্ফলা সে কর্ম হতে**
**যাতে শুধু হৃদয় ভরে শূন্যতায়।**
**সেই দান চায় দীন তুকা,**
**গুণ আর মূল্য যার যায় নাকো মাপা।**[৬]

ঈশ্বর বিরহজনিত নিদারুণ পীড়া তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ আভাঙ্গটিতে :

**দুর্ভাগা মীন যথা তীরে আসি পড়ি**
**খাবি খায় ক্লিষ্টতায় আছাড়ি-পিছাড়ি,**
**অথবা মানব যথা সতৃষ্ণ নয়নে**
**বৃথা খুঁজে মরে যত গুপ্ত স্বর্ণ ধনে—**
**তথা পীড়িত হৃদয় মোর করে অশ্রু বিসর্জন**
**করিতে তো চায় সে যে তব কাছে পুনরাগমন।**

---

৫ Nicol Macnicol, *Psalms of Maratha Saints*, The Heritage of India Series, p. 56

৬ তদেব, পৃঃ ৫৭

হে প্রভু! তোমার তো আছে তাহা জানা
পথহারা ক্রন্দিত শিশুর বেদনা।
মাতৃমুখ দেখিবারে মনে কত ব্যাকুলতা, কত শত খেদ।
(কত বারংবার কহিনু সে কথা)
অহো, তব পদতলে তমঃক্লিষ্ট জগতের হবে রহস্য-ভেদ।
ক্লিষ্ট করা চিন্তার সে অগ্নিশিখা
মোর বক্ষোদেশ দগ্ধ করি রয়।
এভাবে আমায় তুমি ভোল কেন, প্রভু?
(অহো! কে পারে জানতে তব লীলা?)
না, প্রভু, জান তো মোর দুর্ভাগ্যের কথা;
তাই কর কৃপা, তুকার এই অনুনয়।[৭]

তুকারাম চেয়েছিলেন চিনি আস্বাদন করতে, চিনি 'হতে' নয়। তিনি ঈশ্বর-সান্নিধ্যের আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে একীভূত হতে নয়। তাই তিনি বলেন, 'অদ্বৈতে আমার তুষ্টি নেই।'[৮] আন্তরশুদ্ধি লাভ ও সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ফলে তুকারাম ঈশ্বর-দর্শনে কৃতকৃতার্থ হতে পেরেছিলেন, আর সর্বদা প্রভুর পবিত্র উপস্থিতি অনুভব করতেন। প্রভু পাণ্ডুরঙ্গ অবশ্যই তাঁকে ভাবে দর্শন দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর কথায় আছে ঃ 'তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে তুকা বলে, হে আমার চক্ষু দুটি এবার তাঁকে দেখ।'[৯] তিনি সর্বক্ষণ প্রভুর উপস্থিতি অনুভব করতেন নিজের মধ্যে, যেমন তাঁর নিম্নলিখিত আভাঙ্গে পাওয়া যায় ঃ

আমার তরফে এবার আমি পাণ্ডুরঙ্গকে গ্রহণ করেছি,
অন্য কাউকেও নয়।
আমার সকল চিন্তায় তিনি আছেন, রয়েছেন আমার হৃদয়ে,
তিনি রয়েছেন নিদ্রায় জাগরণে।[১০]

তিনি অনুভব করতেন, প্রভু সর্বদা সর্বত্র তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কারণ তাঁর ইচ্ছা ঈশ্বর-ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছিল ঃ

আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল মোরে,
মোর সখা তুমি সর্বত্র
চলতে চলতে ভর দি তোমাতে যখন,
আমায় তুমি যে কর বহন ...
তাই খুশি শিশুর মতো আমি খেলা করি
তোমারই প্রিয় সংসারে, হে ঈশ্বর,

---

৭ তদেব, পৃঃ ৬৩
৮ তদেব, পৃঃ ৬৮
৯ তদেব, পৃঃ ৭০
১০ তদেব, পৃঃ ৭০

আর সর্বত্র—আমি, তুকা, বলি—
আশীর্বাদ বর্ষিত হোক চারিদিকে।[১১]

অপরোক্ষানুভূতির ফলে নিঃসংশয়ে তিনি তখন বলতে পারতেন :

ঈশ্বর আমাদের, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরই
সকল আত্মার আত্মা যা হয়ে আছেন তিনি
ঈশ্বর নিকটেই, এতে কোন সংশয় নেই,
সকলেরই নিকটে, অন্তরে, আবার তিনি বাইরেও।
ঈশ্বর করুণাময়, তাঁর করুণার আর শেষ নেই
প্রত্যেকটি বাসনা তিনি পূরণ করবেনই
ঈশ্বর রক্ষা করেন, রক্ষা করেন আপনজনে
তিনি সরিয়ে রাখেন, মারামারি আর মরণেরে।
ঈশ্বর দয়ালু, দয়ালু নিশ্চয়ই,
তিনি তুকাকে রক্ষা করবেন, পথ দেখাবেনই।[১২]

অন্য একটি *আভাঙ্গে* তুকারাম ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপের কথা বলছেন, যা কেবল *ভক্তি* পথেই পাওয়া যায় :

তোমার স্বরূপ যে মানুষের
বাক্যের বা চিন্তার নাগালের বাইরে।
তাই আমি প্রেমকে করেছি মাপের কাঠি,
যা করবে মোরে শিক্ষায় পরিপাটি।
এমনি করে ঐ প্রেমেরই কাঠি দিয়ে
আমি মাপি অনন্তেরে।
সত্য বলছি, তাঁর পরিমাপের চেষ্টায়
নাইকো আর কোন সঠিক উপায়।[১৩]

গভীর ঈশ্বর-প্রেমে তুকারাম ইন্দ্রিয়ের ও মনের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তিনি তাই বিজয়ীর ভাবে বলেছেন :

এস ভাই, আমরা প্রেমের ডঙ্কা বাজাই
আওয়াজে যার, পাপের যুগে, ভয় পাবে সবাই।
তুকা বলে, এস
আমরা বিজয়-আনন্দেরে স্বাগত জানাই।[১৪]

প্রকৃত জয় হলো, ভোগ লালসাকে জয় করা; একেই বলে আপনাকে জয় করা বা সংযমনে রাখা। উপনিষদ্ একেই বলেছেন স্বরাট, স্বরাজ্য, আত্মানুভূতি-জাত

১১ তদেব পৃঃ ৭১
১২ তদেব পৃঃ ৭৩
১৩ তদেব পৃঃ ৭৩
১৪ তদেব পৃঃ ৮৫

প্রকৃত স্বাধীনতা। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, এক আত্ম-বিরোধী ব্যাপার, যে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা পাব, নিজেদের হারিয়ে, আমাদের নিম্নসত্তাকে বা অহংকে বলিদান দিয়ে। আমরা অহংকে হারিয়ে ঈশ্বর লাভ করব। তাই তুকারাম বলেন ঃ

আমার অন্তরের অহংভাব আজ মৃত,
আর তুমিই সেখানে অধিষ্ঠিত।
তুকা সাক্ষ্য দেয় এই আমি,
এখন আর নয় ক্ষুদ্র 'আমি' বা 'আমার'।[১৫]

আর একটি *আভাঙ্গে* তিনি বলেছেন ঃ

আমারি চোখের সামনে আমার মৃত অহং শুয়ে;
হে ওপারের আনন্দ, তুলনা কর!
আনন্দে জগৎ পূর্ণ, আমিও আনন্দিত,
সর্বাত্মা যিনি রয়েছেন তথায়।
স্বার্থ-বন্ধন মোর খুলে গেছে,
এখন মুক্ত আমি, বহুদূরে যাব পৌঁছে।
চলে গেছে জন্ম-মৃত্যুর মাটি,
সেই ক্ষুদ্র 'আমিত্ব'টি।
নারায়ণ-কৃপায় আমার এ তটে অধিষ্ঠান,
এখানে থাকি অটুট বিশ্বাসে।
তুকা বলে, এখন সাঙ্গ আমার কাজ,
এ বাণীর প্রচার হোক দেশে বিদেশে।[১৬]

আমরা যেন কিভাবে অধ্যাত্ম জীবন যাপন করতে হয় তা শিখে নি, আমরা যেন আমাদের অন্তরে অন্তরে বুঝতে চেষ্টা করি যে, সব অধ্যাত্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা হলো আত্ম-সমর্পণ, পরমাত্মার কাছে স্বীয় সত্তার সম্পূর্ণ উৎসর্জন। আমরা যেন মহারাষ্ট্রের সন্তদের কাছ থেকে এই আত্ম-সমর্পণের, আত্ম-নিবেদনের গুহ্যতত্ত্ব জানতে চেষ্টা করি। অবশ্য, সকল মহান সন্তেরই এ হলো শাশ্বত বাণী।

## উত্তর ভারতের সন্তগণ

রামানন্দই প্রথম মহান সন্ত, যিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলিমদের রাজনীতিক আধিপত্যের প্রতিবাদে উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। এলাহাবাদে তাঁর জন্ম, তবে তাঁর পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিলেন। তিনি এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিশু ছিলেন ও অল্প বয়সেই শাস্ত্রাদি আয়ত্ত

---

১৫ *তদেব*, পৃঃ ৭৯ ১৬ *তদেব*, পৃঃ ৭৯-৮০

করেন। তিনি শ্রীবৈষ্ণব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগ দেন ও ঐ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য রাঘবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে সমগ্র দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন। ফিরে আসার পর রাঘবানন্দের অনুগত বৈষ্ণব সাধুদের মনে হলো, ভ্রমণকালে ইনি নিশ্চয়ই সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী, বিশেষত খাদ্য সম্বন্ধে নিয়মগুলি, পালন করেননি; তাই তাঁকে আর তাঁদের সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার দিলেন না। এতে রামানন্দ তীব্র আঘাত পেয়ে স্বতন্ত্রভাবে জীবন কাটাতে লাগলেন এবং জাতি প্রভৃতি ব্যাপারে আরো উদার নীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। বস্তুত তাঁর উক্তি বলে যে কথাগুলির সব থেকে বেশি প্রসিদ্ধি রয়েছে তা হলো ঃ 'মানুষ কোন্ জাতিভুক্ত বা কার সঙ্গে বসে সে খায়, তা যেন কেউ জানতে না চায়। মানুষ যদি হরিভক্ত হয়, তবে সে হরির আপন জন হয়ে পড়ে।'—

**জাতি পাঁতি পূছে নহি কোঈ।**
**হরি কো ভজে সো হরিকা হোঈ॥**[১৭]

বারাণসীতে গঙ্গার তীরে এক কুঁড়ে ঘরে থেকে তিনি কঠোর তপশ্চর্যা ও ধ্যান অভ্যাস করতেন। তিনি দিনে চার বার ঘরের বাইরে এসে শাঁখ বাজাতেন, ঐস্লামিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবির সম্মুখীন উত্তর ভারতের হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির কাছে রামানন্দের উদাত্ত আহ্বান এক নতুন আশার বাণী-রূপে এল। দূর নিকট সব জায়গা থেকে তার শিষ্যেরা আসতে লাগল। তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই-ই ছিল, ছিলেন কবীর, রবিদাস ও ধন্নার মতো মহান সন্তগণ, কয়েকজন নারীও ছিলেন। রামানন্দ রামকে পরম চৈতন্যস্বরূপ বলে চিনেছিলেন আর মানবজাতিকে এক পরিবাররূপে দেখতেন। তিনি জাতি-ধর্মের বিভেদ মুছে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তী যুগের জন্য ভারতে হিন্দু-মুসলিম ধর্মভাবের এক অনন্যসুলভ সমন্বয়ের পথ রচনা করে দিয়েছিলেন। তিনি সোৎসাহে প্রচার চালাতেন কিন্তু তাঁর কবিতা বা অন্য সাহিত্য-সম্পদের মধ্যে খুব অল্পই রক্ষা পেয়েছে। শিখদের *গ্রন্থ সাহেবে* একটি মাত্র কবিতা লিপিবদ্ধ আছে, যা থেকে তাঁর ভাবের উদারতা প্রকাশ পায় ঃ

'আমি কোথা যাব? সঙ্গীত ও সমারোহ আমার বাড়িতেই চলেছে, আমার হৃদয়ও নড়তে চায় না, আমার মন-পাখি তার ডানা গুটিয়ে স্থির হয়ে গেছে। একদিন আমার হৃদয় উপছে পড়ল, আমার ইচ্ছা হলো চন্দন ও গন্ধ দিয়ে ব্রহ্মের পূজা করি। কিন্তু শ্রীগুরুর অভিব্যক্তিতে জানা যায়, ব্রহ্ম আমার হৃদয়েই রয়েছেন। যেখানে যাই, জল ও প্রস্তরকেই (পূজিত) হতে দেখি; কিন্তু তুমিই তো তোমার অস্তিত্ব দিয়ে সব কিছুর অন্তর ভরিয়ে রেখেছ। বৃথাই তারা তোমার খোঁজ করে

---

১৭ *Ramanand to Ram Tirath* (Madras : G.A. Natesan & Co., 2nd Edn.), p. 3. গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

বেদের মধ্যে। এখানে যদি তোমাকে না পাওয়া যায়, আমরা অবশ্যই সেখানে যাব আর দেখব তোমাকে। হে প্রকৃত গুরু আমার, ঘুচিয়ে দিয়েছ তুমি আমার সকল ব্যর্থতা ও ভ্রান্তি। তুমি ধন্য ! রামানন্দ হারিয়ে গেছে তার প্রভুর মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে; গুরুর উপদেশেই ছিন্ন হয় কোটি কর্ম বন্ধনের সব কিছুই।[১৮]

ডঃ গ্রিয়ারসনের মতে রামানন্দের জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১২৯৯ ও ১৪১০ খ্রীস্টাব্দে। এই মতে তিনি ১১১ বছর বেঁচে ছিলেন। যদিও উত্তর ভারতে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের উৎসমুখ ছিলেন রামানন্দ, তাঁর সরল ভক্তি ও সামাজিক সাম্যের বাণী উত্তর ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল প্রধানত কবীরের গানের মাধ্যমে। কোন্ সালে কবীরের জন্ম, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও আচরণে পরস্পর বোঝা-পড়ায় আসতে চেষ্টা করছিল, সেই সময় কবীরের প্রভাব আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তিনি বারাণসীতে বসবাসকারী মুসলমান তাঁতি পিতামাতার প্রকৃত অথবা পালিত পুত্র ছিলেন। এই দরিদ্র তাঁতিরা পূর্বে হিন্দু ছিল ও হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের চক্ষেই হীনমর্যাদাসম্পন্ন ছিল। স্বভাবতই তারা ধর্মীয় বিধি ও আচরণ পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন। কবীর এইরকম প্রথাবহির্ভূত সমাজে মানুষ হয়েছিলেন; এই পরিস্থিতি তাঁর কবিতাগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। দর্শন শাস্ত্রে তাঁর নিয়মিত পুঁথি বা আচরণগত শিক্ষা ছিল না। তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেন। কথিত আছে যে, তুকারামের মতো তাঁর পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। তিনি কাপড় বুনেই জীবিকা অর্জন করতেন, আর মাকু চালাতে চালাতে কবিতা বা গান বাঁধতেন।

অনেকদিন পর্যন্ত তিনি গুরু লাভ করেন নি; রামানন্দের কথা শুনেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভয় হতো পাছে মহান সন্ত তাঁকে শিষ্যত্বে ব্রতী করতে অস্বীকৃত হন। তাই তিনি একটি মতলব করলেন। তিনি জানতেন যে, রামানন্দ রোজ ভোরে গঙ্গায় স্নান করতে যান। একদিন তিনি নদীতে নামার ঘাটে গিয়ে একটি সিঁড়িতে শুয়ে রইলেন। সন্ত এসে অন্ধকারে মানুষটিকে দেখতে না পেয়ে তার গায়ে পা দিয়ে ফেলেন। চমকে গিয়ে, রামানন্দ 'রাম রাম' বলে চিৎকার করে উঠলেন। তখুনি কবীর দাঁড়িয়ে উঠে জোড়হাতে সন্ত মহারাজকে বললেন, 'প্রভু, আপনি আমাকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্যত্বে বরণ করেছেন, যদিও আমি একজন গরিব মুসলমান তাঁতি মাত্র।' লোকটির ভক্তি ও বিনয়ে বিগলিত হয়ে রামানন্দ তাকে শিষ্যত্বে বরণ করলেন ও তার কাছে অধ্যাত্ম জীবনের রহস্যগুলি প্রকাশ করতে লাগলেন।

---

১৮ *Cultural Heritage of India*, vol. IV. R.K. Mission Inst. of culture, 1969, p. 379 গ্রন্থে উদ্ধৃত

পরবর্তী কালে কবীর ঈশ্বরোন্মাদনায় জীবন যাপন করতে থাকেন। জীবনের নিত্য কর্ম—তাঁর কাছে ঈশ্বরের নিয়ত নাম গুণগান ও স্মরণ মননে—বাধা হয়ে ওঠেনি। সকল মরমী সাধকের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তেমনি তাঁকেও ঈশ্বর-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষার তীব্র মনোবেদনা ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু শেষে তিনি বোধিলাভ করেছিলেন। তাঁর বহু অনুগামীদের মধ্যে মুসলিমও ছিল, হিন্দুও ছিল। তাঁর অপ্রচলিত পন্থাসমূহ, সকল লোকের কাছে সমভাবে ঈশ্বরীয় কথা প্রচার করা এবং পুরোহিত ও মোল্লাদের ভাসা ভাসা ভাবের ও ধর্মধ্বজিতার সমালোচনা গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে রাগান্বিত করেছিল। তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন ও শেষে বারাণসী থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, বাকি জীবন তিনি তাঁর অনুচরদের নিয়ে দেশের পর দেশ পর্যটন করে কাটিয়েছিলেন। পরিণত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। এক আখ্যায়িকা আছে যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হিন্দু ও মুসলমান অনুগামীদের মধ্যে বিরোধ বেধেছিল—তাঁর সৎকার ব্যবস্থা নিয়ে—কিন্তু যখন শবাচ্ছদনের চাদরটি তোলা হয়, দেখা যায় কেবল ফুলগুলি একটি স্তূপাকারে পড়ে আছে।

কবীরের গানগুলিতে এক কঠোর নৈতিকতার ভঙ্গি দেখা যায়। সরল জীবন, কায়িক শ্রম, মানবিক সাম্যের ওপর তিনি জোর দিতেন; আর ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করতেন। তাঁর গুরু রামানন্দের মতো তিনিও নাম গুণ-গানের ওপর খুব জোর দিতেন, আর নাম ও নামী ঈশ্বরকে অভেদ জ্ঞান করতেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী পরমাত্মা, সর্বজীবে অনুস্যূত, আবার সকল রূপের অতীত। সেই সঙ্গে, ঈশ্বর হলেন জীবাত্মার চিরন্তন প্রেমাস্পদ, যাঁকে একমাত্র তাঁর প্রতি শুদ্ধ ভালবাসার মাধ্যমেই জানা যায়। তাঁর কাছে আচার অনুষ্ঠান ও দার্শনিক তত্ত্বের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁর কাছে রাম আর রহিম একই পরমাত্মার নাম। তিনি মন্দিরে অন্ধের মতো মূর্তিপূজাকে আবার ভাসাভাসা ভক্তিভাবে মসজিদে উপাসনাকে নিন্দা করতেন। যা প্রত্যেকের করা উচিত তা হলো হৃদয়ের অন্তস্তলে ঈশ্বরের খোঁজ করা। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

> **যদি কেবল মসজিদেই ঈশ্বরের বাস হয়,**
> **তবে সারা দেশটা কার?**
> **যারা হিন্দু তারা বলে ঈশ্বর একটি মূর্তিতে থাকেন,**
> **আমি কোন মতেই সত্য দেখি না।**
> **হে ঈশ্বর, তুমি আল্লাই হও, আর রামই হও,**
> **আমি তোমার নামেই বেঁচে থাকি.**
> **হে প্রভু, আমায় দয়া কর।**

হরি দক্ষিণে থাকেন, আল্লার স্থান পশ্চিমে,
তাঁকে খোঁজ হৃদয়ে, খোঁজ সর্ব হৃদয়ের হৃদয়ে;
সেখানেই তাঁর স্থান, সেখানেই তাঁর বাস।[১৯]

কবীর জোর দিতেন অনুক্ষণ ঈশ্বর স্মরণের ওপর। নিচের কবিতাটিতে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাবে ঃ

ও সাধু! সহজ মিলনই শ্রেষ্ঠ।
যেদিন থেকে আমি প্রভুর সাক্ষাৎ পেয়েছি,
আমাদের প্রেমলীলার কোন অন্ত হয়নি।
আমি চোখ বুজি না, কান ঢাকি না, শরীরকে কষ্ট দিই না,
আমি চোখ চেয়ে দেখি আর হাসি,
আর সর্বত্র তাঁর সৌন্দর্য দর্শন করি।
আমি তাঁর নাম করি, যা দেখি তা তাঁকেই স্মরণ করায়;
যা করি তা তাঁরই পূজা হয়ে যায়।

আমার কাছে উদয় আর অস্ত সমান; সব বৈপরীত্য মীমাংসিত;
আমি যেখানেই যাই তাঁকেই প্রদক্ষিণ করি,
আমার সব কাজই হয় তাঁর সেবা।
আমার শয়নে, প্রণাম হয় তাঁর চরণে।
তিনি আমার একমাত্র পূজ্য; অন্য কেউ নয়।
আমার জিহ্বা অসৎ কথা বলে না,
দিবারাত্র তাঁরই স্তুতিগান করে।
আমি উঠি বা বসি, ভুলতে পারি না তাঁকে,
তাঁর সঙ্গীতের স্পন্দন যে বাজে আমার কানে।
কবীর বলে ঃ আমার হৃদয় হয় উন্মত্ত,
আত্মার কাছে ব্যক্ত করি যা হয় গুপ্ত।
আমি সেই এক মহান আনন্দে মগ্ন,
যা সব সুখ-দুঃখের পারে।[২০]

কবীরের গানগুলি সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার ফলে তারা প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনের মূল তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে ধারণা করার সুযোগ পেয়েছিল। তাঁর নিজের সাদাসিধে ঈশ্বরোন্মত্ত জীবনই সহস্র সহস্র লোকের আদর্শস্থল হয়ে উঠেছিল। তাঁর মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়েই এক মিলন-বিন্দু খুঁজে পেয়েছিল। তাঁর কবিতাগুলি উত্তর ভারতের জনগণের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে গভীরভাবে

১৯ পূর্বোল্লিখিত *Ramananda to Ram Tirath*, পৃঃ ১৮, থেকে উদ্ধৃত।
২০ তদেব, পৃঃ ২৬-২৭

প্রভাবিত করেছিল। এই প্রভাব যে কত গভীর ও বিস্তৃত ছিল তা বোঝা যায় কেবল যখন দক্ষিণ ভারতে যাওয়া যায়; সেখানকার জনগণের মধ্যে এক ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক চালচিত্র ও সামাজিক মনোভাব দেখা যায়।

রবিদাস (বা রুইদাস) ছিলেন রামানন্দের আর এক মহান শিষ্য ও কবীরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক; তিনি বারাণসীর মুচি সন্ত নামে পরিচিত। কবীরের মতোই তিনি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতেন ও জীবিকা নির্বাহ করতেন হাতের কাজ, হিন্দু সমাজের চক্ষে যা নিকৃষ্টতম বৃত্তি, সেই জুতা তৈরি করে। অবশ্য তাঁর গার্হস্থ্য জীবন কবীরের মতো ছিল না—তা ছিল শান্তিপূর্ণ—তাঁর দোঁহাগুলিতে তাই কোন কঠোর সমালোচনা পাওয়া যায় না। তাঁর গানগুলিও খুবই মার্জিত মনের পরিচায়ক, সব সময়ে যেন ভগবৎপ্রেমে নিমজ্জিত। গরিব মুচি হলেও, তাঁর সন্ত জীবনের সুখ্যাতি দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল; তাঁর অনুগামীর সংখ্যাও ছিল বহু। তাঁর জীবন ও উপদেশবাণী উত্তর ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে প্রেরণার উৎস ছিল, বিশেষত গরিব ও তথাকথিত নিম্ন জাতির কাছে। তাঁর অনুগামীরা *রাই-দাসী* নামে এক পৃথক বৈষ্ণব সম্প্রদায়রূপে গড়ে উঠেছিল, আর তাদের সংখ্যা কেবল *রামানন্দী* (রামানন্দের অনুগামী) ও *কবীরপন্থীদের* (কবীরের অনুগামী) পরেই।

উত্তর ভারতের পরবর্তী মহান সন্ত ছিলেন শিখ ধর্মের প্রবর্তক নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ); তাঁরও ধর্মীয় মনোভাব রামানন্দ ও কবীরের মতোই ছিল। তাঁর জন্ম পাঞ্জাবে লাহোরের কাছে একটি গ্রামে খত্রী (ক্ষত্রিয়) পরিবারে। তাঁর পিতা গ্রামের হিসাব-রক্ষক এবং চাষী ছিলেন; বাল্যে স্কুলে গিয়ে তিনি হিন্দি ও স্থানীয় ভাষায় বেশ ভাল জ্ঞান অর্জন করেন; পারসিক ভাষাও শেখেন। বাল্যেই তাঁর মধ্যে গভীর ধর্মীয় প্রবণতা দেখা গিয়েছিল ও তিনি ধ্যান অভ্যাস করতেন। তাঁর সংসার-বিমুখ মনোভাব লক্ষ্য করে, পিতা তাঁকে নিজেদের জমি জমা চাষ করার কাজে নিযুক্ত করেন, তার সঙ্গে একটি ছোট ব্যবসাও দেখতে বলেন। কিন্তু নানক সর্বান্তঃকরণে আধ্যাত্মিক বিষয়ে মগ্ন থাকতেন এবং পিতার বিপরীত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি ধ্যানেই বেশি সময় কাটাতেন।

বয়স হতেই তার বিবাহ দেওয়া হয়, দুটি সন্তানও হয়। কিন্তু তিনি গৃহস্থালির কর্তব্যকর্মে খুব কমই নজর দিতেন; বনে ও নির্জনস্থানেই তিনি বেশি সময় কাটাতেন। তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে মুসলিম জেলা শাসকের অধীনে একটি কর্মসংস্থান করে দেয়। মর্দানা নামে তাঁর একটি অবিচ্ছেদ্য মুসলিম সঙ্গী, তাঁর সেবার জন্য সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। আরো কয়েকজনের সঙ্গে এঁরা দুজন অবসর সময়ে ভজন করতেন। অবশেষে নানক সংসার ত্যাগ করে, তাঁর সম্পদ গরিবদের মধ্যে

বিলিয়ে দেন ও মর্দানার সঙ্গে সারা উত্তর ভারত ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন— নির্জন স্থানে ধ্যানাভ্যাস ও সাধুসঙ্গও চলতে লাগল। সম্ভবত তিনি কবীরের কবিতাবলী ও দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় নবজাগরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, নানক মক্কাতেও গিয়েছিলেন ও আরবদেশীয় মুসলিম ধর্মগুরুদের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন। বার বছর অনুপস্থিতির পর তিনি পাঞ্জাবে ফেরেন। সেই সময় প্রবল মোগল বিজেতা বাবর ভারত আক্রমণ করে। কথিত আছে যে, নানক ঐ সম্রাটের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে বন্দীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করার ব্যবস্থা করেন।

জীবনের শেষের দিকে নানক সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করে নিজ পরিবারের সঙ্গে বসবাস করেন। তাঁর পূতচরিত্রের খ্যাতি কাছাকাছি সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, ফলে লোকে দলে দলে তাঁকে দেখতে ও তাঁর সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে আসত। তারা যে সব পূজোপহার আনত, তা তিনি দরিদ্র-সেবায় ব্যবহার করতেন। কবীরের মতো, নানকও নররূপধারী নয় অথচ সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথাই প্রচার করতেন এবং তাঁর নাম দিয়েছিলেন *হরি*। আবার কবীরের মতোই তিনি শাস্ত্রজ্ঞানের থেকে চিত্তশুদ্ধির ওপর বেশি জোর দিতেন। দুজনেই জাতি-ভেদের নিন্দা করতেন আর ভক্তজনকে সাদাসিধা জীবন যাপনে প্রেরণা দিতেন। নানক ঈশ্বরের নামজপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি জপজী নামে একটি বৃহৎ কবিতা লেখেন, প্রত্যেক শুদ্ধচিত্ত শিখ উষাকালে তা আবৃত্তি করে থাকেন। তার কয়েকটি ছত্র নিচে দেওয়া হলো ঃ

ওম্ তাঁর এক সত্য নাম,
তিনি স্রষ্টা, সর্বত্র তাঁর ধাম ঃ
তাঁর নাই ঘৃণা, নাই ভয়; তিনি জন্মহীন,
মৃত্যুহীন, স্বায়ম্ভুব প্রভু ...

প্রভু সত্য, তাঁর নাম সত্য,
যদি জপো অন্তহীন প্রেমে;
তাঁর কাছে মানবের চাওয়ার অন্ত নেই,
পায়ও সে তাঁর হস্তপূত বহুমূল্য দান।

প্রতিদানে আমাদের কি আছে দেবার,
যা নিয়ে দাঁড়াব সুমুখেতে তাঁর?
ওষ্ঠ মোদের কি নাম জপিবে
শ্রবণে যাহা প্রেম তাঁর অধিক স্ফুরিবে?

হে নানক, তাঁর অনুভূতি হয়

**কেবল তাঁরই ঐশ্বরিক কৃপায়,**
**অন্য পথের যত আস্ফালন**
**সবই অলস বালভাষণ, আর মিথ্যা কথন।**[২১]

নানকের আর একটি সুন্দর গান আছে, যা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনাতেন। গল্প আছে, নানক যখন পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করে আরাত্রিক দর্শন করতে চাইলেন, পুরোহিতরা অনুমতি দেননি। তাই তিনি মন্দিরের বাইরে বসে এই গানটি বাঁধলেন ঃ

**গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে।**
**তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।**
**ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,**
**সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতিঃ রে।**
**কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি,**
**অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।**
**মন মোর মাগে দিবানিশি সে অমৃত হে**
**হরিপাদ পদ্মে সে মন মধু পিয়াসী রে।**
**কর গো সিঞ্চন তব কৃপাবারি**
**হে পূজ্যনাথ, তৃষিত নানক দেহোপরি**
**ওই মহাপুণ্য তব যে শ্রীনাম**
**করে দাও প্রভু, তারই নিত্যধাম।**[২২]

নানক আমৃত্যু এক মহান হিন্দু সন্তের মতোই থাকতেন। কিন্তু, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, শিখ গুরুগণের নেতৃত্বে তাঁর অনুগামীরা নিজেদের হিন্দু সমাজ থেকে পৃথক করে শিখ-সম্প্রদায় নামে এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন। পাঞ্জাবে ও ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে নানকের প্রভাব এখনও এক প্রাণবন্ত শক্তিরূপে বিরাজ করছে।

আমরা এখন ষোড়শ শতাব্দীর সন্ত তুলসীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করব। তাঁর রচিত *রামচরিতমানস* গ্রন্থটি সারা উত্তর ও মধ্য ভারতে সব থেকে বেশি জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী। দেশের এই অংশে এমন গৃহস্থ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে এই মহাগ্রন্থটির একটি অনুলিপি পাওয়া যাবে না। এটি গত তিন শত বৎসর ধরে কোটি কোটি ভারতবাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে সহায়তা করেছে।

---

২১ তদেব পৃঃ ৪৮-৫১

২২ পূর্বোল্লিখিত *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ১৬০-৬১ তে প্রথম ছটি পঙক্তি উদ্ধৃত আছে। বাকি পঙক্তিগুলি মূল গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ।

উত্তর ভারতের সর্বত্রই নজরে পড়ে জায়গায় জায়গায় গ্রামীণ পণ্ডিত বা পরিব্রাজক সাধুগণ এই গ্রন্থটি পাঠ ও আলোচনা করছেন, আর এক দল মানুষ তা নিবিষ্ট মনে শুনছেন।

তুলসীদাস ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের এক অখ্যাত গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন। শোনা যায় জন্মেই শিশুটি 'রাম' নাম উচ্চারণ করেছিল। একে অশুভ লক্ষণ মনে করে অশিক্ষিত পিতা-মাতা তাকে ত্যাগ করে। নরহরিদাস নামে এক সন্তকে প্রভু স্বয়ং আদেশ দেন শিশুটিকে তুলে নিয়ে যেতে। পরবর্তী কালে, তুলসী এই গুরু ও পালক পিতাকে এইভাবে তাঁর হৃদয়ের প্রীতি উপহার দিয়েছিলেন ঃ

**আমি করুণাসাগর গুরু ও নররূপী হরির**
**বন্দনা করি পাদপদ্ম,**
**তাঁর উপদেশই সূর্যরশ্মিসম দূর করে**
**বিহ্বলকারী ভ্রান্তির মহান্ধকার।**

তিনি শেষ সনাতন নামে আর এক সাধুর কাছে পনের বছর ধরে শিক্ষা লাভ করে বেদ-বেদান্তের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

তুলসীদাস রত্নাবলীকে বিবাহ করেন; তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়। তিনি স্ত্রীর প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। একদিন বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন যে, স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন। স্ত্রীর বিরহে আকুল হয়ে বিনা নিমন্ত্রণেই তিনিও সেই পথে শ্বশুর-বাড়ি ছুটলেন। সেখানে দুজনে দেখা হলে তাঁর এই অশোভন আসক্তিতে স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ 'আমার এই হাড়-মাসের শরীরটার ওপর তোমার এত প্রবল ভালবাসা; এর অর্ধেক ভালবাসা যদি তুমি রামের প্রতি দিতে, তাতে তুমি সাংসারিক দুঃখ কষ্ট থেকে রেহাই পেতে—তোমার মুক্তি লাভ হতো।' এই তীক্ষ্ণ অথচ জ্ঞানসমৃদ্ধ কথাগুলি তুলসীদাসের কাছে নতুন আলোক নিয়ে এল। এতে সংসার ও সাংসারিক সম্পর্কের অনিত্যতা এবং রামরূপী পরমাত্মার নিত্যতার জ্ঞান তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ফলে, তিনি সংসার ত্যাগ করলেন এবং রামেশ্বর, দ্বারকা, পুরী ও বদরিকাশ্রম—এই চার মহাপুণ্যধামে তীর্থ দর্শন সেরে, বারাণসীতে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি মাঝে মাঝে কাছাকাছি তীর্থগুলি দর্শনে গেলেও সব সময়ে বারাণসীতেই ফিরতেন। এবার বারাণসীতে তাঁর সমগ্র আত্মা রামাভিমুখী হয়ে রামজীর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কথিত আছে, মহান রামভক্ত শ্রীহনুমানের কৃপায়, তিনি কয়েকবার আপন অন্তরে নিজ প্রিয়তমের দর্শন লাভে ধন্য হন। একবার প্রভু অশ্বপৃষ্ঠে রাজপুত্রের বেশে তুলসীদাসের সামনে আবির্ভূত হন। বলা হয়, এই পুণ্য দর্শনে তাঁর বাহ্য চেতনা লুপ্ত হয় এবং সেই ভাবোন্মত্ত

অবস্থায় তিন দিন থাকেন। আর একবার তিনি দেখেন—সঙ্গীদের নিয়ে সরযূ নদীর তীরে খেলায় রত রাজপুত্রের ঐ মনোমুগ্ধকর রূপ।

বৃন্দাবনে, তুলসীদাস শ্রীরামের ভক্ত জেনে এক গোঁড়া কৃষ্ণভক্ত তাঁকে বলে ঃ 'কৃষ্ণ *অবতারই শ্রেষ্ঠ*; রাম কেবল অংশাবতার।' একথা শুনে তুলসী তাঁর অননুকরণীয় ভাবে উত্তর দেন ঃ 'কেবল দশরথ তনয়ের প্রেমে আমার আত্মা পূর্ণ ছিল, আর আমি তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্যের স্তুতি করতাম। এখন তুমি তাঁর দেবত্বের কথা বলায় আমার প্রেম বিশগুণ বেড়ে গেল।'

প্রভু তুলসীদাসকে রাম-ভক্তি প্রচারের যন্ত্র করেছিলেন। কালে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, যিনি দশরথের পুত্র হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন, তিনি পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ নন। তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধিসকল তাঁকে তাঁর সহচরদের প্রতি প্রেমে ও সহানুভূতিতে ভরিয়ে তুলেছিল, আর তিনি নিজে যে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন তা সকলের মধ্যে ভাগ করে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কেবল তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনায় নয়, বিশেষত অমর গ্রন্থ *রামচরিতমানস* সমেত তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে অবস্থায় তাঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *বিনয় পত্রিকা* রচিত হয়েছিল, তাতেই তাঁর ভগবৎ-প্রেমে উপছে পড়া বিরাট হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার এক খুনী বারাণসীতে তীর্থ দর্শনে এসে চিৎকার করছিল ঃ 'রামের নামে আমার মতো খুনীকে ভিক্ষা দাও।' তাঁর প্রিয় রাম নাম শুনে, তুলসীদাস ঐ লোকটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে প্রসাদী অন্ন দিলেন ও তাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করলেন। ঐ অঞ্চলের গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, খুন করার পাপ থেকে সে কিভাবে মুক্ত হতে পারে। উত্তরে তুলসীদাস বললেন ঃ 'শাস্ত্র পাঠ করে জেনে নিন ঈশ্বরের নামের শক্তি কতখানি।' ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা আরো প্রমাণ চাইলেন। তাঁরা একমত হয়ে বললেন, যদি বিশ্বনাথের মন্দিরের পবিত্র ষাঁড় ঐ খুনীর হাত থেকে খায়, তবে তাঁরা তুলসীদাসের কথা মেনে নেবেন। ঐ লোকটিকে মন্দিরে নিয়ে আসা হলো, আর ষাঁড়টি তার হাত থেকে খেয়ে নিল। এইভাবে তুলসী প্রমাণ করে দিলেন—ভক্তের ঐকান্তিক অনুতাপ প্রভু স্বীকার করে নেন। আবার এক নতুন ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি হলো। কলি—যিনি অমঙ্গলের প্রতিমূর্তি—তুলসীদাসকে খেয়ে ফেলবেন বলে ভয় দেখালেন। তুলসী হনুমানের কাছে প্রার্থনা জানালেন, তিনি স্বপ্নে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে অমঙ্গলের প্রতিকারের জন্য বিশ্বাধিপতি শ্রীরামের কাছে বিষয়টি নিবেদন করতে উপদেশ দিলেন; এই হলো *বিনয় পত্রিকার* উৎসমূল।

তাঁর পূর্বগ রামানন্দের পদানুসরণ করে তুলসীদাস তাঁর রচনাবলী হিন্দিতেই লিখেছিলেন জনসাধারণের সুবিধার জন্য। এজন্য তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন। একদিন, সংস্কৃতজ্ঞানে গর্বিত এক পণ্ডিত তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করলেন ঃ 'মহাশয়, আপনি তো সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত, তবে এই মহাকাব্যটি ইতর (গ্রাম্য) ভাষায় রচনা করলেন কেন?' উত্তরে তুলসী বললেন ঃ 'আমার মাতৃভাষা অমার্জিত, কিন্তু তা আপনার সংস্কৃত-প্রেমীদের নায়িকা-বর্ণনার (নায়িকাদের বর্ণনা-পূর্ণ রচনার) থেকে ভাল।' পণ্ডিতটি এ কথার ব্যাখ্যা চাইলেন। তুলসী বললেন ঃ 'আপনি যদি একটি গরলপূর্ণ রত্নখচিত পাত্র, আর একটি অমৃতপূর্ণ মাটির পাত্র পান, তবে কোন্‌টিকে আপনি নেবেন, আর কোন্‌টিকেই বা ফিরিয়ে দেবেন।'

প্রসিদ্ধ রামায়ণ গ্রন্থের ভূমিকায় হিন্দিভাষা ব্যবহারের সমর্থনে তিনি বলেছেন ঃ

> **আমি এক বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় যে, সৎলোকে আমার কথা শুনে তৃপ্ত হবে, যদিও মূর্খদের কাছে তা হাসির খোরাক হতে পারে। ... যদি আমার ঘরোয়া কথা ও নিম্নমানের বুদ্ধি কৌশল হাসির বস্তু হয়, তাদের হাসতে দাও সেটা আমার ত্রুটি নয়। প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে যদি তাদের কোন বোধ না থাকে তবে তাদের কাছে এ কাহিনী নীরস বোধ হবে, কিন্তু প্রভুর প্রকৃত ও সাধু উপাসকদের কাছে রঘুবীরের আখ্যায়িকা মধুর মতো মিষ্ট লাগবে।**

একদা কয়েকটি চোর দরজা ভেঙ্গে তুলসীদাসের ঘরে ঢুকে দেখল তীর-ধনুক হাতে ময়লা রং-এর একটি যুবা পাহারা দিচ্ছে। তারা যে দিকে যায়, ঐ পাহারাদার তাদের দিকে ফিরে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছিল। তারা খুব ভয় পেয়েছিল। নিশ্চয়ই চোরেরা আরো কিছু মনে করেছিল। সকালে তারা তুলসীদাসের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ 'মশায়, ময়লা রং-এর ছেলেটি আপনার কে হয়?' এ কথা শুনে তুলসী খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝেছিলেন যে, প্রভু নিজেই পাহারাদারের রূপ ধরেছিলেন। তিনি তাঁর যা কিছু ছিল তাদের দিয়ে দিলেন। এদিকে রামের দর্শন ও তুলসীর আকর্ষণীয় স্পর্শ লাভে, ঐ চোরেরা নিজেরাই আধ্যাত্মিকভাবে প্রণোদিত হয়ে পড়ল। তারা সন্তজীর কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে পবিত্র ও ঈশ্বরে সমর্পিত জীবন যাপন করতে থাকল।

এক সময়ে তুলসীদাস কোন বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি যখন রান্না করছিলেন, গৃহকর্ত্রী কিছু মশলা দিতে চাইলে বলেন, তাঁর ঝোলায় মশলা আছে। আরো অন্য কিছু জিনিস দিতে চাইলে, তিনি ঐ একই উত্তর দেন। এ কথা শুনে, গৃহকর্ত্রী বললেন ঃ 'বাবাজী, আপনার ঝোলায় এত জিনিস রয়েছে কেবল আপনার অনুরক্ত সহধর্মিণীরই এর ভেতর জায়গা হলো না।' এই গৃহকর্ত্রীটি কে? তিনি অন্য কেউ

নয়—তাঁর সহধর্মিণী, যাঁর কথায় তাঁর জীবনের গতি পালটে গেছল। গৃহকর্ত্রী তাঁকে চিনেছিলেন কিন্তু তুলসীদাস গৃহকর্ত্রীকে চিনতে পারেননি, অপরিচিত বলে মনে করেছিলেন।

আরো অন্য ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় ঈশ্বরোপলব্ধিই তাঁর জীবনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, আর কতই না তিনি আশা করতেন যে, অন্য সকলেও দেহ-মন-আত্মা সহযোগে ঐ একই লক্ষ্যের দিকে এগোতে চেষ্টা করুক।

সম্রাট জাহাঙ্গীর তুলসীদাসকে শ্রদ্ধা করতেন বলে কথিত আছে। একদিন তিনি সন্তজীকে বেশ কিছু অর্থ দেবার ইচ্ছা করেন। তুলসীদাস বলেন : 'যে প্রভুর ভক্তি-সাধনায় ডুবে থাকতে চায়, তার পক্ষে ধন সঞ্চয় একেবারে বর্জনীয়। অর্থ চিন্তা ও আনুষঙ্গিক উদ্বেগ মনকে নষ্ট করে দেয়—তা দিয়ে আর ঈশ্বর-চিন্তা চলে না।

অন্য এক সময়ে জাহাঙ্গীর মন্তব্য করেছিলেন : 'স্বামীজী, আমাদের মন্ত্রী বীরবল খুবই জ্ঞানী।' তুলসীদাস উত্তরে বলেন : 'তা হতে পারে, কিন্তু এরূপ মূল্যবান গুণে ভূষিত অথচ নশ্বর এই দেহের অধিকারী হয়ে তিনি যদি ঈশ্বরোপলব্ধির পথটি না খোঁজেন—তবে তাঁর থেকে মূর্খ আর কেউ নেই। তিনি যেমন সফল বাক্‌চাতুর্যপটু—তা জ্ঞানীর লক্ষণ নয়; ঈশ্বরোপলব্ধিতেই জ্ঞান নিহিত রয়েছে।'

মহারাজ মান সিং ও তাঁর ভাই এবং অন্য রাজপুত্রেরা প্রায়ই কবির দর্শনে যেতেন ও তাঁর প্রতি ভূয়সী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। একবার একজন সন্তকে প্রশ্ন করে, সে সময়ে এই সব মহান লোকেরা কেন তাঁকে দর্শন করতে আসতেন, অথচ তার আগে তো কেউ আসতেন না। তুলসী উত্তর দেন : 'একদা আমি ভিক্ষা করতাম, তখন একটা কাণা কড়িও ভিক্ষার ঝুলিতে পড়ত না। তখন কেউ আমাকে চাইত না। কিন্তু গরিবের পালক রাম, আমার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতাম। এখন রাজারাও আমার পাদবন্দনা করে। তখন রাম আমার কাছে ছিলেন না; এখন রামই আমার সহায়।'[২৩]

*বিনয় পত্রিকায়* তুলসীদাস মায়া নিদ্রা থেকে তাঁর জাগরণের কথা বলেছেন, আর ব্যক্ত করেছেন তাঁর অধ্যাত্ম জীবনযাপন করার সঙ্কল্পের কথা :

> এতকাল ধরে অনেক হারিয়েছি আমি, বৃথা কাজে জীবন কাটিয়েছি। প্রভু রামের কৃপায় আমার ঘুম ভেঙেছে। এখন জেগেছি, আর আমি মায়ার (মোহের) বশে যাব না। আমি প্রভুর কৃপায় তাঁর নাম পেয়েছি। এটি বুকে আঁকড়ে রাখব, মুহূর্তের তরেও ছাড়ব না। প্রভুর সুন্দর রূপটি মনে পোষণ

---

২৩ এই সব ঘটনা ও সঙ্গীতের কিছু কিছু বঙ্কে বিহারী রচিত *The Minstrels & God* (Mumbai, Bharatiya Vidya Bhavan) নামক গ্রন্থ হতে গৃহীত হয়েছে।

করতে থাকব। বহুকাল এ জগৎ আমায় বিদ্রূপ করেছে, করে রেখেছে ইন্দ্রিয়ের দাস; এখন আর আমি তেমন হতে দেব না। আমি এখন মৌমাছি হয়ে প্রভুর পাদপদ্মে রয়েছি, মুহূর্তের জন্যও মনকে সে অমৃত আস্বাদন থেকে বিরত হতে দেব না।

আর একটি অপূর্ব প্রার্থনায় ঈশ্বরের নামের ওপর তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা প্রকাশ পেয়েছে ঃ

হে প্রভু, প্রত্যেকে খুশিমতো নিজ নিজ সাধন পথ বেছে নিক। কিন্তু আমি তোমার নাম থেকেই সব বর পাব—কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—বেদ নির্দেশিত আত্মোন্নতির সব পথই ভাল। কিন্তু আমি কেবল একটি আশ্রয়ই খুঁজি আর তা পাই তোমার নামে—অন্য কিছু খুঁজি না ...

আমি তোমার নামের মাধুর্য আস্বাদন করেছি। এতেই আমার, ইহলোকে ও পরলোকে সব বাসনার তৃপ্তি ...

লোকে যে-কোন ভালবাসার পাত্রে নিজেকে বাঁধতে পারে, তার বিশ্বাসের ব্যাপারেও তাই, কিন্তু আমি নামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিনে রেখেছি—রাম—উনিই আমার পিতা, উনিই হলেন মাতা। আমি শঙ্করের দোহাই দিচ্ছি, গোপন না করে সত্য বলছি যে, তুলসীদাস দেখে শুধু তোমার নাম জপেই তার সব কল্যাণ হয়।'

তুলসীদাসের শুদ্ধা ভক্তি তাঁর এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয় ঃ

'হে প্রভু ! তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার ক্রন্দন শুনিবারে? বড়ই অদ্ভুত মোর আবেদন—গরিব হইয়ে আমি চাই রাজা হইবারে...

স্মরণাতীত কাল ধরে সহিতেছি নরক যন্ত্রণা, নিয়েছি কত ইতর জন্ম, কিন্তু চাইনা আমি সম্পদ, মুক্তিও না, যদিও জানি তুমিই দাও এ সব।

আমি চাই কেবল তোমার খেলার পুতুল হতে জনমে জনমে, অথবা তোমার চরণের ছোঁয়া নিতে একটি পাথর।'

এবার আমরা তুলসীদাসের বিখ্যাত *রামচরিতমানসের* কথায় আসি। যদিও বাল্মীকির মহৎগ্রন্থ *রামায়ণের* ওপর ভিত্তি করে এটি রচিত হয়েছে, তবু একে তার নিছক অনুবাদ বলা যায় না। এটির অনেকাংশই *অধ্যাত্ম রামায়ণের* মতো অতি উচ্চ ভক্তিভাব-প্রণোদিত। *রামচরিতমানসে* শিব স্বয়ং স্বীয় অর্ধাঙ্গিনী পার্বতীকে রাম কথা বর্ণনা করছেন। মানস সরোবর হলো শিবের আবাসস্থল কৈলাসের পার্বত্য অঞ্চলের একটি বিরাট হ্রদ। রামচরিত—রামকথা হলো—শিবমানসে কল্পিত এক হ্রদ। হ্রদটি প্রথমে শিবমানসে প্রচ্ছন্ন ছিল—যতদিন না পার্বতী, প্রকৃত রামতত্ত্ব-

বিষয়ক প্রশ্নের মাধ্যমে, মানব-কল্যাণে তাকে বাইরে প্রবাহিত করান। তুলসীদাস তাঁর রচিত রামায়ণে, রামকথা ছাড়া, উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুবাদ সন্নিবেশিত করেছেন, ফলে যেসব মহান সত্যগুলি সংস্কৃতভাষায় প্রচ্ছন্ন ছিল, সেগুলিকে হিন্দি-ভাষী লোকেদের—নিম্ন ও উচ্চশ্রেণীভুক্ত সকলের —কাছে সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন। জনমানসে বাল্মীকি-অবতার রূপে বিরাজিত, তুলসীদাস বহুস্থানে—প্রকৃত ভক্তির গভীরতায় ও মানবিক অভিব্যক্তির নিদর্শনে—বাল্মীকিকে ছাপিয়ে গেছেন।

রামচরিতমানসের সূচনায় আছে শিব-পার্বতীর আলাপ। পার্বতী প্রশ্ন করছেন ঃ

**হে প্রভু, সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বলেন, রাম হলেন অনাদি ব্রহ্ম;**
**সেই রামই কি অযোধ্যাধিপতি দশরথের তনয়,**
**অথবা অন্য কোন জন্মহীন, নির্গুণ ও অখণ্ড সত্তা ?**
**যদি তিনি রাজপুত্র, তবে ব্রহ্ম হন কিরূপে?**

শিব উত্তর দেন ঃ

**সগুণ, নির্গুণ ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই ...**
**যিনি নির্গুণ, নিরাকার, আর অগোচর হয়েন**
**ভক্ত প্রেমে তিনিই আবার নানা রূপ ধরেন।**

তুলসীদাসের কাছে, যে পরমাত্মা রামরূপ ধারণ করেছিলেন, তিনিই অভিব্যক্ত রয়েছেন সর্বত্র। বালকাণ্ডে তিনি বলেছেন ঃ

**রামময় জানি চেতন-অচেতন জগতের সকল সত্তায়—**
**কর জোড়ে আমি করি প্রণাম সকলের পায়।**

তুলসীদাস ঘোষাণা করছেন ঃ

**ঈশ্বরাংশে হয় জীব, নাহি তার নাশ;**
**চেতন, শুদ্ধ, আনন্দময় স্বরূপ তাহার।**
**সে যে পড়ে আছে ঐ মায়ার শাসনে,**
**বাঁধা আছে বন্দী টিয়া বা বানর যেমনে।**
**গর্বমত্ত জীব চলে মায়ার ইঙ্গিতে—**
**সর্বগুণী মায়া গতি ঈশ্বরের হাতে।**

জীব কোন্ পথে চলবে? প্রকৃত ভক্তের মতো তুলসীদাস বেছে নিলেন **ভক্তিপথকে ঃ**

**জ্ঞানপথ যেন তরবারির তীক্ষ্ণধার।**
**সে পথে চলেছে যে চক্ষের নিমেষে হতে পারে পতন তাহার।**
**কিন্তু অজ্ঞান, যা হয় জনম-মরণ চক্রের কারণ,**
**নষ্ট হয়—ভক্তি পথে, না লাগে কোন কঠোর সাধন।**

তুলসীদাসের মতে, প্রধান অধ্যাত্ম সাধনা হলো ঈশ্বরের নামজপ ঃ 'এই লৌহ (কলি) যুগে, রাম—প্রভুর এই নামে ভক্তের সব কামনা বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়। এতে ঘোরতর অকল্যাণ দূর হয়, আর গরল অমৃতে পরিণত হয়।'

তিনি বলেছেন ঃ 'আমি প্রণাম জানাই রাম-নামে... যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-স্বরূপ, আর বেদরাশির প্রাণ—যার তুল্য কিছু নেই।'

ভক্তিপথের শেষ ধাপ হলো, আত্মার আত্মা পরমাত্মার কাছে জীবাত্মার আত্ম-সমর্পণ। আমাদের মতো সাধারণ লোক অহংবোধকেই জীবনের—তথা চিন্তা ও ক্রিয়ার কেন্দ্র করে ফেলে। ভক্ত কিন্তু ঈশ্বরকেই কেন্দ্র করে রাখে। সে নিজেকে—দেহ, মন ও আত্মাকে পরমাত্মার কাছে নিবেদন করে। অহংবোধের নাশ হলেই, ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন ও ভক্তের সঙ্গে তাঁর চিরন্তন সম্পর্ক সম্বন্ধে ভক্তের উপলব্ধি জাগিয়ে দেন। ভক্তরূপে সে প্রভুর বিনীত দাস, আত্মারূপে সে পরম-সত্তার এক শাশ্বত অংশ। তুলসীদাসের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যিনি দশরথ-তনয়, তিনি সর্বজীবের আত্মা ছাড়া অন্য কিছু নন।

রামানন্দ, কবীর বা নানক প্রমুখ অন্যান্য মহান ধর্মনেতাগণের মতো তুলসীদাস কোন নতুন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো—শ্রীরামের রূপকে (ব্যক্তিত্বকে) চরম আদর্শরূপে তুলে ধরা, হিন্দুদের মধ্যে নতুন বিশ্বাস ও আশা সঞ্চার করা—এবং অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত ও বারংবার মুসলমান আক্রমণে দুর্বলীকৃত একটি জাতির ভাবগত ঐক্যসাধনের চেষ্টা।

মধ্যযুগে উত্তর ভারতে *ভক্তি* আন্দোলনের দুটি স্রোত দেখা যায়। একটি রাম-উপাসনাকে কেন্দ্র করে, অপরটি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে। এ পর্যন্ত যেসব সন্তদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই প্রথম গোষ্ঠীর। কৃষ্ণ-উপাসনার সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনটি সূচনা হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব দার্শনিক নিম্বার্ককে অবলম্বন করে। কিন্তু এ আন্দোলনের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়, কেবল যখন বল্লভাচার্যের উদ্ভব হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৭৯-১৫৩১ খ্রীঃ)। বল্লভ পরম চৈতন্যের সঙ্গে কৃষ্ণের একরূপতা স্বীকার করেন। তাঁর দর্শন *শুদ্ধাদ্বৈত* নামে পরিচিত, কারণ এতে বলা হয়েছে জীবগণ (জীবাত্মাগণ) ও পরম চৈতন্য স্বরূপত এক ও অভেদ, উভয়েই স্বরূপত শুদ্ধ *সৎ* ও *চিৎ* (অস্তিত্ব ও চৈতন্য), কিন্তু জীবের ক্ষেত্রে আনন্দ অব্যক্ত বা ঢাকা রয়ে গেছে, অথচ পরম চৈতন্যের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। বল্লভের এই কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক ধর্ম তাঁর মৃত্যুর পর পশ্চিম ভারতে সমাজের সর্বস্তরে বিশেষত বণিক ও কৃষকদের মধ্যে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছিল। বর্তমানে গুজরাট ও রাজস্থানে এ মতের প্রভাবই প্রাধান্য পায়।

কৃষ্ণ-পূজাকে জনপ্রিয় করেছিলেন দুজন মহান সন্ত, সুরদাস (১৪৭৯-১৫৮৪) ও মীরাবাঈ (১৫৪৭-১৬১৪), যাঁরা তুলসীদাসের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। এর মধ্যে সুরদাসকে বল্লভাচার্যের শিষ্য বলা হয়। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, আর আত্মীয়-স্বজনের কাছে দুর্ব্যবহারই পেতেন। তিনি একলা এক কুড়ে ঘরে থাকতে আরম্ভ করলেন, আর জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁর জন্মগত অন্তর্জ্ঞান সহায়ে লোকেদের ভবিষ্যৎ বলে দিয়ে। তিনি কোন মতে সংস্কৃত ভাষাও শিখেছিলেন। পরে তিনি মথুরার কাছাকাছি কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ব্রজে চলে গেছিলেন ও বাকি জীবন সেখানেই কাটান। তাঁর জীবন ছিল মহান ত্যাগে উদ্বুদ্ধ, তিনি সর্বদা কৃষ্ণপূজা ও কৃষ্ণগুণ-গানে কাটাতেন। *সুরসাগর* নামে তাঁর আট হাজারটি আত্ম-বিমোহনকারী সঙ্গীতের সঙ্কলনে প্রকাশ পায়, ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁর আত্মার বুভুক্ষা, অন্তরের সংগ্রাম, মরমী সাধকের আন্তরিক অনুভূতি। এই আনন্দদায়ী গানগুলি সারা উত্তর ভারতে গাওয়া হয় এবং যারা কৃষ্ণ-পূজা করে তাদের কাছে এগুলি প্রেরণার অফুরন্ত উৎস।

অপর সন্ত মীরাবাঈ ভারতের নারী সন্তদের মধ্যে সব থেকে বেশি খ্যাতিসম্পন্না, তাঁকে পৃথিবীর মরমী সাধকদের পুরোধায় স্থান দেওয়া যেতে পারে। ভারতে আবহমানকাল থেকে নারীদের স্থান সাধারণত গৃহস্থালির নিভৃত ও পবিত্র অঙ্গনে। ভারতীয় নারীদের বিরাট অংশের কাছে আদর্শ হলেন মহাকাব্যের দুটি চরিত্র, সীতা ও সাবিত্রী—যাঁরা ছিলেন আত্ম-ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, একাগ্র পতিভক্তির প্রতিমূর্তি। মাতৃত্বের আদর্শের সঙ্গে মিশে এই পাতিব্রত্যের আদর্শ আরো মহিমান্বিত হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মাতৃরূপে হিন্দু নারী 'কেবল পতির পত্নী ও রানী নন, তাঁর শিশুদের পূজার সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা দেবী।' কিন্তু এই সাধারণ নারীদের তুলনায় যথেষ্ট ভিন্ন ধরনের কিছু কিছু বিশিষ্টচরিত্রা নারী সংসার জীবনের দায়িত্বে জড়িয়ে না পড়ে নিজেদের পুরাপুরি অধ্যাত্ম সাধনে ও ভগবদারাধনায় উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কোন কোন নারী, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গচ্ছিত রত্নরাজির মতো নিজ নিজ আধ্যাত্মিক সাধনা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বহু চমৎকারী স্তুতি ও গান রচনা করে রেখে গেছেন।

আমরা আগেই অণ্ডাল, অক্ক মহাদেবী প্রভৃতির মতো এই সব নারী সন্তদের মধ্যে কারো কারো জীবন আলোচনা করেছি। এই সব ভক্তদের চিন্তায় একটি যে গুরুত্বপূর্ণ সম-সূত্র পাওয়া যায়, তা হলো তাঁদের ধারণায় জীবাত্মা যেন চিরন্তন পত্নী আর প্রভু হলেন চিরন্তন পতি, কিন্তু আমাদের সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণ দেহ-সম্পর্কবর্জিত। অক্কমহাদেবী ও মীরার জীবনে অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান, তবে প্রথম জন যদি বহমান স্রোতস্বিনীর মতো হয়, পরেরটি হবে

বন্যাপ্লাবিত নদীর মতো। এই সব মহীয়সী নারী সন্তদের জীবন থেকে—নারীগণ যে কঠোর ত্যাগের জীবন যাপন ও ভগবদুপলব্ধির অধিকারিণী ও পারদর্শিনী হতে পারেন—এই মহৎ শিক্ষাটি আমরা পেতে পারি।

যেমন অধিকাংশ সন্তদের নিয়ে, তেমনি মীরাবাঈ-এর জীবন অবলম্বনে নানা উপকথা গ্রথিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে রাঠোর দলভুক্ত এক রাজপুত রাজার কন্যা তা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। বাল্যকাল থেকেই তিনি গিরিধারী গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর আবেগে অনুরক্তা ছিলেন। বয়স হলে, চিতোরের রাণা সঙ্গের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁর স্বামীর, আর তার কিছু পরেই শ্বশুরের জীবনাবসান হয়। তাঁর কোন দেবর রাণা (রাজা) হন। যেহেতু তিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বামী প্রভু কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ, তাই মানব শরীরধারী স্বামীর মৃত্যুতে সহমৃতা হয়ে সতী হতে চান নি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমূর্তির সামনে (ভজন, কীর্তন ও নর্তন) প্রার্থনা, সঙ্গীত ও নৃত্য করে সময় কাটাতেন। এতে ভক্ত ও সাধুগণ আকৃষ্ট হতেন, আর তিনি এদের সঙ্গ লাভে আনন্দিত হতেন। যেমনই হোক, এতে রাজপরিবারের মর্যাদার হানি হতো; তিনি যাতে তাঁর আধ্যাত্মিক 'পাগলামি' ত্যাগ করেন, সেজন্য রাণা তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার ও নিগ্রহের নানা উপায় অবলম্বন করলেন।

শেষ পর্যন্ত, যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি চিতোর ত্যাগ করে পিত্রালয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিনি তীর্থভ্রমণে যান। বৃন্দাবন, মথুরা ও আরো কয়েকটি তীর্থ দর্শন ও সেই সব জায়গায় প্রসিদ্ধ সন্তদের সাক্ষাৎলাভ করেন। শেষ পর্যায়ে তিনি দ্বারকায় এসে অবস্থান করেন। কথিত আছে, মীরা দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরে কৃষ্ণ-মূর্তিতে লীন হয়ে সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটান।

প্রভু মীরাকে *ভক্তির* বাণী প্রচারের যন্ত্র করেছিলেন। তিনি যে *ভক্তির* শিক্ষা দিতেন তা অতি উচ্চ পর্যায়ের। এর অর্থ, অতি-মানবীয় ত্যাগ, অসীম প্রেম ও প্রভুপদে সম্পূর্ণ শরণাগতি। উত্তরাধিকার হিসাবে এই সম্পদই তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন। অতি অল্প লোকই তাঁর পদ অনুসরণ করতে পারে। নিজ *সাধনা* বিষয়ে তিনি বলতেন, 'অশ্রুজলে ভক্তিলতা পালিত হয়, যখন তাতে ফুল হয়, প্রভু ভ্রমরের মতো আসেন ... মীরা বলে "নাম জপ করে ও শাস্ত্রের সারটুকুকে ধরে থেকে, আমি মহান রহস্যকে জেনেছি। প্রার্থনা আর অশ্রুজলের মধ্য দিয়েই আমি গিরিধারীর কাছে পৌঁছেছি।" তাঁর সমগ্র জীবন যেন বন্যাপ্লাবিত ভক্তি নদী—খরস্রোতা হয়ে চলেছে ভগবৎ সাগরের অভিমুখে।

অধ্যাত্ম-জীবনের পরাকাষ্ঠা হলো সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ আর সে সাধন কেবল

তারাই করতে পারে, যারা অধ্যাত্ম জীবনে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রবর্তকদের কাছে মীরার বাণী তাহলে কি? কিছু কবিতায় তিনি কয়েকটি ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করতে পারে। এগুলির মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয়টির সূচনা হয়েছে *সাধন করনা চাইরে মনোয়া ভজন করনা চাই* কথাগুলি দিয়ে। এর অর্থ হলো 'ওরে মন আমার, তোকে অবশ্যই অধ্যাত্ম সাধন ও পূজায় লেগে থাকতে হবে'। অধ্যাত্ম জীবনের মূল ভাব হলো ভগবৎ প্রেম ও তদ্গত জীবন; বিগ্রহ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সব গৌণ। ব্যঙ্গ করে ঐ মহীয়সী কবি-সন্ত জিজ্ঞাসা করেন ঃ

> **যদি নিয়ত স্নানেই হরি-লাভ হতো,**
> **তবে জলজ প্রাণীদের ব্যবস্থা কি হবে?**
> **যদি ফলমূল আহারেই হরি-লাভ হতো,**
> **তবে বাদুড় আর বানরদের কি গতি হবে?**
> **যদি তুলসী চারা পূজাতেই হরি-লাভ হতো,**
> **তবে আমি তুলসীকুঞ্জ পূজতে পারি।**
> **যদি পাথর পূজাতেই হরি-লাভ হতো,**
> **তবে, আমি পাহাড় পূজা করব।**
> **যদি দুধ খেলেই হরি-লাভ হতো,**
> **তবে, বাছুরদের হাল কি হবে?**

তবে কিভাবে হরি-লাভ হতে পারে? মীরা বলেন, '*বিনা প্রেম সে নহিঁ মিলে নন্দলালা*—শুদ্ধ প্রেম ছাড়া নন্দের আদরের দুলালকে পাওয়া যায় না।' এই মহীয়সী নারী সন্তের এই বাণীটি আমরা যেন সর্বদাই মনে রাখি। আমাদের আধ্যাত্মিক সাধন করতে হবে; আমাদের গাইতে হবে প্রভুর নাম গুণগান; তবে সে সবই করতে হবে গভীর প্রেম ও ভক্তিসহকারে।

আমরা যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি, এ ছাড়াও মধ্য যুগে উত্তর ভারতে আরো অনেক সন্তের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম সন্তও ছিলেন, এঁদের সুফি বলা হয়। ভারতীয় সুফি সন্তদের মধ্যে সিন্ধু দেশের শাহ্ লতিফ, দ্বারা সুকো (সম্রাট শাহজাহনের জ্যেষ্ঠপুত্র) ও দিল্লীর ইয়ারী সাহেব বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। সে সময়ে অনেক হিন্দু মুসলিমকে গুরুরূপে গ্রহণ করত, আবার অনেক মুসলিম সন্তের হিন্দু গুরু ছিল। সুফিধর্ম ও হিন্দুযোগের মধ্যে এই রকম পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে উত্তর ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তারা জাতিভেদ ও মূর্তিপূজার নিন্দা করতেন, আর শাস্ত্রচর্চার থেকে মনের পবিত্রতা ও সাধনার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা সকলেই ঈশ্বর-ভক্তি ও স্বীয় গুরুর ওপর শ্রদ্ধাকে প্রাধান্য দিতেন।

## বাংলার সন্তগণ

বাংলার মধ্যযুগীয় সন্তদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে (১৪৮৫-১৫৫৩ খ্রীঃ) সবার ওপরে স্থান দেওয়া হয়; তাঁকে তাঁর অনুগামীরা রাধা-কৃষ্ণের অবতার মনে করে থাকেন। ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আগেই দেওয়া হয়েছে। জাতি সম্বন্ধে তাঁর উদার ভাব ও দল বেঁধে কীর্তনের প্রবর্তন শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনকে জনসাধারণের মধ্যে অতীব প্রিয় করে তুলেছিল। যদিও চৈতন্যদেব জীবনের শেষ আঠার বছর বাংলার বাইরে পুরীতে কাটিয়েছিলেন, তাঁর অনুগামীরা এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত গোস্বামীর মতো বিশ্বস্ত সঙ্গীরা বাংলায় তাঁর কাজ চালিয়ে যেতেন বিপুল উৎসাহের সঙ্গে। চৈতন্য, রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নামে সংস্কৃত ভাষায় দুই মহা পণ্ডিতকে নিজ জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এঁরা দু-ভাই এবং তাঁদের ভাইপো শ্রীজীব গোস্বামী এক সঙ্গে বৃন্দাবনে স্থায়িভাবে বসবাস করে সংস্কৃতে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার মাধ্যমে চৈতন্যের ভক্তিভাবকে এক দার্শনিক ভিত্তিতে উপস্থাপিত করেন। এই সন্তদের ও তাঁদের শিষ্যদের চেষ্টায় বৃন্দাবন বঙ্গীয় (গৌড়ীয়) বৈষ্ণব মতের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়।

উত্তর ভারতে অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে আমরা লক্ষ্য করি যে, এক দিক থেকে বাংলার এক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, আর তা হলো, সেখানে শক্তি পূজার প্রাধান্য। যদিও বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতের বাকি সব রাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তবু দেশের কেবল এই অংশেই ধর্মজীবনে শক্তিপূজা প্রাধান্য পেয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভগবতী মাতার পূজা ভারতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, আর এর ইতিহাসও পাওয়া যায় প্রাচীন কাল থেকে। কিন্তু শক্তি উপাসনা লোকের ধর্মজীবনের গভীরে স্বীয় মূল সুদৃঢ় করে প্রাধান্য বিস্তার করেছে কেবল কয়েকটি জায়গায় ঃ একেবারে উত্তরে কাশ্মীরে, চরম দক্ষিণে কেরলে, আর পূর্ব প্রান্তে বাংলা ও আসামে। শক্তি উপাসনার প্রধান শাস্ত্র হলো *তন্ত্র*। সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রগুলির গ্রন্থকার ও ভাষ্যকারদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গদেশীয়, এই সব পণ্ডিত ও সুদক্ষ ব্যক্তিদের চেষ্টায় এক বিশেষ ধরনের সাধন প্রণালী—যা তান্ত্রিক সাধনা নামে পরিচিত—বঙ্গদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই সময়ে কয়েকজন সন্তের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা কেবল দুর্গা ও কালীপূজাকে জনপ্রিয় করে তোলেননি, পরন্তু এতে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু-জন সন্তের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরা হলেন রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত, এঁদের গানগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে গভীর অনুপ্রেরণা সঞ্চার করত। রামপ্রসাদ ১৭২৩ খ্রীঃ কলকাতার প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরবর্তী এক

গ্রামে জন্মেছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন বৈদ্য এবং তাঁর পিতা ছিলেন এক প্রসিদ্ধ কবিরাজ। স্কুলে তিনি সংস্কৃত, পারসিক ও হিন্দি ভাষায় কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। বাইশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়, তাঁদের চারটি সন্তান। কথিত আছে যে, তিনি এক সুদক্ষ তান্ত্রিক আগমবাগীশের কাছে দীক্ষালাভের পর ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার তাঁকেই নিতে হয়। তাই, তিনি কলকাতায় যান ও দুর্গাচরণ মিত্র নামে এক ধনী লোকের হিসাবরক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। কিন্তু রামপ্রসাদ জগন্মাতার চিন্তায় এতই বিভোর হয়ে থাকতেন যে, হিসাবের কাজে মন দিতে পারতেন না। জগন্মাতার বিষয়ে গান তাঁর মনে এলেই, তিনি তা রচনা করে ফেলতেন—হিসাবের খাতাতেই। কথাগুলি শেষ পর্যন্ত মনিবের কানে পৌঁছলে তিনি খাতাগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে, তিনি গানগুলির বিষয়বস্তু দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি দোষী হিসাবরক্ষককে বললেন, এখন থেকে পরিবার প্রতিপালন করার জন্য তিনি মাসিক ত্রিশ টাকা করে মাসহরা পাবেন এবং বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তাঁর সাধনা চালিয়ে যেতে পারেন।

রামপ্রসাদ বাড়ি ফিরে গিয়ে সর্বান্তঃকরণে কালীর পূজা করতেন ও তাঁর ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকতেন। সাধনায় নিযুক্ত থাকতে থাকতেই তাঁর অন্তরে গানগুলি স্বতঃস্ফুরিত হতো, আর তাতেই ধরা থাকত তাঁর তৎকালীন আধ্যাত্মিক জীবনের কঠোর সংগ্রামের কথা। তিনি জগন্মাতার নানা বিস্ময়কর রূপের দর্শন পেতেন এবং পরজীবনে তিনি উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনায় মগ্ন থাকতেন। ১৮০৩ খ্রীঃ দীপাবলীর পরের দিন তিনি দেহত্যাগ করেন। প্রথা অনুযায়ী কালীপ্রতিমা বিসর্জন দিতে দিতে রামপ্রসাদ নদীগর্ভে প্রবেশ করে প্রিয়তমা মাতৃদেবীর স্তুতি গাইতে গাইতে শরীর ত্যাগ করেন।

বাংলাভাষা-ভাষী জগতে সর্বত্র রামপ্রসাদের গান গাওয়া হয়ে থাকে। সরলতা ও গভীর আধ্যাত্মিক ভাবাবেগের জন্য গানগুলি গত দু-শ বছর ধরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে আছে। যেহেতু এই গানগুলি তাঁর নিজ ব্যক্তিগত জীবনের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও গভীর ভাবানুভূতির প্রতিচ্ছবি, তাই সেগুলি অধ্যাত্ম-সাধকদের কাছে মহা অনুপ্রেরণার উৎস।

ভারতের সব জায়গাতেই মহা আধ্যাত্মিক খ্যাতিসম্পন্ন সন্ত পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের জীবন-কাহিনী, উপদেশ ও গানগুলির এবং প্রায়শ তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ অনুগামীদের মাধ্যমে, এই মহান সন্তগণ হিন্দুধর্মকে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক প্রাণবন্ত বিশ্বাসের রূপ দিয়েছেন। যখনই যেখানেই জাতিকে নাস্তিকতা

বা বিজাতীয় আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছে, সন্তদের আবির্ভাব ঘটেছে ও তাঁরা হিন্দু জাতির অধ্যাত্ম-শক্তিকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। এইভাবে বহু সম্প্রদায়, মত ও পথে বিভক্ত হলেও হিন্দু আধ্যাত্মিকতা একটি গতিশীল শক্তি হয়েই থেকেছে। এই সব বৈচিত্র্যের নিচে, হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক ধারা সদাই প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ দুঃখ-কষ্ট ও অজ্ঞান থেকে মুক্তিলাভের পথানুসন্ধানে মানুষের চেষ্টা এবং ত্যাগ ও সহনশীলতার মনোভাব। হিন্দুধর্মের মৌলিক শিক্ষা হলো, দুঃখ-কষ্ট থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ কেবল ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধিতেই সম্ভব; আর ঈশ্বরলাভ নানান পথে হতে পারে; ঈশ্বরানুভূতিও অনন্ত প্রকারের হতে পারে; আর ঐ অনুভূতি লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা যখন অন্যান্য ধর্মের সন্তদের জীবনানুশীলন করি, ঐ একই সিদ্ধান্তে এসে থাকি। বাস্তবিক পৃথিবীর সকল ধর্মের সন্তগণ একই শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা একই সত্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বলে থাকেন। সব রকম সমস্যার কারণ তাঁদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাসকল যেভাবে ব্যক্ত হয় তার ভাষা বোঝার মতো শক্তির অভাব। আধ্যাত্মিক বিকাশের এই প্রতীকগুলি আমরা যদি বুঝতে পারি, তবে আমরা দেখব সকল মহান সন্তই একই পরমাত্মার, আত্মার আত্মা যিনি, যিনি সকল আনন্দ ও চৈতন্যের উৎস, তাঁর কথাই বলে থাকেন। আমাদের কাজ হলো, কালের বালুতটে এই সব মহাপুরুষগণ যে পদচিহ্ন রেখে গেছেন তার অনুসরণ করে পরমশান্তি, জ্ঞান ও মুক্তি লাভ করা।

চতুর্থ পর্ব

# আধ্যাত্মিক টুকিটাকি

# পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

## আধ্যাত্মিক টুকিটাকি

এ জগৎ-প্রপঞ্চে নিখুঁত প্রতিষ্ঠান বলে কিছু নেই, কারণ যাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়া হয়, তাদের মধ্যে কেউই নিখুঁত নয়। যা যেমন অবস্থায় আছে, তেমনি ভাবেই তাকে গ্রহণ আমাদের করতেই হবে। সর্বত্রই সবল ও দুর্বল উভয় লক্ষণই পাওয়া যায়, সেই প্রতিষ্ঠানকেই আমাদের বেছে নিতে হবে, যেখানে মন্দের থেকে ভালর ভাগ বেশি, যেখানে আমরা আরো ভাল হবার সুযোগ পাব।

সব রকম অবলম্বনের থেকে স্বাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তা যেন অহং-কেন্দ্রিক না হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আমাদের বলতেন, 'তোমার মনই যেন তোমার *গুরু* হয়।' এর অর্থ হলো আমাদের মন যেন, আমাদের অন্তরে যে *গুরুর গুরু* অধিষ্ঠিত রয়েছেন তাঁর সংস্পর্শে আসার পক্ষে যথেষ্ট পবিত্র হয়। তোমাদের দেয় উপদেশের মধ্যে এইটিই আমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ। তুমি কোন কাজের নও, এ কথা ভেবে নিজেকে দুর্বল করো না। বাইরের সাহায্যের ওপরেও অতি মাত্রায় নির্ভর না করে, আলোক ও নির্দেশের জন্য অন্তরের গুরুর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর।

অন্যদের সুখ দেখে নিজে সুখী বোধ করতে শেখ।

আমরা সবাই কোন বিষয়ে দুর্বল, আবার কোন বিষয়ে বা সবল। এ দুটিকে একত্র কর, তখন যেমনই তাদের দিকে তাকাবে দেখবে ভালর ভাগই বেশি, অবশ্য মন্দকে ক্রমান্বয়ে উচ্ছেদ করতে হবে।

নিজ দুর্বলতার দিকে তাকিয়ে মন মরা হয়ে পড়লে পেছন ফিরে তাকাও—দেখবে গত কয়েক বছরে তোমার ভেতর কত বড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এতে আশায় বুক বাঁধ, আর উৎসাহ পেয়ে বারংবার চেষ্টা করতে থাক। ঈশ্বরীয় শক্তি তোমার পেছনে রয়েছে জেনে আন্তরিক চেষ্টা ও প্রার্থনার সহায়ে সেই শক্তিতে শক্তিমান হতে শেখ। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, সময় হলেই তুমি দেখতে পাবে—তোমার মধ্যে স্বপ্নাতীত আধ্যাত্মিক পরিবর্তন এসেছে।

আমাদের আদর্শ এত উঁচু যে, যতই ঐ দিকে অগ্রসর হই ততই মনে হয়, আরো কত সাধনাই না করতে হবে। এ ভাব খুবই ভাল, এতে আমাদের অগ্রগতি

অব্যাহত থাকে, আর প্রার্থনা ও ধ্যান করতে করতে কিঞ্চিৎ ঈশ্বরীয় আনন্দও আস্বাদন করতে পারি।

অবশ্যই আমাদের সত্যের দিকে এগুতে হবে। সত্যে পৌঁছবার অনেক পথ রয়েছে। জীবাত্মা ক্রমোন্নতির একটা বিশেষ প্রবণতাকে ধরে চলেছে, পথে চড়াই উৎরাই আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উন্নতি হওয়া চাই। গতিতে একটা শৃঙ্খলা থাকা উচিত। আমাদের ধারণাগুলি যেন স্বচ্ছ ও নিয়মবদ্ধ হয়। প্রথম প্রথম শিশুসুলভ সরল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তা যেন অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট না হয়। যত এগিয়ে যাবে, আমাদের দিব্য উপলব্ধি যেন গভীর থেকে গভীরতর হয়।

প্রথম পদক্ষেপ হবে, আপন অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। ঈশ্বর, জীবাত্মা ও বিশ্বের সঙ্গে আপন সম্পর্ক কি তা বুঝে নাও। শুরুতে আমরা যে যেখানে আছি সেখানে থেকেই জীবনের কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। আমাদের নিজ নিজ বিকাশ যেমন যেমন হতে থাকবে, তেমন তেমন আমাদের কর্তব্যবোধেরও বিকাশ হবে—কিন্তু পবিত্রতা ও ঈশ্বরভক্তিই হলো মূল সূত্র। আগে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে, আমরা মূলত কি সে সম্বন্ধে, ধারণা স্পষ্টতর হওয়া চাই, তারপর আমাদের চিন্তা করতে হবে, নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন কিভাবে আনা যায়। পরিবর্তন কদাচিৎ সমান ভাবে হয়ে থাকে। উন্নতি অবনতি তো আছেই, কিন্তু আমাদের উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে, আমরা যেন আরো ভাল হই। যদি কোন কারণে আমাদের অবনতি ঘটে, তবে আমরা যেন অবশ্যই আবার উন্নতির দিকে এগিয়ে চলি। আমাদের মনোভাব নানা রকমের হতে পারে; কিন্তু তার মধ্যে শান্ত আধ্যাত্মিক ভাবটি যেন অবশ্যই প্রভাবশালী হয়। ক্রুদ্ধ হলেও, সমস্ত মনটি যাতে ক্রোধের বশে না আসে অন্তত সে চেষ্টাটুকু আমাদের করা উচিত। মনের কিছুটাকে সংযত রাখ। কিভাবে প্রভাব মুক্ত থাকা যায় তা শিক্ষা কর। তোমার মানসিক সাম্য বজায় রাখ। প্রকৃত ধর্ম পালনে কি তা সম্ভব হতে পারে?

উন্নততর কোন অবস্থা লাভের জন্য—আত্মানুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষায়—প্রত্যেক মানুষ অস্থির হয়ে থাকে। আত্মানুভূতির আকাঙ্ক্ষারূপ সত্যটি অন্তরের গভীর অন্তস্তলে বিদ্যমান। সাময়িকভাবে আমরা তা ভুলতে পারি, কিন্তু আত্মার জন্য ব্যাকুলতা আবার দেখা দেয়।

* * *

নিজের সম্বন্ধে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব ঃ (ক) আমি শরীর; (খ) আমি মন; (গ) আমি চৈতন্যস্বরূপ—আমার নিজ চিন্তার সাক্ষী। প্রথম তত্ত্ব হলো আত্ম-সচেতনতা, আমি *আছি*। তোমার কাছে এর অর্থ কি, তা অনুধাবন কর।

মন হলো চৈতন্যের—আমাদের প্রকৃত আত্মার—যন্ত্রস্বরূপ। আমি দেখি ঃ কিন্তু কিভাবে সঠিক দেখা যায় তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা প্রায়ই ভুল দেখে থাকি, রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে। অন্তর্নিহিত সংস্কার মনকে রাঙিয়ে দেয়। মনের এই অনুরঞ্জনের মাত্রা হ্রাস কর। বস্তুকে তার আপন রূপে দেখতে চেষ্টা কর।

* * *

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? যে ঈশ্বর এখন আমাদের অন্তরে বিরাজমান, তাঁকেই আমাদের প্রয়োজন। তিনি হলেন আমাদের সকলের মধ্যে যোগসূত্র। এ কথাটি আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, আর অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন হয়ে পড়ি। আমরা যেন সমুদ্রে বুদ্বুদের মতো—যারা সাধারণ মৌল পদার্থটির কথা ভুলে গেছে। ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যোগসূত্রটির সন্ধান করাটাই ব্যবহারিক ধর্ম।

অথবা নিজেকে বৃত্তের ভেতর একটি বিন্দুরূপে কল্পনা কর। বৃত্তের মধ্যে এমন কোন বিন্দু নেই যেখানে ঐ বৃত্তের অস্তিত্ব নেই। আমরা পরস্পর যুক্ত আছি ঐ বৃত্তের মাধ্যমে, সরাসরি নয়। ভাবটি হলো সকলকে একই চোখে দেখা। ব্যক্তি জীবনকে উন্নততর জীবনে রূপান্তরিত কর। কিন্তু বদান্যতার প্রথম প্রকাশ আপন গৃহেই হওয়া উচিত। প্রথমে অন্তর্যামী ঈশ্বরের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন কর। মানব সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক যেমন পরিবর্তনশীল, বিশ্ব সত্তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের তেমন কোন পরিবর্তন কখনো সাধিত হয় না। মৃত্যু ধ্বংস নয়। এ কেবল আমাদের স্থান পরিবর্তন। আত্মা এমনই বস্তু যা অপরিবর্তনীয়।

* * *

ভাল মন্দ আছে, আর আমরা কখনো কখনো প্রকৃত সত্যের আভাস পেয়ে থাকি, যা ভালও নয় মন্দও নয়। যা আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়ক তাই ভাল, যা ক্ষতিকারক তা মন্দ। আমাদের ভেতর যেসব মৌলিক উপাদান রয়েছে, তার কিছু ভাল আর কিছু মন্দ। মন্দগুলিকে সরিয়ে দিয়ে ভালগুলি নাও, আর পরে ভাল-মন্দের পারে যাও। আমরা অন্তত আদর্শের দিকে এগোতে পারি, আর পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করতে পারি।

কিছুতে আসক্ত হয়ো না। কিছুতেই উতলা হয়ো না। দৃশ্যমান জগতের পেছনে যে সত্যবস্তু রয়েছে তাকে দেখার চেষ্টা কর। আমাদের দরদী হওয়া উচিত, কিন্তু অন্ধ হওয়া নয়। অসীম সহানুভূতিসম্পন্ন হও। বেদনা ও বিষাদ এক ধরনের শিক্ষা; তাদের সহ্য কর। দুঃখভোগের মাধ্যমে হলেও ঈশ্বরমুখী হও। সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাও আমাদের ঈশ্বরমুখী করে।

অবশ্যই আমাদের আপন সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলতে হবে। সুর না মিললে

আমরা অন্যের বেদনার কারণ হব। তোমার দেহ আর মন যেন এক সুরে বাঁধা থাকে। এর প্রয়োজন রয়েছে আমাদের ভাবাবেগকে উন্নততর খাতে প্রবাহিত করার জন্য। সেগুলিকে দমন করলে, তারা বার বার ছিদ্র পথে প্রকাশ পাবে। দমন অথবা সংযমনই যথেষ্ট নয়।

বন্ধুরা কতকটা সমসুরে বাঁধা থাকে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি দেখাও, উচ্চস্তর থেকে। কখনো কখনো অন্যদের সঙ্গে তোমার মতভেদ হবে বা তোমাকে অন্যদের ধমকাতে হতে পারে, কিছুটা আত্ম-সংযম রক্ষা করে। তাহলে এ থেকে বিবাদ বা ভুল বোঝাবুঝি হবে না। যদি আমাদের অন্তরে ঐকতান বাজতে থাকে, তবে অন্যেও ঐ সুর-সাম্যে প্রভাবিত হবে। যদি আমরা অস্থির হই, তবে আন্তর ও বাহ্য দু-রকম ঝঞ্ঝাটেই আমাদের পড়তে হবে।

প্রথমত নিজেদের সম্পর্কে একটি আধ্যাত্মিক মনোভাব আমাদের অবশ্যই থাকা চাই, আর কেবল তখনই নিজেদের সঙ্গে ঈশ্বরের এবং অন্য লোকের যথাযথ সম্পর্ক আমরা গড়ে তুলতে পারি।

* * *

প্রথমত আমাদের বৌদ্ধিক প্রত্যয় সৃষ্টি করতে হবে। পরে সেই প্রত্যয়কে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বিশ্বাসকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে আমাদের কাজ ও চিন্তার মাধ্যমে; আমাদের অবশ্যই তদনুযায়ী জীবনযাপনও করতে হবে। ধর্ম নিয়ে অত্যধিক কথা হয়ে থাকে। কথা যত কম বলা হয়, ততই ভাল। আসুন আমরা কাজ করি, আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করি। অল্প কিছু লোকেই প্রকৃত ধর্ম লাভ করতে পারে। তত্ত্ব নিয়ে কথা অত্যন্ত বেশি হয়ে থাকে। তাকে কাজে পরিণত করা দরকার।

সত্য একটিই, কিন্তু সত্যে পৌঁছবার পথ অনেক। নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আমরা এগিয়ে চলি। সত্যের আভাস আমাদের অবশ্যই পেতে হবে। পূর্বতন পদচিহ্ন সব রয়েছে, সেগুলিকেই অনুসরণ করতে পারি। ভাবগুলিকে আয়ত্ত করতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। আদর্শকে নামিও না, নিজে ঐ স্তরে উঠে আমাদের অবশ্যই আদর্শের দিকে ধীর গতিতে, ধাপে ধাপে, এগোতে হবে। উন্নত থেকে উন্নততর, স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর ভাব ও কল্পনার অধিকারী হও। এগিয়ে চল, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণের দিকে।

* * *

প্রথম ধাপ হলো তাঁকে আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করা; পরে অন্যের অন্তরেও। তখন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আসে, নতুন সহানুভূতি। মানসিক বৃত্তিগুলির প্রশিক্ষণের

পর, ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেই হবে; এবং প্রার্থনা, ধ্যান, কর্তব্য সম্পাদন ও আত্ম-সংযমের মাধ্যমে ওগুলির উন্নতি সাধন করতেই হবে। অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রচণ্ড তেজের প্রয়োজন।

মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, কিন্তু তাদের সকলের লক্ষ্য এক ঃ জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের যোগসূত্রটিকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের একত্বকে উপলব্ধি করা।

নিঃস্বার্থ কর্ম ঈশ্বরলাভের একটি পথ। এর সঙ্গে বিশ্বাস যুক্ত হলে, এ কাজ আরো সহজ হয়। সমুন্নত মনোভাবের এক মহৎ আধ্যাত্মিক মূল্য আছে। তারা আমাদের ঈশ্বরের আরো কাছে নিয়ে যায়। কোন কোন লোকের মধ্যে ভক্তিভাবই সব থেকে শক্তিশালী উপাদান। কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে সদসৎ বিচার ও সঠিক কর্মতৎপরতা অবশ্যই চাই। নানা দিকে প্রসারিত বিভিন্ন কর্মক্ষমতার মধ্যে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে। কর্মশক্তিগুলির ঊর্ধ্বে ওঠ, আর সত্যকে জান। আত্মা যেন আমাদের অনুপ্রেরণা দেন আর পথ দেখান।

ইহজীবনেই মুক্ত হওয়া, মৃত্যুর পূর্বেই মুক্তি লাভ করা, আমাদের লক্ষ্য। মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ, তাই এই জীবনেই যাতে মুক্তি লাভ হয়, সেজন্য নিবিষ্টতম প্রয়াস পেতে হবে। মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বরলাভ করাই তোমার লক্ষ্য হোক। সাধন করতে থাক, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চল। যতদিন আমাদের অহংবোধ রয়েছে, দায়িত্ব আমাদের। অবশ্যই আমাদের সাধন করতে হবে ও পূর্ণ শুদ্ধতার আরো কাছে পৌঁছতে হবে।

* * *

স্বজ্ঞাই হলো সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এ এক মানসিক বৃত্তি, যা নিজেকে শুদ্ধ বুদ্ধি ও হৃদয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। অবশ্যই ভক্তিকে সর্বদা বুদ্ধির দ্বারা সংযত রাখতে হবে, হৃদয়াবেগকে সর্বদা বুদ্ধির দ্বারা চালিত করতে হবে। হৃদয়াবেগ ও বুদ্ধির মধ্যে সংগতি রাখতে হবে, আর নিছক হৃদয়াবেগ অথবা নিছক বুদ্ধিবাদই যেন আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার অবকাশ কখনই না পায়।

উচ্চতর মানসিক বৃত্তি, স্বজ্ঞা—আমাদের সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শনের, প্রত্যক্ষানুভূতির, দিকে পথ দেখায়। কিন্তু প্রথমে স্বজ্ঞাশক্তিকে অবশ্যই জাগিয়ে তুলতে হবে। এই শক্তি আমাদের মধ্যে আগে থেকেই রয়েছে, কিন্তু মনের মলিনতায় ঢাকা পড়ে গেছে। সত্যানুভূতি লাভ করতে হলে মনকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। এতে আমরা অন্তত সত্যের আভাস পাব। অস্পষ্ট স্বজ্ঞাকে নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ স্বজ্ঞায় উন্নীত করতে হবে। প্রতিটি জীবেরই অন্তরে দেবত্ব নিহিত রয়েছেন। আমরা যেন আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের কথা সর্বদা মনে রাখি।

* * *

হৃদয়াবেগের দ্বারা ভেসে যাওয়া আমাদের অবশ্যই উচিত নয়। এতে ভয়ানক বিপদ ঘটতে পারে। সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চিন্তার প্রয়োজন আছে। তোমার মনোভাবকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। প্রথমে বাইরের সৎ প্রেরণা প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আমাদের অন্তর্নিহিত উদার প্রেরণার গুরুত্ব আরো বেশি। অন্তরের আলোক প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রবলভাবে ব্যাকুল হও। ঐ আলোক তোমার অন্তরেই রয়েছে। অন্তর্নিহিত আলোক প্রকাশের জন্য তোমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য চাই।

প্রতিটি কাজ সেবা-ভাবে শুদ্ধভাবে করতে হবে।

চেতন ও অবচেতন—দুরকম চিন্তা স্রোত বইছে। যখন কাজ করবে চেতন স্রোতকে কাজের দিকে আর অবচেতন স্রোতকে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে রাখবে। কাজ শেষ হলে, দুটি-স্রোতকেই ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দাও।

* * *

আমাদের মনঃ-শারীরিক শক্তিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ও অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এখন শক্তির অপচয় হচ্ছে। শক্তির অপচয় হতে দিও না। শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

নতুন নতুন খাত সৃষ্টি করা যেতে পারে, যাতে শক্তি-স্রোত বৃদ্ধি পায়। বাজে কাজ, বাজে কথা এবং বাজে গল্প ও বাজে চিন্তা আগাছার মতো। সেগুলিকে উপড়ে সরিয়ে ফেল। তাহলে প্রয়োজনীয় কাজ করার অবকাশ পাওয়া যাবে।

অধ্যাত্ম সাধনের সময় শারীরিক বা মানসিক কোন অস্থিরতা অবশ্যই থাকা উচিত নয়। অভ্যাস করতে করতে একাগ্রতা গভীর হয়। একাগ্রতার মাধ্যমে শক্তিপ্রবাহের খাতগুলি পরিষ্কৃত হয়।

আমাদের অবশ্য মূল সৃজন-শক্তির সংস্পর্শে আসতে হবে। আমাদের কাজ হবে—কিভাবে আরো কম বাধাযুক্ত, আরো বেশি ভাল খাত হওয়া যায়, অর্থাৎ কি করে আরো বেশি সৃজন-শক্তি লাভ করা যায়—তার চেষ্টা করা। একটি নিম্নতর মনঃশক্তি রয়েছে, আবার একটা উচ্চতর মনঃশক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে। আমাদের সাধারণ ধরনের চিন্তা হয়ে থাকে নিম্নতর শক্তির সাহায্যে। অনুশীলনের অভাবে আমাদের উচ্চতর বৃত্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই আমরা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে অসমর্থ হয়ে পড়ি।

* * *

উষাকালই পূজা, আধ্যাত্মিক সাধন ও ধ্যানের প্রকৃষ্ট সময়। মনকে নেতিবাচকভাবে নয়, ইতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, কিছু উচ্চ চিন্তার খোরাক দিয়ে। সব সময়ে মনে একটি মূল চিন্তা প্রবাহ যাতে চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের আশু লক্ষ্য কি? সত্যের সংস্পর্শ লাভ। যাকেই আমরা সত্য বলে থাকি, তাই আমাদের সর্ব সত্তাকে আকর্ষণ করে। সেজন্য আমাদের পক্ষে সত্য সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। লক্ষ্য ও পথ দুটিকেই সত্য হতে হবে। এমনকি আমাদের কল্পনাগুলিও যেন সত্য-বিষয়ক হয়।

অবচেতন চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে যথাসম্ভব দাবিয়ে রাখ। চিন্তার নিয়মগুলি আমাদের অবশ্য জানতে হবে, আর চিন্তা ও কাজ সচেতনভাবেই করতে হবে।

যুক্তি-বিচারের প্রয়োজন আছে। এর মাধ্যমেই এর ওপারে, বিচারের অতীত সত্যে, আমাদের অবশ্যই পৌঁছতে হবে।

সাধনের দ্বারাই একাগ্রতা লাভ করা যায়। ধ্যানের পর ঐ ভাবের অন্তত একটু রেশ যেন বজায় থাকে। অন্তরের মন্দিরে একটি ছোট আলো যেন সর্বদা জ্বলতে থাকে।

* * *

প্রথমে যীশু, বুদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখ। পরে শুদ্ধসত্ত্ব মানবের মধ্যে তাঁকে দেখ। যারা পবিত্র নয়, তাদের মধ্যে যে ঈশ্বর রয়েছেন তাঁকেও প্রণাম কর, কিন্তু সর্বদা দূর থেকে। আমরা এত দুর্বল যে, তাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করলে আমরাও তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হব। আমরা যেন সাবধান হই। আমরা যেন শক্তির তারতম্য বুঝতে সচেষ্ট হই এবং নিজ নিজ শক্তির সন্ধানে যত্নবান হই।

পাছে মন্দের প্রভাব তোমার ওপর পড়ে, সে বিষয়ে সর্বদা যথাযথভাবে সাবধান হবে। সাময়িক ভাবে আমরা পালিয়ে যেতে পারি। এটা কি দুর্বলতা? কিছু মানসিক জটিলতাকে দানা বাঁধতে দেওয়া যেতে পারে, মনের আরো বেশি মন্দ জটিলতাকে এড়ানোর জন্য।

মন যেন বায়ু-চাপ-মান যন্ত্র। যদি মনে হয় তুমি মুষড়ে পড়েছ, সতর্ক হও। জীবনে প্রায়ই আপস রফা করতে হয়, না করে উপায় থাকে না। নিজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলে জটিলতা এড়ানো সম্ভব। বেশি মন্দকে দমন করতে, কখনো কখনো অল্প মন্দের ব্যবহার অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি ব্যাপারকে তার নিজ গুরুত্ব অনুযায়ী বিচার করতে হবে।

অধ্যাত্ম-সাধন যেন মনে মনে বরফের ওপর দৌড়। আস্ফালনের ফল পতন। কখনো মনে করো না যে, তুমি খুব বড় বা খুব নিরাপদ।

পার্থিব সম্পদের ব্যবহারে অন্তরের সতর্কভাবকে শিথিল হতে দিও না। লোকের সঙ্গে মেশবার একটা রীতি আছে ঃ যখন অপবিত্র ও দুষ্ট-মনা লোকের সংস্পর্শে

আসবে, সব সময়ের জন্য অন্তরে একটি বেড়া দিয়ে রাখ—ঢালের মতো ব্যবহারের জন্য।

ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা কর, আর তাঁর মাধ্যমে অন্য সকলের সংস্পর্শে। বিন্দুটি যেন বৃত্তের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, কেবল তারপরেই তা অন্য সব বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হবে। ঠিক যেমন প্রত্যেকটি বিন্দুর মধ্যে বৃত্তটির অস্তিত্ব রয়েছে, ঈশ্বর সর্ব জীবের মধ্যে ঠিক সেভাবেই অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন। পূর্ণের মাধ্যমে অংশের সংস্পর্শে এস।

* * *

অধিকাংশ লোক ঈশ্বরের প্রতি তাদের কর্তব্যের অবহেলা করে। অধিকাংশ লোক ভাল প্রয়োজনীয় চারার বদলে আগাছার চাষ করে। আমরা যদি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হতে চাই, তাহলে আমাদের জীবনযাত্রার সূত্রগুলিকে একেবারে পাল্টাতে হবে। মনে শুদ্ধ ও উদার চিন্তাই পোষণ কর এবং সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে সমসুরে বাঁধা থাকতে চেষ্টা কর।

আমাদের উচিত আধ্যাত্মিক মনোভাবকে আমাদের কাছে স্বাভাবিক করে তোলা। অন্তত মনের একটা অংশকে সর্বদা ঐ উচ্চভাবে তুলে রাখা উচিত। প্রত্যেক লোকেরই একটা মূল চিন্তাস্রোত থাকা অবশ্যই উচিত। সে চিন্তা, ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক বা ঈশ্বরলাভের জন্য জীবাত্মার ব্যাকুলতা সম্বন্ধে হতে পারে, অথবা তুমি যে সাক্ষিস্বরূপ আত্মা, সে বিষয়েও হতে পারে। অথবা সব সময়ে পবিত্র নাম জপ করতে থাক; ঐ শব্দ অনুরূপ পবিত্র চিন্তার উদ্রেক করে।

* * *

আমাদের কাজ হলো, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ স্থাপন করা। এর জন্য চাই অন্তর্দৃষ্টি। অধ্যাত্ম সাধনা থেকে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। আমাদের চেতনা-কেন্দ্রটির খোঁজ অবশ্যই করতে হবে। প্রত্যেকটি উচ্চ চেতনা-কেন্দ্র, আমাদের ঈশ্বরের এক একটি ভাবের সংস্পর্শে এনে দেয় এবং শেষে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগের পথে অগ্রসর করিয়ে দেয়। যে মানব সত্তা ঈশ্বরোপলব্ধি করেছেন, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটেছে।

ধর্মের কার্যকর ভূমিকা নিয়েই আমাদের মূলত ব্যাপৃত থাকা উচিত। ধর্ম যদি কেবল তত্ত্ব-আলোচনায় পর্যবসিত হয়, আর মানবের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান না করে, তবে তা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। ধর্ম শিক্ষা দেবে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম জগতের রীতি-নীতি। ক্ষুদ্রাণ্ডের প্রকৃতি জান, পরে জানতে পারবে বিশ্ব-প্রকৃতি কেমন। নিজের মধ্যেই আমরা ঈশ্বরকে পাই।

মূল ভাবটি হলো, বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান, জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে সমুদ্রকে চিনতে পারা। বুদ্বুদকে তার নিজ বুদ্বুদ-প্রকৃতি সম্বন্ধে অবশ্যই স্পষ্টভাবে অবহিত হতে হবে। কেবল তখনই তাকে খুঁচিয়ে দিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে একত্বে আনা যাবে।

কোন কোন বুদ্বুদ সরাসরি সমুদ্রের সঙ্গে একত্বে আসতে চায়, আর পর্বত-প্রমাণ ঢেউগুলিকেও গ্রাহ্য করে না। সেই রকম কোন কোন জীবাত্মা চায় অনন্তের মধ্যে লীন হতে, আর বুদ্ধ ও খ্রীস্টের মতো শ্রেষ্ঠ আচার্যদের পূজারও মূল্য দিতে চায় না। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে নিরাকার চৈতন্যে পৌঁছবার জন্য এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগুলির সাহায্য দরকার।

* * *

অধ্যাত্ম-সাধন আরম্ভের পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো ঃ সংযত জীবন, পরিমিত আহার, ব্যায়াম ও প্রাণায়াম। আহার সম্বন্ধে যা তোমার হজম হয় কেবল তাই খাবে। প্রত্যেক সাধককে অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে তার পক্ষে কি ভাল। ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে। তোমার পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের যত্ন নেবে। মানসিক ও শারীরিক নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব রয়েছে। প্রত্যেকটি ধাপ সচেতনভাবে বুঝে অনুসরণ কর--যন্ত্রিকভাবে নয়। সঠিক ভাবের বিকাশ ঘটাও। শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর দাও। এতেই মানসিক একাগ্রতার কতকটা হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত হলে মনও নিজের মধ্যে ফিরে আসবে।

* * *

নিজ নিজ অন্তরে যে স্থির চেতনা-কেন্দ্রটি রয়েছে তার অনুসন্ধান আমাদের অবশ্যই করতে হবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাচ্যে নানা প্রতীকের ব্যবহার রয়েছে, যা পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রায়ই বোঝে না। সাতটি চেতনা-কেন্দ্র রয়েছে। ক্ষুধার উদ্রেক হলে পাকস্থলীর অস্তিত্ব বোধ করা যায়, মানসিক আবেগ এলে হৃদয়ের অস্তিত্ব বোধ হয়। সর্বদা চেষ্টা করবে, মন যেন হৃদয়ের নিম্ন স্তরে না নামে বরং ললাট দেশে, বুদ্ধি-কেন্দ্রে ওঠাবার চেষ্টা চালাবে। যারা আবেগপ্রবণ তাদের পক্ষে মস্তিষ্ককেই চেতনা-কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা ভাল; সাতিশয় ধীমান ব্যক্তিদের পক্ষে হৃদয়। এই কেন্দ্রগুলিকে গ্রহণ করতে হবে, শারীরিক ভাবের থেকে মানসিক ভাবের দিকে বেশি লক্ষ্য রেখে।

কল্পনা কর, স্নায়ু কেন্দ্র সহ মেরুদণ্ডটি যেন একটি সোপান শ্রেণী। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাস্তরগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ। স্নায়ু প্রবাহ ওপরে উঠছে আবার নিচে

নামছে। প্রথমে তোমার চেতনা-কেন্দ্র স্থির করে নাও। অনুভব করতে থাক সেখানে অনন্ত আকাশকে, যার কেন্দ্রে রয়েছে তোমার চেতনা-বিন্দুটি। কখনো নিচের দিকে টান পড়বে; তুমি নিম্নতর কেন্দ্রে সরে যাবে। একে নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল শিখে নাও। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আমাদের মধ্যেই রয়েছে, ভর-কেন্দ্রও রয়েছে আমাদের মধ্যে।

কল্পনা কর, ঈশ্বর যেন জ্যোতিঃস্বরূপ, কিন্তু তা ভৌতজগতের জ্যোতির মতো নয়। অনুভব করতে থাক চেতনা-কেন্দ্রটি যেন জ্যোতিষ্মান। প্রতীকের সাহায্য নিতে পারা যায়। কিছুটা কল্পনার আশ্রয়ও নেওয়া যেতে পারে। প্রতীকের সাহায্য আমাদের উচ্চতর স্তরে, সত্যের আরো নিকটে, পৌঁছে দেয়। কল্পনা কর, দেবতার জ্যোতির্ময় মূর্তি তোমার চেতনা-কেন্দ্রে বসে আছেন। অথবা কল্পনা কর, তুমি যেন পাখি দিব্য গগনে উড়ছ। এতে তোমার অনন্ত বিস্তারের অনুভূতি হবে। অথবা কল্পনা কর, সমুদ্র ও বুদ্বুদ এবং তাদের একত্বের কথা। বুদ্বুদের কাজ হলো, তার সঙ্গে সমুদ্রের একত্ব অনুভব করা। বুদ্বুদে ছিদ্র করে দিলে তা সমুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

কোন পবিত্র শব্দ-প্রতীকের জপ এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থবোধের অনুধ্যান হলো প্রকৃষ্ট ফলপ্রদ সাধন-পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি। এই মানসিক ক্রিয়াই ধ্যানে পর্যবসিত হয়, যার অর্থ নিরবচ্ছিন্নভাবে একই চিন্তাস্রোতকে রক্ষা করে যাওয়া, যা নিয়ে যায় ঈশ্বর-লীন অবস্থায় এবং পরিশেষে জ্ঞানোন্মেষে ও জীব-ঈশ্বরের যথার্থ মিলনে।

সাধককে অবশ্যই শরীর-মনে সমতাল ও ছন্দ আনতে প্রয়াসী হতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম হতে পারে। কিন্তু সকলকেই শরীর ও মনের মধ্যে সুরসঙ্গতি-বিধানের চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে।

* * *

ঈশ্বরের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আমাদের অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। তাঁকে পিতা, প্রভু, মাতা, সন্তান বা প্রেমাস্পদরূপে দেখা যেতে পারে; আবার তাঁকে আমাদের সকল আত্মার আত্মারূপেও দেখা যেতে পারে। আমাদের প্রকৃত আত্মা, শরীর ও মন থেকে স্বতন্ত্র এক আধ্যাত্মিক সত্তা। আমাদের অবশ্যই সর্বদা চেষ্টা চালাতে হবে চিন্তার মাধ্যমে আত্মভাবটিকে ধরে রাখতে ।

ধ্যানের পূর্বে—নিজেকে ঈশ্বরের অংশ বা ঈশ্বরের সন্তান রূপে ভাবার চেষ্টা কর; বলতে থাক, 'আমি একটি আধ্যাত্মিক সত্তা মাত্র।' তোমার ইচ্ছাকে ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দাও। আমাদের মৌলিক দিব্য প্রকৃতিতে লিঙ্গভেদ নেই। আমাদের নেই কোন পার্থিব সম্পর্ক—যা গড়ে ওঠে শরীরকে অবলম্বন করে। আমরা

ঈশ্বরেরই এক একটি বিকার। ঈশ্বর হলেন বৃত্ত আর আমরা হলাম কতকগুলি বিন্দুর মতো।

আমাদের ঈশ্বর-প্রীতি নেতিবাচক হওয়া উচিত নয়, বরং ইতিবাচক, সৃষ্টিধর্মী হওয়া উচিত। আসুন আমরা ঈশ্বরের পূজা করি, তাঁর সেবা করি, কিন্তু তা কেবল তাঁর ঈশ্বরীয় রূপেরই যেন না হয়—যতরূপে ঈশ্বরের বিকাশ ঘটছে সে সব রূপেরও যেন পূজা ও সেবা হয়।

আমরা যখন নিজেদের ঈশ্বরের সন্তান বলে মনে করি, প্রথমে এটি কল্পনা মাত্র, পরে তা সত্য হয়ে দাঁড়ায় অভিজ্ঞতারূপে। আমরা পূর্ণের অংশ—এ ভাবটি, অধ্যাত্ম-জীবনের শুরুতে, কল্পনা মাত্র। এ ভাবকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে অধ্যাত্ম-সাধনা ও অনুভূতির মাধ্যমে।

অধ্যাত্ম-জীবন সম্বন্ধে আমাদের অবশ্যই এক সর্বগ্রাহী ভাব গ্রহণ করতে হবে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বিভিন্ন পথে হতে পারে। তার মধ্যে ধ্যান একটি, প্রার্থনা আর একটি, নিষ্কাম কর্ম আর একটি। তেমনই একরূপে ঈশ্বর সৃষ্টি করছেন, একরূপে ঈশ্বর পালন করছেন, আর একরূপে ঈশ্বরই সংহার করছেন।

কেউ কেউ স্বাভাবিক অদ্বৈতভাবের প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা বুদ্বুদ হয়ে থাকতে চায় না কিন্তু সমুদ্র হয়ে যেতে চায়। সাধক যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এর কোন একটি ভাব নিয়ে সাধন পথে এগিয়ে যায়, তবেই ঈশ্বর-কৃপায়, সে সর্বভাবে অবস্থিত ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারে। ঈশ্বর সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলুন। প্রত্যক্ষজ্ঞান তাত্ত্বিক জ্ঞানের থেকে ভাল।

* * *

আমাদের সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বর কৃপার বিকাশ ঘটতে পারে। যখন আমরা তাঁকে পাব, তখন আমরা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শান্তির অধিকারী হব। ঈশ্বর বলেন— 'এস আমার কাছে। আমি তোমাকে আত্মজ্ঞান ও আনন্দের অধিকারী করে দেব।' আমরা যেন ঈশ্বরের এই ডাকে সাড়া দিই।

দু-রকম ভক্ত আছে ঃ

১। বানর ছানার মতো

২। বেড়াল ছানার মতো

যারা বানর ছানার মতো, তারা নিজের চেষ্টায় মাকে আকড়ে ধরে থাকে, আর যারা বেড়াল ছানার মতো তারা মায়ের ওপর সব ছেড়ে দেয়, আর ভক্তের যা কিছু প্রয়োজন সবই মা করেন। কেউ নিজ সাধনার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়, কেউ

বা আত্ম-সমর্পণের ওপর। আবার কেউ বা ঈশ্বরের সামনে নতজানু হতে চায় না। তারা সব রকম সীমার ঊর্ধ্বে উঠে তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে চায়।

ভক্ত মনে করে ঃ আমি তোমার। জ্ঞানী মনে করে ঃ আমিই তুমি। ভক্ত ও জ্ঞানী দু-জনেরই ঈশ্বরের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, অনন্তের জন্য গভীর তৃষ্ণা রয়েছে। এই দুই ধরনের সাধকের মধ্যে তুলনা কর। প্রথম ক্ষেত্রে ভক্ত বলে ঃ 'আমি কিছু নয়, তুমিই সব'। জ্ঞানী বলে ঃ 'আমি তোমার থেকে পৃথক নই', সে কেবল তার ব্যক্তি-অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে—আর মনে করছে সে আর ঈশ্বর এক সত্তা। তার অহং লুপ্ত হয়ে গেছে। নিম্নস্তরে এই দুই ধরনের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি, উচ্চ স্তরে এই পার্থক্য অতি সামান্য।

আমরা যেন যথাসাধ্য সাধন করে যাই, আর বাকিটা ঈশ্বরই যা করার তা করবেন। আমাদের ভুল-ভ্রান্তি থেকেও আমরা যেন কিছু লাভ করি। যে ভ্রান্তি আমাদের অধিকতর প্রাজ্ঞ করে তোলে, তা আমাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। আন্তরিকতা পুরস্কৃত হবে। আমাদের আন্তরিকতার ওপরেই ঈশ্বরের নজর থাকে।

* * *

অধ্যাত্ম বিষয়েও চাওয়া ও পাওয়ার মতো সর্বসাধারণ নিয়মটি প্রযোজ্য। আমাদের যা দরকার ঈশ্বর আমাদের তা দেন; আমরা যা চাই, তা নয়। ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন হলেও তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না। তিনি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকট করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করেন। এই হলো ভগবৎ কৃপা।

আন্তরিক হও, আর আপন চেষ্টার ফল তাঁর ওপর ন্যস্ত কর। ফলের থেকে আমাদের আন্তরিক চেষ্টার গুরুত্ব বেশি। যদি কোন উন্নত মুহূর্তে আমরা ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসি, তখন সবই পাওয়া যায়। আমাদের কর্তব্য হলো ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য প্রয়াসী হওয়া—ধ্যান, নৈতিক সংস্কৃতি, নিষ্কাম কর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে। কর্তব্যজ্ঞানে এগুলি করতে থাক। সর্বদা পবিত্র গ্রন্থ থেকে কিছু পড়। ঐ অধ্যয়নকে দৈনন্দিন অধ্যাত্ম সাধনের অঙ্গ বলে মনে করা উচিত, ওগুলিকে বাদ দিলে সাধন সম্পূর্ণ হয় না। জীবনের সব কর্তব্যই সু-সম্পন্ন করতে হবে। সেগুলি এড়িয়ে যেও না। সেগুলিও আমাদের অধ্যাত্ম সাধনের অঙ্গ, এক রকমের আধ্যাত্মিক অনুশীলন। সব রকমের কাজ কর্মকে অবশ্যই সেবার মনোভাবে করতে হবে। তবেই কাজ পূজায় পরিণত হবে। বল, 'হে প্রভু, আমি যা কিছু করি সে সব তোমারই পূজা, এই জ্ঞানে করে থাকি।'

* * *

তোমার অধ্যাত্ম সাধনে আরো বেশি সময় দিতে চেষ্টা কর, বাজে কথায়, বাজে

চিন্তায় ও মানসিক চঞ্চলতায় যে সময় যায় তা কমাও। তবেই তোমার ধ্যান ভাল হবে, আরো তীব্র হবে, তোমার কাজ কর্মও আরো সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

কেউ কেউ কাজে নিজেকে অতিরিক্তমাত্রায় ডুবিয়ে রাখে। কেউ কেউ আবার কেবল অধ্যাত্ম সাধনাতেই নিজেকে মগ্ন রাখে, কিন্তু ফল পায় না। কাজ ও পূজা পাশাপাশি চালাতে হবে। কর্তব্য কর্ম থেকে সরে থাকবে না। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে সামঞ্জস্য অবশ্যই রাখতে হবে। তোমার কাজকে পূজায় রূপান্তরিত কর; সমস্ত কাজকেই ঈশ্বরোদ্দেশে উৎসর্গ কর।

জীবনে অনেক রকম বোঝাপড়া করার দরকার হয়ে থাকে। সব সময় মনে রাখবে ঃ আমরা সকলেই আধ্যাত্মিক জীব, আধ্যাত্মিক সত্তা, এই শরীরকে আশ্রয় করে আছি। প্রধান ভাবটি এইরূপ ঃ শরীর হলো একটি যন্ত্র, একটি মন্দির, বা নিরাপদ আশ্রয়স্থল; এই শরীরকে আরো কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এটিকে ঈশ্বরের আবাসস্থল রূপে দেখা উচিত। নৈতিক উন্নতির দুটি পথ আছে ঃ

১। নৈতিক নিয়মাবলী অনুসরণ কর।

২। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন কর, তাহলে নিয়মগুলি অনুসরণ করা আরো সহজ হবে। তোমার কর্তব্যকর্ম আরো উন্নত ভাব নিয়ে সম্পন্ন কর।

আমরা সাময়িকভাবে সংসার থেকে অবসর নিতে পারি, এটি একটু স্বার্থপর কাজ হলেও; এর ফলে পরে ফিরে এসে আরো উচ্চতর ভাব নিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে মিশতে পারব। অন্যকে দেবার মতো কিছু সংগ্রহ না করে আমরা সেবার কাজে নামতে পারি না।

* * *

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যানমগ্ন চিত্তে আধ্যাত্মিক স্তোত্রাদি কিছু পাঠ করা দরকার। এ কাজের গুরুত্ব অন্য সব সাধনের মতোই। সেই রকম অধ্যাত্ম সাধনও নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্য কর্তব্য, কখনো পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। এর ফলে ইচ্ছাশক্তির বিকাশও ঘটবে। এর উদ্দেশ্য হলো, আমাদের মানসিক ক্রিয়া-পদ্ধতিগুলিকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

সচেতন জীবনযাত্রা এক মজার জীবন। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অর্ধজাগ্রত আর অর্ধস্বপ্নাচ্ছন্ন। মস্তিষ্কের অচেতন ক্রিয়াকে অবশ্যই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চিন্তায় পর্যবসিত করতে হবে। কেবল তখনই জীবন অর্থবহ হবে। তোমার দেহ-সচেতনতাকে যথাসম্ভব কমাতে হবে।

মনে সজীবতা নিয়ে এস, সর্বদা বালসুলভ মানসিকতা নিয়ে থাক। আবার বালক হয়ে পড়। দ্বিতীয় জন্মলাভ কর। মানসিক সজীবতা আমাদের পেতেই হবে। সচেতনভাবে এর অনুশীলন কর। ঈশ্বরের সঙ্গে সুর মেলাতে চেষ্টা কর। জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে। খাতের পথগুলি খুলে দাও! জানলাগুলি খুলে রাখ! মন্দবাতাস বেরিয়ে যাক! ভেতরে যেন সব সময়ে সজীবভাব বিরাজ করে।

* * *

বেদান্ত প্রতিটি জীবাত্মার অন্তর্নিহিত দেবত্বে বিশ্বাসী। বিশেষ বিশেষ মানুষ অনুযায়ী মানুষের শ্রেণী বিভাগে বেদান্ত বিশ্বাস করে না। প্রত্যেক জীব অবশ্যই স্বাধীন ভাবে তার সহজাত দেবত্বের বিকাশ ঘটাবে। নিজ নিজ ভাব বজায় রেখে অন্য ধর্মের ভাব অঙ্গীভূত করতে চেষ্টা কর। আমরা হিন্দুরা হার্দিক পরিবর্তনে, মানসিক পবিত্রীকরণে বিশ্বাসী, কিন্তু আমরা যতক্ষণ না ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারছি ততক্ষণ কখনই সন্তুষ্ট হতে পারি না। তুমি যদি চাও, একে আমাদের মত বলতে পার। আর ঈশ্বরের মতই আমাদের মত।

প্রকৃত ধর্ম হলো জীবে ও ঈশ্বরে সম্পর্ক। ধর্ম ও দর্শন দুই-ই চাই, আধ্যাত্মিক জীবনে; ধর্ম অনুমানকে আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তর করে, আর দর্শন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারতা নিয়ে আসে। তত্ত্ব ও সাধনকে অবশ্যই পাশাপাশি চলতে হবে। প্রকৃত শান্তি পেতে হলে, ধর্মকে দর্শনের সঙ্গে, বিশ্বাসকে যুক্তির সঙ্গে, দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতার সঙ্গে উদারতার মিলন আমাদের অবশ্যই ঘটাতে হবে। আমাদের সমুদ্রের মতো গভীর ও আকাশের মতো উদার হতে হবে। কঠোর নৈতিক শৃঙ্খলা, নিখুঁত কর্তব্যানুষ্ঠান ও আন্তরিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিই হলো আমাদের অন্তর্যামী পরম চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার উপায়। তোমার মতবাদকে তোমার কাছেই রাখ! অন্যাকে তা মানতে বলবে না! মতবাদের ওপরে ওঠ! ঈশ্বর খ্রীস্টান নন, হিন্দু নন, বৌদ্ধও নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ 'নিজেকে জানলেই তুমি ঈশ্বরকে জানতে পারবে।' প্রত্যেকেই একই জল, জীবন-বারি, গ্রহণ করছে। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। সর্বত্রই ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর! বিভিন্নরূপে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। তিনি এই সব, আরো অনেক। শেষে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন। ঈশ্বরের যে কোন ভাবকে ধর। ঈশ্বরের যে কোন ভাব অনুসরণ কর। মনে রেখো ঈশ্বরের প্রত্যেকটি রূপই এক একটি স্বতন্ত্র বিন্দু। স্বতন্ত্র বিন্দুগুলির বৃদ্ধিকে ছাপিয়ে আরো বড় হয়ে বৃত্তটিকে তথা সর্বানুস্যূত অনন্ত চৈতন্যকে, আবিষ্কার করতে হবে। বৃদ্ধির একটা নিয়ম আছে, তাকেই অনুসরণ কর।

*   *   *

ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার নানা পথ রয়েছে। একটা পথ ধর, তারপর সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে, ঈশ্বরকে ধর। আমাদের জীবনের বিস্তার হওয়া উচিত। সকলের সেবা কর, স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ো না। হৃদয়ের বিস্তার—তাই হলো আত্মবিস্তারের পরীক্ষা, প্রমাণ। অন্যের প্রতি আমরা যেন অবশ্যই সাহায্য বা করুণার মনোভাব পোষণ না করি, পোষণ করতে হবে পূজার মনোভাব। অন্যের প্রতি তোমার সাহায্যকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি তোমার সেবারূপে দেখতে হবে। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা কর, সর্বজীবে যে দিব্য সত্তা রয়েছে তাঁর সেবা কর।

আমাদের আদর্শ-বাণী অবশ্যই হবে ঃ প্রথমে নিজে ঈশ্বর হই, যাতে অন্যের মধ্যে যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, তাঁর সেবা করতে পারি। এ কাজ আমাদের সচেতনভাবে প্রথাপদ্ধতিগতভাবে করতে হবে। কাজ ঠিক ঠিক করতে জানলে, তা ঈশ্বরে সমর্পিত হয়ে যায়। 'জাগো, ওঠো, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না।' আমরা যত অগ্রসর হই, তত বেশি বেশি আনন্দ, শান্তি ও স্বর্গীয় সুখ পেতে থাকি।

আমাদের প্রকৃত সত্তার অনুসন্ধান করতে করতে আমরা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাই। আমাদের অহং তখন ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে যায়, অহং যখন আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হয়, তখনই আমরা মুক্ত। অধিকারবোধের পরিবর্তে আমাদের অছিভাব গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরের মাধ্যমে প্রতিটি যোগাযোগই হয় আমাদের কাছে শক্তিপ্রদ। আমরা যখন লোকের ও বস্তুর সঙ্গে সরাসরি যোগ স্থাপন করতে চাই, তখনই ঝঞ্ঝাট আসে। প্রত্যেক লোককে ও প্রত্যেক বস্তুকে ঈশ্বরে বা ঈশ্বরের মাধ্যমে দেখ। অথবা ভাবতে চেষ্টা কর আমরা সকলেই যেন ঈশ্বরের সেবক, ঈশ্বরের সন্তান।

*   *   *

অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সঙ্গতি বোধ রক্ষা করে চলা কঠিন। শক্তিমান হও, তাহলে অন্যেরা তোমার কাছ থেকে অন্যায় সুবিধে আদায় করে নিতে পারবে না। অত্যধিক অভিমানী, অনুভূতিসম্পন্ন, স্নায়বিক দুর্বলতাগ্রস্ত হয়ো না। প্রত্যেক অধ্যাত্ম সাধককে নিজ অন্তরে যথাযথ প্রেক্ষাপটে একটি চিত্র অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। সকল ব্যাপারকেই যথাসম্ভব শান্তভাবে গ্রহণ কর। সেগুলি যেমন আছে তাদের তেমনিভাবে দেখতে চেষ্টা কর। শান্তির জন্য একটু আধটু বোঝাপড়া করে নিতে পার, তবে মনে রাখবে যে, আমাদের ব্যবহারিক জীবন কতকগুলি মানবিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে। প্রায়ই আমরা অন্যকে খোঁচা দিয়ে বসি। ফলে কোন কোন লোক থেকে কল্যাণকর, ধীর ও শান্ত স্পন্দন স্ফুরিত হয়; অন্যের থেকে স্ফুরিত হয় অশুভ স্পন্দন ও চিন্তা।

নিজের কাছে ও ঈশ্বরের কাছে খাঁটি হবার চেষ্টা কর, তাতে অন্যের কাছে খাঁটি হওয়া সহজ হবে। ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্যবস্তুরূপে দেখ, আর অন্য সকলকে নিজ নিজ অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীলরূপে দেখতে শেখ।

প্রতিটি অবস্থাতে তোমার যা করণীয় তা তোমাকে অবশ্যই করতে হবে। বায়ুশকুনের মতো হয়ো না। তোমার মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি বার বার পরিবর্তন করতেই থেকো না। মানসিক বিপর্যয় আসতে দিও না। তোমার আদর্শ অনুযায়ী তোমার জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। প্রায়ই আমরা অন্যের ওপর বেশি নির্ভর করতে চেষ্টা করি; আমরা তাদের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু আশা করি। কিন্তু নির্ভরস্থল হিসেবে মানুষ বড়ই দুর্বল। কোন কোন লোকের ভর-কেন্দ্র ভেতরে না হয়ে বাইরে থাকে। তোমার ভর-কেন্দ্রটিকে ভেতরে রাখ। উচ্চতর সত্তাকে অবশ্যই তোমার ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র করে তুলবে। কিন্তু তাতে এক বিপদ আছে ঃ আমরা আত্ম-কেন্দ্রিক, অহং-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ি। তাই আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে যে, মানব সত্তা ঈশ্বরেরই অংশ, যে ঈশ্বর আমাদের অন্তরস্থ কেন্দ্র—তিনিই অসীম আকাশেরও কেন্দ্র। ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ বিন্দুটি আমাদের অন্তরেই অবস্থিত। তোমার চেতনা-কেন্দ্রকে ধরে থাক, কিন্তু যে অনন্ত চৈতন্য তার চারিদিকে বিস্তৃত তাকে ভুলো না। প্রথম প্রথম কেউ কেউ অহং-কেন্দ্রিক হয়ে থাকে, পরে বিশ্ব-কেন্দ্রিক হয়ে যায়। অধ্যাত্ম সাধনের সূচনায় কোন কোন সাধক কিছুকাল স্বার্থ-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। এই ভাবের প্রতিষেধের জন্য তাদের কিছু নিষ্কাম কর্ম করণীয়। ধ্যান ও প্রার্থনা ঠিক মতো করলে, তা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের ওপরে তুলে আত্ম-কেন্দ্রিক ও স্বার্থপর না হয়ে ওঠার দিকে সহায়তাও করবে। আমরা যেন কখনও অন্যের ক্ষতি করে নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করি।

* * *

হতাশা ও অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমরা আলোকে পৌছে যাই। আমরা যতই অগ্রসর হই অন্ধকার একটু একটু কমতে থাকে, যতক্ষণ না আমরা আলোয় পৌছই। মহান সন্তগণ ও মরমী সাধকগণকেও কিছুকাল হতাশা ও অন্ধকারের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এই সময়ে উচ্চ চিন্তাই আমাদের রক্ষাকবচ।

আমরা অন্যদের দেখি, কিন্তু নিজের দিকে তাকাই না। এই হলো আমাদের সমস্যা। বেদান্ত বলেন, আমরা আমাদের চিন্তারাশির সাক্ষী। এই সাক্ষীর দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের অবশ্যই আরো উন্নত ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। আমরা যেন আমাদের দ্বিতীয় পুরুষরূপে ধরে নিয়ে নিজেদের বিশ্লেষণ করি। প্রায়ই সাক্ষী নিদ্রিত থাকে। তাকে জাগিয়ে তোল! মনে মন্দ চিন্তা এলে, তাকে খুঁজে বার কর। আমাদের

চিন্তারাশি সাধারণত আমাদের সত্তার অন্তস্তল থেকে ওঠে, কিন্তু বাইরের উস্কানি থেকেও আসতে পারে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যে সব ভোগ্য আহরণ করি তা অবশ্যই শুদ্ধ হওয়া চাই। অতএব সর্বদা সতর্ক থাকবে।

* * *

আমাদের প্রিয় ধারণাগুলি যে মুহূর্তে অসত্য বলে জানা যাবে, তখনই সেগুলিকে ত্যাগ করার জন্য আমাদের পুরোপুরি তৈরি থাকতে হবে। উন্নতি লাভের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই। মৃত্যুর পূর্বে আমাদের অবশ্যই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ কিছু কাজে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে হবে।

এমন কে আছ যে আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য উচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত? আমরা উপায় জানি, আধ্যাত্মিক কৌশলও জানি এবং মহতেরা আমাদের সাহায্য করতেও প্রস্তুত, কিন্তু আমরা এতই উন্মার্গগামী যে, নিজেরা সত্যোপলব্ধির জন্য মাথা না ঘামিয়ে কতকগুলি সূক্ষ্মভাব অবলম্বনে বুদ্ধিবৃত্তির তৃপ্তি সাধনের জন্য—ঐ সৎ-প্রচেষ্টা স্থগিত রাখি। আমরা প্রেম, লোভ, আত্মতুষ্টি-সংক্রান্ত কষ্টদায়ক, ঘৃণ্য, তুচ্ছ সামান্য সব স্বপ্নে মশগুল হয়ে তাদের আঁকড়ে ধরে থাকি—যতদিন না সেগুলিকে আমাদের আওতা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

কয়েক বছর পরে আমরাই নিজেদের প্রশ্ন করি ঃ আমি কি অর্জন করেছি? এ জীবন থেকে আমি কি পেয়েছি? আমাদের সকলেরই এমনভাবে জীবনযাপন করা উচিত, যাতে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন থেকে কিছু সার বস্তু আমরা পাই। আমাদের অন্তরস্থ দিব্য আলোকের অন্তত কিছু ঝলকও আমাদের পাওয়া উচিত। যে কেউ আন্তরিক ভাবে বিধিবদ্ধ আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদি সাধন করে, পবিত্র জীবন যাপন করে ও ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করে—সে কখনো নিরাশ হয় না। এ জগৎ একটি শিক্ষণ-ক্ষেত্র, যে অল্প সময়ের পরিসর আমরা পেয়েছি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমাদের করা উচিত।

* * *

বিষয়ী লোকেরা, আর যারা ব্যক্তিগত বাসনায় আসক্ত তারাই কেবল মৃত্যুভয়ে ভীত। যারা অধ্যাত্মমনস্ক তাদের হারাবার কিছু নেই। তাদের কাছে মৃত্যু হলো অস্তিত্বের স্থূল স্তর থেকে সূক্ষ্ম স্তরে যাওয়া। শরীরেরই মৃত্যু। আত্মার মৃত্যু নেই। এই জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেও, নব থেকে নবতর জীবন লাভ করে নবীভূত উদ্যমে আমরা কাজ করব। ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে আমরা সামনে এগিয়ে যাব যতদিন না জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি।

এই সমগ্র জীবন, আমাদের শরীর ও মন, কার ওপর নির্ভর করে? চৈতন্যের ওপর, কোন নররূপ বা নারীরূপ বা শিশুরূপের ওপর নয়। জীবাত্মা যখনই শরীর ত্যাগ করে, শরীর জীবনহীন হয়ে পড়ে। এর সব মাধুর্য লোপ পায়। কেউই মৃত দেহের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, তা পূর্বে কখনো কমনীয়কান্তি হলেও নয়। প্রকৃতপক্ষে নররূপ বা নারীরূপের মধ্যে যে বস্তু আমাদের আকর্ষণ করে তা হলো চৈতন্য—যাকে আমরা ভ্রমবশত ঐ বিশেষ শরীরের সঙ্গে অভিন্ন বলে গণ্য করি। যদি জীবনকে এতই ভালবাস, তবে জীবন যার ওপর নির্ভর করে আছে, তার খোঁজ কেন কর না? আত্মাকে ভালবাসতে জানা আমাদের আরো উচিত এই কারণে যে, কেবল তাঁর উপস্থিতির জন্যই শরীর ও মনে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু মানুষের বহু বহু বছর, এমনকি বহু জীবন লেগে যায় নিজের ভুলটি বুঝতে ও সত্য উপলব্ধি করতে।

* * *

আমরা আমাদের চারিদিকে চিন্তার একটি শক্ত দেওয়াল তুলতে পারি, বুলেট-প্রুফ পর্দা তৈরি করতে পারি, চারপাশের লোকের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য। আমাদের অন্তর্জীবন যদি শুদ্ধ ও শক্তিমান হয়, তবেই চিন্তার দৃঢ় দেওয়াল গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু এর অর্থ অন্যের প্রতি ঘৃণা ও সমাজে অসামঞ্জস্য নয়। অধ্যাত্ম-জীবনে একটা বড় জিনিস হলো যথাযথ মাত্রাজ্ঞান ও সুষ্ঠু সমন্বয়নের ধারণা। যেখানেই তুমি থাক না, সেখানেই কোন রকম বিবাদ ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না করে, নিজেকে সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নিয়ে চল। তোমার চারদিকে এমন একটি সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি কর, যা প্রত্যেকের অনুভূতি-গোচর হয়। ভক্তের সব কিছুই মাধুর্যপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া উচিত।

বাহ্য পরিবেশ থেকে নিজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন কর। তোমার চারিদিকে যদি বেড়া না দাও, তবে তুমি বাড়তে পারবে না। বিনাশসঙ্কুল ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণি তো সব সময়েই লেগে রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার কচি চারাটিকে ছাগলেও এসে খেয়ে যেতে পারে।

প্রথম প্রথম অতি-সাবধানতা তোমার জীবনকে কাঁচের ঘরে বেঁচে থাকার মতো দেখাবে। তোমার হয়তো এই পরিকল্পনা পছন্দ হবে না, কারণ নিজ আধ্যাত্মিক নিয়তি সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই। কিন্তু যারা বাস্তবিকই অধ্যাত্ম-জীবনে অগ্রসর হতে চায়, তাদের পক্ষে এই কাঁচের ঘরে জীবন কাটানোর প্রয়োজন আছে। যতই হোক এ তো কেবল সাময়িক ব্যবস্থা।

* * *

অধ্যাত্ম-জীবনে অগ্রগতির বহু ধাপ আর অভিজ্ঞতার অনন্ত বৈচিত্র্য রয়েছে। এ জীবন দুঃসাহসিক অভিযান ও বীরত্ব, সৌন্দর্যসমন্বিত এক বাস্তব জীবন, আর যে এগুলি চাইবে তাকে পেছন ফিরে না তাকিয়ে মরণ-বাঁচন উপেক্ষা করে এর অনুসরণ করতে হবে। তুমি যদি কেবল অবিকম্পিত চিত্তে সচেতনভাবে এর অনুসরণ কর, তবে প্রভূত শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হবে।

'কিন্তু ঈশ্বরই তো আমাদের এই সব বাসনা দিয়েছেন!' সত্য, খুবই সত্য, কিন্তু তিনি আমাদের নিজেদের ওপর আধিপত্যের বাসনাও দিয়েছেন। বালি ও চিনি আমাদের ক্ষেত্রে মিশে গেছে।

কেন অনুযোগ কর? আমরাই তো এগিয়ে গিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাই, আর হারাই অন্তর্জ্ঞান বৃত্তিকে, শৈশবেই যার উন্মেষের সূচনা হয়েছিল। তাই আমরা এই বর্তমান অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছি। আমদের পরিবেশের দোষ ততটা নয়। যতদিন না আমরা আমাদের পথ সত্য সত্যই পরিবর্তন করছি ততদিন—'ওহো, দুষ্ট লোকে এ জগৎ ভর্তি! মানুষ কত মন্দ! এরা সব কত অপরাধপ্রবণ!'—এ সব কথা বলে দোষারোপ করা নির্বোধের কাজ। সত্যই জগৎ মন্দ, কিন্তু এ বিষয়ে তুমি কি করতে পার? বরং দেখ কিভাবে তুমি নিজ জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে জগতের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হতে পার। একটি কথা সত্য ঃ হৃদয়ে ঘৃণা ও বিরূপভাব পোষণ করে কোন লোক চৈতন্যের আলোক প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

* * *

আমাদের কর্মফল ভোগ করতেই হবে; আর এর অর্থ আমাদের দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ। কিন্তু প্রকৃত সাধক এতে আনন্দিতই হয়, কারণ সর্বদাই এর অর্থ, একটা মন্দ কর্মের ক্ষয় হলো।

যেমনই ঘটুক, ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান হতে শেখ, আর তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমার নিজের ও ঈশ্বরের ওপর অবিচল বিশ্বাস দেন। প্রভুকেই তোমার সর্বময় কর্তা কর। তখন অন্য কিছু আর তোমার উদ্বেগের কারণ হবে না, যেখানেই থাক জানবে যে, তুমি সুরক্ষিত। পবিত্র হও, আর তাঁর প্রতি তোমার দৃঢ় একাগ্র ভক্তি হোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে পরম চৈতন্যের উপলব্ধি সম্ভব হয়—এইখানেই হলো তাঁর উপদেশের মহত্ত্ব। তিনি তো দেখিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের সাধনার অনুশীলন কিভাবে করতে হবে, কিন্তু কে তাঁকে অনুসরণ করতে চায়? কে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী জীবনযাপন ও সাধনা করতে চায়? কে পরিহার করতে চায়—নিজ নির্বুদ্ধিপ্রসূত পছন্দ-অপছন্দগুলিকে, ব্যক্তিগত

আসক্তি প্রভৃতিকে? কতজন লোকই বা তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদি, জপ ও ধ্যান প্রতিদিন দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে, পূর্ণোদ্যমে তীব্রভাবে করে চলে? বেশির ভাগ লোক এত সব করতে চায় না, কিন্তু তারা আসে আর দোষারোপ করে, 'অহো, এত সব চেষ্টা করেও একটু কিছুও লাভ হলো না।'

আমাদের উঠে পড়ে লাগতে হবে। এই শরীর যন্ত্রটি অতি দুর্বল ও অপটু হয়ে পড়ার আগে আমাদের যথা সম্ভব চেষ্টা করে যেতে হবে। যে সব সাধক আন্তরিকভাবে সত্যোপলব্ধি করতে চায় ও একনিষ্ঠভাবে সত্যের নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্য অফুরন্ত আনন্দ অপেক্ষা করছে।

* * *

আমাদের সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের পেছনে একটি সূক্ষ্ম শক্তি রয়েছে। এই শক্তি সূক্ষ্ম শরীরে সঞ্চালিত হচ্ছে। এই সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে আছে কারণ শরীর, যার অপর নাম আনন্দময় কোশ। তোমার মন যখন শুদ্ধ হবে, তখনই তুমি জানতে পারবে যে, তোমার মধ্যে সূক্ষ্ম শক্তিসকল কাজ করে চলেছে। পাশ্চাত্য মনস্তাত্ত্বিকগণ মনের কেবল স্থূল দিকটাই দেখেন, আর দেখেন তার পার্থিব প্রকাশ। মনের ভেতর ও তার মাধ্যমে যেসব সূক্ষ্ম শক্তি কাজ করে সে সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। আমি পাঁচটি কোশকেই একেবারে স্পষ্ট ও পৃথকভাবে অনুভব করতে পারি।

আধ্যাত্মিক উপাসনা করতে করতে সাধকের যেন একটি নতুন আধ্যাত্মিক শরীর, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির একটি নতুন যন্ত্র গড়ে ওঠে, তারই মাধ্যমে সাধক চরম সত্যের সংস্পর্শে আসে। প্রথমে অবশ্যই আধ্যাত্মিক দর্শনলাভে সক্ষম এমন একটি নতুন মন, একটি নতুন শরীর গড়ে ওঠা চাই, আর এই-ই হলো সাধনার অর্থ ও উদ্দেশ্য।

এর জন্য সর্বোত্তম মানসিক ও শারীরিক পবিত্রতার প্রয়োজন। শুদ্ধ মনই সাকার ঈশ্বরের, নানা ঈশ্বরীয় রূপ উপলব্ধির যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যায়। কিন্তু নিরাকার পরব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য সাধককে অবশ্যই শুদ্ধ মন ও দেহকেও অতিক্রম করতে হবে।

* * *

আমাদের প্রকৃত আত্মসত্তা যেন কতকগুলি পোশাক পরে আছেন। আমরা ঐ পোশাককেই নিজেদের সত্তা বলে ভেবে চলেছি—এইটিই হলো আমাদের পক্ষে যন্ত্রণার কারণ।

যখন ধ্যানে বসবে ঐ পোশাকগুলিকে খুলে ফেলার চেষ্টা কর। চিন্তা করতে থাক, সেই অসীম প্রোজ্জ্বল দিব্য জ্যোতিঃ সম্বন্ধে—যা পূর্ণ করে রেখেছে তোমার চেতনা-কেন্দ্রকে, তোমার অন্য সব উচ্চতর-নিম্নতর কেন্দ্রগুলিকে—সমগ্র বিশ্বকে।

ঐ অসীম আলোকে তোমার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরগুলিকে লীন করে ফেল। এই ভাবে দেহচিন্তা লোপ পায়, কেবল তোমার সত্তা স্বরূপ জ্যোতিঃকণাটি অবশিষ্ট থাকে। শেষে স্ফুলিঙ্গটিও ঐ অসীম জ্যোতিতে বিলীন হতে দাও। যদি তুমি ঐ অবস্থাতে থাকতে পার তবে তাই হবে প্রকৃত *বৈদান্তিক ধ্যান*।

এই জ্যোতিঃ বলতে কোন ভৌত আলোক বোঝায় না। তবু সে ধারণাটিকে তুমি অবশ্যই মনের মধ্যে পোষণ করবে, পাছে তোমার মন একেবারে চিন্তাশূন্য হয়ে পড়ে, কারণ সে অবস্থা প্রবর্তকদের পক্ষে বিপজ্জনক।

ঐ ধ্যানকে দৃঢ় করার জন্য, এবার তীব্রভাবে জপ করতে থাক। ঐ অসীম জ্যোতিঃ থেকে একটি পবিত্র স্ফুলিঙ্গস্বরূপ, একটি জ্যোতির্ময় দেহ যেন সৃষ্টি করলে, ঐ অসীম জ্যোতিতেই আবার তাকে লয় করে দিলে। তুমি যদি চাও, তবে তোমার মনশ্চক্ষুতে—তোমার প্রিয় দিব্য রূপটির ঐ অসীম আলোক সমুদ্র থেকে উত্থান আবার তাতেই লীন হয়ে যাওয়াও দেখতে পার। একে তোমার দৈনিক ধ্যানাভ্যাসের বিশেষ অঙ্গ বলে ধরে নাও। কিছুদিন অভ্যাস করতে করতে দেখবে মাত্র দু-মিনিটের বেশি সময় লাগে না।

প্রতিদিন, জপে বসার আগে, তোমার মনকে এই অনুশীলনের মাধ্যমে চালিয়ে নিয়ে যাও। যদি কোন চিন্তা বা চিত্র তোমার মনে জেগে ওঠে, তাকে ঐ জ্যোতিতে লয় করে ফেল। এই সব চিত্র ও চিন্তা, ভাল ও মন্দ, যা তোমার মনে উঠছে—তাদের বল ঃ 'সমুদ্রে লীন হয়ে বিশ্রাম কর! অথবা আমার সঙ্গে ধ্যান কর, কিন্তু আমাকে আর বিরক্ত করো না!' কখনো কখনো আমরা চিন্তায় অন্যের সঙ্গে বিবাদ করি। তাদের বলাই ভাল যে, 'লীন হয়ে যাও!' নিজ প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি কর!

* * *

আমাদের মানবিক ব্যক্তিত্ব এত জটিলতায় ভরা, আর আমরা তাই নিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে এত সময় নষ্ট করি যে, কখনো অগ্রসর হতে পারি না। একটা ঘূর্ণি পাক খেতে খেতে সারা দিনে যত শক্তির অপচয় করে, তা তাকে পৃথিবী ঘুরিয়ে আনতে পারত। তেমনিভাবে জটিলতার মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে, চৈতন্যলাভকে অগ্রাহ্য করে, মুক্তিলাভকে অগ্রাহ্য করে, আমরা যে শক্তির অপচয় করি, তা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারত।

ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক স্রোত শক্তিশালী, কিন্তু ঘূর্ণি যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ তা কিছু করতে পারে না। নদীর দিকে নজর দিয়ে থাকলে এ ব্যাপারটি তুমি দেখতে পাবে। নদীতে স্রোতও আছে, ঘূর্ণিও আছে, কিন্তু স্রোত যত শক্তিশালীই হোক একটা ঘূর্ণিকে মুছে দিতে পারে না—যার সৃষ্টি নদী-বক্ষের নিচে অবস্থিত কোন একটি

বাধা থেকে। আমাদের জটিলতাগুলি ঘূর্ণি-সৃজনকারী বাধার মতো কাজ করে আমাদের সব শক্তির অপচয় ঘটাচ্ছে।

আমাদের জটিলতাগুলি, আমাদের দৃষ্ট বা অনুভূত বস্তুগুলিকে রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে (তাদের নিজস্ব রং ঢেকে)। আমাদের মধ্যে যে ধরনের জটিলতা থাকে তদনুযায়ী প্রত্যেকটি বস্তুকে বিচার করা হয়। আমরা যত বিষয়ী হয়ে পড়ি, অর্থাৎ আমরা যত নিজ নিজ কামনা-বাসনাকে মূর্ত হওয়ার অবকাশ দি, তত বেশি বেশি জটিলতা গড়ে তুলি, আর মনের মধ্যে থেকে যাওয়া পুরান জটিলতাগুলির শক্তি বৃদ্ধি হয়।

কোন নির্দিষ্ট পথে চিন্তা করার ফলে আমরা কিছু কিছু মন ও শরীরভিত্তিক অভ্যাসের সৃষ্টি করেছি। তাতে যে ক্ষতি হয়েছে, তার সংশোধন দরকার। তা কিভাবে সম্ভব? অত্যন্ত তীব্র বিপরীত-স্রোতবিশিষ্ট চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়ে। এরূপ করা হলে, আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হবে, আর আমাদের সমগ্র জীবন রূপান্তরিত হবে।

* * *

একটি মাত্র একাগ্র, পূর্ণ-সচেতন, আন্তরিক মন্ত্রোচ্চারণ—আনমনা হয়ে শত শত জপ করার সমান। হাজার জপের মধ্যে, একটি হয়তো ঠিক মতো করা হয়ে থাকে। তাই ঈশ্বরের নাম এতবার জপ করতে তোমাদের বলা হয়।

লোকে চা, কফি ইত্যাদি খেয়ে স্নায়ুকে সতেজ করতে চেষ্টা করে। একটি স্বয়ংক্রিয় মাত্রারক্ষক কল সব সময়েই ভাল। অধিকাংশ লোক চায় চালিত হতে; তারা বিগড়ে যাওয়া মোটর গাড়ির মতো হয়ে পড়েছে!

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিজ চেতনা সম্বন্ধে সচেতন নয়। আমাদের তথাকথিত চেতনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, শিথিল, অচেতন ধরনের হয়ে থাকে। আমাদের চেতনা ইন্দ্রিয়পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। এই ছড়িয়ে পড়া বন্ধ কর। পরে তাকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত কর। সেই বিন্দু থেকে বৃত্তের পরিধিতে নিয়ে যাও।

চেতনাই হলো লক্ষ্য; চরম উৎক্রান্তি এর মধ্যেই নিহিত। আমাদের চেতনায় বর্তমান বিস্তার খুবই সঙ্কীর্ণ; এর গভীরতা নেই; এ যেন একখানি কাগজের পাতা। আমাদের চেতনার সমৃদ্ধি হওয়া চাই। প্রথমেই আমাদের উচিত *প্রকৃত* ভাবে সচেতন হওয়া। তখনই কেবল অতি-চেতন অবস্থার প্রশ্ন ওঠে। উচ্চতর চেতনাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনতে হবে। এর অন্তত সামান্যও আমাদের মধ্যে সব সময়ের জন্য বজায় রেখে চলতেই হবে। আমাদের চেতনাকে এমন একটি স্তরে রক্ষা করতে হবে, যার নিচে মনকে নামতে দেওয়া উচিত নয়।

*　　*　　*

*কুণ্ডলিনীর* অগ্নি যখন জাগিয়ে তোলা হয়, তখন তা আমাদের পুরাতন অশুদ্ধ ব্যক্তিত্বকে ও তার সঙ্গে পুরাতন *সংস্কারকে* পুড়িয়ে দিতে পারে। ঐ অগ্নিতে পাপ দগ্ধ হয়ে যায়। যেন এক নতুন জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়। প্রাণায়ামের সুদক্ষ অনুশীলনে কুণ্ডলিনী শক্তিকে শীঘ্র জাগ্রত করা যায়। কিন্তু প্রবর্তকদের পক্ষে, একাজ সর্বৈব বিপজ্জনক। অতিশয় মানসিক পবিত্রতার অধিকারী, বিশেষত জিতেন্দ্রিয় না হলে—কুণ্ডলিনী জাগ্রত করার চেষ্টা অবশ্যই করবে না। অন্যথায় ঐ জাগ্রত 'অগ্নি' অনর্থের সৃষ্টি করবে।

শরীরের যৌন স্নায়ুকেন্দ্রের ওপর ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিকে যে সর্বক্ষণ উত্তেজিত করে, সে কখনই অধ্যাত্ম-জীবন যাপন করার কথা চিন্তা করতে পারে না—করলে সে হবে একটি প্রতারক ও প্রকৃত বস্তুর নকল স্বরূপ। আধুনিক জীবনযাত্রায়—চলচ্চিত্র, সাহিত্য, নাচ, আপ্যায়ন, কথাবার্তা, ড্রাগ, মাদক দ্রব্য ইত্যাদির মাধ্যমে কামেচ্ছা উত্তেজক কাজ প্রায়ই করা হয়ে থাকে। এ সবের ভেতর যে বিপদ লুকিয়ে আছে তা যতক্ষণ না মানুষের উপলব্ধি হচ্ছে, সে প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনযাপনে সমর্থ হবে না, সে নিজেকে যীশু, বুদ্ধ বা রামকৃষ্ণের অনুগামীও বলতে পারে না।

আধ্যাত্মিক পথে, দেহগত বাধার থেকে মানসিক বাধা অনেক বেশি। ঈশ্বরের নাম জপ, তার সঙ্গে নামের অর্থ চিন্তা বা উদ্দিষ্ট আদর্শের চিন্তা, ধীরে ধীরে বাধাগুলিকে অপসারিত করে ও মনকে অন্তর্মুখী ও ধ্যানের উপযোগী করে তোলে।

*　　*　　*

চৈতন্য জগতের সন্তান হিসাবে আমরা কিছুটা মূর্তিপূজক। ঈশ্বরের কোন রূপ উপাসনা না করে আমরা পারি না। এই উপাসনা-স্তরের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হয়, আর তখন রূপকে সত্য বলেই ধরা হয়, কিন্তু আমাদের অবশ্যই এর ঊর্ধ্বে উন্নীত হতে হবে। যখন আমাদের আপন রূপ আমাদের কাছে সত্য, ঈশ্বরীয় রূপও সত্য, কিন্তু আমাদের অবশ্যই এ দুই-এর ঊর্ধ্বে উঠে রূপের পেছনে যে চৈতন্য রয়েছেন তাঁকে দর্শন করার চেষ্টা করতে হবে। বুদ্বুদ ও ঢেউ—এ দুই-এর পেছনে একই সমুদ্র রয়েছে—আমাদের তাকেই দর্শন করতে হবে, বহুর মধ্যে একককেই দর্শন করতে হবে। অধ্যাত্ম-জীবনের সূচনায় আমরা দিব্যরূপের ধ্যান করতে পারি, কিন্তু আমাদের তার ওপরে অরূপে, অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে যে তত্ত্ব, সেখানে পৌঁছতে হবে।

*　　*　　*

ভাল ও মন্দ আমাদের কাছে সমান সত্য। যা ভাল তাই করতে আর যা মন্দ তা থেকে সরে যেতে চেষ্টা করাই আমাদের উচিত। ঐ কাজ করার সময় আমাদের উচিত ভাল-মন্দের চিন্তা থেকে আপেক্ষিক ভাল-মন্দের অতীত ঈশ্বরের চিন্তাই বেশি করে করা। একটা মেঘের কথা চিন্তা কর, যার খানিকটা ঘন আর খানিকটা পাতলা। মেঘের ঘন অংশ আলো ঢেকে ফেলে, অন্য অংশে আলোর প্রতিফলন হয়। কিন্তু সূর্য অন্ধকার ও প্রতিফলিত আলোক এ দুয়ের পারে। তেমনি ঈশ্বর পাপী ও সৎ দুই-এর মধ্যেই আছেন, আবার উভয়েরই অতীত। পাপীর মধ্যে ঈশ্বরীয় আলোক চাপা থাকে। সত্যের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে। মেঘের যে দিক সূর্যের থেকে দূরে তার ভেতর দিয়ে আলোর রশ্মি যেতেও পারে, নাও পারে। সূর্যের দিক থেকে এ সবই আলো। সূর্য প্রতিফলিত আলো ও অন্ধকার দুই-এরই অতীত।

প্রকৃত ভক্ত সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছা দেখে। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময়, তাঁর শিষ্যেরা তাঁর রোগ উপশম হবার জন্য তাঁকে মার কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলে—তিনি বলেন, 'আমি কিভাবে নিজের নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করতে পারি? আমার ইচ্ছা যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় লীন হয়ে গেছে। আমার নিজের কোন ইচ্ছা নেই'। ভাবদৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন যে, তিনি সকল মুখের ভেতর দিয়ে খাচ্ছেন। তিনি এও দেখেছিলেন যে, তাঁর শরীর অন্যের পাপ ভোগ করছে। এই প্রায়শ্চিত্তের ভাব, পরের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করার ভাব, যীশুর মধ্যে ছিল, আবার শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও ছিল।

* * *

আমরা যখন ধ্যানে বসি, সব অন্ধকার। বিরোধিতা রয়েছে। আমাদের মন বিদ্রোহ করছে, পাশ কাটিয়ে ছুটে পালাতে চায়। আমরা কিছু আলোক চাই, কিন্তু আমরা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখি না। প্রথমে এমনই হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে, নিয়মিতভাবে আমাদের অনুশীলন চালিয়ে গেলে—ক্রমশ বেশি বেশি আলোক আসতে থাকবে। ভালরকম মানসিক অনুশীলন দরকার, কিন্তু নিম্ন স্তরের এই সব সংগ্রাম মাত্র কিছুকাল ধরে চলে। সব অন্ধকার সত্ত্বেও, আমাদের নিয়মানুবর্তিতাকে কঠোরতম নিয়মের বাঁধনে ও নাছোড়বান্দার মতো চালিয়ে যেতে হবে; তারপরই সূর্যোদয় হবে। অন্ধকার দিনগুলিতে, আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ওপর বেশি জোর দেওয়া দরকার। তোমার প্রার্থনা, জপ ও ধ্যান—তা কিছুটা যন্ত্রচালিতের মতো হলেও চালিয়ে যাও। সাধারণত কঠিন অবস্থায় লোকের প্রবণতা জাগে আধ্যাত্মিক অনুশীলনাদি ছেড়ে দেবার। ঠিক বিপরীত কাজই তাদের করা উচিত।

আমরা বাজে কাজ ও আলস্যের কবলে পড়ি। এ দুটিই সমান খারাপ ও সমানভাবে আমাদের উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। আমরা কদাচিৎ শান্তভাবে বা ভারসাম্য বজায় রেখে চলি। স্বাভাবিকভাবে আমরা হয় ঘুমিয়ে পড়ি বা লক্ষ্য হারিয়ে ফেলি অথবা চালাই প্রচণ্ড কর্মপ্রচেষ্টা, যাতে আমাদের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়। তোমার মধ্যে *সত্ত্ব* অর্থাৎ ছন্দ, আনার চেষ্টা কর। তবেই তোমার মধ্যে উচ্চভাব আসবে। কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই যে, বিনা চেষ্টাতেই আমাদের মধ্যে সমতা, ছন্দোবদ্ধতা, স্থিরতা এসেছে—সব কিছুই আমাদের কাছে আশ্চর্যজনকভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে; কিন্তু মুহূর্তকাল পরে আমাদের সমগ্র মনোভাব বদলে যায়। এই উচ্চতর অবস্থাকে স্থির ও অটল করে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যাতে ঐ উচ্চতর মনোভাব আমাদের মধ্যে সচেতনভাবে আনতে পারি, ইচ্ছাশক্তির সহায়ে, আমাদের চেতনা-কেন্দ্রের উন্নতি ঘটিয়ে। এই অবস্থা একবার লাভ করলে, একে কিভাবে রক্ষা করতে হয়, বর্তমানে তা আমরা জানি না। এ ভাব আসে যায়, কিন্তু আমরা একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না। এ ধরনের পরিস্থিতির পরিবর্তন অবশ্যই চাই। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, এই আধ্যাত্মিক মনোভাব কিভাবে যে কোন সময়ে গড়ে তোলা যায়।

* * *

কর্মফলের ওপর যেন তোমার সাগ্রহ প্রত্যাশা না থাকে। গীতা বলেন, 'কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে নয়'। যদি তুমি ধীরভাবে ও নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় শর্তাদি মেনে তোমার দৈনন্দিন অনুশীলনাদি ও অধ্যয়ন চালিয়ে যাও, তবে পরিশেষে তা আপনা আপনিই ফলপ্রসূ হবে। কিন্তু তোমার অনুশীলনে কখনো কোন ছেদ পড়া উচিত নয়, কারণ অনুশীলনকে খুব দৃঢ় অভ্যাসে পরিণত করতে হবে এবং অধিকাংশ লোকের পক্ষে অনুশীলন ও অধ্যয়নে একবার ছেদ পড়লে, তা আবার আরম্ভ করা খুবই কঠিন। এ কাজগুলি কখনই এলোমেলো, ভাসা ভাসা ভাবে করা উচিত নয়।

আত্ম-সমর্পণ অধ্যাত্ম-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, কিন্তু আত্ম-সমর্পণ কি সহজ ব্যাপার? এস আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের ওপরে উঠি, অন্তরস্থ অসীমের সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে চেষ্টা করি।

এমনকি অধ্যাত্ম জীবনেও বিশ্বশক্তির আলোড়ন চলে। আমাদের ইচ্ছাশক্তির তুলনায় এক মহত্তর ইচ্ছাশক্তি অধ্যাত্ম-সাধকদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। অধ্যাত্ম জগতেও চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে নিয়ম রয়েছে। এই আলোড়নে সর্বদা উন্নতি-অবনতি আছে। উচ্চতর ও নিম্নতর নানা চিন্তাস্তরও রয়েছে। ঈশ্বরের

কৃপাই আমাদের উচ্চতর অধ্যাত্ম স্রোতের সংস্পর্শে এনে দেয়। ঐ স্রোতস্বতীর মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দাও, তোমার উন্নতি হবে। চেষ্টা কর, তুমিও আশ্চর্যজনক উন্নতি করবে। আমি যদি ঐ স্রোতের টানে নিজেকে ছেড়ে দিই, তবে ভালই হবে; কিন্তু আমি যদি সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কিছু সাঁতার দিতে পারি, তবে আমি আরো দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব।

প্রত্যূষকালটি তোমার নিজের জন্য রাখ। অধ্যাত্ম সাধন তোমার দক্ষতা বৃদ্ধি করে, কাজেরও সহায়ক হয়। ইচ্ছাশক্তি সহায়ে অন্তরের ভারসাম্য রক্ষা কর। একাগ্রতার মাধ্যমে কর্ম-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

আমি যদি অন্যের সেবা করতে চাই, আমাদের নিজেদের অবশ্যই কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আমাদের উচিত হবে, আমাদের নিজেদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ ঘটানো, তবেই আমরা অন্যের মধ্যে তা করতে পারব। আমরা নিজেদের যতটা সাহায্য করতে পারব, ততটা সাহায্যই আমরা অপরকে করতে পারব। তুমি সাঁতার জান? যদি তুমি অন্যাকে জলে ডোবা থেকে বাঁচাতে চাও, তোমাকে অবশ্যই সাঁতার জানতে হবে। তা না হলে, তুমিও অন্যের সঙ্গে ডুবে যাবে। অবশ্য ডাঙ্গায় থেকে সাঁতার শেখা যায় না!

* * *

প্রত্যেক মানব-সত্তাতেই অধ্যাত্ম-শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে। মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ সুযোগ, কারণ কেবল মানবের মধ্যেই সম্ভাবনা রয়েছে—এক চেতনা-সম্পন্ন, পূর্ণ জাগ্রত, সংযত জীবনযাপনের। মানুষের মধ্যেই রয়েছে সহজ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি। পশুর মধ্যে সাধারণত সহজ প্রবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কিন্তু মানব বুদ্ধি সম্বন্ধে এ কথা সত্য নয়। পশুরা কি মহানিয়ন্ত্রিত জীবনই না যাপন করে! মানব ও পশু একই অখণ্ড তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ।

আমাদের অধ্যাত্ম-শক্তি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। তাদের বিকাশ ঘটাতে হবে, কাজে লাগাতে হবে, আমাদের জীবাত্মার অভিব্যক্তির জন্য—সত্য উপলব্ধির উদ্দেশ্যে।

অন্তরের আদেশ লাভে যত্নবান হও। তোমার অন্তর্যামীর সুরে সুর মেলাতে চেষ্টা কর। তখন তোমার সুর অন্যদের সঙ্গেও মিলবে। প্রথমে অন্তরে সমন্বয় ঘটে, পরে আসে বাহিরের সমন্বয়। প্রথমে অন্তরে বৈষম্য ঘটে, পরে দেখা দেয় বাহ্য বৈষম্য। এই আন্তর সমন্বয় সচেতনভাবে হলেই ভাল। এই ভাবে আমরা এক দৃঢ় মনোভাবের অধিকারী হয়ে, করুণার পাত্র বাত-কুক্কুটের অবস্থা থেকে রেহাই পেতে পারি।

আমরা যেন কেবল সেই সব শক্তি লাভে উদ্যোগী হই, যাতে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি বাড়ে। আমরা নিজ মুখের চেয়ে অন্যের মুখ ভাল ভাবে দেখে থাকি। উপনিষদ্ বলেন, 'মানুষের সৃষ্টি এমন ভাবেই হয়েছে যে, তার ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ'। আমাদের মন যেন অন্তর্মুখী হয়। আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে যেন ভুল না হয়। এমন সব লোক আছে, যারা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার উদ্ভব ঘটায় বা অধিকারী হয়। কিন্তু তারা অন্যের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে, নিজের ব্যাপারে নয়। দিব্যদর্শনে (Theosophy) ও মানব-দর্শনে (Anthroposophy) অত্যন্ত বেশি বহির্মুখী হবার প্রবণতা দেখা যায়। প্রকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো আমাদের নিজেকে, আমাদের অন্তরের ঈশ্বরকে, সকলের অন্তরের ঈশ্বরকে জানা—আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা নয়। অনেকেই তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যবহার করে থাকে। আমাদের শক্তি সীমিত, আর তার অপচয়ের নানা পথ রয়েছে। আমাদের শক্তিকে যেন আমরা অন্তর্যামী ঈশ্বর অভিমুখী করে রাখি।

* * *

চরম লক্ষ্যের কথা ভুলে না গিয়ে, কাজে পরিণত করা যায় এমন এক আদর্শকে প্রথমে গ্রহণ কর। নিয়মিত অধ্যয়ন, স্বচ্ছ চিন্তা, জীবন-সমস্যার ওপর গভীর চিন্তা, সেবা, ধ্যান ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন চরম আদর্শে পৌঁছতে সাহায্য করে।

অধ্যাত্ম জীবন যেন একটা স্রোত-প্রবাহ। এই প্রবাহকে অবশ্যই রক্ষা করে চলতে হবে। এই প্রবাহের গতিরুদ্ধ হতে দেওয়া উচিত নয়। একে গতিরুদ্ধ হতে দিলেই, আমাদের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ বন্ধ হয়ে যাবে। অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে—দৈহিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক স্রোতবদ্ধতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যেমন করেই হোক এ অবস্থা হতে দিও না।

ধ্যান কেন প্রয়োজন? জীবাত্মার পুষ্টিবিধানের জন্য; সীমিত জীবন থেকে, সীমিত চেতনা থেকে, চারিদিকের অন্ধকার ও অজ্ঞতার আবেষ্টন থেকে মুক্তি লাভের জন্য। আর সীমার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকাই আমাদের সমস্ত দুঃখের প্রকৃত কারণ।

সাধারণত আমাদের জীবন হলো অহং-কেন্দ্রিক। আর এই স্বার্থপর জীবনে জীবাত্মারও একদিন ক্লান্তি আসে সব কিছু থেকে, এমনকি তার নিজের থেকেও। এক নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগে, নাম-রূপের সীমার বাইরে আমাদের সবরকম তুচ্ছ আসক্তির ওপারে, বিস্তৃততর জীবনের জন্য, আকাঙ্ক্ষা জাগে শান্তি ও স্বর্গীয় আনন্দের অনুসন্ধানের। তখনই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা হয়। তখনই আমাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম-বোধের জন্ম হয়।

* * *

'ধ্যান' কথাটি আমরা ব্যবহার করে থাকি সৌজন্যমূলকভাবে। কারণ, বর্তমানে আমরা যে ধ্যান করে থাকি, তাকে মোটেই ধ্যান বলা চলে না। আমরা যা করতে চেষ্টা করি, তা হলো একাগ্রতা আনার চেষ্টা। আমাদের সকলেরই একাগ্র হবার সামর্থ্য আছে, কিন্তু আমরা একাগ্র হই তুচ্ছ জিনিসের ওপর, জাগতিক বিষয়ের ওপর। এ প্রচেষ্টা আমরা কেন বিশালতর ও উচ্চতর বিষয়ের জন্য করি না? আমরা কেন আমাদের মুক্তিলাভের জন্য এর ব্যবহার করব না?

প্রথমে আমরা মাত্র অল্পক্ষণের জন্য ধ্যান করতে পারি। তবে, আগে তোমার অনুভূতি, বাসনা ও ইচ্ছাকে উচ্চতর লক্ষ্যে প্রবাহিত না করে শুধুমাত্র একাগ্রতা অভ্যাস করো না। কেবল একাগ্রতার অভ্যাস অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। কিছু লোকের ক্ষেত্রে এই সব কাজ প্রথম প্রথম ভয়ানক নীরস বোধ হবে। জপের মাধ্যমে তুমি তোমার মনকে নিয়মের বশীভূত করতে পার, অথবা ধ্যানের মাধ্যমে, অথবা বিচারের মাধ্যমে, অথবা এই সব রকম অনুশীলন একত্র করে। এই সব উপায়গুলি সমভাবে কার্যকর। যা সব থেকে প্রয়োজনীয়, তা হলো এর যে কোন একটি পথে অভ্যাস চালিয়ে যাওয়া। যদি সত্যই আকুল আগ্রহ হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে। অন্যথায় জীবাত্মা সন্তুষ্ট হন না। তোমার পছন্দ না হলেও, তোমাকে অবশ্যই নিয়মিত দৈনন্দিন কার্যসূচীর ভেতর দিয়ে চলতে হবে।

* * *

আমাদের মন হওয়া চাই সতেজ, সক্রিয়, উদ্যমী। অপরিহার্য বিষয় হলো মনের সতেজভাব। অন্তরের সতেজভাব আবার সর্বাধিক অপরিহার্য। জীবাত্মা নবীনও নয়, প্রবীণও নয়। জীবাত্মা থেকে কিভাবে শক্তি আহরণ করতে হয়, তা যদি কেবল আমাদের জানা থাকে, তবে শরীরেও নব জীবন ফিরে আসবে।

গভীর ধ্যানের পর শক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস জাগে, আর কোন কোন লোক তাকে কিভাবে চালনা করতে হয়, তা জানে না। আমাদের অবশ্যই একটি উচ্চতর খাত খুঁজে পেতে হবে। তবেই আমাদের মন শান্ত ও চঞ্চলতা-মুক্ত হবে। কখনো কখনো আমরা জিজ্ঞাসার মনোভাব নিয়ে থাকি। উচ্চতর ভাবে থাকলে আমরা নিজেরাই এই জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যাই। আমাদের মন তো বিরাট মনের অংশ। আমাদের মধ্যে ঐ চিন্তা, অন্তত স্মৃতিরূপেও যদি না থাকে, তবে আমাদের তা কখনই বোধগম্য হবে না। ঐ বিশাল চিন্তারাশিকে, স্মৃতি সম্ভারকে, অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। যেমন, তোমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে; তখন চিন্তা স্তরে উঠে পড় তীব্র বেগে, সচেতনভাবে, তাহলে দেখবে চিন্তা স্রোত বয়ে চলেছে। এবং তখন প্রশ্ন উঠবে, কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, আর কোন্‌টি ত্যাজ্য।

কখনো কখনো মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে থাকে। জানতে হবে, কিভাবে সঠিক মনোভাবের সৃষ্টি করা যায় এবং কিভাবে ঐ চিন্তাস্তরের সংস্পর্শে আসা যায়। আমাদের ছোট্ট মনটি তো বিরাট মনের একটি অংশ। আধ্যাত্মিক জীবনের মানসিক অবস্থা ও শারীরিক অবস্থা আছে। তাই শরীরের উন্নতিসাধনের, স্নায়ুপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণের, তারপর চিন্তাপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। কখনো কখনো এমনকি সাধারণ সম্ভাবনার ওপরেও আমরা উঠতে পারি। প্রায়শই আমাদের শারীরিক সীমাবদ্ধতাকেও আমরা ছাপিয়ে যেতে পারি।

* * *

অসুবিধা হলো যে, আমাদের মন বড়ই বহির্মুখী, আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর, অত্যন্ত আত্ম-কেন্দ্রিক। তাই আমাদের কিছুটা অন্যের শারীরিক ও মানসিক সেবা করার চেষ্টা করা উচিত। অন্যের জন্য যে কোন ভাবে আমাদের কিছু ত্যাগ করা উচিত। একজন মাতার ত্যাগ লক্ষ্য কর! যে ভাবেই হোক, অন্যের জন্য কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার না করে কোন লোককেই কেবল আত্ম-কেন্দ্রিক জীবন যাপন করতে দেওয়া উচিত নয়। ত্যাগই জীবন, কেবল ত্যাগের দ্বারাই জীবনে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। যারা একেবারে আত্ম-কেন্দ্রিক তাদের অধ্যাত্ম-জীবনে কোন স্থান নেই।

* * *

আমাদের কখনই মূর্খের স্বর্গে বাস করা উচিত নয়। আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত, যে-বস্তুর যেমন মূল্য তাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করা। প্রিয় মিথ্যার চেয়ে অপ্রিয় সত্যের বেশি মূল্য ধার্যের চেষ্টা করাই আমাদের উচিত হবে। চিরকালের জন্য আমরা সত্যের প্রতি অন্ধ হয়ে থাকতে পারি না। আজ না হয় কাল, একদিন আমরা মোহমুক্ত হবই। তাই যদি হয়, তবে কেনই বা আমরা এখনই সত্যের মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি না হই? আমাদের অত্যধিক স্বার্থপরতা, আরামপ্রদ বস্তুকে, আমাদের তুচ্ছ আসক্তিকে—আর আবেগকে আঁকড়ে থাকার অত্যধিক প্রবৃত্তিকে—আমাদের সব রকম নোংরামিকে চমৎকার বার্ণিসের তলায় লুকিয়ে রাখতে প্ররোচিত করে, আর ভাবতে শেখায় যে, সব কিছুই তো বেশ সুন্দরই আছে। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের জীবনের প্রতি আমাদের আসক্তির জন্যই আমরা অন্ধকারকে আলোকরূপে, অজ্ঞানকে জ্ঞানরূপে দেখতে চেষ্টা করি। এই কারণেই আমরা অসত্যকে সত্যরূপে, অনিত্যকে নিত্যরূপে গ্রহণ করে থাকি। আমরা মৃত্যুর মধ্যে অমরত্ব খুঁজি, দুঃখের মধ্যে সুখ খুঁজি, জড়ের মধ্যে চৈতন্যের, সীমার মধ্যে অসীমের খোঁজ করি। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমরা মরীচিকার পেছনে ছুটি, আলেয়ার আলোর পেছনে আমরা ছুটি অগ্নি আর আলোকের সন্ধানে। আমরা যে হতাশ হব তাতে আর আশ্চর্য কি!

আমাদের সংসার বৈপরীত্যময়, যেখানে ভাল মন্দ, স্বাস্থ্য রোগ, আলো অন্ধকার, সুখ দুঃখ, উষ্ণতা শীতলতা, জীবন মৃত্যু উভয়তই চৈতন্যের অধিগম্য বিষয়। এই দ্বি-তত্ত্বগুলি আমাদের সমভাবেই প্রভাবান্বিত করে। কেবল রোগ নেই মনে করলেই আমি সুস্থ হই না; অন্ধকার নেই মনে করলেই আমি আলো পাই না; মৃত্যু নেই মনে করলেই আমি মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি না; মন্দ নেই ভাবলেই আমি তার বিলোপ ঘটাতে পারি না।

কেবল নিজেকে সুস্থ ভাবলেই রোগী সুস্থ হয় না। ফরসা ভাবলেই ময়লা রং ফরসা হয় না; কুৎসিৎ ব্যক্তি নিজেকে কমনীয় কান্তি বলে মনে করলেই সে মনোহর হয়ে ওঠে না। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি, নিজেকে সুখী ভাবলেই তার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। গরিব লোক নিজেকে ধনী মনে করলেই নিজ অবস্থার উন্নতি করতে পারে না।

আমরা যা নয় নিজেদের তাই মনে করার নাম আত্ম-প্রবঞ্চনা। এ রকম প্রবঞ্চনা কিছুদিনের জন্য সুখকর হতে পারে, কিন্তু পরিশেষে তা অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়। বিপরীত অবস্থাগুলির পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, তাপ ও শীতলতা, স্বাস্থ্য ও রোগ—এরা সব সময়ে পাশাপাশি থাকে।

যতক্ষণ আমাদের আলোকের ধারণা রয়েছে, অন্ধকারের ধারণাও আমাদের থাকবে; আর একথা সত্য হবে—সুখ ও দুঃখের ক্ষেত্রে, সৌন্দর্য ও কালিমার ক্ষেত্রে, সম্পদ ও দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে, এমনি সব বিপরীত অবস্থার ক্ষেত্রেই—আর এই বিপরীত অবস্থাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের প্রভাবিত করে। আমরা চাই তাদের কোন কিছুর দ্বারাই প্রভাবিত না হতে।

এক জোড়া বিপরীত ভাবের একটিকে ধরে আমাদের অবশ্যই দু-এরই ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। আমরা দু-ভাবের কোনটির দ্বারাই যেন স্পৃষ্ট না হই। চেতনার উচ্চতর স্তরে, দিব্য-চেতনার স্তরে উঠলে দুই বিপরীতের প্রতি উদাসীন থাকতে পারি। তাহলে আমাদের জীবনের প্রতিও আকর্ষণ থাকে না, আর মৃত্যু ভয়ও থাকে না।

লক্ষণীয় বিষয় হলো : যতক্ষণ আমরা উভয়ের একটিকে গ্রহণ করব, অপরটিকেও গ্রহণ করতে হবে। আমরা কষ্টকে গ্রহণ না করে সুখ গ্রহণ করতে পারি না। আমরা মৃত্যুকে স্বীকার না করে জীবনকে স্বীকার করতে পারি না। আমরা স্বাস্থ্য, স্বীকার করতে পারি না রোগকে অস্বীকার করে। কিন্তু আমরা এ সবেরই ঊর্ধ্বে উঠতে পারি ও এমন এক স্তরে পৌছতে পারি যেখানে এগুলির কোনটাই নেই। এই হলো আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত কর্তব্য, আর এই সত্যের উপলব্ধি বিনা লক্ষ্যে পৌছনো হলো না।

অধ্যাত্ম-সাধকের পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে সুখান্বেষী হয়ো না।

* * *

কখনো কখনো সাধনকালে আমরা স্থৈর্য হারিয়ে ফেলি, তখন অবশ্যই আমাদের কর্ম-বিন্যাসে কিছু রদবদল ঘটাতে হবে ঈশ্বরের কাছে ওঠার চেষ্টা করে। যে সাগর থেকে বুদ্বুদরূপী আমাদের উৎপত্তি, সেই আমাদের সাগরের (অর্থাৎ ঈশ্বরের) সঙ্গে নিয়ত বোঝাপড়া করে চলতেই হবে।

আমাদের জীবনের কর্তব্য হলো নিত্য বস্তুটিকে খুঁজে বার করা। এই সব নানা পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের অন্তর্জীবনকে অবশ্যই সুস্থিত অবস্থায় রক্ষা করে চলতে হবে। বুদ্বুদকে সাগরের সঙ্গে তার যোগসূত্রটির সন্ধান করতে হবে। এই হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, অচেতনের মধ্যে সত্য চেতনার সন্ধান, জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সন্ধান। আমাদের অন্তরে বাহিরে একটা সমতা খুঁজে বার করতে হবে। আমার মাথা ঘুরলে, মনে হয় সারা পৃথিবী ঘুরছে। যদি আমার মধ্যে শান্তি বজায় থাকে, বাইরে বৈষম্য থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আমার শান্তি বিঘ্নিত হয় না—বরং আমিই আবার বাইরে শান্তি সংস্থাপন করতে পারি। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের অহং-কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। ভেবো না ঃ 'কোন লোক কষ্ট ভোগ করছে, তাতে আমার কি?' আমাদের সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে, কিছু সেবা সর্বদা করতে হবে। আমরা সব সময়েই কিছু করতে পারি, অপরের কল্যাণে কিছু দান করতে পারি, নিজেদের সামান্য অবস্থার মধ্যে, এমনকি সীমিত সঙ্গতির ভেতর থেকে। কিন্তু আমাদের অন্তরের স্থিতিসাম্য হারানো উচিত হবে না।

আমাদের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মধ্যে উচ্চতর স্তরে একটা আধ্যাত্মিক বোঝাপড়া থাকা চাই। আমাদের অবশ্যই সাকার ঈশ্বর ও অসীমের মধ্যে যোগসূত্রটির সন্ধানের প্রয়াস পেতে হবে—ঐ যোগসূত্রটিকে আমাদের মধ্যেই সন্ধানের চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের মুস্কিল হলো, কিভাবে কাজ করতে হয়, তা আমরা জানি না। ঠিক কাজ ঠিক মনোভাব নিয়ে করলে আমাদের বৌদ্ধিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। ভক্তেরা ঈশ্বরের জন্য কাজ করে, তাঁর হাতের যন্ত্র হয়ে। তোমার কাজ যেন কাজের উদ্দেশ্যেই না হয়। তুমি কাজ করবে ঈশ্বরেচ্ছাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এই হলো প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা হয়ে আমরা যেন কাজের মধ্যে একটা নতুন উপাদান যুক্ত করি, যা আমাদের কাজটিকে আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত করে, ফলে আমরা আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব

পাই। ঈশ্বরীয় শক্তি তখন আমাদের সহায় হয়ে কাজ চালাতে সাহায্য করে। আমরা তখন সাহসের সঙ্গে জীবনসঙ্কটের সামনা-সামনি হয়ে তা অতিক্রমণে সফল হতে পারি।

* * *

যদি আমরা জাগ্রত অবস্থায় সর্বদা পবিত্র চিন্তা করতে পারি, তারা খানিক পরে স্বপ্নাবস্থায় আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। জাগ্রত অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। স্বপ্ন নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবে না। উচ্চতর স্তরে জীবাত্মার সক্রিয়তার বিকাশ ঘটাও। যদি আমরা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারি, তবেই আমরা ঈশ্বরীয় শক্তির আওতায় আসতে পারি। দিব্যশক্তি তখন আমাদের রক্ষা করেন ও পথের নির্দেশ দেন।

গভীর নিদ্রায় আমরা বিস্তৃততর চেতনার, বিশ্বাত্মার সংস্পর্শে আসি। আমাদের আত্মা তখন বিরাট বিশ্বশক্তির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা হয়ে আমাদের সতেজ করে তোলে। অন্তঃসারশূন্যতার ইতি হয়, আমাদের মধ্যে শক্তি প্রবাহ আসতে থাকে, আর আমরা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সতেজতা অনুভব করতে থাকি। এই বিশ্বশক্তির সংস্পর্শ আমরা যতক্ষণ পাই ততক্ষণ বয়সের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমাদের জীবসত্তার অত্যন্ত গভীরে যেতে সক্ষম হওয়া চাই।

* * *

কাজের থেকে মাঝে মাঝে অবসর নেওয়া দরকার, আত্ম-বিশ্লেষণ অভ্যাস করার জন্য, আমাদের কি আছে দেখার জন্য : আমাদের ভালর দিকে কি আছে আর মন্দের দিকেই বা কি আছে, তা জানার জন্য। অধ্যাত্মজীবনে আত্ম-সমীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুশীলন করতে করতে এ কাজ স্বাভাবিক হয়ে যায় ও আমাদের কাজের সঙ্গে চলতে থাকে। জীবনের খুঁটি-নাটির সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা মনকে ঘুরে বেড়াতে দিই, তবে আমাদের আধ্যাত্মিক কর্তব্যের হানি হবে। তাহলে, আমাদের ধ্যানের সময় একাগ্রতা আসবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'যে লবণের হিসাব ঠিক মতো রাখতে পারে, সে মিছরির হিসাবও ঠিক মতো রাখবে।' তোমার কর্তব্য কর্ম এলোমেলোভাবে করবে না। ধ্যান ঠিক মতো করতে পারলে, আমরা কাজও ঠিক মতো করতে পারব। কাজ ও ধ্যান পারস্পরিকভাবে সম্বদ্ধ। জীবনের সব কাজই যতটা যত্ন নিয়ে করা সম্ভব তাই করবে। আমাদের কাছে কোন কিছুই ছোট নয়, আবার কোন কিছুই খুব বড় নয়। আমরা যদি সদুদ্দেশ্যে আন্তরিক ভাবে কাজ করি, তবে নিজেদের উন্নীত মনে হয়, প্রচুর শান্তি ও স্ফূর্তি অনুভব করতে থাকি। কখনো কখনো ধ্যানের মাধ্যমে আমরা অধ্যাত্মজীবনে যতটা উন্নতি করি,

তার থেকে বেশি উন্নতি করি সেবার মাধ্যমে। আমরা যদি কাজ-কর্মে ঢিলে ঢালা হই, তবে ধ্যানেও তেমনি হব।

* * *

ধ্যানের জন্য প্রত্যূষ কালটি বেছে নাও। সন্ধ্যার সময় প্রার্থনা কর। শুতে যাও প্রার্থনার ভাব নিয়ে। পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে ধ্যান কর। ছয় ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। প্রতিদিন কম পক্ষে দু-ঘণ্টা পাঠে ও অধ্যয়নে ব্যয় করবে। নিষ্ঠা সহকারে তোমার গুরুর উপদেশ অনুসরণ করে চলবে।

অনেক সময় অন্যের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তার সেবায় না লেগে আমরা মনে মনে ঐ নিয়ে চিন্তা করতে থাকি। এই সময়েই আমাদের অধিকতর আত্ম-সংযম থাকা উচিত। বিবেকানন্দ বলতেন, 'আমাদের কাঁদার সময় নেই।' আমাদের অবশ্যই কাজে লেগে পড়তে হবে। সেটাই হলো প্রকৃত বীরত্ব।

দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মনে মনে অত ভেবো না। তাতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়। শান্তভাবে, সবদিক বজায় রেখে, দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা কর। তোমার অস্থিরতাকে অতিক্রম কর; যতটা পার একে নিয়ন্ত্রণে রাখ। শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক অস্থিরতা, জড়তা—এগুলিই বাধা। এ রকম অবস্থায় পড়লেও, আমাদের অধ্যাত্ম সাধনে ছেদ পড়া উচিত নয়। সংসারের থেকে ঈশ্বরকেই বেশি করে আঁকড়ে ধর; তাতে তুমি শক্তি পাবে। এটাই হলো সব থেকে বেশি কার্যকরী পথ। আমাদের চাই সমতা, অন্তরের সমন্বয়। নিজেদের ও বাহ্য জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে, মৃত্যু ও দুঃখ-দুর্দশা দুই-এর ওপরে ওঠ। আমরা আশা করি, কিছুকাল পরে সূর্য আবার উদিত হবে। এই মিথ্যা আশা আমাদের দুর্বলতাকে একটি সুবিধা দানের মতো। জীবনের দুঃখকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আমাদের সহায়ক। পরাজয়কে জয়ের দিকে ফেরাও। সংসারকে আঁকড়ে থাকলে আমরা তার ওপরে উঠতে পারব না। ভক্তের ভেতর বীরের উদ্দীপনা চাই। এই শক্তির সঙ্গে দয়া ও সহানুভূতি থাকা উচিত। কঠোরভাব ও নিষ্ঠুরতা সব সময়েই দুর্বলতার চিহ্ন। যারা সত্য সত্যই শক্তিমান, তারা দয়াপ্রবণ ও সহানুভূতিতে ভরপুর হয়ে থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে চল, আর সেই সঙ্গে জীবনে বাস্তবতার মুখোমুখি হও। কিভাবে অবিচলিত থাকা যায়, তা শিক্ষা কর।

জীবন সম্বন্ধে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললেই অবসাদ আসে। আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত—জীবনে নিরন্তর সংগ্রামের সম্মুখীন হতে, তাদের মাধ্যমে গড়ে উঠতে এবং শেষে তাদের অতিক্রম করতে। এইভাবে আমরা উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারি। প্রথমে আমাদের চাই সঠিক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৌদ্ধিক প্রতিন্যাস,

আর তারপর একে কার্যকরী করে আমাদের পূর্ণ সত্তার অঙ্গ করে তোলা। তোমরা দুঃখ-দুর্দশার ওপরে ওঠ। দুঃখ-দুর্দশা কল্যাণকর হয়, যদি তা আমাদের ঈশ্বর-চিন্তামুখী করে দেয়। দুঃখের মুখোমুখি হয়ে তাদের ওপরে ওঠ।

মনে কর তুমি কোন একটি বিশেষ চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাচ্ছ না। তার বিপরীত উচ্চতর ভাব বা চিন্তাটিকে ধর। গভীরভাবে ঐ চিন্তায় মগ্ন হও। উচ্চতর চিন্তা দিয়ে নিম্নতর চিন্তাকে দূর করে দাও। এই হলো সার্থক উদ্গতি।

সত্য প্রায়ই এক আকস্মিক আঘাত রূপে দেখা দেয়। ঐ আঘাতের পর আমরা আলোক পেয়ে থাকি, আর তারপর আমরা ঈশ্বরের সংলগ্ন হয়ে যাই। অশুভ কখনো কখনো ছদ্মবেশী শুভাশীর্বাদ হয়ে আসে। ঈশ্বরপ্রীতি আমাদের অনাসক্ত করে তোলে। এতে আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ি না। যে ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে কাজ করে ভৃত্যরূপে নয়, প্রভুরূপে।

প্রায়ই দেখা যায়, কাজে বিফল হলে আমরা হতোদ্যম হয়ে পড়ি। কাজে সফলতা ও বিফলতার চেয়ে ঈশ্বরের ওপর বেশি নির্ভর করতে শিক্ষা কর। কোন কাজে সফল না হলেও, যদি আমরা সত্য সত্যই আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি, তা হলেই আমরা আত্মোন্নতিকল্পে কাজ করেছি, আমরা ঈশ্বরের নিকটতর হয়েছি। আধ্যাত্মিক স্তরে একেই সফলতা বলা হয়; এতে যা লাভ হয়, তা স্থূল পার্থিব ক্ষতিকে পূরণ করে দেয়। কিন্তু প্রথম দিকে, দৃঢ় সঙ্কল্প ও সৎ সাহস থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

আমাদের জীবনের দীর্ঘস্থায়ী উৎসগুলি অবিরত ধারায় প্রবাহমান। তার সংস্পর্শে আমাদের অবশ্যই আসতে হবে। অধ্যাত্ম সাধকের যখনই মনে হবে জীবনের স্রোত যেন বদ্ধ হয়ে গেছে বা জীবন একঘেয়ে হয়ে পড়েছে, তখনই তার উচিত নিজ ক্ষুদ্র সত্তাকে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে বিশ্বাত্মার সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করা। যখন খুবই বিষাদগ্রস্ত হও, কেঁদো না। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হও। ঈশ্বর লাভ না হওয়ার ক্ষোভ আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়।

* * *

যখন ইউরোপের বিশাল চার্চ ও ক্যাথিড্র্যালগুলি দেখি, আমার মনে প্রশ্ন জাগে : এ দেশের আধ্যাত্মিকতার কি হয়েছে? এক সময়ে ইউরোপ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীতে ভরে ছিল। এ থেকে উদ্ভূত হয়েছে মহান ধর্মীয় আন্দোলন, বহু সন্ন্যাসিসম্প্রদায়, মহান সন্তগণ। বহুযুগ সঞ্চিত আধ্যাত্মিকতার কি হলো? তা ইষ্টক ও রঞ্জকে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায়, শিল্পকলায় ও রাজনীতিতে ইউরোপ যে দর্শনীয় কীর্তি স্থাপন করেছে তার জন্য তাকে তার আধ্যাত্মিক পুঁজি থেকে বড় অংশ ব্যয়

করতে হয়েছে। গত দুই-তিন শত বৎসর যাবৎ তার অধ্যাত্ম-জীবন উপেক্ষিত হয়েছে। বৈষয়িক জীবন, ইন্দ্রিয়ভোগ ওখানকার লোকের মূল চিন্তার বিষয় হয়েছে। সাবেক অধ্যাত্ম ভাণ্ডারে আর কিছু জমা পড়েনি। ফলে ইউরোপের সামগ্রিক আধ্যাত্মিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। অধ্যাত্ম শক্তির স্থলে অন্য সব শক্তির আবির্ভাব হয়েছে। বর্তমান ধ্বংসলীলা (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) তারই ফলশ্রুতি।

ভারতবর্ষ যদি তার আধ্যাত্মিকতাকে উপেক্ষা করে, তবে তারও ঐ দশা হতে পারে। সর্বাঙ্গসুন্দর নৈতিক জীবন ও তীব্র আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে জাতির সঞ্চিত সমৃদ্ধ অধ্যাত্ম সম্পদভাণ্ডার সর্বদা পরিপূরিত রাখা অবশ্য কর্তব্য। অগণিত ঋষি, মুনি ও সাধু-সন্তদের ঐতিহ্য নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। সর্বজনীন অধ্যাত্ম পরিবেশ সংরক্ষণে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু অবদান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। সকল চিন্তাশীল ভারতবাসীরই এটা কর্তব্য।

* * *

# গ্রন্থে উদ্ধৃত গল্প, আখ্যান ও মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাবিবরণের তালিকা


১ সিদ্ধার্থের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ৩
২ চৈতন্যের ভগবৎ প্রেমোন্মাদ ১৩-১৪
৩ প্রহ্লাদের সাধন-ভজন ১৪
৪ গিরীশ ও 'রসুনের গন্ধ' ১৬-১৭
৫ গ্রন্থকারের সঙ্গে ডঃ কার্ল ইয়ুং-এর সাক্ষাৎকার .... ২০
৬ মৃতপ্রায় কৃপণ ও লোভী ব্রাহ্মণ ২২
৭ মাতালের ল্যাম্পপোস্টের ওপর ওঠা ২৭
৮ কিশোরী এবং প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ৩১
৯ ল্যাপলাসের সঙ্গে নেপোলিয়নের সাক্ষাৎকার ৩৯-৪০
১০ ভেড়ার অঙ্ক ৪০
১১ বৃদ্ধ কাঠুরিয়া আর তার চকচকে কুঠার ৪১
১২ এক মনোদ্রষ্টা ও এক বালিকা ৪৬-৪৭
১৩ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ .... ৪৯
১৪ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব ৪৯-৫০
১৫ স্বামী ব্রহ্মানন্দের অতীন্দ্রিয় দর্শন ৫১
১৬ যাজকের মুখে ডাহা মিথ্যা কথা ৬৪
১৭ ধর্মান্তরিত মুদীর পেছনের দরজা দিয়ে দুধ বেচা .... ৭১
১৮ কৃষক ও প্রধান ধর্মযাজক ৭১
১৯ শিকার ধরায় সিংহের পূর্ণ নিষ্ঠা ৮৬
২০ গল্ফ খেলায় উৎসাহীর স্বর্গ যাত্রা ৮৬-৮৭
২১ স্বপ্ন যেন চলচ্চিত্র ৮৮, ৫০৩
২২ ইচ্ছা-শক্তি এবং 'করব না' বলার শক্তি ৯২
২৩ চীন দেশের এক লোকের ষাট বছরের জেল ৯৪
২৪ ট্যাক্সি-চালকের সঙ্গে মাতালের তর্ক ৯৭-৯৮
২৫ সার্কাসে মেম ১০৫
২৬ যে যুবক ত্রয়োদশ সহ-সভাপতি হতে চেয়েছিল! .... ১০৬
২৭ ইডিপাস এবং থেব্‌সের স্ফিঙ্কাস .... ১০৭
২৮ প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের 'অবয়ব' এবং 'জীবনের নীতি' ১১০-১১
২৯ বুদ্ধদেবের মধ্যপথ দর্শন ১১৪-১৫

৩০ একটি মানুষের দৈত্যকে আহ্বান .... ১১৫-১৬
৩১ চৌর্যবৃত্তিতে তাওবাদ .... ১১৯
৩২ বাঘ ও ভেড়ার গল্প .... ১২১-২২
৩৩ এক গরিবের রাজসন্দর্শনে যাওয়া .... .... ১২২
৩৪ এক চৈনিক সাধুর দুটি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে তাও নীতির প্রদর্শন .... ১২৫
৩৫ উপগুরুর কাছ থেকে অবধূতের শিক্ষাগ্রহণ .... ১২৮
৩৬ লরেন্স ভাইয়ের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ১২৮
৩৭ যীশুখ্রীস্টের দীক্ষা ১২৯
৩৮ শ্রীরামকৃষ্ণের তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষা .... .... ১২৯
৩৯ শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রনাথকে রামমন্ত্রে দীক্ষাদান .... ১২৯-৩০, ৩৯২
৪০ স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক 'কিডি'র ধর্মান্তরকরণ .... .... ১৩০,১৪৩
৪১ শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক স্বামী শিবানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি দান ১৩০
৪২ স্বামী শিবানন্দ কর্তৃক একজন ভক্তকে দীক্ষাদান ১৩০-৩১
৪৩ এক ভবঘুরের 'ভাসমান কম্বল' ধরতে যাওয়া ১৩৬-৩৭
৪৪ নরেনের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অকপট স্নেহ .... ১৪৩
৪৫ পিঙ্গলার উপাখ্যান .... ১৫৫, ১৫৮
৪৬ যযাতির গল্প ১৫৬
৪৭ লালাবাবার আধ্যাত্মিক রূপান্তর ১৫৯
৪৮ তুলসী দাস কি করে সন্ত হলেন .... ১৫৯
৪৯ তিন ডাকাতের গল্প .... ১৮১, ৫৪২
৫০ একটা ইঁদুরের জন্য সাধুর দুরবস্থা ১৮৬
৫১ স্বামী যোগানন্দের বিবাহ ১৮৮
৫২ শ্রীশ্রীমায়ের এক যুবককে সন্ন্যাসে দীক্ষাদান ১৮৮-৮৯
৫৩ উট এবং এক আরবীর তাঁবু .... .... ১৯০
৫৪ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের ঝগড়ার মীমাংসা .... ২২৪-২৫
৫৫ মনোরোগ চিকিৎসকের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস .... ২২৭
৫৬ সক্রেটিস ও ব্রাহ্মণ ঋষি ২৩০
৫৭ রাখাল বালকদের স্বামী বিবেকানন্দকে পরীক্ষা ২৩৬
৫৮ রাবেয়ার ঈশ্বর প্রেম ২৩৬
৫৯ দুর্বল রমণীর ধ্যানের ইচ্ছা .... ২৩৯
৬০ শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসা ২৪০
৬১ শ্রীচৈতন্য কর্তৃক নিম্নজাতির একটি লোককে আলিঙ্গন ২৪০-৪১
৬২ '৫০ + ৫০'-এর গল্প ২৪৩
৬৩ 'পুনর্মূষিকো ভব'-এর গল্প ২৫৮

৬৪ কাশ্মীরের এক ভগ্ন মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতা ২৬৪

৬৫ জাহাজের মাস্তুলে বসা এক পাখির গল্প ২৬৬

৬৬ একটি পোষা কুকুরের উপাখ্যান ২৬৮

৬৭ এক পণ্ডিতের মুসুর ডাল রাঁধা ২৬৯

৬৮ নোঙর বাঁধা নৌকোয় মাতালের নৌকা চালানো .... ২৭৮

৬৯ মোটরচালক ও স্কুল-ছাত্র ২৮১

৭০ পকেটমার গুরু ২৮৩

৭১ নারদ-সনৎকুমার সংবাদ ২৮৪-৮৫

৭২ তিন জাপানী বানর ২৮৬

৭৩ বিবেকানন্দের 'মন' শব্দ নিয়ে শ্লেষাত্মক উক্তি ৩০২

৭৪ চীনে ও আমেরিক্যান চিকিৎসকের মধ্যে হৃদয়ের অবস্থান নিয়ে আলোচনা .... ৩২৩

৭৫ শুভদিনের ব্যাপারে মহাপুরুষ মহারাজের উপদেশ ৩২৯-৩০

৭৬ অভাবেই শিশুরা প্রার্থনা করে .... ৩৪৮

৭৭ ছোট্ট বালিকার প্রার্থনায় ঈশ্বরকে বোকা বানানোর চেষ্টা ৩৪৯

৭৮ ডুবন্ত নৌকায় মদ্যপের প্রার্থনা ৩৪৯-৫০

৭৯ স্বামী বিবেকানন্দের চিন্ময়ী মায়ের কাছে বৈষয়িক সমৃদ্ধির প্রার্থনায় ব্যর্থতা .... ৩৫০

৮০ মাথুরের কাছে ঠাকুরের মূর্তিপূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা ৩৬৯

৮১ এক ব্যক্তিকে গণ্ডার বলার জন্য আদালতে নালিশ করা ৩৮৩

৮২ এক আমেরিকান মহিলার ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক ৪০৭

৮৩ আরশুলা এবং বোলতার গল্প ৪১৫

৮৪ কেবল সবুজ জিনিস দেখার জন্য যে রাজাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল .... ৪৪৫

৮৫ অন্তর্জ্যোতিঃ বিষয়ে জাতক এবং যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন ৪৪৮-৪৯

৮৬ বাল্মীকির আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ৪৫৯-৬০

৮৭ আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ৪৬০

৮৮ সেন্ট অগাস্টাইনের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ৪৬০-৬১

৮৯ বিবেকনন্দের চৈতন্য-কেন্দ্রের পরিবর্তন ৪৬১-৬২

৯০ আমাদের মধ্যে দেবত্ব, মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব ৪৬৯

৯১ একই বৃক্ষে দুই পাখির বাস ৪৬৯-৭০

৯২ 'শয়তানের মুখোমুখী হও' (পাদটীকা-৬) ৪৮৮-৮৯

৯৩ 'এটা আসল, না তোমার ধর্মোপদেশ?' ৪৯৬

৯৪ ধারাস্নান, জলসিঞ্চন আর অস্নাত থাকা' ৪৯৭

৯৫ 'মহাশয় আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? .... ৪৯৮
৯৬ এক ধর্ম প্রচারক এবং তার ডাক্তার ভাই' .... ৫০০
৯৭ বেঞ্জিনের আণবিক গঠন সম্পর্কে কেকুলের স্বপ্নদর্শন ৫০৪
৯৮ সবাই ঈশ্বরের সন্তান .... ৫০৬
৯৯ নিদ্রা ও সমাধি বিষয়ে স্বামী প্রেমানন্দের উক্তি .... ৫০৭
১০০ স্বামী তুরীয়ানন্দের 'নিদ্রা'-দর্শন .... .... ৫০৭
১০১ গ্রন্থাকারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দের উক্তি ৫০৮-০৯
১০২ গ্রন্থাকারের অসুস্থতার সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দেকে দর্শন ৫০৯
১০৩ চন্দ্র এবং গিরিজার অতীন্দ্রিয় শক্তি ৫০৯
১০৪ তোতাপুরী ও ভৈরব .... ৫১০
১০৫ কিভাবে দুই নারী ধ্যানের দ্বারা উপকৃত হন .... .... ৫১৩
১০৬ এক প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজকের অন্তরে সাম্যতা অর্জন ৫১৩-১৪
১০৭ 'সাপ' নিয়ে খেলা .... .... ৫২৩
১০৮ ছোট্ট বালিকা যিনি মুক্তির সমস্ত রকম উপায় জানতেন? .... ৫৩৮
১০৯ উন্মাদাগারের যুবক .... .... ৫৪১
১১০ 'রস নয়, পীযূষ' .... .... ৫৫০
১১১ সক্রেটিসের নাটকীয় জীবনাবসান .... .... ৫৬০
১১২ পতিতার প্রতি উপগুপ্তের ভালবাসা .... .... ৫৬৭
১১৩ রাজার বিশ্রামাগার মুসলমান ফকির .... .... ৫৭১
১১৪ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তিনজন আলোয়ার (তামিল সন্ত).... .... ৫৭৮
১১৫ মন্দির চূড়া থেকে রামানুজের এক জনতাকে দীক্ষাদান .... ৫৮৩
১১৬ একনাথ এবং মুসলমানের তার দেহের ওপর থুতু ফেলা .... ৫৯২
১১৭ ঈশ্বরের নাম খুনীকে পর্যন্ত শুদ্ধ করতে পারে .... .... ৬০৬

# গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোক-সূচী


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য | ১৩১ |
| অত য এতদক্ষরং গার্গি | ১২৪ |
| অনির্বচনীয়ম্ | ৩৫৬ |
| অপরাধসহস্র | ৩৫৫ |
| অপরিগ্রহস্থৈর্যে | ৪৭ |
| অপবিত্রঃ পবিত্রো বা | ৩৭৭ |
| অপি চেদসি পাপেভ্যঃ | ৩৫৪ |
| অভয়ং বৈ জনক | ২১৬ |
| অভয়ং বৈ ব্রহ্ম | ২১৬ |
| অবিনয়মপনয় বিষ্ণো | ৩৫৯ |
| অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপম্ | ৪৪২ |
| আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ | ১৯১ |
| আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ | ৫০২ |
| আত্মানং রথিনং বিদ্ধি | ৩০৩, ৩৭৪ |
| আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি | ১১১ |
| আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাম্ | ৩৫২ |
| আসীনঃ সম্ভবাৎ | ৩০৪ |
| আসুপ্তেঃ আমৃতেঃ | ১৭ |
| আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ | ১৬৬, ২৮৫ |
| ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিঃ | ৩৭৮ |
| ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্ | ৩০ |
| ঈশ্বরঃ কারণম্ | ৪১ |
| উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো | ৩৬৭ |
| উত্তিষ্ঠত জাগ্রত | ৩ |
| একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি | ৫৮, ৩৬০ |
| এতাবানস্য মহিমা | ৪১১ |
| এতে জাতি-দেশ-কাল | ১৬৯ |
| ওমিত্যেদক্ষরমিদম্ | ৩৮৬ |
| কদা বা হৃষীকাণি | ৩৬০ |
| কৃতে যদ্ধ্যায়তো | ৩৭৬ |
| ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা | ১০৩ |
| গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী | ১৩১ |

| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| গুকারোঽন্ধকারস্তু | ১২১ |
| গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ | ১৪০ |
| চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্ | ৩৫৪ |
| চেতো দর্পণমার্জনম্ | ৩৯৫ |
| জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ | ১২৪ |
| জন্মাদ্যস্য যতঃ | ৩৬৬ |
| ততঃ প্রত্যকচেতনাধিগমো | ১২৬, ২৯৩, ৩৮৭ |
| তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ | ৩৫০ |
| তবাস্মীতি ভজত্যেকঃ | ৪১৮ |
| তস্য কার্য ন বিদ্যতে | ৭৯ |
| তস্য বাচকঃ প্রণবঃ | ৩৮৭ |
| তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি | ৩২৬ |
| ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ | ৩৬০ |
| ত্বমেব মাতা চ পিতা | ৩৭২ |
| ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি | ১৯৭ |
| দহ্রং বিপাপং পরমেশভূতং | ৩২৪, ৩৫৩ |
| দিবি বা ভুবি বা | ৫৮০ |
| দুর্জনঃ সজ্জনো ভূয়াৎ | ৫৫৪ |
| দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ | ৬ |
| দেহোবুদ্ধ্যা তু দাসোঽস্মি | ২৮২ |
| দেহো দেবালয়ঃ | ৩৭৪ |
| ন জাতু কামঃ | ১৫৬ |
| ন জানামি দানং | ৩৬০ |
| ন তত্র সূর্যো ভাতি | ৩৫৭ |
| ন ধনং ন জনং | ৩৫৭ |
| ন নরেণাবরেণ | ১২০ |
| ন মৃষা পরমার্থমেব | ৩৫৬ |
| নাতপস্বিনো যোগঃ | ১৯১ |
| নানাচ্ছিদ্রঘটোদর... | ৪৫০ |
| নাম্নামকারি বহুধা | ১২৬ |
| নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ | ২১৩ |
| নারদস্তু তদর্পিত | ৩৫৬ |

| | পৃষ্ঠা | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| নাবিরতো দুশ্চরিতান্ | ৩৫৩ | যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো | ১০ |
| নাস্থা ধর্মে | ৫৮০ | যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ | ৪১১ |
| নাহং মনুষ্যো | ৪০৯ | যস্ত সর্বাণি ভূতানি | ২১৯ |
| নিমিত্তনপ্রয়োজকম্ | ৪৬২ | যস্যামতং তস্য মতম্ | ২৫ |
| নৃদেহমাদ্যং সুলভম্ | ২৩৩ | যস্যৈব স্ফুরণম্ | ১৩১ |
| নেহ যৎকর্ম ধর্মায় | ৪২৫ | যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ | ৩২৪ |
| পরাত্মানমেকম্ | ৩৫৯ | যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ | ৩২১ |
| পিতা ত্বং মাতা ত্বম্ | ৩৫৬ | যা প্রীতিরবিবেকানাম্ | ৩১৪ |
| পুমান্ নৈব ন স্ত্রী | ৪০৯ | যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ | ৩৫৪ |
| পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি | ৩৫৯ | যো বৈ ভূমা তৎসুখম্ | ২৮৪ |
| প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা | ৩৮৬ | রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ | ৪৪৬ |
| প্রতিবোধবিদিতম্ | ৪৪৩ | রূপং রূপবিবর্জিতস্য | ৪০৪ |
| প্রথমা প্রতিমা-পূজা | ৩৬৮ | বরং পর্বতদুর্গেষু | ১৩৫ |
| প্রাতঃ স্মরামি | ৩৫৮ | বাসে বহূনাং কলহো | ১৪৫ |
| ফণী পিত্বা ক্ষীরং, বমতি | ১১২ | বি মচ্ছ্বথায় | ৩৫৩ |
| ব্রহ্ম তজ্জলানিতি | ১৭১ | বিজ্ঞাতারমরে | ৪৪৩ |
| ব্রহ্মচর্যং তপঃ শৌচম্ | ১৮৬ | বিজ্ঞানসারথির্যস্তু | ১৩ |
| ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ | ১১৩, ২৮৬ | বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ | ২০৭, ৪২৯ |
| ভোগা না ভুক্তা | ১৫৮ | বিপদঃ সন্তুঃ নঃ শশ্বৎ | ২৫৯ |
| ভোগে রোগভয়ং | ১৬০ | বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরী | ৩৫৮ |
| মধুবাতা ঋতায়তে | ৪৩৬-৩৭ | শরীরমাদ্যং খলু | ৩০১ |
| মন এব মনুষ্যাণাম্ | ৯৭, ৪৬৪ | শ্রবণায়াপি বহুভির্যো | ১২০ |
| মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ | ৩৭২ | শৃণ্বন্তু বিশ্বে | ৫৫৫ |
| মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি | ৪০৯ | শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা | ১৫৮, ২০৬ |
| মাতা মে পার্বতী দেবী | ১৯১ | স পর্যগাচ্ছুক্রম | ৩৫৩ |
| যতো বা ইমানি ভূতানি | ২৯০ | স যো হ বৈ তৎপরমম্ | ৫৫৫ |
| যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য | ৭৫ | সত্যপি ভেদাপগমে | ৩৫৯ |
| যদা পশ্যঃ পশ্যতে | ৪৭৪ | সমাধিসিদ্ধি... | ৩০৯ |
| যদা হ্যেবৈষ | ২১৭ | সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য | ৩৫৫ |
| যদ্যৎকর্ম করোমি | ২৭০ | সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব | ৩৫৫ |
| যদ্যদিষ্টতমং লোকে | ৩৬৪ | সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ | ৪৭ |
| যস্মে মনসা বাচা | ৩৫৪ | স্থিরসুখমাসনম্ | ৩০৪ |
| যম-নিয়মাসন- | ২৮৭ | স্বদেহমরণিং কৃত্বা | ৪১৭ |
| | | স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য | ১৭ |

# নির্দেশিকা

(প = পাদটীকা, দ্রঃ = দ্রষ্টব্য)


অখণ্ডানন্দ (স্বামী)—৩৮৪

অগাস্টাইন, সন্ত—৪৬০

অজ্ঞান (অবিদ্যা দ্রঃ), আদি বা অনাদি—৬৮, ৩৭৫, ৫৩১; বিশ্ব (বিরাট)—(মায়া), ৫৪, ৫৪৩, ৫৪৮

অতিচেতন (জ্ঞানাতীত, তুরীয়)—৪, ৩৭৬, ৪১৩, ৪৯৫, ৪৯৭, ৫২০, ৫৬১

অবস্থা— এর অর্থ, ২৩, ৫০, ২৮৮; -ই আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্য, ৪০৩, ৪২৮, ৫৫৮; -র উপলব্ধি, ৪, ২০১, ৩৬১; -ই কেবল ভোগ্য বিষয়ের বাসনাকে দগ্ধ করতে পারে, ১৭৭; -য় সব আপেক্ষিকতার সীমা অতিক্রান্ত হয়, ৩১৩; -সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৬৪; (হৃদয় কেন্দ্রে) ধ্যানই -য় পৌঁছে দেয়, ২৮১, ৩১৯-২০

অভিজ্ঞতা (ভাবোপলব্ধি)—১৭, ৪৪৩; অবতার-পুরুষদের, ৫৬, ৫২৭, ৫৫৭; শ্রীশ্রীমায়ের, ৩৯৬; -র আদর্শ, ১৮-৩৪; ব্যক্তিত্বকে সংহত করে, ২০; প্লটিনাসের, ৫৬৬-৬৭; স্বামী প্রেমানন্দের, ৫০৭; স্বামী বিবেকানন্দের, ১৪৩

অদ্বৈত— -বাদের প্রবর্তন, আচার্য শঙ্কর কর্তৃক, ৫৭৭; -অবস্থার বর্ণনা, ৫৩৩; আত্মোপলব্ধিকে ঈশ্বরোপলব্ধির সঙ্গে অভিন্ন করে, ৪৪৪; উপাসনার মাধ্যমে অনুভূতি, ৩৬৬; চূড়ান্ত অনুভূতি নয় (কারও কারও ক্ষেত্রে), ৫৩৪; -এর বৌদ্ধিক মূল্যায়ন (প্রশংসা)ই যথেষ্ট নয়, ২০২; দর্শনের পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ, ৫৮২; শ্রীরামকৃষ্ণের-অনুভূতি, ৩৬৬; সত্যের ওপর মায়ার আবরণ, ৫৪৮; -ই সর্বোচ্চ অনুভূতি, ৫৩৩; সম্পর্কে কিছু কট্টর পন্থিদের ভুল ধারণা, ২৫৩; সাধারণের ধারণার অতীত, ৪০৪-০৫; সাধনার লক্ষ্য, ৩৬৮

অধ্যয়ন (স্বাধ্যায় দ্রঃ)—২৮০; আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, ৭৬-৭৮, ৮০-৮১, ৮৯-৯০, ১০৮-০৯, ১৩৬, ১৭১, ১৯৮, ২১৫, ৩২৯, ৪২০, ৪৫০, ৪৭৮, ৬৪৫, ৬৫৩

অধ্যাত্ম—আধ্যাত্মিক দ্রঃ

অনাহত ধ্বনি—৩৮৮, ৩৯৬, ৫১৪

অপ্‌পর—৫৮৪

অবচেতন (অচৈতন্য)—১০৮, ২২৭, ৬৪২; ও চেতন মনের সংহতি, ২০, ২৩১; বিষয়ে গবেষণা, ৯৫, ২০১; ব্যক্তিত্বের একটি উপাদান, ২২৮; পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের আবিষ্কার, ১৯; -মন সর্বদা মনের হয়ে কথা বলে, ১৪৮; -মনে চৈতন্যের সন্ধান, ৬৫১; -মনের অস্থিরতা শক্তিক্ষয়কারী, ৩৪২; -মনের সমস্যা সমাধানে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, ২০; মস্তিষ্কের অচেতন ক্রিয়া, ৬৩৩

অবতার—৫১, ৫৫, ৫৮, ৬৭, ৬৯, ১২৯, ২৫২, ৩৬২, ৩৮০, ৫২৭, ৫৩৫-৩৬, ৫৭৮; -গণ সর্বোত্তম আচার্য, ১২৯-৩১; তুলসীদাস বাল্মিকীর, ৬১০; -দের অপার্থিব গুণাবলী, ৪০৫; -দের মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতি, ৪৩; পুনর্জন্মবাদ ও-, ৪৭; -পূজা, ৬১; মানব-কল্যাণে অবতীর্ণ হন, ৩৪৯; -এর রহস্য, ৫৩৫; রাম-, ৪৬০; শ্রীচৈতন্য-, ৬১৫; -সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ৬৬; সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ, ৬৩৬;

সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ, ১২৯; সর্বশ্রেষ্ঠ-, শ্রীকৃষ্ণ, ৫৬১, ৬০৬; সম্বন্ধে হিন্দুমত, ৬৫-৬৬

অবধূত—১২৮, ৪১৫

অবিদ্যা (অজ্ঞান দ্রঃ)—৮, ২০০, ২১৯; -এর প্রকাশ, ৩৪৯

অভেদানন্দ (স্বামী)—৪৮৬, ৫১০

আইনস্টাইন—৯৪

আকাশ—৩৬৯, ৫১৪, ৫৩৩; -এর প্রকার ভেদ, ২৩০

আগমবাগীশ (তন্ত্রাচার্য)—৬১৬

আত্মসমর্পণ—৩৯, ৯৯, ১০০, ২৬৬-৬৮, ২৭১-৭৩, ৩৩২, ৫০১, ৫৮০, ৬১৩-১৪, ৬৪৫

আত্মা (আত্ম)—২৮, ৬০, ২৯৮, ৩২৪, ৩৪৪, ৪৫৭, ৫৭৭; অনন্ত ও সর্বব্যাপী, ২১; -র আত্মা (ঈশ্বর), ১১৭, ১৩৯, ১৪৪, ১৫৬, ২৬১, ২৬৫, ২৭১, ২৮৯, ২৯০, ৩০০, ৩০৯, ৩২১-২২, ৩২৪, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৬৩, ৩৬৬, ৩৮১-৮২, ৪০২-০৩, ৪১০, ৪২৬, ৪৮০, ৪৯২, ৫১১, ৫৮২, ৬১১, ৬১৭, ৬৩০; -র আলোক, ২৩, ২০৯, ৪৪৯; উপনিষদে-, ১০৩-০৪, ১১৭, ৩০৩, ৪৪২, ৫০২, ৫০৫; 'নায়মাত্মাবলহীনেন লভ্য', ২১৩; পরমাত্মার সঙ্গে পার্থক্য (দ্বৈতমতে), ২৮৯, ৩০৬-০৭; (মূলসত্তায়) -অভিন্নতা, ২৯২; পরমাত্মার সঙ্গে -র মিলন, ৩১০, ৩২৩, ৩৬৭; -র পশ্চাতে ত্রিবিধ দেহ, ৫১৭

প্রবুদ্ধ-(সাধক, বোধিসম্পন্ন পুরুষ), ৩৯৭, ৫৪৭, ৫৬১; সম্পূর্ণ বাসনামুক্ত, ৪৫৫; মানব কল্যাণে অবতীর্ণ, ৫৫৭; -দের অধ্যাত্ম-অনুভূতি, ২৪১, ৫১৭-১৮, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৬১; ঈশ্বরকোটিরা বিশেষ শ্রেণীর-, ৫৩৪-৩৫; লাটু মহারাজ, এক উচ্চ পর্যায়ের-, ১৩৬; -দের সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, ৩১১, ৩৬৮, ৫২৭;

বিরাট-১২৫, ১৮৩, ২৮৯, ৩০৯, ৩৭৫, ৩৯৭, ৪৭০, ৫১১, ৫২৫;

বিশ্ব - (হিরণ্যগর্ভ, বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বচৈতন্য), ৫৫-৫৬, ১০৩-০৪, ১০৬, ১১৭, ২৩৫-৩৬, ২৬৬, ২৮৬-৮৭, ৩০৭, ৩৫৪, ৩৭৭, ৩৮৯, ৪০২, ৪১৮, ৫১১

বেদান্তের শিক্ষা -, ১১২-১৩, ২৯৬

ব্যষ্টি - (জীবাত্মা দ্রঃ), ২৮২, ৩০৭, ৩৪৬, ৩৬৬, ৩৮৪, ৪০৬, ৫৩৯

শিবরূপে -র ধ্যান (শঙ্করাচার্য), ১৯১, ৩৫৮-৫৯;

শুদ্ধচিত্তে - র প্রকাশ, ৩০;

আত্মা - স্বয়ংপ্রভ, ৪৪৯; -(সম্পর্কে) হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি, ৯৯, ১১২-১৩, ২৯৬

আধ্যাত্মিক, অগ্রগতি—৭৪, ৮০, ৮৯, ১০৩, ১০৫, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১, ১৪৪, ১৪৯-৫১, ১৫৪, ১৬৩, ১৬৯, ১৯৬, ২১৭, ২১৯, ২৪৮, ২৬৬, ৩৪২, ৩৫৩, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮৭, ৩৯৭, ৪২১, ৪২৯, ৪৩০, ৪৫৩, ৪৮৯-৯০, ৪৯৩, ৫২৩-২৪, ৫৩০, ৫৩৫-৩৭, ৫৯১, ৬৪১-৪২; -অভিজ্ঞতা (অনুভূতি), ১৮, ২০, ২২, ২৬, ২৯, ৩২, ৩৪, ৭৬, ১৬১, ১৬৬, ২০২, ২১১, ২১৬, ২৬৬, ৩০৮, ৩১০, ৩২২, ৩৪১, ৩৫৭, ৩৯১, ৪০৫, ৪৫৩-৫৪, ৪৬১-৬২, ৪৬৬, ৪৭৩, ৪৭৭-৭৯, ৪৮৪, ৪৯৫, ৪৯৮, ৫০০, ৫০২, ৫০৭, ৫১০-১১, ৫১৪-১৬, ৫২২, ৫৩২, ৫৪৪, ৫৫৬-৫৭, ৫৬৯, ৫৭১, ৫৭৩, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯২-৯৩, ৬১৭; আকাঙ্ক্ষা, ৫, ২১, ৫৮, ১৮২, ২৬১, ২৬৮-৬৯, ২৮৭-৮৮, ৩০২, ৩০৩, ৩৯২, ৪৭৮, ৫০৪; আচার্য, ২২, ৩৬, ৯৭, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১১৭, ১২৫-২৬, ১৩০, ১৪০, ১৪১, ২০৭,

২৮২-৮৩, ৫২৫; আদর্শ, ৪-৫, ৬৫, ৮৫, ৯৩, ৯৭, ১০৫, ১৮৬, ২০১, ২৯২, ৩০২-০৩, ৩৪৪, ৪৭৪, ৫১৮; উন্মেষ, ১২২; উন্মেষের পদ্ধতি, ১৮৩, ৫১৭-৩৭; উপলব্ধি, ১২, ২৩, ১০৪, ১১৮, ১২৪, ২৯৪, ৩০৮, ৪৪৪, ৪৯৬, ৫৫২, ৬৩১; ক্ষুধা, ১০৫, ২৮০, ২৯৭, ৩২৩, ৪৮৫, ৪৯৮; চেতনা, ৫২, ৫৮, ৮৫, ১৪১, ১৮৬-৮৭, ২৩১, ২৮৫, ২৯৩,৩২০, ৩৫৬, ৩৮৯, ৪১২, ৪৫১, ৪৬১, ৪৬৬, ৪৮১, ৪৮৪-৮৫,৪৮৬, ৫১৮, ৫২৫, ৫৫৭; সাধক রামপ্রসাদের উচ্চ -য় মগ্নতা, ৬১৬; স্বামী ব্রহ্মানন্দের সদা উচ্চ -য় ডুবে থাকা, ৫৭৪; -জাগরণ, ৩৮, ৮৫, ১১৯, ১২৪, ১২৬, ১২৮, ২১১, ৫৩৯, ৫৪৩; শ্রীশ্রীমার দ্বারা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে-, ৫৬৫; জ্ঞানালোক (জ্ঞান), ১২৮, ১৪২, ২২৯, ২৩৬, ৩১১, ৩৫১, ৩৫৪, ৪২৭, ৫০৫, ৫৩৭, ৫৬১, ৫৬২, ৫৭১, ৫৯১; দর্শন, ৩০৮, ৩৫৮, ৩৯১, ৫২২, ৫৬৮, ৬৪০; দীক্ষা, ১২৪-২৬, ১৩০; পথ, ৩৪, ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৯-১১, ১১৬, ১১৮, ১৩৩, ১৩৮, ১৪০, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮-৬৯, ১৮৬, ২৫৮, ২৭৭-৭৮, ২৮০-৮১, ২৮৩-৮৪, ২৯৫, ২৯৬, ৩০০-০১, ৩০৬, ৩০৮, ৩১৬, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৬৬, ৩৮৯, ৪৭২, ৪৭৭, ৪৯৪, ৪৯৫, ৫০৯, ৫২৭, ৫৪৬, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৮৩, ৬৪৩; শক্তি, ৮৩, ৮৪

আন্দাল—৫৮১, -এর কৃষ্ণপ্রেম, ৫৮১-৮২; ভক্তিরসের মধুর ভাবের দৃষ্টান্ত, ৫৮২, ১২৫-২৬, ১২৯-৩০, ১৩৭, ১৮৬, ৩২১, ৩৪৯, ৫১৯-২০, ৫২৪, ৬৪৬; শ্রীরামকৃষ্ণের-, ৫৬৪; শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীর-, ১২৬; স্বামী ব্রহ্মানন্দের-, ৫০৮-০৯, ৫৭৪; শৃঙ্খলা (সাধনা, অভ্যাস), ২১, ৭৫, ৯০, ১২৫, ১৫৭, ১৬৩, ১৭১, ১৭৬, ২০৫, ২৬৮, ২৭৮, ২৮০, ২৮৪, ২৮৭, ২৯২, ২৯৯, ৩০৩, ৩০৭, ৩১২, ৩১৫, ৩২৫, ৩৬৭, ৩৮৬, ৩৯১, ৩৯৭, ৪২৫, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৯৬, ৪৯৮, ৫২২, ৫৪৯, ৫৭১, ৫৮৩, ৬১৫, ৬৩২, ৬৩৭; -সংগ্রাম, ১০, ১১, ২৮, ৪৯০, ৪৯৫, ৫৯১, ৬১২-১৩, ৬১৬; সাধক, ৯৭, ৯৯, ১৪০, ১৪১, ১৮২, ২৫৩, ২৭২, ২৭৯-৮০, ২৯৪, ৩০১, ৩০৬, ৩০৮, ৩২২, ৩২৪, ৩৬৭-৬৮, ৪৭২, ৫১২, ৫২২, ৫৬১, ৫৬৫, ৫৭৪, ৫৮১; সাধনা (অতিমানবিক), ৫৬; -পথ ও ঈশ্বরাবতার, ৩৪৯; ওঁ-ই হলো -র লক্ষ্য (কঠোপনিষদ্), ৩৮৬

আব্রাহাম লিঙ্কন—ব্যক্তি ও নীতি সম্পর্কে, ১১০-১১

আলফ্রেড এডলার—২০, ১১৪

আলোয়ার—৫৭৮-৮৩; অণ্ডাল, ৫৮১; কুলশেখর, ৫৮০; তিরুপ্পন, ৫৭৯-৮০; তিরুমঙ্গাই, ৫৭৯; নম্মালোয়ার (শতকোপ বা শতারি), ৫৭৯; পে, ৫৭৮; পেরিয়ালোয়ার (বিষ্ণুচিত্ত),৫৮১; পৈগাই, ৫৭৮; ভূতালোয়ার, ৫৭৮

আসন—১৭১, ২১৩, ২৮৭-৮৮, ৩০১, ৩০৩-০৪, ৩১৬-১৭, ৩৩৪

ইম্যানুয়েল কাণ্ট— -এর চরম অনুজ্ঞা, ৫৪৭; এবং বেদান্ত, ৪৫৪-৫৫

'ইষ্ট'—১৩৯, ১৪৪, ২০৮, ২১১, ২৫০, ৩১৮, ৩৪০, ৩৭৯, ৩৯৮, ৪২২, ৪৮১-৮২, ৪৯৫

ইষ্টদেবতা—৮৪, ১৪০, ১৪৪, ২১১, ২৪৯, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৯, ২৯২-৯৩, ৩০৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২২, ৩৪৭, ৩৭৭, ৩৯২, ৪০২, ৪০৫, ৪১৬, ৪২২-২৩, ৪৮০, ৫১৫, ৫৩০, ৫৩২

ইসলাম ধর্ম—৬০, ৩৯৩, ৫৩৮, ৫৫৬, ৫৭১-৭৩, ৫৯৮

ইহুদি ধর্ম—২৯, ৪৩, ৬০, ৬৩, ৫৩৮

ঈশাবাস্য-উপনিষদ্ (ঈশোপনিষদ্)—৩০, ২১৯, ৩৫৩, ৫৫৮

ঈশ্বর—৮৭, ৮৮, ৯৩, ১৭৭, ১৭৮, ২০০, ২২০-২১, ২২৩, ২৮৯-৯০; অন্তর্যামী-, ৫৮, ১২৩, ১২৬, ১৪৩, ১৪৪, ৩০৪, ৩৩৯, ৩৪৫, ৩৬৮; -এ আত্মসমর্পণ, ৩০, ৫৪, ১৭১, ২৫৬-৭৩, ২৮৭, ৩০৮-০৯; আত্মার আত্মারূপে, ২৭, ৬০, ১৫৬, ২৬৫, ২৮৯; ওঁ-এর প্রতীক, ৩৮৭; -কৃপা, ৯২, ১৪২, ৪৪৪, ৪৯১; -পূজা (উপাসনা), ৩৬৮-৬৯; -এর প্রতীক, ৩৬৮-৭১; -এর প্রতি আকুতি, ১২-১৬, ১২৫, ১৩৩, ১৭৪, ২৮০; -প্রেম, ১৫৪, ২৩৮-৫৫; মহাবিশ্ব শক্তিরূপে, ৩০৭; ব্রহ্মের চরমরূপ, ৫৫; মাতৃরূপে, ৬২-৬৫, ২২০; এবং মানবদেহ, -মন্দির ৭; মানুষ, ৯৬; মীমাংসকগণ-বিশ্বাসী নয়, ৫৪৫; সর্বকর্মফল সমর্পণ, ১১৬-১৭, ৩০৯; -সম্বন্ধে বিবিধ ধারণা, ৫৩-৬৯, ২৯০-৯১; -সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ, ২৫৩; -এবং সংসার একই সঙ্গে চলে না, ৮৭; -সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে, ৫৪-৫৫; -সান্নিধ্যের সাধনা, ৪১৯-৩৭

ঈশ্বরকোটি—৫২৭, ৫৩৪, ৫৩৭

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—৭৪

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ—৬, ৪৫, ৬৯

উইলিয়ম জেম্‌স—৪৯৬-৯৭

উপনিষদ্ (ঈশাবাস্য, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, মাণ্ডূক্য, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ দ্রঃ)—৩১, ৫৪, ৬০, ৭০, ৭৮, ১০০, ১০৩, ১০৭, ১০৯-১০, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৪, ১৭১, ২০৩, ২১৩, ২১৭, ২১৯, ২৮৭, ২৯০, ৩০৩, ৩২১, ৩২৪, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৭৪, ৩৮৬-৮৭, ৪১৭, ৪৪১, ৪৬৪, ৪৬৯, ৪৭৪, ৫২৬, ৫৪৫, ৫৫৫, ৫৬১, ৫৬৫, ৬১০, ৬৪৭; অহিংসার মূলভিত্তি, ২১৯; আত্মার উপলব্ধি, ১১৭, ১১৯, ২১৩; পরমাত্ম উপলব্ধি, ১০৩, ১১৯, ৪১৭, ৪৭৪, ৫৫৫; শঙ্করাচার্যের ভাষ্য, ৫৬১

উপনিষদীয়—আদর্শ প্রেম, ১৫০, ৫৬৫; ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের বাণী, ১৯৭; ঋষিগণ, ৫৯, ২৪১, ৩০৫, ৩৫৪; নারদ-সনৎকুমার সংবাদ, ২৮৪

উপাংশু (জপ)—৩৯২

উপাসনা—৬০৯; এর অর্থ, ৩৬৫-৬৬, ৩৮১; অহংগ্রহ-, ৩৬৮; প্রতীক-, ৩৬৯

ঋগ্বেদ— -এ ঈশ্বরের ধারণা, ৩৫৩-৫৪; 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি', ৫৮, ৮৯; -এর দেবদেবীগণ, ৫৭-৫৮; 'নাসদীয় সূক্ত', ৫৩-৫৪; 'পুরুষ-সূক্ত', ৭৩, ২৩০, ৪১১; -এ প্রার্থনা, ১১৩, ২৮৬, ৩৫০

ঋষি (গণ) (বিজ্ঞানী, পূর্ণজ্ঞানী পুরুষ)—৭, ২৭, ২৮, ৬১, ১০০, ১০৪, ১১৭, ৩২৩-২৪, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৮, ৪০২, ৪১১, ৪৭৪, ৫৫৫

একনাথ—৫৯২-৯৩

ওজঃ—১৯৯

ওল্ড টেস্টামেন্ট—জবের উপাখ্যান, ৩০, ২৬৭

ওয়াল্ট হুইটম্যান—৩৬, ৪৫

কঠোপনিষদ্— -এ আত্মোপলব্ধি, ৩৭, ৪৪৩, ৫৫৮; ওঁ-এর তাৎপর্য, ৩৮৬; পরমাত্মার স্বরূপ, ৬০, ১১৭; রথের উপমা, ১৫, ১০৩, ৩০৩, ৩০৬, ৩৭৪; সুপ্তিভঙ্গের আহ্বান, ৩, ১০৪

কথামৃত—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' দ্রঃ

কবীর—৫৯৯-৬০২

কর্ম—২৬০-৬১, ৫৭৪, ৫৮০, ৬৩৯; অবতারগণ (কপাল মোচন) ও ফল, ১২৯; আধ্যাত্মিক সাধনা হিসেবে-, ৬৯-৭০, ১৬৮, ৫২৪, ৬০৯; চিত্তশুদ্ধি, ৩৯; জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ, ৫৩৭; -ফল থেকে -কে বিচ্ছিন্ন করা, ২৭৯; -বন্ধন ও গুরু, ১৩১; -বন্ধন থেকে মুক্তি, ৪২-৪৩, ৫৮৬; -বাদ, ৩৭-৪৩, ১৭৩, ৫৭৭; ভগবৎকৃপা ও-, ২৬০-৬১

কর্মযোগ (যোগ দ্রঃ)—ও নৈতিক নিয়ম, ১৬৮; -এর পথ, ২৯-৩০, ৯৯, ২৭৯; -এর লক্ষ্য, ৩৩; -সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ, ৬৮-৬৯

কার্ল জি জঙ্— এঁর মতে, অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী, মানুষের দুই শ্রেণীবিভাগ, ২১; অহং-ত্বের কুফল, ৯৮; ব্যক্তিত্বের সংহতির প্রয়োজনীয়তা, ২৩১; স্বপ্ন, ৫০৪; স্নায়ুরোগ, ৯৪; -এর সঙ্গে গ্রন্থকারের সাক্ষাৎকার, ২০

কালী (মাতা)—৬১, ৬৩-৬৫, ২৫১, ২৯০, ৫৬৪, ৬১৫, ৬১৬; -মন্দির (দক্ষিণেশ্বর), ১২৯, ৩৬৯, ৫১১, ৫৬৪

কুণ্ডলিনী—ঊর্ধ্বগতি, ৫২৫-২৭; জাগরণ, ১৯৮, ৩৯৬-৯৭, ৫১৯, ৫২১-২৫, ৬৪৩; তান্ত্রিক ব্যাখ্যা, ৩২১; বর্ণনা, ৫১৯

কুলশেখর—৫৮০

কৃপা (ভগবৎ)—৩৪, ১২৫, ১৩১, ১৪০, ২০২, ২৬০, ২৭০, ২৭২, ৩৫৪, ৪৯০, ৪৯৩, ৫৯৭; আত্মপ্রচেষ্টা ও-, ৯২-৯৩, ৯৭, ২৯৪; ঈশ্বর-, ২৫৮; ঈশ্বর, গুরু ও মনের-, ১০৫-০৬; জগজ্জননীর-, ৩৯৬; যীশুখ্রীস্টের-, ৩৯৩; রামচন্দ্রের-, ৬০৮

কৃষ্ণ (শ্রী)—৩২, ৩৩, ৩৮, ৫৫, ৫৮, ৬০-৬২, ৬৬, ৬৯, ৭৫, ১১৫, ১২৩, ১৪২, ১৬৪, ১৮৬, ২১৮, ২৪১, ২৫২, ২৫৬, ২৫৯, ২৭২, ২৭৩, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৭১, ৩৯৫, ৪১৯, ৪২৭, ৪৬৮, ৪৭৪, ৫০০, ৫৩০, ৫৭৮, ৫৮১-৮২, ৬১১, ৬১২-১৪, ৬১৫; আত্মার স্বরূপ, ৩৮, ৪৬৮; কর্মযোগ, ৩৩; -এর বাঁশি, ৩৮৯, ৩৯৮; মুক্তপুরুষের লক্ষণ, ৪১৯, ৪৭৪; শ্রীরামকৃষ্ণ-এর পুনরার্বিভাব, ৪৯; স্বামী ব্রহ্মানন্দের-দর্শন, ৫১

কেনারাম ভট্টাচার্য— ১২৯

খ্রীস্টধর্ম—২০৩, ৩৪৮, ৫৬৭; -এ আচার-অনুষ্ঠান, ৪৯৭; আত্মার পুনর্জন্ম, ৪৩-৪৬; ঈশ্বরের ধারণা, ৩৪৮; পরিত্রাণ (মুক্তি), ৫৩৮, ৫৪০; মরমিয়া সাধক ও সাধনা, ২৯; মাতৃবন্দনা, ৬৩; শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, ৫৬৪

খ্রীস্টান—১৫, ২৫, ৪৪, ৭২, ৯২, ৯৭, ২৪৩, ৩৪৮, ৫২৫, ৫৬৪, ৬৩৪; অবতারত্ব সম্পর্কে-দের বিশ্বাস, ৩৭৯-৮০; দীক্ষা, ৪৯৭; প্রার্থনা, ৩৯৩; মরমিয়া সাধক, ২৯, ৩২৫, ৫৩৪, ৫৬৭-৭০; সন্ন্যাসী, ১৯৭, ৩১৬

গদাধর—শ্রীরামকৃষ্ণ দ্রঃ

গিরিজা—৫০৯

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—১৬-১৭, ২৮৩, ৪৭০; আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তরণ ৪৫৯

গীতা (শ্রীমদ্ভগবদ্)—৪, ১৭, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৮, ৪৩, ৬০, ৬২, ৬৬প, ৬৯, ৭৩, ৭৯, ৮৩, ১১৫প, ১১৭প, ১৭৭, ২০৩ ২১৮, ২৪১, ২৪৫, ২৪৬, ২৭২, ৩১০, ৩৫৯, ৪৭৪, ৫০০, ৫৪৫, ৫৬১, ৫৮২, ৫৯০, ৬১০, ৬৪৫; -য় অবতারবাদ, ৫৫; ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, ২৫৬; এমার্সনের ওপর -র প্রভাব, ৪৫; কর্তব্য-কর্মের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ, ৭৪, ৪১৭; কুণ্ডলিনীর জাগরণ, ৫২৪; গুরুর প্রয়োজনীয়তা, ১২৩; ত্রিগুণ অনুসারে মানব-প্রকৃতি, ৪৬৬-৬৯; দেব ও

দানব-প্রকৃতির মানুষ, ৫৪৩-৪৪; পুনর্জন্ম, ৩৭-৩৮, ৪৭, ৯৬; ভক্তের প্রতি ভগবানের আশ্বাসবাণী, ৩৫৪-৫৫; মনের নিয়ন্ত্রণ, ৩০০; গুণ, ৪৯০, ৫৪১; ত্রিবিধ-, ১৮১, ৩৪৩, ৪৪৭, ৫৪২-৪৩

গুরু (আধ্যাত্মিক আচার্য দ্রঃ)—১২১, ১২৫-২৬, ১৪৩, ১৫৫, ৩৪৩, ৩৭৯, ৩৯১, ৪২৫, ৪৬০, ৫০৫, ৫৯০, ৬১৪, ৬২১, ৬৫৩; অন্তরের পথপ্রদর্শক, ১২১-২২, ৩০৮; ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা, ১১৯-৩২; -রূপে ঈশ্বর, ১৩১, ১৪৬, ৩০৮, ৩৫৮, ৬২১; উপ-, ১২৮; একনাথের-, ৫৯২; কবীরের-, ৫৯৯; -র করণীয়, ১২০-২২; -কৃপা, ১৩০; তুলসীদাসের-, ৬০৫; দক্ষিণামূর্তি (শঙ্করাচার্য-কৃত স্তোত্র), ৪৫০; -র নিকট প্রার্থনা, ১৩১-৩২; -বাদ, ১৩৯-৪২; রামানুজের-, ৫৮৩; -র প্রতি মনোভাব, ১৩৯; -রূপে শিব, ৫৮৫; -রূপে গুরুমন, ১২৭-২৯; শ্রীরামকৃষ্ণের-, ৪৯৬; -র সংজ্ঞা, ১২১

গোষ্ঠী-পূর্ণ—৫৮৩

গৌরাঙ্গ (শ্রী)— (শ্রীচৈতন্য দ্রঃ), ৫৩০

গ্রিয়ারসন (ডঃ)—৫৯৯

চক্র—(চৈতন্যকেন্দ্র দ্রঃ), ৩২০, ৩৪৪, ৫১৮-২৩; অনাহত-, ২১১, ৩২০

চন্দ্র—৫০৯

চিত্তাকাশ—২৩০

চিদাকাশ—২৯২; -এর ধ্যান, ৩২৫

চেতনা— -র অবস্থা, ৩৭৪-৭৫, ৪০৯-১০, ৪৫৮, ৫১৯, ৫২১, ৫৪০;

-কেন্দ্র, ২০৯, ৩৭৮, ৩৭৯, ৪০৯, ৪৮৯, ৫২০, ৫৫১, ৬২৯, ৬৪০, ৬৪৫; -এর অবস্থান, ২৩৪, ৬২৮; উচ্চতর-, ১৮৬, ২০১, ২৯২, ৩৭৫, ৪০২; উচ্চতর-এ নিজেকে ধরে রাখা, ১৭৬, ২০৯, ৩৭৮, ৩৯২, ৪২২, ৪৮০, ৪৮৬, ৬৩৬; কোন বিশেষ -এর ধ্যান, ৩১২, ৩২৫, ৩৭৪-৭৫; চক্ররূপে-, ৩২০, ৫২০-২২; মনকে কোন একটি বিশেষ-এ স্থির করা, ২৮৮, ৩৩৪, ৪০২; -এর স্থানান্তরকরণ, ১৭৬, ৩২০-২১, ৩৯৮, ৪৪২, ৪৬১, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৬, ৫৪৯; -হিসেবে ঈশ্বর, ২৫৭; -হিসেবে হৃদয়দেশ, ৩১৯-২০, ৩৭৭, ৫২১, ৫২৫;

জ্ঞানাতীত-, ২৬, ৪৫৪, ৫১৫; তিনটি-, ২৩-২৪, ৩৮৭, ৫১৭; তুরীয়-, ২৩, ৫১৭-১৮; -এর পরিবর্তন (রূপান্তর), ২১১-১২, ৫১২, ৫৫৬; বিশ্ব-, ২৩০, ২৩২, ২৬৭, ৫১৫; -র বিস্তার, ২৪৯, ৩০৫, ৫১৫, ৫৫৬

চৈতন্য, অনন্ত—২৩-২৪, ৩৭, ৪৭, ৫১, ১১৭, ১৪১, ২১০, ২২৫, ২৩২, ২৪৩, ২৫৩, ২৮০, ২৮১, ২৮৫, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ৩০৭, ৩২৪, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৬২, ৩৭৯, ৪০৫, ৪১১, ৪৩১, ৪৪৫, ৪৫২, ৫১৫, ৫২৭, ৫৩৩, ৬৩৬; -এর ধ্যান, ৩০৭, ৪০৯; -ই পরম সত্য, ৩৮৫, ৪১৮;

চৈতন্য, অনন্ত— ব্যক্তি চৈতন্য-এর অংশ, ২৩২, ৩২৫, ৩৭৯, ৪৫২; মহান আচার্যগণ - নিয়েই জন্মান, ৪৭

দিব্য- ৬২, ৮৪, ১২৮, ১৮৩, ২৩৬, ২৪৯, ২৭৩, ২৮২, ২৮৮, ৩১১, ৩৩৯, ৩৪৫, ৩৬১, ৩৬২, ৩৭৬, ৩৮০, ৪০২, ৪২৭, ৪৭৪, ৪৯০, ৫২৫, ৫২৬, ৫৭১

দেহ - (দেহবোধ)—৪১০, ৫১৬; ঈশ্বরোপলব্ধিতে এর বাধা, ৩২৫; -এর ওপরে ওঠা, ৪৫৩; কারাইকাল আম্মায়ারের-মুক্তি, ৫৮৬; জপরতা শ্রীশ্রীমায়ের-লোপ, ৩৯৬; -এর তীব্রতা হ্রাসের উপায়, ১৯২, ৩৮১, ৪১৬-১৭; -এর বিস্মরণ, -এর ক্ষেত্রে

মুখমণ্ডলের অবদান, ৪০৮; ৩২২; -এর তীব্রতা হ্রাসে শুদ্ধব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা, ৩৭৮-৭৯

ব্যক্তি (ব্যষ্টি)—৯৬, ৯৯, ২২৮, ২২৯, ২৩২, ২৩৬, ৩১৩, ৩২৫, ৩৪৪, ৪২২, ৪৫২, ৪৬৫, ৪৮১, ৪৮২, ৫১৬

সর্বব্যাপী- —৩৫২, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৯, ৩৭১, ৪৯৫

চৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণ (গৌরাঙ্গ দ্রঃ), ৩৩; ঈশাবতার, ৫৩৬; -এর ঈশ্বর-প্রেমের গভীরতা, ১৩-১৪; -এর জীবন, ৫৬৩-৬৪; -এর জ্ঞানাতীত অবস্থার ফল, ২৬; -এর ত্রি-সূত্র, ৩৯৫; -এর নীচজাতীর ভক্তকে আলিঙ্গন, ২৪০; প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের নিকট-এর প্রার্থনা, ৩৫৬-৫৭; ভগবানের নামের মহিমা সম্বন্ধে-, ১২৬, ৩৭২

ছান্দোগ্যোপনিষদ্—৫৯প, ১৬৬প, ১৭১প, ২৮৪, ২৮৫প, ২৮৬প

জটিলতা (মানসিক)—১৭২, ২০২, ৪৫২, ৫৪৩, ৬২৭ অহমিকাই-র সৃষ্টিকর্তা, ৫৫৮; -ত্রিবিধ, ২৮, ২২৬; -এর বিনাশ, ৪৬৫, ৫৪৯; -সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের কারণ, ২২৫-২৮; স্বপ্নমাধ্যমে-এর প্রকাশ, ৫০৪

জন উড্রফ (স্যার)— -রচিত গ্রন্থ, The Serpent Power, ৫২০

জন (সেন্ট) অব দি ক্রস—৫১২, ৫২৪, ৫৭০

জনক রাজা— -এর ভয়শূন্যতা অর্জন, ২১৬; -যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ (অন্তর্জ্যোতি বিষয়ে), ৪৪৮-৪৯, ৫০৫; -সংসারীদের আদর্শরূপে, ১০৫

জনাবাঈ—৫৯২

জনার্দন স্বামী—একনাথের গুরু, ৫৯২

জপ—৩৩, ১৪৪, ২১১, ২৯৩, ৩০৮, ৩১৯, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৪২-৪৩, ৩৪৪, ৩৭৬-৭৮, ৩৮১, ৩৯৩-৪০৩, ৪১৮, ৪১৯, ৪৭৫, ৪৮৬, ৫২৪, ৬০৯, ৬৪০, ৬৪৮; -এর মাধ্যমে ঈশ্বরোপলব্ধি, ১০৯, ২৭২, ২৭৯, ৩০৮, ৩৪৫-৪৬, ৩৭২, ৩৮৯; -এর উদ্দেশ্য, ৩৯২, ৪৩৩, ৪৪৯-৫০, ৫৪৩, ৬৪২, ৬৪৩; -এর উপায়, ৩৯২; ওঁ মন্ত্রের আকৃতিই-, ৪০২; কাজ করতে করতে-, ৮১, ২৭৩, ৪২১, ৪২৫; ধ্যানের পথে-, ২৯২, ৩৯৯-৪০৩, ৬৩০; -এর পথে বাধা, ২৯৮, ২৯৯, ৩৯৭-৪০১; -এর পদ্ধতি, ২৮৩, ২৯১-৯২, ৪০২, ৫১৫, ৬৪১; বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে-, ৩৯৩-৯৪, ৬০৩-০৪; মানসিক অস্থিরতায়-, ২০৮, ৪০০, ৪৯২, ৪৯৪, ৬৪৪; -সম্বন্ধে (শ্রী) রামকৃষ্ণ, ৩৯৫-৯৬, ৪০০-০১; -এর শক্তি, ৩৯২, ৬১১; -এর জন্য সময় দেওয়া, ৭৮, ১৩৬, ৩২৮, ৩৩২; -এর সাফল্যের শর্ত, ১৪৮, ২৭৯, ৩০৮, ৩৯৮; -সম্বন্ধে (শ্রীমা) সারদাদেবী, ৩৯৬; -স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ১২৭, ১৮৩, ২৯৮-৯৯, ৩৬৭, ৩৯৬-৯৭, ৪২৫; হিন্দুধর্মে-, ৩৯৪-৯৭

জরথুষ্ট্র— -বাদী বা জরথুষ্ট্রীয়, ৩৬৭; -এর মতবাদ, ৩৪৮

জীব—৯৮, ৪৫০, ৬১০; -এর অদ্বৈতানুভূতি, ৫৩৩; -সম্বন্ধে বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ৬১১; -এর মুক্তি, ৫৩৯; -সম্বন্ধে (শ্রী) রামকৃষ্ণ, ৯৮, ৪০৬; -শব্দের অর্থ, ৪৪৭; সাংখ্য ও বেদান্তমতে-, ৫৪

জীববিজ্ঞানী—মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে-, ৪৬৮; ব্যক্তি বা প্রাণীর অমরত্ব সম্বন্ধে, ৩৬

জীবাত্মা—৫২, ৫৪, ৯৯; -এর জাগরণ, ৫৩২; -পরমাত্মারই অংশ, ১৪০; -পরমাত্মার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ১৩১; পরমাত্মার সঙ্গে-র মিলন, ৩২; -এর প্রকৃত স্বরূপ ও পরমাত্মা, ৫৪৯

জৈন ধর্ম—৪১

জ্ঞান—৫৭৪, ৬০৯; আলোয়ারদের দৃষ্টিতে পরা-, ৫৭৮; উপনিষদে-, ৩২১, ৪১৪; -এর ব্যাখ্যা, ৩১; সর্বোচ্চ অনুভূতিতে ভক্তি ও, ৫৮৮

জ্ঞানযোগ—৯৯, ২৭৮; বাছাই করা কিছু লোকের জন্যই-, ২৭৮; -এর ব্যাখ্যা, ৩১-৩৩; -এ শুদ্ধতার গুরুত্ব, ১৬৮-৬৯

জ্ঞানসম্বন্ধর—৫৮৪

জ্ঞানী—২১, ২৩৮, ৪৩৭, ৬৩২; -ঈশ্বরের প্রিয়তম, ২৪১; -র প্রার্থনা, ৩৬১; -সম্বন্ধে (শ্রী) রামকৃষ্ণ, ৪৯৮, ৫৩৫

জ্ঞানেশ্বরী (জ্ঞানদেব)—৫৯০

টমাস একুইনাস (সন্ত)—৫৬৯

টমাস হাক্সলি—আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি বিষয়ে, ৪৪-৪৫, ৪৬৮

টেনিসন—৪৫; -এর কবিতা, Ancient Sage (প্রাচীন ঋষি) ৩৮৩-৮৪

ডারউইন—৪৪, ৪৬৮; -এর বিবর্তনবাদ, ৯৫

ডেকার্টেজ—৪৪৬

তন্ত্র— -এ উপাসনা, ৩৭১; -মতে কুণ্ডলিনীর অধিষ্ঠান, ৩২১; -এ মন্ত্রবিজ্ঞানের বিকাশ, ৩৮৮; -এ মাতৃ-উপাসনার বিশদব্যাখ্যা, ৬৪, ৬১৫; -এ সপ্তচক্র (চেতনা-কেন্দ্র), ৫১৯; সপ্তচক্রের ব্যাখ্যায় (শ্রী) রামকৃষ্ণ, ৫২৬-২৭

তন্ত্রশাস্ত্র— -এ নিম্নতর চেতনা-কেন্দ্রে মন স্থির করা, ৩৩৪; -মতে ঠিক ঠিক মনোভাব গড়ে তোলা, ৩৭৪

তপঃ—তপস্যা, ৫৩-৫৪; -ত্রিবিধ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা), ৩৩, পতঞ্জলী মতে-, ১৭০, ২৮৭; -ই সকল যোগের মূলকথা ৩৩

তমঃ—তামসিক, ৪৭২; ক্রমোন্নতির মাপকাঠিতে-এর স্থান, ৫৪১-৪২; -গুণী পশু (অসুর)-র রূপান্তর, ৪৭৩; -গুণে বিনাশ (সাধিত) হয়, ১৮১, ৫৪২; -প্রকৃতির মানব সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৪৬৬-৬৭; -মনোভাব কখনও কখনও এড়ানো যায় না, ৩৪৩; -মনোভাব কালে ধ্যান, ৩২৯; -এর মাত্রানুযায়ী মানুষের শ্রেণীবিভাগ, ৪৬৯; -মায়ারই উপাদান, ৪৪৭; -এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, ১৮০-৮১, ৫২১, ৫৪৩-৪৪

তান্ত্রিক— -দেবদেবীসমূহ ও তার মন্ত্র, ৩৭১-৭২, ৩৯২; (শ্রী) রামকৃষ্ণের - গুরু, ১২৯

তিরুপ্পন আলোয়ার—৫৭৯

তিরুমঙ্গাই আলোয়ার—৫৭৯

তুকারাম—জপ সম্বন্ধে-, ৩৯৪-৯৫; -এর জীবন ও বাণী, ৫৯৩-৯৭

তুরীয়—২৩, ৫১৭-১৮

তুরীয়ানন্দ (স্বামী)—৫৭৫; কিভাবে-নিদ্রা জয় করেছিলেন, ৫০৭

তুলসীদাস—১৯৫, ৩৩০; -এর আধ্যাত্মিক রূপান্তর, ১৫৯; -এর জীবনী ও রচনাবলী, ৬০৪-১১

তৈজস—৪৫২

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—৫৭প, ২১৭প, ২৯০

তোতাপুরী—৫১১

ত্যাগ—১৫৭, ৩১৭, ৩৫০, ৩৭৩, ৪২৫, ৪৩০, ৪৯৪, ৫৪৩, ৫৪৬; -এর অনুশীলন, ১৫৩; আত্মোপলব্ধি অসম্ভব -বিনা, ৫৩৯; -ই (সব ধর্মে) আধ্যাত্মিক জীবনের মূলভাব, ১৪৭; -আধ্যাত্মিক জীবন সূত্রপাতের প্রাথমিক আবশ্যকতা, ১৫৭; -এর পথ, স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে বেছে নেন, ৪; -এর প্রকারভেদ, ১৫৯-৬০; -এর প্রয়োজন, ১৪৭-৪৮; -বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, ১৫৩-৫৪; বুদ্ধের ঐতিহাসিক সংসার-, ৫৬২;

ভারতে নারীসন্তদের-, ৬১২-১৩; -মানুষের এক দৈবীসম্পদ, ৫৪৩; মীরাবাঈয়ের-, ৬১৩; (শ্রী) রামকৃষ্ণের-, ৩৫০, ৫১২, ৫৬৪; যথার্থ-এর অর্থ, ১৫০, ১৫৩-৫৪; সাধুসঙ্গ -বৃত্তি জাগায়, ১৩৩; সুরদাসের-, ৬১২; -হিন্দুসংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ৬১৭

দক্ষিণেশ্বর—১৫, ৩৬৯, ৫০৯, ৫১০-১১, ৫৬৪-৬৫

দর্শন—২৩৬; অনুশীলন ব্যতীত - অর্থহীন, ৩১৮, ৪৭৭; উপলব্ধির পথ হিসেবে-, ৫৪৯; কবীরের কোন -এর শিক্ষা ছিল না, ৫১৯, ৬০০; জ্ঞানদেবের-, ৫৯০; থায়ুমানওয়ারের-, ৫৮৮; -ও ধর্ম, ২২-২৩, ২২৮, ৬৩৪; -এর প্লটিনাস গোষ্ঠী, ৫৬৬; -এর বিষয় হিসেবে সুষুপ্তি, ৫০৫-০৬; বীরশৈব-এর প্রতিষ্ঠাতা বাসবেশ্বর, ৫৮৮; ভারতীয়-, ৪১-৪২; -এ অজ্ঞান, বন্ধনের কারণ, ৫৪, অনুভূতি বিষয়ে-, ২২-২৩; -এ কর্মসূত্র, ৩৯; মীমাংসক -এরই একটি শাখা, ৫৪৬-৪৭; শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে-, ৩৮৪-৮৫

মীমাংসক-, ৫৪৫-৪৭; রামানুজের-, ৫৮৩; শঙ্করাচার্য ও অদ্বৈত-, ৫৭৭; সাংখ্য মতে মুক্তি, ৫৪০; স্বামী বিবেকানন্দের-, ৩৬৫

দার্শনিক—৪৬৩; অ্যাম্মোনিয়াস সাক্কাস ও তাঁর শিষ্য প্লটিনাস, ৫৬৬; ইম্যানুয়েল কাণ্ট (জার্মানী), ৪৫৪-৫৫; ওরিজেন (খ্রীস্টান), ৪৪; গ্যোরদানো ব্রুণো (ইটালী), ৪৪; নিম্বার্ক (বৈষ্ণব), ৬১১; পাইথাগোরিয়ান—(গ্রীক), ৪০২; পাশ্চাত্য-, ৪২; ফিলো জুডিয়াস (ইহুদী), ৩৪৮, ৩৮৮; লাওৎ সু (চীনের মরমিয়া সাধক), ১১৯; হিন্দু-, ২২; হেরাক্লিটাস (গ্রীক), ৩৮৭

দুঃখ—৫৪১

দুর্গাচরণ নাগ (সাধুনাগ মহাশয়)—২৭৮

দুর্গাচরণ মিত্র—৬১৬

ধর্ম—২৬, ৯৫, ১৩০, ১৬৪, ১৮৮, ২৩১, ২৫৩, ৩৫৫, ৩৮১, ৪২৫, ৫৫৬, ৫৬৩, ৬২২, ৬২৮; অল্পবয়স থেকেই -এর চর্চা, ১৬-১৭; বিভিন্ন-এ আত্মা, ৩৫; -এর ক্ষেত্রে আভিজাত্য, ৫; -এর আসল ও মেকিরূপ, ১১৯-২০, ১৯২, ৩১৫, ৫৬৩, ৬২৩; ইসলাম-, ২৯; ইহুদী-, ২৯; -এ ঈশ্বরের সর্বোচ্চ স্থান, ৪১৩; -বিষয়ে (শ্রী)কৃষ্ণের শিক্ষা ৪৩; -বিষয়ে খ্রীস্টান মত, ২৯, ২০২, ৩৯৩; -এর মাধ্যমে জগতে ঐক্যস্থাপন, ৬৭; জ্ঞানাতীত অনুভূতিই সব-এর মূল, ২৬; -ও দর্শন, ২২, ২২৮, ৬৩৪; -এ দীক্ষানুষ্ঠান, ১২৪; -এর পরশপাথর, ৫০১-০৩ -এ প্রতীকসমূহ ৬৬৬; -এর প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অংশ, ৮৮-৯০; -ও বিজ্ঞান, ৪৯৬-৯৭; -বিষয়ে বুদ্ধদেব, ৯০; -এ মরমিয়া সাধকগণ, ২৮-২৯; -এ মানুষের ব্যাকুলতার প্রকাশ, ৩৫১; -মীমাংসকদের মতে, ৫৪৭; বিভিন্ন-এ, মোক্ষ (পরিত্রাণ) লাভ, ৫৩৮-৪০; হিন্দু-এ রামানন্দের অবদান, ৫৯৮-৯৯; রামানুজের -প্রচার, ৫৮৩; -এর লক্ষ্য, ৫২২, ৫৩৪, ৬১৭; -শখ বা ফ্যাশন (অনেকের কাছেই), ১০, ১০৫; শিখ-, ৬০২-০৪; -এ শুদ্ধিকরণ, ১১০, ২৯৯; (বিশ্বের) সন্তগণ, ৪৭৫, ৫৬৬; স্বধর্ম, ৭৪; স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত-এর সংজ্ঞা, ২৭, ২৩৮, ৩০৯, ৫৪৯; হিন্দুধর্মীয় সংস্কৃতির গতিময়তা, ৫৭৭; হিন্দুদের-৭৩-৭৪, ৫৪৭, ৫৭৭

ধর্মতত্ত্ব— -এ উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ৫৫৬, খ্রীস্টান-, ৪৪; -এ দোষস্বীকার, ১৬৩; পাশ্চাত্য-এ অবতারবাদ, ২৫২-৫৩; -এ প্লটিনাসের প্রভাব, ৫৬৬; -এ মাতৃ-উপাসনা, ৬৩

ধর্মতত্ত্ববিদ্ (ধর্মশিক্ষক)—অগাস্টাইন (সন্ত), ৪৬০-৬১; আলঘজালি, ৩৯৩; খ্রীস্টান-,

৬৪, ৩৭৩; টমাস অ্যাকুইনাস, ৫৬৯; মুসলিম-, ৫৭১-৭২

ধ্যান—২৭৩, ২৮৮, ৩৬৮; -এর অর্থ, ২৮১, ২৯২; আত্মার-, ২২২-২৩; -আধ্যাত্মিক পথের বাধার অপসারক, ২৯৩; -থেকে (উৎসারিত) আনন্দ, ২৯৩; উপনিষদীয়-, ৫৯-৬০; -এবং একাগ্রতা, ৩১২-২৫; একেশ্বরবাদীর-, ৫৯; জপের ধ্যানে পরিণতি, ১৮৩, ২৯২, ৪০০-০৩; -এর (বিভিন্ন) ধাপ, ১৪১; নিরাকারের-, ৬০, ২৫১, ৩০৭, ৩৪৭, ৪০৪-১৮; -এবং নিদ্রা, ২৮৮, ৩২৯, ৩৯৮; -এর পথ (রাজযোগ), ৩০; -এর পথে বাধা, ১৭৭-৭৮, ৩৪৪, ৪৮১; পাতঞ্জল যোগের অঙ্গহিসেবে-, ২৮৮; -এর প্রণালী, ১৪০-৪১; -(উচ্চস্তরের) প্রার্থনা, ৩৫০; প্রার্থনার-এ পরিণতি, ৩৪১; -এর ফল, ১৮২-৮৩, ৩০৭-০৮, ৩৪৫-৪৬, ৪৯৪; -প্রসঙ্গে (স্বামী) ব্রহ্মানন্দ, ২৯৮-৯৯; শ্রীশ্রীমায়ের-, ৩৯৬

নরহরিদাস—তুলসীদাসের গুরু, ৬০৫

নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ দ্রঃ)—১৫-১৬, ২১৭, ৫৫৫; -এর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, ১২৯-৩০, ৩৯২, ৪৬১-৬২, ৪৯৮; -এর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ-ভালবাসা, ১৩৮-৩৯, ১৪৩, ২৪০; -এর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার, ৪৯, ৪৯৮

নাগমহাশয় (সাধু)—দুর্গাচরণ নাগ দ্রঃ

নানক (গুরু)— ঈশ্বরের নামকীর্তনের ওপর গুরুত্ব দান, ৩৯৫; -এর জীবন কাহিনী, ৬০২-০৪

নামদেব—৫৯০-৯২

নায়নমার—৫৮৩

নারদ—ঈশ্বরীয় প্রেম সম্বন্ধে, ১০; -এবং সনৎকুমার সংবাদ, ২৮৪-৮৫; -এবং বাল্মীকি কথোপকথন, ৪৫৯-৬০

নিউ টেস্টামেন্ট— -এ পুনর্জন্মবাদ, ৪৩-৪৪, ১৮৭

নিদিধ্যাসন— -এর অর্থ, ৩৬৮

নিয়ম—৪৮৩; -পঞ্চসূত্র, ১৭০-৭১, ২৮৭, ৩০২; -পাতঞ্জলযোগের অঙ্গ, ৩০, ১৭০-৭১, ২৮৭, ৩০১-০৪

নির্বাণ—২৩০, ৫৩৭, ৫৪০; বুদ্ধের -লাভ, ৪৭; -শব্দটি শূন্যতা বা বিনাশের দ্যোতক নয়, ৪৫৭

ন্যায়সূত্র—৪১

পতঞ্জলি—১৬৬, ৩৮৭; -র মতে অজ্ঞান, ২৮, ১০৮; -র অষ্টমার্গ যোগ, ৩০, ২৮০, ২৮৭-৮৯, ২৯৩; -র মতে অহংত্ব, ৯৮-৯৯; (উচ্চতম) আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাতটি স্তর, ৫৩৭; -র মতে আধ্যাত্মিক জীবনে বাধা, ১০৯, ১২৬, ২০৭, ২৯৩, ৪২৯, ৪৭৬; আসন সম্বন্ধে-, ৩০১-০৪, ৩১৬-১৭; ঈশ্বর সম্বন্ধে-, ৫৪, ৩০৯; জপ সম্বন্ধে-, ১২৬, ২৯১; পূর্বজন্মের স্মৃতি-জাগরণ সম্বন্ধে-, ৪৭; বাহ্য ও অন্তর শুচি সম্বন্ধে-, ১৫৮, ১৭০, ২০৬; -র বিবর্তন তত্ত্ব, ৪৬২-৬৩; -র মতে শিষ্য তিনরকম ও তাদের মধ্যে প্রভেদ, ১২৫

পরমাত্মা— -র অংশ হলো জীবাত্মা, ১৪০, ২৮৯, ২৯৬, ৩০৬, ৫২২; -অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, ৩৪৩; -ই ইষ্টদেবতা, ২৯১, ৩৪৬; -র দ্বারা জীবাত্মা পরিব্যাপ্ত, ১৩১; -ও জীবাত্মার মিলন বিন্দুই চক্র, ৩৪৪; -র সঙ্গে জীবাত্মার মিলন, ৩২, ২৮৯, ৩১০, ৩৯৭; -র সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের তীব্র বুভুক্ষা, ২৩৯; জীবাত্মার হৃদয়ে-র বিশেষ আসন, ৩২২; জীবাত্মা স্বরূপত ঈশ্বর বা-, ৫৪৯

পল (সন্ত)—১৮৫, ৫৬৭

পুরাণ—গ্রীসীয়-, ৯৮, ১০৭; -এর দেবদেবীসমূহ, ১৭৩; -এ পূজা সম্পর্কে উপদেশ, ৩৭৬; -এ প্রহ্লাদের প্রশংসা, ১৪; মিশরীয়-, ১০৭; -এ সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে, ১৩৮

পুরুষ— সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্, ১০৩-০৪; -পতঞ্জলি, ২৭; বিরাট-, ৩০৭; যোগদর্শনে-, ৫৪; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫৫; সাংখ্যমতে-, ৫৪, ২৯৬

পুরুষ-সূক্ত—৭৩প, ২৩০প, ৪১১

প্রকৃতি—২৯৬, ৩৮৪; -ও মায়া, তুলনা, ৫৪; সাংখ্যমতে-, ২৯৬

প্রজ্ঞা—৪৫২

প্রতিমা—উপাসনায়-র ব্যবহার, ৩৬৯; -পূজা, ২৮১

প্রতীক— -উপাসনা, ৩৬৮-৬৯

প্রত্যাহার—৩১২; পাতঞ্জল-যোগের একটি পদক্ষেপ, ২৮৮

প্রহ্লাদ—১৪

প্রাণায়াম—এর অনুশীলনে বিপদ, ৩০, ৩০৫, ৪৭৯, ৬৪৩; -এর উপকারিতা, ২৮৮; -পাতঞ্জল যোগের অঙ্গ হিসেবে, ৩০, ২৮৮; -এর প্রণালী, ৩১৭, ৩৩৫

প্রার্থনা— ৬৯, ১৪৮, ২০৫, ২৭২, ২৭৮, ২৯৬, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৭৪, ৪৬০, ৪৯১, ৫২৩, ৫৭৬, ৬২১, ৬২৫; -র অনুশীলনে প্রতিক্রিয়া, ৪৭৫-৭৬; -র মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা লাভ, ৫১৮; আধ্যাত্মিক জীবনে-র স্থান, ৩৪৮-৬৩; ঈশ্বর-য় সাড়া দেন, ৬০; -উপলব্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, ২৭৯; -ও কর্মের সমন্বয়, ২৭০, ২৭১, ৩১৫, ৪২১; (শ্রী) কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা, ৫৫, ২৫৯; তুলসীদাসের-, ৬০৮-০৯; -ও ধ্যান শান্তির একমাত্র পথ, ৩৪৫; -ধ্যানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, ১৮৩, ৪০৩; (গুরু) নানক সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ-, ৬০৩, পবিত্রতার জন্য-, ১৭১-৭২; পরহিতে-, ১৫০; (সন্ত) ফ্র্যান্সিসের-, ৫৬৮-৬৯; -আরও বেশি করে করতে হবে, ১২, ১৬৩, ২০৮, ৪০১; -প্রসঙ্গে (স্বামী) ব্রহ্মানন্দ, ১২৭, ১৮৩, ৩৬৭; ব্রহ্মে আত্মসমর্পণের জন্য-, ৩৭৮; মনকে শান্ত করতে-, ৩২৬; মহাপুরুষদের শুভ আবির্ভাব তিথিতে-, ৩৩১; মীরাবাঈয়ের-, ৬১৩; যীশুখ্রীস্টের-, ৩৯৩; -প্রসঙ্গে (শ্রী) রামকৃষ্ণ, ১৩৩, ৬৪৪; -সম্বন্ধে (ভাই) লরেন্স, ৫৭০; -র সময় ৭৮, ৪২১, ৬৫৩; -সাম্যভাব নিয়ে আসে, ২৩৫; -র সাহায্যে সুপ্তশক্তির জাগরণ, ১১৭, ৪৩৩; হিন্দুধর্মে-, ৫৮

প্লটিনাস—৪৩, ৫৬৬

প্লেটো—আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে-, ৪৩

ফিঙ্ক (ডঃ)—২১

ফ্রয়েড (সিগমণ্ড)—৯৫

ফ্রান্সিস (সন্ত) (এসিসির)— -এর জীবন, ৪৬০, ৫৬৮-৬৯

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৫

বলরাম বসু—১৫-১৬

বাইবেল—১৪৩প, ৫৬৭প; -এ আত্মার পারলৌকিক জীবন, ১৮৭; -এ আধ্যাত্মিক দীক্ষা, ১২৪; -এ আধ্যাত্মিক সাধনা, ৯৭, ২০২; -এ আধ্যাত্মিক সুখ, ৭; -এ ঈশ্বর ও ধনদেবতা, (ম্যামন), ৮৭; -এ ঈশ্বর ও মানুষ, ৯৬; -এ ঈশ্বরপ্রেম, ১৪৯; -এ জবের চিরকুমার; ১৮৫; -এ জবের উপাখ্যান, ৩০, ২৬৭; -এ পুনর্জন্মবাদ, ৪৩-৪৪, ৪৭; -এ যীশুখ্রীস্টের আশ্বাস, ৫৩৩; -এ শব্দব্রহ্ম, ৩৮৭; -এ সত্য ও মুক্তি, ৫৪৪

বাচিক (জপ)—৩৯২

বাসনা— -র অর্থ, ৩৮-৩৯; -ক্ষয়, বিদ্যারণ্যমতে, ৫৩৭; দ্ব্যর্থবোধক কথাটির জন্য লালাবাবার পরিবর্তন, ১৫৯

বিজ্ঞান— -সম্বন্ধে (শ্রী)রামকৃষ্ণ, ৫২৯, ৫৩৪-৩৭
বিজ্ঞানী—৫৩৪-৩৭
বিদ্যা—৩৯৫; দুইপ্রকার-সম্বন্ধে উপনিষদ্, ৩১; ব্রহ্ম-, ১২৩, ২৮৩; -শক্তি (ব্রহ্মজ্ঞান) ২১৯, ৩৪৯
বিদ্যারণ্য—৫৩৭
বিবেকচূড়ামণি—৫প, ৯২প, ১৪২, ৫৫৬-৫৭
বিবেকানন্দ (স্বামী)—নরেন্দ্র দ্রঃ; ৪৮-৫০, ৫৫৫, ৫৭৫; অধ্যবসায় সম্বন্ধে-, ২১৪; অবতার প্রসঙ্গে-, ১২৯; -আজও বেঁচে আছেন, ৩৩১; -র আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ১২৯-৩০, ১৪৩, ২৪১, ২৬৪, ৩৫০, ৩৮৪, ৪৬১-৬২, ৪৯৮, ৫১০, ৫৩৪; -এর আধ্যাত্মিক জীবনে সংগ্রাম, ৪, ৪৮৪; -এর আধ্যাত্মিক শক্তি, ১৩০; আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে-, ৫০৮; ঈশ্বর বা আত্মোপলব্ধি সম্বন্ধে-, ১১২-১৩, ১১৪, ১৩৫, ১৬৪-৬৫, ২২৩, ৫৪০; -প্রদত্ত ঈশ্বরের সংজ্ঞা, ৫৩২; -এর উপদেশ, ৮৮, ৯৮, ১৭১, ২৫১, ২৯৪, ৪০৭, ৪৯৯, ৫১২, ৫৩৬, ৫৪০, ৫৫২, ৫৫৯, ৬৫৩; -এর কবিতাবলী, ১৯২, ২২২, ৪৯৫, ৫৩৩; কর্তব্য সম্বন্ধে-, ৬৯-৭০, ৭২; কর্মযোগ সম্বন্ধে-, ৬৮-৭০, ৩৬৫; ক্রমঃবিবর্তন তত্ত্ব সম্বন্ধে-, ৪৬২-৬৩; -এর জীবন ও বাণী, ৫৭৩-৭৪; -এর জীবন থেকে পুনর্জন্মবাদের প্রমাণ, ৪৯; -এর দৃষ্টিতে ঈশ্বর, ৫৫; দেহান্তর ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে-, ৩৫, ৩৭, ৩৮; ধর্ম ও অনুভূতি সম্বন্ধে-, ২৫-২৬; ধর্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে-, ৫৩৪; -প্রদত্ত ধর্মের সংজ্ঞা, ২৭, ২৩৮, ৩০৯, ৫৪৯; ধ্যান সম্বন্ধে-, ১৭১; নিজের মোক্ষ সম্বন্ধে-, ৪২৯; প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে-, ৩৬৯; বাহ্যিক ভাবাবেগ সম্বন্ধে-, ৪৭২-৭৩; বিশ্বাস সম্বন্ধে-, ১৭৩; -এর ব্যক্তিত্ব, ২২৬-২৭, ২৩৬; ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে-, ১৯৯, ২০০; -কর্তৃক 'মন' শব্দের শ্লেষাত্মক প্রয়োগ, ৩০২; -এর মহাসমাধি, ৪৯-৫০; -এর রচনাবলী (যোগ-সম্বন্ধীয়), ২৭৮; -এর প্রতি (শ্রী) রামকৃষ্ণের ভালবাসা, ১৪৩; শুচিতা সম্বন্ধে-, ১৭২; শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে-, ৫৬৫; সুখের প্রকৃতি সম্বন্ধে-, ২৬১; স্ফোট এবং শব্দ ব্রহ্ম সম্বন্ধে-, ৩৮৪-৮৫, ৩৮৯
বিশিষ্টাদ্বৈত—৫৮৮; -এর অর্থ, ৫৯, ৫৮৩; রামানুজ-কর্তৃক-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, ৫৮৩; হিন্দুধর্মের এই প্রাচীন তত্ত্বের পুনরুদ্ধার, ৫৭৭
বিষ্ণু—৫৬১; -অবতার, ৩৭১; ইষ্টদেবতা-রূপে-, ৫৩০; -পদই সাধকদের পরম লক্ষ্য, ৫৪৫; -র প্রতীক, ৩৭১; -র ভক্তগণ; অণ্ডাল, ৫৮১; তিরুপ্পন আলোয়ার, ৫৭৯; প্রহ্লাদ, ১৪; -ভাগবত ৫৭৮; রামানুজ কর্তৃক-উপাসকদের নিয়ে এক স্বতন্ত্র ধর্মগোষ্ঠীর প্রবর্তন, ৫৮৩; -র নিকট শঙ্করাচার্যের প্রার্থনা, ৩৫৯
বিষ্ণুচিত্ত (পরিয়ালোয়ার)—৫৮১
বুদ্ধ (দেব) (সিদ্ধার্থ)—৬৬, ১৩৬, ২৩১, ২৫২, ৬২৭, ৬২৯, ৬৪৩; অবতাররূপে-এর বাণী, ৩৮০; -এর অমরত্ব, ৩৩১; -এর অষ্টমার্গ, ৩৩; -এর আচার-অনুষ্ঠান অপেক্ষা পবিত্রতার ওপর বেশি গুরুত্বদান, ৯০; -এর 'আত্মদীপো ভব'-এর মন্ত্র, ১২৮; -এর (সিদ্ধার্থের) আধ্যাত্মিক পথ গ্রহণ, ৩; -এর ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলা, ৯০; -চেতনা, ৫০১; দৃশ্য জগতের অস্থায়িত্ব সম্বন্ধে -এর বাণী, ৭৮; -এর নাম জপ, ৩৯৪; -এবং নির্বাণ, ৪৫৭, ৫৪৪; -এর বংশধারা, ৪৭-৪৮; -এর বোধিলাভ,

৫৫০; -এর মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ, ১১৪-১৫; -এর শিষ্য উপগুপ্ত, ৫৬৭; -এর 'সম্যক সঙ্কল্পের উপদেশ, ১৩৪
বুদ্ধি— -র অনুসন্ধান, ৪৯৯-৫০০; দেহাত্ম-২৮২; সারথির উপমা, ১০৩
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—৫৯প, ৭৫প, ৮৯প, ১৫০প, ২১৬, ২৮৭প, ৩২৪, ৪১১, ৪৪৩প, ৪৪৮-৪৯, ৪৬৯, ৫০২, ৫০৫, ৫৫৮-৫৯
বেদ—৪১, ২৮৪, ৪৯৯, ৫৪৭; -এ ঘোষিত লক্ষ্য ওঁ, ৩৮৬; -এ নির্দেশিত পথ, ৩৬০; -এ বিরাট পুরুষের ধারণা, ২৩০; বিশ্বই -এ উক্ত শাশ্বত বাণীর অভিব্যক্তি, ৩৮০; -এ বিষ্ণুর উল্লেখ, ৫৭৮; -এ'ভূমি' বা আধ্যাত্মিক স্তর, ৫২৬; -এ মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে মন্ত্র, ৬৪; শতারির তামিল-, ৫৭৯
বৈজ্ঞানিক—২৩, ৪০, ১১৯, ৩১২, ৪১৩; -দের অনুসন্ধানে সত্য প্রকাশ পায় না, ২৫; -গণ আধ্যাত্মিক অনুভূতির সত্যতা স্বীকার করেন, ৪৯৭; -টমাস হাক্সলি, ৪৪-৪৫; -দের মনের ওপর গবেষণা, ৯৫
বৈদিক—আচার-অনুষ্ঠান (মীমাংসকদের), ৫৪৫-৪৭; -ঋষিগণ, ৪১১, ৪৩৬-৩৭; আহার সম্বন্ধে-, ১১৫; -র 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'র বাণী ৩৬০; ঈশ্বরোপলব্ধি ও অমরত্ব সম্বন্ধে-, ৫৫৫; -কর্তৃক বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, ৫৮;
-প্রার্থনা, সুস্থ দেহমনের জন্য, ২৮৬;
-যুগ, -এ দেবদেবী ও প্রতীকের উপাসনা, ৩৭১; -এর দেবদেবীগণ, ৬১, ৩৭২; -এ দেবী মাতৃকার পূজা, ৬৪
বৈষ্ণব (গণ)—১৫, ৫৩০; আলোয়ার-, ৫৭৮-৮৩; -গুরুগণ কেউই স্বর্গকে সাধনজীবনের লক্ষ্য বলে মানেন নি, ৫৪৫; -গুরু নাথমুনি, ৫৮২; (শ্রী) চৈতন্যদেবের মতবাদ 'জীবে দয়া', ৩৯৫; -পুরন্দরদাস, ৫৮৮; -মন্দির, ৫৮১; -লালাবাবা, ১৫৯; -শাস্ত্রে বহু পথের নির্দেশ, ৩৬০
বৈষ্ণব মত—৩৬৫, ৫৭৯
বৌদ্ধ (ধর্মাবলম্বিগণ)—৪১, ৫০১, ৫২৫, ৬৩৪; -আত্মার ও অমরত্বে বিশ্বাসী নন, ৪১, ৯৫; -সাহিত্য ৮৬
বৌদ্ধধর্ম— -এ অর্হৎ ও বোধিসত্ত্ব, ৫৩৭; -এ ধ্যান ও পবিত্র জীবনযাপনের গুরুত্ব, ৩৯৪; -এ নির্বাণ, ২৩০-৩১, ৪৫৭, ৫৪০; -এ ব্রহ্মচর্যের ওপর গুরুত্ব, ২০৩; -সর্বজীবের প্রতি করুণার ধর্ম, ১৩৪
ব্যাস (দেব)—আসন সম্বন্ধে-, ৩০৪; -এর যোগসূত্রের ভাষ্য, ১৬৬, ১৭১
ব্রহ্ম—৫৩, ২৮৯, ৩২৭, ৩৬৭-৬৮, ৩৯০, ৪৫৮, ৫০৭, ৫১১, ৫৩৩, ৫৫৫, ৫৭৭; -এর অদ্বৈত স্বরূপ, ৫৪; -অনুভূতিই প্রকৃত মুক্তির পথ, ৫৪৩; অভীঃই হলো ব্রহ্ম, ২১৬-১৭, ৫৫৮; -এর সঙ্গে আত্মার ঐক্য, ৯৭, ৯৯-১০০, ২৯৬, ৩৫৭-৫৮, ৪০৮-০৯, ৪৫১, ৫৫৬-৫৭; -এর সঙ্গে আত্মার মিলন, ৪০৭; -র উপলব্ধিই হলো গুণাতীত অবস্থা, ১৮১; -উপলব্ধির পথে বাধা, ৪৭৬-৭৭; -চিন্তা, শুদ্ধ মনেই সম্ভব, ১৬৬; -ই জীবের প্রকৃত সত্তা, ৫১৭; -জ্ঞানীই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ১২৪-২৫; -জ্ঞানীর প্রকার ভেদ, ৫৩৭; দেহ হলো-মন্দির, ৩২৫; -এর ধ্যান, ১৬৯, ১৭১; -নাদ, ৩৮৭-৯০, ৪০২; নিরাকার-, ৩৬৬; -এর প্রতীকোপাসনা, ৩৬৯; -বাদিনী, ৫৬৫; -এর বিবিধ নাম, ২৯০; -এবং মায়া, ৪৫৭; মীমাংসকগণের -এ অবিশ্বাস, ৫৪৫; (শ্রী)রামকৃষ্ণের-অনুভূতি, ৫৬৪, রামানন্দের-অনুভূতি, ৫৯৮-৯৯; -রূপে ওঁকার, ৩৭২, ৩৮৫-৮৬, ৩৮৯-৯০; -রূপে মা কালী (শ্রীরামকৃষ্ণ-

দৃষ্টিতে), ৬৪-৬৫; -রূপে মা ভবানী (শ্রীশঙ্করাচার্য-দৃষ্টিতে), ৩৬০; -ত্ব লাভে গুরুর প্রয়োজনীয়তা, ১২৭-২৮, ২৮২-৮৩; -এ সকল সত্তার একীভবন, ২৭, ৩৫৭-৫৮, ৪০৫, ৫৩৪, ৫৩৬; সগুণ ও নির্গুণ-, ৫৭, ১৫৩, ৫৩৫, ৬১০; সনৎকুমারের-উপদেশ, ২৮৪-৮৫, -এ সর্বস্ব সমর্পণ, ৩৭৭-৭৮

ব্রহ্মচর্য—অধ্যাত্মজীবনে - অবশ্যপালনীয়, ১৭০; -এর অনুশীলনে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান, ৫৫১; -এর অর্থ, ২০২; পতঞ্জলির অষ্টমার্গ, ২৮৭-৮৯; -এর প্রয়োজনীয়তা, ১৯৯-২০১; সংসারীদের জন্য, ১৮৫-৮৬

ব্রহ্মসূত্র—রামানুজ-ভাষ্য, ৫৮২; শাঙ্কর ভাষ্য, ৫৬১

ব্রহ্মা— ৬৬, ৬১১; সৃষ্টিকর্তা (হিরণ্যগর্ভ), ৫৪, ৩৮৫

ব্রহ্মানন্দ (স্বামী)—(রাখাল দ্রঃ), ১৫৫-৫৬, ২৯১, ৫৭৪-৭৫; অন্তিম শয্যায়-এর অলৌকিক দর্শন, ৫১; -এর আধ্যাত্মিক শক্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ৫০৮-০৯; কর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে, ২৭০; কামনা জয়, ৩০২; কুণ্ডলিনী জাগরণ, ৫২৫; গুরুর কর্তব্য, ১২২; গুরুর প্রয়োজনীয়তা, ১২৩, ২৮২-৮৩; গুরু হিসেবে মন, ১২৭, ৬২১; গ্রন্থকারের প্রতি-এর উপদেশ, ১২৫, ২০০; গ্রন্থকারের স্বপ্নে -এর দর্শন, ৫০৪-০৫; 'জপ' সম্বন্ধে, ১২৭, ২৯৮-৯৯, ৩৯৬-৯৭, ৪২৫; 'ধ্যান' সম্বন্ধে, ১৮৩, ২৯১, ৩২০, ৩৩১; 'পূজা' সম্বন্ধে, ৩৬৭; 'ব্রহ্মচর্য' সম্বন্ধে, ১৯৯-২০০, ২০৫; (বিক্ষুব্ধ) মনকে প্রশান্ত করা, ২২৪-২৫; 'শব্দব্রহ্ম' সম্বন্ধে, ৩৮৫

ব্রাহ্ম—১৫, ৫৬৪

ভক্ত—৭, ২১, ৩১, ৫৫, ৫৭, ৬১, ৭৫, ১২৭, ১৩১, ১৩৪, ১৪০, ১৪৯, ১৫১, ১৯১, ২৩৮, ২৬৭, ২৭৭, ২৭৮, ২৮২, ৩০২, ৩০৬, ৩০৭, ৩৩০, ৩৪২, ৩৬০, ৩৬৪, ৩৭৭, ৩৮৯, ৫০৯, ৫২৭, ৫৩৭, ৫৬৩, ৫৭৫, ৫৮৮, ৬০৬, ৬১১, ৬৫১; আদর্শ -এর লক্ষণ, ৩৪, ৬৫, ১৭৬, ৩৪৫, ৩৮২, ৪১৯, ৫৮০-৮১, ৬৩৮, ৬৪৪, ৬৫৩; -এর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ১৩০, ৩৫৭, ৫২৬; -এর আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ, ১৩৫; ইষ্টের সঙ্গে -এর নিত্য সম্পর্ক, ৪২২; -এর ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা, ৫৮, ৬৫-৬৬, ২৫৫, ২৮৯, ৩৫২, ৪০৬, ৪১৮, ৬৩২; -এর ঈশ্বরে ব্যক্তিরূপের আরোপ ২৫৩; ঈশ্বরের প্রতি -এর মনোভাব, ৬৩২; -এর প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, ১৬, ২৫, ৮৭, ৪৯১, ৫৮৫; -এর সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, ২৭, ৬২-৬৪, ৩০৯, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৬, ৫৮২, ৬১২; -এর মতে উদ্ধারের পথ, ৬৬; -সম্পর্কে উপনিষদীয় ধারণা, ৩০৬-০৭; (শ্রী) কৃষ্ণের -এর প্রতি আশ্বাস, ২৪৬; -এর কোন জাতিভেদ নেই, ২৪০; -এর দিব্য বা ঐশী শক্তি, ২৫৬; -এর দুর্ভোগ ও পরীক্ষা, ২৫৭, ২৬৩, ৪৮৫; -এর প্রকারভেদ, ৫৭, ৬২, ২৪১-৪২, ৬৩১; -এর প্রয়োজনীয় গুণাবলী, ৩৪০-৪২; -এর প্রার্থনা, ৩১৪, ৩৫৪, ৩৫৯, ৫৮০; -এবং ভগবৎ কৃপা, ২৬০, ৩৫১, ৫০২; (শ্রী)রামকৃষ্ণের -, ৯৬, ১০৩, ২৮৩, ৪৩০, ৪৭২; শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর -, ১৮৮-৮৯, ৫৬৫;

ভক্তি— (ঈশ্বর প্রেম বা প্রীতি দ্রঃ), ১৩৪, ২৭২, ২৮৬, ৩৩৮, ৩৪৫, ৪২২, ৪৮৯, ৫২১, ৫২৭, ৫৩৬, ৫৪৮, ৫৭৪, ৫৯০, ৬২৫; -মাধ্যমে আত্মার অমরত্বের অনুভূতি, ২৪৬; -আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি, ৬২২; ঈশ্বর -র অসীম উৎস, ২৮১; উত্তরভারতে -আন্দোলন, ৫৮৩, ৫৯০, ৫৯৭, ৬১১; -

(সম্বন্ধে) একনাথ, ৫৯২-৯৩; কারাইক্কাল আম্মায়ারের -, ৫৮৬; - এবং জপ, ২৯৮, ৩০৮, ৩২৮, ৩৮১-৮২, ৩৯৫-৯৬; - ও জ্ঞান, চরম পর্যায়ে অভিন্ন, ৫৮৮; - (সম্বন্ধে) তুকারাম, ৫৯৬; - (সম্বন্ধে) তুলসীদাস, ৬০৮; দক্ষিণভারতে - আন্দোলন, ৫৮২; দুঃখ অচলা -সঞ্চারী, ২৬০; নামদেবের - , ৫৯১; -র পথে শৃঙ্খলা, ২৭৮-৭৯, ৩০৯, ৫৩০; পরা-, ৫৭৮; প্রকৃত -র বর্ণনা, ২৫৫; ফাঁকা -র নিন্দা (কবীরের), ৬০০; বঙ্গে - আন্দোলন, ৬১৫; বাসবেশ্বরের -, ৫৮৮; -(সম্বন্ধে) বিবেকানন্দ, ৫১২; -র জন্য বিবেকানন্দের প্রার্থনা, ৩৫০; -র ব্যাখ্যা, ২৩৮; - ও ভগবৎ কৃপা, ৪৯৩; ভারতীয় নারীর পতি-, ৬১৩; -মার্গ, ৫৩০, ৬১১; - ও মীরাবাঈ, ৬১৩; - (বিষয়ে) মীরাবাঈয়ের উপদেশ, ৫৯৯; -মুক্তি বিধানের সহায়ক, ১৬২, ১৬৯, ৫৪২; - ও মূর্তি পূজা, ৩৬৯; - (সম্বন্ধে) রবীন্দ্রনাথ, ২৫৯; -(সম্বন্ধে) (শ্রী) রামকৃষ্ণ, ৩৯৫-৯৬; (শ্রী)রামকৃষ্ণ শিষ্যমণ্ডলীর -, ৫৭৫-৭৬; -বিষয়ে রামানন্দের উপদেশ, ৫৯৯; রামানুজের - দর্শন, ৫৯, ৫৮৩; শঙ্করাচার্যের - (হিন্দুদেব-দেবীর প্রতি), ৫৬১; -শাস্ত্র, ২৯০; -র সংজ্ঞা, ৩৫৬; সাংসারিক সংসর্গ -পথের অন্তরায়, ১৩৫

ভক্তিযোগ—(যোগ দ্রঃ), -আধুনিক যুগে সহজতম পথ, ৯৯; -এর পথে পবিত্রতার গুরুত্ব, ১৬৮; -(সম্বন্ধে) (স্বামী) বিবেকানন্দের গ্রন্থ, ২৭৮, ৩৮৪-৮৫; -এর রূপরেখা, ৩১, ৩৩

ভাগবতম্ (শ্রীমদ্), ৫৫, ৭৫, ১৪৫প, ২০৩, ৬১০; -এ অবধূত ও তাঁর গুরু, ১২৮, ৪১৫; -এর অংশ 'উদ্ধবগীতা', ১৪৫; -এ (সর্ব) আসক্তিকে ঈশ্বরমুখী করা, ২৪৬; -এর (একাদশ স্কন্ধ) ওপর একনাথের ভাষ্য, ৫৯২; -এ (শ্রী) কৃষ্ণই পরমেশ্বর, ৫৫; -এ ধর্ম ও সন্ন্যাস, ৪২৪-২৫; -এ পিঙ্গলার উপাখ্যান, ১৫৫-৫৮; -এ বাচিক উপাসনা, ৩৭৬; -এ যযাতির উপাখ্যান, (মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত) ১৫৬-৫৭; -এ সংসার বৃক্ষের বর্ণনা, ১৬২; -এ সাংসারির কর্তব্য, ১৮৬; -এ সাধুসঙ্গ, ১৪২; -এ স্বর্গসুখের নিন্দা, ৫৪৫

ভৈরবী ব্রাহ্মণী—শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু, ৪৯৬

মধ্বাচার্য—৫৭৭

মনস্তত্ত্ব (মানসিকতা)—মনস্তাত্ত্বিক, ১৯, ১৭২, ২০২, ৩৫২, ৪৬৪; অস্বাভাবিক-, ৪২৪; আধুনিক- ও নৈতিকতা, ১১৩; (ডঃ) অ্যাডলারের- সংক্রান্ত চিন্তাধারা, ২০, ১১৪; দেহ-মনের জটিলতায়-, ৩৭৫; ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে তুলনায়-, ২২৮; ধ্যানবিষয়ে- নিয়ম, ৪১৪; পাশ্চাত্য-, ১৯, ৯৬; ব্যক্তিত্বের সংহতির ধারণায়-, ২৩১; ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য -এর মধ্যে পার্থক্য, ৪৩২; সাংখ্যবিদ্‌গণের দৃষ্টিতে-, ৫৪; - স্থৈর্যই যথেষ্ট নয়, ২২৯

মনস্তত্ত্ববিদ্—১৯-২১, ২৩, ৭০, ১১৪, ২০২, ২০৬, ২৮৯, ৩১২, ৫২৩; অবদমন সম্বন্ধে-, ৪৩১-৩২; 'কাম' সম্বন্ধে-, ১৮৪; কার্ল জঙ্, ২০-২১; দেহ ও মন বিষয়ে আধুনিক-, ৯৫-৯৬; দেহ-শিথিলিকরণের (বিশ্রাম দেওয়ার) ব্যায়াম সম্পর্কে-, ১১২; নিজেদের সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি সম্পর্কে-, ১৯; প্রাচীন ভারতের-, ৪৬৯; 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে-, ২২৮-২৯; ব্যক্তিত্বের সংহতি সম্বন্ধে-, ২৩১, ২৩৪; ভাবাবেগ সম্বন্ধে-, ২২৬-২৭, ৩০৬; মন সম্পর্কে পাশ্চাত্য-, ২২৫; মানসিক জটিলতা সম্বন্ধে-, ২৮, ২২৫-২৭; মানসিক দ্বন্দ্ব বিষয়ে-, ২২৯, ২৩৪; সহজাত প্রবৃত্তি সমূহের উৎস

সম্বন্ধে-, ৪৬৮; স্নায়ুরোগ বিষয়ে-, ৪৬৫-৬৬; স্বপ্ন বিষয়ে -ফ্রয়েড এবং জঙ্, ৫০৪
মনু—৬৭, ৩৭৬
মনোবিশ্লেষণ (বিশারদ)—১৯, ১১৩, ২২৭, ৪৭১
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ—২২৭, ৪৬৫, ৫১৩; মেনিঙ্গার, ২২৮-২৯; (ডঃ) হ্যাডফিল্ড, ১১৩
মন্ত্র—৩১, ১২৯, ১৩০, ১৬১, ৪২২, ৫৯৯; -এর অর্থ, ২৯১, ৩৭২; -মাধ্যমে ঈশ্বরের শক্তির সঞ্চার, ১২৪; -এর প্রকার ভেদ, ৩৯১; -এর বারংবার উচ্চারণ (জপ), ১২৬, ২৫১, ২৯১, ২৯৩, ৩০৭, ৩৩০, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৯১, ৩৯৭-৪০১, ৪৯২, ৫১৫, ৬৪২; -এর ওপর বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা, ৩৭৯, ৩৯৮; রামানুজ কর্তৃক গণদীক্ষাদান, ৫৮৩; -শক্তি ৩৭৯, ৩৯২; শক্তি-, ৪০২; -দ্বারা শক্তির জাগরণ, ১২৪; -শাস্ত্র, ৩৮৮; -এর সংজ্ঞা, ৩৭২, ৩৯১; স্বপ্নে-প্রাপ্তি, ১৩০, ৫০৫
মরমিয়া (সাধক)—১২, ৩৩, ২০৩, ৪৯৬-৯৮, ৬৩৬; -অনুভূতি, একনাথের, ৫৯৩, (শ্রী)রামকৃষ্ণের, ৫৬৪, সুরদাসের, ৬১২; আধ্যাত্মিক দিক থেকে -এরা কর্মকুশল, ২০৫; আলোয়ারগণ ছিলেন মহান-, ৫৭৮; ইসলাম জালালুদ্দিন রুমি, ৫৭২; মনসুর আল হাল্লাজ, ৫৭০-৭১; রাবিয়া, ২৩৬, ৫৭০; সুফীবাদ, ২৯, ৫৫৬; খ্রীস্টান ধর্মে-, ২৯, ৯৭, ১১০, ৩১৫, ৫৫৬, ৫৬৭-৭০; অনভিব্যক্ত আলোক, ৫৩২; (সন্ত) অগাস্টাইন, ৪৬০-৬১; (সন্ত) ইগনেশিয়াস লয়োলা, ৫৭০; (সন্ত) জন (ক্রসের), ৫১২, ৫২৪, ৫৭০; (সন্ত) টমাস অ্যাকুইনাস, ৫৬৯; (সন্ত) তেরেসা (অ্যাভিলার), ৫৭০; (সন্ত) পল, ৫৬৭; (সন্ত) ফ্রান্সিস (এসিসির), ৪৬০, ৫৬৮; ভাই লরেন্স, ৫৬৯-৭০; -এর গুপ্ত সোপান, ৫১৮; -এর নিগূঢ় দর্শন, ২০১; -এর পথ, ২৭-২৮; পবিত্রতার ন্যূনতম ভিত্তির ওপর -এর গুরুত্ব দান, ২৯৯; পিথাগোরাস সম্প্রদায়, গ্রীসের, ৩৮৯; প্লটিনাস, নয়া-প্লেটোবাদের দার্শনিক, ৫১১; -এর বীজ নামের রহস্য মন্ত্র, ৩৯০; মীরাবাঈ, বিশ্বের এক একনিষ্ঠ - সাধিকা, ৬১২; (ভাই) লরেন্স (ফরাসী), ১২৮; লাওৎ সু, চৈনিক-দার্শনিক, ১১৯; -সাধনা, ৩৬৪-৭২; সুফি, ৫৭১-৭৩; হিন্দু-, ৫৭২, ৫৯৪; শঙ্করাচার্য, ৪৬৯
মরমিয়াবাদ—ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মে, -এর অস্বীকার, ২৯; বধূরূপে আন্দাল (গোডা), ৫৮১-৮২; মহারাষ্ট্রে-, ৫৯০
মহৎ, মহত্তত্ত্ব— ৫৫, ১০৪
মহম্মদ—২৬, ৩৩, ৫৩৮
মহাপুরুষ (অবতার পুরুষ, পয়গম্বর, (লোকগুরু)—৬১, ১৬৫, ২১৪, ৩৮০-৮১, ৫৬১, ৫৬৬; -দের মুখ দিয়েই ঈশ্বর কথা বলেন, ৬৬; -দের মধ্যে পবিত্র গুণাবলীর প্রকাশ, ৪০৫; (শ্রী)রামকৃষ্ণ, ২৬, ১০৪, ৪৯৮; -রাই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়, ৭
মহাপুরুষ মহারাজ (শিবানন্দ, স্বামী দ্রঃ)—১২৫, ১২৬, ১৩০, ৩৩০
মহাভারত—১৫৬, ৩৭৬
মাণিক্কবাচকর—৫৮৪-৮৫
মাণ্ডুক্যকারিকা—৫৩৩
মাণ্ডুক্যোপনিষদ্—৫৮প, ৩৮৬, ৪৫২
মানসিক (জপ)—৩৯২
মানসিক (মানস, মনো)— -অনুভূতি (অভিজ্ঞতা), ৫১১, ৫১৫; -ক্ষেত্র, ৬২৯; -ক্ষমতা, ১১৬, ৫০৯, ৫৭৪, ৬৪৭; -জগতের রহস্য, ৫০৭-১১; -জীবন, ৫১৯; -নিয়ন্ত্রণ, ৫৪৯; -বাধাসমূহ, আধ্যাত্মিক

পথে, ৪২৮, ৬৪৩; -শক্তিপ্রবাহের প্রণালী, ৪৩৩; -শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা, ৪৩১; -সংবেদনশীলতা, ৩৮৪

মায়া (বিরাট বা বিশ্বময়জ্ঞান)—৫৫, ১৯২, ২৫৩, ৪৫৪, ৬০৮, ৬১০; -ঈশ্বরের লীলা, ২৫, ৪৮৯; -র উপাদান, ত্রিগুণ, ৪৪৭, ৫৪৩; -র ওপারে ঈশ্বর, ৩৪৮-৪৯; বেদান্ত ও সাংখ্যের দৃষ্টিতে-, ৫৪; মহা-, ১৮৮; -শক্তি, ৭, ২৫৭, ৩৪৯, ৫৪৮

মীমাংসক (গণ)— -ঈশ্বর বিশ্বাসী নন, ৪১, ৫৪৫; কান্টের সঙ্গে -এর তুলনা, ৫৪৭; -এর নীতিশাস্ত্র প্রসঙ্গে আলোচনা, ৫৪৬-৪৭; -এর লক্ষ্য স্বর্গসুখ, ৫৪৫

মীরাবাঈ—৬১২-১৪

মুক্তি (পরিত্রাণ)—২২, ৬৬, ১৪৬, ৩৬৯, ৪২৯, ৫৮৩, ৬০৯; -এবং অপরের কল্যাণ, উভয় ইচ্ছাই মিলিয়ে দিতে হবে, ৩১০-১১; আত্মপ্রচেষ্টা ভিন্ন - লাভ অসম্ভব, ৯১; ইসলাম ধর্মমতে-, ৫৩৮; ইহুদী ধর্মমতে-, ৫৩৮; ঈশ্বর-প্রীতিই -র একমাত্র উপায়, ৫৭৮; ঈশ্বর-সান্নিধ্যই -র একমাত্র পথ, ১৯৪; খ্রীস্টমতে-, ৯৭, ৫৩৮, ৫৪০, ৫৪৪; বিশ্বাস এবং নৈতিকতাই-র উপায়, ২৯, ১৭২-৭৩; বেদান্তমতে-, ৫৪০; বৌদ্ধমতে-, ৩৯৪, ৫৪০, ৫৪৪; -র ব্যাখ্যা, ৫৩৮; মূর্তিপূজা -পথে বাধাস্বরূপ, ৩৭৩; সাংখ্যমতে-, ৫৪০; হিন্দুমতে-, ২৯, ৫৩৮, ৫৪০-৪৪, ৫৪৮

মুণ্ডকোপনিষদ্—৩৫৭প, ৪৪৩প, ৪৭৪প, ৫৫৫প, ৫৫৮প; ওঁ-কার সম্বন্ধে-, ৩৮৬; -এ দুই পাখির কলাকথা, ৪২, ৪৬৯-৭০, ৫২৬; পরমাত্মা সম্বন্ধে-, ৩২১; শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে-, ৩২১

মুসলমান (সম্প্রদায়)—২৬৪, ৫৯২, ৬১১

মোক্ষমুলার, অধ্যাপক—২২, ৬১, ৩৮৪প

যতীশ্বরানন্দ (স্বামী)—গ্রন্থাকার, ৫৫৪প, -অঙ্কিত আধ্যাত্মিক উন্মেষের বর্ণনা-চিত্র, ৫২৮; -বর্ণনা চিত্রের ব্যাখ্যা, ৫২৯-৩৭

যম—পতঞ্জলির যোগসূত্রে -এর পাঁচটি বিধি, ৩০, ১৬৯-৭০, ২৮৭, ৩০১, ৩০৩-০৪, ৪৮৩

যমুনাচার্য—৩৫৬, ৫৮২

যাজ্ঞবল্ক্য—জনকরাজার সঙ্গে -এর কথোপকথন, ৪৪৮-৪৯, ৫০৫, ৫৫৮-৫৯

যীশুখ্রীস্ট—১২৪, ১২৯, ১৩৬, ২৩১, ৩৪৮, ৩৭২, ৬২৭, ৬২৯, ৬৪৩; -এর অবতারত্ব, ৩৮০; -এর অমরত্ব, ৩৩১; -এর উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রার্থনা, ৩৯৩; -এর উপাসনা, ২৫২; -এর জীবন ও বাণী, ৫৬৩; -এর তুরীয় অনুভূতি, ২৬; -এর দীক্ষা, ১২৯; -কর্তৃক পুনর্জন্মবাদের সত্যতা প্রতিপাদন, ৪৩-৪৪, ৪৭; -এর প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব, ৬৪৪; -এর বাণী, ৫০০-০১; -এর ব্রহ্মচর্য বিষয়ে মতামত, ১৮৫; -এর শিষ্যমণ্ডলী, ১২৪, ১৪৯, ৫৬৭; -এর শৈলোপদেশ, ৩৩, ২০২

যোগ (কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ দ্রঃ)—১৯, ৩৪, ৪৭, ৪৯, ১০৯-১০, ১১৬-১৭, ২০৯, ৩১০, ৩৬০, ৪৬৬, ৫১৩, ৫২৩, ৫৩০, ৫৫০, ৫৯০, ৬১৪; -এর অনুশীলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন, ১১৫, ৩০০-০১; -সম্বন্ধে উইলিয়ম জেমস্, ৪৯৬-৯৭; কর্ম-, ২৯-৩০, ৬৮, ৯৯, ১৬৮-৬৯, ২৭৮-৭৯, ২৯৫; জ্ঞান-, ৩১-৩২, ৯৯, ১৬৮, ২৭৮, ২৯৫; -দর্শনে ঈশ্বর, ৫৪; পতঞ্জলির-, ২৮০, ২৯৩, ৩০১-০৪; -বিষয়ে পতঞ্জলির সূত্র, ২৭-২৮, ৪৭, ৯৮-৯৯, ১০৮, ১০৯, ১১৭প, ১৫৮, ১৬৬, ১৬৯-৭০, ১৭৯প, ২০৬, ২০৭, ২৮৭, ২৯১, ২৯৩, ৩০১, ৩০৩-০৪, ৩০৯,

৩৮৭, ৪২৯, ৪৬২, ৪৭৬, ৫৩৭; -সম্বন্ধে (স্বামী) বিবেকানন্দ, ২৫-২৬, ৪৬২-৬৩; -সম্বন্ধে (স্বামী) বিবেকানন্দের গ্রন্থ, ২৭৮; -সম্বন্ধে ব্যাস, ১৭২; ভক্তি-, ৩২, ৯৯, ১৬৮, ২৭৮, ২৯৫; -এর মনস্তত্ত্ব, ২০২; রাজ-, ৩০, ৯৯, ১৬৮; -এর লক্ষ্য, উপলব্ধি, ৩২-৩৩, ৫৪৯

যোগানন্দ (স্বামী)—১৮৮

যোগী—৪৭, ১১৭, ১৬৬, ১৯৯, ২৮৮, ৩১২, ৩১৭, ৩৯১, ৪৬৩, ৪৮৬, ৫০৯, ৫২৬

যৌগিক প্রক্রিয়া—৫২০-২১

রজঃ—৪৭০, ৪৭২; -আসুরীভাবের প্রবণতা সৃষ্টি করে, ৫৪৩; -ই গতিতত্ত্ব, ১৮০; ধ্যান-কালে মন রাজসিক হয়ে পড়লে, ৩৩০, ৩৪৩; -নিম্নতর চক্রের সঙ্গে যুক্ত, ৫২০; -মানুষকে সংসারজালে আবদ্ধ করে রাখে, ১৮১, ৫৪২, ৫৪৪; -মায়ার একটি উপাদান, ৪৪৭; -এর লক্ষণসমূহ শ্রীমদ্ ভগবদগীতার মতে, ৪৬৭; -সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য, ৪৬৯; -এর সত্ত্বগুণে রূপান্তর, ৪৭৩

রবিদাস (রাইদাস)—৬০২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—২৫৯

রাখাল—(ব্রহ্মানন্দ স্বামী দ্রঃ), ৫০

রাজযোগ— -এ অহংবোধকে শুদ্ধ ও আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ করা, ৩৩; -এ পবিত্রতার ওপর জোর, ১৬৮; -এর ওপর (স্বামী) বিবেকানন্দের গ্রন্থ, ২৫, ১৯৯, ২৭৮; সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যাত, ৩০

রাবিয়া—২৩৬, ৫৭১

রাম(চন্দ্র) (শ্রী)— -এর জীবনীকার বাল্মিকী, ৪৬০; তুলসীদাসের -ভক্তি, ৬০৫-১০; -এর পূজা, ৫৮, ৬১, ৩০৯, ৩৭১, ৫৩০; -বিষ্ণুর অবতার, ৬৫, ৩৭১; -মন্ত্রে নরেন্দ্রনাথের দীক্ষা, ১২৯-৩০, ৩৯২; -এর (শ্রী)রামকৃষ্ণ-রূপে পুনরাবির্ভাব, ৪৯; -এর সঙ্গে (ভক্ত) হনুমানের সম্পর্ক, ২৮২

রামকৃষ্ণ (শ্রী)—ভগবান, (গদাধর, গুরুমহারাজ, প্রভু দ্রঃ), ১৪-১৭, ৫০, ৬৬, ১২৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৩, ২১৪, ২১৭, ২৬১, ২৭০, ২৭২, ২৭৭-৭৮, ২৮৩, ৩৩০, ৩৫০, ৩৮০, ৪০২, ৪০৬, ৪৩০, ৪৬৬, ৫১০, ৫১২, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৫৫, ৫৬৩-৬৪, ৬৩৪, ৬৩৯, ৬৪৩, ৬৫২; -অধ্যাত্ম-শক্তির ভাণ্ডার, ১৩০; -এর অমরত্ব, ৩৩১; অহং-ত্বের বাধা সম্বন্ধে, ৩৩, ৯৮-৯৯, ২৪৫, ৪৫৪; আত্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা, ৯১; আত্মপ্রচেষ্টা ও ভগবৎকৃপা, ৯২, ৫০২; (তিনপ্রকার) আনন্দ, ২৯৪; (বিভিন্ন) আধ্যাত্মিক পথসমূহের সমন্বয় সাধন, ২৭৭-৭৮; আহার সম্বন্ধে, ১৬৬-৬৭; ঈশাবতার প্রসঙ্গে, ৫৩৬; ঈশাবতার-রূপে-, ৪৯, ৪২৯; -ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৭৪; ঈশ্বর-সম্বন্ধে সর্বব্যাপক অনুভূতি, ২৫৩; ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে, ১৪-১৬; ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতার উদাহরণ, ১৪; ঈশ্বরে সর্ব মন সমর্পণ, ১২; কর্মবৃদ্ধির প্রবণতাকে উৎসাহ দিতেন না, ৪২৩; কাম-কাঞ্চন, ৮২, ১৮৯, ১৯৬; কুণ্ডলিনীর জাগরণ, ৫২৬-২৭; কুসঙ্গের কুফল, ১৬-১৭; (শ্রী) কৃষ্ণপ্রসঙ্গে, ৬৬; -এর গল্প : কাঁটা ঘাস খাওয়া উট, ১৪৭; খিদে-পাওয়া ছেলে, ২৯৭; গরিব কাঠুরিয়া, ২৮১-৮২; চিড়ে তৈরি করা মেয়ে, ২৬৯; জমিতে জলসেচ করা চাষী, ৫২২; জালে বদ্ধ মাছ, ৫৪৮; জিনিসের ফর্দ লেখা চিঠি, ৮৯; তাঁতি বৌয়ের গল্প, ৫৫৯; তিন ডাকাত, ১৮১, ৫৪২; নুনের পুতুল, ২৭, ৩২৫; পোষা কুকুর, ২৬৮; বাঘ-ভেড়া, ১২১-২২;

রাজা ও পণ্ডিত, ৫৫৩; সাপ ও সাধু, ২১৮প; ছয় রিপুকে ঈশ্বরমুখী করা, ১১৪; জপ সম্বন্ধে, ৩৯৫-৯৬, ৪০০-০১; -এর জীবনী ও বাণী, ৫৬৩; জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গে, ৪৯৮, ৫২৯; -এর দীক্ষা, ১২৯; দেহ ও তার বিকার, ২৬১; দেহ থেকে আত্মার নিষ্ক্রমণ, ৯৬, ১৪১; -এর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের (বিবেকানন্দের) প্রথম সাক্ষাৎ, ৪৯, ৪৯৮; -এর পূজা, ২৫২; প্রত্যগাত্মার জাগরণ, ১২৪; প্রার্থনা প্রসঙ্গে, ৩৪৯, ৩৫০, ৬৪৪; -এর প্রিয় সঙ্গীত, ১৪৫-৪৬, ২৬১-৬২, ২৬৫, ৬০৪, ৬১৫; বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য বিষয়ে, ১৮৫, ১৮৭, ২০০; -এর বিবেকানন্দকে (নরেন্দ্রনাথকে) রামমন্ত্রে দীক্ষা দান, ১২৯-৩০, ৩৯২; ব্রহ্মের শব্দপ্রতীকরূপে প্রকাশ, ৩৮৫; ভক্তদের প্রতি ঈশ্বরের টান, ৮৭, ২৫৯, ৩১১, ৪৯১; ভক্তের তিন শ্রেণী বিভাগ, ৫৭; -এর ভস্মাবশেষ (আত্মারামের কৌটা), ৫৬১; মন্ত্রশক্তি প্রসঙ্গে, ১২৭; - মাতৃভাবে ঈশ্বরোপসনা, ৬৩-৬৫, ২৯০; মানবজাতির উদ্দেশ্যে -এর বাণী, ১৯৬-৯৭, ৫০০; মুক্ত পুরুষের লক্ষণ, ৫৫৮; মূর্তিপূজার তাৎপর্য, ৩৬৯; (সুলভ) যোগশক্তির খেলা দেখাতেন না, ৫০৯; -যৌনপবিত্রতার প্রতিমূর্তি, ১৯১; -এর (ব্রজের) রাখাল দর্শন, ৫০; -এর শিষ্যমণ্ডলী, ১৬-১৭, ১২৬, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৯, ২২৯, ২৩৩, ২৭২, ২৯৪, ২৯৬, ৪৭২, ৫০৫, ৫৫৮, ৫৭৩, ৫৭৫; (স্বামী) অদ্ভুতানন্দ বা লাটু মহারাজ, ১৩৬, ৫৭৫; গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১৭, ২৮৩, ৪৫১; নাগ মহাশয়, ২৭৮; নিরঞ্জন, ৫১০; (স্বামী) প্রেমানন্দ, ২২৪, ৫০৭, ৫৭৫; বলরাম, ১৫-১৬; (স্বামী) বিবেকানন্দ, ১১২, ৪৬১, ৫৭৩-৭৫; (স্বামী) ব্রহ্মানন্দ, ২২৪, ৩৬৭, ৩৯৬-৯৭, ৫৭৪; (স্বামী) যোগানন্দ, ১৮৮; (স্বামী) শিবানন্দ, ১২৫, ১৩০, ৫৭৫; (স্বামী) সারদানন্দ, ৫৭৫; -এর শিষ্যদের প্রতি ভালবাসা, ১৩৮-৩৯, ১৪৩, ২৪০; সংসারীদের প্রতি -এর উপদেশ, ৭৪, ১০৫; সংসার কিভাবে থাকতে হবে, ১৭৫; সত্যকে ত্যাগ করতে পারেন নি, ১৭০; সর্বধর্ম সমন্বয়ের অবতাররূপে, ২৬; সাধনকালে -এর মানসিক অবস্থা, ৪৯৬; সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, ১৩৩; হৃদয়-কেন্দ্রের গুরুত্ব, ৩২১

(শ্রীশ্রী) রামকৃষ্ণকথামৃত, ৭৪প, ৯৬, ১৪৪প, ১৪৬প, ১৪৭প. ১৯৫প, ১৯৮প, ২১৭, ২৬৩প, ২৬৫প, ২৬৯প, ৪১২, ৪৫৪প, ৪৬৬প ৫২২প, ৫২৬প, ৫৩৪প, ৫৪৮প, ৫৫৩প, ৫৫৫প, ৫৫৮প, ৬০৪প;

-অধ্যাত্ম-জীবনে অধ্যয়ন, ৮৯; অবতার হিসেবে (শ্রী)রামকৃষ্ণ, ৪৮; অহং-বোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করা, ৩২-৩৩, ২৪৫; আত্মপ্রচেষ্টা ও ভগবৎ-কৃপা, ৯২; আধ্যাত্মিক ক্ষুধা, ২৯৭; আধ্যাত্মিক জীবনে 'নিত্য' ও 'লীলা', ৫৩৬-৩৭; আমি, কাঁচা ও পাকা, ৯৯; আহার প্রসঙ্গে, ১৬৬-৬৭; ঈশ্বরাবতার গাভীর বাঁট, ৫৩৬; ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, ১৫; ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ভিন্ন জীবে ভিন্ন ভাবে, ৭৪; ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক, ৪০৬; উপাসনা ও ঈশ্বরোপলব্ধি, ২৭৭; কর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনা, ২৬৯; কর্মবৃদ্ধির প্রবণতাকে উৎসাহ না দেওয়া, ৪২৩; কাঠুরিয়ার গল্প, ২৮১-৮২; কুণ্ডলিনীর জাগরণ, ৫২৬-২৭; কুসঙ্গের কুফল, ১৬-১৭; ছয় রিপুকে ঈশ্বর-মুখী করা, ১১৪; জপ, ৩৯৫-৯৬; জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর সংজ্ঞা, ৪৯৮, ৫৩৫; তাঁতি বৌ-য়ের গল্প, ৫৫৯; তিন ডাকাতের গল্প, ১৮১, ৫৪২; তিন থাকের ভক্ত, ৫৭; ত্রিবিধ আনন্দ, ২৯৩-৯৪; নুনের পুতুলের

গল্প, ২৭, ৩২৫; ব্রহ্মচর্য, ২০০; সংসারীর আধ্যাত্মিক জীবন, ১০৫, ১৮৭; সাধুসঙ্গে কি লাভ? ১৩৩; সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা, ২৮০; সাপ ও সাধুর গল্প, ২১৮প; সিদ্ধার্থের বুদ্ধে রূপান্তর, ৩; হৃদয়-কেন্দ্র, ৩২১

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন—৫৬৫, ৫৭৩-৭৫

রামকৃষ্ণানন্দ (স্বামী)—(শশী দ্রঃ), ৫০, ৫৭৫; -এর (শ্রী) রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, ১৮৫

রামপ্রসাদ—১৯৮, ২৫১, ৬১৫-১৬

রামানন্দ—৫৯৯, ৬০২

রামানুজ (শ্রী)—আচার্য, ৫৮৮; -এর জীবন ও বাণী, ৫৮২-৮৩; -এর দর্শন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ৫৭৭; ভাল ও মন্দ সম্পর্কে-, ৭২

রাহুকুলন্—৩২৯

রোমাঁ রোলাঁ—৫১৩

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড—৫৭৭

লরেন্স (ব্রাদার)—১২৮, ৫৬৯-৭০

লাটু (মহারাজ)—১৩৬

লিঙ্গ—৩৭১

ল্যাপল্যাস—৩৯-৪০

শঙ্করাচার্য—৫, ৩৭০, ৪৬৯; -এর অপরোক্ষ আত্মবিশ্লেষণের পথ, ৩৫; আহার সম্বন্ধে ২৮৬; -এর জীবন, ৫৬১; মুক্ত পুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে, ৪১৯; -এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি : অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্, ১৫১, ১৯১; অপরোক্ষানুভূতি, ৪৭৬; দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্, ৩৫৮, ৪৫০; দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্ ৩৫৯; নির্বাণষটকম্, ৫৯, ৪০৯; প্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্, ৩৫৮; বিবেকচূড়ামণি, ৫, ১২৩, ৫৫৬-৫৭; বিষ্ণুষট্পদী, ৩৫৯, ৪১২; বেদসারশিবস্তোত্রম্, ৩৫৮-৫৯; শিবমানসপূজা, ১৯১, ২৭০; -কর্তৃক স্বর্গসুখস্পৃহার নিন্দা, ৫৪৫; -হিন্দুধর্মে প্রথম বিপ্লব আনেন, ৫৭৭

শব্দব্রহ্ম(LOGOS) (নাদব্রহ্ম)—৩৮০, ৩৮৫-৮৯

শশী—(রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী দ্রঃ), -এর (স্বামী) বিবেকানন্দের মহাসমাধি ব্যাপারে পূর্বাভাস, ৫০; -এর (শ্রী) রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার, ১৮৫

শালগ্রামশিলা—৩৭১

শাস্ত্র—১২৪, ৬০৬, ৬১০; -অধ্যয়ন, সাধনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, ৪১৬, ৪২৩; ঈশ্বর সাধকদের সঙ্গে -মুখে কথা বলেন, ৩; ঋষিরা অত্যধিক -অধ্যয়নে উৎসাহ দেন না, ৮৯, ৬০৩, ৬১৪; -এ গুরুর প্রয়োজনীয়তা, ১২৩; তন্ত্র-এ শক্তিবাদ, ৬১৫; তামিল ও সংস্কৃত-অধ্যয়নে রামানুজের উৎসাহ দান, ৫৮৩; -এ ত্যাগের গুরুত্ব, ১৪৭; -দেহকেই ঈশ্বরের মন্দির বলে দেখান, ৭; নারদের সর্ব-এ জ্ঞান, ২৮৪; বিভিন্ন -এ বিভিন্ন পথের সন্ধান, ৩৬০, ৩৬৭; রাজার কাছে পণ্ডিতের—ব্যাখ্যা, ৫৫৩; সমষ্টিজীবনে ব্যক্তিজীবনের স্থান প্রসঙ্গে-, ৭৩; -সম্মত অধ্যয়ন শাস্ত্র, সাধনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, ৪১৬, ৪২৩

শিবানন্দ (স্বামী)—(মহাপুরুষ মহারাজ দ্রঃ), ১৩০, ৫৭৫; শুভদিন প্রসঙ্গে, ৩২৯-৩০

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ (বল্লভাচার্য)—৬১১

শেষ সনাতন—তুলসীদাসের শিক্ষাগুরু, ৬০৫

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্— -এ আত্মোপলব্ধি প্রসঙ্গ, ৪১৭-১৮, ৫৫৫; ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব প্রসঙ্গে, ৫৭, ১৯৭, ২৫১; -এ দুই পাখির উপমা, ৪৭০, ৫২৬; বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, ৬৭, ৩০৪; বিশ্ব-সৃষ্টি প্রসঙ্গে, ৫৩; -এ মুমুক্ষুত্ব, ৬০

শ্রীশ্রীমা—(সারদাদেবী দ্রঃ), ৯২-৯৩, ১৮৮,

১৯১-৯২, ১৯৬, ২৭২, ২৯৭, ৩৪২, ৪৩০, ৫০৫; জপ সম্বন্ধে-, ৩৯৭; -এর সম্পর্কে (স্বামী) বিবেকানন্দ, ৫৬৫; সন্ন্যাস জীবন সম্বন্ধে-, ১৮৭-৮৮; -এর সাধনা, ৩৯৬

সংস্কার—১৫৯, ৫৩১; আধ্যাত্মিক জীবনে -এর প্রভাব, ৯২, ৪৪৯, ৪৬৫, ৬৪৩; -এর ব্যাখ্যা, ৩৮-৩৯; সাধুসঙ্গ সু- বাড়িয়ে দেয়, ১৪২

সক্রেটিস— -এর বিচার, ৫৬০; -ও ব্রাহ্মণ মুনি, ২৩০

সচ্চিদানন্দ—২৯২; -এর অনুভূতিই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ৪৬৪-৬৫; -ই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, ৪৪১, ৪৬৪; -রূপে ঈশ্বর, ২৯২, ৩৪৮, ৩৬২; -এর উপলব্ধিই বেদান্তমতে আধ্যাত্মিক জীবন, ৫৪৮-৪৯; একেশ্বরবাদীর -এর ধ্যান, ৩৬২; জীবনের অহংবোধ ও দিব্য ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে রয়েছে অখণ্ড-, ২৫৫; -(সম্বন্ধে) তান্ত্রিক ধারণা, ৫২৭; -এর ধ্যান, ২৯১, ৩৫৮, ৪১০; -ই ব্রহ্মের স্বরূপ, ৫৪; (শ্রী) রামকৃষ্ণের দেহ হতে উদ্গত - ও তাঁর দর্শন, ৪৮

সত্ত্বঃ—৪৬৯, ৬৪৫; -ই আধ্যাত্মিক সোপানের সর্বোচ্চ ধাপ, ১৮০, ১৮১, ৫৪২-৪৩; -উর্ধ্বতন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত, ৫২১; -ই হলো জ্ঞানতত্ত্ব, ১৮০; -প্রধান মানুষরা দৈবী সম্পদে ভূষিত, ৪৬৯, ৫৪৩-৪৪; -এর বন্ধন, ৫৪২; -মায়ার উপাদান, ৪৪৭; সাত্ত্বিক আহার, ২৮৫; সাত্ত্বিক মানুষের গুণাবলী, ৪৬৭-৬৮, ৪৭৩

সন্তগণ (ঋষিগণ)—১৩০, ১৩৬, ২২২, ৩০৪, ৩০৮, ৩৬৯, ৩৮৫, ৩৯১, ৩৯৩, ৪৭৫, ৫৫৬, ৫৬৬, ৫৭১, ৬৩৬, ৬৫৫; -অগাস্টাইনের জীবন, ৪৬০-৬১; -এর কাছে আধ্যাত্মিক জগৎই সত্য, ১১; -এর ইচ্ছাশক্তি প্রবল, ২১৪; উত্তরভারতের-, ৫৯৭-৬১৪; -জপের ওপর গুরুত্ব দেন, ১২৭, ৩৯৪; -জীবনে নিখুঁত হন, ১৩৬; দক্ষিণ ভারতের-, ৫৭৮-৭৯; -এর নিরাসক্তির উদাহরণ, (লালাবাবা ও তুলসীদাস), ১৫৯; -পূর্ণজ্ঞান নিয়ে জন্মান না, ২৮৪; -এর প্রতি প্রণাম, ৩৬১; প্রহ্লাদ (পুরাণের-), ১৪; বাংলার-, ৬১৫-১৭; -এর ব্রহ্মচর্য বিষয়ে অভিমত, ২০৩; মহারাষ্ট্রের-, ৫৮৯-৯৭; মুসলিম-এর গল্প, ১৩৩-৩৪; রাবিয়া, নারী সুফী-, ২৩৬; সুরদাস, উত্তর ভারতের মহান্, ২৫৬

সন্ন্যাস—৫৯০

সন্ন্যাসী— -র কমণ্ডলু, ১৪৪; ফ্রান্সিসকান -সম্প্রদায়, ৫৬৮; যীশুখ্রীস্ট ছিলেন খাঁটি-, ৫৬৩; -সম্বন্ধে (স্বামী) বিবেকানন্দ, ১৬৪-৬৫; -সম্বন্ধে (শ্রী) রামকৃষ্ণ, ৭৪

সমাধি—৫০৭; ঈশ্বরকোটিরা -র স্তর থেকে নেমে আসেন, ৫২৭; ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ মাধ্যমে-, ৫৪, ৩০৯; নির্বিকল্প-, ৫২২; -র পথে বাধা, ৪৭৬; পাতঞ্জল যোগের শেষ ধাপ, ২৮৮; -এর ওপর (স্বামী) বিবেকানন্দের কবিতা, ৫৩৩; (স্বামী) বিবেকানন্দের নির্বিকল্প-র অভিজ্ঞতা, ৪৯৮-৯৯; (স্বামী) বিবেকানন্দের মহা-, ৫০; -সম্বন্ধে (শ্রী) রামকৃষ্ণ, ৯৯, ২৪১, ৫২৬-২৭, ৫৩৫; -সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য, ১৯১; সুষুপ্তির সঙ্গে -র পার্থক্য, ৪৫১

সাংখ্যদর্শন—ঈশ্বর মানে না, ৪১; -এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, ৫৪, ২৯৬

সাধনা—৭৬, ৮৫, ১৩৫, ১৪৩, ১৫৩, ১৬৭-৬৮, ১৭৩, ২৩৯, ২৬৮, ৩৩৮, ৩৭৩, ৪২৯; অদ্বৈত-, ২৮২; অধ্যয়ন, -র গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, ৮৯-৯০, ৪১৬-১৭;

আত্মসমর্পণ -র শক্তিশালী অস্ত্র, ২৫৬, ৩৪২; কবীরের-, ৬০১; জপ, -গুরুত্বপূর্ণপথ, ৩৮৫, ৩৯৬; তুকারামের-, ৫৯৩; -সম্বন্ধে তুলসীদাস, ৬০৯; ধ্যান, -র মূল জিনিস, ৩৩৪; -নিয়মিত হতে হবে, ৩৪৫, ৪৯০; -র পথে বাধা, ৪৭৫-৭৬; -র প্রতিক্রিয়া ৪৭৫-৯৫; বাংলার তান্ত্রিক-, ৬১৫; (স্বামী) বিবেকানন্দের-, ৫৭৩; ব্রহ্মচর্য, -র প্রয়োজনীয় বিষয়, ১৯৫; মীরাবাঈয়ের-, ৬১৩; যোগশক্তির অভিজ্ঞতা, -কালে, ৫০৯; -সম্বন্ধে (শ্রী) রামকৃষ্ণ, ৬৩৯; রামপ্রসাদের-, ৬১৬; সাধুসন্তদের-, ২৮৪

সাধু—১৮৮, ৬০১, ৬০৫

সারদাদেবী (শ্রী)—(শ্রীশ্রীমা দ্রঃ), ৯২-৯৩, ১৭৮, ৫৭৫; -এর জীবন, ৫৬৪-৬৫; -সম্বন্ধে (স্বামী) বিবেকানন্দ, ৫৬৫

সারদানন্দ (স্বামী)— -এর জীবনী, ৫৭৫; (শ্রী) রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার, ১৮৫

সিদ্ধার্থ—(বুদ্ধ দ্রঃ), ৩

সুইজারল্যাণ্ড—২৮৬, ৫২৩; -এ অধ্যাত্ম সাধক, ৫১৩; (ডঃ) জঙ্-য়ের সঙ্গে গ্রন্থাকারের সাক্ষাৎকার, ২০; -এ মাতৃ-উপাসনা, ৬৩

সুখ—১৫, ৩৮, ৫৩, ৩৩৯, ৪৪২, ৫৪১, ৫৪৭; আধ্যাত্মিক অনুভূতির-, ৩৪, ১৫৪, ১৫৬, ১৯৬, ২১৪, ২৯৮; আধ্যাত্মিক-, ৭; আনন্দময় ব্যক্তিত্ব-এতে অভিভূত হন না, ২৩৭; ক্ষণস্থায়ী ও প্রকৃত-, ৬, ২৬; জাগতিক-, ১৮৮-৮৯; ত্রিবিধ-, ২৯৩-৯৪; -দুঃখের মুকুট পড়ে আসে, ২৬১, ৩৩৯; মোক্ষ প্রাপ্তিতে প্রকৃত -এর অবস্থা, ৫৩৮; -এর রকমফের, ২৪১-৪২, ৫৪৬; সত্ত্ব -এর দিকে নিয়ে যায়, ৫৪২; সুষুপ্তির-, ৫০৭

সুফী—৫২৫, ৬১৪

সুফীবাদ—২৯, ৪৮, ২৩৬, ৫৭৩

সুফী মরমিয়া সাধক—৫৭১; আল ঘজালী, ৩৯৩, ৫১১; ইবন আরবী, ৫৩১; জালালুদ্দীন রুমি, ৪৮, ৫৭২; মনসুর অল হল্লাজ, ৫৭১-৭২; রাবিয়া, ২৩৬, ৫৭১

স্ফোট—(শব্দব্রহ্ম দ্রঃ), ৩৮৫; -এর ধারণা থেকে মন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি, ৩৮৭; -এর শব্দ -প্রতীক ওঁ, ৩৮৫, ৩৮৯

স্বাধ্যায়—(অধ্যয়ন দ্রঃ), ১৭১, ২৮৭

হিন্দু—১৫, ২০, ২৫, ৬৪, ৭২, ৯২, ৯৭, ৯৮, ৩৫৫, ৩৮৯, ৪১১, ৪৪৬, ৪৬৮, ৫২৫, ৫৩১, ৫৬১, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৮৩, ৫৯৮-৬০২, ৬০৪, ৬১১, ৬১৪, ৬১৭; অগ্নিপূজা, ৩৬৭; -মতে অবতারত্ব, ৬৫-৬৬; -মতে অমরত্ব, ৩৬-৩৮, ৪৬; আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ৩৫৭-৬১; আধ্যাত্মিকতা, ৬১৬; আরশুলা ও বোলতার গল্প, ৪১৫; -মতে কর্তব্য, ৭২-৭৫; -মতে দেবী মাতৃকার আরাধনা, ৬২-৬৩; -নারী, ৬১২; -পরম্পরা, ৩২৯, ৫৩৪; -প্রার্থনা (গায়ত্রী), ৩৫০, ৩৬০; -মতে মন্ত্র, ৩৯১-৯২; মতে মূর্তিপূজা, ৩৬৯-৭১; -মতে যোগ, ১৯; -শাস্ত্রে গুরু, ১২৩; -সমাজ-জীবনের পরিকল্পনা, ৭৫

হিন্দুধর্ম—১৯, ৫৪, ১৮০, ৩৫৫, ৫৪৭, ৫৪৯, ৫৬১, ৫৬৪, ৬১৬-১৭; -এ অবতারবাদ, ৬৫-৬৬; -এ আত্মা, ৩৬-৩৮; -এ উপাসনা, ৩৮১; -এ ঈশ্বরের ধারণা, ৩৪৮-৪৯, ৩৫৫; -এ চরম আদর্শ, ৫৫৬; -এ জপ, ৩৯৪-৯৫; -এ ধর্ম ও দর্শন, ২২-২৩; -এ ধর্মীয় স্বাধীনতা, ২৯; -এ প্রার্থনা, ৩৫১; -এ ব্রহ্মচর্য ও বিবাহ, ১৮৪-৮৫, ২০৩; -ও ভারতবর্ষ, ৫৭৭, -এ মূর্তি পূজা, ৩৭১-৭২, ৩৮৭; -এ বিভিন্ন সম্প্রদায়,

৩০৯; -এ সাধনা, ৬০; -এ স্বর্গ ও সুখভোগের ধারণা, ৫৪৫
হিরণ্যগর্ভ—বিশ্বমনরূপে, ৩০৭, ৩৮৫; বিশ্বস্রষ্টারূপে, ৫৪
হ্যাডফিল্ড—১১৩
হ্যারিয়েট বীচার স্টো (Uncle Tom's Cabin), ৩৫-৩৬